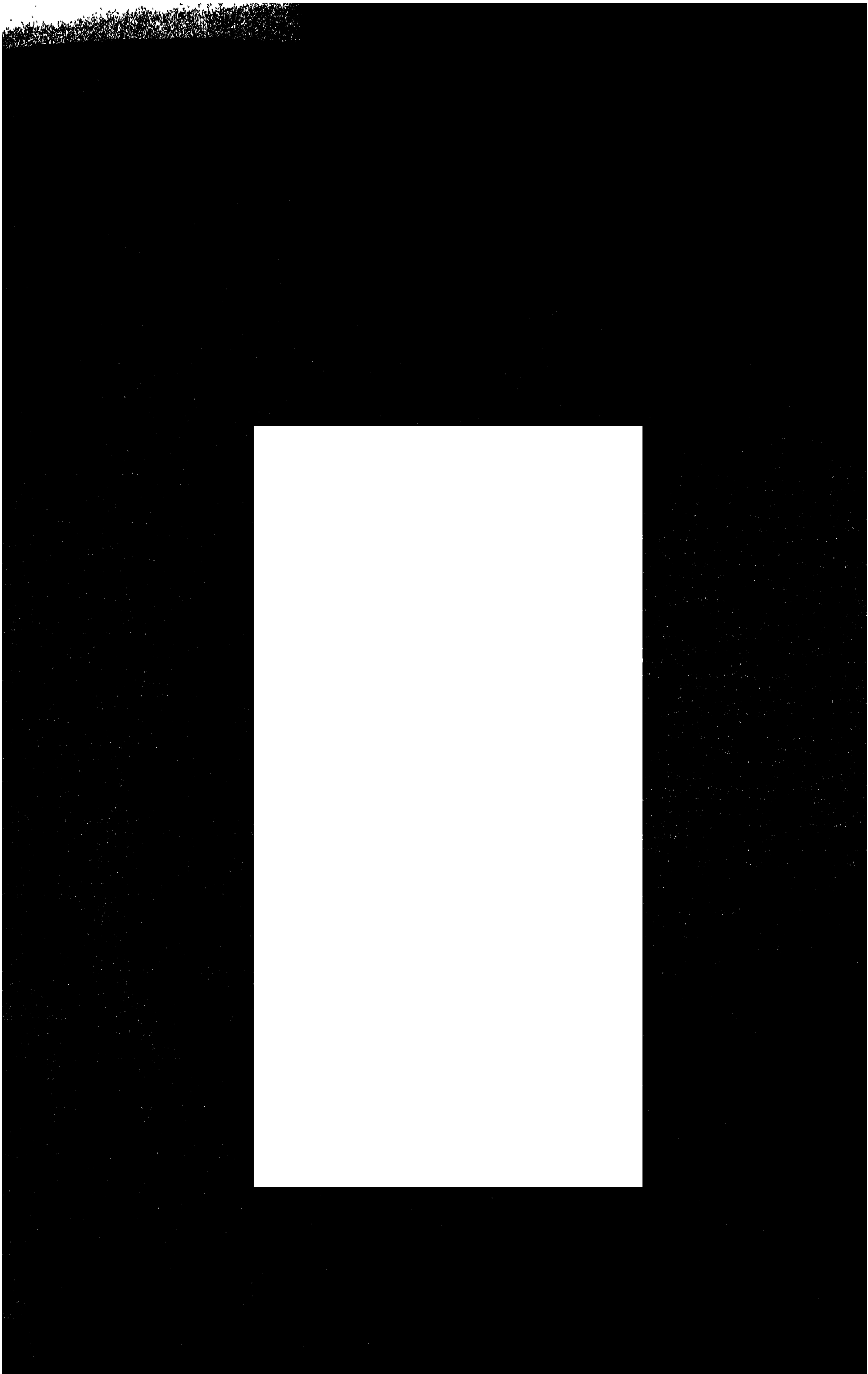
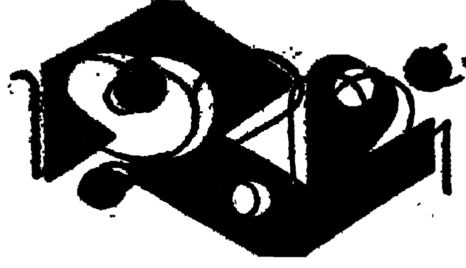


ত্রৈমাসিক পত্রিকা



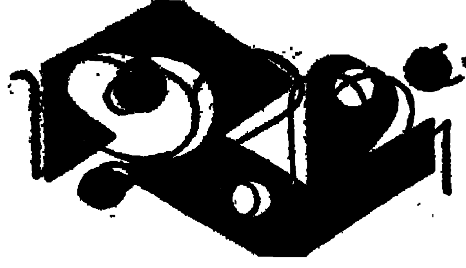
বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭১

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা



বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭১

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ষড়বিংশতিতম বর্ষ প্রথম সংখ্যা



নেহরু : ১৯৫৭ সালে একটি মুল্যায়ন

এস্‌কট রীড

ভারতে নেহরুর অপ্রতিহত প্রভাব। আজকের ভারত নেহরুর ভারত। একাদিক্রমে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে নেহরু ভারতের নেতা। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতালাভের আগের ষোল বছর ভারতবাসীর দৃষ্টিতে তাঁর স্থান ছিল গান্ধীর ঠিক পরেই। ১৯৪৮ সালে গান্ধীর তিরোধানের পর নেহরু হলেন অদ্বিতীয়। জীবৎকালে প্যাটেল ছিলেন নেহরুর ক্ষমতার অংশীদার। প্যাটেল মারা গেলে নেহরু হলেন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। স্বদেশের ইতিহাসে এত বড় ভূমিকা, স্বদেশবাসীর অন্তরে এতখানি প্রতিষ্ঠা নেপোলিয়নের পর নেহরু ভিন্ন আর কারো দেখা যায় নি। ভারতবাসীর কাছে নেহরু হলেন একাধারে জর্জ ওয়াশিংটন, লিঙ্কন, রুজভেল্ট আর আইজেনহাওয়ার।

ভারতে নেহরুর বিবিধ ভূমিকা। তিনি বাইবেলের পূর্বভাগে বর্ণিত পয়গম্বর এলিশা—যিনি এলিজারূপী গান্ধীর উত্তরসাধক। পয়গম্বরের ভূমিকা গ্রহণ করে গান্ধীর পূত আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট ভারতকে তিনি তার দোষত্রুটি, ভাষাবিদ্বেষী আর বর্ণবিদ্বেষী অন্ধতার জন্যে কশাঘাত করেন। ভারতকে কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হতে বলেন। ভারতকে তিনি দেখান ভাবী বিরাটত্বের ভাবাবিষ্ট ছবি। নবভারতের প্রধান পুরোহিতও তিনি। তাঁর পৌরোহিত্যে নতুন বাঁধ বা কারখানা বা গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর কাছে এইসব আচার-অনুষ্ঠান হল নবভারতের ব্রত উদ্‌যাপন—এক নতুন আত্মিক আভ্যন্তরীণ সুষমার দৃষ্টিগ্রাহ্য বাহ্যিক লক্ষণ। তিনি একই সঙ্গে রাজা এবং পয়গম্বর ও পুরোহিত—কেননা তিনি ভারতের ঐক্যের প্রতীক, তিনি ভারতের মুখপাত্র, ভারতীয় সরকারের শীর্ষস্থানীয়। কখনও কখনও তাঁর আচরণে মনে হয় তিনি বুঝিবা বিরোধীপক্ষেরও নেতা।

নেহরুর স্নায়বিক শক্তি ও খাড়া থাকার ক্ষমতা অগাধ। ১৯৪৫ সালে শেষের বার জেল থেকে ছাড়া পাবার কিছুদিনের মধ্যেই এক মাসের ছুটি নিয়ে তিনি কাশ্মীরে ঘুরে বেড়ান। তারপর বারো বছরের মধ্যে বছরে দু-একদিনের বেশী তিনি কখনও ছুটি নেননি। এগারো বছর আগে প্রধানমন্ত্রী হবার পর একদিনের জন্যেও অসুস্থ হয়ে কখনও তিনি

শয্যা গ্রহণ করেন নি। মামুলি অসুখবিসুখ হওয়াকে তিনি অপরাধ বলে গণ্য করেন। মাঝেমাঝে সর্দিকাশিতে কাতর হলেও তার জন্যে কখনও তিনি কাজকর্ম থেকে বিরত হননি। এ বছর অবধি সকাল প্রায় আটটা থেকে রোজ রাত একটা পর্যন্ত সমানে তিনি কাজ করেছেন। আজকাল তিনি শুতে যান রাত বারোটায় আর সাতটা সাড়ে-সাতটার আগে ওঠেন না। নেহরু কাজ করেন সপ্তাহে সাতদিন, বছরে বাহান্ন সপ্তাহ। সমানে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন, সভাসমিতিতে যোগ দিচ্ছেন, সারা ভারত চষে বেড়াচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে বৈদেশিক সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদের, বিশিষ্ট অতিথিঅভ্যাগতদের, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী-দের, কংগ্রেস পার্টির কর্মীদের সাক্ষাৎকারের বিরাম নেই। একা খেতে বসা তাঁর কমই ঘটে। প্রাতরাশের সময় অতিথি বলতে একমাত্র তাঁরাই যাঁরা তাঁর বাড়িতে এসে ওঠেন, তবে বাড়িতে তাঁর অতিথি প্রায় লেগেই থাকে। মধ্যাহ্নভোজের সময় প্রায় রোজই তাঁর কোনো না কোনো অতিথি থাকে। একা একা কিংবা শুধুমাত্র মেয়ের সঙ্গে বসে খাওয়া তাঁর ধাতে নেই বললেই চলে। এক নাগাড়ে কয়েক ঘণ্টার বেশী গা এলিয়ে বসে আরাম করা তাঁর কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়। কাজেই ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে একবার যখন চারদিনের ছুটি নেবার সুযোগ এল, নেহরু রাজী হলেন না। ছুটি নেবার বদলে চার দিনের মধ্যে দুটো দিন তিনি উন্নয়ন দপ্তরের কমিশনারদের সম্মেলনে বসে কাটিয়ে দিলেন।

বহিরাগত প্রধানমন্ত্রী বা কোনো মন্ত্রিসভার সদস্য যখনই নেহরুর সঙ্গে দেখা করেন তাঁর মনে হয় নেহরু হৃদয়বান, চোখে মুখে তাঁর প্রশান্ত ভাব, কোনো ব্যস্ততা নেই, যেন তিনি মিতাচার আর মনোরম বিচারবুদ্ধিসম্পন্নতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। অন্যান্য সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর আচরণে মনে হবে নেহরুকে আড়াল করে মাঝখানে যেন মোটা কাঁচের দেয়াল গাঁথা রয়েছে। নেহরুর মন সে ঘরে থাকবে না।

নিজে বক্তৃতা দিতে তিনি ভালবাসেন। বক্তৃতা শুনতে তাঁর ভাল লাগে না। জন-সভায় অন্য কারো বক্তৃতার সময় সাধারণত তিনি বসে থেকে আরামে গা এলিয়ে দেন। তাঁকে এমন পরিপূর্ণভাবে গা এলিয়ে দিতে দেখা যায় যে, অনেক সময় দেখে মনে হয় তিনি ঘুমোচ্ছেন।

যেসব কর্মচারী বা চাকরবাকর তাঁর কাছে কাজ করে, তাদের প্রতি ব্যবহারে অন্যান্য অধিকাংশ ভারতীয়ের চেয়ে তিনি ঢের কম রূঢ় এবং ঢের বেশী বিবেচনাসম্পন্ন। যারা তাঁর কাছে কাজ করে তারা মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে তাঁর সেবা করে। গৃহকর্তা হিসেবে অতিথিদের কাছে তিনি সদয়, যত্নবান, সদা প্রফুল্ল। দুপুরে বা রাত্রে খেতে বসে কাজের কথা বলতে তিনি ভালবাসেন না। যদি এমন কোনো বিশিষ্ট অতিথি থাকেন যাঁর সঙ্গে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে চান, বিশ্রম্ভালাপের জন্যে তাকে তিনি খাওয়ার পর একপাশে ডেকে নিয়ে যাবেন। সুদর্শনা আমুদে মেয়েদের সঙ্গ তিনি পছন্দ করেন। নেহরুর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এক অসাধারণ আকর্ষণী ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতার বিষয়ে তিনি নিজেও খুব সচেতন। সম্ভবত বরাবরই তিনি এই মোহিনীশক্তির অধিকারী। মন মুগ্ধ করার ছলাকলাগুলো স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আসে এবং দেখে মনে হয়, এবং সত্যিই বোধহয়, স্বতঃস্ফূর্ত। ঠিক সেকালের রাজাদের মতই নেহরু তাঁর এই নৈপুণ্যকে কাজে লাগান। নেহরুর চালচলনে আছে একটা সুরুচিপূর্ণ সৌষ্ঠব। তার প্রকাশ শুধু তাঁর মানানসই ভারতীয় পোশাকে বা তাঁর লাল গোলাপে নয়—যেভাবে তিনি সিগারেট খান, তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে যেভাবে তিনি তাকে অভ্যর্থনা করেন অথবা বিদায়কালে যেভাবে

বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেন।

অনেক সময় তাঁকে দেখে আত্মাভিমানী বড় ঘরের মানুষ বলে মনে হয়। কখনও কখনও এমনকি নৈশভোজের টেবিলে খোশগল্পে বসেও তাঁকে একটু যেন অহংকারী বলে বোধ হয়। কথার মাঝখানে হঠাৎ তিনি তিরস্কারের সুরে বলে উঠবেন, 'তার মানে? কী বলতে চান আপনি?' অন্য কারো মতামতকে কোনো রকম আমল না দিয়ে তিনি নিজেই বিধান দেবেন। আধ মিনিটের মধ্যেই তিনি এমন একটা উক্তি করবেন যেটা হবে তাঁর রূঢ়-ভাষণের জন্যে খানিকটা মাপ চাওয়ার মত। কানাডা থেকে একবার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভারতে এসেছিলেন; তাঁর আগ্রা আর ফতেপুর-সিক্রি দেখতে যাবার কথা ছিল। সেই ভদ্রলোকের সম্মানার্থে অনুষ্ঠিত মধ্যাহ্নভোজসভায় আমি কথাপ্রসঙ্গে নেহরুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'প্রধানমন্ত্রী, ভারতের কোন্ মসজিদ আপনার কাছে সবচেয়ে সুন্দর বলে মনে হয়? আমার তো ফতেপুর সিক্রি সবচেয়ে ভাল লাগে।' নেহরু বললেন, 'কী? সবচেয়ে ভাল নিঃসন্দেহে জামা মসজিদ।' কয়েক সেকেন্ড পরেই তিনি প্রায় হতচকিত হয়ে দ্বিধা-জড়িতভাবে বললেন, 'বুঝলেন, ফতেপুর সিক্রি আমি দেখেছি সে আজ বিশ বছর আগে।'

তুচ্ছ বিষয়ে নেহরুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। মাইক্রোফোন বিগ্ড়ে গেলে অথবা সময়মত মালপত্র এসে না পোঁছুলে তিনি বেজায় চটে যেতে পারেন। আর পাঁচজনের মতই তিরিক্ষে মেজাজ নিয়ে তিনি ঘুম থেকে উঠতে পারেন এবং একটা কোনো ছুতো পেলেই তাঁর রাগ ফেটে পড়তে পারে।

নেহরু মোটেই এমন ভাব দেখান না যে তিনি মাটির মানুষ। দেখে মনে হয়, তিনি খোশামোদ আর প্রশংসা পছন্দ করেন—অবশ্যই তা যদি সুরুচিসম্মতভাবে করা হয়। কেউ কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে তাঁর গুণগান বা প্রশংসা করুক এটা তিনি চান না। কিন্তু ভারতের নামে প্রশস্তির বন্যা বইয়ে দিলেও তাঁর খুব আপত্তি আছে বলে মনে হয় না। নেহরুর সম্বর্ধনা-সভায় গৌরচন্দ্রিকা গোছের বক্তৃতা বা ভাষণ যদি বেশী অলঙ্কারবহুল হয়, নেহরু তাহলে ক্ষেপে গিয়ে বক্তা বেচারাকে তক্ষুণি বক্তৃতা বন্ধ করতে বলবেন।

কোনো সরকারী অনুষ্ঠানে শেষ মুহূর্তে খুঁটিনাটি ব্যবস্থার ভার নিজের হাতে নেওয়া তাঁর স্বভাব। আমার মনে আছে, ১৯৫৩ সালের অগস্ট মাসে এয়ারপোর্টে পাকি-স্তানের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলীকে অভ্যর্থনা জানানো হবে—প্লেন তখনও এসে পোঁছোয় নি, বেড়ার ওপারে প্রচন্ড ভিড় আর সেই পল্‌কা বেড়ার ঠিক পাশেই বিমানঘাঁটির জমির ওপর দাঁড়িয়ে নেহরু জনতাকে আদবকায়দা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছেন। পরে যখন তারা হুড়মুড় করে এগিয়ে এসে হৈ হট্টগোল বাধিয়ে দিল, নেহরু তখন জনতার দিকে তাঁর হাতের বেটন উঁচিয়ে লোক সরিয়ে অতিথির যাবার রাস্তা করে দেবার চেষ্টা করলেন এবং ক্ষেপে গিয়ে লোকজনদের প্রচন্ড বকাবকি করতে লাগলেন। দু একদিন পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে এই ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম। নেহরু বলেছিলেন, 'তুমি যাই করো, ভারতীয় জনতা কিছু বলবে না, এমন কি গালাগাল দিলেও তারা মনে কিছু করবে না—অবশ্য সেটা যদি বন্ধুভাবে করা হয়।'

প্রকাশ্যে পাদপ্রদীপের সামনে যাঁদের জীবনের অনেকখানি কাটাতে হয়, যাঁদের নিজেদের লক্ষ্যসাধনের জন্যে মোহজাল বিস্তার করতে হয়—তাঁদের অধিকাংশকেই হতে হয় অভিনেতা। নেহরু সেই অর্থে একজন অভিনেতা। যখনই তাঁর ওপর উজ্জ্বল আলো এসে পড়ে, তিনি মুখোস পরে নেন—তখন সুন্দর চেহারা, হাসিখুশী মুখ, চটপটে ভাব,

সাতষট্টি বছর বয়স হয়েছে দেখে কে বলবে? সম্পূর্ণভাবে মুখোসখোলা অবস্থায় আমি তাঁকে মোটে একবারই দেখেছিলাম। আমাকে তাঁর অফিসঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে; নেহরু তাঁর ডেস্কে বসে লিখছেন; আমার পায়ের আওয়াজ তিনি শুনতে পান নি। তাঁর মুখ দেখে মনে হল বয়স হয়ে গেছে, শরীর আর বইছে না।

নেহরু বড় নিঃসঙ্গ। নিজেকে তিনি গুটিয়ে রাখেন। গান্ধীর মৃত্যুর পর এমন আর কেউ নেই যাকে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ বলা যায়—একমাত্র তাঁর মেয়ে ইন্দিরা ছাড়া। ইন্দিরার বয়স এখন সাঁইত্রিশ; নেহরুর সংসারে ইন্দিরাই গৃহকর্ত্রী। নেহরুর বোধহয় সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু মাউণ্টব্যাটেনরা। ভারতবর্ষে নেহরুর কোনো প্রাণের বন্ধু নেই। তাঁর বহুদিনের বিশিষ্ট সহকর্মীরা আছেন, যাঁরা তাঁর শ্রদ্ধাস্পদ ও স্নেহভাজন। আছেন তাঁর অধীনস্থ সহকর্মীবৃন্দ এবং প্রচুর আলাপী বন্ধু। ক্ষমতা সব সময় মানুষকে নষ্ট করে না। অনেক সময় মহত্ত্ব দেয়। কিন্তু ক্ষমতা পেয়ে নেহরুর একাকিত্ব আরও বেড়ে গেছে, তবে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেও তিনি নিশ্চয় নিঃসঙ্গ ছিলেন। বিশ বছর আগে নেহরু নিজেই একথা লিখেছিলেন যে, দু একজন লোকের চেয়ে বিরাট জনতার কাছেই তিনি ঢের সহজে নিজের মন খুলে ধরতে পারেন।

নেহরু বরাবরই তাঁর বাবার ভক্ত এবং ছেলেবেলায় বাবাকে ভয় করতেন। নেহরুর বাবা ছিলেন দৃঢ়চিত্ত, তীক্ষ্ণধী, জাঁদরেল মানুষ। এমন বাপের সন্তান হওয়ার দরুন হয়ত নেহরুকে ভুগতে হয়েছিল। নেহরুর বাবা ছিলেন কংগ্রেস দলের দু তিনজন সর্বাগ্রগণ্য নেতাদের মধ্যে একজন। নেহরু জানেন যে, ১৯২৯ সালে চল্লিশ বছর বয়সে যখন তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন অনেকেই তখন বলেছিল বাপের জোরেই ছেলে তরে গেল। তেমনি এও তিনি জানেন যে, লোকে বলে থাকে নেহরু যে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন সেটা তাঁর নিজের গুণে নয়—গান্ধী তাঁকে বেছেছেন বলে; এবং তাও কি, গান্ধী প্যাটেল মারা না যাওয়া পর্যন্ত নেহরু প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শুধু নামেই। নেহরু যে এত বেশী গোঁয়ারের মত নিজেকে খাটান তার বোধহয় একটা কারণ এই যে, তিনি নিজের এবং তাঁর সমালোচকদের কাছে এটা প্রমাণ করতে চান যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার তিনি যোগ্য নিজের গুণে—বড়লোকের ঘরে জন্মেছেন বলে নয় বা গান্ধীর বরপুত্র বলেও নয়।

নেহরুর ওপর যাঁর সবচেয়ে বেশী প্রভাব ছিল, তিনি হলেন গান্ধী। গান্ধী তাঁর গুরু; তাঁর আচার্য। নেহরু ছিলেন গান্ধীর প্রিয় চেলা; গান্ধীর শিষ্য। গান্ধীর পেছন পেছন জোহুকুম হয়ে তিনি ঘুরতেন না; গান্ধীর তিনি অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। অনেক সময় গান্ধীকে তিনি ভ্রান্ত ভাবতেন। প্রায়ই গান্ধীর সঙ্গে তিনি ঝগড়া করতেন। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটা এ রকমের ছিল না যে, একজন হলেন কম বয়সের ব্যবহারিক রাজনীতিজ্ঞ এবং আরেকজন বেশী বয়সের একজন সাধুসন্ত, যিনি রাজনীতির ঊর্ধ্বে—দুজনের সম্পর্ক ছিল তার চেয়েও জটিল এবং সূক্ষ্ম। গান্ধী ছিলেন খুব চতুর একজন ব্যবহারিক রাজনীতিজ্ঞ; রাজনৈতিক দোকানদারি এবং মনোহরণের নৈপুণ্য তাঁর আশ্চর্যরকমের অসাধারণ। সাধুসন্ত বলে তাঁকে যদি নাও স্বীকার করা হয়, তিনি অনেকটা সাধুসন্তেরই মত।

গান্ধীর চিন্তারাজ্যের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকত উদ্দেশ্য ও উপায়-ঘটিত প্রশ্ন: উদ্দেশ্য সৎ হলেও সে উদ্দেশ্য অসদুপায়ে সাধন করা শুধু অনুচিত নয়; অসৎ পন্থায় কোনো সৎ উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভবই নয়। যত দিন যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর পদে থেকে নেহরু ততই দেখতে পাচ্ছেন যে, যিনি প্রধানমন্ত্রী হন তাঁর সামনে বাছাইয়ের প্রশ্নটা প্রায়ই কোন্‌টা

ভাল কোন্‌টা মন্দ হিসেবে আসে না—আসে কোনটা বেশী মন্দ, কোন্‌টা কম মন্দ হিসেবে। গান্ধীর নীতির সঙ্গে বাস্তবের এই অসম্ভাবে নেহর্ মানসিক কষ্ট পান। তবে যে স্থ্লে উপযোগবাদ শ্ধ্মাত্র হাতেনাতে ফল পাওয়ার মানদণ্ডে সমস্ত কাজের বিচার করে, তিনি সে উপযোগবাদের ব্ড়ি ছ্ঁয়ে থাকতে রাজী নন—তাতে যদি সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক মঙ্গল হয়, তাও নয়। তিনি জানেন, একজন নীতিবোধসম্পন্ন মান্ষের পক্ষে অবাধে সব কাজেই করণীয় বা মার্জনীয় হতে পারে না—তা সে কাজ যতই উপযোগী বলে মনে হোক না কেন।

নেহর্ ভুলে যান নি, অন্যায়কর্ম এবং অন্যায়কারীর মধ্যে তফাৎ করার প্রয়োজনের ওপর গান্ধী খ্ব জোর দিতেন। অন্যায়কে নিশ্চয়ই ঘৃণা করতে হবে; কিন্তু ভালবাসতে হবে অন্যায়কারীকে। স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতীয়রা সাম্রাজ্যবাদের পাপকে ঘৃণা করবে, কিন্তু যে ব্যক্তিরা সেই পাপের সেবক তাদের প্রতি মনে কোনো তিক্ততা বা ঘৃণা পোষণ করবে না। নেহর্ অনেক সময়ই অতীতের কথাপ্রসঙ্গে বলেন, ভারতে এত লোক গান্ধীর কথার বাধ্য ছিল বলে—সেইসঙ্গে এ কথাও তিনি অকুণ্ঠভাবে অকপটে স্বীকার করেন যে, স্বাধীনতার আন্দোলন দমন করতে গিয়ে ব্টিশেরা খ্বই সংযতভাবে বলপ্রয়োগ করেছিল বলে, এবং তারা ভারত ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বলে—ভারতের সঙ্গে ব্টেনের চরম বিচ্ছেদ 'স্বচ্ছন্দে, ভাল মনে এবং ন্যূনতম তিক্ততার সঙ্গে' সংঘটিত হতে পেরেছিল।

উদ্দেশ্য আর উপায়ের ওপর গান্ধীর সমানভাবে জোর দেওয়া এবং বলপ্রয়োগকে ন্যূনতম প্রয়োজনে পরিণত করা—এটাই বোধহয় ছিল একক সবচেয়ে বড় শক্তি, বিশের দশকে এবং তিরিশের দশকের গোড়ায় নেহর্কে কমিউনিস্ট হওয়া থেকে যা নিবৃত্ত করেছিল। গান্ধীর প্রভাব এখনও তাঁর ওপর রয়েছে বলে, ভারত স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আজও রাশিয়া এবং পিকিং চীনের শাসনব্যবস্থাকে সত্যিকার 'ভাল' শাসন ব্যবস্থা বলে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। যে শাসনব্যবস্থাকে স্তালিনবাদী সন্ত্রাসের ওপর নির্ভর করতে হয় অথবা গোটা হাঙ্গেরীয় জাতির বিদ্রোহকে নিষ্ঠ্রভাবে দমন করতে হয়, তা কখনও 'ভাল' হতে পারে না। তাঁর মতে, 'কোনো কোনো কমিউনিস্ট সমাজের অবলম্বিত পদ্ধতি'তে রয়েছে 'বড় বেশী জবরদস্তি ও পীড়ন' এবং এইসব 'পদ্ধতি সঠিক নয়'।

কারো সম্বন্ধে নেহর্ যখন সর্বোচ্চ প্রশংসা করেন, তখন তাঁকে 'ভাল লোক' বলে বর্ণনা করেন। 'মিঃ স্যাঁ লরাঁ একজন ভাল লোক'। আমার মনে হয় নেহর্র ধারণায় আইজেনহাওয়ার ভাল লোক। বর্মার উ ন্য শ্ধ্ ভাল লোক নন, তার চেয়েও বেশী—তাঁর ভালত্বের সঙ্গে রয়েছে অন্তরের এক উজ্জ্বল মহিমা। নেহর্ যে সময় পশ্চিমীদের ওপর বেজায় খাপ্পা হয়ে থাকেন, তখনও খ্রুশ্চেভ বা ব্লগানিনকে কখনও 'ভাল লোক' আখ্যা দেন না। আমার ধারণা, নেহর্ ভাল লোক বলতে বোঝেন এমন একজন লোক যাঁর আচরণ নৈতিক বিচারব্দ্ধি দিয়ে পরিচালিত হয়; ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার রাহ্ যাঁকে গ্রাস করে না; যিনি নিজের স্বিধের জন্যে যখন যেমন তখন তেমন নন অথবা কুচক্রী নন; যিনি 'ঐকান্তিক'; যিনি তাঁর আশপাশের মান্ষদের মনে করেন তারা সহান্ভূতির পাত্র—কতক-গ্লো যন্ত্র বা দাবার বড়ে বা বিমূর্তভাব নয়।

নেহর্ প্রোমাত্রায় পাশ্চাত্যভাবাপন্ন। সম্ভবত তিনি স্বপ্ন দেখেন এবং ভাবেন ইংরেজিতে। ভারতে যে জিনিসগ্লো তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়, সেসব জিনিস পাশ্চাত্যের লোকদেরও অসহ্য : মাইক্রোফোন, যা দিয়ে স্বর বেরোয় না; গানবাজনার জলসা, যা শেষ

হতে চায় না; বক্তৃতা, যা একের পর এক হয়েই চলে; ওঁছা ধরনের হাতের কাজ; অকারণে নোংরা করা আর দুর্গন্ধ ছড়ানো। নেহরু হলেন একজন পাশ্চাত্যের মানুষ যিনি মনে প্রাণে চেষ্টা করে এদেশবাসী হয়েছেন। পঁয়ত্রিশ বছর আগে তিনি ভারত পুনরাবিষ্কারের অভিযানে বার হন। জেল জীবনে অবসর পেয়ে তিনি ভারতীয় ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ে গভীরভাবে পড়াশুনা করেন।

ধর্মকে তিনি দেখেন উনিশ শতকের শেষদিকের পাশ্চাত্য উদারনৈতিক সংশয়বাদীর চোখ দিয়ে। সাধুসন্ন্যাসী, গোমাতা পূজা ও জ্যোতিষশাস্ত্র—সনাতন হিন্দুধর্মের এইসব ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা সংশয়বাদী পাশ্চাত্যবাসীদেরই মত। ইদানীং দেখা যাচ্ছে, নেহরু ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক শক্তি বা আধ্যাত্মিক সত্যের মধ্যে একটা পার্থক্য করছেন। ক্রমশ তিনি বেশি করে বুদ্ধের উপদেশামৃতের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন।

নেহরু হলেন স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ সম্প্রদায়ের সোশ্যালিস্ট, তবে তাঁর সোশ্যালিজম্ বুদ্ধিঘটিত নয়। সোশ্যালিজমের তত্ত্বে তিনি সুপটু নন। নেহরুর সোশ্যালিজম্ গ্রেট বৃটেনের উনিশ শতকীয় খৃস্টীয় সোশ্যালিজম্ ও রাস্কিনের সোশ্যালিজমের ধারাবাহী। দারিদ্র্যপীড়িত দেশে মহানুভব এবং কল্পনাশক্তিসম্পন্ন অভিজাতবংশীয় মানুষ—যার মন একদিকে বড়লোকের দৃষ্টিকটু ভোগবিলাস এবং অন্যদিকে গরিবের দুঃখ আর দৈন্যদশা দেখে বিদ্রোহ করে উঠেছে—তার সোশ্যালিজম্ই অনেকাংশে নেহরুর সোশ্যালিজম্।

যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে নেহরুর সন্দেহ, হামবড়া ভাব এবং বুঝসমঝের অভাব যা বিশের কোঠার শেষদিকে বৃটিশ লেবার পার্টির অধিকাংশ উচ্চকোটির নেতাদের মধ্যে দেখা যেত এবং যা এখনও কারো কারো মধ্যে আছে—তার চেয়ে না বেশী, না কম। সাধারণভাবে, যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে "নিউ স্টেটস্‌ম্যানে"র যে দৃষ্টিভঙ্গি, তার সঙ্গে নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গির মিল আছে। কোনো একজন মার্কিনকে তাঁর ভাল লাগলে তিনি বলেন তাকে একেবারেই যুক্তরাষ্ট্রের লোক বলে মনে হয় না। প্রকাশ, ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয়বার সফরকালে নেহরু নাকি নিউ ইয়র্কে তাঁকে বলা অন্য একজনের এই উক্তিটি সমর্থনসূচকভাবে উদ্ধৃত করেছিলেন : 'আমেরিকা হল এমন দেশ, যেখানে কারো প্রথমবার আসা উচিত নয়।' সেই-সঙ্গে 'প্রধানমন্ত্রী হিসেবে' কথাটা তাঁর যোগ করা উচিত ছিল। হায় রে, তিরিশের আমলের মাঝামাঝি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে এসে বছরটাক যদি তিনি যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়ে যেতেন—যখন 'নিউ ডীল'-এর পুরো মরশুম চলেছিল—তাহলে যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে এখনকার চেয়ে ঢের যথার্থ ছবি তাঁর মানসপটে আঁকা হয়ে যেত।

নেহরু আদতে উদারপন্থী। ম্যাকার্থিবাদকে তিনি ঘৃণা করেন। কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লাকে চার বছর ধরে বিনা বিচারে আটক করে রাখাটা তাঁর কাছে রুচিবিরুদ্ধ কাজ। রাশিয়া ও চীনের টোটালিটারিয়ান শাসনব্যবস্থায় উৎসাহ উদ্যম, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা এবং বৈষয়িক সাফল্যের প্রশংসা করলেও এইসব টোটালিটারিয়ান দেশের বিবর্ণতা, একভাবাপন্নতা এবং জী-হাঁ ভাব তাঁর অপ্রিয়। তিনি বলেন, 'একনায়কতন্ত্র আমি পছন্দ করি না। আমি পছন্দ করি না কোনো স্বৈরাচারী শাসন।' বহুলাংশে নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট ভারতীয় জনতা, যাদের বৃহদংশ পশ্চাৎমুখী—তাদের খুঁচিয়ে, গুঁতিয়ে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে, কোলে-পিঠে করে, কখনও ঠেলে, কখনও টেনে অর্থনৈতিক আর সামাজিক প্রগতির গণতান্ত্রিক দুরূপথে খাড়া ওপরে তোলা যে কী কঠিন তা আর কারো চেয়ে নেহরুই ঢের ভাল জানেন। নিশ্চয় টোটালিটারিয়ানিজম্-এর সংক্ষিপ্ত রাস্তা তাঁকে অহরহ হাতছানি দেয়—কিন্তু সে

হাতছানিকে তিনি আমল দেন না। নেহর়ু বিশ্বাস করেন, নিকট ভবিষ্যতে এবং আখেরে ভারতের পক্ষে বরং গণতন্ত্রেই ঢের ভাল ফল হবে।

নেহর়ু পশ্চিমীদের এবং রাশিয়াকে সম্প়ূর্ণ প়ৃথক মাপকাঠি দিয়ে বিচার করেন। তিনি এও বিশ্বাস করেন যে, পশ্চিমীদের ত্র়ুটিবিচ্যুতিগ়ুলো দেখিয়ে প্রকাশ্যে দোষারোপ করলে তাদের নীতিগ়ুলো বদলে ভালোর দিকে নিয়ে যাওয়ার কাজে সাহায্য হতে পারে; সেদিক থেকে, রাশিয়া আর চীনের গলদ দেখিয়ে প্রকাশ্যে দোষারোপ করলে কোনো উপকার তো হবেই না, উল্টে অপকার হতে পারে। নেহর়ু এটা বোঝেন বলে মনে হয় না যে, তিনি রাশিয়া আর চীনকে তাদের দ়ুষ্কর্ম আর অপরাধের জন্যে দোষারোপ করতে যেহেতু অপারগ হন, সেই হেতু পশ্চিমীদের ভুলচুক দেখিয়ে তিনি যে দোষারোপ করেন তার জোর কমে যায়। এটা একটা ভয়েরও কথা। কারণ, প্রচুরসংখ্যক ভারতীয়ের মনে রাশিয়া আর চীন সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা হয়েছে—এতে করে তা শোধরাতে কোনো সাহায্য হয় না। বোধ-হয় নেহর়ু সে বিপদের কথা উপলব্ধিও করেন না।

রাশিয়া আর চীনের দ়ুষ্কর্ম আর অপরাধ সম্পর্কে নেহর়ুর চোখ ব়ুঁজে থাকার ব্যাপারটা অনেকাংশে এসেছে স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর জড়িত থাকার স়ূবাদে। ভারতীয়-দের য়ুঝতে হয়েছে ব়ৃটিশদের সঙ্গে—র়ুশদের সঙ্গে নয়। ভারতীয়রা সাক্ষাৎভাবে যেটা জেনেছিল, সেটা হল ব়ৃটিশমার্কা সাম্রাজ্যবাদ এবং উদ্ধত বর্ণবৈষম্য—যা র়ুশমার্কা নয়। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ নেহর়ুর পরিচিত শত্র়ু। তিনি তাকে সনাক্ত করতে পারেন। ১৯৫৬ সালে স়ুয়েজ ক্যানেলে তাকে তাঁর চিনতে একট়ুও কষ্ট হয় নি। নাসের স়ুয়েজ খাল জাতীয়-করণ করায় ব়ৃটেন আর ফ্রান্সের যা প্রতিক্রিয়া হল—তা দেখে নেহর়ু স্পষ্টই ধরে নিলেন যে, এ হল অশ্বেতকায়দের বির়ুদ্ধে শ্বেতকায়দের উনিশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী জলদস্য়ু-ব়ৃত্তিতে ফিরে যাওয়ার প্রমাণ। এ সম্বন্ধে ব়ৃটিশেরা যেসব ওজর দেখিয়েছে তার মধ্যে নেহর়ু শ্বেতকায়দের বোঝা সম্পর্কে ব়ৃটিশদের উনিশ শতকীয় বকধার্মিক ব়ুলির গন্ধ পেয়েছেন। একবার এক জনসভায় নেহর়ু তিক্তভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ব়ৃটেন আর ফ্রান্সকে কে মন়ুষ্যসমাজের দারোগার পদে বসাল?' র়ুশ-চীনের সাম্রাজ্যবাদ বা সম্প্রসারণবাদের লক্ষণগ়ুলো দেখে চিনে ওঠা নেহর়ুর পক্ষে সহজ নয়। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে সে জিনিস চিনতে নেহর়ুর খামাখা দীর্ঘ সময় লেগে গিয়েছিল।

আশাবাদ নেহর়ুর মজ্জায় মজ্জায়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, কী পশ্চিমে কী র়ুশচীনে—অবশেষে মান়ুষের কাণ্ডজ্ঞান এবং সদ্‌গ়ুণ সম্ভবত জয়ী হবে। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, 'আমার মধ্যে আছে ভবিতব্যে আস্থার একটা ভাব; আমার আস্থা ভারতের ভবিষ্যতে; আস্থা প়ৃথিবীর ভবিষ্যতে। এই আস্থার স্বপক্ষে আমি কোনো য়ুক্তিপ্রমাণ দিতে পারি না।...আমি রোমাঞ্চের স্বাদ পাই, আনন্দ পাই বেঁচে থাকার মধ্যে, কাজের মধ্যে এবং এমনিই এ-ও-তা করার মধ্যে।'

তাঁর জীবনযাত্রার যা প্রণালী, ভারতের সেকেলে যা সব সংস্কার, তাঁর ওপর কাজকর্মের যা চাপ—তার অর্থ, স্বাভাবিক জীবনের ধারকাছ দিয়েও নেহর়ু যেতে পারেন না। একবার তাঁর কাছে আমি তাঁর "ডিস্‌কভারি অব ইণ্ডিয়া" গ্রন্থের সংক্ষেপিত সংস্করণের কথা উল্লেখ করেছিলাম। শ়ুনে তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন : 'কই, আমি তো কিছ়ু শ়ুনি নি।' আমি বললাম দিল্লীর প্রত্যেকটা বইয়ের দোকানেই বইটা এমনভাবে রাখা আছে যাতে সকলের চোখে পড়ে। নেহর়ু একট়ু চুপ ক'রে থেকে, তারপর খানিকটা যেন অবাক হওয়ার

ভাব নিয়ে বললেন, 'জানো, চার পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের কোনো বইয়ের দোকান আমি মাড়াই নি।' নেহরু বোধহয় গত সাত আট বছরে ভারতবর্ষের কোনো দোকানেই যান নি। তিনি বোধহয় কখনই কোনো জিনিসের জন্যে নিজে হাতে পয়সা বার ক'রে দেন না। ছোট বড় সব রকমের পাওনাই তাঁর হয়ে আর কেউ মিটিয়ে দেয়।

তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে পুলিশ যেসব সাবধানতা অবলম্বন করে, সেসব তিনি বেজায় অপছন্দ করেন; এবং তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত লোকজনেরা তাঁকে আগলে রাখার ব্যবস্থাগুলো তাঁর কাছ থেকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে। তিনি পই পই ক'রে ব'লে দেন, সাদা পোশাকের এবং উর্দিপরা পুলিশ যেন ন্যূনতম সংখ্যায় থাকে। যখন তারা সাধারণ লোকের কাছ থেকে তাঁকে ঘিরে আলাদা ক'রে রাখে, তিনি তখন সট্‌কে পড়েন। পুলিশের বেষ্টনী ভেদ ক'রে সোজা ভিড়ের মধ্যে তিনি হেঁটে চলে যান। কখনও কখনও গিয়ে পড়ে দেখেন উভয় সংকট—ভিড় ঠেলে লোকে হুড়মুড় ক'রে আসছে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে। প্রণাম জিনিসটা তাঁর দুচক্ষের বিষ।

নেহরু আততায়ীর হাতে খুন হতে পারেন—সে বিপদ সব সময় আছে। তেমন মামুলী ধরনের মাথা-খারাপ লোক সব দেশেই থাকে, যে তার প্রতি সত্যিকার বা কল্পিত কোনো অবিচারের জন্যে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী মনে করে। ভারতবর্ষে চল্লিশ কোটির ওপর লোকের বাস; সুতরাং অন্য অধিকাংশ দেশের চেয়ে ভারতবর্ষে তেমন পাগলের সংখ্যাও ঢের বেশী। তার ওপর, ভারতবর্ষে একটু বেশী রকমের গোঁড়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু মনে করে—হিন্দুধর্মের চিরাচরিত প্রথার দিক থেকে নেহরু হলেন ঘরের শত্রু। হিন্দুধর্মের গা থেকে কিছু সন্না পোকা ছাড়াবেন ব'লে এই ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক পার্লামেণ্টকে দিয়ে হিন্দু কোড বিল গিলিয়ে নিচ্ছেন—তাতে তাঁর ওপর হিন্দুদের আক্রোশ রুজভেল্টের ওপর গ্রটন বা হার্ভার্ডের দেশোয়ালীদের আক্রোশের চেয়ে ঢের বেশী তীব্র। এই প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুদেরই একজন গান্ধীর ঘাতক। গত চার বছরে অন্ততপক্ষে একবার—দুই বা ততোধিক বার হওয়াও সম্ভব—ওদের একজন নেহরুর প্রাণ নেবার চেষ্টা করেছে। যদিও তাঁর প্রাণনাশের বিপদ সর্বক্ষণই আছে, তাঁকে সে ব্যাপারে ভয়ে ভয়ে থাকতে দেখা যায় না—অন্তত সে রকম কোনো ভয়ের ভাব তিনি দেখান না।

চার্চিল নেহরুর প্রসংগে বলেছেন যে, ভয় আর ঘৃণা এই দুই শত্রুকে নেহরু জয় করেছেন। নেহরু যদিও পঁচিশ বছর ধ'রে বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, যদিও তারা তাঁকে দশটি বছর জেলে আটকে রেখেছে, যদিও তাঁর প্রায় সব প্রিয়জনদেরই তারা কয়েদে পুরেছে এবং অনেককে বৃটিশের পুলিশের হাতে মার খেতে হয়েছে—তাহলেও বৃটিশের বিরুদ্ধে তাঁর মনে কোনো তিক্ততা আছে ব'লে মনে হয় না। কোনো দলের মানুষের প্রতিই তাঁর বিরাগ বা বিদ্বেষ নেই।

তাঁর নীতিবাক্য হল—আস্থায় মিলায় আস্থা। আপনি যদি চান আপনার ওপর কেউ ভরসা রাখুক, তাহলে দেখানো দরকার আপনারও তার ওপর ভরসা আছে। তিনি বলেন ভারতের জনগণের ক্ষেত্রে এতে কাজ হয়। তাঁর এই প্রতিপাদ্য তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও টেনে নিয়ে যান। আইজেনহাওয়ার যদি তাঁর বিশ্বাসের পাত্র হতে চান, তাহলে আইজেন-হাওয়ারকেও প্রমাণ দিতে হবে যে নেহরুর ওপর তাঁর বিশ্বাস আছে।

পড়ার চেয়ে নেহরুর বক্তৃতা কানে শুনতে এমনিতে ঢের বেশী ভাল লাগে। তিনি কখনই নোট দেখে সভায় বলেন না। বক্তৃতায় তিনি কী বলবেন আগে থেকে সাধারণত তাঁর

ভাবা থাকে না। সেই ম়ুহ়ূর্তের অন্তঃপ্রেরণার ওপর তিনি নির্ভর করেন। জনসভায় বক্তৃতা করতে উঠে গোড়াতেই তিনি একটি কাজ করার চেষ্টা করেন—কাজটা হল শ্রোতৃ-মণ্ডলীর সঙ্গে নিজের একটা আত্মীয়তা পাতানো। প্রায়ই শ়ুর়ুর কয়েকটি বাক্যে তিনি এমন কথা বলেন যা শ়ুনে শ্রোতাদের বেশ মজা লাগে। দিল্লীতে এক বিরাট জনসভায় আমি তাঁকে এইভাবে বক্তৃতা করতে দেখেছিলাম; সভায় লাখখানেক লোক এক ঘণ্টা মাটিতে ব'সে অমায়িক ম়ুখে কিন্তু নিঃস্পৃহভাবে বক্তাদের গলাবাজি শ়ুনছিল। নেহর়ু যখন মাইকের সামনে দাঁড়ালেন, তখনও তাদের বীতস্পৃহ ভাব কাটবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। কিন্তু নেহর়ু মাইক ম়ুখে ক'রে দাঁড়াবার তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই দেখা গেল সবাই বেশ নড়েচড়ে বসেছে এবং লোকে হো হো ক'রে হাসছে; ব্যস, তারপরই সেই বিপ়ুল জনতা নেহর়ুর অন়ুগত হয়ে পড়ল।

নেহর়ুর বক্তৃতা সাধারণত হয় চেতনার স্বচ্ছন্দ প্রবাহিণীর মত। যখন যা মনে আসে তিনি ব'লে যান। ডালপালার ভেতর বিচরণ করেন। নিজেকে বড় বেশী ছড়িয়ে ফেলেন। জনসভায় তাঁর বক্তৃতা খ়ুব খারাপ হলে হয় প়ুনর়ুক্তিবহ়ুল, জলো এবং অস্পষ্ট—তবে স়ুখের বিষয়, তেমন খারাপ বক্তৃতা তিনি দেন না বললেই হয়—আর বোধহয় দিলেও, লক্ষ লক্ষ লোকের সভায় তো নয়ই। যখন তিনি খ়ুব ভাল বলেন—কখনও ভোজশেষের ভাষণে—কখনও বড় বড় জনসভায়—শ্রোতাদের তিনি পারেন স্বমতে আনতে, মনে নাড়া দিতে, মনস্তুষ্টি করতে; তাঁর ভাষায়, শ্রোতাদের সঙ্গে 'একাত্মতার ভাব' জাগিয়ে তুলতে পারেন। কারণ, শ্রোতারা দেখবে—কী আশ্চর্য, তিনি কত অন্তরঙ্গ হয়ে, কি রকম আটপৌরেভাবে, কি রকম আন্তরিকতার সঙ্গে মনপ্রাণ খ়ুলে দিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নেহর়ু বলেছেন: 'ভারতীয় জনসাধারণকে যথাসম্ভব সহজ ভাষায় ইস্কুল-মাস্টারের মত ক'রে সব কিছ়ু ব়ুঝিয়ে বলা...তারা যাতে নিজেরা ভাবতে এবং মর্মগ্রহণ করতে শেখে...সেটাই বরাবর হয়েছে আমার প্রধান কাজ।...ভারতবর্ষে আজও লোকের কাছে পেৌঁছ়ুবার সব চেয়ে বড় উপায় হল জনসভা।'

জনসভায় বক্তৃতা দিতে নেহর়ু ভালবাসেন। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে এক সপ্তাহের জন্যে তিনি বেরিয়ে পড়বেন ভারতের নানান জায়গায় বক্তৃতা দেবার জন্যে; মাইলের পর মাইল রাস্তার ধ়ুলো খেয়ে দিনে বার ছয়েক তিনি দশ হাজার থেকে পাঁচ লক্ষ লোকের সভায় বক্তৃতা দেবেন; আট ঘণ্টার মধ্যে এক মিনিটও তিনি একা থাকার সময় পাবেন না; এবং তারপর আনন্দে আটখানা হয়ে দিল্লীতে ফিরে আসবেন। খানিকটা বক্তৃতা দেওয়া, খানিকটা ভারতের প়ুরনো সৌন্দর্য আর নতুন সব প্রকল্প চোখে দেখা, খনিকটা তাঁর দিল্লীর দস্তাবেজের হাত এড়ানো, এবং সেইসঙ্গে অনেকাংশে নিশ্চয় এটাও আছে যে, তাঁর প্রতি ভারতের লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি লোকের শ্রদ্ধা, স্তুতি ও ভালবাসার প্রকাশ দেখে তাঁর ব়ুক ফ়ুলে ওঠে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকতে নেহর়ু ভালবাসেন। বেদম কাজের মধ্যে থাকাটা তাঁর কাছে খ়ুব আনন্দের। সব সময় তিনি যে লোকচক্ষে আছেন এবং দেশ-বিদেশের মহা মহা রথীরা তাঁকে দর্শন করবার জন্যে যে দিল্লীতে হ়ুমড়ি খেয়ে পড়েন—নেহর়ু তাতে আত্ম-প্রসাদ পান। জনসাধারণের ভক্তিভাবে তাঁর বল বাড়ে। তিনি একটা কিছ়ু করে যেতে এসেছেন, এভাব তাঁর মধ্যে আছে; যাকে তিনি তাঁর জীবনের ব্রত ব'ল মনে করেন, সে ব্রত সফল করতে পারলে নিজেকে তিনি কৃতার্থ মনে করবেন এবং তাতে তাঁর স়ুখ না হলেও

স্থাপিত হবে। রাজনীতির অকূল সমুদ্রে সাহসে পাড়ি দেওয়ায় তাঁর আনন্দ। সৃজনশীল, কর্মযোগী রাজনীতিক হিসেবে খুঁচিয়ে, ঠেলে, টেনে, গুঁতিয়ে, আগে আগে থেকে, কোলে-পিঠে ক'রে ভারতবর্ষকে গরুর গাড়ি আর ঘুঁটে-গোবরের যুগ থেকে তুলে জেট প্লেন আর পারমাণবিক শক্তির যুগে পৌঁছে দেবার কাজে নেহরু সুতীব্র আনন্দ অনুভব করেন। জাতীয় উন্নয়নের দুঃসাহসী অভিযানে তিনি ভারতের নেতা ব'লে সব সময় তিনি কাজের অশান্ত ঘূর্ণির মধ্যে বেশ একটা মৌজের অবস্থায় থাকেন—তিনি নিজেই এই অবস্থাটাকে 'একটানা উত্তেজনা'র অবস্থা বলেন।

এখন যা তার চেয়ে নেহরু ঢের ভাল নেতা হতে পারতেন। যেমন, তিনি ঢের ভাল নেতা হতে পারতেন যদি আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তাঁর সময় আর শক্তি কম খরচ ক'রে একটু বেশী খরচ করতেন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে। কার কাছে তিনি বা ভারত কতটা ঋণী সে হিসেব না ক'রে, তাঁর উচিত বৃদ্ধ বা অবসাদগ্রস্ত সহযোগীদের নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলা। তাঁর উচিত কংগ্রেস দলের ভেতর এবং বড় বড় রাজকর্মচারী আর মফঃস্বলের আমলা ইস্তক আগাপাছতলা শাসনযন্ত্র ঝেঁটিয়ে দুর্নীতির বিষ ঝেড়ে ফেলা। অন্যান্য দেশের সঙ্গে আলোচনায় এমন একজনকে কখনই তাঁর প্রতিনিধি হতে দেওয়া উচিত নয়—যোগ্যতা থাকলেও, যিনি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ভারতের যত না বন্ধু তিনি জোটান তার চেয়ে বেশী বন্ধু হারান এবং লোককে ভারতের বক্তব্যের পক্ষে যত না টানেন তার চেয়ে বেশী লোককে বিপক্ষে ঠেলে দেন। তাঁর হাতে আর প্রায় বছর পাঁচেক সময় আছে, তার মধ্যে তাঁকে ভারতের বুকে তাঁর ছাপ রেখে যেতে হবে; সভাসমিতিতে অত বেশী বক্তৃতা দেওয়া অথবা অত বেশী সর্বজনীন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া—এসব কমিয়ে তাঁর উচিত সবচেয়ে জরুরী বিষয়গুলোতে সময় আর শক্তি নিয়োগ করা। আগে থেকে তৈরী না হয়ে কঠিন বা স্পর্শকাতর আন্তর্জাতিক প্রশ্নে কখনই তাঁর প্রকাশ্যে কিছু বলা উচিত নয়। এটা তাঁকে বুঝতে হবে যে, আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে তাঁর সামনে প্রধানতম কাজ হল—দশ বছরে ভারতে কৃষির উৎপাদন দ্বিগুণ করার ব্যবস্থা করা; এবং আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রে তাঁর প্রধানতম কাজ হল—পাকিস্তানের সঙ্গে একটা রফা ক'রে দুই দেশের মধ্যেকার বিভেদাত্মক গভীর ও কঠিন যাবতীয় সমস্যা মিটিয়ে ফেলা; এবং যাতে এই মীমাংসা হয় তার জন্যে নেহরুর উচিত তাঁর নেতৃত্বের সর্বশক্তি দিয়ে ভারতবর্ষকে আপোষে রাজী করানো—যদিও সে আপোষ অবশ্যই অপ্রীতিকর হবে। রুশ-চীন আর ইঙ্গ-মার্কিন—দুই জোটের ক্ষেত্রে নীতিবোধের দু প্রস্থ মাপকাঠি প্রয়োগের অভিযোগ যাতে কখনই তাঁর বিরুদ্ধে কেউ না আনতে পারে তার জন্যে তাঁর রীতিমত সাবধান হওয়া উচিত। অনেক আগেই তাঁর উচিত ছিল তাঁর জায়গায় যথাসম্ভব ভাল একজন লোক বেছে তাকে তালিম দেওয়া—যাতে সে তাঁর কাজের ভার নিতে পারে।

কখনও কখনও নেহরুকে নিরীক্ষণ করতে করতে আমার কেমন যেন মনে হয়েছে যে, তিনি একজন ঐন্দ্রজালিক—যিনি চোখের সামনে মায়াবলে তুলে ধরেন এক ঐক্যবদ্ধ, প্রগতি-শীল ভারতের ছবি, এবং অকুস্থল থেকে তিনি চলে গেলে সে ছবিও অন্তর্হিত হবে। এ ছবি হল তাঁর তৈরী মায়া এবং এ মায়া তিনি নিজে ইচ্ছে করেই সৃষ্টি করেন। এ জিনিস তিনি করেন বিদেশের লোককে ভুল বোঝানোর জন্যে নয়। তিনি তা করেন, কেননা তিনি জানেন—ভারত যদি ধ্যানমূর্তি আর দিবাস্বপ্ন দেখে, যদি তার অতীতের শ্রেষ্ঠ বস্তু গ্রহণ করে আর নিকৃষ্ট বস্তু বরবাদ করে—একমাত্র তাহলেই ভারতের অগ্রগতি সম্ভব। কাজেই

তিনি সারা ভারত চষে বেড়িয়ে তাঁর ভাবপ্রতিমা প্রচার করেন—এমন এক ঐক্যবদ্ধ ভারতের ধর্ম প্রচার করেন যেখানে ভারতের প্রত্যেকটি অংশ, প্রত্যেকটি সম্প্রদায় সকৃতজ্ঞভাবে নিজেকে ভারতের অন্যান্য সমস্ত অংশের, অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী বলে মনে করবে।

ভারতীয় জনগণের কাছ থেকে তিনি যে শ্রদ্ধা, যে স্তুতি এবং যে ভালবাসা পান, তিনিও তাদের তা আন্তরিকভাবে প্রত্যর্পণ করেন। তিনি প্রায়ই এ কথা বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, ভারতের চাষীরা নিরক্ষর হলেও অজ্ঞ নয়। তিনি বলেন, হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ "রামায়ণে"র অংশবিশেষ চাষীদের মনের মধ্যে গাঁথা। পুরাণ আর কিংবদন্তীর মণিমুক্তার মধ্যে তারা ডুবে থাকে। তার ফলে তাদের চিত্তবৃত্তি, জ্ঞানবুদ্ধি আর কল্পনাশক্তি সমৃদ্ধ হয়।

নেহরু যখন এসব কথা বলেন, শুনে মনে হতে পারে যে ভারতের কৃষিসমাজের গুণ-গরিমা খানিকটা তাঁর কল্পনাপ্রসূত। তবে মুসোলিনী যেভাবে ইতালির লোকদের ঘৃণার চোখে দেখতেন, সেভাবে নিজের দেশের লোকদের তাচ্ছিল্য করার চেয়ে বরং কোনো নেতার পক্ষে তাঁর দেশের মানুষজন সম্পর্কে মনগড়া উচ্চ ধারণা থাকাও ভাল। নেহরু ভারতবর্ষকে ভালবাসেন কবির মন নিয়ে—প্রায় তন্ত্রমন্ত্রসাধনার মত। ভারতবর্ষের মাটিকে তিনি ভালবাসেন; এ এমন এক মাটি যাকে সহজেই ভালবাসা যায়। ভারতবর্ষ দেশ, সে দেশের পাহাড়পর্বত মাঠপ্রান্তর, ত্রিবাঙ্কুরের শান্ত নিথর খাঁড়ি, প্রাচীন মিনার আর নয়নাভিরাম মঠমন্দির—এসব নিয়ে বলতে গেলেই আবেগে নেহরুর গলায় সুর নেমে আসে।

ভারতীয় ইতিহাসের দূরবিস্তৃত দৃশ্যপট নেহরুকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। বারাণসীর কথা বলতে গেলেই তিনি বলেন, যে-শহর তিন হাজার বছর ধরে ভারতের তীর্থস্থান—সে শহরে হাঁটবার সময় একজন ভারতীয়ের মনের মধ্যে কী যে হয়! দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আর ইন্দোনেশিয়ায় একদিন ছিল হিন্দু রাজাদের রাজত্ব; আংকর ভাট, নৃত্যকলা, গোটা এলাকার বর্তমান নেতাদের অধিকাংশেরই সংস্কৃত নাম—পুরনো দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া আজকের এইসব নজিরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে নেহরু ভালবাসেন। ১৯৫৭ সালে জীবিত একজন ভারতবাসী হিসেবে তিনি বুদ্ধের স্বদেশবাসী হওয়ার জন্যে গর্ব বোধ করেন—যে বুদ্ধ মারা গেছেন ২৫০০ বছর আগে, যে বুদ্ধ তাঁর মতে ভারতভূমির শ্রেষ্ঠ সন্তান।

নেহরু দয়ালুহৃদয়, নেহরু মহানুভব; নেহরু কল্পনাপ্রবণ, নেহরু ব্যথার ব্যথী। ভারতের জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট তিনি মনে প্রাণে অনুভব করেন। তাদের দুঃখ দেখে তিনি ব্যথা পান। সে দুঃখ তাঁকে অস্থির করে তোলে। সে দুঃখ তাঁকে ক্রোধান্বিত করে।

ভারতের জনসাধারণের প্রতি তাঁর স্নেহমমতা আর ভক্তিশ্রদ্ধা, ভারতভূমির প্রতি তাঁর ভালবাসা, ভারতীয় ইতিহাসের মায়ায় তাঁর মুগ্ধ হয়ে থাকা, ভারতবাসীর দুঃখকষ্ট দেখে তাঁর ব্যথা পাওয়া আর রাগ হওয়া—সর্বোপরি এই গুণগুলো থাকার জন্যেই বোধহয় তিনি ভারতের অবিসম্বাদী নেতা এবং ভারতীয় জনগণের নয়নের মণি হতে পেরেছেন। আর এই-সব গুণ থাকার ত্রুটিটাই হল তাঁর স্বভাবের দোষ। অপদার্থ আর দুর্নীতিগ্রস্তদের তাড়িয়ে দেওয়া বা জেলে দেওয়ার বদলে তাদের প্রতি তিনি দেখান দয়ামায়া, উদারতা, বিবেচনাবোধ আর সহানুভূতি। তাঁর নিজের মধ্যে ছলচাতুরি না থাকার, ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তাঁর নিজের বিমুখতা থাকার মানে হয় এই যে, তিনি অন্যের মধ্যেকার ছলচাতুরি আর ষড়যন্ত্রের ব্যাপার-গুলো ধরতে পারেন না।

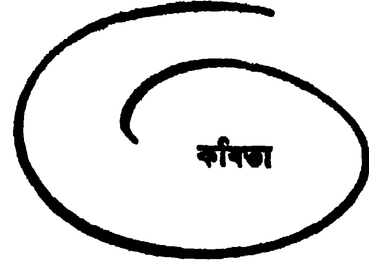
আততায়ীর হাতে নিহত না হওয়া পর্যন্ত অথবা কাজ করতে করতে দম ফুরিয়ে চলে

না পড়া পর্যন্ত তিনি যেমন ভারতের প্রধানমন্ত্রী আছেন তেমনিই থাকবেন। তিনি আরও নিঃসঙ্গ বোধ করবেন, তাঁর প্রতি ভারতীয় জনগণের ভালবাসার লক্ষণগুলোকে তিনি আরও বেশী আঁকড়ে ধরবেন, আরও অসহিষ্ণু হবেন, আরও বেশী শশব্যস্ত হবেন, আরও ক্লান্ত হবেন, ভারতের মঙ্গলের জন্যে যা একান্ত দরকার অথচ যাতে বন্ধুরা বা প্রবীণ সহকর্মীরা ক্ষুণ্ণ হবেন সে জিনিস করতে তাঁর অরাজীভাব আরও বাড়বে। ভারতের ও বিশ্বের ইতিহাসে নিজের স্থান সম্পর্কে তাঁর আত্মচেতনা বাড়বে বই কমবে না। এটা এখনই তাঁর জানা থাকার কথা যে, তিনি স্থান পাবেন বিগত ২৫০০ বছরের দুই মহান শাসক অশোক আর আকবরের পাশে—ভারতবর্ষ যদি কৃতকার্য হয় তাহলে তাঁকে বলা হবে আধুনিক ভারতের স্রষ্টা—এবং যাই ঘটুক, বিশ্বের একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ হিসেবে ইতিহাসে তাঁর নাম থেকে যাবে।

*　　*　　*　　*

যে কেউ নেহরুকে বর্ণনা করতে যাবে, গান্ধীকে বর্ণনা করতে গিয়ে নেহরুর যেকথা মনে হয়েছিল সেই কথা তার অনেকাংশে মনে না হয়ে পারবে না। এ বিষয়ে নেহরু সম্প্রতি বলেছেন : 'এমন একজন মানুষ, যিনি ঠিক আর পাঁচজনের মত নন, যাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, এবং যাঁকে দেখে এই রকমের একটা ভাব হত যে, তাঁর বিরাট শক্তি এবং অফুরন্ত মনোবল। ...আর তাছাড়া তাঁর কর্মজীবন হয়েছে সার্থক...ভারতের জনসাধারণকে তিনি ঢেলে সেজে দিয়ে গেছেন...তারা এখন আগের চেয়ে ঢের উন্নত—অনেক শক্তিমান, অনেক সাহসী, অনেক বেশী সুশৃঙ্খল।'*

[*এস্‌কট রীড ছিলেন ১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত ভারতে কানাডার হাই কমিশনার। হাই কমিশনার থাকাকালে অটোয়ায় পররাষ্ট্র দপ্তরে ১৯৫৭ সালের মে মাসে রীড একটি চিঠি লেখেন। উপরের নিবন্ধটি সেই পত্রাংশ।]



অন্য মৃত্যু

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমি বাঘিনীর মুখে চুমা খাব ব'লে
সংসার ছেড়েছি।
আমার সংসারে রাত্রিদিন শুধু মানুষের কথা
অপ্রেম, কলহ, ঈর্ষা
কোলাহল!

এমনকি সহোদর, সহধর্মিনীর মুখ
অন্ধকারে প্রেতের ছায়ার মত
মনে হয়। অথচ ঘরের বাইরে
বেরুতে পারি না।

চারদিকে গুপ্তঘাতকেরা ঘুরছে
সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর, তারা
নিঃশব্দে বিষ মেশায়।

এর চেয়ে ঢের ভাল অরণ্যের বাঘিনীর
মুখে চুমা খেয়ে
ভদ্রভাবে ম'রে যাওয়া॥

টেলিফোন

নবনীতা সেন

মাঝেমাঝেই, ঘরের কাজে যখন ব্যস্ত থাকি,
আমার যেন মনে হয় ওপরে ঘণ্টি বাজছে,
টেলিফোন। হাতের কাজ ফেলে ছুটে যেতে গিয়ে
খেয়াল হয় ওটা আমাদের বাড়িতে হ'তে পারে
না। বন্ধু থাকলেও, আমাদের ফোন নেই।
ভাল করে কান পেতে শুনলে বুঝতে পারি,
ঘণ্টিটা আসলে বাজেইনি। এ বাড়িতে নয়,
কোনো বাড়িতেই নয়। ওটা আমার মনের ভুল।
আবার হাতের কাজটা তুলে নিই। কাজ সুরু
করলেই অনেক দূরে টেলিফোন বাজতে থাকে।
আমি অস্থির হয়ে শুনতে পাই, কেউ সাড়া
দিচ্ছে না, ফোনটা বেজেই চলেছে একটানা।
যদিও আমি জানি তা এ বাড়িতে নয়,
ও বাড়িতে নয়, কোনো বাড়িতেই নয়।

সে

বিনোদ বেরা

এলো না সে, বানালাম নিজেকে দুজন
অশ্রুর আলোয় চিনে নিলাম পথ ঘাট,
হৃদয়ের অমাবস্যা হলো নিরসন
চকিত বিদ্যুতে, গাঢ় মেঘের কপাট
খুলে অন্তরীক্ষে এক নবীন ভুবনে—
মনের তাবত ভাষা হয় নীহারিকা,
নীলদ্যুতি আহ্লাদিত আত্মসমর্পণে
যুগল সত্তায় হলো ঘর বহ্নিশিখা।

এক সত্তা অহোরাত্র ফোটায় পূর্ণিমা,
অন্য অতিকায় রক্তসূর্য পরাক্রম;
এইভাবে উল্লঙ্ঘন করে নিজ সীমা
জগতে প্রকাশ পায় অনন্য উদ্যম।
সে আসে না বলে এত বিজয়ী, সঠিক
ক্ষমতায় হয়ে উঠি দীপ্ত অলৌকিক॥

দেশলাই

লোকনাথ ভট্টাচার্য

—কী হয়েছে কী? ওরকম করছিস কেন? চেঁচিয়ে উঠল কামাক্ষী।

—হবে আবার কী, নাকের মধ্যে একটা কী ঢুকিয়ে ব'সে আছে। এখন সেটা আটকে গেছে, বেরোচ্ছে না। নীচু হয়ে মেয়েটার দিকে তাকাতে বলল রমা।

এদিকে মেয়েটা চেঁচাচ্ছে, গলা ফাটিয়ে কাঁদছে।

এক মুহূর্তের মধ্যে ঘটল কাণ্ডটা।

—আ—হা—হা, ওর দিকেও একটু নজর রাখা উচিত ছিল। দোকান পেলে তুমি এমন হয়ে যাও......, একটু চাপা বিরক্তির সুরে বলল কামাক্ষী। ভয়, পাছে এর বেশি কিছু বললে স্ত্রী জ্ব'লে ওঠে।

কিন্তু স্ত্রী তো জ্বালানি কাঠ হ'য়েই আছে।

—আর তুমি, মুখ ঝামটা দিয়ে বলল রমা,—তুমি কী করছিলে? তুমি দেখতে পারনি? মেয়ে কি আমার একলার নাকি?

যাক গে, তর্ক-বিতর্কের সময় নয় এখন। যেটা ঢুকেছে, সেটাকে অবিলম্বে বার করতে হবে।

—দেখি, নড়িসনে, মেয়েটার মাথাটা ধরে নাকের মধ্যে দিয়ে দেখবার চেষ্টা করল রমা।

—ও হয়েছে, একটা পুঁতি ঢুকিয়ে বসে আছে। দাঁড়া, আস্তে আস্তে বার করছি।

অতি সামান্য ব্যাপার। বাচ্চাদের নিত্যই হয়। মা-বাবা মেয়েকে নিয়ে মেলায় এসেছে। শান্তিনিকেতনের পোষমেলা। একটি সাঁওতালী মেয়ে পথের ধারে বিছিয়ে বসেছে এটা-ওটা নানান গয়না তাদের। দেখতে রুপোর মত, রুপো নিশ্চয়ই নয়, কারণ দামে এত সস্তা। রমার লুব্ধ নেত্র, দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভাবছে, তার খোঁপার জন্যে এ ধরনের একটা বাহারি কাঁটা কিনবে নাকি? আজকাল আবার এ ধরনের জিনিসের একটা ফ্যাশান উঠেছে তো। কিন্তু কোন্‌টা কিনবে, আর কোন্‌টা কিনবে না—এই সমস্যা রমার। সে তাই বাছায় ব্যস্ত। একবার এটা হাতে নেয়, আরেকবার ওটা হাতে নেয়।

মা'র মনোযোগ যখন এইদিকে সম্পূর্ণ আকৃষ্ট, তখন তিন বছরের মীরাও আবিষ্কার করেছে একটি অতীব প্রলোভনীয় জিনিস। যে-মেয়েটা গয়না বিক্রী করছিল, তারই পাশে আরেকটি সাঁওতালী মেয়ে বসেছে। একটা ধুতির ওপর সে বিছিয়ে বসেছে হরেক রকমের পুঁতির মালা—লাল পুঁতি, নীল পুঁতি, কালো পুঁতি। ছোট পুঁতি, বড় পুঁতি, মাঝারি পুঁতি। বহু পুঁতি বিচ্ছিন্নভাবেও পড়ে রয়েছে। মীরার শিশুর মন, নজরে পড়ামাত্র তার আর দৃষ্টি সরে না। কখন একটি ছোট্ট লাল টুকটুকে পুঁতি সে তুলে নিয়েছে। সেটাকে বাঁ কানের গর্তটার কাছে মিনিটখানেক ঘুরিয়েছে, মন্দ লাগেনি। তারপর মুখে পুরেছে, তখনো খুব মন্দ লাগেনি। তারপর মুখ থেকে বার করে সেটাকে নাকের মধ্যে ঢুকিয়েছে। এবং নাকে ঢুকেই সেটা আটকে গেছে। তেমন বেশি ভেতরে যায়নি—কাছাকাছিই কোথাও আটকে গেছে। আর বাচ্চাটা চেঁচাতে সুরু করেছে।

হ্যাঁ, কামাক্ষী কী করছিল, কেন তার নজরে পড়েনি, সেটা একটা প্রশ্ন বটে। কারণ

সে তো কিছু কিনছিল না, কোনো কিছুর দিকে নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়েও সে ছিল না। কিন্তু সে সব ভেবে এখন লাভ কী, একটা কিছু করতে তো হয়। এবং এক্ষুণিই।

ভাগ্যিস, তেমন ভেতরে যায় নি—হয়তো তার কড়ে আঙুলের ছুঁচলো নখটা দিয়ে টেনে বার করা যাবে, ভাবল রমা। নখের ডগাটা আস্তে আস্তে ঢোকাল মীরার নাকের মধ্যে। টানবার চেষ্টা করল, কিন্তু পুঁতি বেরোয় না। পুঁতিটা ঠেকছে ঠিকই নখের ডগায়, সন্দেহ নেই। বেরোয় না কেন? আবার চেষ্টা করল, পুঁতি বেরোয় না। আবার, আবার, আবার চেষ্টা করল, তবু পুঁতি বেরোয় না। এদিকে মেয়েটার যে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে, সেটা বুঝতে বুদ্ধির দরকার করে না। তখন কী করবে ঠিক করে উঠতে না পেরে রমা নখটাকে আরো একটু ভেতরের দিকে চালাবার চেষ্টা করল, যদি একটু ভেতরে ঢুকিয়ে তারপর জোরে টান মারলে হতচ্ছাড়া জিনিসটা বেরিয়ে আসে, এই ভেবে। ব্যস, যেই নখটা একটু জোরের সঙ্গে ভেতরে ঢোকানো, অমনি পুঁতিও চলে গেল ভেতরে, এবার আরো ভেতরে, নখের নাগালের বাইরে। বাচ্চাটার হঠাৎ যেন দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড় হল।

—ঐ যাঃ। বলল রমা।

—কী হ'ল? কামাক্ষীর আতঙ্ক ফুটে উঠল প্রশ্নের মধ্যে।

—ভেতরে ঢুকে গেছে, একেবারে ভেতরে।

—কত ভেতরে?

—এখনো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ভেতরে।

মেয়েটা হাঁসফাঁস করছে।

—একটা কিছু কর গো, রমা প্রায় কেঁদে ফেলে।

কী হবে? চোখের সামনে মেয়েটা ম'রে যাবে? একমাত্র মেয়ে, একমাত্র সন্তান তাদের। মীরা, মীরু, মীরান্দা—সোনা মীরা, শুক্কু মীরা, হীরু মীরা। কত আদরের নাম, কত মুহূর্তের স্বর্গীয় আনন্দ ঐ ছোট্ট পুঁচকে মেয়েটাকে নিয়ে। আর তার ঐ চোখ দুটো, কখনো কখনো কী দুষ্টু, কখনো কখনো কী মিষ্টি, কখনো কখনো কী অনির্বচনীয় করুণায় সিঞ্চিত। যেন সমস্ত পৃথিবীর আনন্দের নির্যাস সঞ্চিত দুটি চোখের চাওয়ায়। আর তার আধো-আধো ডাকা কখনো বাপু বলে কখনো মা বলে, কখনো তার কান্না, কখনো তার হাসি, কখনো তার নাছোড়বান্দা আব্দার। সেই মীরা......কী হবে এখন?

অদূরে তিনটে নাগরদোলা চরকিবাজী খাচ্ছে, অজস্র ছেলেমেয়ে নিয়ে। কানে ভেসে আসছে উল্লসিত কোলাহল। কামাক্ষীর চোখে সব ঝাপ্সা হয়ে আসছে। যেন তারও মাথার মধ্যে একটা নাগরদোলা ঘুরতে আরম্ভ করেছে, বন-বন-বন-বন, বন-বন-বন-বন।

হঠাৎ তার প্যান্টের বাঁ পকেটের মধ্যে সে অনুভব করল সেই জিনিসটা। হাত তো দিয়েই আছে পকেটে, হাতে সেটা ঠেকছে। সত্যিই তো, সমাধান একটা রয়েছে এই পকেটের মধ্যেই। বার করবে কি তবে সেটা? বার করবে কি করবে না? কিন্তু রমা, তার সামনে? আর তারপরই যে কী প্রচণ্ড কাণ্ড হবে, তা তো জানাই আছে। কিন্তু বার যদি না করে তো মেয়েটা হয়তো মরেই যাবে।

তবে কি বার করবে সে জিনিসটা? পকেটের মধ্যে হাতটা ঘুরছে, জিনিসটা মুঠোর মধ্যে। যা হয় হবে, কিন্তু মেয়েটাকে সে চোখের সামনে এইভাবে মরতে দিতে পারবে না।

ফট করে কামাক্ষী দেশলাই-এর বাক্সটা বার করল পকেট থেকে। রমা নিশ্চয়ই দেখেছে, দেখছে। দেখুক গে। মীরার জীবনটাই সবচেয়ে বড় কথা এই মুহূর্তে। বাক্সটা থেকে

একটা কাঠি বার করে নিল কামাক্ষী। মেয়েটার মাথাটা ধরল বাঁ হাত দিয়ে। নীচু হয়ে তাকাল নাকের ভিতর। তারপর সন্তর্পণে কাঠিটা ঢোকাল ডান হাতে ধরে। আস্তে আস্তে ঘোরাচ্ছে কাঠিটা নাকের মধ্যে। মেয়েটা ছট্‌ফট্‌ করছে। এখুনি, এখুনি জিনিসটাকে বার করে আনতেই হবে।

ঠেকছে, ঠেকছে ঠিকই। ঐ বোধ হয় একটু নামল—হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু নেমেছে। একবার টান, দুবার টান, তিনবার টান। ব্যস্‌, পুঁতিটা বেরিয়ে এল—একটা ছোট্ট লাল পুঁতি। চক্‌চক্‌ করছে। জয় ভগবান।

মেয়েটা ককিয়ে কেঁদে উঠল। কিন্তু আর ভয় নেই। রমা এতক্ষণ দেখছিল নিস্পন্দ বুকে, নিষ্পলক নেত্রে। পুঁতিটা বেরিয়ে আসতেই মেয়েটার গলায় ঠাস করে এক চড় মেরে বলল,—কেন ওটা নিয়ে ঘাটতে গিয়েছিলে, বল? আর কক্ষণো হাত দেবে না।

মেয়েটা আরো জোরে কেঁদে উঠল।

—থাক, যা হবার হয়েছে, বললে কামাক্ষী গম্ভীর গলায়। মেয়েটাকে কোলে তুলে নিল। দেশলাই-এর বাক্সটা নিঃশব্দে পকেটে পুরে ফেলেছে আগেই।

—কী, কাঁটাটা কিনলে? রমার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে বলল কামাক্ষী।

—মরুকগে, কিছু কিনব না, সব কেনায় ঘেন্না ধরে গেছে। রমার গলার স্বরটা হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। হবেই তো। আসন্ন ঝড়ের জন্যে মনটাকে প্রস্তুত করছে কামাক্ষী।

—তো আর কী দেখবে, চল? যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে বলার চেষ্টা করল কামাক্ষী।

—কোথায় যাব? কোথাও যাব না। বাড়ী চল।

বাড়ী মানে সরোজদার বাড়ী, যেখানে ওরা উঠেছে। দুদিন বাদে মেলা শেষ হলেই ফিরে যাবে কলকাতায়।

খোয়াই সুরু হয়েছে, তা লাল মাটির বুকে ঢেউ খেলিয়ে মিশে গেছে অনন্তে। কী প্রকাণ্ড আকাশ মাথার উপর। যেদিকে তাকাও, দৃষ্টি কখনো ব্যাহত হয় না। কেবল এদিকে ওদিকে কোথাও কখনো এক-একটা বিচ্ছিন্ন তালগাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ বিরাট আকাশের সঙ্গে যেন তাদের কী এক নিভৃত কানাকানির সম্পর্ক।

কিসের সম্পর্ক কে জানে। আর জেনে লাভটাই বা কী। মরুকগে। কামাক্ষী যেন হঠাৎ কোন এক কটু খাদ্য খেয়ে ফেলেছে, মুখে তার টক-টক গন্ধ। কিছুতেই যেন আর রুচি নেই তার, সবই বিস্বাদ লাগছে।

রমা আশ্চর্য গম্ভীর, তার মুখখানা যেন ঝড়ের মেঘ। মেয়েটা তখনো ঘাড়ে কামাক্ষীর। কান্না থেমেছে অনেকক্ষণই, যদিও চোখের জল শুকোয়নি। এখন নীরবে বিষণ্ণমুখে আঙুল চুষছে। ঐ এক আঙুল চোষার অভ্যাস ওর। মা কত বারণ করেছে, বলেছে আঙুল চোষা যদি বন্ধ না করে তো সামনের দাঁতগুলো উপরে উঠে আসবে, অত সুন্দর মুখখানা বাঁদরের মত হয়ে যাবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? একটু সুযোগ পেয়েছে কি মীরা তার বাঁ হাতের দুটি আঙুল পুরবে মুখের মধ্যে। এখনও পুরেছে। পুরুকগে। আর চেঁচাতে ভালো লাগে না। কিন্তু এভাবে ঘাড়ে করে আর কতক্ষণ বহন করা যায়?

—নামো দেখি এবার দয়া করে, একটু হাঁটো তো। নীরবতা ভঙ্গ করে বলল কামাক্ষী। কিছুক্ষণ আগে তো একটা মস্ত বদমায়েশি করেই ফেলেছে—পাছে আবার ধমক খেতে

হয়, তাই ভয়ে ভয়ে কোনো উচ্চবাচ্য না করে নেমে পড়ল মীরা।

দু মিনিট নিঃশব্দে পথ চলা। মেয়েও কিছু বলে না, মাও বলে না, বাবাও বলে না। হঠাৎ রমা বলে উঠল,—তাহলে তুমি আবার সিগারেট ধরেছ?

প্রশ্নটা শুনেছে কি কামাক্ষী? না শুনতে পায়নি, এমন ভাণ করবে? কিন্তু ভাণ করেই বা কতক্ষণ রেহাই মিলবে?

—কী, উত্তর দিচ্ছ না যে? আবার বলল রমা।

কী উত্তর দেবে কামাক্ষী, কী উত্তর তার দেবার আছে? এবার তো হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে। সিগারেট যদি না খায় সে, তবে দেশলাই-এর বাক্সটা তার পকেটের মধ্যে ঢুকল কেমন করে? ভুল করে ঢুকে পড়েছে? না অন্য কেউ তার অজান্তে সেটা তার পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে? অথবা সেই যে কাল সন্ধ্যায় সরোজদার ঘরে ধূপ জ্বালতে হয়েছিল, মশা তাড়াবার জন্যে, তারপর দেশলাইটা সে অন্যমনস্ক হয়ে পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছিল, এবং তখন থেকে সেটা পকেটেই রয়ে গেছে? কিন্তু কোন্ মুখে সে এইসব বাজে অজুহাত দেবে? আর, দেবে কাকে? রমাকে? সে কী কম চালাক মেয়ে? তাছাড়া, এমন করে বাজে অজুহাত সে আর দিতে পারছে না, কাপুরুষ হতে সে পারছে না আর। আজ হাতে নাতে ধরা যখন সে পড়েইছে, তখন বীরের মত বুক ফুলিয়ে তার অপরাধ স্বীকার করবে। কারণ, সিগারেটের প্যাকেটটাও তো রয়েছে অন্য পকেটে, সেটাকেও তো সে লুকিয়ে বহন করছে।

—হ্যাঁ, অনেকদিন বাদে আজ ভাবলাম একটা সিগারেট খেয়েই দেখি। একটা খেলে কিছু হবে না। কাঁচুমাচু করে বললে কামাক্ষী।

যদিও এটাও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। তবু সম্পূর্ণ সত্য কথা যেটা, সেটা বলতেও তার সাহসে ঠিক কুলোল না। সে বলতে পারল না, হ্যাঁ, নতুন করে আবার সিগারেট খেতে আমি অনেকদিন থেকেই সুরু করেছি, লুকিয়ে খাই, রোজই খাই, সুযোগ পেলেই খাই।

—ও, মাত্র একটা সিগারেট খাওয়ার জন্যে একটা গোটা দেশলাই-এর বাক্স তোমার না কিনলে চলছিল না। এসব কাকে বোঝাচ্ছ তুমি? চাপা এক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বিরক্তির স্বরে বলল রমা।

আচ্ছা মুস্কিল তো, এত জেরার দরকারটা কী তোমার? আমি মানুষ খুন করেছি নাকি? সিগারেট খেতে ইচ্ছে গেছে, খাই, ব্যস, ব্যাপারটার সেইখানেই ইতি। তোমায় বিয়ে করেছি বলে কি একটা ছোটখাটো সাধ বা ইচ্ছাও পূরণ করতে পারব না নিজের খুশীমত? তোমার দেখাদেখি যদি আমিও তোমার সব ছোটখাটো সাধে বাদ সাধতে যাই, তখন? এই যেমন, বলি তুমি লিপস্টিক মাখবে না, কিছুতেই মাখতে পারবে না, আমি পছন্দ করি না, তখন?

কিন্তু এসব যুক্তি মনে মনে করে তো লাভ নেই, মুখে বলতে হবে। আর সেই মুখে বলার সাহসটাই কামাক্ষীর নেই আজ, তার গলা যেন শুকিয়ে আসছে। তাছাড়া, তার এই সিগারেট খাওয়া বা না-খাওয়ার যে-তর্কটা, সেটা একটু অন্য ধরনের—তার সঙ্গে রমার লিপস্টিক মাখা বা না-মাখার প্রসঙ্গের ঠিক তুলনা চলে না। আর, এই সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারটা তো আজকের নয়, এর পিছনে একটা ইতিহাস আছে।

কামাক্ষী তাই আর কোনো প্রতিবাদ করার ভরসা পেল না। রমাও পথে আর কিছু বলল না। বাড়ী পৌঁছোল। বেলা প্রায় দেড়টা বাজে, স্নান করে খেয়ে নিতে হবে।

সময় যায়, রমা আর কথা কয় না, যেন হঠাৎ মৌনব্রত অবলম্বন করেছে। এদিকে কামাক্ষীরও সাহসে ঠিক কুলোচ্ছে না কোনো একটা অবান্তর প্রসঙ্গ তোলার, যে-কোনো প্রসঙ্গ।

খাওয়া সারা হতেই রমা বলে উঠল,—আজই বিকেলের ট্রেনে কলকাতা ফিরব।

—সে কি? কামাক্ষী চম্‌কে উঠল। মেলা না দেখেই?

—ঢের দেখেছি মেলা। অরুচি ধরে গেছে।

—বেশ। সংক্ষেপে বলল কামাক্ষী।

—তাছাড়া, মেলার শেষে গেলে প্রচণ্ড ভিড় হবে, ট্রেনে ওঠা যাবে না।

সত্যিই তো, খাসা যুক্তি। কিন্তু এ যুক্তিটার কথা আজ সকালে বা গতকাল সন্ধ্যায় মনে হয়নি কেন?

—বেশ তো। আবার বলল কামাক্ষী।

ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট। বোলপুর থেকে একটা ছোট কামরা একেবারে খালিই পাওয়া গেল। একটা দুটো স্টেশন যাবার পরে কামাক্ষী আর থাকতে পারল না। বলল,—এত রাগের হয়েছে কী তোমার, যদি একটা সিগারেট খেয়েই থাকি......

—থাক, এ নিয়ে কোনো তর্ক করতে চাই না। তারপর একটু থেমে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বলল রমা, তোমার সঙ্গে কথা কইতে পর্যন্ত ঘৃণা হয়।

—দ্যাখো রমা, এসব......

—বলেইছি তো, আমি তর্ক করতে চাই না। ভীরু, কাপুরুষ কোথাকার। মিথ্যাবাদী।

রাগে যেন ভেতরে-ভেতরে ফোঁস ফোঁস করছে রমা। কী যে বলবে কামাক্ষী, কিছুই ভেবে পেল না।

—আর তুমি মাত্র একটা সিগারেটই খাওনি, অজস্র সিগারেট খেয়েছ, নিত্যই খাচ্ছ, শুধু আমাকে বলতে চাও না।

—খেয়েছি তো খেয়েছি, তাতে হয়েছে কী?

—হয়নি কিছুই। কিন্তু না খাবার ভাণ কর কেন? আমাকে মিথ্যে কথা বল কেন? এখনো তুমি চাও যে আমি তোমার ওপর আস্থা রাখি, তোমাকে শ্রদ্ধা করি?

—দ্যাখো রমা, কত স্বামীই তো সিগারেট খায়। কিন্তু তার জন্যে কোন্ স্ত্রী তার স্বামীকে এইভাবে অপমান করে? এত বাড়াবাড়ি......

—অপমান? কে কার অপমান করেছে? আমি না তুমি? আমি তোমাকে কখনো মিথ্যে কথা বলিনি, তোমাকে কখনো ধাপ্পা দিতে যাইনি, তোমার চোখে ধুলো দিইনি।

—আ—হা, এত ছোট জিনিসকে এত বড় করে দেখার দরকারটা কী?

—এটা ছোট জিনিস নয়। এটা অত্যন্ত বড় জিনিস। এটা সব থেকে বড় জিনিস স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে। এটা পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধা সম্মানের কথা, এটা একজনের প্রতি আরেকজনের বিশ্বাসের কথা। তুমি আমার সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করেছ।

খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ। একজন রাগে ফুলছে, আরেকজন বোবার মত চুপ করে বসে আছে। কিন্তু রমা ছাড়বার পাত্র নয়। আবার বলল,—আসবার সময়ও তুমি ট্রেনে স্মোক করেছিলে, অথচ আমার কাছে সে কথা স্বীকার করনি। মনে পড়ে?

কী বলবে কামাক্ষী?

—বাথরুমে ঢুকে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে স্মোক করেছিলে। তোমার পরেই আমি

বাথরুমে যাই, গিয়ে দেখি বাথরুম ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। কী সিগারেটের গন্ধ! তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করি, তুমি বল অন্য কোনো যাত্রী খেয়েছে। মিথ্যাবাদী।

সত্যি, এখন মনে হচ্ছে কামাক্ষীর, সেদিন ট্রেনের বাথরুমে ঢুকে অত তাড়াতাড়ি একটা আস্ত সিগারেট শেষ করা তার উচিত হয়নি। কিন্তু কী করবে সে? সেদিন তিন ঘণ্টার ওপর সে সিগারেট না খেয়ে ছিল। বাথরুমে ঢুকেই মনে হল, খেয়ে নিই না একটা বোঁ করে, কেউ তো দেখছে না। তবু সেদিনকার সেই বিপদটা সে শেষ পর্যন্ত ধাপ্পা দিয়ে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল, আজকের বিপদটা আর পারল না। প্রকাশ্যে বলল,—খাই তো খাই, অত গালাগাল দিচ্ছ কেন?

—খাও তো খাও? বলতে লজ্জা করছে না? বেশ তো, তুমি তোমার পথ বেছে নিয়েছ। হাজার হলেও তুমি স্বাধীন ব্যক্তি। কিন্তু আমিও স্বাধীন, সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমিও আমার পথ বেছে নিতে চাই, আমিও আমার খুশিমত চলতে চাই। আমি তোমার সঙ্গে আর থাকতে চাই না।

—পাগলামি করে না রমা, এসব কী বলছ তুমি?

—ঠিকই বলছি। দেখতে পাবে।

আবার চুপ। কেমন একটা মূঢ় আবেশে যেন কামাক্ষীকে আচ্ছন্ন করেছে। তর্ক চালানোর সাহসও নেই, ইচ্ছাও নেই। এবং কেমন যেন এক ধরনের ভয় করতেও সুরু করেছে। মীরা ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। বর্ধমান পেরিয়ে গেছে। এখন ইলেক্‌ট্রিক লাইন। গাড়ী চলছে হু-হু করে।

সিগারেট সে ছেড়েছে বহুবার, ধরেছে বহুবার। সে সবই রমার জ্ঞাতসারে। তার সিগারেট খাওয়া রমা কোনোকালে পছন্দ করেনি। অতি প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্না এই মেয়ে, রমা। তার রুচি অরুচির মধ্যে ভাগ পরিষ্কার। যা সে পছন্দ করে, তা সে পছন্দ করে, আর যা সে পছন্দ করে না, তা সে সহ্য করতেও পারে না। তার ওপর শিক্ষিতা মেয়ে সে, অভিজাত ঘরের, এবং এক অর্থে স্বাবলম্বিনীও। কারণ বিবাহের পরেও সে চাকরী করে। ভালো চাকরীই করে।

যতবার কামাক্ষী সিগারেট ছেড়েছে, কী আনন্দ রমার। আদরে আপ্যায়নে যত্নে সে স্বামীকে অস্থির করে তুলেছে, তাকে উপহারে ভূষিত করেছে। কিন্তু প্রতিবারই সিগারেট ছাড়ার দশ দিন বা বারো দিন বা পনের দিনের মধ্যে কামাক্ষী আবার সিগারেট ধরেছে। এবং যতবারই এইভাবে সে নতুন করে সিগারেট ধরেছে, রমা তাকে প্রতিবারই বলেছে : আমি এত অপছন্দ করি এই জিনিসটা—আমার দিকে চেয়ে, আমার ভালোবাসার দিকে চেয়ে কি তুমি এই স্মোকিংটা ত্যাগ করতে পার না?

তার ওপর ছিল, যা আজো আছে, খবরের কাগজে নিত্যনতুন রিপোর্ট স্মোকিং সম্বন্ধে। সিগারেট খেলে ফুসফুসে বা গলায় ক্যান্সার হয় কিনা, তাই নিয়ে কত দেশের কত বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন ও করছেন। এ সম্বন্ধে নতুন কিছু খবর বেরোলেই খবরের কাগজটি হাতে করে রমা এসে বলবেই,—এই দ্যাখো, এবার সোভিয়েটরাও বলছে...

—কী বলছে? হয়তো কামাক্ষী ব'লে উঠল।

—বলছে, ফুসফুসের ক্যান্সারে যারা ভুগছে, তাদের একশোজনের মধ্যে পঁচাত্তরজনই অতিমাত্রায় সিগারেট খায়।

—অতএব?

—অতএব সিগারেট খাওয়া থেকেই ঐ রোগটি আসে।

—হ্যাঁঃ, আসে বললেই আসে? কত লোককে জানি যারা দিনে চল্লিশ-পঞ্চাশটা করে সিগারেট খায়, আর তা খাচ্ছে বিশ পঁচিশ বছর ধরে সমানে। তাদের কারুরই কিছু হয় নি।

—আহা রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে তো সময় লাগে। আর একবার সেই লক্ষণ প্রকাশ পেলেই হয়ে গেল, ব্যস।

—কী জানি, অত সহজে বিশ্বাস করতে তো আমার প্রবৃত্তি হয় না।

—তোমার প্রবৃত্তি হয় না কারণ তোমার যুক্তি একেবারে দুর্বল যুক্তি। লোভ থেকে, বদভ্যাস থেকে মুক্তি পেতে গেলে প্রবল ইচ্ছাশক্তির দরকার হয়। আর সেই শক্তি তোমার নেই।

—কী মুস্কিল। আর এত প্রশ্ন উঠবেই বা কেন। তুমি বলছ, এসব রোগ যাদের হয়, তারা সকলেই অতিমাত্রায় সিগারেট খায়। আমি তো অতিমাত্রায় সিগারেট কখনো খাই না। দিনে বড় জোর পনেরটা বা বিশটা, তার বেশি কখনো যাই না।

—পনেরটাই হোক আর বিশটাই হোক আর দশটাই হোক আর একটাই হোক, তা-ই বা তুমি খাবে কেন? না খেলে কি চলে না? সিগারেট না খেলে মানুষে বাঁচে না? বরং সিগারেট খেলেই যখন এত প্রচন্ড বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। আজ বিশটা খাচ্ছ, কাল পঁচিশটা খাবে, পরশু তিরিশটা খাবে, তারপর ক্রমে ক্রমে দিনে চল্লিশটা, পঞ্চাশটা, ষাটটা খাবে, এর শেষ কোথায়?

—শেষ খুবই আছে, ইচ্ছে করলেই আছে।

—সেই ইচ্ছেটা করছে কে? তুমি? দেখে তো মনে হয় না। একটা সিগারেটই বা তুমি খাবে কেন? যখন এতে শুধু খারাপ হওয়ারই সম্ভাবনা আছে, ভালো কিছুমাত্র নয়? প্রথমত তো পয়সা খরচ, সম্পূর্ণ নিরর্থক পয়সা খরচ, এর চেয়ে পয়সা পোড়াতে পার। তায় খাবার জিনিস নয়, পেট ভরে না। এ খেলে মুখে গন্ধ হয়, দাঁত নষ্ট হয়, গলা নষ্ট হয়, ফুসফুস নষ্ট হয়, সমস্ত শরীরটা নষ্ট হয়। কেন খাবে তুমি?

—আচ্ছা বাবা, খাব না।

কিন্তু পরে কামাক্ষী আবার খেয়েছে, সমানেই খেয়ে গেছে। রমা তাকে নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করেছে। ধীরে ধীরে রমার মনের মধ্যে হয়তো জেগেছে একটা ঘৃণার ভাব, একটা অনাসক্তির ভাব, একটা তাচ্ছিল্যমিশ্রিত করুণার ভাব। হয়তো তার মনে হয়েছে, এ লোকটা আশ্চর্য দুর্বল প্রকৃতির, এর কোনো মনের জোর নেই, এ খালি সিগারেট ছাড়ে আর ধরে। প্রকাশ্যেও এমন কথা বহুবার বলেছে রমা।

তবু এসব বহুকাল আগেকার ব্যাপার। শেষবার কামাক্ষী যখন সিগারেট ছেড়েছিল, অর্থাৎ এইবার, সে আজ বছর খানেকেরও আগের কথা। এবারের এই সিগারেট ছাড়াটা ততটা রমার তাড়নায় নয়, যদিও এ বিষয়ে রমার মনোভাব অলক্ষ্যে কাজ করেছিল নিশ্চয়ই। তবু এবার সিগারেট কামাক্ষী ছাড়ে মূলত নিজেরই প্রেরণায়। তার যেন মনে হতে সুরু করেছিল, ব্যাপারটা ভালো হচ্ছে না, এভাবে আর চালানো উচিত নয়। অবশ্য সিদ্ধান্তটা সম্বন্ধে রমাকে সে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে যায়নি বুক ফুলিয়ে। রমা জানতে পারে তিন চার দিন বাদে, একদিন যখন রমারই উপস্থিতিতে এক বন্ধু তার সামনে সিগারেট এগিয়ে দেয়। কামাক্ষী প্রত্যাখ্যান করে, বলে,—কয়েকদিন খাচ্ছি না। ইচ্ছে আছে, আর খাবও না। অবশ্য জোর করে কিছু বলতে পারছি না, দেখি কদিন চলে এ রকম।

শুনে, বলা বাহুল্য রমা খুবই সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু কোনো মন্তব্য করার ভরসা তখন সে পায়নি। আগেও তো সে বহুবার দেখেছে এমন সিদ্ধান্ত নিতে কামাক্ষীকে। তবে এবারের সিদ্ধান্তটার একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। এক মাস গেল, দু মাস, তিন মাস, চার মাস গেল, কামাক্ষী আর সিগারেট খায় না। এমনকি আজো পর্যন্ত রমার দৃঢ় ধারণা ছিল যে কামাক্ষী অবশেষে সত্যিই সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে, এক বছরেরর ওপর সে আর স্মোক করে না। কামাক্ষীর প্রতি বিশ্বাস তার ধীরে ধীরে ফিরেও আসছিল।

এই তো কিছুদিন আগেই খবরের কাগজ হাতে রমা এসে হাজির। একটা খবরের দিকে কামাক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বলে,—দ্যাখো, অস্ট্রিয়ার বৈজ্ঞানিকরা কী বলছে। এরা এবার হৃদরোগের সঙ্গেও ধূমপানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রমাণ করেছে। সত্যি, সিগারেটটা ছেড়ে দিয়ে তুমি যে কী ভালোই করেছ......।

কথাটা শুনে, মনে আছে কামাক্ষীর, সে ভয়ঙ্কর অস্বস্তি বোধ করে। নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হতে থাকে তার। কেন?

কারণ সেইখানেই যে একটা ছোট্ট মুস্কিল হয়ে গেছে, সে যে ইতিমধ্যেই লুকিয়ে লুকিয়ে আবার সিগারেট খেতে আরম্ভ করেছে। তিনটি মাস যায় বেশ, নির্ঝঞ্ঝাটে। তারপর হঠাৎ একদিন কী মনে করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসে। রমা মীরাকে নিয়ে তার মা-বাবার সঙ্গে দার্জিলিং-এ গেছে তখন গরমের ছুটিতে। কামাক্ষী কলকাতায় একলা। একদিন রবিবারের দুপুরে তার মনে হল, সিগারেটের দাসত্ব থেকে মুক্তি তো পেয়ে গেছিই, এখন তো সিগারেট খাওয়া-না-খাওয়া আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে, সুতরাং খাই-ই না কেন একটা সিগারেট, মাত্র একটা, আর খাব না।

ব্যস, সেই একটা থেকেই আবার পতনের সুরু হয়েছে। তারপর লুকিয়ে সমানে খেয়েছে ও খাচ্ছে, রমাকে না জানিয়ে। আপিসে খায়, বন্ধুদের সঙ্গে খায়, বেড়াতে গিয়ে খায়, কিন্তু বাড়ীতে খায় না, রমা যেখানে থাকে সেখানে খায় না। আপিস থেকে ফেরার সময় মুখে একটা সুপারি চিবোতে চিবোতে আসে, যাতে মুখে গন্ধ না হয়, রমা টের না পায়।

কখনো কখনো আবার একটা আধটা পান মুখে দিয়েও বাড়ী ফেরে। পান খাওয়ার অভ্যাস তার কোনোকালেই নেই। রমা বলে,—সে কি গো, পান খেতে সুরু করলে কবে থেকে?

—সুরু না হাতী। একটা পেলাম, একজন দিলে, মিঠা পান, তাই খেলাম। খেতে কিন্তু মন্দ লাগে না। খাবে একটা?

—যাঃ কী যে বল।

আর আজ? উঃ, কী সর্বনাশ হয়ে গেল। ঐ পুঁতির ব্যাপারটা ঘটার দরকারটা কী ছিল? ভগবান প্রতিশোধ নিলেন।

শ্রীরামপুর ছাড়িয়ে গেছে। কলকাতা এল বলে। মীরা উঠে বসেছে। রমার মুখ সমানই গম্ভীর, হয়তো আরো গম্ভীর আগের চেয়েও। হ্যাঁ, সবই সম্ভব এই মেয়ের পক্ষে। বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা পর্যন্ত সে ভাবতে পারে, নিশ্চয়ই পারে। বিশেষ করে স্বামীর প্রতি সকল শ্রদ্ধা, সকল আস্থা, সকল বিশ্বাস আজ সে যখন এমনি করে হারিয়েছে। হাড়ের মধ্যে যেন হঠাৎ কেমন এক কন্‌কনে ভাব জাগল কামাক্ষীর, মনে হল দেহমন অবশ হয়ে আসছে। ভয়ঙ্কর একটা ভয় করছে—ভয় সুখশান্তি হারানোর, জীবনটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়ার।

তবে কি একবার প্রাণপণ চেষ্টা করবে সে, একটা শেষ চেষ্টা? হাওড়া পৌঁছোতে

আর বেশি দেরী আছে বলে মনে হচ্ছে না।

—রমা, ধরা গলায় ডাকল কামাক্ষী।

উত্তর নেই।

—রমা।

—কী? রমার কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তির সুর।

—রমা, এবারকার মতো মাফ কর, আর কখনো স্মোক করব না।

—লজ্জা করে না তোমার এভাবে নিজেকে ছোট করতে? আমি যদি তোমাকে সিগারেট ত্যাগ করতে বলে থাকি, সেটা তোমারই ভালোর জন্যে, আমার স্বার্থের জন্যে নয়। আমি তোমাকে সম্মান করতে চেয়েছিলাম, তোমার কাছ থেকেও সেই একই সম্মান চেয়েছিলাম। তার চেয়েও অনেক বড় করে যা চেয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে তুমি নিজেকে নিজে সম্মান কর। আমার চোখে তুমি যদি ছোট হয়ে যাও, সেটা যে আমার পক্ষে কত বড় একটা আঘাত, তা তুমি বুঝবে না।

—আমি বুঝতে পারছি রমা, সবই বুঝতে পারছি। আমার খুবই দুঃখ হচ্ছে, সমানই দুঃখ হচ্ছে, বিশ্বাস কর। কিন্তু আর হবে না, আর আমি স্মোক করব না, এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

—প্রতিশ্রুতি? রমা যেন হঠাৎ জ্বলে উঠল। কিসের প্রতিশ্রুতি? কে চায় তোমার প্রতিশ্রুতি? আর আজ নিয়ে এই প্রতিশ্রুতি তুমি কতবার দিয়েছ জানো? সত্যি, তোমার লজ্জা করে না? একটা পৌরুষবোধ নেই?

—রমা......

—না—না, দয়া করে এসব কথা আমাকে আর শুনিয়ো না। তোমার মুখদর্শন পর্যন্ত আর করতে চাই না। সরে যাও। চলে যাও।

হাওড়া স্টেশন এসে হাজির।

বেশ, তবে সরেই যাব, চলেই যাব, ভাবলে কামাক্ষী। কিন্তু দেশলাই কাঠিটা যদি সে সময়মত বার করতে না পারত তো হয়তো মেয়েটা মরেই যেত চোখের সামনে। সে-কথাটা কি একবার ভেবে দেখেছে রমা? কোন্‌টা বড় তার কাছে—কামাক্ষীর সিগারেট খাওয়া বা না খাওয়া, না মেয়েটার প্রাণ?

যাকগে, যা হবার হ'য়ে গেছে, এবং যা হবার হবে।

কিন্তু কোথায় দাঁড়াবে কামাক্ষী, কী হবে এবার? এক প্রকাণ্ড পরিহাস, ও এক প্রচণ্ড শূন্যতা। নিজের ওপর ক্রোধ, অনুতাপ, আতঙ্ক।

মেয়েটার হাত ধরে নামবর জন্যে প্রস্তুত হল কামাক্ষী। এ যেন আর সেই একই হাওড়া স্টেশন নয়, যা সে এতদিন চিনে এসেছে।

বুদ্ধি, মেধা, মেরী ম্যাকার্থি

অশোক মিত্র

হাল্কা পাঠ্যবস্তুতে আস্তে-আস্তে পৃথিবী ছেয়ে যাচ্ছে। এটা প্রায় প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ীই হচ্ছে। মার্কিন অর্থানুকূল্যে দেশের-পর-দেশ টি'কে আছে—কাতারে-কাতারে মার্কিন ধনবিজ্ঞানী-সমাজতাত্ত্বিক-সমাজসেবক-মনীষী-কূটনৈতিক-পণ্ডিত-মূর্খ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছেন। মার্কিন যন্ত্রপাতি, মার্কিন ছবি, ইংরেজি ভাষার অগ্রগামী মার্কিন বিকৃতি। মার্কিন জীবনযাত্রার মূল দর্শনের সূত্র ঋজুতাকে আশ্রয় ক'রে—সব-কিছুকে আমি-ভালো-তুমি-নিকষ-মন্দর পর্যায়ে ঠেলে নামাতে হবে, সোজা ক'রে আসল কথাটি নিবেদন করতে হবে, তাতে যদি হৃদয়গহনের সূক্ষ্ম, সন্তর্পিত উচ্চারণগুলি ধরা না-পড়ে, ক্ষতি নেই; চিন্তার ব্যাপ্তি যদি কমিয়ে আনতে হয়, তাহ'লেও বিষণ্ণতা অবান্তর।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে চিন্তার উৎকর্ষ, কল্পনার তেপান্তরবৃত্তি মার্কিন দেশে শেষ হ'য়ে এসেছে। কুড়ি কোটি লোকের মস্ত বড়ো দেশ, প্রাচুর্য সর্বত্র উপচে পড়ছে—বাইরের পৃথিবীর স্থূলবোধআচরণঅভিক্ষেপ পাশে সরিয়ে রেখে অনুপাতে স্বল্পসংখ্যক বৈজ্ঞানিক এখনো মহৎ গবেষণা করছেন, তন্নিষ্ঠ সাহিত্যদর্শনকাব্যচর্চাও অনুপস্থিত নয়। স্রেফ সংখ্যাতত্ত্বের সিদ্ধান্ত থেকেই এটা বলে দেওয়া যায় যে মনীষা তথা অন্বীক্ষার ঊর্ধ্ব-মানের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই—সাধারণ বিচারবুদ্ধি যতই স্থূল হ'য়ে আসুক না কেন, অসাধারণত্ব সব-সময়েই পরিমাপের বাইরে।

কিন্তু মুস্কিল হলো শতকরা সাতানব্বুইদের নিয়ে যে-সমাজ তা নিতান্তই শাদামাঠা, দুঃসহরকম ভোঁতা। এবং যে-মার্কিন প্রতিভাস ভিতরে-বাইরে বিকিরিত হচ্ছে, তা এই সাতানব্বুইদের সমাজের। খোলা, চটকদার ছবিওলা বই, যা একনিশ্বাসে প'ড়ে ফেলা যায়; ব্যাকরণ পেরিয়ে-আসা ভাষাবিন্যাস, যা একেবারে-হালে-মার্কিন-দেশে-উপনীত পোল ইতালীয় চেক স্লাভ সুইডিশ যে-কেউ চট্ ক'রে বুঝে নিতে পারে, ইতিহাস ও নীতিচর্চায় এমন-এক দেশজ সরলতা যাতে উত্তম-অধমের অতিরিক্ত কোনো ভাবনানুষঙ্গ নেই; কাব্য যেখানে লংফেলো-রবর্ট ফ্রস্টের বন্ধনী ছাপিয়ে উপ্‌চে ওঠার অনুমতি পায় না; মঞ্চাভিনয় ভদেভিলের শাসন ডিঙিয়ে খুব বড়ো জোর মিউসিক্যালের অঙ্গনে পৌঁছে হাঁপাতে শুরু করে; গল্পসাহিত্যের নামে যেখানে অশুদ্ধ সস্তা বুকনিভারাতুর ইংরেজিতে বহুশত পৃষ্ঠা-ব্যাপী প্রলাপকথন চলে।

হয়তো এ-বিষয় নিয়ে আক্ষেপের সমারোহ অযৌক্তিক। লোকায়ত এবং লোকোত্তরের দ্বন্দ্বে লোকোত্তর ক্রমশ পিছুপা হবে। প্রায়নিরক্ষরদের সংখ্যাধিক্য ঘটলে একধরনের প্রায়নিরক্ষর সাহিত্যও সৃষ্টি হ'তে বাধ্য। একবারে হালে মার্কিনদেশে সাহিত্যের অছিলায় অনেক ধরনের কণ্ডূয়ন হচ্ছে: কবিতায়-গল্পে-প্রবন্ধে। দুটো লক্ষণ প্রধানত চোখে পড়ে: এক, অধিকাংশ সাহিত্যব্রতীর ভয়-পাইয়ে-দেওয়া প্রাকরণিক (এবং ব্যাকরণিক) দৌর্বল্য, দুই, সমস্ত রচনার মধ্যে একটি অপ্রচ্ছন্ন বিক্ষিপ্তভাব, যার ফলে উপন্যাসের ভূমিকা এক সংস্থানে শুরু হ'য়ে হঠাৎ গ্রহান্তরে চ'লে যায়; কাব্যে টুকরো-টুকরো নৈরাজ্য, আঁটোসাঁটো ছন্দের দীর্ঘস্থায়ী প্রয়াস কদাচিৎ লক্ষ্য হয়; প্রবন্ধ যা-ও দু'একটি লেখা হয়, প্রায়ই

তত্ত্বজর্জর প্রলাপের বিকল্প।

শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যুগপৎ এই সারল্যানুসৃতি এবং ঈষদস্থিরতা মার্কিনদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। চিত্রকলায় প্রাকরণিক পূর্বকুশলতা উৎক্ষিপ্ত, চোখধাঁধানো পটাঙ্কনের দিকে আপাতত লোকায়ত আসক্তি। দর্শনচিন্তা সাংবাদিকতায় স্তরে এসে ঠেকেছে : সমাজের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে বছরে দুটো-তিনটে ক'রে বই লিখছেন ভাড়াটে সাংবাদিকেরা, এবং সে-সব বই হু-হু ক'রে কাটছে। টাইপ নিয়ে গল্প, টাইপ কী ক'রে হয়, তার ব্যাখ্যার জন্য উপন্যাস : এই প্রাথমিক পার্থক্যটুকু অবলুপ্ত। প্রায় যে-কেউই উপন্যাসের ভাণ ক'রে এক হাজার পৃষ্ঠা জুড়ে ব্যাপ্তি খুঁজছেন, কিন্তু, মাঝে-মাঝেই মনে হয়, এমনকি প্রথম পৃষ্ঠাটুকুও সৃষ্টির প্রয়োজনের বহির্ভূত প্রয়াস।

উজ্জ্বলতার অনুসন্ধানে কোন্ দিকে তাকাবো তাহ'লে? মার্কিনদেশের ফসলে আপাতত আমাদের উদরপূর্তি হচ্ছে, মার্কিনিদের কাছে যন্ত্রপাতি-কাঁচামাল-অন্যান্য তৈজস অনেক-কিছুর জন্যই হাত পাততে হচ্ছে। সুতরাং আশা বলুন, আশঙ্কা বলুন, শিগ্গিরই আমাদের শিক্ষায়-আচরণে-অভিক্ষেপে মার্কিনি রঙ-বেরঙ লাগবে। অবশ্য প্রায় ছ'লক্ষ গ্রামে ধুঁকে-পুকে বেঁচে-থাকা ভূমিহীন কৃষিজীবি-মজুরচাষিদের মধ্যে এই তরঙ্গ পৌঁছুবে না, নগরে-বন্দরে অগুন্তি নিম্নবিত্তরাও হয়তো অস্পর্শিত থাকবে। কিন্তু শহুরে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের চোখে মার্কিনি নেশার অঞ্জন লাগবেই, জাতীয় পরিকল্পনাদির ফিকিরে হালে বেশ-খানিকটা পয়সা করেছেন সেরকম মধ্যবিত্ত-উচ্চ মধ্যবিত্তরাও বাদ যাবেন না, সদাগরি দপ্তরের কর্মচারী-সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ-চিকিৎসক-আইনজ্ঞ-অধ্যাপক অনেকেরই মনে-ব্যবহারে দোলার চমক লাগবে। গোপাল বড়ো সুবোধ বালক, যা পায় তা-ই খায় : আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের গোপালরা খুব বেশিদিন অচঞ্চল থাকতে পারবেন ব'লে মনে হয় না। ইতিমধ্যেই ড্রেনপাইপ পাৎলুন, ট্যুইস্ট নৃত্যসংগীত, মার্কিনি চুটকি পত্রিকা, অখ্যাত-অজ্ঞাত মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঝালরওলা খেতাব, ইত্যাদির প্রসারে হকচকিয়ে যেতে হয়। মান অপরগতি হয়েছে, কাল অস্থির। অন্য সময়ের তুলাদণ্ডে যে-সামগ্রী অপকৃষ্ট বিবেচিত হতো, তা-ই এখন দেশের সাক্ষর শ্রেণীর কাছে পরমগ্রহণীয় মনে হচ্ছে।

যেহেতু এই অয়নবৃত্তের মধ্যে আমরা ধরা প'ড়ে গেছি, সাহিত্যের স্বাদ আমাদের এখন হয়তো অধিকাংশ সময়ে *Time* পত্রিকার শেষের তিন-চারটি পৃষ্ঠা উল্টে মেটাতে হবে, এই পত্রিকাটির, কিংবা সমগোত্রীয় অন্য কোনো খবরকাগজের, বিচারের কষ্টিপাথরে নিজেদের বিবেচনাকে বিন্যস্ত করতে হবে। বোধহয় খুব-একটা পরিশীলিত পরিশ্রমী চেষ্টারও দরকার নেই : চোখের সামনে যে-প্রতিম্ব দেখবো, দিনের-পর-দিন যে-রুচির প্রচার শুনবো, যে-আদর্শকে রাজাসনে অধিষ্ঠিত করতে অনুজ্ঞা পাবো, এমনই মানুষের আত্মসমর্পণকাতরতা, অচিরে মনের, রুচির, আদর্শের গড়নও অনুরূপ পরিবর্তিত হবে। ফলে, *New Yorker*-এর মতো উজ্জ্বল-ঝকঝকে-নাকউঁচু পত্রিকা প'ড়ে আমাদের আনন্দ ব্যাহত হবে, আমরা শ্রীযুক্ত লুসের লঘুরসচটুল মহলের ঘরানা হবো। হেমিংওয়ে পাঠে আর তেমন নেশা হবে না, জন হার্সি-গোছের কোনো লেখকের যুদ্ধকাহিনী নিয়ে পড়বো; লাওনেল ট্রিলিং কিংবা এডমান্ড উইলসনের সাহিত্যবিচারে আর আস্থা থাকবে না, দেখবো রীডর্স ডাইজেস্টে কে কী লিখেছেন।

এই অপকৃষ্ট-আসক্তির সমারোহে, ধ'রেই নেওয়া চলে, শ্রীমতী মেরী ম্যাকার্থি অপঠিত থেকে যাবেন। ওরকম ঝলোমলো গদ্য, ওরকম শিক্ষিত কৌতুক, ওরকম নির্দয় ব্যঙ্গ কাছে

টানতে পারে না, লোককে ছিটকে গণ্ডির বাইরে ফেলে দেয়। এত বুদ্ধির দীপ্তি, যা মেয়েলি অথচ যা মনীষার ধারে প্রখর, শ্রীমতী ভার্জিনিয়া উল্‌ফের রচনায় ইতিপূর্বে পাওয়া গেছে, কিন্তু একহিশেবে শ্রীমতী ম্যাকার্থির গদ্য আরো বেশি সার্থক : শ্রীমতী উল্‌ফের গদ্যে কবিতার কিঙ্কিণীমূর্ছনা যথেষ্টই ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে আরো যা ছিল তা অস্বাস্থ্য-ছড়ানো এক প্রলাপঅস্থিরতা। মেরী ম্যাকার্থির লেখায় সেরকম কোনো প্রলাপের প্রলেপ নেই, তাঁর গদ্য তাই উচ্ছল-ছলোছলো তটিনীরোল, যে-নদীতে অথচ চিন্তার গভীরতর জলকেলি। এই গদ্য প্রেমিকার মতো কাছে টানে, বন্ধুর মতো আলোচনায় জড়ায়, ওস্তাদের গানের লয়ের মতো হঠাৎ কোনো সুদূরে তুলে নিয়ে যায়। অত্যন্ত ঘরোয়া শব্দবলী, যেন সিগারেটের ধোঁয়ার অন্তরালে পড়শী মেয়েটি বসিয়ে যাচ্ছে, অথচ যে-মুহূর্তে শব্দ-স্থপতি শেষ হলো, টনক নড়লো আমাদের, দ্রুত ঘাড় তুলে আমরা মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম : এ-মেয়ে তো যে-সে মেয়ে নয়, একসঙ্গে রাজনীতি কপচাচ্ছে, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে, শ্রীমতী সীমন দ্য বোভোয়াকে একহাত নিচ্ছে, মার্কিন সমাজের বিভিন্ন স্তরের কুশ্রীতা-হীনতা-অন্ধতা নিশানা ক'রে ব্যঙ্গের ফুলঝুরি ঝরাচ্ছে, এরই ফাঁকে-ফাঁকে কিন্‌সী রিপোর্টের সিদ্ধান্তাদি নিয়ে তুখোড় টিপ্পনি, গান্ধিজির মৃত্যুতে বিষাদার্ঘ্য, সেনেটর ম্যাকার্থির উদ্ভববিশ্লেষণ। যে-ভাষাকে মনে হয় কবিতা, তার যে এতপ্রকার ব্যবহার সম্ভব, এমন সচ্ছন্দ, দ্রুত তালে বিষয়-থেকে-বিষয়ান্তরে প্রব্রজ্যা সম্ভব, এই উপলব্ধির আনন্দ অনেক।

অথচ ঠিক সেই ভাষাই আবার খানিক বাদে কথকতায় ব্যাপৃত হ'য়ে পড়ে। এমন-অনেক প্রবন্ধ মেরী ম্যাকার্থি লিখেছেন, যেগুলিকে অনায়াসেই গল্প ব'লে চালিয়ে দেওয়া যায়, এবং এমন-অনেক গল্প, যেগুলিকে বলা চলে রসে-বিষাদে-মেশানো স্মৃতিচারণ। কয়েক বছর আগে *Memories of a Catholic Girlhood*[১] নাম দিয়ে তিনি একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন : সত্য এবং কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে আশ্চর্য-উজ্জ্বল পর-পর অনেকগুলি চিত্রের সমাবেশ। ফিকে--হ'য়ে-আসা স্মৃতি, তার শরীরে কিছু-কিছু কবিতার কথা-বলা; যা মনে পড়ে না, অনুপূর্ব মনে-থাকা দৃশ্যগুলির সঙ্গে কল্পনার বুনোন জুড়ে নতুনধারা এক মাধুরী-সমাবেশ। এই বয়নশিল্প সারা হবার পর আরেক-দফা তারপর লেখিকার নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার পালা : প্রতি কাহিনীর শুরুতে—নয়তো শেষে—পাঠককে সতর্ক ক'রে দেওয়া কতটুকু ছোঁওয়া, কতটুকু কথা, সব-মিলিয়ে কতটুকু ভাবনা-কাঁপানো মনের আল্‌পনা। যেন এক মেরী আরেক মেরীকে তর্জনী তুলে শাসাচ্ছে, 'এখানে তুমি স্রেফ গুলতাপ্‌পি দিচ্ছো, ঐ গল্পটাতে তোমাকে যে-প্রথম চুমু খেয়েছিল, তাকে তুমি ইচ্ছে ক'রে কেটে দিয়েছো। আর এখানটায় নিজেকে তুমি বাহাদুরি দেওয়ার চেষ্টা করছো, আসলে যা ঘটেছিল তা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম...'।

যোগ-বিয়োগের বোঝাপড়ায় পাঠকদের মস্ত লাভ হলো এই যে যে-বই গোড়াতে ছিল নিতান্তই কয়েকটি খাপছাড়া গল্পের সমষ্টি, তা রূপান্তরিত হলো, পিতৃমাতৃহীন অপাপ-বিদ্ধা একটি বালিকা কী ক'রে অনেকগুলি নির্মোকের মধ্য দিয়ে গিয়ে সবশেষে, সতেরো বছরের জাদুমুহূর্তে, ভাসার কলেজের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলো, তার আশ্চর্য-নিটোল এক প্রবহমান চিত্রকল্প আমাদের কাছে উন্মীলিত হলো। নিজেকে নিয়ে লেখা কাহিনীতে অনেক সময় একটা খুঁত ঢুকে যায় : আবেগে অপক্ষপাত বজায় রাখা দুরূহ হ'য়ে পড়ে।

[১] Harcourt, Brace & Company. New York. $ 3·95

কিন্তু যেহেতু শ্রীমতী ম্যাকার্থি নিজেই নিজের সমালোচক, এবং সমালোচনাতে কোনো স্থান কিংবা সময়চ্ছেদ ঘটেনি—কোথাও আপাতঅবৈকল্যবিচ্যুতি ঘটলে সঙ্গে-সঙ্গে মন্তব্য যোগ ক'রে দেওয়া হয়েছে,—যা দোষের হ'তে পারতো তা অধিকতর মাধুরীরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

সেজন্যই, *Memories of a Catholic Girlhood*-এর ভগ্নাংশগুলি পাঠান্তে, সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত মেরী ম্যাকার্থিকে অত্যন্ত পরিচিত ব'লে মনে হয়, তাঁর ইহুদি-জাতা প্রসাধনবিলাসিনী দিদিমাকে পরিষ্কারভাবে চোখের সামনে দেখতে পাই, কনভেন্টের মেয়েদের আর মাদার সুপিরিয়রকে আমাদের আলাপিতা ব'লে ধ'রে নেওয়া চলে প্রায়, Medicine Springs গ্রামের ছেলেপাগল মেয়েদুটির সঙ্গেও যেন কোথায় আলাপ হয়েছিল এমন মনে হয়। শ্রীমতী ম্যাকার্থির লেখার হাত কী ক'রে স্কুলজীবনে আস্তে-আস্তে পাকা হলো, সাহিত্যে প্রীতি কী ক'রে সমস্ত সত্তা বেয়ে সঞ্চারিত হলো, ভাষার প্রতি নিবিড়-অন্ধ প্রেম জড়ো হ'তে-হ'তে হঠাৎ কী ক'রে একদিন উন্দামতা পেলো, প্রতিটি ধাপ গুণে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত এখন আমাদের জানা। এবং স্কুল পেরোবার পর, সীঅ্যাট্‌লের সেই প্রত্যন্ত পরিবেশ ঝেড়ে ফেলে স্বপ্ন-দিয়ে-তৈরি পূর্বপ্রান্তিক ভাসার কলেজে পড়তে যাওয়ার মনোবলই বা কী ক'রে শ্রীমতী ম্যাকার্থি জড়ো করলেন, তা-ও আমরা *Memories* পাঠ ক'রে জেনে নিতে পারলাম।

অতঃপর ভাসার, সুন্দরী, শৌখিন, বড়োলোকদের ফ্যাশান-বানানো বুদ্ধিঝলমল কন্যাকাতে ছাওয়া ভাসার। শ্রীমতী ম্যাকার্থির প্রবন্ধসংগ্রহ *On the Contrary*[২]-তে ভাসার কলেজের মেয়েদের নিয়ে একটি রচনা আছে ('The Vassar Girl')। রচনাটি কিছু স্মৃতিরোমন্থন, কিছু সমাজবিশ্লেষণ। ভাসারের অধিকাংশ ছাত্রী বিত্তবান ঘর থেকে; যাদের সেরকম কুলপরিচয় নেই, তারা পড়াশুনোয় মেধাবী, বৃত্তি পেয়ে প্রবেশ করে। সজাগ চোখ, সজীব মন, রাজনীতিচর্চায় নয়তো অভিনয়কলায় নয়তো অন্য-কোনো নেশায় সর্বদা ঘোর-লাগা অবস্থা মেয়েদের : ছাত্রীথাকাকালীন অবস্থায় প্রত্যেককে দেখেই মনে হয় দশবছর বাদে কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে একটা মস্ত-কিছু হবে—হয় সাহিত্যিকা, নয় অভিনেত্রী, অথবা ওয়েইটম্যান-কাপে-খেলতে-পারা টেনিস খেলোয়াড়, বা রাজনীতিতে-ঢুকে সমাজবিপ্লবের-বন্যা-বাওয়ানো জননায়িকা। ভাসারের সমস্ত অঙ্গন ছেয়ে এই প্রতিশ্রুতির মর্মর : হাওয়ার এমন-এক গুণ, পরিবেশে এমন-এক ধার যে কোনো মেয়েকেই তুচ্ছ মনে হয় না, প্রতিভাহীনতার প্রসঙ্গ যেন অবান্তর। সমস্ত পৃথিবী ঐ চারটি বছরের সীমাসময়ের মধ্যে যেন প্রত্যেকটি ভাসার ছাত্রীর কাছে অবনত হ'য়ে আসে : হে মেয়ে, প্রণতি গ্রহণ করো, ক'রে ধন্য করো সব-কিছুকে, তোমার জন্য সব-কিছুই তো প্রস্তুত।

তবে বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে, আঠারো-উনিশ বছরের উদ্ভিন্নযৌবনা মার্কিন মেয়েরা ভাসার-হান্টার-স্মিথ-ওয়েলেস্‌লী ধরনের কলেজের মুক্ত অঙ্গনে। ঋতুশেষ হ'লে প্রতিভাতে মরচে ধরে, উনিশ বছরে হাডসন নদীর ধারে পিকনিক করতে গিয়ে যাকে অসম্ভব প্রতিভাবতী মনে হয়েছিল, কয়েক বছর বাদে নিউ ইয়র্ক শহরের সাবওয়েতে, কিংবা ক্লীভল্যান্ডে কোনো সুপারমার্কেটে অপরাহ্নিক বাজার-করার মুহূর্তে, তাকে নির্বাপিত মনে হয়, সাধারণ মনে হয়, হয়তো বা এমনকি নিরেট মনে হয়। শ্রীমতী ম্যাকার্থি হিশেব দাখিল ক'রে বলছেন, আসলে, অধিকাংশ মেয়েদের পক্ষে, ভাসারে গেলেও যা, না-গেলেও তাই। উত্তরজীবনে ভাসারের প্রলেপ তেমন-কিছু লেগে থাকে না : 'a census was

[২] Farrar, Straus & Cudahy. New York. $ 3·95

taken, and it was discovered that the average Vassar graduate had two-plus children and was married to a Republican lawyer' (*On the Contrary*, ২০০ পৃষ্ঠা)। এতদ্‌সত্ত্বেও যে-ক'টি প্রাক্তন ভাসারকন্যা যশোমতী হিশেবে পরে নাম কুড়োন, তাঁরা স্বয়ংবৃত্তা, তাঁদের গৌরবে ভাসারের খ্যাতির বহর বাড়ে, কিন্তু সে-গৌরবে পোকীপ্‌সির এই মেয়ে-কলেজের আদৌ অধিকার নেই।

তাহ'লে ভাসারে গিয়ে মেয়েরা কী পায়, পরিবেশের উজ্জ্বল-কজ্জল মোহিনী মায়া যে-বৈভব ছড়ায়, তার মূল্য কতটুকু? শ্রীমতী ম্যাকার্থি, স্পষ্টই বোঝা যায়, বেশ কয়েক বছর ধ'রে সমস্যাটি নিয়ে ভেবেছেন। আগেই যা বলেছি, চিন্তার মেয়েলিমার জন্য তিনি আদপেই লজ্জিতা নয়, তাঁর মানসিক গণিতগঠনে এধরনের মিতাক্ষর-দায়ভাগ সমস্যা বড়ো জায়গা দখল করে আছে। *Memories*-এর পর, ভাসার-জীবন নিয়ে রচিত *The Groves of Academe*-র পর শ্রীমতী ম্যাকার্থিকে তাই প্রাকৃতিক তাগিদেই উত্তর-ভাসার জীবনের প্রসঙ্গে কোনো-না-কোনো একদিন ভাষ্য লিখতে হতো। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস, *The Group*,* মনে হয় সেই ভাষ্য।

শ্রীমতী ম্যাকার্থি এখানে নিজেকে সামান্য আড়ালে রেখেছেন, তাহ'লেও অনুমান করা সহজ যে উপন্যাসটির মারফৎ আরেকবার স্মৃতিচারণের মহড়া চলছে, নিজের ফেলে-আসা-বিশেষ দিনগুলিকে কিছুটা ভালোবাসা, কিছুটা ঠাট্টা করা, কিছুটা হয়তো বা বিচার করা। *The Group* ভাসার থেকে পাশ-ক'রে-বেরোনো আটটি মেয়ের কাহিনী, স্থান প্রধানত নিউ ইয়র্ক শহর, কাল ধরা চলে ১৯৩৩ সাল থেকে শুরু ক'রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার প্রায়াহ্ন। মার্কিনদেশে সে এক অদ্ভুত সময় গেছে : বহু প্রবন্ধে বহু গল্পে মেরী ম্যাকার্থি বিপ্লবের ছোঁয়া-লাগা প্রেমরক্ত বছরগুলির বর্ণনা দিয়েছেন, ভাসার থেকে সদ্য-বেরিয়ে-আসা তিনি, সাহিত্যিকা, রাজনীতিভক্ত, প্রেমিকটি হয়তো শখের অভিনেতা, আর মনে সহস্র সংকল্পকল্পনায় সহস্র অশ্বমেধের উন্দামতা। আর্থিক মন্দায় চুপ্‌সে আছে গোটা মার্কিন দেশ, শিল্পপতিদের মধ্যে হাহাকার, এমন সময় আশার মশাল আকাশে উঁচিয়ে রাষ্ট্রপতি রোজভেল্টের অনুপ্রবেশ। সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত-কিছু অন্যরকম হয়ে গেলো; New Deal এর দুর্মর আশার নির্ভরে শিল্পী-শ্রমিক-কবি-রাজপুরুষ-অভিনেতা-কারুকর্মী সবাই অভিনব অভিজ্ঞানে ব্যাপৃত হলেন। পুরোনো কাঠামো আর না, পুরোনো দর্শন-রাজনীতি-ধনবিজ্ঞান মেকি প্রমাণিত হয়ে গেছে, এবার নতুন ক'রে পৃথিবী গড়ার পালা। রাজনীতিতে মার্কসবাদ আর তার অসংখ্য বিস্ফারিত অলিগলি, যৌনসম্পর্কে শ্রীমতী মেরী স্টোপ্‌স অথবা স্টেখেল, সাহিত্যে বা চিত্রকলায় দুঃসাহসী প্রাকরণিক প্রসঙ্গান্তর। কী উজ্জীবন্ত প্রাণবন্ত ছিল মার্কিনদেশ এই অল্প-কয়েকটি বছর : যুদ্ধোত্তর নির্জীব-হ'য়ে-আসা জুজুবুড়ির-ভয়ভীত রীতিসংকীর্ণ বর্তমানের মার্কিন দেশের সঙ্গে সেই সোচ্চার মিছিলের দিনগুলির কোনোরকম যোগসূত্রই নেই। সাম্প্রতিকতার কোনো প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত উপন্যাসটিতে নেই, কিন্তু নেই ব'লেই তিরিশ বছর আগেকার পুরোনো উজ্জ্বলতার স্মৃতিকে এতটা দ্যুতি নিয়ে বিকিরিত হ'তে দেখে চমকে উঠতে হয়।

The Group-এর শুরু তাদের আটজনের একজনের বিবাহানুষ্ঠানে, শেষ কয়েক বছর বাদে সেই মেয়েটিরই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজনের ভিড়ের মধ্যে। ইতিমধ্যে চোখে-প্রগাঢ়-নীলিমা-নিয়ে বেরিয়ে-আসা ভাসার কলেজের সেই আটজন ঘর বেঁধেছে, ভেঙেছে;

* Weidenfeld and Nicolson. London. 18s

ছবি এঁকেছে, ছেড়েছে; প্রেমে পড়েছে, প্রেম থেকে পালিয়েছে; পারিবারিক অনুশাসন পেরিয়ে ভিন্নরকম হবার চেষ্টা করেছে, হয়তো সামান্য সফল হয়েছে, নয়তো হয়নি; পৃথিবীকে আবিষ্কার করতে বেরিয়েছে, পৃথিবীদ্বারা প্রতিহত হয়ে ফিরেছে, নয়তো পৃথিবীর রলরোলের সঙ্গে সন্ধি করতে শিখে এসেছে; সমাজবিপ্লবের কথা ভেবেছে, কার্যত মাত্র প্রেমিক থেকে প্রেমিকান্তরে গমন করেছে, অথবা যৌনবোধের বিষয়ান্তরে। এই কাহিনীর বিস্তারে কৌতুক আছে, ঝিকিমিকি রোদ্দুর আছে, অথচ বুকে-চেপে-বসা অসাফল্যের বেদনার গ্লানিও অনুপস্থিত নয়। আটজন যে-আলাদা-আলাদা স্বপ্ন নিয়ে ভাসার কলেজের ফাটক পেরিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, সেই স্বপ্নগুলি কেমন বিকিরিত-বিস্ফারিত-বিচূর্ণিত হ'তে-হ'তে অপরাপর ধূসর শরীরে বিলীন হয়ে গেলো, তার মমতা-মাখানো বৃত্তান্ত শ্রীমতী ম্যাকার্থির এই কাহিনী। কাহিনীটিতে তেমন-একটা অখণ্ডতা ও যে আছে তা নয় : এক অধ্যায় থেকে পরের অধ্যায়ের সেতুবন্ধন মোটামুটি শিথিল, কিন্তু ক্ষতি হয়নি তাতে, হয়তো এই শিথিলতাই তির্যক বিন্যাসে প্রমাণ শেখায় যে ইচ্ছার সঙ্গে স্বপ্নের, স্বপ্নের সঙ্গে সৃষ্টির সম্বন্ধও এলায়িতশিথিল।

শ্রীমতী ম্যাকার্থি বোধহয় আরো-একটা কথা বলতে চাইছেন। কৈশোর-প্রথম যৌবনের আদর্শগুলি অধিকাংশই ধোপে টেঁকেনা; আমরা অহরহ বদলাচ্ছি, কিছুটা জ্ঞানের পরিধি বৃহত্তর হচ্ছে ব'লে, কিছুটা আবেগের অভিজ্ঞতায় দীর্ণ হচ্ছি ব'লে। অনেক পথ হেঁটে, অনেক কাদা-কাশবন অতিক্রম ক'রে মাঝে-মাঝে হয়তো নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় : কী হলো এত সব ক'রে, হঠাৎ কোথা দিয়ে কোথায় এলাম, এর কোনো দরকার ছিল কি, এই আকুতির, আকাঙ্ক্ষার, অতৃপ্ত বাসনার, অপূর্ণ স্বপ্নের? মানুষকে বুঝতে চাই, ব্যথা দিয়ে চ'লে আসি; পৃথিবীকে অন্যরকম ক'রে গড়তে চাই, পৃথিবীই আমাকে বদলে দিয়ে পিষ্ট ক'রে চ'লে যায়। সব-মিলিয়ে তাহ'লে এই বেদনার, এই অশান্তির সার্থকতা কোথায়? শ্রীমতী ম্যাকার্থি এই প্রশ্নের উত্তর প্রায় অস্তিত্ববাদের আশ্রয় থেকে দিচ্ছেন : সার্থকতা অভিজ্ঞতার গহনে, এই কান্নার-ব্যর্থতার-কৌতুকের-অচরিতার্থতার-মেনে-নেওয়ার মধ্যে; ভাসারের নীলিমা একদিন চোখ থেকে মিলিয়ে যাবে, তারপর মধ্যাহ্নের স্নেহস্বচ্ছতা; এই স্বচ্ছতার স্বাদই জীবনবোধ।

শ্রীমতী ম্যাকার্থি পঞ্চাশ পেরিয়েছেন: ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধেছে, থেমেছে; যুদ্ধোত্তর পর্বে মার্কিনদেশের একদা-স্বপ্নালু সমাজ অনুশাসনে নির্জীব হয়ে এসেছে; ভাসার-থেকে পাশ-করা মেয়েরা হয়তো এখন আর নিষিদ্ধ স্বপ্ন দেখেনা, স্বপ্নের সঙ্গে কর্মের, কল্পনার সঙ্গে সৃষ্টির অসেতুসম্ভব পরম্পরা সুতরাং হয়তো তাদের চকিত ক'রে আনে না; হয়তো তাদের কাছে মেরী ম্যাকার্থির কোনো আকর্ষণ নেই, তাদের প্রিয়া পাঠিকা হয়তো শ্রীমতী এডনা ফার্বার।

হয়তো দীপ্ত বুদ্ধির দিন শেষ হয়ে এসেছে, মেধার প্রয়োজন ফুরিয়েছে; হয়তো মেরী ম্যাকার্থি তাহ'লেও এখনো লিখে যাবেন, কিন্তু আমরা পড়বো না।

মুখোশ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

রাস্তাটা সম্প্রতি নাম করে উঠছে। গড়িয়াহাট রোড। নর্থ এবং সাউথ বরাবরই ছিল কিন্তু সাউথে কে আসত? একে তো বজবজের রেল-লাইন নর্থের ঋজু শরীরটার কোমর বাঁকিয়ে দিয়েছে সাউথের তার উপর ধানক্ষেত আর ধোবার ঝিল আর নর্দমার গা-ছুঁয়ে সে-দক্ষিণা-পথ কায়ক্লেশে গিয়ে পৌঁচেছে দক্ষিণদুয়ার যাদবপুর পর্যন্ত! সে নামেই তো 'গঙ্গা মনে পড়বার কথা! তবে ম্লেচ্ছদের তো ওসব বাছবিচার নেই—তাই তাঁদের আমলে নৈশ-আড্ডার আর খেলাধুলার একটা প্রশস্ত জায়গা ছিল এই সাউথ অঞ্চলেই, যোধপুর পার্ক। আভিজাত্য ওটুকুই আর যদি আভিজাত্য থাকে ব্যাধির রাজা রাজযক্ষ্মার দরুণ যার নামে যাদবপুরকে চেনা। এঞ্জিনীয়ারিং? শিবপুর পেলে যাদবপুর কে আসত?

কলকাতায় দক্ষিণের একটা আভিজাত্য আছে। দক্ষিণ-খোলা বাড়ি থেকে শুরু করে চৌরঙ্গী-ভবানীপুর-বালিগঞ্জ সবই অভিজাত তালিকার নাম। এ-ব্যাপারটা যাঁদের জানা ছিল আর শোনা ছিল যোধপুর ক্লাবের নাম তাঁদের মধ্যে যে উনিশ-শতকীয় বাবুগোষ্ঠীর কেউ থাকবেন তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। শ্যামবাজার-বাগবাজার-শোভাবাজার ভদ্রাসন থাক না, গড়িয়াহাটার আশে-পাশে দু-চার বিঘে ধান-জমি কিনে রাখতে কী? কতোই বা আর দাম? তাছাড়া যোধপুর ক্লাবের কাছাকাছিই যখন পাওয়া যাচ্ছে। বাঙালপাড়া বালিগঞ্জ থেকেও দূরে অথচ লেকের হাওয়া পাওয়া যাবে। এখন থেকে বত্রিশ বছর আগে প্রজেনজিৎ দেবের দু' বিঘে জমি হয়েছিল তাই এ-অঞ্চলে। আবাদ-অঞ্চলে তাঁর জমিদারী। দক্ষিণদিকটা মন্দ লাগবার কথা নয় তাঁর।

কিন্তু তিনি প্রজাসত্ত্ব আইনও দেখে যাননি, জমিদারী-উচ্ছেদ তো না-ই। সবই দেখতে হল তস্য পুত্র পিনাকীরঞ্জনের। পিনাকী লেখাপড়া শিখেছিল, বিশ্ববিদ্যালয় ছুঁতে না পারলে যে শিক্ষিত হওয়া যায় না—তা সে জানত। সে গ্র্যাজুয়েট। হলেও বা কী? শিক্ষিত হলেই কি আর কৃষক-প্রজাদলের ওই জবরদস্তির আইন একটি জমিদারের ছেলে হাসিমুখে মেনে নিতে পারে? পিনাকী মানেনি। সে উত্তেজিত হয়েছে তারপর বিমর্ষ। তারপর ভদ্রাসন-বিক্রিটা তার কেউ-কেউ বললেন সন্ন্যাস। সে অবশ্যি তাঁদের বোঝালেন, —মোটেও তা নয়। ওসব বাঙাল স্বদেশী উকিলের প্যাঁচে কে পড়বে, মশাই? কোন্‌দিন আইন করে বসবে, জমিদারের বাড়ি দখল করো! তাছাড়া, এতো বড়ো বাড়ি নিয়ে করবই বা কী? ভাড়াটে বসাতে ত পারব না!

অতএব পিনাকী গড়িয়াহাট এলো। বাজার ছেড়ে হাট। যাহোক তবু সেকেলে। দু' বিঘের দশ কাঠা রেখে বাদ-বাকি সব বিক্রী। ছোট দোতলা—একটা বাগান হলেই তো হল! আর জমি যাঁরা নিচ্ছেন, মানে পাশাপাশি থাকবেন, তাঁদের একজন এক বীমা কোম্পানীর সর্বেসর্বা অপর আলিপুরের রিটায়ার্ড জজ। মোটামুটি প্রতিবেশী মন্দ হবে না। তাছাড়া এধরনের লোকের যখন এদিকটায় নজর পড়ছে—আর জমির দামও চড়ার দিকে, গড়ানো হাট জমজমাট গরানহাটা হতে আর কদ্দিন?

সত্যি, বেশিদিন কি লাগল? এঞ্জিনীয়রদের ব্যস্তদিন। যেদিকে তাকাও, পাইলিং,

ইঁট-চূণ-সুরকি-সিমেন্ট-লোহা, ত্রিকোণ-চতুষ্কোণ-বৃত্তাকার গর্ত, মাটির ঢিবি। যুদ্ধের সময়টাতে যা-একটু অন্য রকম, অসুবিধে—তার আগে আর পরে একই রকম। গড়িয়াহাট সাউথের ল্যান্ডস্কেপই বদলে গেল। পিনাকী খুশী হয়ে উঠছিল জায়গাটার রূপান্তরে, আভিজাত্যে। কিন্তু স্বাধীনতার পরটাতে যখন যোধপুর ক্লাব শ্মশান—সামনে তাকাতে যেন তার ভয়ই করত। ছেলেবেলা থেকে সে সায়েব-মেম দেখে অভ্যস্ত—বলতে গেলে, বড়দিন তো বাবার একটা উৎসবই ছিল—এ কী? চৌরঙ্গীতে গিয়ে দেখল সে, কোথায় ত্রস্ত পায়ে সায়েব-মেমদের চলা—স্থূলাঙ্গিনী পাঞ্জাবী-মাড়োয়ারী হেলেদুলে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে!

সেই আবছা ভয়টা স্পষ্ট হয়ে গেল জমিদারী-উচ্ছেদের আলাপ-ভরা আবহাওয়ায়। যখন রাগিণী শুরু, মানে আইন পাশ হয়ে গেল তখন আর ভয় নেই। দুশ্চিন্তা। সরকার থেকে কিস্তির টাকাগুলো কবে কবে পাওয়া যাবে। মোটেও যা সে পছন্দ করে না তা-ই করতে হবে—উকিলের বাড়ি দৌড়ানো—কোর্টে হাজিরা দেওয়া। প্রজাসত্ত্বেই তো মালিকানা গেছে—ছিলাম তো নামমাত্র জমিদার—নামটা তুলে দিতেই যদি সদয় স্বদেশী সরকার টাকা দেন তো মন্দ কী? দুশ্চিন্তার শেষে ভাবলে পিনাকী। ভাবলে, এক-কপর্দক মঞ্জুর না করলেও বা আমরা কী করতে পারতাম?

কিন্তু হাতিবাগানের মুচ্ছুদ্দিবাড়ির মেয়ের তাতে খুশী হবার কথা নয়। একে তো গা-ঘিন-ঘিন-করা গাঁয়ে আসা তার উপর মহাল বেহাত! মাধুরী খবরটাতে রীতিমতো আঘাতই পেয়েছিল। বাপ-মা জমিদার-বাড়ি দেখেই তো মেয়ে দিয়েছিলেন, পিনাকীকে দেখে নয়। পারিবারিক বিয়ে। হাতিবাগানের দত্তবাড়ির সঙ্গে শোভাবাজারের দেববাড়ির বিয়ে। সে বাড়ি তো গেছেই পিনাকীর পাগলামিতে—এখন আবাদের মহালও গেল! আমল নাকি বদলে গেছে, এমনই হবে—পিনাকী বলে। সত্যি-মিথ্যে সে-ই জানে। মাধুরী সে খোঁজ নিতে চায় না। ভাবে, হয়তো পাল্টেছে আমল। সায়েবদের আমল। তাঁরা থাকলে কি হিন্দু-মুসলমানে এমন দাঙ্গা হয়?

যা-কিছু খবর থাকে, মাধুরীকেই জানায় পিনাকী। স্ত্রী ছাড়া জানাবার আর কে আছে? প্রসেনজিৎ দেবের সবেধন নীলমণি সে। যদিও ষাট, তার দু'টি ছেলে—দু'টিই নাবালক। খবর নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে আড্ডা জমাবে? মান-সম্ভ্রম কি চলে গেছে তার—জমিদারী গেছে বলে? দেববাড়ির কোন্ ছেলে জুড়িগাড়ি ছাড়া বাইরে বেরিয়েছে? আস্তাবলটাকে গ্যারেজ করবেন, ভাবছিলেন বাবা, তারপর তো গতই হলেন! উঁচু পাহাড়ের ঢালুতে গড়িয়েই গড়িয়াহাটা এসেছে পিনাকী। জুড়ি-গাড়ি প্রায় মনেই আসে না—মোটরেরও স্বপ্ন নেই পিনাকীর কিন্তু তা বলে কি প্রতিবেশীর আড্ডাঘরে গিয়ে খবর বিলি করবে? আর তেমন প্রতিবেশী যাঁদের সে জমি দিয়েছে, বলতে গেলে যাঁরা প্রজারই সামিল!

—বলছ কি তুমি? মহাল নিয়ে নিলে? এ তো জবরদস্তির সামিল! ভুরু কুঁচকে রুদ্ধশ্বাসে বলেছিল মাধুরী।

—তবে আর বলছি কী? তুমি তো ক্ষেপে গিয়েছিলে, শোভাবাজারের বাড়ি কেন বেচে দিলাম! এখন বোঝো! স্ত্রীকেই যেন আক্কেল বোঝাতে চাইলে পিনাকী।

—টাকা-পয়সা কিছু দেবে না?

—তা দেবেন ওঁরা। তবে কবে দেবার মর্জি হয় ভগবান জানেন!

বাপের ঘর থেকে শুরু করে শ্বশুর ঘর পর্যন্ত মাধুরী ভাগ্যবিধাতা বলতে সায়েবদের নামই শুনে এসেছে, ঠাকুরদেবতাকে নেহাৎ দরকার হলে ঠনঠনে কালী। স্বামীর মুখেই

মাঝে-মাঝে ভগবানের নাম শুনছে সে কিছুকাল থেকে। নায়েব-গোমস্তার মুখ কালো দেখলে বা দুলু-বুলু শক্ত অসুখে পড়লে। যেকালে, ছেলেবেলায় মাধুরী দেখেছে সায়েব-ডাক্তার আসতেন বাড়িতে, এখন সে পিনাকীর মুখে শুনতে পায় ভগবানের নাম!

—তাহলে, বলো, সর্বনাশই হয়ে গেল! গলাটা বোঁজা-বোঁজা হয়ে এলো মাধুরীর।

—সর্বনাশ আর কী? ও থেকেও বা কী হত? অজন্মা না-হয় নোনা—এ-খবরই শোনাতে আসতেন নায়েববাবু!

—তবু তো আসতেন! এখন আর কে আসবেন তোমার বাড়িতে!

ব্যথিত হয়েই মাধুরী স্বামীকে একতলার কাছারি-ঘরে রেখে দোতলার শোবার ঘরে চলে এসেছিল। সেদিন দুলু-বুলুকেও স্কুলে যাবার সময় মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়নি সে। ঠাকুরকে তটস্থ করে থালায় ভাত, বাটিতে মাছ রেখেই সে উঠে পড়েছিল। এবং দিবানিদ্রার অষুধ বসুমতীসাহিত্যমন্দিরের বই স্পর্শও করেনি। ফলে সমস্ত দুপুর ছটফট করেই গেল তার। ঢকঢক জল খেল। উপর-নীচ করল বারকয়েক। বাগানের ফুল-ফলের চারা-গুলোর দিকে তাকালো। মালী রাখা হবে আর? প্রশ্নটার তাড়া খেয়ে সিঁড়ির গোড়ায় এসে ভাবলে, ছেলেবেলায় কী ফল খেতে সে ভালোবাসত। আম না আপেল?

কিন্তু দিব্যি ঘুমোল পিনাকী। সেদিনও। সেদিনও কাছারী-ঘরের গদী-আঁটা ছোট চৌকিটায় সে ঘুমিয়ে চলল। দৈনিক কাগজে মুখ ঢেকে আর-আর দিনের মতোই। যেন কিছুই হয়নি। জেগেই চা চাইবে। মালীর সঙ্গে কথা, স্কুল-ফেরত ছেলেদের জন্যে অপেক্ষা, তা চুকে গেলে আজও যেন নায়েববাবু আসবেন, সে আশায় সদর থেকে গেট পর্যন্ত পায়চারি!

অদ্ভুত মানুষ! ভাবলে মাধুরী। সবই হতে দিচ্ছে। যা হচ্ছে সব কিছু। হাত তুলে কখনো যে বাধা দেবে তা নয়। শ্বশুরকে মনে পড়ল মাধুরীর। বিশাল পুরুষ! কতো বড়ো চৌকো মুখ—চুমড়ানো গোঁফ! তাঁর বোর্ন এন্ড শেফার্ডের বাড়ির তোলা ফটোটার দিকে তাকাবে বলে মাধুরী তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। তাকানো যেন দরকার। মনে হল মাধুরীর। নইলে, যে-ধরনের ব্যথায় সে ছটফট করছে তা যেন কিছুতেই যেতে পারে না।

তবু তো আঘাত পায় মাধুরী, ব্যথা পায়, ছটফট করে কিন্তু পিনাকী? কিছুই যেন তার হয় না, কোনো ব্যথাই যেন লাগে না কোথাও, কোনো ঘটনা-ই যেন ঘটনা নয় তার মনে। সবই তার বাইরে ঘটছে, খবরের কাগজের ঘটনার মতো, কোনোটাই তার ভেতরে নয়। এমন তো নয় সে বেহুঁশ হয়ে আছে, বাপ-পিতামহর মতো সে-ও নেশা করে এবং দুর্ঘটনার খবর পেলেই মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে থাকে, তা সে মোটেও নয়। তবে? তবে আর কী, ও-ই রকম। ঘটনা হলে স্ত্রীর কাছে বলেই খালাশ। তা নিয়ে আর কোনো ভাবনা নেই, যন্ত্রণা নেই। কী করতে হবে তা জানতে এ'র-ও'র পরামর্শ সে কোনোদিন নেবে না। নেবে কী, করার তো কিছু তার নেই। কিছু করা যায় না বলেই করার নেই। পিনাকী তা বিলক্ষণ জেনে রেখেছে। কী করার ছিল তার যখন প্রসেনজিৎ দেব সন্ন্যাসে মারা গেলেন? ডাক্তাররা বা কী করতে পেরেছিলেন? অতএব কোনা চেষ্টার মধ্যেই আর নেই পিনাকী।

যা হবার এমনিতেই হয়। ভেবে রেখেছে পিনাকী। কতো চেষ্টা তো করলেন তাঁদের উকিলবাবু খেসারতের কিস্তি মঞ্জুর করিয়ে আনতে! পারলেন? যখন পাবার পাওয়া গেল। মাঝখান থেকে, শুধু মাধুরীর পেড়াপীড়িতেই, মোটা ফিস্ গুণলেন তিনি। টাকাও

যে এসেছে আর গেছে, তা-ও বর্ষারই মতো, টাকারই খুশী-মাফিক। পিনাকীর তাতে হাত ছিল না। কিন্তু মাধুরী তেমন ভাবে না। ভাবে, টাকা যেন ছিনিয়ে আনা যায় কিম্বা আলিবাবার মতো চিচিং ফাঁক বলেই গাধার পিঠে মোহরের বস্তা নিয়ে বাড়ি ফেরা যায়! যেন ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত রাখলেই টাকা থেকে যাবে, খরচ হবে না—যেন কোম্পানীর কাগজগুলো বেচতে হয়নি। মেয়েলি ভাবনা! ব্যবসায়ী ঘরের মেয়ে তো! ভাবনাই অন্যরকম।

মাধুরীই যখন অন্যরকম ভাবে, পিনাকীর দৃঢ়মূল ধারণা, তার ভাবনার শরিক ত্রিসংসারে কেউ নেই। অবশ্য, ভাবনা বলতেও তার তেমন-কিছু নেই। যে-ভাবে সে থাকছে, তেমন কেউ থাকে না, থাকতে রাজি নয়। থাকছে কি প্রদ্যোৎ মল্লিক? তারই সমবয়সী। বিদেশ ঘুরে এসেছে। ব্যারিস্টারিও নাকি পাশ। প্র্যাকটিস অবশ্য করে না। করবার দরকারও বা কী? কিন্তু সে তো থাকছে না। শুনি, উপভোগ করছে। বিদেশ থেকে এসেই কোন্ এক প্রণয়িনীর সঙ্গে মদ খেতে শুরু করে। দু'জনই দু'জায়গায় বিবাহিত। তবু নাকি হোটেলে ঘরভাড়া নিয়ে একই রকম হুল্লোড় করে। প্রদ্যোতের কথা ছেড়েই দাও, পাড়ার আরো দু-পাঁচটা সচ্চরিত্র ছেলেও কি পিনাকীর মতো থাকছে? সবাই অফিসে বেরোয়, টাকা ছিনিয়ে আনবার ফিকিরে। মোহনবাগানের খেলার সঙ্গে গঙ্গার ইলিশের মরশুম মেশায়, শিশিরবাবু-অহীন-দুর্গাদাস নিয়ে রক গরম করে। অন্য রকম। সবাই অন্যরকম।

বাগবাজারে যদি এমন, গড়িয়াহাটায় কি আলাদা কেউ আছে—যে হুবহু পিনাকীর মতো থাকছে? রজত-কৌলীন্যে যাঁরা নতুন প্রমোশন পেয়েছেন তাঁদেরই তো ভীড় এখানে! দেড় বিঘে জমি যাঁদের কাছে বিক্রি করে দিলে পিনাকী—তাঁদের সে প্রজা ভাবলে বা কী এসে গেল? সবাই মস্ত বড়োলোক। যাঁর বীমা কোম্পানী সরকার নিয়ে নিলেন, সেই সচ্চিৎ রায় না চৌধুরী কী যেন ভদ্রলোকের নাম, রাখলেন না বটে একবিঘে জমি ধরে—চড়া দামই পেলেন কিন্তু ঠাঁট কি একটু কমেছে? সেই বাড়ি-বাগান। তাঁর জমি কিনেছেন এক সুপারেন্টেন্ডিং এঞ্জিনীয়র। এঞ্জিনীয়ারদেরই তো এখন মরশুম! তারপর আছেন অবসর-প্রাপ্ত জজ-বাবু—সরকার কোন্ কমিশনে ডাকেন তারই প্রত্যাশায়। সবাই আলাদা রকম।

এসব খবরও কি জানা হত? জজ-বাবুর ছোট ছেলের বৌভাতে নিমন্ত্রণ এলো। জজ-বাবু নিজেই এলেন। তবু, যেতে রাজি হয়নি সহজে পিনাকী।

মাধুরী বললে,—এ কী পাগলামি করছ? নিমন্ত্রণ নিলে এখন বলছ যাবে না!

পিনাকী হেসে বললে,—তুমি যাবে নাকি?

—বুড়ো মানুষ এতো করে বলে গেলেন, যাবো না?

—আজকাল তো সতীর পুণ্যেই পতির পুণ্য! আমাকে আর টানাটানি কেন?

—তুমি নড়তে চাও না, তাই টানাটানি।

টানাটানিতে জিত হল মাধুরীরই। এবং জীবনে এই বোধ হয় প্রথম পিনাকী স্ত্রীর সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বেরোল। দু'জন যে একসঙ্গে যাবে তা-ও মাধুরীরই ইচ্ছায়। হাল-আমলের এই রীতি সায়েব-মেমদেরই দেখে এসেছে পিনাকী। যদিও বা কখনো প্রদ্যোৎ মল্লিকের বা ঠাকুর-বাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেছে সে, একাই গেছে—মাধুরী গেলে ছেলে-পুলেদের নিয়ে আলাদা। তার পথ-সঙ্গিনী হবে মাধুরী এ সে জীবনেও ভাবেনি। অথচ সেদিন গেল। রীতিটা যে কী করে পাল্টে গেল সে বুঝতে পারল না।

যাওয়াতেই জজ-বাবুর আড্ডায় নানা লোকের সঙ্গে দেখা, নানা কথাবার্তা শোনা,

জওহরলাল, কাশ্মীর, পাকিস্তান, বাংলার মন্ত্রী, এল-আই-সি, ফরাক্কা-বাঁধ এসব তো ছিলই আলাপে তাছাড়া যাঁর-যাঁর ঘরের খবর। প্রায় সবারই ছেলে, না-হয় মেয়ে বিলেতেই আছে, পড়াশুনোয়, ফিরে এসে যে সবাই নিউ-দিল্লীর শোভাবর্ধন করবে, সবারই এই আশা। কিন্তু সব-চাইতে অদ্ভুত খবর, যোধপুর-ক্লাবের এলাকা এখন যোধপুর পার্ক। সেখানে প্লট রাখবার জন্যে নাকি শেয়ার-বাজারের কাড়াকাড়ি লেগে গেছে। ইতিমধ্যে প্লট নিয়ে বাড়িও তৈরী হয়ে গেছে কয়েকটা। পার্কে বাড়ি? শুনে হাসিই পাচ্ছিল পিনাকীর। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টেরও খবর পাওয়া গেল সেখানে। জজবাবুর বড়ো ছেলে গ্লাসগো ফেরত এঞ্জিনীয়র। তার মুখ থেকে শোনা, কাজেই দৈনিক কাগজের তৈরী খবর নয়, যা ভাবে পিনাকী। আর সে-খবর সত্যি না হলে যোধপুর-পার্ক নিয়ে এতো কাড়াকাড়িও বা চলবে কেন? খবর : গড়িয়াহাট নর্থ-সাউথ সোজা চওড়া রাস্তা হয়ে যাবে, রেললাইনের উপর দিয়ে পুল তৈরী হবে।

নীরব শ্রোতাই ছিল পিনাকী। কী বলবে সে? কী-ই বা বলার আছে? সবই তো বাইরের খবর! তার খাওয়া-দাওয়া-ঘুম ছুঁয়ে যায় এমন কিছু নয়। দুলু-বুলুর পড়াশুনো? ওদের বিলেত পাঠানো? সাধ্যই নেই তার ওদের বিলেতের খরচ দেবার, সাধ করে কী হবে? তাছাড়া সাধ্যও যখন ছিল পরিবারের, কে কবে বিলেত গেছে? বাবা কি তাকে বিলেত পাঠালেন? বলতেন, বিলেত গেলে ঠাণ্ডা লেগে যক্ষ্মা হয়ে যায়। তাঁর কোন্ বন্ধু এক অ্যাটর্নির ছেলের নাকি তা-ই হয়েছিল।

সাধ্য নেই! কথাটা বিঁধতে পারত পিনাকীকে। ওঁদের কথার শেষে, ভোজের প্যান্ডেলে কিম্বা মাধুরীর সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসবার পথে। কিন্তু বেঁধেনি। ভোজে বসে তার মনে হয়েছিল, মিষ্টিগুলো ততো ভালো নয়, এদিককার কোনো দোকানের হবে, তাদের সিমলা-পাড়ার মিষ্টির মতো তো নয়ই, বাগবাজারের সাবেকি রসগোল্লার কথা ছেড়েই দিলাম। বাড়ি ফেরবার পথে মনে হয়েছিল মাধুরী বেশ খুশী-খুশী। বোঝাও গেল কেন খুশী। বলছিল,—সোনা-দানার কথা ছেড়েই দাও, আজকাল আর কে দিচ্ছে ওসব? শাড়িই বেশি। আসবার পথে মাধুরীর হাতে একটা শাড়ির বাক্স ছিল, দেখেছে পিনাকী, আর এ-ও জানে, দুপুরে মাধুরী ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে গড়িয়াহাটার মোড়েও গিয়েছিল ট্যাক্সি ডেকে। কিন্তু জিজ্ঞেস করেনি, কী দিলে জজবাবুর পুত্রবধূকে, দেখেওনি। এখন মাত্র জিজ্ঞেস করলে,—তুমি কী দিলে?

—বেণারসী। তার উপর আর শাড়ি আছে নাকি?

—তাই নাকি?

ওটুকু সংক্ষিপ্ত কথায়ই নিমন্ত্রণ-পর্ব শেষ করল পিনাকী। সাধ্য নেই—ভাবনাটা ফিরে আসতে পারত তার মনে। বেণারসী উপহার দেবার যে আর সাধ্য নেই, সে-কথা শোনাতে পারত মাধুরীকে। কিন্তু শোনায় নি। শোনাবার কথা মনেই আসেনি পিনাকীর।

বাড়ি ফিরে মনে এলো জজবাবুর আড্ডার এক-একটি মুখ। জজবাবুর বড়ো ছেলে, বেশ উঁচু-লম্বা—ধুতি-পাঞ্জাবীতেও সাহেব-সাহেব চেহারা। বীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা—লম্বাটে মুখটা ভেঙে গিয়ে এখন একটু বেশি লম্বাটে মনে হয়। এঞ্জিনীয়রবাবু—ছাঁটা-গোঁফ, মজবুত মুখ বয়েস হলেও। জজবাবুর বড়ো ছেলের বন্ধু—কী যেন নাম, যোধপুর পার্কের নতুন বাসিন্দে—পদ্মবিভূষণ না কি উপাধি আছে, সেকেলে রায়বাহাদুরের মতো। কী করেন ভদ্রলোক, জানা গেল না। কথায় বোঝা গেল, তাঁর খাতির সব-মহলে। বেশ গোলগাল চেহারার সুগন্ধি মানুষ। যোধপুর পার্কের লোকগুলো বোধহয় সবাই ওমনি

হবে। শৌখীন। বিলিতি সায়েবের জায়গায় দিশিবাবু। বাবু আর আজকাল ক'জন আছে? সবই তো প্রায় দিশি-সায়েব। ছেলে-ছোকড়া থেকে নিজের বয়সীদের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল পিনাকী সবারই ট্রাউজার-শার্ট। সামিয়ানার নীচে এদিক-ওদিক ঘোরা-ঘুরি করছিল ভোজনের শেষে। এক টুকরো কলকাতা।

তাই, মোটের উপর খুশীই হয়েছিল পিনাকী। ভাবতে পারছিল, কলকাতায়ই সে আছে। সোঁদরবনে এসে ঢোকে নি। যদিও সেদিকেই তাদের জমিদারী ছিল—একবারও সে যায়নি আবাদে।

তারপর থেকে বিকেলে-বিকেলে যোধপুর পার্কে ঢুকে পড়ত পিনাকী। মাঠ, বাঁকা লেক, তালগাছ। আর এদিকে-ওদিকে খোঁড়া-মাটি, ইটের স্ট্যাক, লোহার ফ্রেম—বাড়ির উদ্যোগ। তৈরী বাড়িও আছে এখানে-সেখানে। কোন্ বাড়িটা যে সেই সুগন্ধি পদ্ম-বিভূষণের তা জানে না সে। জানলেও যে পিনাকী বাড়ির সামনে দাঁড়াত তা নয়। এঁরা অন্য শ্রেণীর মানুষ। সেদিনই সে জেনে এসেছে। ভদ্রলোকের নাকি সভা-সমিতিতে ডাক পড়ে, খবরের কাগজের মহলে আর সিনেমার মহলে সমান আদর। নতুন কলকাতার জৌলুষ-লাগা মানুষ। বনেদী বলতে কিছু নেই!

বনেদী! পিনাকী বা বনেদী-আনার কী রাখল? বাপ-পিতামহর বাড়ি যেদিন বেচে দিয়েছে সেদিনই বনেদী-আনার সব গেছে তার। তারপর এ-অঞ্চলে আসা! আসবে প্রদ্যোৎ মল্লিক বাড়ির সব-ক'খানা ইঁট খসে পড়লেও? শহরতলিতে বাগান-বাড়িই হত, ভদ্রাসন নয়। যোধপুর ক্লাবও সায়েবদের বাগানবাড়ি ছাড়া আর কী ছিল? এখন দিশি-সায়েবদের হালের বাবুদের বসতবাটী হচ্ছে!

এ-ধরনের চিন্তায় মনে ধিক্কার আসতে পারত পিনাকীর কিন্তু তা আসে না। এ-ও যেন হবার ছিল, তাই হয়েছে। শোভাবাজার থেকে উঠে গড়িয়াহাট আসা। তারপর যদি জজবাবুর বাড়ির মতো বাগান-উঠোনছুট রাস্তা-ঘেঁষা বাড়িতেও যেতে হয় তাতেও তার দুঃখ হবে না। পিনাকী জেনে রেখেছে যা হয় তাকে বাধা দিয়ে রোখা যায় না। এই যে যুদ্ধ হল, চেম্বারলেন তা রুখতে পেরেছিলেন, কতো তো চেষ্টা যুদ্ধ যাতে না হয়! মাধুরী হাত বাড়ায়—রুখতে চায়! কী বোকা! ওর বাপের ঘর কুলীন কায়েত, কিন্তু কাজকর্মে বেণে হয়ে গেছে! বেণে! চাঁদবেণে পেরেছিল লক্ষ্মীন্দরকে বাঁচতে? রেখেছিল তো তাকে লোহার ঘরে!

যোধপুর পার্কে যাওয়া বন্ধ করে যখন পিনাকী লেকে যাওয়ার কথা ভাবছিল, তেমন একদিনে জজবাবু লেকে যাওয়া বন্ধ করে পিনাকীর কাছারী ঘরে এসে ঢুকলেন। আবার নিমন্ত্রণ নাকি? একটু বিমূঢ়-মতোই দেখালে পিনাকী। না। তা নয়। আসার কারণ জানিয়েই জজবাবু ঘরের দু'টি চেয়ারের একটিতে বসলেন। ভাগ্যিস, ফরাস তখন ছিল না—তার জায়গায় দুটো চেয়ার এসেছিল। বসিয়েছিল মাধুরীই। নইলে শুধু গদীআঁটা তক্তপোষেই পিনাকীর চলে যেতো।

—আপনার এখানেই এলাম দেববাবু—লেকেই যেতাম বিকেলটায়—এখন আর হাঁটতে পারিনে ততোটা, হাঁপিয়ে উঠি! বৃদ্ধ বললেন।

—আমি তো প্রায় বেরোই নে—তক্তপোষে বসেই বললে পিনাকী,—আপনি এলে তবু বেশ গল্প হবে!

—হ্যাঁ—লম্বা টানে সম্মতি জানালেন জজবাবু—কাজের অযোগ্য যখন হয়ে গেছি,

তখন গল্প-সল্প করা ছাড়া আর কীই বা করবার আছে?

কোনো কমিশনে যে ডাক আসছে না জজবাবুর, তা বুঝে নিতে দেরি হল না পিনাকীর কিন্তু সে-অপ্রীতিকর ব্যাপারটা নিয়ে যে পিনাকী আলাপ শুরু করবে না তা-ও সে তখুনি জানে। বললে,—আপনার মুখে গল্প শোনা তো সৌভাগ্যের ব্যাপার!

—হ্যাঁ, এবার হ্রস্বীকৃত করলেন জজবাবু তাঁর গলার টান। —বলতেও পারেন—বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে আমার। পুরনো দিন থেকে রস নিংড়ানো ছাড়া আর কী করতে পারি আমরা? যেমনি আপনি, আমিও।

—না-না, আমি না। হাসল পিনাকী,—আমার আর কী থাকতে পারে, বলুন। ওই যা বলছেন বাপ-পিতাম'র হয়তো কিছু ছিল!

—ও, নিশ্চয়! ভুরু কপালে তুলে মাথা নাড়লেন জজবাবু, তাঁরা ছিলেন, যাকে বলে পুরুষসিংহ! নীল-কুঠিয়ালদের সঙ্গে লড়লেন কারা? আমার মামাবাড়ি বারোদী। ছেলে-বেলায় শুনেছি ওখানকার জমিদাররা নিজহাতে লাঠি ধরে ধলেশ্বরী-শীতললক্ষ্যার পাড়ে যতো নীলকুঠি ছিল সব ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছিলেন!

—বাবা বলতেন বটে তিতুমীরের কথা। ওই পালোয়ানকে যশোরের কোন্ জমিদার-বাবু না কি পুষ্যিই নিয়েছিলেন নীল-কুঠিয়ালদের ঠেঙাবার জন্যে! পিনাকী একই রকম হাসি ধরে রাখল ঠোঁটে।

ভৃত্য শম্ভু এসে উঁকি দিয়ে দেখে গেল, বাবু কার সঙ্গে কথা বলছেন।

গল্পে প্রায় জমে গেলেন জজবাবু,—শুধু কি তা-ই? গোটা জীবনটার উপরই থাবা ছিল তাঁদের—দান-ধ্যান যেম্নি আমোদ-আহ্লাদ, শখ-শৌখীনতা তেম্নি! আর ক্ষমা? এতো আমার চোখে দেখা! লাটে উঠেছে কতো জমিদারি—সানসেট ল'তে—হয়তো অনেক সময় নায়েবেরই চক্রান্তে। কিন্তু নায়েবের গায়ে একটি টোকা দিয়েছেন কোনো জমিদার?

খবরের কাগজের খবরের মতোই পিনাকীর জানা ছিল, তাদের আবাদেরই কোন্ নায়েব নাকি বারুইপুরে মস্ত পাকা-বাড়ি করেছেন, জমিজমার তো কথাই নেই—কথাটা মনে এলেও ঠোঁট থেকে তার হাসি মুছল না কিম্বা সে-কথা আলাপে আনল না, বললে,—আপনার কি পুব-বাংলায় বাড়ি? পুব-বাংলার অনেক জমিদারিই হাতবদল হয়েছে। বাবা বলতেন, সানসেট ল'র দরুনই। কলকাতার বাবুরা কিনে নিয়েছেন।

—ওদিককার মহাল তো ভালো। দু-ফসলা জমি। আর পুব-বাংলা! নীচু হয়ে জজবাবু চাঁদির পালিশটা দেখালেন, নিজে কী দেখলেন বোঝা গেল না। জুতোর পালিশ না মেঝেতে বিছানো বাংলাদেশের মানচিত্র। একটু থেমে সনিঃশ্বাসে বললেন,—জন্মভূমি পূর্ব-বাংলাতেই। প্রধানমন্ত্রী তো নই, তার উপর দাবী জানাব কী করে?

কথাটার অর্থ হয়তো ঠিক ধরতে পারল না পিনাকী। তবে যা ধরবার সে ধরে নিলে: জজবাবু বাঙাল। কিন্তু সে তো রাজনীতি করেনি, খেলার মাঠেও যায়নি কিম্বা চাকরিরও উমেদার ছিল না কোনোদিন তা-ই বাঙাল-সম্পর্কে কোনো বিরাগ তার ছিল না। অনুরাগ যে ছিল তা-ও নয়। কলেজ-দিনে অনেক বাঙাল ছেলের সঙ্গে সে পড়েছে, হয়তো হেসেও কাউকে বলেছে,—ক'ঘণ্টা পড়িস, বাঙাল? ষোল, না কুড়ি? কিম্বা,—তোদের মনোরঞ্জন ভটচায লোক হাসালে রে—মুখ দিয়ে 'কেন' বেরুচ্ছে না—বেরিয়ে গেছে 'ক্যান'! কিন্তু সব-কিছুই ছিল ভাসা-ভাসা, ভেতরের কিছু নয় বা ভেতরে রাখবার কিছু নয়। এমনকি, ফজলুল হকের প্রজাস্বত্ব আইনও না।

জজবাবুর কথাও তেমনি শুনে যাচ্ছিল পিনাকী, যেন হঠাৎ-হাওয়া গায়ে মাখাচ্ছিল। উপভোগের কিছুই নেই, বিরক্তিরও কিছু না।

বললে,—পূব-পাকিস্তানে এখনো বাড়িঘর আছে নাকি আপনার?

—আমি তো মুন্সেফির দিন থেকেই যাযাবর। ভাইরা ছিলেন পৈতৃকভিটায়—কবেই বিক্রি-টিক্রি হয়ে গেছে—পাকিস্তান হবার আগেই।

মজা না পেয়েই বললে পিনাকী,—মজা দেখেছেন—কেউ আর আজকাল কোথাও স্থির নয়—সবাই উদ্বাস্তু।

রুপোর রেকাবি ভর্তি মিষ্টি নিয়ে এলো শম্ভু, খাগরাই গ্লাসে জল। কিন্তু কোথায় রাখবে জজবাবুর আপ্যায়নের এই সাজ-সরঞ্জাম? মা তো বলে দেননি। ইতস্তত করতে লাগল সে।

—এ কী ব্যাপার! আঁৎকে উঠলেন জজবাবু,—আমার জন্যে না কি? ব্লাডপ্রেশারের রোগী, ডাক্তারের নির্দেশে পথ্য আমার।

—খাবার। বিমূঢ় হল পিনাকী, উঠে দাঁড়াল, ভৃত্যের হাত থেকে রেকাবি আর গ্লাস নিজের হাতে নিয়ে বললে: মেয়েরা পাঠিয়েছেন। তারপর শম্ভুকে,—যাও, একটা টিপয় নিয়ে এসো!

—মেয়েরা পাঠিয়েছেন! স্তিমিত প্রতিধ্বনি শোনালেন জজবাবু তারপর ভাঁজে-ভাঁজে হাসির রেখা ফুটে উঠল তাঁর সমস্ত মুখে,—সেকেলে মেয়েরা এখনো আছেন বলে ঘর-বাড়ি আর আমাদের মতো বুড়োরা টিকে আছি! তা বলতেই হবে!

—বিচারকের বিচারই তো আমাদের শিরোধার্য! লুপ্ত হাসি ফিরে এলো আবার পিনাকীর ঠোঁটে।

—আর বিচারক! বাইরেই সে-শোভা, দেববাবু, ভেতরে নয়!

সৌজন্যবোধেই পিনাকী বিস্মিত দেখালে, কোনো অভিজ্ঞতায় বা অনুভবে নয়,—সে কী! আপনি তো একটি সোনার সংসার তৈরী করছেন! সেদিন দেখে এলেম!

অনাবশ্যক জোরে হেসে উঠলেন জজবাবু,—সোনার সংসার! সত্যি তা-ই। অলঙ্কারের চাহিদা কী ভয়ানক বেড়ে গেছে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন—ফোর্টিন ক্যারেটের বাঁধও মানছে না!

টিপয়ে খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল শম্ভু।

তক্তপোষে ঢিলেঢালা হয়ে বসে পিনাকী বললে,—তার মানে আমরা সেকেলেই রয়ে গেছি!

রেকাবিতে তাকিয়ে জজবাবু বললেন,—নইলে এতো মিষ্টি একালে কেউ হাজির করে?

খাবারে মন দিলেন জজবাবু। অতিথি-সেবার তৃপ্তিতে পিনাকীর মুখে একটা চরিত্র ফুটে উঠল, যা তার মুখে স্বভাবতই নেই।

খাবার শেষেও পনেরো-কুড়ি মিনিট আলাপ হল। সবই পারিবারিক আলাপ। দুলু-বুলুর শিক্ষা নিয়ে জজবাবু উৎসাহ দেখালেন, ফলে জজবাবুর ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনীর খবরে উৎসুক দেখালে পিনাকী। সবই ভদ্রতার বিনিময়। আলাপের শেষে যে কেউ কাউকে মনে রাখবে না তা জেনেই যেন এ হৃদ্যতা। জজবাবুকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে পিনাকী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এমনই ক্লান্ত হয়েছিল সে যে মাধুরী এসে যখন জজবাবুর খবর জিজ্ঞেস করল তখনও তার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না।

কিন্তু তার পর থেকে কথা বলতে জজবাবু বিকেলবেলা নিয়মিতভাবে আসতে

লাগলেন। এবং রক্তের চাপ উঁচুতে উঠে কালেভদ্রে শয্যাশায়ী থাকলে লোক পাঠিয়ে পিনাকীকে তাঁর বাড়িতে ধরে নিয়ে যেতে লাগলেন। যার একমাত্র মানে, পিনাকী জজবাবুকে ভুলতে চাইলেও, জজবাবু তাকে মনে রেখেছেন। যোধপুর-পার্কের সুগন্ধি পদ্মবিভূষণকেও সে-সূত্রেই আরেকদিন পাওয়া গেল—জজবাবুর শয্যাপার্শ্বে। নাম জানা হল: সুমিত্র উপাধ্যায়। ব্রাহ্মণ। চিরকালই রাজ-অনুগ্রহে পালিত—ভাবলে পিনাকী। আর, এখনকার রাজা বলতে কি আর তাদের মতো রাজন্যের অপভ্রংশ? রাজা বাগবাজারের বাক্যবাগীশরা কিম্বা ক্রিকেট-মাঠের খেলোয়াড়রা কিম্বা সিনেমার সুপুরুষরা। আর তো সব মন্ত্রী-উপমন্ত্রী-পাইক-বরকন্দাজ! সুমিত্র উপাধ্যায়কে নিয়ে দুচার কথা ভাবলে মাত্র পিনাকী, একটি কথাও বললে না, তাই আলাপ-পরিচয় হল না। যদিও পিনাকীর পরিচয় জেনে সুমিত্র বলেছিল, আমাকে সেকালের অগ্নিশর্মা উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের কেউ বলে ভেবে বসবেন না—আমি নেহাৎ-ই জল, নূপ-কূপ-সমুদ্রের যে-জলই ভাবুন! তবু সুমিত্রকে জলচর বলে মনে হল না পিনাকীর। সেদিন জজবাবুর প্রেশারটা মাত্র জেনে বিদায় নিলে পিনাকী। চা সে কারো বাড়িতেই খায় না—জজবাবুর বাড়িতেও না। তবু অন্যদিন এক গ্লাস জল খেতো। সেদিন তা-ও না।

পশ্চিমে গড়িয়াহাট রোড, সেখান থেকে গেট-বরাবর রাস্তা ঢুকে পিনাকীর দশবিঘেকে উত্তরে-দক্ষিণে পাঁচ-পাঁচ বিঘেতে ভাগ করে দিয়েছে। দক্ষিণে বাগান, উত্তরে বাড়ি। সেনি-টারি পায়খানায় পাঁচ বিঘে অন্তত দরকার—তাছাড়া বালিগঞ্জের বাঙালদের মতো দু'বিঘে আড়াই বিঘেতে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে সে রাজিও নয়। দক্ষিণের খোলামেলা থেকে প্রচুর হাওয়া আসে—তাই ফ্যান ঝুলাতেও পিনাকী ইতস্তত করেছিল। মাধুরী জেদ ধরে ঝুলিয়েছে। ছেলেবেলা থেকে ফ্যানের হাওয়াতেই সে মানুষ, কাজেই পিনাকীর হাড়ে জমিদারি হাওয়া লক্ষ্য করে বলেছিল,—বিজলিবাতি হবার পরও তো ও-বাড়িতে তুমি ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলিয়ে রেখেছিলে, টানা-পাখাতেই তুমি বোধহয় খুশী! পিনাকী হেসেই উত্তর দিয়েছে,—ঝাড়-লণ্ঠনের শোভার কাছে বিজলিবাতির ডোম! 'ডোম্'-কথাটায় জোর দিয়ে সে বোঝাতে চেয়েছিল, ওটা হাঁড়ি-ডোমের মতোই অপাংক্তেয়।

দুপুরবেলা কাছারী ঘরেই শোয় পিনাকী কিন্তু ফ্যান ছাড়ে না। এই গ্রীষ্মেও। বাগানের হাওয়ার উপর আবার হাওয়া আছে না কি! কর্তারা বাগান-বাড়ি করতেন সাধে? অবশ্য ইটালিয়ান নগ্ন-মূর্তিগুলোকে সে কোনো দিনই পছন্দ করতে পারেনি। ও শ্বেত-পাথরে বরং মেঝে তৈরী হলে ভালো ছিল, ভাবত সে।

রেডিয়োর বেলায় কিন্তু মাধুরীর ইচ্ছা টেঁকেনি। দুপুর-ঘুমে বসুমতী সাহিত্য-মন্দির সহায়ক না হলে রেডিয়োটা মন্দ ছিল না। কিন্তু পিনাকী মাথা নেড়ে বললে, —বাবার আমলেও তো ওস্তাদদের আসর বসত বাড়িতে, শুনেছ—তাঁর আগে নাকি কর্তারা বাড়িতেই ওস্তাদ পুষতেন—কোথায় সে আসর আর তোমাদের এখনকার অনুরোধের আসর! বলিহারি, কে যে ও'দের গাইতে অনুরোধ করে! মাধুরী অবশ্যি ভেবেছে অন্যকথা—রেডিয়ো এনেছ তো ছেলেদের পড়াশুনো শিকেয় উঠেছে। বাপের বাড়িতে ত্রিসন্ধ্যা রেডিয়োই শুনেছে মাধুরী, পড়াশুনো যে কারো বেশি হয়নি তা সে জানে! নিজেদের পাপ ছেলেরাও করুক, এ আর কে চায়? তাই রেডিয়োর যন্ত্রণা নেই পিনাকীর বাড়িতে।

জ্যৈষ্ঠের দুপুরে নিরিবিলি বেশ ঘুমুচ্ছিল সেদিন পিনাকী। দিনটা যে একটা ঐতিহাসিক দিন হয়ে উঠবে কে জানত? খবরের কাগজে ক্লান্তিকর কাশ্মীর ছাড়া কিছু

নেই। পিনাকী খবরের কাগজে মুখ ঢেকেই ঘুমোচ্ছিল আর-আর দিনের মতো। বাজারে চাল-তেল-চিনি-মাছ পাওয়া না গেলে উদ্বেগে মাধুরীর ঘুম নষ্ট হয় ঠিকই—কারণ ওগুলো তার পক্ষে উত্তেজক খবর। পয়সার অভাব থাকলে ও খবরে সুখী হওয়া যায় কিন্তু মাধুরীর পয়সার অভাব কী? হাতখরচের জন্যে বাবা তার নামে মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে একটা বাড়ি লিখে দিয়েছেন। ভাড়া থেকে একগুষ্টির হাতখরচ চলতে পারে। অবশ্যি সে-পয়সায় পিনাকীর বিন্দুমাত্রও লোভ নেই—এমন কি ভাড়াটে তুলে দিয়ে সে-বাড়িতে যেতেও সে রাজি হয়নি। যার যা প্রাপ্য, সে নেবে—এই সে বুঝে এসেছে। এমন আলাদা বোঝার ফলেই সংসারের খবরও তার খবর নয়—ওটা মাধুরীরই এলাকার—যেমনি কাশ্মীর পণ্ডিত জওহর-লালের এলাকার। যার কাজ তার সাজে। পিনাকীর ওতে নাক ঢুকিয়ে কী লাভ?

কাজেই নাক দিয়ে দিব্যি শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছিল পিনাকীর, এই জ্যৈষ্ঠের দুপুরেও, বাজার-খারাপের দিনেও, কাশ্মীর-আলাপের সময়েও। কিন্তু ঘণ্টা খানেকের বেশি নয়। ডাকাডাকিতে ধড়ফড় করে উঠে বসল সে। জজবাবু! বোঝা যাচ্ছিল, ছুটে এসেছেন তিনি। এবং চেঁচিয়ে ডেকেছেন। ফলে হয়তো প্রেশারেই এখন চেয়ারে বসে হাঁপাচ্ছেন!

পিনাকীকে উঠে বসতে দেখেই হাঁপের মাঝে-মাঝে তিনটে শব্দ বার করলেন জজবাবু মুখ থেকে,—জওহরলাল মারা গেছেন!

গান্ধীজির মৃত্যু-সংবাদে না কি তিনটে গুলির শব্দ শুনেছিলেন কেউ-কেউ, পিনাকী কান পেতে তেমনি বোধহয় কিছু শুনছিল বা শুনতে চাচ্ছিল। কিন্তু 'মারা গেছেন'-এর বেশি কিছু শুনল না। বললে,—মারা গেছেন? কে বললে?

—এই তো মাত্র রেডিয়োতে খবর শুনে ছুটে এলাম আপনার কাছে! জজবাবুর মুখে যন্ত্রণা ছিল। সে কি ছুটে আসার দরুন রক্তের চাপে না জওহরলালের মৃত্যু-সংবাদে বোঝা গেল না।

—তবে তো মিথ্যে নয়। পিনাকী বললে।

—মিথ্যে হবে কেন? ভুবনেশ্বর থেকেই তো শরীর খারাপ চলছিল—আবার বোম্বে! তামাম শোধ। শেষ হল! দেয়ালে নয়, মেঝেতে কী যেন পড়তে শুরু করলেন জজবাবু।

—তাহলে তো টেলিগ্রাফ বেরিয়েছে—শুনছিনা তো হল্লা!

—এ মুল্লুকে আসতেও তো দেরি! টেলিগ্রাফেও বা কী আর বেশি খবর থাকবে? সকালেই অ্যাটাক্ হয়েছিল—ডাক্তাররা ভরসা দেননি।

এবার যেন স্পষ্ট বুঝতে পারল পিনাকী, ও-ধরনের একটা অ্যাটাকের ভয়েই জজবাবুর মুখে যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। জওহরলালের মৃত্যুতে নিজের মৃত্যুর ছায়াই দেখতে পাচ্ছেন জজবাবু। তাই খুবই উদাসীনতায় বললে পিনাকী, বলতে হয় একরকম ভালোই গেলেন, যাকে বলে হারনেসে যাওয়া। অনেকে তো ওঁর পদত্যাগ চেয়েছিলেন।

—দেখবেন, তারাই এখন বেশি চেঁচিয়ে কাঁদবে! এদেশের দস্তুরই, মশাই, তা-ই। এবারেও দেয়ালে নয়, বাইরে তাকালেন জজবাবু—মেঝের পাঠ সমাপ্ত করে।

—হুঁ। কোনো মন্তব্যে যেতে চাইল না পিনাকী।

জজবাবু পিনাকীর মুখে চোখ আনলেন। যেন মেঝের লেখা শোনাতেই বললেন তিনি,—আর যা-ই করুন না করুন জওহরলাল—স্বাধীনতার ভিত্তিটা আমাদের তৈরী করে দিয়ে গেলেন।

নীরবে উঠে দাঁড়াল পিনাকী, হয়তো চোখমুখে জল দেবার জন্যে।

দুই

দেববাবুর সঙ্গে আলাপটা ঠিক জমল না। চারটে নাগাদ জজবাবু বেরিয়ে এলেন সে বাড়ি থেকে। রাস্তায় একটু দাঁড়ালেন। বাস-বোঝাই অফিস-ফেরতা লোক। সুব্রতও হয়তো আসবে এক্ষণি, বা এসেই গেছে। বাড়ি ফিরেই হয়তো গ্যারেজে গাড়িটা দেখতে পাবেন। অফিস-পাড়ার খবর তার কাছেই পাওয়া যাবে। তবু দাঁড়ালেন জজবাবু। খবরের জন্যেই। খবরের কাগজের স্পেশ্যাল নাম্বার তো নিশ্চয়ই বেরিয়েছে। দক্ষিণমুখো পায়ে-হাঁটা এক ভদ্রলোককে পেয়ে উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেসও করলেন, ও মশাই, শুনুন—কাগজ-টাগজ বেরিয়েছে—দেখে এলেন কিছু?

বিষণ্ণের চাইতে বিরক্তই দেখাচ্ছিলেন ভদ্রলোক বেশি, হয়তো এই অসময়ে বাসে ভীড়ের জন্যেই বিরক্তি। তিনি দাঁড়ালেন। বললেন,—দেখিনি আবার! লেবেল ক্রসিং কি পার হতে পারল হকার? নেকড়ের মতো সব লোক লাফিয়ে পড়ে ওর কাগজ লুটে-পুটে নিয়ে গেল!

—বলেন কী? বলেই জজবাবু হাঁটতে শুরু করলেন। খবর যা আছে তা যে জোর খবর না হয়ে যায় না তা ভেবেই জোরকদম দিলেন তিনি পায়ে। বেশিদূর তো নয়। দেববাবুর বাগানের দেয়াল পেরোলেই গলি, গলির গা-ঘেঁষে গড়িয়াহাটার উপরেই তার দোতলা।

দোতলার ডানদিকে গ্যারেজ—একটা মাত্র নিমগাছের আড়াল। নিমগাছের হাওয়া ভালো, গ্যারেজের হাওয়া যদি দূষিতও হয়। বিচারে খুঁত নেই জজবাবুর। গ্যারেজ থেকে গড়িয়াহাটা পর্যন্ত চওড়া রাস্তা—মোটরেরও, বাড়ি ঢুকবারও। রাস্তার পাশে দোতলার সামনে কয়েক-হাত মাত্র লন। টবের বাগান সাজানো বাড়ির দিকটায় আর দেয়াল বা রাস্তার দিকে মাধবী-লতা, মে-ফ্লাওয়ার বা বোগান ভিলি নয় যা হাল-আমলের ফ্যাশন।

ওইটুকু লনেই বেতের চেয়ার নিয়ে বসবেন এখন জজবাবু। সুব্রতকে ডাকবেন। বড়ো ছেলে। বিনয়ী, অমায়িক। পেশার দরুন যতোটা হতে হয়। এখন মস্ত এক লৌহ-ইস্পাত-প্রতিষ্ঠানের পি-আর-ও সে। বিদেশ থেকে এঞ্জিনীয়ারিং ও কোম্পানী ম্যানেজমেণ্ট শিখে এসে দেশে কয়েকদিন সাহিত্য-চর্চা করেছে। তারই সুফলে এবং পিতৃ-সুকৃতিতেই তার এই চাকরি। বন্ধুবর পদ্মবিভূষণ অবশ্যি 'পি-আর-ও'-কে সাহিত্যিক ভূষণে উপস্থিত করে তাকে 'প্রিয়'-নামে ডাকে কিন্তু ওটাই বোধহয় সুব্রতর খাঁটি পরিচয়। নামটা প্রিয়ব্রত হলেই মানাত বেশি। জজবাবুর কাছেও সে ততোটুকুই প্রিয় রাজা দশরথের নিকট রামচন্দ্র যতোটা ছিল। পিতা শাঁসালো হলে সন্তান পিতৃভক্ত হয়—এ-কথাটা সমাজতান্ত্রিকদের রটনা ছাড়া তো কিছু নয়—ভক্তি ভক্তিই, জজবাবু মনে বিচার করে দেখেছেন। রামপ্রসাদকে কালী এমন কী জমিদারী দিয়েছিলেন, বরং কালিভক্তির জন্যে জমিদারি-সেরেস্তায় তাঁর চাকরি গেল কিন্তু রামপ্রসাদের মতো ভক্ত ক'টা হয়? ছোট ছেলে সুপ্রিয়ই তো আলাদা ধাতের। উচ্ছৃঙ্খলের মতো কঠোর একটা কথা অবশ্য তিনি ব্যবহার করেন না, কিন্তু তাকে তো তিনি বিয়ে করিয়েছিলেন নেহাৎ-ই প্রয়োজন-বোধে। নইলে বিচারশীল হয়ে তিনি বেকারের বিয়েতে সম্মতি দেবেন কেন?

যা ভেবেছিলেন জজবাবু, ঠিক তা-ই। গ্যারেজেই আছে গাড়ি। ধূম দেখলে যেমন পর্বতকে বহ্নিমান মনে করতে হয় সেই অনুমান-প্রমাণে নির্ভর করে তিনি 'সুবু, সুবু'-ডাকতে ডাকতে বাড়ির এলাকায় গিয়ে ঢুকলেন।

গরমেও এ-বাড়ির কেউ উদোম থাকে না—তাপমাত্রা যতো ডিগ্রিতেই উঠুক। পাজামা-

গেঞ্জি আর হলদে-স্ট্র্যাপের হাওয়াই স্যান্ডেলে সুব্রত বারান্দায় এলো। মুখে আশঙ্কা। বুকে-বা পিঠে ব্যথা শুরু হল না কি বাবার? এমনি ডাকছেন কেন? আর গিয়েছিলেনও বা কোথায়? এই তো সেদিন সচ্চিৎবাবু—যাঁকে বাবা বীমা-বাবু বলেন, লেক থেকে বেড়িয়ে আসতে কেমন ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসেছিলেন। মেঘ করেছিল। কাল-বোশেখী আসবে ভেবে দিশেহারা হয়ে ছুটছিলেন। বৌদ্ধ-মন্দিরের কাছাকাছি এসে থুবড়ে পড়ে গেলেন। ভাগ্যিস, মাইল্ড অ্যাটাক—নইলে তো সেদিনই গিয়েছিলেন। বাবা? প্রেশার বেড়েছে নিশ্চয়ই। আর, এ-খবরে প্রেশারের রোগীর তো প্রেশার বাড়বেই। শ্রীযুক্ত সেন নাকি পনেরো মিনিট কথাই বলতে পারেন নি। তিনিও তো হাসপাতালেরই রোগী!

বারান্দার ডান-পাশের দু'ধাপ সিঁড়িতে এসে বাবাকে সম্পূর্ণ দেখতে পেল সুব্রত। জজবাবু তখন সিঁড়ির গোড়ায় প্রায় এসে গেছেন। সুব্রত জিজ্ঞেস করলে,—আমাকে ডাকলেন, বাবা?

—ডাকছিলাম। ভাবতে-ভাবতে এসেছি, এতোক্ষণে হয়তো তোমাদের অফিস-ছুটি হয়ে গেছে। বারান্দায় এলেন জজবাবু তারপর বসবার ঘরে এবং তারপরও শোবার ঘরে।

সুব্রত পেছন-পেছন এসে বাবার শোবার ঘরের দরজায় থামল। জজবাবুর সুস্থ চলার ভঙ্গীতে যতোটা আশ্বস্ত হয়েছিল সে এখন ততোটাই শঙ্কিত হল। বললে,—আপনার শরীর কি খারাপ করেছে?

গা থেকে কেম্ব্রিকের পাতলা কোটটা সরিয়ে নিচ্ছিলেন জজবাবু,—নাঃ। বললেন তিনি,—সুরেনকে দুটো চেয়ার দিতে বলো, লনে।

ভৃত্যের উপর এ-আদেশের মানে বুঝতে দেরি হয় না সুব্রতর। সুরেনের খোঁজে সে চলে যায়। সুরেন কী কাজে বাইরে গেছে। অগত্যা সুব্রতই হালকা দুটো বেতের চেয়ার দু'হাতে তুলে নিয়ে যায় বসবার ঘর থেকে লনে। এবং একটাতে বসে বাবার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। এখন তাকে বাবার কোর্টের উকিলের ভূমিকা নিয়ে অনর্গল বকে যেতে হবে, বিচারপতি শ্রোতার ভূমিকায় দু'-একটা 'কী' 'কেন' মাত্র উচ্চারণ করবেন। এ-প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার। অফিস-পাড়ার খবর না শুনলে বাবার চলে না। আর আজ তো বিশেষ। কোন্ প্রশ্ন নিয়ে এসে বাবা বসেন তা-ই ভাবছিল এখন সুব্রত। তার উপরই সুব্রতর কথার দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। ঘরে-বাইরে, যখনই সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, বাবা জওহরলাল সম্পর্কে তাঁর উঁচু ধারণাটা উঁচু গলায়ই প্রকাশ করে এসেছেন কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ বা মেঘনাদ সাহা জীবিত থাকতে তাঁদের দু'-একটা মন্তব্যে, নেহাৎ-ই নিজের শোবার ঘরে, সমর্থন না জানিয়ে পারেন নি। তা মাত্র দৈবাৎ এবং একা সুব্রতরই সামনে। তাকে নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

শাদা চটি, শাদা ধুতি, শাদা ফতুয়ায় শুভ্রকেশ জজবাবু সবুজ লনে নেমে এলেন। পদ্মবিভূষণ সুমিত্র উপাধ্যায় আড্ডায় উপস্থিত থাকলে শ্বেত-সবুজের যোগাযোগ লক্ষ্য করে বলতে পারতেন—সত্তুর পেরিয়েও জওহরলাল তরুণ কবির কবিতা পড়তেন। সাহিত্য-চর্চা এককালে করে থাকলেও সুব্রত এ-ধরনের কথা ভাবতে পারল না। তার ভাবনায় বাবার সম্ভাবিত প্রথম প্রশ্নটাই পাক খাচ্ছিল।

চেয়ারে না এসে কোনো কথাই বললেন না জজবাবু। যে-কোনো উপায়েই হোক তিনি প্রাথমিক উত্তেজনার উপশম করে এসেছেন। যখন কথা বললেন, বললেন,—কী দেখে এলে তোমাদের ওদিকে?

—অফিস-ছুটির পর ছোট-ছোট জটলা। বাড়ি যাবার তেমন তাগিদ যেন কারো নেই। চৌরঙ্গী প্রায় চুপচাপ—ভীড় কম। কিন্তু স্টেটস্‌ম্যান অফিসের সামনে মস্ত ভীড়—খবর সংগ্রহের জন্যে! মোটর-যাত্রীর পক্ষে এর চাইতে বেশিকিছু বলা সম্ভবপর নয়।

—কী বলাবলি করছে লোকজন? শোকের তেমন ছায়া পড়েছে গান্ধীজি মারা যাবার পর যেমনটা হয়েছিল? সতেরো বছর আগেকার একটা বিকেল মনে আনতে চেষ্টা করলেন জজবাবু, যখন তিনি আলিপুরের বিচারপতি।

কিন্তু সুব্রত লক্ষ্য করছিল, বিচারপতির মনোভঙ্গী আজ আর নেই যেন বাবার, তেমন নির্বিকার শ্রোতা আজ আর নন তিনি। যেন বিপক্ষ-পক্ষের উকিল। সওয়াল-জবাব চলেছে। বললে সে,—অফিস-টফিসের শিক্ষিত ছেলেরা তো ভালোবাসতেন জওহরলালকে —তাঁদের চিন্তা : এর পর কী হবে! সুব্রত করিডরে বা সিঁড়িতে সহকারীদের মুখে যে দু'একটা কথা শুনেছিল, তাই স্মরণে এনে বললে।

—কী আর হবে! নৈরাশ্য নয় খানিকটা চ্যালেঞ্জই যেন শোনাল জজবাবুর কথায়।

—জওহরলালের স্ট্যাচারের কেউ নেই কি না, তাই।

—গান্ধীজির স্ট্যাচারের কেউ ছিলেন? তার পর কি দেশ ডুবে গেছে?

—গান্ধীজির ভারত তো নিশ্চয়ই ছিল না! সুব্রতর ঠোঁটে হাসির আভাস ফুটে উঠল।

—এখন তাহলে জওহরলালের ভারত আর থাকবে না। কী ক্ষতি?

—ক্ষতি নেই। সময় তো বদলাচ্ছেই।

এখানে এসে ছেলের সঙ্গে একমত হয়ে জজবাবু চুপ করলেন। বিচারপতির গাম্ভীর্য ফিরে এল তাঁর মুখে। এবার যেন 'রায়ে'র কথা চিন্তা করছেন।

শ্বেত-পাথরের গ্লাশে মিশ্রির সরবত নিয়ে সুব্রতর ছোট মেয়ে মহুয়া লনে নেমে এলো। এখনো ছুঁচো-মুখ পাম্পশুতে নয়, বাটার হালকা চপ্পলে, গোল্ডেন-ইয়্যালো ফ্রকে এই একদশীকে ফুল না প্রজাপতির মতো মনে হচ্ছিল, তা-ও পদ্মবিভূষণ উপস্থিত থাকলে বলতে পারতেন।

লেক-বেড়িয়ে এসে বাবা মিশ্রির সরবত খান। মা মারা যাবার পর থেকে মহুয়ারই হাতে, তা জানে সুব্রত। বাবার এই দৈনন্দিন পানীয়ে ঔৎসুক্য না দেখালেও তার চলে। কিন্তু উৎসুক হল সুব্রত,—মা করে দিয়েছেন তো? জিজ্ঞেস করল মেয়েকে।

—বাঃ, মা করবেন না তো কে? মহুয়া স্কুলে-শেখা নাচের একটা ভঙ্গী তুললে শরীরে।

সুরেন ফিরে এলেও সুরেনের তৈরী সরবত যে বাবা খান না, তাও জানে সুব্রত। তবু তার এই অহেতুক প্রশ্ন। অহেতুক? সুব্রত বোধহয় মনে করে না এ-ধরনের প্রশ্ন অহেতুক। মা মারা যাবার পর বাবার স্বাস্থ্যের খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবনা-চিন্তার দায়িত্ব বড়ো ছেলে হিসেবে তার উপরই বর্তেছে। মানে, সে তা গছে নিয়েছে। নিতে পারত মনিকাও—তার স্ত্রী এবং নতুন গৃহকর্ত্রী। কিন্তু মনিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করবার যোগ্যতা যতোই থাক্‌, মার আসনে অধিষ্ঠিত হবার যোগ্যতা যে নেই তা সুব্রত বিলক্ষণ জানত। স্ত্রৈণের কাছেও বোধহয় স্ত্রী মার আসন পায় না। সুব্রত স্ত্রৈণ হোক্‌ বা না হোক—সে-কথায় না গিয়েও বলা যায়।

কিন্তু মনিকার সরবত-তৈরীতেও যে জজবাবু খুব খুশী, তাঁর কথায় মনে হল না। মহুয়ার হাত থেকে সস্নেহে গ্লাশটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন তিনি,—তুমি যে করবে

সরবত তৈরী করবে—তাই ভাবছি!

—আমি? আমি করবই না। এক-জায়গায় দাঁড়িয়েই নেচে উঠল মহুয়া।

ওর এ-ধরনের সোজা সরাসরি কথাগুলোর জন্যেই জজবাবু বড়ো মলুয়ার চাইতে ওকে বেশি পছন্দ করেন। মলুয়াও কথা বলে সোজা-সোজা কিন্তু কাজ করে যেন বাঁকা। মহুয়ার যে কথা সে কাজ।

হাসলেন জজবাবু,—করো না। যা করছ, তা-ই করো।

—সরবত এনে দেওয়া? সে তো আমি বলেছি—তুমি লেকের বেঞ্চিতে বসে থাকলেও, সেখানে আমি পেণছে দেব!

সুব্রতও হাসছিল। পায়রার মতো বক্‌বকমে মহুয়ার জন্যেই বাড়িটা যা-একটু সরগরম। মলুয়া তো, বলতে গেলে, বাবা-মার সঙ্গে কথাই বলে না। কোন্ দিন দেখা যাবে বোবা হয়ে গেছে। ছোট বৌ সোমা সম্পর্কে অবশ্যি এখনি কিছু বলা যায় না। হাসিমুখে চুপচাপ চলাফেরার দিনই চলেছে ওর এখনো। আর মনিকা! যখন কথা বলে জোরেই বলে আর নাগাড়েও কয়েক মিনিট কিন্তু যখন চুপ করল, তার মেয়াদ দু'দিনও হতে পারে।

খয়েরি কোলাপুরী চপ্পলে, বিনীর ব্রিক-রেড ট্রাউজারে আর বাফ্-মুর্শিদাবাদ সিল্কের শার্টে সুপ্রিয় বেরিয়ে যাচ্ছিল। একা। সুব্রত একপলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলে। মহুয়াও গা করলে না তেমন, কেননা কাকুর সঙ্গে দিদিরই ভাব বেশি। জজবাবুর নজরে পড়লেও তিনি সরবতেই মনেযোগ দেখালেন।

মহুয়া গ্লাশের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। তাই আলাপ স্থগিত। কিন্তু মহুয়ার অনুপস্থিতিতে আবার যে আলাপ শুরু হবে তার কথাই ভাবছিল সুব্রত। সে কি ঘরোয়া না জওহরলালই আবার? ঘরোয়া আলাপ সুপ্রিয়কে কেন্দ্র করেই শুরু হয়, যার শৌখীন বেকারত্বে জজবাবু বিরক্ত। মাঝে-মাঝে মলুয়াতে তা ছড়িয়ে পড়ে। ষোড়শী মলুয়ার বিয়ের জন্যে আশ্চর্য রকম ব্যস্ত বাবা। সে কি নিজের মৃত্যু-চিন্তায় অস্থির হয়ে, না অন্যকিছু? সুপ্রিয়র বেলায় তো বাবা শুনেছিলেন, ও নাকি গোলপার্কে কার বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছে। তেমন-কিছু সন্দেহ করছেন না তো মলুয়াকে নিয়ে? হতে পারে! ইংরেজ আমলের বিচারপতি হলে হবে কী, মনুসংহিতায় অগাধ শ্রদ্ধা!

মহুয়ার হাতে গ্লাশটা ফিরিয়ে দিয়ে জজবাবু কাপড়ের কোঁচায় মুখ মুছলেন। ছুটি পেয়ে মহুয়া হাওয়া। সুব্রত উৎকর্ণ হলো। ঘরোয়া না জওহরলাল? ভেবে স্থির করতে পারেনি কী শুনবে।

জজবাবু এবার সত্যিকারের বিচারের ফলাফল জানাবার ভঙ্গী আনলেন মুখে। চিবুক নামালেন, চোখের তারা স্থির করে বললেন,—আজ জওহরলালকে সবাই ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি বলেই স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু আমাদের বয়সী যাঁরা, তাঁরা এ-কথা ভাবতে পারিনে।

এজলাসে বসে যেন চুয়াল্লিশ কোটি ভারতবাসীকে কাঠগড়ায় দেখছিলেন জজবাবু। সুব্রত মাত্র তাদের প্রতিনিধি। বললেন তিনি একটু থেমে, থামতে হল 'রায়ে'র চরম বাক্য উচ্চারণ করবেন বলে,—আমরা সুরেন বাড়ুয্যেকে শুনেছি, শ্রীঅরবিন্দের মোকদ্দমায় রোমাঞ্চ অনুভব করেছি, বাল গঙ্গাধর তিলককে ভারতের নেতা হিসেবে প্রথম দেখতে পেয়েছি, তারপর গান্ধীজি, চিত্তরঞ্জন, চিত্তরঞ্জন আর মোতিলাল নেহেরুর মিলন, সুভাষচন্দ্র তারপর জওহরলাল। বিশের সনগুলোতে বা ত্রিশেও কে ভাবতে পেরেছিল জওহরলাল হবেন

ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা?

আসামীর প্রতিনিধি হাসিমুখে 'রায়' মেনে নিল। সুব্রত বললে,—না। তখনো সুভাষ বোসের মতো গ্ল্যামার তাঁর কোথায় ছিল?

—তবে হ্যাঁ—এবার হাসলেন জজবাবু, মনে হল একটা ব্যক্তিগত মন্তব্য করে এজলাস থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার উদ্যোগ করছেন তিনি,—তোমরা যারা বিদেশ ঘুরে-টুরে এসেছো, তাদের কাছে জওহরলালের চাইতে প্রিয় নেতা আর কেউ হতে পারেন না।

বাবার ইঙ্গিতটা যে কোন্ দিকে তা বুঝতে না পেরে একটু অপ্রতিভ হল সুব্রত। যা হলে সে চায়ের অজুহাতে বা জরুরি কোনো টেলিফোনের তাগিদ দেখিয়ে দৃশ্য থেকে বরাবরই প্রস্থান করে থাকে। কিন্তু আজ সে বসে রইল ঘরোয়া আলাপের আশায়। ঘরোয়া আলাপটা আজ সত্যিকারের জরুরি ব্যাপার। অফিস থেকে এসেই সুব্রত দেখেছিল মলুয়া সাজগোজ করে বসে আছে আর মনিকা ওকে বলছে আজ বেরোতে দেবে না। অবশ্যি একা বেরোয় না মলুয়া—সুপ্রিয়র সঙ্গেই বেরোয়। কেন যে মনিকার আজ এই জেদ তা সুব্রত ঠিক জানে না, মনিকা এখনো তা জানায় নি। বাবা যদি জেনে থাকেন—এই তাঁর সময়, যখন ঘরোয়া মামলার বিচার শুনিয়ে থাকেন। জওহরলালের মৃত্যুতে তো আর জগন্নাথের রথের চাকা থেমে থাকবে না—ভারতের ঘরে-ঘরে জীবন চলবেই. কিছুই স্তব্ধ হবে না, যার যতো প্রিয়ই হোন না তিনি।

কিন্তু যার আশায় ছিল সুব্রত, দেখা গেল তা হবার নয়। গেট পেরিয়ে পদ্মবিভূষণ সুমিত্র উপাধ্যায় এসে বাড়িতে ঢুকছে। সুমিত্র একরকম ঘরেরই মানুষ, সুব্রতর বন্ধু এবং সাহিত্যগুরু, তবু তার উপস্থিতিতে ঘরের মেয়েদের নিয়ে আলাপ যে এ-বাড়ির দস্তুর নয় তা সুমিত্র কেন, মহুয়াও জানে।

নাম-করণে জজবাবুর আশ্চর্য মৌলিকতা দেখা যাচ্ছে। যদিও তিনি বলেন, তাঁর স্কুলজীবনেই তাঁদের কোন্ শিক্ষক থেকে না কি এ-বিদ্যা শেখা তবু তার প্রয়োগ সম্প্রতি সুরু করেছেন। মলুয়াকে তিনি মার্লিন বলেন, সচ্চিদানন্দ রায়কে বীমাবাবু আর পদ্ম-বিভূষণ সুমিত্রকে, বিভীষণ নয়, 'পদ্মনাভ'! পদ্মনাভ-নামের কারণ দেখান সংস্কৃত শ্লোক আওড়ে : কবিরেব প্রজাপতি।

সে-নামেই ডেকে উঠলেন জজবাবু সুমিত্রকে। আগ্রহাতিশয্যে ভুলে গেলেন তিনি যে সুমিত্রকে 'আপনি' বলেন।

—আরে—এসো, এসো পদ্মনাভ! তোমাকেই মনে-মনে চাইছিলাম।

তখন টবের বেড়া পার হয়ে সুমিত্র লনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সুব্রত দাঁড়িয়ে বলল,—বোসো এখানে—আমি চেয়ার নিয়ে আসছি!

—সুরেন কোথায়? সুমিত্র বললে।

যেতে-যেতে হেসে বললে সুব্রত।—তোমাদের মতো কুঁড়ে মানুষ তো নই। ভৃত্যের অবর্তমানে আকাশ-ভেঙে পড়ে না মাথায়!

—কবি-ঔপন্যাসিক সবাই আলস্যের গুণগান করে গেছেন—তা জানো? যেমনি শরৎ চাটুয্যে, তেমনি হারীন চাটুয্যে! কথাটা বন্ধুর পেছনে ছুঁড়ে দিল সুমিত্র।

বন্ধু! সুমিত্রর কোন্ বয়সী বন্ধু নেই? যেমনি পঁচাত্তুরে অবসর-প্রাপ্ত জজ শশাঙ্কশেখর তার বন্ধু তেমনি তস্য পুত্র পঞ্চাশ-ছুঁয়ে-যাওয়া সুব্রতও তার বন্ধু। যদিও সুমিত্রের জন্ম এ-শতকের প্রথম বছরে, তরুণদের বন্ধুত্ব-লোভেই সে বছর-পাঁচেক কমিয়ে

তাঁর বয়েস বলে। বলে আর কী? তা-ই প্রচারিত। আধুনিক কোনো কবিতা-সঙ্কলন খুললেই দেখা যাবে—সুমিত্র উপাধ্যায় (জন্ম—১৯০৫)। কবি! মাত্র বাষট্টি সনে—চীন-যুদ্ধের সময় জানা গেল বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস লেখক এবং ঔপন্যাসিক সুমিত্র উপাধ্যায় পদ্যও লিখতে পারেন। তখন চীন-যুদ্ধ। কবিরা ক্ষেপে উঠেছেন দুর্বাক্য প্রয়োগ করে 'নেফা' থেকে চীনা সৈন্যদের তাড়াবার জন্যে! এই মওকা ছাড়বে কেন সুমিত্র? বিশেষ সে যখন পদ্মবিভূষণ, ভারতের প্রতি তার একটা কর্তব্য-বোধ নিশ্চয় আছে। এবং আনুগত্য। যদিও চল্লিশের সনগুলোতে তিনি 'জনযুদ্ধে' ভিড়ে গিয়ে 'ভারত ছাড়ো'র বিরোধিতা করেছেন—তবু পদ্মবিভূষণে বিভূষিত হতে তাকে বেগ পেতে হয়নি। তাছাড়া তখন ওই নীতি অবলম্বনে তার সুবিধেও হয়েছিল প্রচুর। সুমিত্র যে দীনেশ-সেন টুকে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস লেখকই মাত্র নয়, একজন উঁচু দরের ঔপন্যাসিক তা জনযুদ্ধওয়ালারাই প্রথম প্রচার করতে সুরু করে। ১৯৪৭-এ বিবৃতি দান করে সুমিত্র ওই বন্ধুদের সংস্পর্শ ত্যাগ করে বলতে লেগেছিল : শরৎ চাটুজ্জেই নাকি তাকে আসন ছেড়ে দিয়ে গেছেন। যদিও তার সাম্প্রতিক তরুণ বন্ধুরা পেছন ফিরেই মন্তব্য করে, সুমিত্র উপাধ্যায়ের পদ্যগুলো তাঁর লেখা নয়—তাঁর স্ত্রীর লেখা—যিনি বাংলা-সাহিত্যের এম-এ ডিগ্রী-ধারী কিন্তু সুব্রতর তেমন ধারণা নয়। সে মনে করে, নবীন সেনের যুগে ও-ধরনের পদ্য লেখা চলত, ১৯৪৮-এ যে-তরুণী সুমিত্রকে বিয়ে করেছেন, তাঁর হাতে ওরকম লেখা আসতে পারে না। কিন্তু তাতে কী? ও-ধরনের পদ্যেও তার খাতির কমেনি। বাংলা-হিন্দি-সঙ্কলন-গ্রন্থে তার স্থান হয়েছে। আগামী নির্বাচনে সুমিত্র রাজ্যসভায়ও স্থান আশা করছে। মোটেও তা দুরাশা নয়।

প্রবীণ বন্ধু শশাঙ্কশেখর সহাস্যে বললেন,—আপনি অলস! পরম শত্রুতেও তা বলতে পারবে না!

—কাজের চাপ এখন একটু বেশি অবশ্যি কিন্তু ডক্টর রায় আমাকে বলেছিলেন—পঞ্চাশোর্ধে দুপুরে একটু বিশ্রাম নেবে হে—সেই অবধি দুপুরটা আমার আলস্যেই কাটে, ঘুম হলে ত ভালো, নইলে গড়াগড়িতেই!

এই পুজোর-ফরমাশে অক্লান্তকর্মী, সুদীর্ঘ বাক্য-ব্যবহারে একটুও ক্লান্তি বোধ করলে না। শ্বাস ফেলল কি ফেলল না আবার সুরু করল সুমিত্র, আজও তা-ই হচ্ছিল। কিন্তু কে জানত, রেডিয়ো এই দুঃসংবাদ নিয়ে আসবে! স্বপ্নেরও অগোচর। সংহিতারই দুপুরে রেডিয়ো খোলার অভ্যাস। তিনিই ধরেছিলেন খবরটা। তাঁরই ডাকাডাকিতে উঠে বসলুম। শুনে তো পাথর!

ছায়াছবির হ্রস্ব সংলাপ লিখেই সে মুল্লুকের প্রবেশ-পত্র পেয়েছিল সুমিত্র। দেখালে, হ্রস্ব বাক্য-রচনায়ও তার অধিকার সমান।

—আপনি পাথর—আমি দৌড়ুলাম! কৃতকর্ম স্মরণ করে শশাঙ্কশেখর এবারেও হাসলেন।—যেন খবরটা রাষ্ট্র করবার ভার আমার উপর, মনে হয়েছিল!

—আমিও দৌড়ুতুম! আসতুম আপনার কাছেই। বিস্ময় বলুন আর শোকই বলুন তা একা-একা প্রকাশ করা চলে না!

—কেন? আপনার স্ত্রীই তো ছিলেন!

—সংহিতা রেডিয়ো খুলেই বসে আছে—কখন কী খবর আসে! সুমিত্র তার আগেকার কথারই শেষাংশ প্রকাশ করলে এবার যা বিস্ময়কর হলেও শোকার্ত নয়,—আসা হল না।

টেলিফোন বেজে উঠল। সাপ্তাহিক "স্বদেশ" ফোন করছেন : তাঁদের এ-সংখ্যার জন্যেই জওহরলালের উপর কবিতা চাই। সম্মতি দিতেই হল। একটা আবেগ-গ্রস্ত অবস্থায় ছিলাম তো—লেখাও হয়ে গেল। দুটো গান-ও। অনেকদিন পর!

—বলছিলাম কি না, আলস্য আপনার বরাতে বা ধাতে নেই!

সুব্রতর আসতে দেরি হচ্ছিল। বসবার ঘর থেকে একটা চেয়ার টেনে লনে এসে বসতে এতো দেরি হবার কথা নয়। আসলে বাবার কাছ থেকে ছুটি নেবারই দরকার ছিল তার। সুমিত্র আসাতে সুযোগ ঘটে গেল। বসবার ঘর থেকে অন্দরে এলো সুব্রত, অন্দরে আসবার ওই এক গেট বলেই বসবার ঘরে তাকে আসতে হল। সেকেলে বাড়ির মতো খিড়কির দুয়ার থাকলে সেদিকেই যেতো সে। মনিকাকে বারান্দাতেই পাওয়া গেল। যেন সুমিত্রর আসার খবরটাই সে পেঁছুতে এসেছে, তাই বলল, উপাধ্যায় এসেছে।

—জানি তো ও'রা আসবেন! মনিকা স্বামীর কাছাকাছি থেমে বল্‌লে,—তাই তো সুরেনকে গোলপার্কে পাঠালুম!

—গাঙ্গুরামে? হেসে উঠল সুব্রত।

—চায়ের সঙ্গে দেব এক-কণা বিস্কুট নেই! ছুটির দিনে মেয়েরা আর কী করবে—ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিস্কুট চিবোচ্ছে!

—সবাই মার্কিনী মেয়েদের মতো পেটুক হয়ে উঠল দেখছি!

—ওরা ফল খাবে না—ছোঁবেও না। টফি-চকোলেট-বিস্কুট এন্তার গিলতে পারবে!

—গ্রীষ্মের ছুটিতে কী জামই না খেতাম আমরা! উঃ। জাম—গোলাপজাম-জামরুল! কাকার ওখানে নেমন্তন থাকত আম-কাঁটালের আর লিচুর!

হাতে টিসু-পেপার-ঢাকা খুরি আর কাগজের বাক্স হাতে সুরেন গলদ্‌ঘর্ম হয়ে দৃশ্যে প্রবেশ করল।

মনিকা বেজে উঠল,—না এলেই পারতে! ট্যাঁকে যখন পয়সা ছিল—ট্র্যামে ঘুরে শোকের দৃশ্য দেখলে হত না!

সুরেন হেসে বল্‌লে,—বাসে কি, মা, আসা যায়? হাতে এসব নিয়ে! হে'টে আসতে সময় তো লাগবে!

—তা লাগুক—প্রস্থানোদ্যত হল সুব্রত, বেজে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই যে মূক-গম্ভীর হয়ে উঠবে মনিকা, তার আভাস পেয়েই এ একরকম পৃষ্ঠভঙ্গ,—বাইরে চা নিয়ে এসো—উপাধ্যায়বাবু এসেছেন।

একসঙ্গে দুটো ফরমাশ সুরেনকে দেওয়া যায় না—দিলেই বিপদ। দুটোরই আধখানা করে হবে—একটাও সম্পূর্ণ নয়। মুদীখানায় নগদ কিছু কিনতে হলে হিসেব গোলমাল করবেই। নেহাৎ-ই অশিক্ষিত—নইলে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল লেবার না হয়ে ঘরের কাজ করতে আসে? কোথায় ঘরের কাজের লোক পাওয়া যাচ্ছে এখন? সচ্চিদানন্দবাবুর বাড়িতে ঝি, সুমিত্রর বাড়িতে ঝি, এঞ্জিনীয়রবাবু একটা নেপালী ছোকরা রেখেছেন—যাকে বাড়ির শোভাই বলা যায়, ভৃত্য বলা যায় না। এক দেব-বাবু ভাগ্যবান—বনেদী মানুষ, পুরুষানুক্রমে ভৃত্য আসত ও'দের, যেম্নি জমিদারী। সুরেনের মতো দুর্ভাগা শতকরা একটি নেই।

সুরেনকে ভেবেই সুব্রত নিজেই চেয়ার টেনে ফিরে এলো লনে। সুমিত্র তখন গল্প ফে'দেছে। পদ্মবিভূষণ-উপাধি-প্রাপ্তির সুযোগে জওহরলালের সঙ্গে যে তার দেখা হয়েছিল সেই গল্প। বাবা মুগ্ধ শ্রোতা। অন্তত সুব্রতর মতো অবিশ্বাসী শ্রোতা নন।

তিলকে সর্বদাই তাল করে সুমিত্র—শুধু বয়সের বেলায় তালকে তিল। সুব্রতর মোনালিসা-ভঙ্গীর হাসিতেই হয়তো কথার মোড় ফিরিয়ে নিল সুমিত্র, বললে,—আইয়ুবের সঙ্গে পণ্ডিতজীর দেখা হবার সম্ভাবনায় যে-সব কাগজ আজও বিষোদগার করেছে—দেখবে সুব্রত, তাদেরই শোক-প্রকাশের বহর কতো!

—তোমাদের সাহিত্যে কুম্ভীরাশ্রু বলে একটা কথা আছে না? সুব্রত সদাচারে, এর চাইতে কঠিন কথা উচ্চারণ করতে পারল না।

—আছে। কিন্তু তা যে ফ্যালে তারাই তো টাকার কুমীর! সুমিত্র জানে কোনো খবরের কাগজের মালিক এ-কথা শুনতে আসছেন না।

বীমা-বাবুর একমাত্র ছেলে অভিজিৎ এক অভিজাত কাগজে লীডার লেখে। মালিকের টাকায় বিদেশ ঘুরে আসবার আগেই সে ইংরেজি উচ্চারণে বাংলা কথা বলত। কেননা, সে ইংরেজির কৃতী ছাত্র। জজবাবু ইংরেজ আমলে জজিয়তি করেও অভিজিতের ইংরেজি সহ্য করতে পারেন নি, তার ইংরেজপনাও নয়.। কিন্তু তা তাঁর নেহাৎ-ই ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রকাশ্যে অভিজিতের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ, বিশেষ করে বীমাবাবুর কাছে গেলে। ইদানীং শয্যাশ্রয়ী বীমাবাবুকে তাঁর প্রায়ই দেখতে যেতে হয়। একসঙ্গে জুটে বাড়ির জমি কিনেছেন, সে-খাতির কি অভিজিতের দুর্নীতিতে বাতিল করা যায়? সঞ্জীব চাটুয্যের দিনের প্রতিবেশীও তাঁরা নন। অভিজিতের প্রশংসার আগে জজবাবু কাগজের মালিকের প্রশংসায় এলেন,—হোন না টাকার মালিক—সমাজে টাকা ছড়িয়ে দিলেই হল—মানে সিন্দুকে রাখা নয়, ইন্‌ভেস্টমেন্ট। আমাদের জওহরলালের মিক্সড্ ইকনমিতে তো টাকার মালিকদের তা-ই ভূমিকা! আর দেখছিও তা-ই। অভিজিৎ যে কাগজে কাজ করছেন, তার মালিকরা তো বলতে গেলে মুক্তহস্ত। দেশের মানুষ গড়ার কাজে বিত্তবানদের ভূমিকাই তো প্রবল!

বাঙালী সাহিত্যিক কবে আবার ধনবিজ্ঞানের উপদেশ শুনতে চায়, ধনী হওয়াই তাঁদের লক্ষ্য এবং সুমিত্র তা-ই। তাই জজবাবুর কথাগুলো শোনার ভাণ করেও সে শুনল না, শুনল শুধুমাত্র অভিজিতের নাম। লোকটা, বলতে গেলে, সুমিত্রর একরকম প্রতিবেশী। কিন্তু এমন অশালীন! সুমিত্রর একটা বই-এর চিত্ররূপ কাগজের সুযোগ পেয়ে এগ্নি ব্যঙ্গোক্তিতে বিদ্ধ করেছে যাতে তার গল্প-লেখার প্রতিভাও অস্বীকৃত। আরে মূর্খ, গল্পই যদি না লিখতে পারি তাহলে বাংলা-কাগজের শারদীয়-সংখ্যার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকরা আর চিত্র-প্রযোজক-পরিচালকরা আর কলেজ স্ট্রীট-পাড়ার শাঁসালো গ্রন্থ-প্রকাশকরা আমার দুয়ারে ধর্না দেবেন কেন? অভিজিতের নাম শ্রবণেই সুমিত্র তাকে মনে-মনে এ-প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করল। এবং তির্যকভাবে অভিজিতকেই শাপগ্রস্ত করতে চাইলে,—ওসব ক্যাপিটা-লিস্টদের কাগজ আর কদ্দিন! দুঃখ যে পণ্ডিতজি তাঁর সমাজতন্ত্র দেখে যেতে পারলেন না।

সুব্রতর 'বস্' ও-কাগজের একজন ডিরেক্টর। বিত্তবান শ্রেণীর উচ্ছেদে তারও বিপন্ন হবার কথা। পিনাকীরঞ্জন দেব যে একজন উচ্ছন্ন জমিদার, প্রতিবেশিত্বের খাতিরেই নয়, অন্য কারণেই সেজন্য সে দুঃখিত। প্রথম যৌবনে জমিদার-পাড়া পাথুরেঘাটার ঘোষ-বাবুদের বাড়িতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনবার কী নেশাই না তার ছিল! তাছাড়া, বিদেশ থেকে এসে পেনেটির এক জমিদার-তনয়ের সঙ্গে ছ'মাস একটা সাহিত্য-পত্রিকারও চেষ্টা করেছিল সুব্রত। কী ভদ্র আর বিনীয়ই না ছিল তার সেই বন্ধু! টি-বিতে মারা গেল। প্রাচীন রক্ত দুর্বল হয়ে গেছে বলে যেম্নি বীজাণুর আক্রমণ, তেম্নি রাষ্ট্রের! সুব্রত ঘাড় কাৎ করে বললে—তোমার পুরনো রঙ দেখা যাচ্ছে না, সুমিত্র?

—আমি? চিরদিনই আমি জনগণের পক্ষে! সুমিত্র অম্লানবদনে বল্‌লে।

—কে নয়? জজবাবু হাসলেন, কে না জানে ভারতের জনগণ দরিদ্র। তাই ভারতও দরিদ্র!

সুব্রতও হাসলে, জেনে কী উপকারটা হচ্ছে! কেউ আমরা ধনী না হয়ে ছাড়ছি?

—ধনী আর কী? সুমিত্রর আঁতে ঘা লাগল, মোটামুটি একটা সুস্থ স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং-এ যাওয়া। প্রত্যেকেরই সে লক্ষ্য থাকা উচিত।

অসুস্থ স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং-এর কথা মনে এলো জজবাবুর। অভিজিতের কথাও। কিন্তু তিনি বল্‌লেন, কবে যেন পড়েছিলুম—অভিজিতেরই একটা লীডার। 'ফিলসফি অব পোভার্টি'। বেশ।

—ওটাকে 'ফিলসফি অব পিউবার্টি'ই বলুন—শুনি, তরুণতরুণী আত্মীয়-আত্মীয়াদের নিয়ে বাড়িতে সে যা আড্ডা বসায়, অ্যাফ্লুয়েন্ট সমাজেও তেমন বিকৃতি দেখা দেয়নি। সুমিত্র কালো হয়ে গেল যেন বিভীষিকা দেখে।

সুব্রতও শুনেছে, কোন্ মার্কিন-ফেরৎ বাঙালী মহিলা নাকি প্যারিসের নক্সায় 'সালোঁ' তৈরী করেছেন। সেখানে গুনীজ্ঞানীদের সান্ধ্য আড্ডা বসে। পানাহার হয়। নিয়মিত না হলেও সুমিত্র যায় সেখানে। পার্ক-স্ট্রীটের 'বার-'-এ অবাঙালী তরুণ-তরুণীর আড্ডারই ঘরোয়া সংস্করণ। কাজেই অভিজিতের আড্ডার চাইতে মোটেও পবিত্র নয়। কিন্তু শোনা কথায় সুমিত্রকে অপদস্থ করতে ইচ্ছে হল না সুব্রতর—অবশ্য চাক্ষুষ দেখলেও নয়। তাই শুধু সে হাসতেই লাগল, বলল না কিছু।

তারুণ্যের উচ্ছৃংখলতা সব-সময়ই ছিল, আজকাল না কি তা অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে। লেকে প্রাচীনদের আড্ডায় এ-নিয়ে কথাবার্তা শুনেছেন জজবাবু। আর শুনবেনও বা কী? দেখছেন না? অন্যে পরে কা কথা? নিজের ঘরেই তো দেখছেন। সুপ্রিয় ক্ষেপে ওঠেনি গোলপার্কের এক বস্ত্র-ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করতে? বলত বটে, ব্যবসায়িক পরামর্শের জন্যে সে গোলপার্কে যায়। তারপরও যা খবর পাওয়া গেল, সে তো আরো কেলেঙ্কারি। পার্ক-স্ট্রীটের কোন্ অভিনেত্রীকে নিয়ে সে নাকি শান্তিনিকেতন ঘুরে এসেছে। বলেছিল, বন্ধুদের সঙ্গে শান্তিনিকেতন যাচ্ছে। শান্তিনিকেতনের উপাচার্যের উপর অগাধ বিশ্বাসে জজবাবু মনে করেন, শান্তিনিকেতনের নৈতিক স্বাস্থ্য আদর্শস্থানীয়। সেখানে সুপ্রিয় নিশ্চয়ই সে অভিনেত্রীকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছে। অভিজিতকে নষ্ট ভাবতে গেলে তাই জজবাবু সুপ্রিয়কে না ভেবে পারেন না। হয়তো অনেকটা তাই, তিনি অভিজিৎকে প্রশংসা করেন। সুমিত্রর নিন্দাতে তিনি কান দিতে চাইলেন না। বল্‌লেন—আমাদের মতো যাঁদের অভিজ্ঞতা, মানুষকে নিরপরাধ ভাবা তাঁদের পক্ষে মুস্কিল। কিন্তু এ-ধরনের ধারণা মনের সংকীর্ণতা ছাড়া তো কিছু নয়। কোথায় যেন পড়েছিলাম, অপরাধটা মানবিক। মানুষই অপরাধ করতে পারে। পশু তো আর অপরাধ করতে পারে না! জজবাবু হাসতে লাগলেন।

—জানেন না, কী হচ্ছে! সুমিত্রর উত্তেজনা গেল না, আজকাল একদল তরুণ লেখক, আমাদেরই এখানে, নিজেদের কী বলছে? তারা না কি কুকুর, উল্লুক—এই সব! নিজেদের মানুষ বলেও ভাবতে পারে না অথচ সাহিত্য সৃষ্টি করতে আসে!

—ওসব গীনসবার্গের চেলা-চামুণ্ডা—ছেড়ে দাও, সুমিত্র, ডলার-পোষ্যদের কথা—এখানে তা না-ই বা বললে! সুব্রত ভুরু কুঁচকে বললে।

—জওহরলাল আমাদের এমন ডেমোক্র্যাসি শিখিয়ে দিয়ে গেলেন—যে আমাদের মনে

মানুষ আর পশু এক হয়ে গেছে! জজবাবু উঠে দাঁড়ালেন, পদ্মনাভ প্রজাপতির তো তা খারাপ লাগবার কথা নয়!

—তার চাইতে বলা ভালো, সব ব্যাপারে বিদেশের কাছে হাত পাততে শিখিয়ে গেলেন জওহরলাল। 'বসে'র মুখে শোনা কথা না হলেও বাবার মর্জিমাফিক যে হবে কথাটা তা সুব্রত জানে।

—অ্যাঁ—লম্বা টান দিলেন শব্দটায় শশাঙ্কশেখর, অবসরপ্রাপ্ত আলিপুরের জজ। এখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এখন ধুতি-ফতুয়া-চটিতে তিনি ঘরে যাচ্ছেন স্মিতমুখে। ঘরের ছেলে ঘরে ফেরার মতো।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুরেন হাঁকল,—বড়দা, আপনাদের চা ঘরেই দেওয়া আছে—ওখানে তো আলো নেই!

সুমিত্রও হাসল অনেকক্ষণ পর—বেশ আলোর সন্ধানী হয়েছে তো সুরেন!

সুব্রত উঠে দাঁড়াল, ওঠো। আলোর পতঙ্গ কে নয়? হাসিতে দাঁত চিকলো, চোখ সরু হল সুব্রতর।

—বরং আগুন বলো, ধনতান্ত্রিকের প্রিয়! সুমিত্র উঠে সুব্রতর পিঠে হাত রাখল।

—কোন্ আগুন? রুরকেল্লা-ভিলাই দুর্গাপুরের নয়?

সবুজ লন থেকে ওরা আলোকিত ঘরে এলো।

অন্য ঘরে রেডিয়ো বাজছে, গান না ঈশোপনিষদ না গীতা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

তিন

রাজভবন থেকে আসছিল অভিজিৎ। প্রেসের গাড়িতেই। স্টাফ রিপোর্টারের খানিকটা কাজ আজ সে নিজে থেকে গছে নিয়েছে। লীডারই লিখুক খবর-সংগ্রহের উপর দার্শনিকতা ফলিয়ে বা ব্যানার লাইনে রিপোর্ট। অবশ্য রিপোর্ট হলে নাম থাকবে, লীডারে যা থাকে না। স্টাফ-রিপোর্টাররা উত্তরে-পুবে ঘুরছেন, শোক-স্তব্ধ কলকাতার ছবি লিখে আনতে। সে দক্ষিণটা চক্কোর দিয়ে যাবে। রেডিয়োতে যখন খবর দিচ্ছিল, সে বাড়িতেই ছিল। খবর পেয়েই ট্যাক্সিতে অফিসে। যদিও ঠিক তখনই তার হাজিরা দেবার সময় নয়। কাগজের আগামী কালের জরুরী সংখ্যায় কাজের মতো কাজ করতে পারলে নিজের ভবিষ্যৎ-ও ফর্সা। একটু বেশি খাটতে হবে। তার জন্যে বা কী? শ্রম-অপনোদনের অষুধই যখন তার জানা। জার্মানদের মতো বাড়িতেই 'সেলার' করেছে সে। বাবা তো আর উপর থেকে নীচে নামছেন না! এক-রকম পঙ্গুই হয়ে গেলেন। অবশ্য বাবার আমলে অন্য সুখ ছিল। নিজেদের গাড়ি ছিল। এখন ট্যাক্সি ছাড়া উপায় নেই।

এসব ভাবনার ভেতরই চোখ ছিল তার ফুটপাথে আর পার্কে—যেখানে স্তব্ধ জটলা। আর বাড়ির ছাদে-বারান্দায় অর্ধ-নমিত জাতীয়-পতাকা। ওদিকে নাগাড়ে চেয়ে থাকলে অবশ্যি আত্মগত-চিন্তায় ছেদ পড়ছিল মাঝে-মাঝে। আজকের মন্ত্রীসভার প্রস্তাবটা পোর্ট ফলিও ব্যাগ থেকে বার করে তখন তার উপর চোখ বুলোচ্ছিল। চমকে উঠবার মতো তেমন কিছু নয়। ধরতে গেলে মামুলিই। 'জওহরলালের মৃত্যুতে ভারতের ও বিশ্বের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে!' এ-কথা তো সবার মৃত্যুতেই বলা যায়। যে-একটি মানুষ মরে যায় ঠিক তার মতো অপর একটি মানুষ কি থাকে, না জন্মায়? এ তো আর ল্যাংরা আমগাছ নয় যে

একটির অভাবে আরেকটিও ল্যাংরা আম দেবে! 'পশ্চিমবঙ্গ হারিয়েছে একজন প্রকৃত বন্ধু ও দিশারী, আমাদের সমস্যা এবং আমাদের জনসাধারণকে নিয়ে যাঁর গভীর ও চিরন্তন চিন্তা ছিল এবং তা-ই ছিল আমাদের শক্তি ও উৎসাহের অবিরাম উৎস।' মিথ্যা ভাবলেও শুনতে ভালো। যাক্, মৃতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নেই। ক্রুশ্চফ মানুন আর না-ই মানুন ওটা পশ্চিমী গণতন্ত্রের সজ্জনতা। শরৎ বসু, শ্যামাপ্রসাদও মন্ত্রীসভায় থাকলে এ-ধরনেরই প্রস্তাব আনতেন। সামাজিক জীবনে সবাইকে ডক্টর জেকিল হতে হয়, ব্যক্তিগত জীবনে হোন না তিনি মিষ্টার হাইড! উনিশ-শতকীয় এ-চরিত্রটা মন্দ ছিল না। কিন্তু এ-শতকে? প্রফুমা-কীলার কেলেঙ্কারিতে মন যায় অভিজিতের। যেন একটু মজাই লাগে।

জাতির লাল জওহরলাল! হঠাৎ কথাটা মনে আসে। এর ইংরেজি কী হতে পারে? বিলাভেড্ অব দ্য নেশন? কিন্তু বাংলা-হিন্দির মিশ্রণটা যেখানে বেশি—চৌরঙ্গী আজ বেশ চুপচাপ। অদ্ভুত লাগবে তাঁদের কাছে যাঁরা খবরটা পাননি। কিন্তু সতেরো বছর আগে—গান্ধীজির গুলি-লাগার খবরে এর চাইতে বেশি অদ্ভুত ছিল চৌরঙ্গী। ভয়ে, সন্ত্রাসে যেন স্তব্ধ। এম্নি শোকগ্রস্ত নয়। মুখর চৌরঙ্গী মূক হয়ে গেছে মাত্র। বিলিতি শিক্ষায় মানুষ জওহরলালের বিয়োগে চৌরঙ্গীর এ-শোভাটা মন্দ নয়। হিন্দি-ওয়ালাদের 'হেভেন' না হয়ে মাউন্টব্যাটেনের আড্ডাখানা থাকলেও চৌরঙ্গী আজ এম্নি হত!

আর পার্ক স্ট্রীট্! ট্রিঙ্কা-ফ্লুরি, ব্লু-ফক্স-বারবাকু-ওলিম্পিয়া প্রভৃতি খানাঘরগুলো বন্ধ। বন্ধ করতে হয়েছে। শর্ট-ব্লাউজের আর ড্রেন-পাইপের ছোকরাছুক্‌ড়িরা কী অসহায়! পার্ক স্ট্রীট দিয়ে লোয়ার সার্কুলার রোডে আসতে ভেবেছিল অভিজিৎ। তারপর ল্যান্সডাউন—বাঙালী-পাড়া। তেমন যেন জটলা নেই—অর্ধনমিত পতাকার অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোনো পরিবর্তনই চোখে এলো না অভিজিতের। খবরের ক্ষুধা থাকতে পারে ওঁদের, আর-কিছু না।

রবীন্দ্রসরোবরে বিকেলের হাওয়া। বাবার বয়সীরা ঠিকই এসেছেন। তাঁরা তো জওহরলালকে আবেগপ্রবণ ছাড়া কিছুই আর ভাবতে পারেন না! নেতাজী তাঁদের বিচারে কর্মীপুরুষ। স্বামী বিবেকানন্দের পরই নেতাজী।

গড়িয়াহাট লেবেল-ক্রসিং-এ গেট বন্ধ! ট্রেন তলে নেয়নি এখনো—? ট্রাম তো তিনটে থেকেই উঠে যাচ্ছে। কোন্ গাড়ি আস্‌বে আর ক'টা গাড়ি কে জানে? মালগাড়ি হলেই তো বিপদ! আধঘণ্টার আগে উনি সরবেন না। গড়িয়াহাটার অসমাপ্ত পুলের ঢালুতে তাকাল অভিজিৎ। কবে যে শেষ হবে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের এই শ্লো মুভমেণ্ট! আমাদের ভোগান্তিরও শেষ। পাড়ার এঞ্জিনীয়রবাবু বলছেন, ১৯৬৫-তে। একটা বছর এই বন্ধ-গেটের পেছনে দাঁড়াতে হবে! বিরক্তিতেই সিগারেটের প্যাকেট বার করল অভিজিৎ ট্রাউজারের পকেট থেকে। একটা সিগারেট ঠোঁটে নিলে। নিয়েই মনে হল, গোল্ড-ফ্লেকের এ-সুগন্ধ যেন পুরো একটা বছরই সে পায়নি।

পাশাপাশি গাড়িতে এক মঙ্গোলয়েড দম্পতী। অফুরন্ত প্রতীক্ষার সময় চারদিকেই তাকাতে হয় আর অভিজিৎ তো চারদিকে তাকাবার কাজ নিয়েই বেরিয়েছে! এ-অতিথিরা কারা? উৎসুক হল অভিজিৎ। জাপানের, যাভার, লাওসের, বার্মার, নেপালের? যে দেশেরই হোক, ওঁরাও তাকালেন অভিজিতের দিকে। জাতীয় ব্যঞ্জনাহীনতা ওঁদের মুখে, যাকে বিষণ্ণতা বলেই এখন মনে হল অভিজিতের। সাংবাদিকতার তাগিদে ইংরেজিতেই প্রশ্ন করল অভিজিত,—আপনারা কোথায় যাচ্ছেন।

পুরুষের প্রশ্নে মেয়েটিরই সপ্রতিভ হবার কথা। তা-ই হলেন মেয়েটি,—যাদবপুর, ইউনিভার্সিটি।

—এখন কি খোলা পাবেন?

—ওঃ। মেয়েটি।

—কেন? পুরুষটি।

—তিনটেয় সব ছুটি হয়ে গেছে!

ভ্রাম্যমানতার নেশায় ও'দের খবর রাখবার কথা নয়। পুরুষটি ভাবলেশহীন মুখে চলে গেল। মেয়েটি গলা বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে,—কিন্তু কেন?

—নিশ্চয়ই পথে হাফ-মাস্ট ফ্ল্যাগ দেখে এসেছেন! অভিজিৎ যেন ভারতের প্রতিনিধিত্ব-পত্র বৈদেশিক কোনো রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করছে, এম্নি গাম্ভীর্য মুখে এনে বললে, —আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু মারা গেছেন!

—ওঃ, বিদেশী গানের চড়া সুরই প্রায় বার করলেন মেয়েটি মুখ থেকে।

সরু চোখ গোল করে পুরুষটি বললেন,—নেহরু মারা গেছেন?

—এ আমাদের মহা বিয়োগ! অভিজিৎ।

—সবারই মহা ক্ষতি!

ক্ষতি-বিনিময় করে মুখ ফিরিয়ে আনবার আগে অভিজিৎ দেখতে পেলে মেয়েটি রুমালে চোখ মুছছে। কান্না মেয়েদের সাধা। সে কসমোনটই হোক আর আমাদের কুসুম ঝি-ই হোক। ভাবনাটা আর প্রলম্বিত হলনা অভিজিতের। গাড়ি চলে যাচ্ছে। গেট খুলবে।

কোথায় যাবে এখন অভিজিতের গাড়ি? বাড়ির পাশ কেটে সোজা গিয়ে আনোয়ার শা' রোডের বাঁক। এ-অঞ্চলের মুসলমান-পল্লী। হ্যাঙ্গামার পর অনেকেই বাড়ি বেচে পাকিস্তানে যাচ্ছে—তবু আছে বনেদী ঘরগুলো, যাঁরা টালিগঞ্জ ছাড়া সাতপুরুষে আর কোনো জায়গা চেনেন না। এই তো তাদের বাড়ির ই'টের কনট্রাক্ট যে নিয়েছিল, নুরুদ্দিন—তাকে তো এখনো সারা গড়িয়াহাটা সাইকেলে চক্কোর দিতে দেখা যায়। টালিগঞ্জেরই লোক। দেখতে হবে ওদের—খবরটাকে কী ভাবে নিলে ওরা, তা একটা ভালো 'নিউজ আইটেম' হবে।

একটুকরো ভবিষ্যৎ-ভাবনায় অভিজিৎ ভুলেই গিয়েছিল ড্রাইভারকে পথনির্দেশ দিতে। বাড়ির সামনে এসে ব্রেক কষল ড্রাইভার। সচকিত হয়ে অভিজিৎ বললে,—না। এগোও। আনোয়ার শা' রোড।

পুকুর, কবর, মসজিদ, খেজুরগাছ—আনোয়ার শা' রোড। যোধপুর পার্কের তাল-গাছের মেলামেশাও আছে আর দক্ষিণী মাটির নারকেল। কিন্তু নিসর্গ দেখতে তো এখানে আসা নয়। কী পরিমাণ হাফ-মাস্ট—এবং তা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তা-ই খ‍ুঁজতে হবে। আছে। একটা বড়ো বে-সাইজ পুকুরের পাশে, রাস্তা-ঘেঁষে জটলা দেখে গাড়ি থামাতে বলল অভিজিৎ। গাড়ি থামল। নামল সে।

টিপু-সুলতানের বংশধর কেউ বোধহয় নন, নুরুদ্দিনের মতোই সাধারণ ঘরের জনা পঁচিশেক মুসলমান সমাজতন্ত্রী জওহরলালকে তাঁদের বিনীত শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। পুকুরের পশ্চিমে গোরস্থান—জীর্ণ হলেও কাঠামোতে আভিজাত্য পাওয়া যাবে। পুকুরের উত্তরে রাস্তার পাশে ই'ট বসিয়ে গম্বুজ-মতো করা হয়েছে—তার উপর বাঁশের খ‍ুঁটিতে অর্ধ-নমিত ভারতের জাতীয় পতাকা—খ‍ুঁটিতে হেলানো জওহরলালের ছবি—জুঁই মালার

শোভিত। অভিজিৎ এসে পাশে দাঁড়াতেই ও'রা নমাজের ভঙ্গীতে মাথা নত করে গম্বুজটি ঘিরে দাঁড়াল। এ যেন ও'দের নবনির্মিত মসজিদে জমায়েত। পরম শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা নিবেদন! তাই মনে হল অভিজিতের। মনে রাখবার মতো দৃশ্য। এমন দৃশ্য আর কোথাও সে দ্যাখেনি। চুপচাপ গাড়িতে ফিরে আসবার পথটুকুতে অভিজিতের মনে এলো মোবারক আলির নাম। মোবারক আলিই তো? জওহরলালের নিঃসঙ্গ শৈশব যাঁর সঙ্গ কামনা করত। সিপাহী-বিদ্রোহের আগুনে ঝলসে-যাওয়া সেই বৃদ্ধের মুখ যেন আনোয়ার শা' রোডের গম্বুজের পাশে কারো কারো মুখে দেখে এলো অভিজিৎ। প্রিয়জনের বিয়োগে কী শোকস্তব্ধ, শ্রদ্ধাবনত মুখ! আর কী দেখার আছে? শোকের আর শ্রদ্ধার এর চাইতে গম্ভীর, এর চাইতে সুন্দর দৃশ্য বুঝি আর কোথাও পাওয়া যাবে না সারা কলকাতায়। কিন্তু পাশাপাশিই মনে পড়ল তার হ্যাঙ্গামার সময়কারই এক ঘটনা। শেয়ালদ' থেকে আনা সংবাদদাতার এক খবরে জুলুম!

গাড়ি স্টার্ট নিল। বাড়ি যাচ্ছে অভিজিৎ। গাড়ি অপেক্ষা করবে। রিপোর্টই হোক আর প্রবন্ধই হোক বাড়িতে বসেই লিখবে। পোর্টফোলিও ব্যাগের ফ্যাস্‌নার টানল অভিজিৎ। বইটা ঠিকই আছে। মোরেসের লেখা জওহরলালের জীবনী। প্রবন্ধ দাঁড় করাতে হলে দু' ঘণ্টা অন্তত লাগবে। হাতঘড়ি দেখল অভিজিৎ। সাতটা বাজে প্রায়। দশটায় অফিসে পৌঁছিয়ে দেওয়া যাবে। তা-ই বলা আছে সম্পাদকের কাছে। আর রিপোর্ট হলে তো এক ঘণ্টার বেশি কিছুতেই নয়।

গড়িয়াহাটায় এসে গেছে গাড়ি। একটু নড়ে-চড়ে বসল অভিজিৎ। আর কী? এখনি নামতে হবে। পেট্রল পাম্প, সেলিমপুরের মোড়, এন্ড্রুস স্কুল, স্টপ্‌! গাড়ির চলার আর থামার সঙ্গে শব্দগুলো মনে-মনে উচ্চারণ করল অভিজিৎ। যেন টেলিগ্রাফের বয়েৎ।

গড়িয়াহাটা রোড থেকে একটা ফাঁড়ি নিয়েছিলেন সচ্চিদানন্দ রায় তাঁর কেনা জমি দু'ভাগ করে দেবার জন্যে। এক ভাগ বিক্রীর জন্যে, অবশ্যি চড়া দাম পেলে, অপরভাগ নিজের বাড়ির জন্যে। পিনাকীরঞ্জন দেবের কাছ থেকে সম্পূর্ণ জমিটাই বীমা কোম্পানীর টাকায় কেনা হয়েছিল। সচ্চিদানন্দের আশা ছিল একটু রয়ে-সয়ে বিক্রীর ভাগটা প্লট হিসেবে ছাড়তে থাকলে তাতেই বীমা কোম্পানীর টাকাটা চুকিয়ে ফেলা যাবে। 'জীবন-কেন্দ্রে'র হাতে কোম্পানী চলে যাবার আগে প্লটগুলো সাত-তাড়াতাড়ি বিলি করতে হয়েছিল বলে তাঁর আশা-পূরণ সম্পূর্ণত হলনা, বাড়ির জমিটা থেকেও একটা প্লট বেচে তিনি কোম্পানীর কাছে ঋণমুক্ত হয়ে মুখরক্ষা করলেন। মুখরক্ষা হল অবশ্যি এল-আই-সির কাছে কিন্তু কর্মচারিরা তাঁর মুখরক্ষা করেন নি। এখনও তাঁরা সচ্চিদানন্দর বাড়ির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে তাঁকে চৌর্যাপরাধে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু সচ্চিদানন্দ রায় আপন চিত্তকে নির্দোষ মনে করেন এই ভেবে যে জমিক্রয়-বিক্রয়ে কোম্পানীর লাভ হতে পারত কিন্তু তা হয়নি। মালিকের লাভ-আত্মসাৎকে যদি চুরি বলো, তাহলে সম্পত্তিমাত্রই তো চুরি।

ফাঁড়ির মোড়ে গাড়ি দাঁড়াল। ফাঁড়িতে ঢুকলে গাড়ি 'ব্যাক্‌' করতে হয়, ঘুরবে এমন ফাঁকা মাঠ নেই। ফাঁকা একটা প্লট যা আছে তা বিক্রীর জমিতে, ফাঁড়ি আর গড়িয়াহাটার মোড়ে। ক্রেতা বাড়ি করেননি। বোধহয় স্পেকুলেটার। অভিজিতের ধারণা তা-ই। এবং স্পেকুলেটারদের সম্পর্কে তার ধারণা মোটেও ভালো নয়।—স্পেকুলেটার ছিলেন বলে বাবার সম্পর্কেও। অভিজিৎ যে সচ্চিদানন্দের জীবনের ধারা অনুসরণ করেনি তার কারণ তা-ই।

হাতে ব্যাগ দুলিয়ে, ঘাড় কাৎ করে, সোজা পা ফেলে ফাঁড়িতে প্রবেশ করল অভিজিৎ।

কালো শ্যু, কালো ট্রাউজার আর টেরিলিন-শার্ট ও টেরিলিনের মতোই ফর্সা, পালিশ মুখ দেখে যে-কোনো অচেনা ব্যক্তি ভাবতে পারেন, 'কুইট-ইণ্ডিয়া'র পরও বোধপুর ক্লাবের কোনো সভা এ-অঞ্চলে রয়ে গেলেন না কি?

ঠোঁটে জিব বুলিয়ে বাড়ি ঢুকল অভিজিৎ। তার মানে এই নয় যে সে কোনো কথা বলবে বলে তৈরী হয়ে নিচ্ছে। এ হল শ্রেফ তৃষ্ণার রিফ্লেক্স। পানীয় চাই। 'সেলারে' বা আড্ডাঘরে বসবে বলে তৈরী হয়ে নিচ্ছে। হাইন কানিয়াকের ছিপি খুলবে। গ্লাসের আধেক কোকা কোলার সঙ্গে এক পেগ সেই অভিজাত ব্র্যাণ্ডি মেশাবে। তার প্রিয় ককটেল। যা শ্রান্তি দূর করে এবং কলমের ক্ষিপ্রতা বাড়ায়।

কিন্তু ঘরে ঢুকবার মুখেই গৌরীর সঙ্গে দেখা। স্ত্রী।

বারান্দার কড়া আলোতে বর্ষিয়সী গৌরীর বয়সের রেখাগুলোই মুখের উপর প্রখর দেখাচ্ছিল, চেহারার সুষমাটা তেমন নয়। কিন্তু তার কথায় বোঝা গেল, এই প্রাখর্যের জন্যে আলো ততোটা দায়ী হয়তো ছিলনা যতোটা তার দুশ্চিন্তার অন্ধকার। বললে সে, বাবার প্রেশার বেড়েছে! সেই হলো। তুমি বেরিয়ে গেলে আর পুপুকে ডাকলেন। আর মেয়েও ওম্নি বোকা, বলে ফেলেছে জওহরলাল মারা গেছেন!

হাসিতে ঠোঁটটা পালিশ দেখাল অভিজিতের। বললে,—প্রেশার হবার কারণ কী? জওহরলাল তো বাবার সুনজরে ছিলেন না!

—সমান-বয়সী তো প্রায়! বুড়োমানুষদের নিয়ে ওই তো বিপদ—সমবয়সী কেউ মারা গেলে অস্থির হয়ে পড়েন!

—ও কিছু না। অভিজিৎ ঘরে ঢুকে জানালাগুলো খুলে দিলে। ফ্যান আর লাইটের সুইচের বোতাম পর পর টিপে টুক্-টুক্ আওয়াজ করলে। তারপর হাতটাকে টেলিপ্রিণ্টারের মতোই অনর্গল লিপি-যন্ত্র করে তুলবার অভিপ্রায়ে ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণে রাখা ত্রিকোণ শেল্ফটার দিকে এগোল। ওই শেল্ফের গুণেই এ-ঘরের নাম 'সেলার'। বন্ধুবান্ধব দু'একজন তা-ই বলে। সেলারের গুণ নিশ্চয়ই এ-ঘরের আছে। হিটলারের মতো ঝড়ের আবির্ভাব তো জার্মানীর 'বিয়ার সেলার' থেকেই। অভিজিৎ তাই বলে,— উত্তর-পশ্চিমের শেল্ফটা আমাকে নরওয়েষ্টার বানিয়ে দেয়।

হুইস্কির অনচ্ছ 'জার'টা ছাড়া বিচিত্র বোতল-গ্লাসে শেল্ফটা বেলোয়ারি। সেকালের ঝাড়-লণ্ঠনের আভিজাত্যের শূন্য স্থান পূর্ণ করেছে একালের জার-বোতলগ্লাস। যেম্নি গুটিকয় জমিদারের শূন্য আসনে গুটিকয় ধনপতি সওদাগর। আবাদীকংগ্রেসের পর ধনপতির আসনও টলমল।

ধনপতির পুত্র অভিজিৎ টলমল অবস্থাটাকে আহ্বান করতে চাইল শরীরে। ক্ষিপ্র হাতে, ওস্তাদ কম্পাউণ্ডডারের মতো, তার কক্টেল তৈরী করে গলাধঃকরণ করলে। বেশি সময় হাতে নেই। একালে কোনো-কিছুর জন্যেই বেশি সময় নেই। শোকের জন্যেও না। যে শোকগ্রস্ত মনে অভিজিৎ কালো ট্রাউজারটা পরেছিল, সে-মন আর এখন আছে না কি?

কিন্তু মূর্তিমতী আলস্য হয়ে পুপু এসে ঘরে ঢুকল। অভিজিতের বিবাহিতা মেয়ে পারমিতা। আসন্নপ্রসবা। স্ফীতোদরা মেয়েরা বোধহয় বেশি লজ্জাহীনা হয়। অন্তত প্রদর্শন-লুব্ধা।

—অফিস ছেড়ে তুমি হঠাৎ এলে যে, বাবা? শরীর খারাপ লাগছে? পারমিতা অভিজিতের স্বাস্থ্য-জিজ্ঞাসা করলে।

—অফিসের কাজেই বসব এখন। এককথায়ই মেয়েকে বিদায় করতে চাইল অভিজিৎ।

—খবরটাতে দাদু কেমন হয়ে গেলেন! অবশ্যি পিল খেয়ে এখন ভালোই আছেন। যদিও সচ্চিদানন্দ পারমিতার দাদামশায় নন, ঠাকুর্দা তবু দাদু-টা ভালো শোনায় বলেই পৌত্র-পৌত্রীর মুখে দাদু-নামটাকেই চালানো হয়েছে এ-বাড়িতে।

মেয়ের মুখে দাদুর ভালো-মন্দ শুনবার সময় বা ইচ্ছা কোনোটাই ছিলনা অভিজিতের। বরং মেয়ে-জামাই চাটার্ড-একাউন্টেন্ট জয়ন্ত, বোহিসেবী হতে যে মাঝে-মাঝে শ্বশুরের আহ্বান শোনে, এলে অভিজিৎ খানিকটা খুশী হত। যদিও জয়ন্ত বয়সে অভিজিতের একমাত্র পুত্র অমিতব্রতর বড়ো কিছুতেই নয়, তবু কল্যাণ-সম্পর্কের ছেলেটিকে পানীয়ের সঙ্গী করতে একটুও ইতস্তত করেনি অভিজিৎ। তার কারণ অবশ্য একটা উপস্থিত যে না করতে পারে সে এমন নয়। সচ্চিদানন্দর বীমা-কোম্পানীর শেষ অবস্থায় জয়ন্ত সেখানে ইণ্টারন্যাল অডিটর হিসেবে এসেছিল। এমন ইণ্টারন্যাল যে ছেলেটি কর্তার অন্তঃপুরেও প্রবেশ-পত্র পায়। অভিজিতের সঙ্গে আলাপটা পারমিতার সঙ্গে মেশবার শর্ত হিসেবেই সে মেনে নিয়েছিল। আর অভিজিৎ তখন জয়ন্তকে 'ইয়ং ফ্রেন্ড' হিসেবেই গ্রহণ করেছে। মেয়ে-জামাই হলেও বা কী? সে ফ্রেন্ডশীপ তো নষ্ট হতে পারে না। পারমিতা পিতার ও স্বামীর মদ্যপান বসে বসে দ্যাখে। বেশ মজা পায়। মদ্যপায়ী যে মেয়েদের বিভীষিকা সৃষ্টি করে, সে-টাবু থেকে পারমিতা মুক্ত। এখনও, এসেই সে বাবার হাতে গ্লাস দেখেছে এবং পানীয়াবশেষ। তারপর দেখতে পাচ্ছে, লম্বা সোফায় হেলান দিয়ে প্যাডের উপর অনর্গল কলম চালাচ্ছেন। বিদায় নিলেনা পারমিতা। পাশের ছোট সোফাটায় বসল।

বসে থাকবে পারমিতা, চুপচাপ। যেম্নি পোষা বিড়াল তোমার পায়ে-পায়ে এসে পাশে জায়গা পেলে গোল-গাল হয়ে শুয়ে থাকবে, আদর করো আর না-ই করো। কিন্তু তোমার পায়ে গা ঘষে-ঘষে হাঁটা ছাড়া আর হয়তো তোমার গন্ধের আবহাওয়ায় সুখী হয়ে শুয়ে থাকা ছাড়া বিড়ালের আর কোনো কাজ থাকে না। পারমিতার কাজ থাকে। যখনই কোনো কাজ থাকে তার তখনই বাবার কাছে এসে এম্নি চুপচাপ বসে। অভিজিৎ মেয়ের উপস্থিতিটা গ্রাহ্য না করেই নিজের কাজ করে যায়, যেমন এখনও করে চলেছে। তা আধ-ঘণ্টাই হোক, এক ঘণ্টাই হোক। কাজের শেষে মুখ তুলে মেয়ের উপস্থিতিটা উপলব্ধি করে। মানে, তখন জিজ্ঞেস করে,—কী খবর? কিছু বলবে?

খবর? কী আর তেমন-কিছু খবর থাকে পারমিতার? জয়ন্ত এসেছিল, তাকে নিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে গেছে, ইউরিন-রিপোর্ট ভালো কি মন্দ—এ ধরনেরই সব খবর। বলার যা থাকে তা অমিতব্রতর নামে নালিশ। ওয়েস্ট-জার্মেনীতে যে এখন পেণ্ট-টেক্‌নোলজিতে পারঙ্গম হতে গেছে। দাদা তিনমাস কোনো চিঠি দিচ্ছেন না আমাকে। কী হল বলো তো? জার্মানীর ছেলেমেয়েরা না কি বিশ্রী স্বভাবের হয়ে যাচ্ছে। দাদা সে-দলে মিশে গেল না কি?—মিঠু? চিঠি দিচ্ছে না? লিখে দেবো। একটা সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে ঠোঁটের কোণগুলো নীচে নামিয়ে হাসে অভিজিৎ। আজও যা বলার আছে পারমিতার এবং যা বলতে, ঈশ্বর জানেন, ক'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে তা-ও তেমন কিছু গুরুতর নয় আর তা শুনে যে অভিজিৎ মেয়ের সঙ্গে গাল-গল্পে বসে যাবে সে আশাও নেই। তবু বসে রইল পারমিতা। মার কাছে বসে থাকলেও বসেই থাকত আর একা থাকলেও বসে বসে একটা সিনেমা-কাগজের পাতাই উল্টোতো-পাল্টাতো। এখনকার প্রায় কাগজই তো সিনেমার

সঙ্গে সাহিত্য, না-হয় সাহিত্যের সঙ্গে সিনেমা পাঞ্চ করে দেয়! তাই কেউ নিশ্চিত বলতে পারবে না পারমিতার অনুরাগ কোন অংশে, সাহিত্যে না সিনেমায়।

অভিজিৎ থামছেনা। থামছে শুধু সিগারেট পুড়ে গেলে অপর সিগারেট ঠোঁটে নেবার জন্যে। সিগারেট টানছে না সে। ঠোঁটে লেগে থেকেই পর-পর সিগারেটগুলো পুড়ছে। 'ওবিচুয়ারি' লিখছে না সে—যা লেখা হবে অফিসে জওহরলালের অটোবায়োগ্রাফি বা বায়োগ্রাফি টুকে। ফার্স্ট লীডারও নয়। ওটা খোদ সম্পাদকের কলম থেকে বেরোবে। একটা রিপোর্টই সাহিত্যিক ভঙ্গীতে দাঁড় করাচ্ছে সে। সাংবাদিকতায় সাহিত্য বা সাহিত্যে সাংবাদিকতাতেই তো আজকাল বাজার মাৎ! কাজেই মাতোয়ালা যেন গত স পন্থা। এই মাত্র টালিগঞ্জ এলাকায় সে যে-দৃশ্য দেখে এলো, সব দেখা-শোনাগুলোকে সে-দৃশ্যের অভিমুখী করে যা গিয়ে দাঁড়ায়, তাতে হয়তো সম্পাদকীয়ের পৃষ্ঠায় রচনাটার স্থান হতে পারে। সুরার উদ্দীপনা ছাড়া সে-আশার উদ্দীপনাও কম ছিল না। অবশ্য আশা একে ঠিক বলা যায়না। বলা উচিত নয়। অভিজিৎ প্রায় নিশ্চিত ছিল, ও-পাতায় লেখাটা যাবেই। রচনার নাম-ও মনে এসে হাজির হয়েছিল ইংরেজি-সাহিত্যের রাজ্য থেকে : 'পিল্‌গ্রিম্‌স প্রোগ্রেস্‌'। যাবে না কী? কতো বছর কলম ঠেলছে অভিজিৎ? পঁচিশ। পারমিতার বয়সী সাংবাদিকতা তার। আটাশ বছরের যুবক হিসেবে সুরু। মিঠুর আটাশ চলেছে—এখনো কাজ সুরু করেনি। তরুণ সাংবাদিকের চুলে পাক ধরল—লেখা পাক্‌বে না এখনো? মনে যে লেখার স্রোত তার উপরেই এসব কথা বৃষ্টির মতো টিপ্‌-টিপ্‌ ঝরছিল। স্রোতে তাতে ব্যাঘাত আসে না। যেম্নি একটা মস্ত মার্বেল পারমিতা উপস্থিত থেকেও কোনো ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে না।

পারমিতা আজকের নালিশটার ভেতরই ডুবে ছিল। কলমের মুখে কখন বাবা ক্যাপ পরাবেন আর সে-ও হাঁ করবে, যদিও তারই প্রতীক্ষা তবু সেই তীব্র মুহূর্ত অনেক দূরে। তাই এখন বাবার প্রতি অন্যমনস্ক হলেও চলে। নালিশ আজ ঘরোয়া নয়। যদিও এঞ্জিনীয়রবাবুরই ঘরের খবর এবং নালিশ কিছু থাকলে তাঁরই মেয়ে চিত্রার বিরুদ্ধে, যে পারমিতারই সমবয়সী এবং এখনো অবিবাহিতা বলে পরিচিতা, তবু এ-পড়শীর বাড়ি, বলতে গেলে, তাদের বাড়িরই সামিল। পারমিতা যদি একা থাকলে পত্রিকার পাতা উল্টোয় আর কোনো পুরুষ চিত্রতারকার ছবির সন্ধান করে তা শুধু তার বিবাহ-পূর্ব অভ্যাসের দরুণ, যে-অভ্যাসের জন্যে দায়ী তার বন্ধু চিত্রা। গলির এ-ধারে ও-ধারে বাড়ি। আর এঞ্জিনীয়ারবাবুতো দাদুর কাছ থেকেই বাড়ির জমি নিয়েছেন। এবং কাছাকাছি থাকবেন বলে মুখোমুখি প্লট। কাজেই গোড়া থেকেই এ-বাড়ির সে-বাড়ির তেমন-কিছু ব্যবধান নেই। সুতরাং, চিত্রার নামেই যখন নালিশ, নালিশটা যে ঘরোয়া নয় তা-ই বা পারমিতা বলে কী করে?

এঞ্জিনীয়রবাবুর বাড়ি থেকে রেডিওগ্রামের গান বাজছে। কী আশ্চর্য, আজও তেম্নি গান? বাড়ির ঘটনাটা না হয় তুচ্ছ কিন্তু জওহরলালের মৃত্যু? সে একটা দিনেও কি ওঁরা চুপচাপ থাকতে পারছেন না? 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না পথের শুকনো ধুলো যতো'—কান পেতে গানের কথাটা ধরল পারমিতা। এ-গান হয়তো আজ চলতে পারে। খানিকটা প্রসন্নই যেন হয়ে উঠল সে। গান পারমিতাও ভালোবাসে। তাহলেও, বলবে, আজ গান শোনবার দিন নয়। কে চালিয়েছে রেকর্ড? চিত্রা তো নেই-ই। মিত্রাদি? গানই তো ওঁর কাল হল। এবং ঘটনার পর ঘটনা ঘটাল—যা উপন্যাসেই ঘটে। কী একটা

উপন্যাস যেন কোথায় পড়তে সুরু করেছিল পারমিতা—দুই বোনের ব্যাপার, অনেকটা তা-ই তো হল মিত্রাদি আর চিত্রার বেলায়! ছোট বোন সিপ্রার বেলায় কী হবে? যে স্কুলে আছে? পড়ায় যতোটুকুই এগোক—এখনো ফ্রকেই আছে, শাড়িতে ওঠেনি! শাড়িতে উঠলে তবু ভাবা যায় বয়সে উঠে গেল, বড়ো বোনদের দায়িত্ব থাকে না ছোটর সামনে কী উদাহরণ রাখল, না রাখল! সিপ্রা বলতে গেলে কচিই রয়ে গেছে। কী ভাববে মেজদিকে সে এখন? বড়দিকেই বা কী ভেবেছিল যখন ডিভোর্স হয়ে গেল। কিন্তু যার জন্যে এতো তার সংগে কি থাকা হল? একটি লম্পট! গানের কেরিয়ার খুবই হল মিত্রাদির! এখন এন্ড্রুজে টীচারি করছেন। বলতে গেলে নিঃসংগ জীবন। একদল ছেলেমেয়ে পড়ালেই কি আর নিঃসংগতা ঘোচে? গান গাইলে বা গান শুনলে? কী জানি!

নীতি নিয়ে যখন আলাপ চলছিল পারমিতার মনে, ঠিক তক্ষুণি অভিজিৎ প্যাড্-কলম রেখে উঠে দাঁড়াল। নালিশটা প্রায় ঠোঁটে এনে ফেলেছিল পারমিতা। কিন্তু সামলে গেল। লেখা শেষ হয়নি বাবার। ত্রিকোণ শেল্ফটার ডাক এসেছে আবার। এবার 'জারে'র পানীয় আর সোডা। হাতের পিঠে ঠোঁট মুছে আবার এসে বসল অভিজিৎ। যে-গন্ধটা পারমিতা আগে পায়নি, কিন্তু যা তার বেশ চেনা, তা-ই পেল এবার। খারাপ লাগলনা। এমন কি, মজা পেয়ে সে হাসতও যদি ওদিককার কৌচে জয়ন্ত থাকত। কিম্বা বাবার বন্ধু সান্ন্যাল-দম্পতী—স্বামী-স্ত্রী দু'জনই যাঁরা পানাসক্ত।

হেমন্তরই পর-পর গান চলল, তারপর শচীন দেববর্মণের লোকসংগীত—যেম্নি চলে! পারমিতা অগত্যা গানেই মন দিলে। কখনো সুচিত্রা-কণিকার গান দেবেন না মিত্রাদি। তারপর আসবে দেবব্রত বিশ্বাস। দু'বোনই একরকম—পুরুষ-ঘেঁষা। এখন তো অন্তত মিত্রাদির পুরুষদের ভালো না লাগা উচিত। কী অপূর্ব গান কণিকার : 'সে যে মানেনা মানা'—কিন্তু মিত্রাদি ভালো বলবেন না! অবশ্যি মিত্রাদিও খুব ভালো গাইতে পারেন আর তার দরুণই তো সিনেমার জগতে যাওয়া আর সেই লম্পটের সংগে প্রেম! এম্নি বোকা মিত্রাদি যে বুঝতে পারলেন না মেয়েদের নষ্ট করাই ওর পেশা! গোবেচারি স্বামী—অধ্যাপক, কী দোষ ছিল তাঁর আর ওই লোকটার কী-ই বা গুণ—যে কাঞ্চন ফেলে কাচের দিকে দৌড়ুলেন মিত্রাদি? এই মুহূর্তে অধ্যাপকের জন্যে খুবই দুঃখিত হল পারমিতা এবং জয়ন্তকে মনে আনল। আজ এলো না কেন সে? ট্র্যাম-বাস বন্ধ? ট্যাক্সিও কি নেই? পারমিতার খবরের জন্যে নয়—এ কতো বড়ো খবর, জওহরলাল মারা গেছেন!

এবার পেন ক্যাপ-বন্দী করল অভিজিৎ, যখন দেবব্রত বিশ্বাস একটু যেন হাঁপ তুলে গাইছিলেন : 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু...'। লেখা শেষ। শেষ-পংক্তিগুলোতে চোখ বুলোচ্ছিল তবু, ঠিক শেষ হল কি না তা-ই দেখবার জন্যে। ভারতের যিনি নেতা হবেন, শরীরকে তাঁর তীর্থস্থান করে তুলতে হয়। কেননা ভারতের জনসাধারণ তীর্থযাত্রী। তীর্থদর্শনের মতোই নেতা-দর্শন চাই তাঁদের। গান্ধীজিতে পেয়েছিলেন জনসাধারণ তাঁদের প্রথম তীর্থস্থান। তারপর সতেরো বছর চড়াই-উৎরাই পার হয়ে যে-অধিত্যকায় এলেন সেই যাত্রীদল, সেখানে পেয়েছিলেন তাঁরা জওহরলালকে। যেন হরিদ্বারের পর বদরিকা। তারপর? অভিজিৎ ক্যাপ খুলল আবার। সই করল : এ, রায়। 'তীর্থযাত্রীর প্রগতি' প্রবন্ধ সমাপ্ত। মেয়ের মুখে তাকাল এবার অভিজিৎ, একটা সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে বলল, —কিছু বলবে?

বলবেনা? তবে আর পারমিতা এতোক্ষণ বসে আছে কী করতে? —এঞ্জিনীয়রবাবু

এসেছিলেন, বাবা, দাদুর কাছে। দাদুর অসুখের খবরে নয়। পিল-টিল খেয়ে যখন দাদু উঠে বসেছেন তখন। যেদিন প্রায়ই আসেন, তেমনি। আমি ছিলাম। একবার উঠে এসেছি, মা বলছিলেন, তুই-থাক্—বারবার ওঠা-নামার দরকার নেই। তাড়াতাড়ি এক নিঃশ্বাসে বলতে গিয়েও শ্বাসযন্ত্রের অপারগতার জন্যে তা পারলনা পারমিতা।

—হুঁ। অভিজিতের মনোযোগ ছিল কি না বোঝা গেলনা।

না থাকবারই কথা। বাবার কাছে এঞ্জিনীয়রবাবুর সেই তো এক নালিশ, ব্রিটিশ আমলের আর যা-ই দোষ থাক, প্রাদেশিকতা ছিলনা আর গুণের আদর হত! যেদিন কলকাতা কর্পোরেশন 'করাপশনের আড্ডা'—সব কর্পোরেশনই তা-ই। অর্থাৎ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন থেকে তাঁকে অবসর নিতে হয়েছে, এক্সটেনশন পাননি এবং অবসর নেবার পরও যখন তিনি শক্ত সমর্থ, কর্মক্ষম, তাঁকে ফরাক্কা ব্যারেজে ডাকা হয় নি। জজবাবুর সঙ্গেই অবশ্য তাঁর বাণী-বিনিময় ভালো চলত, যাঁর মনে এই প্রবল নৈরাশ্য যে কোনো কমিশন তাঁকে দেওয়া হল না। কিন্তু জজবাবুর অসন্তোষ, ক্ষোভ বা নৈরাশ্য বাইরে প্রচারিত নয়, একমাত্র সুব্রতই তার খবর রাখে। হয়তো তাই অসিতরঞ্জন ঘোষাল, এ-গলির এঞ্জিনীয়র, সামনের গলির মোড়ের জজবাবু শশাঙ্কশেখরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন নি। বিয়ে-বৌভাতে নিমন্ত্রিত হয়েছেন এঞ্জিনীয়রবাবু জজবাবুর বাড়িতে, সৌজন্যসূচক সদালাপও যে দু'চারটে হয় নি তা নয় কিন্তু সচ্চিদানন্দ রায়ের সঙ্গে অসিতরঞ্জন ঘোষালের যে হৃদ্যতা তা কখনই তৈরী হয়ে ওঠে নি। সাংবাদিক হলেই যে পাড়ার খবর রাখতে হবে তা নয়, এক রাস্তার উপর পাশাপাশি থাকতে গেলে এর-ওর মুখে এসে যতোটুকু খবর কানে পৌঁছয় তা-ই জানে অভিজিৎ, তার বেশি কিছু নয়।

—আমি অবশ্য বারান্দায়ই চলে গেলাম এঞ্জিনীয়রবাবু আসতেই কিন্তু শুনছিলাম দাদুর কাছে তিনি যা বলছিলেন। থামতে হল পারমিতাকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্বাসযন্ত্রের দুর্বলতায়।

—আড়ি পাতা, অ্যাঁ? অভিজিৎ ভেতরের হুইস্কির আগুনেই যেন ধূমায়িত হচ্ছিল মুখে, সিগারেটের আগুনে নয়।

—তা বুঝি? এঞ্জিনীয়রবাবু কি আস্তে কথা বলেন? পাড়া জাগিয়ে ওঁর কথা! এমন যে গোপন রাখবার ব্যাপার, তা-ও নিলেমের গলায় বলা চাই!

—এবার কী নিলেম হল?

—নিলেম! ডোমের নরম আলোতে যতোটা নরম দেখাচ্ছিল পারমিতাকে—গলাও এবার ততোটা নরমই শোনাল,—সেকালের বররা যেদিন নিলেমে উঠ্‌ত—একালেও তা-ই কিন্তু মেয়ের বাপরা ডাক বাড়ান না এখন, মেয়েরা নিজেই!

কেমন হেঁয়ালির মতো মনে হল পারমিতার কথা। জয়ন্ত এসে উপস্থিত হবে না তো এখন ওর আলাপে? বিরক্তিতে নড়ে-চড়ে বসল অভিজিৎ। উঠে যাবার পূর্বাভাস। কিন্তু বিরক্তিটা অভিজিতের নিজের উপর, মেয়ের উপর মোটেও নয়। কোনো স্বামী আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে ভালোবাসতে পারে না। জয়ন্ত যদি ইদানীং অন্য মেয়ের প্রতি দুর্বলতা দেখিয়ে থাকে, তাকে দোষ দেওয়া যায় না। পারমিতার কথায় এ-ধরনের চিন্তা অভিজিতের মনে এলো বলেই নিজের উপর সে বিরক্ত হল।

—শোনই না চিত্রার কাণ্ড—আর দেরি করল না পারমিতা নালিশ জানাতে,—মিত্রাদির বরকে ও বিয়ে করেছে। যে মিত্রাদিকে ডিভোর্স করল, তার সঙ্গে যে কী করে চিত্রা ভাব

জমালো ভাবা যায়না!

—হতে পারে। হয়। হবে না কেন? নেশার ঝোঁকেই যেন অভিজিৎ একটার পর একটা কথা গড়িয়ে দিলে।

—বন্ধুদের সঙ্গে পুরী যাবে বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে এই কাণ্ড!

বিয়ের পর কোনো কোনো মেয়ে নীতিবাগীশ হয়ে ওঠে ভেবেই অভিজিৎ গাত্রোত্থান করলে,—আমি পালাই। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কাগজপত্র পোর্ট ফলিওতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অভিজিৎ।

পারমিতাও উঠল। ভারি পায়ে বাইরে এলো। রান্নাঘরের দিকে আলো আর সব অন্ধকার। শব্দও নেই কোথাও। মিত্রাদির রেডিওগ্রাম থেমে গেছে। এঞ্জিনীয়রবাবুর বাড়ি চুপচাপ। ঘটনা নিয়ে কতোক্ষণ বা চ্যাঁচায় মানুষ—একটু পরেই চুপচাপ। এম্নি চুপচাপ।

চার

'এ. আর. ঘোষাল বি-ই' গেটের পিলারে নেম-প্লেট। গেট থেকে চওড়া রাস্তা ডাইনে-বাঁয়ে ছোট দুটো লন রেখে দোতলা বাড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁচেছে। গোল বারান্দা দু'টি তলাতেই। গড়িয়াহাটার ফাঁড়ি বরাবর গেটের দু'পাশে লনের দক্ষিণ-প্রান্তে নারকেলের সারি—পাম নয়। অকেজো ব্যাপারে অসিতরঞ্জন নেই—আজীবন তিনি কাজের লোক। তাই পাম নয় নারকেল। কিন্তু তিনি কাজের হলেও ছেলে-মেয়েরা যে অকেজো হবে না তার তো মানে নেই। শিল্পকে যিনি অকাজ মনে করতেন, সেই রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে তাঁর বড়ো ছেলে আর মেয়ে মানুষ। মিত্রা গান শিখেছে আর অলক বাগান করা। তা-ও ফুলের বাগান। নারকেলে অবশ্যি অলকের আপত্তি ছিল না, কেননা রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে নারকেলকুঞ্জ আছে। কিন্তু লন দুটো সে মেজেণ্টা বোতাম-ফুলের কেয়ারিতে ঘিরেছে। এবং রবীন্দ্রনাথ যাকে 'বাগান-বিলাস' বলতেন সেই 'বোগান-ভিলি' বারান্দার দু'পাশে দোতলা পর্যন্ত তুলে দিয়েছে। 'বোগান-ভিলি'-র ফিকে মেজেণ্টা পাতার দালানের 'বাফ' রং-এ হাসি ফুটিয়ে তুলেছে বলা যায়। ছোট বোন সিপ্রা বলেছিল,—মে ফ্লাওয়ার দিলে ভালো হত না, দাদা? কী সুন্দর গিরি-মাটি রঙ! হয়।—অলক বলেছিল,—কিন্তু তাতে বাউল-বাউল দেখাবে বাড়িটা।

বাউল! আজ ২৮শে মে ভোরবেলায় দোতলার গোল-বারান্দার একা-একা যে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরছেন—তাঁকে বাউল ছাড়া আর কী বলা যায়? গেটে চোখ রাখছেন বারবার। চিত্রার ফিরে আসাটাই কি আশা করছেন তিনি, না, কাগজওয়ালাকে? তা যা-ই হোক, কাজের অপেক্ষায় আছেন তিনি। গৃহীর কাজই হোক আর কাগজ পড়ার কাজই হোক। এই বাউল অবস্থাটা, মোটের উপর, তাঁর ভালো লাগছে না। একা একা কথাও তো বলা যায় না। বাড়ির সবাই ঘুমুচ্ছে। এখন কথা বলতে হলে তো যেতে হয় সচ্চিদানন্দবাবুর কাছে। তিনিও পঙ্গু মানুষ, নিদ্রা-জাগরণ অনিয়মিত। তাছাড়া মাত্র কাল বিকেলে তো তিনি সচ্চিদানন্দবাবুর সঙ্গে কথা বলে এলেন। তাঁর একটা ধারণা হয়েছে, সচ্চিদানন্দবাবু কানে কম শোনেন। তাই চেঁচিয়ে কথা বলতে হল। নইলে ওকথা কি চেঁচিয়ে বলবার মতো? মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। সে বিয়ে আবার কাকে? না, নিজের জামাইবাবুকে। জামাইবাবু ছাড়া কী? সত্যপ্রিয়র সঙ্গে তো আর মিত্রার 'জিগ্যাজ

সেপারেশন' হয় নি। রাগের মাথায় সত্যপ্রিয় মিত্রাকে বলেছিল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে, ওর মুখদর্শন আর করবে না। ও কি আর ডিভোর্স? মিত্রাও রাগের মাথায় ওকেই ডিভোর্স বলেছে!

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে খানিকক্ষণ ভাবলেন অসিতরঞ্জন। চিন্তাও একটা কাজ। বা কাজের অগ্রদূত। কিন্তু এ-ধরনের অকেজো চিন্তায় আর কী হবে? কী আর করবার আছে? কালই তো চিত্রার চিঠি এলো—সত্যপ্রিয়র সঙ্গে ওর বিয়ে রেজেস্ট্রারি হয়ে গেছে। কী আর করতে পারেন অসিতরঞ্জন? শুধু মাত্র ইচ্ছা করতে পারেন, আশা করতে পারেন, চিত্রা ফিরে আসুক।

গেটে ককানি শব্দ হল। কাগজওয়ালা ঢুকছে। মোড়ক বেঁধে ছুঁড়ে দেবে এখন। 'ক্যাচ' নেবার জন্যে তৈরী হলেন অসিতরঞ্জন। ছাত্রবয়েসে ক্রিকেট খেলার অভ্যাসবশত। মোড়কটা হাতে নিতে পারলেন তিনি।

এই তো কাজ জুটল। কাগজ পড়া। কাগজটা খুলবার আগে তাঁর মনেই আসে নি, আজ যে এমন বিরাট খবর থাকবে কাগজ জোড়া। 'সারা বিশ্ব নেহেরু-প্রয়াণে শোকার্ত'— প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে এক-ইঞ্চি টাইপে খবরের শিরোনামা। কালো বর্ডারে পৃষ্ঠাটা বিলিতি-রীতিতে শোক-লাঞ্ছিত। সর্বত্র বিদেশী ফ্যাশান! হবেই! নেহরু-মানুষটাই ছিলেন বিদেশী। তাই বিদেশী কেতাদুরুস্তদের ছড়াছড়ি সর্বত্র। নেহেরু তো আর গান্ধীজি নন! বিজ্ঞানে গান্ধীজির অনীহাকে চাকরি জীবনে, গান্ধীজির জীবিতাবস্থায়, তীব্র আক্রমণ করলেও এখন গান্ধীজিকে এঞ্জিনীয়র এ, আর, ঘোষালের বেশ ভালো লাগছে। সার্ভিসে যদ্দিন ছিলেন আর ঢুকে তো ছিলেন বিদেশীরই আমলে—তদ্দিনই অসিতরঞ্জন বিদেশী পোষাক পরেছেন—এখন ভুলেও তা স্পর্শ করেন না। এমনও ভেবেছেন, 'নেমপ্লেট' থেকে 'এ, আর, ঘোষাল বি-ই' তুলে দিয়ে বিশুদ্ধ 'অসিতরঞ্জন ঘোষাল' বসিয়ে দেবেন।

খবরে চোখ বুলোতে লাগলেন অসিতরঞ্জন। জাতি বারো দিন অশৌচ পালন করবে। মনে-মনে মন্তব্য করলেন : এগারো দিন কেন নয়? নেহেরু তো ব্রাহ্মণ। নিজের ব্রাহ্মণত্বে যেন একটু গর্বও অনুভব করলেন অসিতরঞ্জন।

তারপর? খবরই : আজ একটায় শেষকৃত্য। সব দেশের নেতারা বিমানযোগে আসছেন। ব্রিটিশ-প্রধানমন্ত্রীর আসাটাই সবচাইতে গুরুতর মনে হল অসিতরঞ্জনের, তার-পর সোভিয়েট সহযোগী প্রধানমন্ত্রীর আসা। ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ জওহর-লালকে ডগলাস হোম আত্মীয় ভাবতে পারেন—তেম্নি সমাজতন্ত্রী জওহরলালকে ক্রুশ্চফ অকপট সোভিয়েট সুহৃদও ভাবতে পারেন কিন্তু যে চৌ-এন-লাই-এর নামে কলকাতায় সন্দেশের নাম হল—তাঁর চিনি-সন্দেশ শুধু এই : 'নিউ দিল্লীতে সকাল বেলায় রোগাক্রান্ত হয়ে বিকেল বেলা মিঃ নেহরু মারা গেছেন।' অথচ চীন-নামেই এখনও এ-এলাকার কতোগুলো লোক গদগদ! অসিতরঞ্জন পূব-দিকে তাকালেন। পূব-ঢাকুরিয়া। অলক বলে, চীনপন্থীতে না কি ভরতি। বিদেশের পন্থায় ছাড়া, নিজের দেশের পন্থায় যেন আমাদের চলবার উপায় নেই! অসিতরঞ্জন যে রাষ্ট্রনীতির ভূমিকা তৈরী করলেন মনে-মনে তা কিন্তু নয়। এ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে আসবার ভূমিকামাত্র। কাকেই বা আর দোষ দিই —মনে-মনে উচ্চারণ করলেন তিনি—শেফিল্ড, গ্ল্যাসগো, ওয়েস্ট জার্মানী ছুঁয়ে এলেই এদেশে মস্ত এঞ্জিনীয়র, তাকে নিয়ে লোফালুফি—এখনো! যেন আমরা শিবপুরের পাশ বলে গাজন শিখেই এসেছি—এঞ্জিনীয়ারিং নয়! আশ্চর্য! স্বরাজ বলতে আমরা তা

বুঝতাম না। অসিতরঞ্জন ক্ষুব্ধ মনে অন্য সংবাদেও চোখ নিলেন, যেমন, জওহরলালের মৃত্যুতে শেখ আব্দুল্লা কেঁদেছেন, নন্দ প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন বা মাউন্টব্যাটেন রানীর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধুর চিতাশয্যা পার্শ্বে এসে দাঁড়াবেন কিন্তু কাশ্মীর-সমস্যা বা নন্দযুগ বা প্রথমার মতোই দ্বিতীয়া এলিজাবেথের ভারতপ্রীতি প্রভৃতি সূত্রগুলো নিয়ে সময়ক্ষেপ করলেন না তিনি। ছবির পাতায় গেলেন। চিত্রা কাগজ হাতে নিয়েই যেম্নি ছবির পাতা খুঁজত—বলতে গেলে অসিতরঞ্জনও তা-ই করলেন। পড়ায় অরুচি এসে গেছে। এই তো সারা সকালে একটা মাত্র কাজ। তাতেও অরুচি? তাহলে কী করবেন এখন? চা-পান। কিন্তু উনি কি উঠেছেন? কনকলতা।

ঘুমোবার ঘরে এলেন অসিতরঞ্জন। কনকলতা বিছানায় নেই, ঘরেও না। দু'টো বিছানাই পাট করা, বেডকভার বিছানো; মশারি নিখোঁজ। আজ কি একটু বেশি সকালে উঠলেন কনকলতা? রাত্রিতে ঘুম হয়েছিল, না জেগেই ছিলেন? এসব প্রশ্ন এখনমাত্র মনে এলো তাঁর। চিত্রার খবরের পরও রাত্রিতে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি। কাজেই জানেন না ঘরে কী হয়েছে না হয়েছে। কনকলতা কেঁদে থাকলেও শুনতে পান নি। চিত্রার খবরটা আদ্যোপান্ত সচ্চিদানন্দবাবুকে জানাতেই মনটা হাল্কা হয়ে গিয়েছিল। ফলে, আর-আর দিনের মতোই দশটা-পাঁচটা ঘুমিয়েছেন। জওহরলাল যেম্নি বলতেন, তিনিও বলতে পারেন, স্নায়বিক রোগে কোনোদিন ভোগেন নি। শীর্ষাসন না করেও।

কনকলতা হয়তো হিটার নিয়ে বসেছেন। ভাবনার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন অসিতরঞ্জন। এই ভোরে তো আর ঝি আসছে না। উনুনও ধরবে না। তবু, এখুনি এসে পড়বে। দেয়াল ঘড়িতে তাকালেন তিনি। ছ'টা। এখুনি আসবে ঝি। মিত্রার স্কুল আছে। অলকের অবশ্যি ইউনিভার্সিটি ক্লাশ, বাঁধা সময় নেই। হাতের কাগজটা বিছানার উপর রেখে অসিতরঞ্জন কনকলতার খোঁজে বেরোলেন।

খাবার ঘরেই প্লাগ-পয়েন্ট। সে-ঘরেই পাওয়া গেল কনকলতাকে। দু'টো কাপে চা ঢালছেন।

কতোদিন পর যে এ দৃশ্য দেখলেন অসিতরঞ্জন! কনকলতা তাঁর জন্যে আর নিজের জন্যে শুধু চা করছেন! মিত্রার বয়স কি ত্রিশ হবে? তাহলে ত্রিশবছর আগে। কেমন যে ছিল সে দিনগুলো ভাবতে চেষ্টা করলেন অসিতরঞ্জন। কিন্তু ভেবে ছবিগুলো স্পষ্ট করবার আগেই মুখ তুলে কনকলতা বললেন,—রেডিও বাজবার আগে তো আর ওরা ঘুম থেকে উঠবে না—ভাবলাম, তোমার-আমার চা-টা করে ফেলি!

কনকলতাও কি তাহলে অসিতরঞ্জনের মতোই সে দিনগুলোর কথা ভাবছেন আজ যখন ছেলে-মেয়ে কেউ ছিল না? যে বিরসতায় ভুগছিলেন তিনি ঘুম থেকে জেগে অবধি, তা যেন কী এক যাদুমন্ত্রে সরস হয়ে উঠল। প্রণয় বলতে যা বোঝায়, এ-বয়সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তা থাকবার কথা নয়, যা থাকে তা সাহচর্য-জনিত একাত্মতা। বয়স আরো এগোলে তা-ও আর থাকে না—বিচ্ছেদ সুরু হয় এবং বিচ্ছেদেই যেন শান্তি। এখন অসিতরঞ্জনের সঙ্গে কনকলতার একাত্মতার দিন চলেছে। তাই অসিতরঞ্জন যা ভাবছিলেন, দেখতে পেলেন কনকলতাও সে-ধারায়ই ভাবছেন। ভাবনার সঙ্গী পাওয়াতেও হয়ত সরস হল তাঁর মন। তাঁর একটা প্ল্যান চীফ এঞ্জিনীয়র মঞ্জুর করলে যেম্নি সরস লাগত দিনটা—এ-সময়টা তাঁর ঠিক তেম্নি সরস মনে হল।

বললেন,—অদ্ভুত—জানলে? এমন সময় যা হয় না, আজ চায়ের একটা ভীষণ তেষ্টা

পেয়েছিল আমার।

নিজেকে জাহির করবার অভ্যাস নেই কনকলতার। বলতে গেলে, তিনি সেকেলে মেয়েই। প্রথম মহাযুদ্ধের বছরে জন্ম। যুদ্ধ শেষ হলেই তো সত্যিকারের এ-কাল সুরু হল। না কি ফিরে আবার সেকাল? গান্ধীজি চরকা কাটতে বললেন। পাঁচ ছয় বছর বয়স হবে তাঁর তখন। ঠিক মনে নেই। তাছাড়া কাল নিয়ে মারামারিতেও মন নেই। বরং বলা যায় তিনি খাঁটি পিতৃতন্ত্রের মেয়ে। ঘরের বাইরে যাবার ইচ্ছেকে যেমন দমন করতে হয়েছে, তেম্নি নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে লাফিয়ে উঠবার বা কাঁদুনি গাইবার বৃত্তিটাকেও চাপতে হয়েছে। কাজেই গত রাত্রির অনিদ্রাকে তিনি চা-পানের ইচ্ছার সংগে জড়িত করে কথা বললেন না, বললেন,—চায়ের সংগে তুমি কী খাবে? স্লাইস্ ব্রেড আছে কিন্তু মাখন নেই। ওম্নি টোস্ট করে দেব?

—এতো সকালে শুধু চা-ই ভালো। অসিতরঞ্জন স্ত্রীকে দেখছিলেন, পুরনো দৃষ্টিকে নতুন করে দেখছিলেন আবার যেন আঠারো-উনিশ বছরের এক তরুণীকে।

—কোথায় দেব তোমার চা? বারান্দায়?

—তা-ই চলো। হাত বাড়ালেন অসিতরঞ্জন।

—থাক্। আমিই নিয়ে যাচ্ছি। একটা কাপ নিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন কনকলতা।

অসিতরঞ্জন বললেন,—ট্রেতে দু'টো কাপই তুলে নাও।

কনকলতা হাসলেন। বয়স সত্ত্বেও তাঁকে সুন্দর দেখালো। অন্তঃকরণ ভালো না হলে হাসলে না কি কাউকে সুন্দর দেখায় না। হাসলেন কনকলতা, হয়তো তাঁরও অতীতের একটা সময় মনে পড়ল বলে। এখন ছেলে-মেয়েদের আমলে যেম্নি, তেম্নি শ্বশুর-শাশুড়ির আমলে স্বামীর সংগে বসে তিনি খান নি। খেয়েছিলেন একটা সময়ে যখন স্বামী-স্ত্রী তাঁরা একা। তখনকার সময়টাই মনে এলো কনকলতার। ছোট ট্রেতে দু'টো কাপ তুলে নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

ঘরের বাইরে এলেন অসিতরঞ্জন, পেছনে কনকলতা। সপ্তপদের দিনটার কথাও মনে আসতে পারত ওঁদের। অসিতরঞ্জনের সুরু হয়েছিল তা বত্রিশ-তেত্রিশ বছর আগে। হাল-ফ্যাশনে বিবাহ-বার্ষিকী পালন করলে হয়তো প্রতিবছরই মনে পড়ত এক সঙ্গে সাত পা' হাঁটার কথা। কিন্তু তা যখন নয়, আজ কি হঠাৎ মনে পড়বে তাঁদের মিলনের এই প্রাচীন রীতি?

হয়তো মনে পড়ল। দু'জনেরই। বারান্দায় দু'জন পাশাপাশি বসে অনেকটা যেন উজ্জ্বল দেখাল। কাল সন্ধ্যায় ঘরের দু'টি খাটে দু'জন বসে যতোটা বিমর্ষ হয়েছিলেন তাঁরা, ততোটাই যেন এখন সুখী। কাল চিত্রার চিঠিই ময়লা করে দিয়েছিল দু'জনের মুখ। এখন চিত্রা নেই। যেন মিত্রা, অলক, সিপ্রাও নেই। আছে দু'জন। কোন্ সময়ে তা জানা নেই।

—চা-টা অপূর্ব হয়েছে—প্রথম চুমুকেই বললেন অসিতরঞ্জন।

—খুব সকালে চা খেতেই ভালো। চা-তৈরীর প্রশংসাটাও গায়ে মাখাতে চাইলেন না কনকলতা।

—এমন সকালে অনেকদিন পর চা খাচ্ছি, তা-ই না?

—হুঁ। অনেকদিন পর। হাসলেন কনকলতা।

—কোথায় খেয়েছিলাম প্রথম বলো ত? পাবনায় না বহরমপুরে?

—হবে কোথাও। চুমুকে ঠোঁট ঢাকলেন কনকলতা।

—মিতু তখন আসেনি। বলেই চুপ করে গেলেন অসিতরঞ্জন। যেন একটু বিবর্ণও।

পরিবারের দৃশ্যটা সন্ধ্যার ছায়ার মতো চোখের উপর নেমে এলো। কালকের সন্ধ্যার ছায়ার মতো। ভাবলেন, কতো জায়গাই উন্নত হল তাঁর হাতে, উন্নতি হল তাঁরও, কিন্তু পরিবারকে উন্নত করতে পারলে না তিনি। শিক্ষা কি দ্যাননি ছেলে-মেয়েদের? কিন্তু কোনো শিক্ষাই হয়তো তারা নিতে পারল না। মিতু বা কী করল! আর এখন চিতু! জওহরলালের চিতা জ্বলবে আজ। এ পরিবারেও তা-ই জ্বলল। চিত্তরঞ্জনের চিতার দিকে গান্ধীজি কপালে ভাঁজ তুলে যেদিন তাকিয়েছিলেন, অসিতরঞ্জনও বোগান-ভিলির গুচ্ছে তেম্নি তাকিয়ে রইলেন।

মেয়েদের উপর বাপ যতোটা কঠোর হতে পারেন না, মা তা পারেন। কনকলতা বললেন, —না এলেই ভালো ছিল। কেউ যদি না আসত, তা-ই ভালো ছিল।

আনার অপরাধ গায়ে মাখিয়ে অসিতরঞ্জন কাপের কাণায় ঠোঁট ঘষে বললেন,—তুমিই ভুগেছ বেশি। আমার কী? মফঃস্বলেই তো বেশি থাকতাম!

—ভোগান্তির শেষ যে কোথায় তা-ই ভাবছি।

—হুঁ। দু'জন তো আরো রয়েই গেছে।

—তোমাকে তো বলছি—চলো না কোথাও তীর্থে চলে যাই!

—তীর্থ?

একই রকম প্রশ্ন শুনলেন স্বামীর মুখ থেকে কনকলতা। যতোবারই তিনি তীর্থে যাবার কথা বলেছেন, অবাক হয়ে যেন প্রশ্ন করেছেন অসিতরঞ্জন, তীর্থ কেন? দেবতা-ঠাকুরে ভক্তি নেই স্বামীর, তাই কনকলতা গত দশবছর যাবৎ প্রচুর ধর্মগ্রন্থ কিনিয়ে পড়েছেন। একসময় মা আনন্দময়ীর সঙ্গেও দেখা করতেন মন্ত্র নেবার জন্যে। কিন্তু মা মন্ত্র দেন না। তারপর গীতার ও ভাগবতের বাংলা-অনুবাদ পাঠের ফলে শ্রীকৃষ্ণকেই উপাস্য জেনে তিনি কৃষ্ণের দু'ফুট এক ত্রিবর্ণ-চিত্র সংগ্রহ করে এবং দু'ইঞ্চি' ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঠাকুর ঘরে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করলেন। ঠাকুর-ঘর তৈরী ছিল না। ভাঁড়ারের আর্ধেক দখল করলেন কৃষ্ণ-ঠাকুর খিঁচুড়ির বা পায়েসের আতপচালে ভাগ বসিয়ে। ভোগের অন্ন খেতে ভোগী অসিতরঞ্জনের আপত্তি নেই, যতো আপত্তি ছিল তাঁর পার্টিশন-দেয়াল তুলবার বেলায়! ও প্রশ্নে নিশ্চয় স্বামী বোঝাতে চান, তীর্থ তো তৈরীই করেছ, আবার কোন্ তীর্থে যাবে?

কনকলতা বললেন,—তীর্থে যায় না মানুষ?

—যায়। অনেক সহজ হয়ে এলো অসিতরঞ্জনের গলা,—মহাপুরুষরা যেখানে দেহ-রক্ষা করেন সেখানে যাবে না কেন মানুষ? তারপর হাল্কা হল গলা,—তুমি তো মহাতীর্থে আছো! সতীর দেহের অংশ পড়েনি কালিঘাটে? তাছাড়া হাল-আমলের তীর্থস্থানও তো কলকাতা। রবীন্দ্রনাথের মতো মহামানব এখানে দেহরক্ষা করেছেন!

বিয়ের আগে রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা" পড়েছিলেন কনকলতা এবং বিয়ের পর তাঁর শোভনলাল অসিতরঞ্জনকে বলেছিলেন,—"শেষের কবিতা" খুব ভালো বই, না? হাল-আমলের শিবপুরের হবু এঞ্জিনীয়রদের মতো কাব্য-প্রীতি ছিল না সেদিনের বিজ্ঞান-প্রিয় ছেলেদের, অন্তত অসিতের তো নয়ই—"শেষের কবিতা" তিনি তখনও পড়েন নি, তবু বোকা না বনে বুদ্ধিমানের মতো চাপা হাসিতে সঙ্কট এড়িয়ে গিয়েছিলেন। অলকের শান্তিনিকেতনে পড়াও কনকলতার ইচ্ছাপূরণ ছাড়া নিজের রুচিতে নয় অসিতরঞ্জনের।

কনকলতা বুঝতে পারলেন স্বামী তাঁর পুরনো আগুন উস্কে দিতে চাচ্ছেন। নইলে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ কেন? কনকলতাকে "নষ্টনীড়ে"র চারুলতা যে ভাবেন নি অসিতরঞ্জন

তা তো নয়, লাবণ্য না ভাবুন। এই মুহূর্তে কনকলতা বিষণ্ণ হয়ে ভাবলেন, নষ্ট তো হলই তাঁর নীড়! তিনি তা করেন নি! মিত্রাও ততোটা নয়, চিত্রা যা করল।

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে স্ত্রীর মুখে তাকালেন অসিতরঞ্জন। আশা করেছিলেন, তাঁর হাল্কা কথায় কনকলতার মুখে হাসি ফুটবে। কিন্তু উল্টোটাই দেখতে পেলেন তিনি। কাপের চায়ে তাকিয়ে আছেন স্থির দৃষ্টিতে। বিষণ্ণ, গম্ভীর। যেন চায়ের গেরুয়া রংটাই দেখছেন। কোনো সাধুসঙ্গ হল না জীবনে সেই অতৃপ্তিতে? শুনেছেন, দেব-বাবুর বাড়িতে বেলুড়-মঠের সন্ন্যাসীরা আসেন। জজবাবুর মুখে একদিন যেন শুনেছেন, না সচ্চিদানন্দবাবুর মুখে? ক্ষয়িষ্ণু মানুষকেই তন্ত্রমন্ত্রে পেয়ে বসে! কনকলতা একরকম দেব-বাবুরই দলের! কনকলতার শারীরবৃত্তের ক্ষয়িষ্ণুতা স্মরণ করলেন অসিতরঞ্জন। কনকলতা নিজেও তা টের পেয়েছিলেন বোধহয় দশ বছর আগে। টু আর্লি! স্ত্রীর মুখে হাসি ফোটাবেন বলেই এবার অসিতরঞ্জন পরিহাসে এলেন,—১৯৪৭ থেকে তো দিল্লীই পুণ্যতীর্থ—মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ-কুরুক্ষেত্রস্থল! গান্ধীজি দেহরক্ষা করলেন, তারপর এই তো জওহরলাল! আমাদের এখন আবার নেতাজির সেই শ্লোগান হওয়া উচিত : দিল্লী চলো।

অভিপ্রায় ব্যর্থ হল না অসিতরঞ্জনের। কনকলতা মুখ তুলে একটু হাসলেন।

ওটুকু হাসিই যথেষ্ট। অসিতরঞ্জন ভাবলেন। আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে যে হাসতে পারছি তা-ই যথেষ্ট মনে করতে হবে।

বললেন,—তুমিও আজ একটু সকালেই উঠেছ দেখছি! আমি উঠে যাবার পরেই, না? বিছানা-মশারি গুছিয়ে, ঠাকুর-ঘরে নামজপ করে তবে তো চা-তৈরী করছিলে!

দুঃখের অকেজো জগৎ থেকে যেন নিত্যকার কাজের জগতে ফিরে এলেন কনকলতা। বললেন,—জটার মা কি এলো? না এলে তো এক্ষুণি উনুনে যেতে হয়!

—কে জানে! ছুটির দিন আজ শোক করবার জন্যে—জটার মা-ও হয়তো শোক করছে!

—জওহরলালকে সবাই তো ভালোবাসতেন! যাঁরা নিন্দা করেন, তাঁরাও।

—যাবে না কি প্রয়াগে? জওহরলালের জন্মস্থানে?

—তাছাড়া তা বুঝি ত্রিবেণীসঙ্গম নয়?

—ভারতের এক ইঞ্চি মাটি দেখাতে পারো যা তীর্থস্থান নয়?

—হেঁ—সেই কোন্ মরুভূমিও তো তীর্থ—কোন্ বই-এ পড়ছিলাম!

—তোমার ধর্মগ্রন্থ পড়বার সেই তো উপক্রমণিকা!

—না-না, 'পরমপুরুষ'—উঠে দাঁড়ালেন কনকলতা।

—তাহলে একদিন দক্ষিণেশ্বরই চল। জীবিত রাজামহারাজ, পুরুষমহাপুরুষকে দিয়ে বিশ্বাস নেই—কী বলো? হেসে উঠলেন অসিতরঞ্জন।

পাঁচ

পিনাকীরঞ্জন দেবের বাড়ির সীমানা থেকে গড়িয়াহাটা রোড বরাবর দক্ষিণে সচ্চিদানন্দ ঘোষের বাড়ি পর্যন্ত আপনি একটি খালি-প্লট বা দু'টি মোটর-চলাচলের ফাঁড়ি দেখতে পারেন কিন্তু অনভিজাত কিছুই পাবেন না। শুধু কাঁচা ড্রেন। আর গড়িয়াহাটা-টা

দক্ষিণাপথ বলেই ততো চওড়া নয়। তবে স্বাধীনতার পর উত্তরাপথ যখন প্রশস্ত হয়েছে এবং ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট যখন আশ্বাস দিচ্ছেন, বিশালকায় সেতুবন্ধ অচিরেই সুসম্পন্ন হবে আর তার জন্যে যোধপুর পার্কের লাগোয়া জমিও নেওয়া হয়ে গেছে, তখন দক্ষিণ গড়িয়া-হাটাও প্রশস্ততার স্বপ্ন দেখতে পারে। পারে কী, দেখছেই। যেদিন থেকে বাস-রুট হয়েছে সেদিন থেকেই। তারপর দোতলা বাস চলবার পর তো আরো। ট্রামও না কি আসবে পুলের উপর দিয়ে। দ্বিতীয় হাওড়া ব্রীজ! কাজেই দেব-বাবুর বাড়ি থেকে উত্তরে এগোলেই দেখবেন দোকানের সারি, দুষ্প্রাপ্য ট্যাক্সির দিনেও দু'চারটে ট্যাক্সি আর মোড়ে, ঢাকুরিয়া স্টেশন রোডের মোড়ে, রিক্সার বিরাট জটলা। যদিও দোকানগুলো জাঁকালো নয় এবং রিক্সাও কিছু অভিজাত বাহন নয় তবু রাস্তা চওড়া হয়ে গেলে গোলপার্কের আভিজাত্য যে ব্যবসায়ীদেরও স্পর্শ করবে না কে জানে? তাছাড়া রাস্তার পশ্চিমে যোধপুর পার্কে পশ্চিমী আভিজাত্য তো ক্রমবর্ধমান। এবং পূবেও পশ্চিমের স্মৃতিবিজড়িত এন্ড্রুস স্কুল এখনও আছে। দেববাবু, জজবাবু, বীমাবাবু, এঞ্জিনীয়রবাবু এলাকাটা নিয়ে মোটামুটি সুখীই ছিলেন। ভবানীপুর-বালিগঞ্জের আভিজাত্য তো আসি-আসি করছে, তবে উডস্ট্রীট-ক্যামাক্‌স্ট্রীটের আভিজাত্য নয়। এতোটা জায়গা জুড়ে বসেও আর বাগান নিয়েও কি দেববাবু সেই আরণ্যক শান্তি আনতে পারলেন? এনেছিলেন নাকি রাজা প্রফুল্ল ঠাকুর! মস্ত বাগান! কোথায়? দক্ষিণেশ্বর? দক্ষিণেশ্বরের শান্তি কোথায় এ গড়িয়াহাটায়? হাট গড়ে উঠছে। ঐ বাসের দরুণই যতো অশান্তি! ব্রেক-কষার কী বেয়াড়া আওয়াজ! তাছাড়া দক্ষিণের দোকানগুলো? ডাক্তারের চেম্বার সহ্য করা যায়, ইলেকট্রিক্যাল্‌স্‌ শপও কিন্তু মুদীখানা? ওটার অস্তিত্বই তো বোঝায় রোজ-রোজ চাল-ডাল-তেল-নুন-মশলা কিনে খাবার লোকও আছে এ-পাড়ায়। যেম্নি কাঁচা নর্দমা, তেম্নি হয়তো ওদের সংসার!

ওরা আছেই তো। পান-বিড়িওয়ালা, রিক্সা-ওয়ালা নেই? যারা দিনমজুরেরই সামিল। ঝুড়ি-কোদাল হয়তো ছেড়েছে কিন্তু ইলেকট্রিক মিস্ত্রি নেই? এক টাকায় ইঞ্জেকশন দেবার জন্যে ডাক্তারের কম্পাউন্ডার নেই, দু'টাকায় দাঁত-তোলার ডেন্টিস্ট? ফড়ে লন্ড্রিওয়ালা নেই? এসব বাজে মাল আছে যখন বাজে মালের মুদীখানা থাকবে না? শাঁসালো যদি বাড়ছে, বাজে মালও বাড়ছে! দেশে জন্মের হারটা কেমন এবং কোথায় তা বেশি? মুখপাত্র দেখে কী বুঝবেন? একটু ভেতরে প্রবেশ করুন—ঢাকুরিয়ায় ঢুকুন, দেখবেন। কিন্তু এঁরা ভুলেও একটি পা বাড়াবেন না সেদিকে—দেববাবু-জজবাবু-বীমাবাবু এন্ড সন্স। এঞ্জিনীয়রবাবুর ছেলে অলক মাঝে-মাঝে স্টেশন রোডে ঢোকে সাহিত্য-সভা থাকলে আর সেলিমপুর রোডেও প্রবেশ করে চীনা-পন্থী সুহৃদদের সঙ্গে।

সচ্চিদানন্দবাবুর দক্ষিণ সীমান্তে যে ইলেকট্রিক পাখা আর বাতির দোকান, মোটর মেরামতেরও—তার সামনে দাঁড়িয়ে সমান-বয়সীদের সঙ্গে অলক আড্ডা দিচ্ছিল। দোকানে বসেও মালিক আর কর্মরত মিস্ত্রি আড্ডার আলাপে দুটি-একটি কথা ছুঁড়বার লোভ সংবরণ করতে পারে না। বাবার মতোই রুশ-পন্থী ছিল অলক। কিন্তু সম্প্রতি উষা কোম্পানীর ধর্মঘটে রুশ-চীনের একজোট হওয়ার ফলে কিছু চীনপন্থী সুহৃদও জুটিয়েছে। তাহলেও সে টেরিলিন পরে এবং প্রায়-নর্দমা-নল পাৎলুন। ফলে প্রায়-বুকপিঠখোলা জামায় শোভিতা একটি দময়ন্তীও জুটেছিল যে এখন অলককে কিছু না বললেও অদূর অতীতে নলরাজা বলে নির্বাচিত করেছিল। অলকের অলকদাম কিছুদিন আগেও উত্তম কৌমার্যে শোভিত

ছিল সম্প্রতি খেলোয়াড়ের বৈধব্যে (বৈদগ্ধে?) স্বস্বীকৃত। হলেও, সিনেমায় আর খেলায় তার সমান অনুরাগ যেমন্নি সাহিত্যে আর লাল দেশগুলোতে।

জওহরলাল রুশবিপ্লবের ধাক্কায় সমাজতান্ত্রিক হলেন, না লাল চীন দেখার ফলে, তা নিয়ে সশব্দ অলাপ চলছিল যুবকদের মধ্যে। দোকানের মালিক, যিনি কিছুদিন আগেও উষা কোম্পানীর ধর্মঘটীদের বাড়ির 'ফ্যান' জলের দরে কিনে নিয়েছেন, হেঁকে বললেন : ওসব বলে কী হবে, বলুন! বাঙালীর মাছ-ভাতের কথা কে ভাবছেন? লালগম আর শালগম খেলেই হবে?

অলকের ধূর্ত বন্ধু বিকাশ, যে তাকে দুই গলিতেই ঢোকায়, বিড়ালের মতো হেসে বল্লে—শিববাবু আজকাল কিছু পড়াশুনো করছেন, দেখছি!

—করতে হয়। যে-শেক্সপীয়র সুরু করেছেন চারদিকে!

উত্তর এলো। ঢাকুরিয়ার শেক্সপীয়র-উৎসবে ছিল বিকাশ। উৎসবের তারিখ ছিল ২৭শে মে। ভেস্তে গেল। জওহরলাল মারা গেলেন। সব আয়োজন পণ্ড। তবে কি হবে না? হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু মে-মাসে আর হল না। 'মে-ডে'র মাস!

বিকাশকে অলকই ধূর্ত বলত আধুনিক সাহিত্যের রাজা-উজীর নাকি তৈরী করে সে আবার রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকীতে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতাও দিয়েছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যাদর্শ মৃত্যুহীন! অলক বিকাশের পিঠে একটা চাপড় বসিয়ে বললে,—শিববাবুও শেক্সপীয়র পড়ছেন—বুঝবে মজা! নাবালকদের ছাইভস্ম লেখা নিয়ে যে হৈ-হৈ করে বেড়াও!

বিকাশ বললে,—বুঝিস নে—মধুরম্ বালভাষিতম্।

সেলিমপুর রোডের, বার্মিজ লুঙি-পরা, হলদেরং প্রণব দুর-দুর করে উঠল,—ধেৎ! তোরা হচ্ছিস আসল ভণ্ড! উপাধ্যায়কে করবি প্রধান-অতিথি আর শেক্সপীয়রকে বলবি জন-গণের কবি!

বিকাশ॥ উপাধ্যায়ের উপর তোর রাগ কেন? ও'র সাহিত্যের ইতিহাসে তো আছে—কোনো-কোনো বাঙালী 'মোঙ্গোলিয়ান'!

—যাক্-যাক্—শেক্সপীয়রও নয়, উপাধ্যায়ও নয়! অলক বললে,—মোদ্দা কথা—লালচীন দেখে এসেই তবে জওহরলাল সোশ্যালিস্ট হলেন!

—সোশ্যালিস্ট! কথা নয় যেন একটা সশব্দ ঘোড়ার হাঁচি শোনালে প্রণব,—বললেই হওয়া যায় কি না!

অলক॥ অন্তত সোশ্যালিস্ট ফিলসফিতে তো বিশ্বাস করতেন! স্টেট্স্ম্যানের প্রবন্ধ পড়িস্নি আজ?

বিকাশ॥ কিন্তু 'এ-আর'এর লেখা অপূর্ব!

প্রণব॥ 'এ-আর' আবার কোন্ মক্কেল?

অলক॥ অভিজিৎদা। খবরদার, আমার পড়শী—শ্ল্যাঙ বলবিনে।

প্রায়ই চুপচাপ থাকে কিন্তু সব-সময়ই হাসে আর মাথা নাড়ে সত্যপ্রসাদ। উষা কোম্পানীর এ-গ্রেড ফিটার—আনোয়ার শা' রোডের মোড়েই বাড়ি—টালিগঞ্জ থানার কাছাকাছি। ধর্মঘট করতে হয়েছিল, কারখানায় ঢোকা যায় না বলে। ঠিক মজুর তো নয়। মজুরের সর্দার। কথা বলার মুস্কিলও আছে তার। কিছু বলতে গেলেই বিকাশ "রক্তকরবী" থেকে কথা উদ্ধার করে ছুঁড়ে দ্যায়। তবু বলে। ক্বচিৎ, কদাচিৎ। যেমন এখন বল্লে,—অভিজিৎ রায় পাক্কা-সায়েব কি না—খানা খেলেও গ্র্যাণ্ডে খায়—বিকাশের

হয়তো ও'কে ব্লু-ফক্সে টানবার রোখ!

অলক হেসে উঠল,—সব শেয়াল কি নীল শেয়াল হয়েছিল?

মুখ সুঁচলো করে কী বলতে যাচ্ছিল বিকাশ, প্রণব বললে,—এক কাজ কর বিকাশ! উপাধ্যায়ের সঙ্গে তো খুব ভাব জমিয়েছিস্! তোরা দুজনেই সাহিত্যের বাতিক ছেড়ে সিনেমায় ঢুকে যা। বিকাশ রায়কে গিয়ে বল্—ভিলেনের পার্টে আমাকে একটা চান্স দিন, স্যর! যদি চান্স পাস, একবার মাত্রই পাবি—অন্তত বিকাশ রায়ের কাছে। কারণ, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, তোকে অভিনয় করতে হবে না, যা বিকাশ রায়কে করতে হয়!

রাগী আজকাল কে নয়? সবাই বদমেজাজি! আর এ তো রাগ করবার মতো কথাই। বিকাশ ফেটে পড়ল,—তোদের সঙ্গে কথা কী? তোরা তো দুনিয়াশুদ্ধু লোকের উপর ক্ষেপে আছিস! আমারও ক্ষেপবার অধিকার আছে—জেনে নে!"

শিববাবু খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তবু গলা শোনালেন,—কী হলো!

সত্যপ্রসাদ নিরুত্তাপ গলায় বললে,—এখনো হাতাহাতি নয়!

ঠোঁট কামড়ে প্রণব বললে,—হতে কতোক্ষণ!

অলক এক লাফে একটু দূরে সরে বল্লে,—তোরা এখনো হাফ-মস্তান রয়ে গেছিস্!

খদ্দের বিদায় করে শিববাবু ফুটপাথে এসে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে বললেন,—হয়েছে—হয়েছে! বন্ধুদের মধ্যে ও-রকম চলেই আজকাল! হিন্দি-চীনি ভাই-ভাই ছিলাম না আমরা—তারপর তো কতো গোলাগুলি চলল!

কথাটাতে প্রণব কাবু হবে ভেবে বিকাশ আবার বিড়ালের হাসি হাসল।

জজবাবুর ছোট ছেলে সুপ্রিয় দৈবাৎ এদের জটলায় এসে দাঁড়ায়। যেদিন ট্যাক্সি পায় না, হেঁটে স্টেশন-রোডের মোড় পর্যন্ত গিয়ে ট্যাক্সি খুঁজতে হয়, মাত্র সেদিন। তেমন দিন সপ্তাহে একটির বেশি নয়। যাদবপুর থেকে খালি ট্যাক্সি আজ বোধহয় মোটেও আসছিল না সুতরাং হাঁটার পথে এঞ্জিনীয়রবাবুর ছেলেকে দেখে থামল সুপ্রিয়। অলকের সঙ্গেই তার যা-একটু কথাবার্তা আছে—আর-আরদের মুখ চিনলেও রক্তের খবর জানে না। সে জানে তার আর অলকের রক্ত প্রায় কাছাকাছি গোষ্ঠীর, অন্তত 'বি-গ্রুপে'র নয় যা রাশিয়ার চাষীতে আর চীনের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মেডিসিন পড়া ছেড়ে দিয়ে আসবার আগে ওই জাতিতত্ত্বটুকু সে শিখে এসেছে। ছেড়েছে সে অনেক-কিছুই এবং ধরেছেও বহু। যেম্নি বিদ্যা তেম্নি বিদ্যাধরী। ফলে এখন ভাবছে : মেহেরালি, সব ঝুট্ হ্যায়।

অলকই ডাকল সুপ্রিয়কে, থামল দেখে,—শোনো—যাচ্ছ কোথায়? গোলপার্ক? মুচকি হাসলও অলক।

সুপ্রিয় এগোলো,—গোল মানে শূন্য! তাছাড়া পাবার আর কী আছে বলো?

—পরীক্ষার্থীদের? হাসিটা উঁচু হল অলকের।

—পরীক্ষার ভয় আর নেই। যাদের আছে তাদের নিয়েই ভয়।

—যেমন? অলকও এগিয়ে কাছাকাছি হল সুপ্রিয়র।

সত্যপ্রসাদ আর প্রণব সুপ্রিয়কে এক নজর দেখেই মাথা নীচু করলে। তার মানে এই নয় যে সাপের চোখে ধুলো পড়েছে। সুপ্রিয় তাদের না চিনলেও, তারা সুপ্রিয়কে চেনে। চেনে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে, বড়োলোকের নষ্ট ছেলে হিসেবে। তাই মনে-মনে শ্রেণীদ্বন্দ্বে ভোগে। কিন্তু শিববাবু সুপ্রিয়কে থামতে দেখেই গদগদ হলেন। সৌন্দর্য-উপভোগের মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। দেখনহাসি! বিকাশ এ-সুযোগ

হারাতে চাইল না। জনসংযোগের জন্যে সব সময়ই সে পা বাড়িয়ে আছে। সুপ্রিয়র দাদা সুব্রতবাবু যে 'পি-আর-ও' তা-ও তার জানা। কে জানে, কোনো প্রতিষ্ঠানের 'পি-আর-ও' হবার শিক্ষানবিশিই করছে কি না বিকাশ। হাফ্-সাহিত্যিক না হয়ে সাংবাদিক সাহিত্যিকের কাজ করে যদি এই জন-সংযোগের ব্যাপারটা সে চালিয়ে যেতে পারত তাহলে তার আকাদমী-পুরস্কার আর রবীন্দ্র-পুরস্কার মারে কে? আর এও তো তার জানা আছে যে উপাধ্যায় এম্নি করেই যোধপুর-পার্কে বাড়ি করেছেন। বিকাশও এগোল সুপ্রিয়র দিকে তাক করে। গুলি ছুঁড়ল,—ভালো আছেন?

—এই এক-রকম। লেগেও লাগল না গুলি।

সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীর রকমটাই বোঝাচ্ছিল অলককে,—আমাদের হার মানিয়েছে, বলতে হয়। এক-আধটা গল্পে পড়েছি, চোখে দেখিনি ও-রকম। দেখলাম গ্রীষ্মের ছুটির দিনে এন্ড্রুস-স্কুলের সামনে।

দিদি এন্ড্রুস-স্কুলের টীচার, তাছাড়া দিদির বিবাহিত জীবনটাও এক ট্র্যাজিডি তাই অলক আশঙ্কায় একটু পিছিয়ে গেল কিন্তু বিকাশ উদগ্রীব শ্রোতার ভঙ্গীতে সুপ্রিয়কে তাতিয়ে দিতে চাইল।

ঘটনাটা যে খুব রসালো নয় মুখের তেমন একটা ভঙ্গী এনে সুপ্রিয় বললে,—ইউনিভার্সিটিতে এখন কিসের জোয়ার, অলক? চীন, বিটনিক না ড্রেন-পাইপ?

যতোটুকু পিছিয়ে গিয়েছিল অলক ততোটুকু এগোলো,—মাস্টারদের ভেতর? না, ড্রেন-পাইপ এখনো ঢোকেনি!

—কাঁধে-ঝোলানো ট্র্যান্‌জিস্টার?

বিকাশ সশব্দে হেসে উঠল। দৃষ্টি আকর্ষণের অভিপ্রায়ে, মজা পেয়ে ততোটা নয়।

—তা-ও না। ঠোঁটে সামান্য হাসি তৈরী করে তুলল অলক।

—কিন্তু স্কুল-ছেলেদের তা-ই দেখলাম। মেয়ে দেখবার জন্যে তিনটি টিন-এজারর্স দাঁড়িয়ে আছে। একজন ড্রেন-পাইপ, অপর পা'জামা-ট্র্যানজিস্টার তৃতীয় খেলোয়ার-চুল হাফ্-প্যান্ট। পাশেই ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি।

অলক ভোজন-তৃপ্তের গোলগাল মুখে বললে,—ওরা শান্তিনিকেতনে পড়তে যায় না কেন?

অম্লানবদনে বললে সুপ্রিয়,—ততো পয়সা নেই। ট্র্যান্‌জিস্টারটা হয়তো ধার করা।

ছেলেদের রূপে তৃপ্ত হল না বিকাশ গুণের আস্বাদ চাইল,—কী বলাবলি করছিল ওরা?

—মেয়েরা তো ইউনিফর্মে—শাড়ি যেন ছিল না। তা হলেও বা কী? আকাশচারিণী হলেও কি ওদের মর্ত্যের পিপাসা যায়! কথায় সাহিত্যিক ভঙ্গী নিয়ে এলো সুপ্রিয়।

বিকাশ রুশ-পন্থীর সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করলেও এখন আলগা হয়ে এলো, যেম্নি চীন-আক্রমণের সময় চিনি-ভাই থেকে আলগা হয়ে 'চিনে ড্রাগনের বিষ' চেনাতে চেয়েছিল বাংলাদেশকে একাধিক কবিতা লিখে। উপাধ্যায় তখন কবিতার নামে কেলেঙ্কারি করছেন? কিন্তু বিকাশ তখন প্রচার করছিল, কবিতায় শ্লীলতাহানির যুগে উপাধ্যায়ের কলম বাংলা কবিতাকে নতুন পথ দেখাবে। উপাধ্যায়ও ঋণ-শোধ করছিল, তার বাড়ির আড্ডায় ঘোষণা করে, বিকাশের আর যে পরিচয়ই থাক্, উৎকৃষ্ট কবি হিসেবে তার সমাদর হওয়া দরকার। খবরগুলো জানা ছিল বলেই অলক তাকে ধূর্ত বলত। এখনও বিকাশের চোখে-মুখে সেই

ধূর্তামিই দেখতে পেল অলক কিন্তু চুপচাপ রইল।

বিকাশ বললে,—হাঁ—মেয়েদের মেয়েলিপণা বাড়ছে এখন!

—সে তো পুরুষের পক্ষে সুবিধের কথা! অনিচ্ছুক হাসিতেও সুপ্রিয়র পালিশ মুখ পালিশতর দেখালে,—কিন্তু টিন-এজার্সরাও যদি মেয়ে-পুরুষের দৈহিক সম্পর্কটা শিখে ফ্যালে আমেরিকান "লোলিতা"র মতো তাহলে, জানলে অলক, আমার মতো পুরুষও তাতে রাজি নয়।

টিন-এজার্স মেয়ে আছে দু'জনের পরিবারেই কিন্তু সুপ্রিয় যে বড়ো ভাইঝিটিকে স্মার্ট করবার অভিপ্রায়ে তার 'সফরি'র আড্ডায় নিয়ে যায় এবং এক অখ্যাত সাংস্কৃতিক-সংস্থার নৃত্য-নাট্যে "চিত্রাঙ্গদা" "শ্যামা" প্রভৃতির ভূমিকা সংগ্রহ করে ভাইঝির জন্যে, তা অলকের জানা খবর কিন্তু সিপ্রা যদি এ-বয়সেই বিদেশী রীতির 'প্রেম' করতে সুরু করে তা ভেবে ভুরু কুঁচকোল অলক। বললে,—মেয়েরাও ফষ্টিনষ্টি করছিল ছেলেদের দেখে, তাই না?

—ছেলেগুলো নষ্ট, মেয়েরা নষ্টি হবেই! হাসিটা মুখ থেকে মুছে সুপ্রিয় হাত-ঘড়ি দেখে বললে,—এবার আমি পালাই অলক। সাড়ে দশটায় একটা এন্‌গেজমেন্ট আছে।

দৃশ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হল সুপ্রিয়। স্বস্থানে ফিরে আসতে-আসতে বিকাশ বললে,—বিত্তবানদের সঙ্গে মেলামেশি করলে তাদের সম্পর্কে ভুল ধারণা ভেঙে যায়।

অলক বললে,—ভেঙে যাবার আগে কী থাকে ধারণাটা?

—এক্সপ্লয়টার তো বটেই!

—আগাগোড়াই তা-ই। ধারণাটা বজায় রাখ, বিকাশ!

সত্যপ্রসাদ বললে,—কার কথা বলছিস?

অলক হাসলে,—বিত্তবানদের কথা।

—কিন্তু মজা এই—সত্যপ্রসাদ হাসলও ঘাড়ও নাড়ল,—বিত্তবানরাই সমাজতন্ত্র করে—আমাদের মতো মজুররা নয়।

গম্ভীরমুখ গম্ভীরতর করে বললে প্রণব,—হাঁ—জওহরলালের সমাজতন্ত্র।

ভুরু কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে নিলে বিকাশ।

অলক বললে,—ক্রুশ্চফের মতো মরা মানুষ টানছিস কেন? সমাজতন্ত্র জওহরলালের কাজ তো নয়, ফিলসফি।

ক্রুশ্চফের নিন্দায় খুশী হল প্রণব, বললে,—সবাই ক্যাপিটালিষ্টের দালাল!

সত্যপ্রসাদের মুখ খুলে গেছে হঠাৎ আজকের আবহাওয়ায়, বললে,—ক্যাপিটালিষ্টরা তোমাদের সমাজতন্ত্রে কোন্ বাধা দিচ্ছে—করো না সমাজতন্ত্র যদি মুরোদ থাকে।

—আমাদের সমাজতন্ত্র যখন পুঁথি-কেতাবের বস্তু, তখন কে সমাজতান্ত্রিক নয়? রবীন্দ্রনাথ নন? রাজার নাতি, জমিদারের ছেলে, লিখে যাননি সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য—"রক্তকরবী"? অলক তার শান্তিনিকেতন-বাসের ঋণ শোধ করতে চাইল কি না বোঝা গেল না।

—জওহরলালও বক্তৃতাই তৈরী করে গেলেন—মন্ত্রীত্বটা ছেড়ে শান্তিনিকেতনের আচার্যের হোল-টাইম জবটা নিলেই পারতেন। প্রণব তেতো মুখে বললে।

বিকাশ অলকের হাত টেনে বললে,—চল্—ষ্টেশন-রোডটা ঘুরে আসি!

অলক প্রণবকে নিরীক্ষণ করছিল, বিকাশের টান খেয়ে বললে,—কী রকম সরু চোখ

করে ফেলেছিলি প্রণব—বিকাশ সাধে বলে তুই মোঙ্গোলয়েড—চৈনিক? লক্ষ্য করলে সুপ্রিয় বলত 'বি-গ্রুপ ব্লাড'!

বি-গ্রুপটা তবু বিদ্রূপ নয়। প্রণব প্রস্থানোদ্যত হল।

বিকাশ সত্যপ্রসাদকেও টানতে চাইল,—যাবি নাকি সত্য কবি-সাহিত্যিকের গলিতে।

ঘাড় নেড়ে হেসে বললে সত্যপ্রসাদ,—গলিতে বা পার্কে সব জায়গাতেই আমি রাজি।

ছয়

দেববাবু, বীমাবাবু, জজবাবু—গড়িয়াহাটার এই সারি শেষ করে যোধপুর পার্কে তাকান—আপনার চোখ-বরাবর যোধপুর পার্কের পয়লা চওড়া রাস্তা সোজা চলে গেছে। ডাইনে পোস্ট-অফিস দিয়ে এলাকা সুরু। পোস্টবক্সে সযত্নে চিঠিটা ফেলে সুমিত্র উপাধ্যায় একটু তৃপ্ত দেখালে। কোনো উপন্যাস শেষ করে পাণ্ডুলিপিটা সংহিতাকে পড়তে দিয়ে যেমন গল-কম্বলের স্তর পড়ে চিবুকের নীচে, তা-ই পড়ল। চিঠিটা গোপালের হাতে না দিয়ে নিজের হাতে দিতে পারল বলেই যেন একটা প্রশান্তিও অনুভব করল সে। বুড়োমানুষ গোপাল—কোথায় কী রাখে মনেই থাকেনা এখন। একবার বাইরে পাঠালে দ্বিতীয়বার পাঠাতে নিজেরই কষ্ট হয়। থপ-থপ হেঁটে এই তো দেড় ঘণ্টায় বাজার সেরে এলো—তাও গড়িয়াহাট মার্কেট নয়, ঢাকুরিয়া বাজার—তাতেই গলদ্ঘর্ম। তারপর আবার পোস্ট-অফিস! আধঘণ্টা দুশ্চিন্তায় ভোগাবে। তবু আছে—ষোল বছর আছে বলেই আছে। আছে ওর আসার পর থেকেই, উপাধ্যায়ের যা বাড়-বাড়ন্ত বলে। গোপাল বাউড়ি। বিহার-বাংলার মেশানো ভাষায় কথা বলে। 'বিহার-মার্জারে' সই দিয়েছিল উপাধ্যায়, বন্ধু সুব্রত বলে, এই গৃহপালিত শান্তশীল মার্জারটির প্রেমেই না কি মুগ্ধ হয়ে! সে যা-ই হোক, যেম্নি মেছোকে তেম্নি ভৃত্যকে কে না আজকাল তোয়াজ করে? নেহাৎ-ই বুড়ো বলে পড়ে আছে গোপাল, বয়েস থাকলে কবে 'ঊষা'য় না-হয় 'সুলেখা'য় ঢুকে যেতো!

চিঠি ফেলার ব্যাপারে দু'-এক মিনিট গোপালের প্রসঙ্গ ভেবে সুমিত্র চিঠিটাকেই ভাবলে তারপর। এখন ঠিক পৌঁছে যাবে চিঠি নিউ-দিল্লীতে, প্রাইম-মিনিস্টার্স হাউসে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাতে। টেলিগ্রামে শোক-প্রকাশে আস্থা নেই সুমিত্রর। শত হোক সে সাহিত্যিক, তাছাড়া পণ্ডিতজির মৃত্যু তার আবেগের ক্ষেত্রে সাড়া জাগিয়েছে তো বটেই। তির্যক-পন্থী একটা কাগজ মন্তব্য করেছিল, 'বিহার-মার্জার' সমর্থন করে আমি না কি নেহরুর মতলবই হাঁসিল করতে চেয়েছিলাম! কথাটা মনে পড়তেই একটু হাসল সুমিত্র। ডাইনে যোধপুর পার্কের লেকের জলটাও রোদ পড়ে হাস্‌ছে! জলের রেখা কতোক্ষণ থাকে? খুব দ্রুত পরিবর্তন এলো সুমিত্রর মুখে: আরে মূর্খের দল—পশ্চিমবঙ্গ কি বিহারের সঙ্গে যুক্ত ছিলনা, ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ে? তখন নেহেরু কোথায়? অর্দ্ধ-স্বগত কথাগুলো লেক-ঘেঁষা একটা লোহার কন্‌স্ট্রাকশনের দিকে ছুঁড়ে দিল সুমিত্র। কন্‌স্ট্রাকশনটাকেই সেকেলে উইন্ডমিল ভাবল হয়তো সে।

পণ্ডিতজি নেই, এখন বুঝবে! শত্রুর প্রতীককে শেষ কথা শুনিয়ে সুমিত্র এসে রাস্তার ফাঁড়ির মুখে দাঁড়াল, যেখান থেকে মনে হয় রাস্তাটা দু' ভাগ হয়ে গেছে। ডানেই গেল সে, যেদিকে তার বাড়ি। বাঁয়ে সব অজানা বিত্তবানের শাঁসালো ভাড়াটে। তার এক-তলা, টবের বাগান—বলতে গেলে দীনজনকুটির।

ওখানেই তো পণ্ডিতজির সঙ্গে তার মিল! পণ্ডিতজি দারিদ্রের ব্যথা বুঝেছিলেন। তাই তাঁর সমাজতন্ত্রের দর্শন, মানবতা-ধর্ম! নিখুঁত আধুনিক মানুষ! সুমিত্রর অর্থের নেশা কেন? দারিদ্র্যের প্রতি ঘৃণায়। ওই ব্যাধিতে তো সে-ও ভুগেছে! জানে, কী যন্ত্রণা যে তা দিতে পারে!

সাফাই গাইতে ওস্তাদ উপাধ্যায়। পরের কাজের যতোটা নয়, নিজের কাজের। চ্যাংরা সাহিত্যিকরা বলছে আমার না কি কলম থামানো উচিত! পি-বি সান্ন্যালের দোতলার বারান্দায় অর্কিডগুলোতে তাকালো সুমিত্র—ওখানকার এক-দঙ্গল নাবালক ছেলে না-শুনুক কথাগুলো—অর্কিডই শুনুক : এককালে তো লিখেছি, না-হয় এখন কলম থামালামই। যা লিখেছি তা-ই তোরা লিখে দেখা না! শোনাল বটে সুমিত্র, কিন্তু সে জানে বাড়ি গিয়ে যদি দ্যাখে স্টেশন রোডের বিকাশ চন্দ একদল নাবালক সাহিত্যিক নিয়ে তারই মুখনিঃসৃত বাণী শুনবার জন্যে অপেক্ষামান তখন সে তাদের যা শোনাবে তা সম্পূর্ণ অন্যরকম না হয়ে কী উপায়? স্তুতি তো দেবতাও চান। এবং স্তুতি পেলেই বর দান। বরেও প্যাঁচ কষে সুমিত্র : আমরা আর কতোদিন লিখব আর লিখতে পারবও বা কেন? পঞ্চাশের পর তো বিদায়ের বিধান আছেই। তোমরা লেখো—আমাদের হারিয়ে দাও। হারিয়ে দিতে পারবে। এই তো বিকাশ, খুব ভালো লিখছে আজকাল! দ্বৈত-ভূমিকাটা হয়তো মনে পড়ল সুমিত্রর। মনে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল।

বেশ খানিকটা কবিতা এসে গেল শ্রীমতী ইন্দিরাকে লেখা চিঠিতে! সংহিতা তো পড়ে ভালোই বললে। ওর পড়াশুনো বিচারবুদ্ধি আছে। ও পাশ করে দিলে বাজারে সে লেখা পাশ হয়ে যাবেই। পাঠক আর আজকাল ক'জন? সবই তো পাঠিকা। ছেলেরা তো এঞ্জিনীয়রিং-এ, খেলার মাঠে-পাঠে, সিনেমায়-হোটেলেই ভিড় জমাচ্ছে!

'উপাধ্যায় কুটিরে' ঢুকল এসে সুমিত্র উপাধ্যায়। সিঁড়ির দু'পাশে কয়েকটা টব—কয়েকটা ফুলগাছ—বেল-জুঁই-হেনা-জাতীয়। বোঝা যায় ফুলদানির জন্যে নয়। সংহিতারই ইচ্ছায় ওই টবের বাগান। ফুল ছেঁড়েনা সে। ফুলদানীর জন্যে নয়, চুলের জন্যে নয়, বিছানার জন্যে নয়। বারান্দায় এসে মাঝে-মাঝে বই নিয়ে বসে যখন, তখন একটু সুগন্ধি হাওয়া পাবে বলে এই বাগান। ফুল ছিঁড়তে না-চাওয়াটা যে গ্যেটের চরিত্রে ছিল, তা অবশ্য সংহিতার জানা নেই। তবে, প্রেমে জবরদস্তিটা, যা আজকাল মেয়েদের চরিত্রেও দেখে অবাক হয় সংহিতা, তা সে, গ্যেটের মতোই কোনোদিন ভাবতে পারেনি। সুমিত্রর সঙ্গে তার বিয়েটা অবশ্যি শাস্ত্রীয় কিন্তু বিবাহ-পূর্ব বয়েসে যে সেদিনে মেয়েরা প্রেমে পড়তনা তা নয়। এমন ঘটনা সংহিতারও ছিল। ছেলেটি এলো, তাকে ছুঁলো, চলে গেল। তার পেছনে ধাওয়া করেনি সংহিতা। আজকাল তো না কি বিদেশে পর্যন্ত ধাওয়া করে মেয়েরা। সেখানে গিয়ে ছেলেকে ধরে বিয়েতে রাজি করায়। সংহিতার মুখে এ-ধরনের একটা কাহিনী শুনে সুমিত্র ভেবেছিল একটা গল্প লিখবে। কিন্তু সংহিতা বাধা দিয়েছে,—না-না, ওসব জানোও না, লিখতেও পারবেনা! সত্যি, এখনকার জীবনের কী জানে সুমিত্র? শুধু প্রতিপক্ষের রটনা নয়, ভাবতে গেলে নিজেও সে বোঝে। বুদ্ধি তার বিলক্ষণই আছে। কিন্তু চিত্রপরিচালকদের মন জোগাতে গেলে অনেকসময় মন টলে যায়। বলতে গেলে, যুদ্ধের বছরগুলো পর্যন্তই সে আধুনিক ছিল। অন্য কেউ জানুক আর না-ই জানুক, সে তো মনে-মনে জানে, পথচারিণী নষ্ট মেয়ের পেছনে সে ঘুরেছে। পয়সাও নষ্ট করেছে ঢের। পয়সা তো তখনই। কমিউনিস্ট-পার্টির প্রচারের কৃপায় কী কাটতি সব বই-এর!

অবশ্যি তাদের পার্টি-প্রোগ্রাম সমর্থন করে কাহিনী তৈরী করতে হত। স্বাধীনতার পর থেকে কমিউনিটি ডেভালপমেণ্ট নিয়ে কাহিনী! পয়সা টানবার কৌশল শিখে গেলে কি আর কোনো পরিবর্তনে ভুগতে হয়? পয়সা আসত প্রচুর আর নষ্টও করেছে সুমিত্র। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো তখনই একদিন ভাবতে পেরেছে : বিয়েটা মোর ইকনমিক, যেমন্দি ইকনমিক কুকার—জ্বালানি খরচা কম। তখনই বিয়ে। মার্কামারা লম্পটেরই বিয়ে হয় এদেশে—আর তার লাম্পট্য তো ভেতরে-ভেতরে! গৃহিনী জুটল। জুটলেই আবার অন্য খাতে খরচ। গৃহ চাই। হল জয়গা কেনা। হল যখন, তখন কি আর যোধপুর পার্কের জমির দাম আগুন ছিল? ছিল না, তাই হল। আয়করের ভয়ে তা-ই প্রচার করত সুমিত্র। এবং জমি কিনেও ছোট একতলা করবার টাকা যদিও তার হাতে ছিল তবু হয়তো আয়কর ফাঁকি দেবার জন্যেই কিম্বা বিত্ত ও যশের লোভে মোটা টাকার পুরস্কার-বিতরণী সংস্থার ব্যবস্থাপককে একদিন গিয়ে বলল,—একটা পুরস্কার-টুরস্কার যদি হয়, তাহলে মাথা গুঁজবারও একটা ঠাঁই হয়ে যায়! সভ্য ভদ্রলোক বিস্মিত হলেন কিন্তু পুরস্কার হল। তারপরই 'উপাধ্যায় কুটির।'

এ সমস্তই স্বামী-স্ত্রীর যার-যার নিজের জানা কাহিনী। দ্বিতীয় ব্যক্তি তার খবর রাখতে পারে কিন্তু সে তাদের জীবনে একবারই উঁকি দিয়েছে—আর নয়। কিন্তু সে দ্বিতীয় ব্যক্তি স্ত্রীর বেলায় স্বামী নয় বা স্বামীর বেলায় স্ত্রী নয়। সুমিত্র মদ খেলেও মতিশীল স্ট্রীটের শুঁড়ির দোকানই তা জেনেছে, সংহিতা জানতে পেরেছে স্বামী ভিনিগার খেয়ে এসেছেন।

বারান্দায়ই দাঁড়িয়ে ছিল সংহিতা, সুমিত্রর পোস্টাফিসে যাবার সময় যেমন্দি ফিরে আসবার সময়ও তেমন্দি।

সিঁড়িতে পা দিয়ে মনে-মনে বললে যেন সুমিত্র : এই তো গৃহ! এই প্রতীক্ষা! প্রকাশ্যে বলতেও কথায় মাঝে-মাঝে শুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করে সে। রবীন্দ্রনাথ না কি করতেন, তাই। 'গৃহ'র পরিবর্তে 'ঘর' মনে এলোনা তার। এ-ও একটা কারণ, যার জন্যে হয়তো এখনকার চ্যাংরা সাহিত্যিকের কাছে সে উপেক্ষা পেতে সুরু করেছে। প্রকাশকদের ঘরে সে নিজেও খবর নিয়ে জানতে পারছে, তার বই-এর প্রতীক্ষা কমতির দিকে। তাই হয়তো সংহিতার এই প্রতীক্ষা তার আজ একটু বেশি ভালো লাগল! কে জানে, আজ থেকে দিল্লীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার শুভারম্ভ হল কি না!

—দাঁড়িয়ে আছো! হেসে বললে সুমিত্র।

—থাকতে নেই? হাসল সংহিতাও।

নির্ভেজাল গণনায় যখন সুমিত্রর এখন ষাট চলেছে আর সংহিতার আট-চল্লিশ এবং যে ত্রিশোত্তীর্ণ বয়সে সংহিতার বিয়ে হয়েছে—স্বাভাবিক কারণেই তাদের বিবাহিত জীবনে এ-ধরনের নরম-নরম কথার উপস্থিতি অস্বাভাবিক ছিল। এখন তা মাঝে-মাঝেই উপস্থিত হয়। একমাত্র ছেলের বয়েস যখন মাত্র পনেরো তখন দু'জনেরই নবীন প্রৌঢ়তা ভাবতে বাধা কী? তাছাড়া, যৌবন তো যে-কোনো বয়েসেই দেখা দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথই উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে আছেন।

বসবার ঘরে এলো ওরা। বসল পাশাপাশি বেতের ডবল-সীটারে। একটা দেয়াল বুক-শেলফ না দেয়াল বোঝা মুস্কিল। অপর দেয়ালে নানা সাইজের মানপত্র সযত্নে বাঁধানো। তৃতীয় দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের চিত্র-শোভিত ক্যালেণ্ডার। চতুর্থ-দেয়ালে একটি

পদ্ম আঁকা—উপরে দেবনাগর অক্ষরে 'সত্যমেব জয়তে' লেখা। যে-কেউ দেখলে ভাববে, সুমিত্রর পদ্মবিভূষণ উপাধি লাভের পরই দেয়ালের এই ভূষণ। কিন্তু সুমিত্র বলে, দেয়ালের লেখাই ফলবে—সত্যেরই জয় হবে। নানা ব্যাপার মিশেই যে একটা প্রতীক হয় এবং এক্ষেত্রে সুমিত্রর একটা ধূর্তামি তা সে মনে মনে জানে।

—বিকাশ আসেনি? জিজ্ঞেস করল সুমিত্র।

—আসবে নিশ্চয়। ছুটির দিনেই তো আসে ও। সংহিতা হাই তুলে বললে।

—যাক্। সকালটা ভাগ্যে অবসর ছিল—অনেক কাজ হয়ে গেল।

—প্রবন্ধটা আবার পড়ে দেখবে?

—কেন? তোমার ভালো লাগছে না?

—পণ্ডিতজির সঙ্গে তোমার ঘনিষ্টতার কথাটা বেশি-বেশি হয়ে গেল না?

—ওই তো মজা! প্রবন্ধে পার্সোন্যাল এলিমেণ্ট যতো বেশি থাকবে ততোই তার আদর। এতো আর ইতিহাস নয় যে সত্য কথা ছাড়া লিখতে নেই।

হাসল সংহিতা,—উপন্যাস লেখো যখন, বানিয়ে লিখতে তো জানোই!

—জানো—এ-বয়সে শুধু কল্পনায় ওড়া চলে না। একটু দর্শন চাই। তোমার মনে আছে, সমাজতন্ত্র আমার দর্শন ছিল। পণ্ডিতজিরও তা-ই। ও-ব্যাপারটা আলোচনায় এই তো শুধু বলেছি, এ-নিয়ে পণ্ডিতজির সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। আমার কথায় তিনি খুশী হয়েছিলেন।

এম্নি আরো অনেক মিথ্যা দর্শনের কথা ছিল রচনাটায়, যা সুমিত্র সারা সকাল বসে লিখেছে তারপর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে চিঠি। যদিও বিকাশ ছাড়া অন্য কোনো পূর্ব-তিরিশ বয়সের সাহিত্য-পাঠক সুমিত্রকে মননশীল লেখক বলে না তবু দুষ্প্রাপ্য মনন-শীলতায় হাত বাড়িয়ে সুমিত্র শ্রীমতী ইন্দিরাকে জানিয়েছিল, আমার এ-চিঠি বাংলাদেশের সমস্ত মননশীল ব্যক্তিরই সমবেদনা বহন করছে, যাঁরা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে ছাড়া আর কাউকে তাঁদের যোগ্য নেতা বলে মনে করতেন না। বাংলার ক'জন মননশীলের সঙ্গে বা সুমিত্রর দেখা হয়? কাজেই এ-দর্শনও মিথ্যা।

তবে সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। দেখা হয়। শুক্লা গাঙ্গুলির নৈশ আড্ডায় গেলে দু'চারজন আধুনিক শিল্পী-সাহিত্যিক-রাজনীতিজ্ঞর সঙ্গে দেখা যে না হয় তা নয়। বিদেশের পালিশ সবারই বেশবাসে, মুখে-কথায়। নিউদিল্লীর গ্রীণ-পার্কে বা অশোক রোডে বা বিনয়নগরে যাঁদের শোভা পেত। এখনকার সেই পরমহংস মধ্যে সুমিত্র বক ছাড়া আর কী? তবু শুক্লার সৌজন্য অপরিসীম। প্যারিসে-ম্যুনিকে-লণ্ডনে-ব্লুমিংটনে অনেক দিন কাটিয়ে এসেছে—বেশ-বাসের স্বল্পতা ও সূক্ষ্মতা আছে কিন্তু তবু ভারতীয় প্রাচীন আতিথেয়তার একটা নতুন স্বাদ যেন পাওয়া যায় ওর কাছে। আজ সন্ধ্যায় যেতে হবে শুক্লার আড্ডায়। পণ্ডিতজি নিয়ে পরিস্রুত আলাপ ও পানীয় চলবে নির্ঘাৎ।

—বল্লাম তো—আবার পড়ে দেখো। 'কলম চালালেই লেখা হয় না'—এসব কথা নাকি তোমাকেই লক্ষ্য করে বলে কেউ-কেউ! সংহিতাকে দুঃখিত দেখালে।

—তুমি তো জানো, ফর্মা বাড়লেই উপন্যাসের দাম বাড়ে—তখন দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে কলম চালানো ছাড়া আর উপায় কী? আর তুমিও বলতে, বই বড়ো করো। বড়ো করবার অভ্যাস তো আমার ছিল না!

সুমিত্র তার পড়তি বাজারের কথাই ভাবলে এবং রণেন মিত্রের উঠতি বাজারের কথা।

—তা করো। কিন্তু ভেবেচিন্তে লিখতে দোষ কী? অনুরোধের মতোই নরম শোনাল সংহিতার গলা।

—ভেবেচিন্তে? রণেন মিত্তির ভেবে-চিন্তে লেখে? বাংলা বাক্যই তো লিখতে শেখেনি। ব্যাকরণ ভুল। স্মরণশক্তি নেই। তার কাটতি কী জানো? সাহিত্যে-সিনেমায় কুলীন লেখক এখন সে। কায়েতেরই যুগ পড়েছে!

—কলকাতার কায়েত, না?

—আমি কি পাকিস্তান থেকে এসেছি যে হেনস্তা করবে?

হোক্ না সুমিত্র পশ্চিমবঙ্গের লোক তবু পূববাংলার প্রতি চল্লিশের সনগুলো থেকে বেদরদী নয়। সুতরাং দু'পুরুষ আগেও যে-পরিবার পূববাংলায় ছিল, সে-পরিবারেই সে বিয়ে করেছে। আর বিয়ের পর তো পদ্মাপারের লোকদের ভালো না বেসে তার উপায়ই নেই। অন্তত ভালোবাসা বা দরদ না দেখিয়ে। তাছাড়া এতো মানতেই হবে পূব-বাংলার মেয়েরাই শিক্ষিত বেশি—শুক্লা গাঙ্গুলি পশ্চিমবঙ্গে আর ক'টা আছে?

—দেখলে তো—উদ্বাস্তু নিয়ে লেখা তোমার বইটার ছবি হল না! অথচ কী ভালো বই! সংহিতা দুঃখোত্থিত হতে পারছিল না।

শোভন এলো। স্কুল-ফ্যাইন্যাল দেবে এবার। বসবার ঘরে আওয়াজ পেলেই ঘুরে একবার দেখে যায়। বাবার সঙ্গে কারা দেখা করতে এলেন বা মা কাদের শুধু চা খাওয়ালেন বা চায়ের সঙ্গে খাবার তা দেখে যেতে হয়। সহপাঠীদের সঙ্গে গল্প করবার জন্যে। বেশির ভাগ সহপাঠীই উৎসুক ছবির কোনো অভিনেতা, নামের অন্ত যাঁদের 'কুমার' দিয়ে, তাঁরা কেউ এলেন কি না, নামের আদিতে যাঁদের 'সু' ছবির তেমন অভিনেত্রীকেও কেউ-কেউ খোঁজ করে কিন্তু শোভনের কৌমার্যবোধ এতো প্রখর যে শেষোক্তদের সে ধমকে দেয়। কিন্তু কথায়—চেহারায় না হোক, সে বাপের মতোই 'সত্যমেব জয়তে'। বলে, বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তো এ-'কুমার' সে-'কুমারে'র লাইন লেগে যায়—যদিও সুমিত্রর বয়সী এক পড়ন্ত অভিনেতা ছাড়া সুমিত্রর আড্ডায় কেউ আসেন না। মায়ের মতো গোলগাল চেহারায়, পূববাংলার রক্তে জন্ম নিয়ে কেন যে শোভন সহজ সত্য স্পষ্ট বলে দিতে পারে না তা বোধ হয় বংশতত্ত্ববিদ্‌দের এক সমস্যার ব্যাপার। কালা বামুন তো সে মোটেও নয়!

ঘরে বাবা-মা ছাড়া কেউ নেই দেখে শোভন ঘরে ঢুকল। বল্‌লে, জওহরলাল এবার এগজামিনে আস্‌বে, বাবা?

সংহিতা হেসে বল্‌লে,—কাল থেকে ওই এককথা ওর মাথায় ঘুরছে।

—কোন্ এগজামিনে? ফাইন্যালে? আসতেও পারে। পিতার সেকেলে গাম্ভীর্য নিয়ে এলো সুমিত্র তার চোখে মুখে।

—কোন্ বই পড়তে হবে? শোভন একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের পেন্সিলটা কামড়াতে লাগল।

—কাগজে যা বেরিয়েছে তা টুকে রাখছ তো—তাতেই হবে। সুমিত্র তারপর স্ত্রীর মুখে তাকিয়ে সমর্থন চাইলে,—তা-ই না?

—কেন? ছোটখাটো জীবনী নেই বাংলাতে? সংহিতা মনে করতে চাইল।

—দ্যাখো, মনে আসে কি না!

—বই-এর পাড়ায় গেলে তুমিও তো দেখতে পারো।

—পুলক না? সান্ন্যালদের বাড়ির? বল্‌লে, নেই তেমন বই! শোভন বললে।

—পুলক তো ভারি খবর রাখে বই-এর।

প্রতিবেশী পি-বি সান্ন্যালের বাড়িতে না কি রণেন মিত্রেরই আদর বেশি, সুমিত্র উপাধ্যায়ের কোনো বই নেই—সখেদে শুনেছে সুমিত্র। কেন নেই সে অনুসন্ধান করতে যায় নি সে। কোন্ কলেজে নাকি প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন পি-বি সান্ন্যাল। শিক্ষকদের যা হয়, বহু সন্তান। আর প্রদীপের নীচেই তো অন্ধকার থাকে। ছেলেগুলো আকাট মূর্খ। মূর্খ কি না তারও খোঁজ নেয়নি সুমিত্র। ওম্নি বলে। খোঁজ নিতে গেলে পাছে তারাও খোঁজ নিয়ে রটিয়ে দেয়, কলেজে এক বছরের বেশি যে সে পড়েনি। ওসব পণ্ডিত-মূর্খ তো বুঝবে না, সাহিত্যিক হবার শর্ত যে কলেজবিদ্যা মোটেও নয়। বাংলাদেশের ক'জন বিখ্যাত সাহিত্যিক কলেজে পড়েছেন? পড়তে পারে রণেন মিত্তির, যে শুদ্ধ বাংলা বাক্য লিখতে জানে না।

সান্ন্যাল-বাড়ি সম্পর্কে সুমিত্রর 'এলার্জি' জানা আছে সংহিতার। ও বাড়ির দুটি মেয়ে যে সম্প্রতি হাত-কাটা পিঠ-খোলা ব্লাউজ পরছে তাতে সংহিতাও বাড়িটার উপর খুশী নয়। শোভনকে বললে সে,—পুলকের সঙ্গে ভাব জমেছে নাকি তোমার?

স্ত্রীর দিক থেকে অনুকূল হাওয়া পেয়ে মুখে হাসি তৈরী হল সুমিত্রর, বললে,—বারেন্দ্ররা কেমন লোক জানো না? প্রমথ চৌধুরী মশাই নিজে বলে গেছেন।

—তিনি বারেন্দ্র ছিলেন, না?

—হাঁ। আন্‌পপুলারিটিতে ভুগলেন চিরকাল।

পারিবারিক আলাপ আর চলতে পারল না। সদলে বিকাশ 'সেটে' প্রবেশ করল। আপ্যায়নে ফর্সা করে তুলল সুমিত্র তার মুখ।—এসো এসো বিকাশ—এঁরা সব কে? বোসো—বোসো।

বসবার জায়গা করে সংহিতা উঠে দাঁড়াল, বিকাশের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললে, —ভালো?

—আপনি কোথায় যাচ্ছেন, বৌদি! অসম্ভব নড়ে-চড়ে উঠল বিকাশ।

—আপনারা বসুন না—শোভনের পিঠে হাত রেখে সংহিতা বললে,—আমি আসছি!

বিকাশকে চেনে শোভন কিন্তু তাঁর সঙ্গে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কেউ সিনেমার রাজা-যুববাজ বা কুমার হতে পারে কিনা ভাবলে সে। বোঝাই যাবে। চায়ের সঙ্গে যদি মা খাবার দেন তখনই বুঝতে পারবে শোভন। অপরিচিতদের পরিচয় জিজ্ঞেস করল না সে সংহিতাকে। যা জানতে চাইলে মা-বাবা খুশী হন, তা-ই তো জিজ্ঞেস করতে হয়। নইলে, একটা সিনেমার কাগজে সুমিত্রর একটা ধারাবাহিক উপন্যাস পড়তে পড়তে যখন তার বাবার আড্ডা-ঘরে উঁকি দেবার ইচ্ছে হল, আর ওম্নি একটা পেন্সিল হাতে ছুটল, তখন কি শোভনের ইচ্ছে ছিল বাবাকে জিজ্ঞেস করবে, তিনি যে এবারে চার লাইন ইংরেজি পদ্য দিয়েছেন তা তার পড়ার বই থেকে টুকে নিয়েছেন কি না? মনে এলেও জিজ্ঞাসাটা, বলতে অন্য কথাই বলল। জিজ্ঞেস করল এমন কথা যাতে বাবা-মা ধরে নেন শোভন আজকের খবর-কাগজ থেকে জওহরলালের জীবনী খাতায় টুকে নিচ্ছে।

বিকাশ বসল। পাশাপাশি অলক আর সত্যপ্রসাদও।

বিকাশ আর ইতস্তত করলে না। বললে,—গিয়েছিলাম, সুমিত্রদা, পাড়ারই হেরম্ব সেনগুপ্তের বাড়ি। ভাবলাম, বন্ধুবান্ধবরা আজকের দিনটা সাহিত্যিক-সঙ্গই করব। এই অলক—যাদবপুরে কম্প্যারেটিভ লিটারেচার পড়ছে—আর সত্যপ্রসাদ উষা কোম্পানীর

ফাইটার।

—বাঃ বেশ তো! উচ্ছ্বসিত হল সুমিত্র,—বন্ধুত্বটা বেশ ভাগাভাগি করে নিয়েছ, সাহিত্য-রসিকে আর শ্রম-রসিকে।

—বোঝেন তো সাহিত্য আর শ্রমনীতিই তো নেশা! বিকাশ দন্তপংক্তি বিকশিত করে হাসলে।

—যাদবপুরে তো এখন বুদ্ধদেব বসু নেই? সুমিত্র অলককে জিজ্ঞেস করেই সত্য-প্রসাদের দিকে তাকাল,—উষা কোম্পানীর ধর্মঘটটা বিশ্রী হয়ে গেল, তা-ই না?

সুমিত্র শুনে মজা পাবে বলে অলক আর সত্যপ্রসাদের 'হ্যাঁ'-'না'র আগেই খোলা মুখ আরো খুলতে চাইল বিকাশ,—গেলাম তো হেরম্ব সেনগুপ্তর বাড়ি। তিনি তখন হাঁড়ি-কড়াই-খুন্তি-থালা-বাটি গাড়িতে তুল্‌ছেন—আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন সময় নেই। চেঞ্জে চলেছেন হিড়িম্বা-নন্দন!

—সে কী? হেসে উঠল সুমিত্র কিন্তু কোন্ কথার উপর বোঝা গেল না।

বিকাশ হয়তো বুঝল। বল্‌লে,—হ্যাঁ, পাড়ার ছেলেরা ওই নামে ওঁকে ডাকে!

অলক ভদ্র হাসিতে মুখ পালিশ করে বল্‌লে,—দেখতে মহাভারতীয় যুগের অতিকায় মানুষই মনে হয়!

অনুজ্জ্বল হয়ে বললে সুমিত্র,—হেরম্ব চেঞ্জে যাচ্ছেন কেন?

—জওহরলালের মৃত্যুর খবরে ব্লাড-প্রেশার বেড়েছে হয় তো! সত্যপ্রসাদ সাদাসিধে মুখে বললে।

এবার যেন চিন্তিত সুমিত্র,—হুঁ। প্রেশার হচ্ছিল ওঁর মাঝে-মাঝে।

—প্রেশার হলে কি ওম্নি মেজাজ দেখায়? বিকাশ পড়শী-সাহিত্যিকের হাঁড়ির খবর সত্যি জানে,—বললেন, তোমরা আজ এলে যে বড়ো—পাড়ার কোনো ছেলে তো আসে না আমার বাড়ি! যাবে কী করতে? বুড়ো বয়েসে খিস্তির উপন্যাস লিখছেন!

সমধর্মীর ওকালতি ধরল বিকাশ। ওসব ছেলেমানষি তারও তো করতে ইচ্ছে যায়—পিতৃভক্ত সংহিতার ভয়ে করতে পারে না। অনেকদিন ভেবেছে, মস্তানের জীবন নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবে—শেষটায় দাঙ্গার সময় মস্তানি ছেড়ে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই করছে দেখালেই হলো। সিনেমার স্কোপ আছে। আর ছবি হলে রাষ্ট্রপতি-পুরস্কারেরও আশা। কিন্তু সংহিতার জন্যে হল না। পূব-বাংলার মেয়ে কী বুঝবে, মস্তানিও যে কলকাতার একটা কালচার। হেরম্বর শেষ-উপন্যাস তো 'মহানগর কলকাতা'—রবীন্দ্র প্রাইজ পেয়ে যেতে পারে! সুপারসোনিক স্পীডে কথাগুলো ভেবে বললে সুমিত্র। —তরুণরা এখন যা লিখছেন, আমাদের মতো বুড়োদেরও তো তেমন পরীক্ষায় ইচ্ছে যায়? রবীন্দ্রনাথ "শেষের কবিতা" লেখেন নি? 'লেবরেটরি'?

মুখের হাসি মুছে অলক বললে,—তার জন্যে যে আজকাল লেভেটরির অভিজ্ঞতা বর্ণনা চলবে তার কোনো মানে নেই!

—চলছে নাকি? হেসে উঠল সুমিত্র। গোপালভাঁড়ামি!

—ব্রিটিশের আসবার আগে যা', যাবার পরও তা। বিকাশ রাজনীতি-সচেতন হয়ে উঠল।

—তার মানে কি জানো? সুমিত্র তার অভ্যাস-মতো বিশ্লেষণ-শক্তি দেখাতে চাইলে, —ব্রিটিশ-রাজত্ব এবং তার উত্তরাধিকারী কংগ্রেস-রাজত্ব আমাদের মনে কোনো পরিবর্তন

আনতে পারে নি। শুনেছি, রণেন নাকি সিনেমার জন্যে একটি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর তৈরী করেছে।

—এবং নিওরিয়্যালিজমের পান্ডারা তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি সুরু করেছে—তা শোনেন নি? অলক বললে।

সত্যপ্রসাদ ঘাড় নাড়ছিল, হেসে সে নিজের পাৎলুনে তাকাল একবার, তারপর বললে, —কী বলিস অলক, ব্রিটিশ আমলে আমরা যতোটা সায়েব হইনি—জওহরলালের আমলে ততোটা হয়ে গেছি!

সুমিত্র বিব্রত হল। জওহরলালকে নিয়ে মোটেও নয়। ছেলেটি তার বিশেলষণের উল্টো কথা বলছে বলে। কিন্তু সে এমন উকীল যে বাদীকেও জেতাতে পারে—বিবাদীকেও। একটা ঢোঁকে প্রথম ধাক্কাটা গিলে নিয়ে সুমিত্র বল্‌লে,—ব্রিটিশের শিক্ষায়ই তো জওহরলাল মানুষ! কিন্তু তুমি যা বলছ, হয়তো সব ক্ষেত্রে তা ঠিক নয়। বাইরের পোষাকটা আমরা বিদেশ থেকে নিচ্ছি বটে কিন্তু দুর্নীতির পোষাকটা আন্তরিক।

—দুর্নীতিটাও বিদেশ থেকে আমদানী, সুমিত্রদা—বিকাশ আবার দন্তরুচি দেখালে। —সুইডেন-ওয়েষ্টজার্মানী-ফ্রান্স-মার্কিনের কথা ছেড়েই দিলাম—ইংল্যান্ডেও তো কীলার-কেচ্ছা হয়!

—তা হচ্ছে। বিকাশকে অপ্রসন্ন করতে চায় না সুমিত্র। কথা না বাড়িয়ে সে দরজায় তাকালো। এখনো সংহিতা চা-টা নিয়ে আসছে না কেন? বিকাশকে সে নিজ হাতে চা দেয়। গোপালের হাত অন্যদের জন্যে। তরুণদের মধ্যে এখন এক বিকাশই তো আছে যার মারফৎ তরুণসমাজে তার প্রচার চলে—তাদের সভায় সভাপতি হতে ডাক আসে। যদিও সুমিত্র এখনো রাষ্ট্রের নেক-নজরেই আছে তবু ভবিষ্যৎটা তো নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। কে জানে, বিকাশের মতো বামপন্থীরা যে রাষ্ট্রের অধিকার পাবে না? বুড়ি ছুঁয়ে রাখতে হয়।

বিকাশের ধূর্তামি ধরতে যেমন অলকের দেরি হয় নি, সুমিত্রর বেলায়ও তা-ই। যদিও সে চল্লিশের সনগুলোর ইতিহাস জানে না তবু তো সুমিত্রর হাল-আমলের উপন্যাস দু'-একটা তো পড়েছে—কংগ্রেসের উপর কটাক্ষ আছে। কিন্তু পদ্মবিভূষণ হল সে কিসের জোরে? সাহিত্য-সৃষ্টির জোরে? ও-সাহিত্য ধোপে টেঁকে? বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে অলকের পরিচয় আছে। বাংলাদেশেও অনেক সাহিত্যিক সুমিত্র উপাধ্যায়ের চাইতে সৎ সাহিত্য তৈরী করেছেন কিন্তু তাঁর খাতির কেন এতো উপরের মহলে? ভদ্রলোকের যে ক'টা পা' বোঝা যাচ্ছে না—অনেক নৌকোতেই পা' বাড়িয়ে আছেন! অলক দেয়ালে ঘড়ি খুঁজল। নেই। বিকাশকে জিজ্ঞেস করল,—ক'টা বাজে, বিকাশ? চল্‌ এবার যাওয়া যাক্‌।

হাত বাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সুমিত্র,—সে কী বোসো! চা তো খাবে!

—এই দুপুরে? ম্লানভাবে হাসলে অলক।

—এখন ক'টা হবে? এগারোটার বেশি নয়! দরজার দিকে পা বাড়াল সুমিত্র, —লেবু-চা-ই এখন প্রশস্ত। দেখছি আমি।

সুমিত্র অন্দরে চলে গেল।

তিনবন্ধু খানিকক্ষণ চুপচাপ। প্রথম নীচু গলায় কথা বললে সত্যপ্রসাদ,—মনে তো হয় ভদ্রলোকের বিলাস-ব্যসন কম নয় কিন্তু উদ্বাস্তুর উপন্যাসটা পড়ে ভেবেছিলাম তাদের মতোই এ'র জীবন।

—আন্তরিকতা থাকলেই হ'ল! বিকাশ বললে।

—আন্তরিকতা? অলক চোখের ছোবল মারলে একটা বিকাশকে।

সংহিতা জানে, আজ কেউ-না-কেউ আসবেই যার জন্যে খাবার দরকার। তাই গোপালকে বাজারে পাঠাবার সময়ই দৈনন্দিন ফর্দে বাড়তি একটা সন্দেশের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছিল। গোলপার্ক ছাড়া ভালো সন্দেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু ঢাকুরিয়া ছাড়া অন্য কোথাও গোপালকে পাঠালেই সময়ের গোলমাল। তাছাড়া ঢাকুরিয়াতে সুবিধেও আছে। চার আনার সন্দেশ নেই—সব সন্দেশ দু'আনা। চা-খাবার ট্রেতে তোলাই ছিল, যখন সুমিত্র লেবু-চার খোঁজ করতে গেল। লেবু-চা-ই হয়েছে। ট্রে গোপালই তুলে নিল হাতে। সংহিতা নামিয়ে ওদের হাতে দেবে। সুমিত্র দাঁড়িয়ে দেখবে। এই ব্যবস্থা।

—ওরা বসবার ঘরে এসে দেখল, আগন্তুকরা চুপচাপ বসে আছে।

আপ্যায়নের ব্যবস্থায় বিকাশ যেন চমকে উঠল,—এ কী সুমিত্রদা। আজ তো এর জন্যে মোটেও প্রস্তুত নই আমরা।

—তার জন্যে কী? সুমিত্র বিগলিত হাসিতে বল্‌লে,—জীবনে মৃত্যু আছেই, তার জন্যে কি খাওয়া-পরা, হাসি-তামাসা বন্ধ হয়ে যায়?

সংহিতা চৌকো এক-পায়া টি-টেবিলটা ওদের মাঝখানে বসিয়ে যার-যার মুখোমুখি চা-খাবার নামিয়ে রাখছিল। বললে বিকাশকে,—পণ্ডিতজির জন্যে সভা-টভা করবেন না আপনারা?

—সে-পরামর্শই তো সুমিত্রদার সঙ্গে করতে এসেছিলাম! বিকাশ লুফে নিল কথাটা।

—সে তো তুমি একা-ই পারো! সুমিত্র চোখের একটা ভঙ্গী করলে।

কথাটাতে ধূর্তামির আভাস পেয়ে অলক আরো গম্ভীর হল।

বিকাশ নিজের সংগঠন-ক্ষমতায় সচেতন হয়ে বললে,—সভাপতি শুধু হতে হবে আপনাকে। আর সব-কিছু আমি করে নিচ্ছি।

সংহিতা জানে, খাবারের ফল ফলবে। খুশী হয়ে সে একটা শ্রীনিকেতনী মোড়া টেনে এনে বসলে।

বিকাশ হাঁ-হাঁ করে উঠল,—ওটাতে আমিই বসছি, বৌদি—আপনি এখানে আসুন।

—না-না, আপনি বসুন। বসুন। সংহিতার কণ্ঠও অনুরোধে সোচ্চার হল।

—স্থান নিয়ে কেন এতো হৈ-চৈ—কথাটাকে বিশেষ থেকে সাধারণে আনতে চাইল সুমিত্র, সভায় আপন স্থান সম্পর্কে নিরাপদ হয়ে।

হাসি, মাথা-নাড়া কোনোটাই ছিল না সত্যপ্রসাদের, সে ভাবছিল, আমরা কেন এলাম! যে প্রায় সবসময়েই শ্রোতা, তাকেও ভাবতে হল এ-কথা। হয়তো অলকের আভিজাত্য তার মনও ছুঁয়ে গিয়েছিল। কিম্বা ভাবছিল, বিকাশ সুমিত্র উপাধ্যায়ের আন্তরিকতার গুণে মুগ্ধ হতে পারে, তাদের মুগ্ধ হবার কোনো কারণ নেই।

ওরা চুপচাপ চায়ে মন দিল। সুমিত্র ধূর্ত না হলেও বুদ্ধিমান যে তা ঠিক। নইলে লিখবার সাধারণ-ক্ষমতা নিয়ে যোধপুর পার্কে বাড়ি করবে কোন্ উপায়ে? এখন অবশ্যি সাধারণ-ক্ষমতারই দিন। কিন্তু সুমিত্র যেদিনে লেখা সুরু করেছিল তখন তো রবীন্দ্রনাথ-শরৎ চাটুজ্জে-প্রমথ চৌধুরী জীবিত! তাঁদের আদর কি তেম্নি ছিল রণেন-হেরম্ব-সুমিত্রর আদর আজ যেম্নি? বোঝে তা সুমিত্র। নিজেও তা বোঝে। বিচার করতে বসলেই বোঝে। এক সাহিত্য-সভায় এক সময় সে 'সাহিত্য-সম্রাট' উপাধিও পেয়েছিল এক বক্তার

মুখে। তক্ষুণি সে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল : 'যে উপাধি বঙ্কিমচন্দ্রের, আমার মতো অযোগ্য লেখককে সে-উপাধি দেওয়া আমাকে লজ্জিত করা ছাড়া আর কিছু নয়।' এখন, সুমিত্র বুঝতে পারছিল, যে-দু'জন ছেলে এখানে নবাগত, তারা যেন বেশি সুখানুভব করছে না। তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যদি তারা চুপচাপই রইল তাহলে বুঝতে হবে তার সম্পর্কে তাদের ধারণা আর যা-ই হোক, বিকাশের মতো নয়।

একটু উদ্বিগ্ন হয়েই সুমিত্র বললে,—এ-পাড়ায় একটা সভা হওয়া উচিত। কাকে কাকে বলতে হবে তা তো তোমরা জানোই। বুঝলে, বিকাশ, পণ্ডিতজির আদর্শে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা যেন সভায় উপস্থিত থাকেন। জানো তো বাংলাদেশে আজ যে কোনো আদর্শ নেই!

—কেন থাকবে না? সংহিতা মুখ খুললে,—জৈব বৃত্তি?

—প্রাক্-সামাজিক মানুষ হয়ে যাচ্ছে সবাই—পণ্ডিতজি যখন সমাজতন্ত্র দিয়ে গেলেন আমাদের! পদ্মবিভূষণ সুমিত্র উপাধ্যায়কে সন্ধ্যার মতো বিষণ্ন দেখালে।

সাত

সন্ধ্যায়ই যে শুক্লা গাঙ্গুলির গাড়ি এসে ঢুকবে যোধপুর-পার্কে কে জানত? অন্তত সুমিত্র ভাবতে পারে নি। বরং ভেবেছিল সন্ধ্যার পর সে-ই ফার্ণ-রোডে যাবে শুক্লা গাঙ্গুলির আড্ডায়। নারায়ণ শালিগ্রাম—শালিবাহনেরই কোনো গাঁয়ের ছেলে হয়তো, যে-রাজার রহস্যের অন্ত ছিল না—রহস্যময় হাসিতেই বলে : সালোঁ এবং শুক্লা তা গায়ে মাখায় না, যেহেতু তারা দু'জন নাকি প্যারিসেই পরিচিত এবং সাঁলো নামটা শ্লীল কি অশ্লীল তা তাদেরই ভালো জানা, অতএব সুমিত্র ও নামটা ব্যবহার না করে তাকে আড্ডাই বলে। নারায়ণ বোধহয় আজ আসবে না—সে এলে তো শুক্লাকে ব্লু-ফক্সে টেনে নেবার তাগিদেই আসে—আড্ডা জমে না। যে-ই আসুক না আসুক, সিঁড়ি থেকে বারান্দায় এসে সুমিত্র শুক্লাকে গাড়িতে দেখেও ভাবতে পারল না শুক্লা তার বাড়িতে আসতে পারে।

দরজায় দাঁড়িয়ে শোভন কিন্তু ভাবতে পারছিল। সিনেমার সুপরিচিতা দু'একটি অভিনেত্রীকে গাড়িতে ঢুকতে দেখেছে সে যোধপুর-পার্কে। এলোমেলো বাড়ির নম্বর তো এখানে! একদিন একটা বাড়ির গলিটাও জানতে চেয়েছিল একটি মেয়ে শোভনের পাশেই গাড়ির ব্রেক কষে। সে নম্বরের বাড়ি চেনে না শোভন! তাতে তার আফশোষ ছিল না—আফশোষ হল, মেয়েটি যে তাদের বাড়ির নম্বর জানতে চাইল না। ইনি—যাঁকে শোভন গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে হেসে উঠতে দেখল—ঠিক তাদের বাড়ির নম্বরই চাইছেন তো! সিনেমা অভিনেত্রীর মতোই চুলগুলো বানিয়েছেন, কিন্তু এ'কে তো শোভন চেনে না। 'সু'-দিয়ে যতোগুলো মেয়েলি নাম আছে, মনে-মনে পড়ে গেল শোভন। না, সুপরিচিতা কেউ তো নন, অন্য সু হতে পারে। যখন সুমিত্রকে গাড়িতে যাবার জন্যে ডাকছিলেন মেয়েটি, তখন শোভন একটু পেছনে সরে ভাবতে পারল, ইনি বাবার সুপরিচিতা।

বেরোবার জন্যে আধা-তৈরীই ছিল সুমিত্র। হাওয়াই চপ্পল থেকে শাদা নাগ্রাই-এ পা গলিয়ে নিলেই হয়। তবু চপ্পলেই সে নেমে গেল শুক্লার গাড়ির পাশে।

—উঠে আসুন—শুক্লা দরজা খুলে দিয়ে পাশের সীটে আলতো হাত বুলিয়ে আনল। সংহিতার কাছে শুক্লার কী পরিচয় দেবে তা-ই মনে-মনে হয়তো তৈরী করছিল

সুমিত্র, তাই কথা বলতে দেরি হল।

—আসুন—ইত্যবসরে সুরেলা গলা শোনাল শুক্লা।

বয়স হয়তো পঁয়ত্রিশ হবে। হলেও শুক্লা এখনো তরুণী। তাছাড়া পঁয়ত্রিশ বছর হলেও সুমিত্রর মেয়ের বয়সীর চাইতে তো সে বড়ো নয়। আব্দার শোনাতে পারেই সে সুমিত্রকে। আর এ-কথাও তো সত্যি যে হেলেনিক আমল থেকেই মেয়েরা বাবাকে ভালোবাসে। আর এমনই আশ্চর্য্য যোগাযোগ—শুক্লার পৈতৃক ভিটে বোরালের দিকে, প্রত্নতাত্ত্বিকরা যে-অঞ্চলে হেলেনিক 'ভাস' আবিষ্কার করেছেন। আধো-আধো শোনা আছে শুক্লার, তিন পুরুষ আগে, তাদের পরিবারে কে নাকি খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন। মাইকেলের সময়ে, না কি ঠিক খবর নেয়নি। ছেলেবেলায় তার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গভর্নেস ছিল—বাবার ঝোঁক ছিল মেয়ে বিলিতি শিক্ষায় তৈরী হয়ে উঠুক, এসব খবরই খুঁটে-খুঁটে জেনেছে শুক্লা এবং ভেবেছে, ভাববার বয়সে পৌঁছিয়ে, বাবা তাকে খুব ভালোবাসেন। মুখের কাঠামোটা শুক্লার চতুষ্কোণ কিন্তু সমবাহু নয়—ত্বক্‌মাংসের প্রলেপে কোণগুলো মরে গেলেও কাঠামোটা পরিষ্কার বোঝা যায়—ডিম্বাকৃতি কেউ তাকে বলবে না। বড়ো চোখ, সোজা নাক, ছোট ঠোঁট—সৌন্দর্য্যের সব ঠাটই পুরোপুরি আছে, সেকালে মিলোর ভেনাস বলে' চালিয়ে দেওয়া যেতো কিন্তু বয়স তো ছেড়ে কথা বলে না—তাই শত প্রসাধনেও হাসলে গালের দু'পাশে, উপর থেকে নীচে লম্বা কয়েকটা সরু রেখা উঁকি দেয়।

সুমিত্র কিন্তু এক তরুণী, সুন্দরীকেই দেখছিল—মুখে ভাষা আসবার আগে চোখে তার যে ভাষা এলো, তাতে বলা যায়। আর এ-কথা তো সত্যি যে শিল্পীমাত্রেই প্রথম রিপুর প্রভু বা ভৃত্য। সুমিত্র কোথায় যে প্রভু আর কোথায় যে ভৃত্য তা অবশ্যি সংহিতা শুক্লা বা সিনেমার কয়েকটি মেয়ের গবেষণার বিষয় এবং তার নিজেরও। কিন্তু নিজেকে কি সুমিত্র কোনোদিন জানাতে চাইবে? খুবই সহজভাবে সে বল্‌লে,—জানো? ভাবছিলাম তুমি আস্‌বে। এম্নি হয় অনেক সময়। তা-ই না?

—হোক্। ঘাড় দুলিয়ে বললে শুক্লা,—উঠে আসুন তো এখন।

দরজার ফ্রেমের খোলা একটা জায়গা হাতের মুঠোতে নিয়ে সুমিত্র বললে,—আসছি।

আসছি মানে গাড়িতে আসা নয়, চপ্পলটা পাল্টে আসা। ইদানীং, শুক্লার সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকে, পোষাক-আসাকে বেশ একটু মনোযোগ দিচ্ছিল সুমিত্র। শুক্লার আড্ডা সেলোঁই হোক আর যা-ই হোক, মার্কিনি ছন্নছাড়া ফ্যাশান সেখানে অচল। পোষাক ছাড়াও আরেকটা কারণ ছিল বাড়িতে ঢুকবার। সংহিতা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে শুক্লাকে, এবং এই সে ওকে প্রথম দেখলে। দেখার ফলাফলটাও জেনে আসা দরকার। অন্য মেয়েতে অনুরাগী হলেই যে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ কমে যাবে—সুমিত্রর বেলায় তা হয়নি। শুক্লাকে দেখার ফলে সংহিতার মেজাজ যদি বিগড়েই যায়, তাহলে সংহিতাকে কী বলতে হবে তা ভেবেই সুমিত্র ঘরে ঢুকল।

বিগড়ানো মেজাজে সংহিতাকে যেখানে পাওয়া স্বাভাবিক, সেখানে পাওয়া গেল না। বসবার ঘরে না, শোবার ঘরে না, শোভনের ঘরেও না। শোভন ফাউণ্টেন পেনে কালি তুলছিল। লেখাটা বোধহয় ফেয়ার করবে। তাকে মার খবর জিজ্ঞেস না করেই জুতো পাল্টে বেরিয়ে যাচ্ছিল সুমিত্র, এম্নি সময় সংহিতা দেখা দিলে। হয়তো রান্নাঘরেই ছিল। জিজ্ঞেস করলে সংহিতা,—কোথায় যাচ্ছ!

যা ভেবে রেখেছিল সুমিত্র, তা-ই বল্‌লে,—জওহরলালের শোক-সভায়। এক

মিনিস্টারের বাড়ি থেকে একজন মহিলা এসেছেন নিয়ে যেতে।

—ও, বলে পথ ছেড়ে দিলে সংহিতা। কী ভাবছিল সে বোঝা গেল না।

সুমিত্রকে পাশে নিয়ে হাওয়া হল শুক্লা। যোধপুর-পার্ক পার হবার আগে ষ্টীয়ারিং-এ আলতো হাত রেখে বললে—আপনাদের এ-রাস্তাটা লাভলি। চওড়া বলেই নয়—সোজা তো বটেই! ল্যান্ডস্কেপটা বিউটিফুল। বাঁয়ে রেখে এলাম—ওটা লেকের ফাঁড়ি, না? ডানের বাড়িগুলো বাফ্, লাইট-গ্রীণ এম্নি সব সুদিং কালার!

গড়িয়াহাটায় ট্র্যাফিক দুর্দান্ত—চোখ ফেরাতে পারলে না তাই শুক্লা।

শিল্পীমাত্রেই কস্তুরীমৃগ। কিন্তু সুমিত্র বোধহয় ব্যতিক্রম। বস্তুত সে দেখাতে চায় —দৈহিকতা দিয়েই দেখাতে যায় তার নিজের একটা সুগন্ধ আছে। সারা শরীরে তাই সে চন্দনের গুঁড়ো মাখে। কিন্তু এখন যেন আপন গন্ধ ছাপিয়ে শুক্লার গায়ের মেয়েলি গন্ধ আসছিল তার নাকে। নারকেল তেলের নয়। অদ্ভূত ফিকে একটা সুগন্ধ। ফিকে হলেও চন্দনকে মেরে দিচ্ছিল।

কিন্তু গন্ধ-বিষয়ক কথা বললে না সুমিত্র, বললে রাস্তার ট্র্যাফিকেরই কথা,—লেভেল-ক্রসিং-এ গিয়ে না-জানি আধঘণ্টা দাঁড়াতে হয়। ভীষণ বোরিং।

আলাপে 'বোরিং'-শব্দটার প্রয়োগ শুক্লার কাছ থেকেই শেখা সুমিত্রর। শিখতে তার আপত্তি নেই। হাল-আমলের লেখকদের থেকে উপন্যাসের দীর্ঘ নাম দিতে সে শিখেছে। কেউ যদি কোনো বই-এর নাম দিল : "সন্ধ্যার আকাশ ও মাটির ঘাস"—ওম্নি সুমিত্রর নূতন উপন্যাসের নাম হবে: "মাটির আকাশে সন্ধ্যা"। নাম না কি বই বিক্রীর সহায়ক—এ-ধরনের নামেই তরুণমহল মুগ্ধ। হয়তো 'বোরিং'-শব্দের ব্যবহারে সুমিত্র শুক্লাকে কাছে টানতে চায়।

কিন্তু শুক্লা কাছে নয় কার? শালিগ্রামের কাছে যেম্নি, তেম্নি সুমিত্রর কাছে, তেম্নি আই-সি-এস অশোক গুপ্তের কাছে এবং সঙ্গীতশ্রী বসন্ত অধিকারী ধরনের সমান বয়সীদের কাছে।

গেট খোলা। রেল-লাইন পেরোতে যতোটুকু ঝাঁকুনি ছিল শরীরে তার চাইতে বেশী টাল খেয়ে শুক্লা সুমিত্রর উরু ছুঁয়ে গেল কয়েকবার। বললে,—আজ যখন জওহর-লাল উপলক্ষ্যে ডেকেছি সবাইকে গুপ্ত যে কতোটা 'বোর' হবে ভাবছি!

'বোর'-শব্দটাকে ইংরেজি উচ্চারণেই চেনে সুমিত্র কিন্তু শুক্লার মুখে তার আলাদা ধ্বনি শুনল। কিন্তু ধ্বনির বিশ্লেষণে না গিয়ে বললে সে,—গুপ্ত বড্ড বেশি পলিটিক্স কপ্চান! ওরা পুলের টানেল পার হয়ে গেল।

—পলিটিক্স? নিউ-দিল্লীর মতো ইন্টারেষ্টিং হবে কোনোদিন এখানে? রুবি-রং ঠোঁটের ফাঁকে মুক্তোর পাঁতি ঝিকিয়ে উঠল শুক্লার।

ইন্দ্রপ্রস্থের ইন্দ্রসভায় তো হাত বাড়িয়েই আছে সুমিত্র, সোৎসাহে বললে,—দিল্লী যাবার সুযোগ হলে তোমার দাদার সঙ্গে এবার দেখা করে আসব। কোথায় না থাকেন? বিনয়-নগর?

—ওসব নগর-টগর নয়, খাশ গ্রীণ পার্ক।

একটু ভদ্র রসিকতা করতে চাইল সুমিত্র,—ওরা মরুভূমির কাছাকাছি থেকে করল কি না গ্রীণ পার্ক, আর আমরা ক্ষেত-খামারের দেশে থেকে কি না মরুভূমির দেশ থেকে নাম আনলাম যোধপুর পার্ক।

এলিঅটের তর্জমা পড়ে নয় খোদ এলিঅট পড়ে হায়াসিন্থ-গার্লকে ভালোবেসেছিল

শুক্লা—বললে,—ক্ষেত-খামারের দেশ! গড্! আজকাল West-Bengal-কে Waste Bengal বলা হয়, জানেন তো? রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর রাজা সাধে বলছেন, আমি মরুভূমি!

উত্তর-গড়িয়াহাটার সোজা রাস্তা মসৃণগতিতে পার হয়ে শুক্লা গোলপার্ক এসে স্টীয়ারিং ঘোরালো।

সুমিত্র Waste Bengal কথাটাতে কৌতূহলী ছিল, বললে,—এর নামও তো গ্রীণ পার্ক হতে পারত। পেছনে তাকিয়ে দ্যাখো কেমন গ্রীণারি।

শুক্লার বাবা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগে বড়ো কাজ করে এসেছেন। কোনো সভ্যতা আবিষ্কার নয়, আবিষ্কৃত পাথর-হাড়িকুঁড়ি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। তাই সভ্যতার হাড়ি-কুঁড়ির খবর মাঝে-মাঝে জানাতেন তিনি ছেলেমেয়েদের। শুক্লা বিদেশী বিয়ে করলেও যে তিনি ক্ষুণ্ণ হতেন না বা অবিবাহিত আছে বলে যে তিনি ক্ষুণ্ণ নন, তা হয়তো ভারতীয় সভ্যতার গোড়ার কথা জানেন বলে।

শুক্লাও জানে কিছু-কিছু। বিদেশে ঘুরতে হলে, বিশেষ করে মার্কিন-দেশে, ভারতীয় সভ্যতার কথা কিছু জানতে হয়। বীট্‌রাই তো তন্ত্রের খবর জানতে চায়।

বালিগঞ্জ স্টেশনের দিকে মোড় নিয়ে শুক্লা বলে,—বাবা তো বলেন, রাজপুতনার সভ্যতার সঙ্গে বাংলাদেশের অনেক মিল আছে—শিবিরাজা-ফাজা অনেক-কিছু বলেন! বলেন, ওখানকার 'কালিবঙ্গ' সভ্যতা নাকি পশ্চিমবঙ্গেরই কালোমানুষের সভ্যতা!

শালিগ্রামের কথা মনে এলো সুমিত্রর। বললে,—মিল? নিশ্চয়ই আছে। নইলে মাড়োয়ারী বঙ্গে এসে এতো সুখ পায়!

—আপনি জয়পুর গেছেন? যশোরেশ্বরী এখনো আছে ওখানে।

—বাঙালী?

—তা-ও আছে অনেক।

—বাঃ! শালিগ্রামকে তাহলে তো আজ জামাই-আদর করতে হয়!

স্টেশনের ফাঁড়িতে ঢুকল শুক্লার গাড়ি—তারপর আর কী—নিমেষে বাটার দোকানের নিশানা—একডালিয়া প্রেস—ফার্ণ রোড। মোড়গুলোই মনে ছিল বোধহয় শুক্লার—তাই কথা বলল না। এ-ধরনের কথায় সে ইংরাজি গানের চড়া সুরের মতো চীৎকার করে হেসে ওঠে। কিন্তু সে-হাসিও শুনল না সুমিত্র।

কিন্তু তার কাজ সে করে গেল। ভাঙানির কাজ। শুক্লার মতো একটি মেয়ে যে তার হাতছাড়া হবে, তা সুমিত্র সহ্য করতে পারে না। এসব কাজে সে বয়স ভুলে যায় যদিও বক্তৃতা করে বলে: আমাদের বয়সে রমণীর প্রেমে লুব্ধ হওয়া চলে না!

ট্র্যাফিক আর স্টীয়ারিং-এ মনোযোগী শুক্লাকে শোনাল সে,—জানো শালিগ্রাম এক-ধরনের দ্রাবিড় রাজপুত—হূণ থেকে যারা এসেছে তাদের গায়ের রং অদ্ভুত ফর্সা!

বাড়ির গেটে ব্রেক ঠেলে শুক্লা বললে,—প্রায় জার্মানদের মতো।

—হতে পারে নর্ডিক। জাতিতত্ত্বের আধো-আধো জ্ঞান থেকে বললে সুমিত্র।

দরজা খুলে একটা ছোট লাফে নেমে পড়ল শুক্লা।

অপর দরজায় সুমিত্রও নেমে এলো।

ছোট দোতলা। পুব-দক্ষিণে বাগান। মে-ফ্লাওয়ার আর জুঁই—রক্তকরবী আর গুলঞ্চ। ভটচাযের গোলাপও আছে—এখন ফুল নেই। গেট-পেরিয়ে শ্বেতপাথরের ফলকে কালো অক্ষর 'পি, গাঙ্গুলি'। প্রিয়তোষ গাঙ্গুলির সঙ্গে সুমিত্রর আলাপ হয়েছে দু'এক-

দিন। 'ইন্ডাস্ভ্যালি সিভিলিজেশনে'র কথা বলছিলেন। আফশোষ করছিলেন,—ওটা পাকিস্তানে পড়ে গেছে। এম্নি যায় ভারতবর্ষের! অশোকের আফগানিস্তান গেছে—দ্রাবিড়সভ্যতার বেলুচিস্তান, ওদিকে দ্বীপময় ভারত।

সাহিত্যের ইতিহাস এক সময় লিখেছিল সুমিত্র উপাধ্যায়, ফলে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে একটা এক্সটেনশন লেকচারও পেয়েছে কিন্তু তার বেশি আর কী? বইটা তেমন বিক্রী হয় নি! অধ্যাপকরাই তো আজকাল সাহিত্যিক আর ঐতিহাসিক! সেই দুঃখে সুমিত্র ইতিহাস ছেড়েছে—সাহিত্যের ভূতটা এখনো ঘাড়ে আছে—রণেন মিস্তিরের জ্বালায় ছেড়ে না গেলেও, 'নতুনরীতি'র প্যাঁচালে সে-ভূত পালিয়ে যাবে।

অতএব প্রিয়তোষ গাঙ্গুলির ঐতিহাসিক আলাপে বাঙালী জনসাধারণের মতোই অনীহা দেখাত সুমিত্র। হেসে বলত,—সমাজতন্ত্রের দিনে সাম্রাজ্যবাদের কথা শুনে কী হবে বলুন?

—কিন্তু অশোক-চক্রটা কেন? শুধু কি অশোক হোটেল খুলবার জন্যে? পেন্সনপ্রাপ্ত সব সরকারী কর্মচারির মতোই গাঙ্গুলি-সায়েব সরকারী নীতির সমালোচক হয়ে উঠতেন।

কিন্তু নয়া দিল্লী তো এখনও সুমিত্রর আশা-ভরসার স্থল তাই সে অমনোযোগী হয়ে উঠত এ-ধরনের কথায়ও।

যেহেতু গাঙ্গুলি-সাহেব রবীন্দ্রনাথের বৈকুণ্ঠের খাতার বৈকুণ্ঠবাবুর মতো অবিবেচক আলাপচারী নন, তিনিও মুখ ফিরিয়ে নিলেন একদিন। সুমিত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণাটা খুব সুখী হল না। মেয়েকে তা জানালেনও : জানিস খুকী, শরৎচাটুজ্জের পর সাহিত্যিকরা ভেবে নিলেন, তাঁদের পড়াশুনো না করলেও চলে!

—তাই দেখছি! শুক্রা উপরে-নীচে, ডানে-বাঁয়ে শরীরটা একটু নাচিয়ে খুশীর ভাব দেখালে।

এখন অবশ্যি সামনের আড্ডা-ঘরে গাঙ্গুলি-সায়েব ছিলেন না, নারায়ণ শালিগ্রামও নয়। কিন্তু শুক্রার টেলিফোন-ডাকে গুপ্ত-সায়েব এসে বসে আছেন। কতোক্ষণ কে জানে? আজ তো ছুটির দিন।

দুজনকে একসঙ্গে ঘরে ঢুকতে দেখে অশোক গুপ্ত খুব ভাবান্তর দেখালেন না। এক পলক তাকিয়েই যেম্নি স্টেট্সম্যান পড়ছিলেন, তেম্নি পড়তে লাগলেন—ঠোঁটের সিগারেটেও একটু বেশি জোরে টান পড়ল না। যদিও অ্যাশ্-ট্রে-টা পাশের টি-পয়ে আছে কি না একবার দেখে নিলেন!

খুশীতে একরকমই নাচে শুক্রা, বাবার সাম্নে যেম্নি গুপ্ত-শালিগ্রাম-অধিকারী-উপাধ্যায়ের সামনেও তেম্নি। তেম্নি খুশী দেখিয়ে শুক্রা বললে,—ও, গুপ্ত এসেছেন! চারমাত্রার মাত্রিক ছন্দের ধ্বনিস্পন্দন শোনা গেল। কিম্বা ইংরেজি তিন-সিলেব্‌লের ছন্দ-ধ্বনি।

ভূমিকা ছাড়াই খুশী-মাফিক শুক্রা তার সালোঁতে প্রবেশ-প্রস্থান করে। সুমিত্রকে অশোক গুপ্তর জিম্মায় রেখে শুক্রা ভেতরে ঢুকে গেল। গাড়ি গ্যারেজে তুলবে ড্রাইভার—সে দায়ও তার নয়।

সুমিত্র দাঁড়িয়েই রইল, অশোকের অনুশাসন শোনবার জন্যে, অর্থাৎ তাকে বসতে বলেন কি না সিভিল সার্ভিসের লোক তা-ই দেখবার জন্যে। সিভিল-সার্ভিস তো পুরনো বস্তু! কী আপ্যায়নই না সে পেয়েছিল যুদ্ধের সময় আই-সি-এস চ্যাটার্জির

বাড়িতে!

কী দায় পড়েছে গুপ্তর "স্টেট্‌স্‌ম্যান" থেকে চোখ তুলবার? সে তো বাড়ির লোক নয়। সে-ও আপ্যায়ন-প্রত্যাশী। A light has gone out of our life—জওহরলালের কথাই জওহরলাল-সম্পর্কে ভাবছিল অশোক গুপ্ত। টিউব-লাইটের জ্যোৎস্নায় যেন সে বসে নেই—অমাবস্যার অন্ধকারে বসে আছে। গান্ধীজির মৃত্যুর পর পণ্ডিতজি ও-কথা বলেছিলেন, পণ্ডিতজির মৃত্যুর পর আজ আমরা ও কথা বলতে পারি। স্যাডেনড্ হার্টের দরুণ সিগারেটের জোনাকিটাই নিবু নিবু দেখাচ্ছিল। দুঃসংবাদে অনেকের হার্ট তো ফেলও করে।

অগত্যা নিজেকেই নিজে সাহায্য করল সুমিত্র। বসল! কিন্তু ঘরের অপর-প্রান্তে। দু'প্রান্তেই দু'টো বসবার আসর। হাঁ—আসরই। মেঝেতে গালিচা আছে। নিশ্চয়ই কাশ্মিরী। কিন্তু তা পা-পোষেরই সামিল। তার উপর বেঁটে-বেঁটে কৌচ। কোণে, কোণে ত্রিকোণ টেবিল। দু'টোতে ফ্লাওয়ার ভাস্। একটাতে প্রসাধন-সামগ্রী। বাকিটায় 'বুক অব দ্য মান্থ'-লেবেলের দু'টো একটা বই। রেডিওগ্রাম নেই—যা থাকবার কথা। ওটা গাঙ্গুলি-সায়েবের দোতলার ঘরে। এ-ঘরটাকে নিরিবিলি রাখতে চায় শুক্লা—যদিও সঙ্গীতশ্রী বসন্ত অধিকারীর যাতায়াতের অধিকার দিয়েছে। দর্জা-জানালায় এখন মে-ফ্লাওয়ার রঙের পর্দা—ঋতুর রঙে পর্দার রঙ বদলায়। দেয়ালে একটা মাত্র ছবি, রবীন্দ্রনাথের আঁকা সাপের মতো রজনীগন্ধার ডাঁটা—কিম্বা 'কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা-বনে'। ঘরে ঢুকলেই সামনের দেয়ালে তা দেখা যায়। কিন্তু মার্কিন অ্যাবস্ট্রাক্ট পেণ্টিং-এর অ্যালবাম আছে শুক্লার, কোনো চিত্রকর আড্ডায় জুটলে দেখাবে, দেয়ালে ঝোলায় নি।

কাজেই দেয়ালে তাকিয়েও যে সময় কাটাবে সে-উপায় ছিল না সুমিত্রর। কিন্তু বই-এর টেবিলে দু'একটা বই ছিল। উল্টে-পাল্টে দেখতে পারত সে। কিন্তু সেদিকে গেল না। গিয়েছিল, প্রথম যেদিন এ-ঘরে সে আসে। আশা ছিল, তার কোনো বই থাকবে ওখানে। শুক্লা একটা বাংলা উপন্যাস লিখেছে, এখনকার নয়াদিল্লীর বাঙালী-জীবন নিয়ে, তাকে পাঠিয়েছিল—চিঠিসহ, কেমন লাগল দয়া করে জানাতে। সংহিতা পড়ে যা বলেছে তা-ই লিখে দিয়েছে সুমিত্র। যথেষ্ট বুদ্ধিমান সে, তাই বলাটা ভাষার প্যাঁচ ভালো ফলাতে পেরেছে। ফলে, শুক্লা তাকে চিঠিতে আমন্ত্রণ করেছিল সুমিত্রকে তাদের বাড়ি। সেই প্রথম সে এসেছিল। আশা করা অন্যায় নয়, শুক্লা যখন নতুন লিখছে, জ্যেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের দু'একটা বই তার শেল্‌ফে থাকবে। কিন্তু শেল্‌ফ কোথায়? ছিল ওই ত্রিকোণ টেবিল। তার উপর একটা মোটা বই। তখনও সে নিরাশ হয়নি। ও-ধরনের মোটা বই তো তার চার পাঁচ খানা আছে—তার যে কোনো একটাই হতে পারে। কিন্তু হলনা। 'দি টিন ড্রাম'—পুতুলের চেহারার একটা বাচ্চা ড্রাম বাজাচ্ছে—ওই প্রচ্ছদ। দেশী-বিদেশী কোনো বই-ই সুমিত্র পড়ে না—খবর জানতে হলে সংহিতার কাছেই জেনে নেয়। কিন্তু বুদ্ধিকে তো দৌড় করাতে পারে সে। অনেক-সময় প্রচ্ছদ দেখেই বলে দেয়, বইটা কী হবে। 'দি টিন ড্রাম' হয়তো ওদের 'পথের পাঁচালি'—একটা বাচ্চার জীবন। খানিকটা বয়স পর্যন্ত নিশ্চয়ই, নইলে এতো মোটা বই হবে কী করে? উল্টে-পাল্টে বইটা সম্পর্কে মুদ্রিত খবর খানিকটা পড়ল সুমিত্র, দু'একটা ইংরেজি শব্দের মানে বুঝল না, বিরক্ত হল, বইটা রেখে চলে এলো বেঁটে কৌচে। জলচৌকির চাইতে বেশি উঁচু হবে না কৌচগুলো। জলচৌকি রাখতে কী দোষ ছিল? বিরূপ মনে ভেবেছিল সেদিন সুমিত্র।

আজ অবশ্যি শুক্লা-সম্পর্কে মন তার বিরূপ নয় কিন্তু অশোক গুপ্তকে সে মোটেও ভালো মনে গ্রহণ করতে পারল না। এমন কি, মনে-মনে কথা শানাতে লাগল সুমিত্র, যা দিয়ে গুপ্ত-সায়েবকে সে বিঁধবে শুক্লা এসে আলাপ সুরু করবার পর।

পাঁচ মিনিটেই শুক্লা ফিরে এলো। শাড়ি পাল্টেছে। মেরুন থেকে লাইট মভ। গোল্ড-ইয়্যালো ব্লাউজ। বাটার 'মন্দা'-চপ্পল পায়ে।

ঘরময় জ্যোৎস্নার উপর সেই সূর্যোদয়ে তাকিয়ে পূর্বপুরুষের মন্ত্রই বলে উঠল সুমিত্র উপাধ্যায়,—উষসঃ নক্ জিহ্বীতে...

রাত্রি-বিজয়িনী উষা ঝর্ণার শব্দে হেসে উঠল,—হিন্দী শিখ্ছেন না কি আজকাল?

অশোক গুপ্ত খবরের কাগজের আড়াল ঘুচিয়ে সতৃষ্ণ হয়ে তাকালে। মন্ত্রে নয় হাসিতে।

—হিন্দীর মতোই অসংস্কৃত—পূর্বপুরুষের ভাষা পড়েছিলাম একসময়! সুমিত্রও হাসলে।

দুই প্রান্তের মাঝখানটার চওড়া, খালি জায়গাটায় দাঁড়িয়ে শুক্লা বললে,—কখন?—আসুন এদিকে। অশোক গুপ্তর দিকে টানলে শুক্লা সুমিত্রকে।

সুমিত্র উঠে আসতে-আসতে শানানো কথাগুলোই হয়তো ভাবছিল, তাই অনামনস্কের মতো বললে,—বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাস যখন লিখি!

—লিখেছিলেন না কি? বাবাকে দেবেন? শুক্লা সুমিত্রর সঙ্গে একই কৌচে বসে বললে,—ইতিহাসে বাবা ভীষণ ইণ্টারেষ্টেড!

রবাহূত হয়েই অশোক বললে,—হাঁ। এই তো তখন আমার কাছে চেয়ে গেলেন, আর্কিওলজির সরকারী পুঁথি-পত্তর। বোরালের ব্যাপার না কি আছে ওখানে।

—আছে? বাচ্চা মেয়ের মতো ঘাড় কাৎ করলে শুক্লা,—বাবার দেশের-গাঁয়ের ব্যাপার! তাহলে তো চাইবেনই!

—ব্যাপার নিশ্চয়ই অশোক-আমলের, নয় গুপ্তযুগের! সরল হাসিতে বলতে চাইল সুমিত্র। ইতিহাসে তার বুদ্ধির দৌড় দেখাতে মোটেও নয়, শানানো অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করতে।

ভুরুতে দু'একটা ঢেউ উঠল অশোক গুপ্তর। সুমিত্রর অস্ত্র খুব বিঁধেছে বলে মনে হল না। তবু তো নুইসেন্স এফেক্ট নামে একটা ব্যাপার আছে। বিরক্তি। ফলে সোজা সুমিত্র-শুক্লার মুখোমুখি বসে না থেকে, সুমিত্রর দিকে খানিকটা পিঠ দিয়ে নড়ে বসল। যাতে এ-ও বোঝা যায় যে শুক্লার প্রতিই সে বিশেষ উৎসুক।

শুক্লা সবার প্রতিই সমান উৎসুক। সুমিত্রর কথায় তাই সে যেম্নি হাসছিল, তেম্নি হাসিতেই উৎসুক হল গুপ্তর মুখে কিছু শোনবার জন্যে।

অশোক তৎক্ষণাৎ বললে,—স্টেট্স্ম্যানের ফার্স্ট-লীডার পড়েছেন? ওয়েল ব্যালেন্সড্। সব সময়ই।

—'ম্যানস্ ডিয়ারেস্ট পোজেশান্ ইজ লাইফ'—কে বলেছেন কথাটা, নেহেরু না লেনিন? একবার চোখ বুলিয়েছি, মনে নেই! রঙীন ঠোঁট আর শাদা দাঁত থেকে ইংরেজি বাক্যটা মধুময় হয়ে বেরোলো।

তা অশোক যতোটা পান করবার জন্যে সতৃষ্ণ দেখাল সুমিত্র ততোটা নয়। ইংরেজিতে ক্ষুধামান্দ্য হয় সুমিত্রর। সে রবীন্দ্রনাথের রজনীগন্ধায়ই তাকিয়ে রইল—শুক্লার ঠোঁটের

আর দাঁতের রক্তকরবীর দিকে নয়।

—অন্যের মনেও যাতে সেই পোজেশন-বোধ আসে তাই চেয়েছিলেন পণ্ডিতজি! অশোক কপালে দার্শনিকের ভাঁজ তুলল,—বস্তুত তাই তো তাঁর সোশ্যালিজ্‌ম্‌—ফিলসফি।

—ও, কী সুন্দর বলতে পারেন আপনি—ঝিল্‌কিয়ে উঠল শুক্লা,—দ্যাট্‌স্‌ হুয়াই আই সিম্পলি লাভ্‌ড্‌ দ্যাট্‌ ওল্ড-ম্যান!

ইংরেজি-বুক্‌নিতে অনীহা বা এলার্জি থাকলেও নেহরুকে ভালোবাসার ব্যাপারে সুমিত্র পেছিয়ে পড়তে রাজি নয়, বললে,—কে না ভালোবাসতেন ওঁকে?

এবার দু'ই চোখে দু'জনকে জড়িয়ে বললে শুক্লা,—নন্‌-এলাইনমেণ্ট কনফারেন্সই তো সেবার যে পণ্ডিতজি গিয়েছিলেন যুগোশ্লোভিয়ায়। আমি প্যারি-তে ছিলাম। টিটোর সঙ্গে পানীয় উপভোগ করছেন—ছবিটা ছাপা হয়েছিল এখানকার কাগজে? আমার এতো ভালো লেগেছিল পণ্ডিতজির সে-মুখ! পোজেশন-বোধ বলছিলেন না, গুপ্ত? ঠিক তা-ই।

এ কি পানীয় ব্যবস্থার ভূমিকা? ভাবলে সুমিত্র। কিন্তু তা হলে তো বসন্তকে আসতে হবে। শালিগ্রাম না এলেও চলে। কিন্তু বসন্তকে চাই শুক্লার প্রথম গ্লাস ঠুকবার জন্যে। মেয়েদের সাহিত্য-বোধের চাইতে গানের বোধ বেশি—যতো শিক্ষিতাই হোক বা বিদেশ-দুরস্ত।

সুমিত্রর মনও হতে পারে কিম্বা শুক্লার তৃতীয়নয়ন—বোধহয় টানছিল সঙ্গীতশ্রী বসন্তকে। পর্দা সরিয়ে সে এসে ঢুকল। "প্রবাসী"তে "শেষের কবিতা" ছাপা হবার সময় দেবীপ্রসাদ 'অমিতরায়ের' যে-ছবিটা এঁকেছিলেন—বসন্তকে দেখে সুমিত্রর তা-ই মনে পড়ল অনেকদিন পর।

—বড্ড দেরি হয়ে গেছে—জোড়হাতে থুতনি নেড়ে বললে বসন্ত,—কিন্তু ফোনে তো বলেছি, A.I.R.-এ একটা এনগেজমেণ্ট ছিল! ওখানেই দেরিটা হল!

—দেরি হল বলে কি দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? বসুন! শুক্লা দৃশ্যত দুই চোখে অভ্যর্থনা জানালে।

বসন্ত কোঁচাটা সামলাতে দু'পায়ে জ্যামিতিক নাচের ভঙ্গি দেখিয়ে এগোল এবং অশোকের পাশাপাশি খালি কৌচে অবলীলায় বসে পড়ল।

একটু ঘাড় বাঁকালো অশোক,—রেকর্ডিং ছিল? কখন ব্রডকাস্টিং?

—ন'টায়!

—ও, বাবা তখন ঘুমিয়ে পড়েন! বিষণ্ণ দেখালে শুক্লা, কথাটাতে বিষণ্ণতা ছিল না বলে।

সুমিত্রর সুযোগ এলো তার লেখা গান-দু'টোর কথা বলবার। কিন্তু বললে, —এ সময়টাতে গান-লেখা হচ্ছে না—যা হচ্ছে তার কী ভাষা, রবীন্দ্রনাথ থেকে ধার-করা দু'একটি পংক্তি বাদ দিলে!

—আপনারা লিখুন না—সাহিত্যের উঁচু ধাপে যাঁরা, তাঁরা তো এগিয়ে আসছেন না! বসন্ত বললে।

—খাঁটি কথা। অশোক পিঠ হেলিয়ে দিল কৌচে,—রবীন্দ্রনাথ যদি লিখতে পারলেন গান, এখনকার সাহিত্যিকরা কি তাঁর চাইতে বেশি অভিজাত হয়ে গেলেন?

যেহেতু সুমিত্র জওহরলালের অভাব-বোধে ইতিমধ্যেই দু'টো গান লিখে ফেলেছে—দু'টো, যাতে রেকর্ডের এপিঠ-ওপিঠ হয়—তার জন্যেই অশোকের বক্রোক্তি সে গায়ে মাখল

না। অশোকের উদ্দেশ্যেই শুক্লাকে বললে সে,—জানো শুক্লা—কবিতার সারাৎসারই গান। শুনতে পাই এখনকার কবির সংখ্যা, কলকাতায়ই না কি পাঁচ শ'। তার মধ্যে, ধরে নিচ্ছি, অন্তত পাঁচজন তো ভালো কবিতা লেখেন!

—এ স্ট্যাটিস্‌টিক্স কোথায় পেলেন! শুক্লা মজা পেয়ে সুমিত্রর গা-ঘেঁষা হল।

—আমি জানি। জানার উৎস সংহিতার উল্লেখ করল না সুমিত্র,—বলো, সে পাঁচজন কী করছেন? লিখছেন গান? লিখছেন না—মানে লিখতে পারেন না। তুমি বোধহয় জানো না, গান লিখবার অভ্যাস থেকেই সাহিত্যে ঝোঁক এসেছিল আমার! বসন্তকে ধরবার জন্যে টোপ ফেললে সুমিত্র।

বসন্ত অনুনয়ে গদগদ হয়ে বললে,—দিন না আমাকে দু'দশটা গান লিখে! আপনাকে পেলে তো আর টম-ডিক্‌-হ্যারির পেছনে আমাদের দৌড়ুতে হয় না!

—রিয়্যালি? অশোক গুপ্ত হেসে উঠল। তার ধারণা ছিল, এখানে এলেই বসন্ত দু'-একটা ইংরেজি বুক্‌নি ঝাড়তে সুরু করে।

খুশী হল সুমিত্র। বসন্ত টোপ গিলল বলে। কিন্তু খুশীর অনুপাতে, ঠোঁটে যতোটুকু হাসি ফুটল, তা কিছুই না। যেন বসন্তর এই প্রার্থনা ন্যায্য এবং যেসব টম্‌-ডিক-হ্যারি এখন গান লিখছে তাদের বহু-বহু ঊর্দ্ধে তার আসনটা ন্যায্যত প্রাপ্য। কিন্তু গান দু'টো সে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছে। জামা-পরবার পরেই পকেটে নিতে ভোলে নি। যদিও শুক্লার টেলিফোন পায় নি—তবু শুক্লার আড্ডায়ই সে বেরোচ্ছিল। শুক্লার কাছেই গান দু'টো দেবে ভেবেছে, বসন্তর হাতে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে। যা সে আশা করেছিল, আকাশ-বাণীর অফিস থেকে বা গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে তার গানের জন্যে তাগাদা আসবে, তা আসে নি। টেলিফোনই বাজে নি আজ। তারা জব্দ হবে খানিকটা বসন্তর গলায় তার গানের কথা শুনলে। বসন্তর কাছে তো যোড়হস্ত তোমরা, যে আমার কাছে হাত যোড় করছে গানের জন্যে—এখন ভাবল সুমিত্র। শুক্লার দালালির আর দরকার হল না। অবশ্য শুক্লার খাতিরেই এই খাতির করল বসন্ত তাকে। শুক্লার কথায়ই তো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে সুরু করল ও। নইলে টম্‌-ডিক্‌-হ্যারির গানই তো গাইত। সঙ্গীতশ্রী উপাধি যদি পেয়ে থাকে তো তারপর!

শুক্লা প্রায় ছেলেমানুষি একটা প্রস্তাব করে বসল। খুকী-খুকী গলায় অনুরোধ জানালে সুমিত্রকে,—তাহলে এক্ষুণি দিন না একটা গান লিখে পন্ডিতজির উপর—বসন্ত সুর দেবেন এবং গাইবেন। আজই, এখানে। দেবেন? আমি ততোক্ষণ আপনাদের পানীয়র ব্যবস্থা করছি! শেষ বাক্যটায় কৌশোর উত্তীর্ণ হল শুক্লা।

যেন হঠাৎ কী মনে পড়ল যা খুঁজতে হবে এম্নি ভাব করে সুমিত্র তার পকেট হাতড়াতে লাগল। কারণ, তৎক্ষণাৎই তো গান দু'টো বার করতে পারে না। অবশ্যি বার করলে ক্ষতি ছিল না। সঙ্গে-সঙ্গে বলতে পারত, তোমার জন্যেই লিখে এনেছি। কিন্তু সে-ধরনের প্রেম তার শুক্লার উপর নেই। বলতে গেলে, সুমিত্র প্রয়োজন-বাদী। বাস্তব স্বার্থ ছাড়া একটি পা'-ও সে নড়ে না। সুব্রতর সঙ্গে যে এখনো তার পরিচয় আছে শুধু এই স্বার্থে যে সুব্রতর চেষ্টায় ভবিষ্যতে শোভনের একটা ভালো চাকরি হয়ে যেতে পারে।

শুক্লার বাক্যের শেষেই বসন্ত খুশী-খুশী চোখে বললে,—আমি রাজি—এখন পদ্ম-বিভূষণের কৃপা হলেই হয়!

ফিরে তাকে এখুনি যে সঙ্গীতশ্রী বলবে এমন বোকা সুমিত্র উপাধ্যায় নয়। সে

তখনো কপালে মিহি ভাঁজ তুলে জামা হাতড়াচ্ছে।

শুক্লা দাঁড়িয়ে বললে,—কী খুঁজছেন? পেন? কাগজ?

—না-না! দেখছি, পকেটে আছে কি না কাগজটা! কাগজটা বার করবার আগে বললে সুমিত্র।

—এই তো আছে! কিসের কাগজ না জেনেই পাওয়ার সুখে নেচে উঠল শুক্লা—তারপর জিজ্ঞেস করল,—কী ওটা?

—গান। লিখেছিলাম। ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করে গ্রামোফোন কোম্পানীতে চলে যাব। ও'রা চেয়েছিলেন কি না! বললে সুমিত্র।

বসন্ত লুব্ধ হাত বাড়িয়েছে দেখে খুশীতে নেচেই শুক্লা প্রস্থান করলে।

শুক্লার প্রস্থানে মুখে তৃপ্তি এনে অশোক আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে টিনশুদ্ধু টিপয়টা বসন্তর সামনে এগিয়ে দিলে।

বসন্ত কাগজেই তন্ময় তখন। সুমিত্র অশোকের সিগারেট খাবে না। যদিও ধূম-পানের তেষ্টা তার ছিল তবু তীব্রতর পানীয়ের অপেক্ষায় তাকে তুচ্ছ করা কিছুই না।

ভুরু কুঁচকে বসন্ত চোখ-দুটো অনুবীক্ষণযন্ত্র করে তুলছিল ক্রমেই যাতে কথাগুলোর রক্তে সুরের শাদা-লাল কোষগুলো দেখা যায়।

এই রঙ্গমঞ্চে নারায়ণ শালিগ্রাম প্রবেশ করল। দ্রাবিড় সৌন্দর্য চোখে-মুখে এখনো আবিষ্কার করা যায়। অন্তত শুক্লার বাবা গাঙ্গুলি-সাহেব তাকে সে-সৌন্দর্যের অনুরোধেই বেশি খাতির করেন, তার বিদেশী ধোপের জন্যে ততোটা নয়। সরু কোমর থেকে যদিও ট্রাউজারটা তলপেটে নেমে এসেছে, কিন্তু টেরিলিনের ঘি-রঙ শার্টটা গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে চওড়া বুকের ছাতি যে-কোনো চোখের দৃষ্টিকে লোভাতুর করে তুলতে পারে। অন্তত শুক্লা, মার্কিনি মেয়েদের মতো, তাতেই বশ।

শালিগ্রামকে দেখেই সুমিত্রর জামাই-আদরের কথা মনে পড়ল। একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল সে,—নারায়ণ! নারায়ণ! লক্ষ্মীভাইটি এসো, এসো!

নারায়ণ শালিগ্রাম এগিয়ে এসে সুমিত্রর হাত ধরলে,—আপনিও এসে পড়েছেন দেখছি! বাট হুয়্যার'স্ আওয়ার সুইট-গ্যাল?

তিনটে চা-বাগানের মালিক শালিগ্রাম-পরিবার, কয়েকটা কয়লা-খনির মালিক হতে পারলেই বিড়লা-হাউসের মতো শালিগ্রাম-হাউস দাঁড়িয়ে যাবে। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে পড়তে গিয়েছিল, সোশ্যালিজ্‌ম্ শিখে এসেছে কি না জানা নেই। তাহলে আর হাউস্-ফাউস্ দাঁড়াবার উপায় নেই।

অশোক ভাবছিল কথাগুলো অর্দ্ধনিমীলিত চোখে।

সুমিত্রর হাত ছেড়ে অশোকের দিকে মন দিলে শালিগ্রাম,—অশোকবাবু কী ভাবছেন? নেহরুর পর নন্দবংশ চল্‌বে এবার?

সিগারেট ঠোঁটে রেখেই অশোক গুপ্ত জড়িত গলায় বললে,—বংশ? আমাদের তো দিয়ে গেছেন একবার! অন্তত পুলিশকে!

সুমিত্র ততক্ষণ বসন্তে মন দিয়েছিল। মুখে তার গুন্‌গুন্ বেরোচ্ছে কি না দেখতে। যে-ফুল ফুটিয়েছি! একদম বসন্তের গোলাপ—ব্ল্যাক্‌প্রিন্স! গুন্‌গুন্ সুরু হবে না? হল। এবং ইলেশনের রোগীর মতো সোল্লাসে অনেকগুলো কথার তাগিদে সুমিত্র শালি-গ্রামকে পাশে ডাকল,—বোসো, শালিগ্রাম! পথে আসবার সময় শুক্লার সঙ্গে তোমার কথাই

হচ্ছিল! বাঙালীর মতো তোমাদের রাজস্থানীদেরও নেহরুর মৃত্যুটা তেমন লাগে নি? কী বলো?

শালিগ্রাম এসে সুমিত্রর পাশে বসল।—কী করা যায়, বলুন! ঘাড় নেড়ে বললে শালিগ্রাম,—নেহরু তো দক্ষিণেই তাকিয়েছেন! রাজস্থানের দিকে তাকিয়েছেন, না ওয়েস্ট বেঙ্গলে?

অশোক ঠোঁটদুটো সিগারেট থেকে মুক্ত করে বললে,—রাজস্থানের লেড্-মাইনিং-এর কোনো খবর জানো, শালিগ্রাম? সাম্ দত্ত, যাঁর সিলেটে সিমেণ্ট কোম্পানী ছিল—গিয়েছিলেন রাজস্থানে লেড্-মাইনিং করতে!

—দ্যাট্স্ মাই ফাদার্স প্রোভিন্স্। বাবা জানতে পারেন। আপনার দরকার আছে? তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারি বাবাকে! টিপয়ের টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল শালিগ্রাম।

বসন্ত কাগজে আর জানালার পর্দায় চোখ চালাচ্ছিল এতোক্ষণ গুন্‌গুন্ করতে করতে। এবার বললে সুমিত্রকে,—

—যন্ত্রের দরকার তো কিছু! দেখি শুক্লা কী ব্যবস্থা করে! সুমিত্র শালিগ্রাম সম্পর্কে আর উৎসাহ দেখালে না।

ট্রে ভর্তি গ্লাস আর সোডার বোতল নিয়ে আধা-ভৃত্য শম্ভু হোটেলের বয়ের ভঙ্গীতে পর্দা সরিয়ে দেখা দিলে। শালিগ্রাম উঁচু হাসিতে সাঁলোর আবহাওয়া তৈরী করে বললে, —যেখানে ডেজার্ট সেখানেই ওয়েসিস্!

সুমিত্র তার যৌবনের প্রিয় কবি যতীন সেনগুপ্তর পংক্তির পরিবর্তিত রূপ পরিবেষণ করলে কাব্যিক উৎসাহে,—বঙ্গ-সাগর থেকে একখানি মেঘ ধার দিতে পারো থর-সাহারার বুকে।

স্কচ-হুইস্কির সুদৃশ্য জারটা একটা পোষা জন্তুর মতো কোলে নিয়ে দেখা দিলে এবার শুক্লা। এবারও শাড়ি পাল্টেছে। সোনালি-পাড়ের ধূসর জমিন! মেঘবর্ণ। জল-ভরা মেঘ।

অশোক গুপ্ত চোখের অভ্যর্থনা জানিয়ে শুক্লাকে বললে,—কে বলেছিলেন, শুক্লা—কোল্‌রিজই তো? সুরছন্দের সঙ্গে সুরার একটা সম্পর্ক আছে!

—আছেই তো! শুক্লা এবার জন্মজনপদের লক্ষ্মীর উত্থানের দৃশ্য দেখালে, হাতে যাঁর ধান্যভরা মঙ্গলকলস।

সুমিত্র একটু ম্লান দেখালেও শুক্লাতে ঔৎসুক্য না দেখিয়ে পারলে না,—কী কী? বল তো!

—বাবা বলেন, নর্ডিকরা বেদের ছন্দ লিখতেই পারতেন না যদি সোমপায়ী না হতেন!

সোল্লাসে সবাই হেসে উঠল।

আট

কাগজ তো পড়ে না মাধুরী। পড়বেও না। হোক না বাংলা খবরের কাগজ। হোক না সে এখনো প্রায়-তরুণী। দেখেছে, বাবা-কাকারা পড়তেন ইংরেজি কাগজ। তা পড়তেন সায়েবদের সঙ্গে তাঁদের কাজ-কারবার ছিল, তাই। বাংলা-কাগজ তো সেদিনের ব্যাপার!

প্রায়-তরুণী হলেও বাবা-কাকাদের মুখে-শোনা কথাটা শ্রুতিশাস্ত্র হয়ে উঠেছে মাধুরীর। পিনাকীকে কাগজ পড়তে দেখলেই কথাটা মনে আসে। স্মৃতিশাস্ত্র আওড়ে বলে: একেলে ব্যাপারে তোমার বড্ড লোভ। শ্যামবাজার-বাগবাজার ছেড়ে উঠে এলে গড়িয়াহাটা—পড়ছ বাংলা খবরের কাগজ! একে তো মুচ্ছুদ্দি-বাড়ির মেয়ে, ইংরেজরা যেদিন পাল-তোলা জাহাজে এসে লবণের ব্যবসা করছিল, পিতামহর পিতামহরা সেদিন থেকে ইংরেজের দালাল, তারপর যখন বিলিতি মদ এলো জাহাজশুদ্ধু কিনে নিত না কি তাদেরই বাড়ির কর্তারা। গল্প শুনেছে মাধুরী। মুচ্ছুদ্দি-বাড়ি থেকে এলো সে জমিদার-বাড়িতে। তার শ্বশুরের গুষ্ঠিও তো না কি গড়ের সায়েবদের ওখানে কী কাজ করে জমিদার! সে কি আজকের কথা? কেউ বলতে পারে না কবে! সবাই বলে বনেদি জমিদার। কাজেই মাধুরীর সেকেলেপণাটা যাবে কেন? তার উপর বাবা তার হাতখরচের জন্যে একটা বাড়ি লিখে দিয়েছেন ঠাকুর-বাড়ির কর্তাদের মতো। কলকাতার একটা সম্পত্তি! সরকারী আইনে যাকে ধরতে পারবে না! জমিদার বলতে তো এখন কলকাতার বাড়ির মালিকরাই! এ ব্যাপারে মাধুরী খুবই ওয়াকিবহাল। মোটের উপর বাড়িতে জমিদারিটা এখন সে-ই করছে, পিনাকীরঞ্জন নয়।

পিনাকী কাগজ হাতে নিয়েই মাধুরীকে ডাকল, বারান্দায় তাকে দেখতে পেয়ে,—শুনছ? শোনো—শোনো—

পিনাকীর খবর-কাগজ পড়া নিয়ে কী বলা যায় তা এলোমেলো ভেবে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল মাধুরী।

—জানো, কাল দিল্লীতে ভূমিকম্প হয়ে গেছে! একটা মজার খবর বলার মতো করে বললে পিনাকী।

—ভূমিকম্প? ও, নেহেরু মারা গেছেন, তাই বলছ?

—না-না, সে তো আগেকার খবর। পরে ভূমিকম্প।

—তা হতে পারে। ভূমিকম্প তো হয়ই মাঝে-মাঝে।

—আমি কী ভাবছি জানো? নেহরুর মারা যাবার খবর পেয়ে এতো লোক জড়ো হয়েছে দিল্লীতে যে তার ভার আর সইতে পারছেন না ধরিত্রী!

হাসল মাধুরী,—সে তো পাপের ভার সইতে না পেরে কেঁপে ওঠেন তিনি!

—তুমি কি ভাবছ যারা জড়ো হয়েছে তারা সবাই পুণ্যবান?

—পাপী যে তা-ও বা তুমি জানো কী করে?

—জানি? কাগজ-ধরা হাতটা এগিয়ে দিলে পিনাকী,—দ্যাখো—রাজঘাটের পথে পায়ের নীচে পিষে তিনটে লোককে মেরেছে!

—কী সর্বনাশ! আঁৎকে উঠল মাধুরী।

—সর্বনাশ আবার নয়! তিনমূর্তি মার্গে এখন তিনটি প্রেত দাঁড়িয়ে থেকে বলবে, দ্যাখো নেহরুর জন্যে আমরা মারা গেলাম! পৃথিবী শিউরে উঠবে না? বহুদিনের জমাট আক্রোশ যেন ফুটে বেরোল পিনাকীর চোখে।

সে-চোখ দেখতে ভালো লাগল মাধুরীর। সে-চোখে যেন সে এখন শ্বশুরমশাই-এর চোখের আদল দেখতে পেলো।

খুশী-খুশী মুখে মাধুরী বললে,—তাহলে সত্যি দিল্লীকে পাপে ধরেছে!

—কবে না ধরা ছিল? মুখ-গোমরা হয়ে রইল পিনাকী।

সুখী হয়েই সকালের কাজে বা অকাজে চলে গেল মাধুরী। ছেলেরা ওঘরে পড়ছে, যাবার দরকার নেই। ভাপের দই করতে ঠাকুরকে বলে লাভ নেই—ও পারবে না করতে। পিনাকীর খাওয়ার শখ হলে আর কী হবে! গোলপার্কে না কি সিমলের দোকান হয়েছে। বলে-কয়ে তাদের ওখান থেকে যদি আনা যায়। শম্ভুকে বাজারে পাঠানো! সাতটাকার উপর আজ ক'টাকা দেবে সে সিমলের কিছু মিষ্টি আনতে সেই সুখী বাজেটে মন দিয়েই মাধুরী দোতলায় উঠে গেল।

এ-বাজেটেও যদি প্রসেনজিতের পুত্র পিনাকীরঞ্জন মারা গিয়ে প্রেত হয়ে থাকে তাহলে আর কী করা? গুমোট মুখেই পিনাকী আবার কাগজটাতে চোখ নিলে। চিতায় তুলেই চীৎকার: চাচা নেহরু জিন্দাবাদ! হবেই! গ্রেট্ মুঘল আকবর ছাড়া আর কী ছিলেন নেহরু। প্রতাপাদিত্যের জমিদারী কেড়ে নেওয়া আর প্রথম এলিজাবেথের সঙ্গে দহরম-মহরম! একই মুঘল আমল! ও'রা না-হয় হাতে গোলাপ ধরতেন আর ইনি বুকে!

চায়ে চুমুক দিয়ে এমন হাল্কা লাগল নিজেকে পিনাকীর যেন শবদাহর ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। পেয়ালা শেষ করে তার মনে হল, এখন একটু বাইরে বেরোতে হয়। ইচ্ছে করছে বেড়াতে। লেকে বিলম্বিত হাঁটিয়েরা আছেন কিন্তু বাতিকগ্রস্ত ছাড়া লেকে এখন কে যায়!—জজবাবু! জজবাবুই মনে এলো পিনাকীর। কাল এসে গেছেন বুড়ো। রিটার্ন ভিজিট দেওয়া উচিত। বীমাবাবুর স্বাস্থ্য-অনুসন্ধানেও যাওয়া যায়। এ-দু'জনই আছেন। পরিচিত। আর কারো সঙ্গে পরিচিত হতে চায় নি পিনাকী। তাঁরাও কি পরিচিত হতেন যদি জমি কিনতে না আসতেন তার? যেচে কারো সঙ্গে সে পরিচয় করতে যাবে কোন্ দুঃখে? সে কি বীমার দালাল, ব্যবসাদার, চাকরির উমেদার? সে কি কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হতে চায়, না স্বদেশী নেতা যে ভোট কুড়িয়ে বেড়াবে? হাতির বদলে মোটর চললে হবে কী? এখনো হাতিবাগান আছে। কে না জানে যে হাতি মরলেও লাখটাকা। কলকাতা-৩১এ এসেছে পিনাকী সাধে? ছেলেবেলায় শুনেছে, এদিকে হাতি চড়ে!

বেরোবে বলেই পিনাকী উপরে গেল। গিলে-করা পাঞ্জাবীটা আর মেটে রঙের নিউ-কাট জুতোর জন্যে। ময়লা ধুতি সে বাড়িতেও পরে না। রায়সায়েব কেটে পদ্মশ্রী করলেই কি আর যুগ পাল্টায়। জমিদার-খেতাব কাটলেই কি আভিজাত্য চলে যায়? সে না হোক, তার শ্বশুর-গুষ্ঠি তো এখন জমিদার! কলকাতায় ক'খানা বাড়ি? সমাজতন্ত্র করবে তো নাও না সে সব বাড়ি কেড়ে! না কি রেণ্ট-কালেক্টররাই তোমাদের সমাজতন্ত্রের পথে বাধা হয়ে ছিলেন! সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে-উঠতে পিনাকী মনে-মনে ক্ষেপে উঠল। মনে-মনেই ক্ষেপে সে। অনেক নদী তো ফল্গু হয়ে যায়। বাংলার জমিদাররাও তেম্নি। চাচা নেহরুর তর্পণের দিনে কী হয় কে বলবে? না, কিছু হলেও তো হাতে-খোঁড়া গোষ্পদ! সে কি আর বন্যার স্বপ্ন দেখতে পারে?

মাধুরী হাত না বাড়াতেই দেখা গেল পিনাকী ঠাণ্ডা। হেসে বললে,—একটু বেরোব। দিনটা বেশ ফর্সা, ফুরফুরে তা-ই না?

—কোথা যাচ্ছ? কী করে একটা গাঁধি-পোকা লাফিয়ে এসেছে পিনাকীর গেঞ্জিতে, ঘাড়ের কাছটায়, টোকা মেরে ফেলে দিয়ে বললে মাধুরী,—গন্ধও পাও না?

—কী? বাদামী পোকাটার চিৎ-মূর্তিতে তাকিয়ে বললে পিনাকী,—পোকা? বাগান করলে যা দোষ!

—প্রজাপতিও তো হতে পারত! গালে টোল ফেলে হাসল মাধুরী। হাসলে এখনও

তাকে আশ্চর্য সুন্দর দেখায়।

—খুশী হতে তাহলে? ফিকে-বাদামী জুতোয় পা দিলে পিনাকী, গিলে-করা শুভ্র পাঞ্জাবীতে মন।

পাহারাদারের মতো পায়চারি করাই তো এখন তাদের কাজ—মাধুরী ঘরে, পিনাকী না-হয় মাঝে-মাঝে বাইরে। মন যদি কিছুতে থাকে, তাহলে তা শুধু খাদ্যের খুঁটিনাটিতে। ঐতিহ্য বলে যে একটা শব্দ শোনা যায়—এই খাওয়ার ব্যাপারে সেটা—রুপোরও কয়েক প্রস্ত বাসন পড়ে আছে ভাঁড়ারে, যার চাবীতে মাধুরীর সন্তর্পণ মন।

বেরোলো পিনাকী। বীমাবাবুর বাড়ি যদি যায়ই, জজবাবুকে নিয়েই যাবে।

মালী দৌড়ে আসছিল, নিজেই সে গেট বন্ধ করল। গড়িয়াহাটার গড়ুর্-গড়ুর্ শব্দ—লরী-বাস-মোটর, ভেঁপুর রং-বেরং আওয়াজ! পুলটা হলে না-জানি কী চৌদুনে ওঠে ব্যাপারটা! বিরক্ত হল পিনাকী। রাস্তায় পা দিতে চায় না সে সাধে? কানের পর্দা তো আর গণ্ডারের চামড়া নয়! ঘোষ-বাড়ির জলসায় তবলা-যুদ্ধ যখন চলত, আসর ছেড়ে আসত পিনাকী।

খানিকটা রাস্তা তো পেরোতেই হবে। খালি জমি, গলি, ডাক্তারখানা—তারপর জজ-বাবুর বাড়ি। ভেতরে ঢুকে বীমা-বাবু ভালোই করেছেন। বড়ো রাস্তা ঘেঁষে থাকলে জীবন যে কতো বিপন্ন, তিনি না জানলে আর কে জানবেন?

যাদবপুরটা হল কী? অরেকটা কলকাতা? বাস-লরী-ট্যাক্সি-প্রাইভেট আসছে তো আসছেই! রাস্তা পারাপার এক মুস্কিল ব্যাপার! ভাগ্যিস, জজবাবুকে পেতে রাস্তা পেরোতে হবে না। ভাগ্যিস, যোধপুর পার্কে তার কেউ পরিচিত নেই! পরিচিত হতে এসেছিলেন—কে যেন? পদ্ম—? বারবার পদ্মশ্রী কথাটাই মনে এলো পিনাকীর—নামটা মনে এলো না। মনে তো আসে না এমন কতো নামই! বাবার এতো বড়ো জাঁকালো নামটাই মনে আসে না আর কে পদ্মভূষণ না গোলাপভূষণ ভাববে দাঁড়িয়ে? অত্যন্ত দ্রুত পায়ে সে জজবাবুর বাড়ির গেটে উপস্থিত হল।

গ্যারেজ বরাবর রাস্তার গেট খোলা। থামতে হল না। বাড়ির বারান্দায় যাবার আগে থামল না পিনাকী। তা-ও কয়েক সেকেণ্ড। খোলা ঘরে ঢুকবে কি ঢুকবে না ভেবে। শুধুমাত্র ঘরের অদৃশ্য মানুষদের জিজ্ঞেস করতে,—জজবাবু আছেন?

তক্ষুণি উত্তর এলো,—কে, কে? আসুন, ভেতরে আসুন।

ঢুকল পিনাকী। জজবাবুই। সহাস্য। বীমাবাবুর সঙ্গে বসে আছেন। সেদিনকার কাগজটা খালি কৌচের উপর। খবর নিয়ে দুই অবসর-প্রাপ্তের আলাপ হচ্ছিল বোঝা যায়। এবং মজার আলাপ।

পিনাকীও তো মনে-মনে মজা পাচ্ছিল মাঝে-মাঝে আজ। বলুলে,—না চাইতেই জল। ভাবছিলাম জজবাবুকে সঙ্গী নিয়ে বীমাবাবুর সঙ্গে দেখা করব আজ! দেখছি একেবারে মোহানায় এসে গেছি।

শশাঙ্কশেখর আর সচ্চিদানন্দ দু'জনেই পুলকিত হলেন বোঝা গেল। কিছু বলবেন বলে' দু'জনেরই ঠোঁট নড়ল, তাই বাঁধানো দাঁতের দরুণ গালশুদ্ধ মুখের সবটুকু নীচু দিক নড়ে-চড়ে উঠল। অবশেষে অবসরপ্রাপ্ত জজ শশাঙ্কবাবু বললেন,—বরং বলুন মরুভূমিতে এলেন! আমরা এখন তা ছাড়া আর কী?

মাথা নাড়লেন সম্মতিতে সচ্চিদানন্দ।

বন্ধের সম্মান দেখাবার জন্যেই, বসবার অনুরোধ সম্পর্কে মনে কোনো প্রশ্ন না এনে, খালি কৌচের খবরের কাগজটা একটু ঠেলে দিয়ে বসল পিনাকীরঞ্জন। কিম্বা হয়তো ভাবল, তা ছাড়া আর কী? জজবাবুর কথাটাই ভাবল। ভেবে দেখল, সে নিজেও তা ছাড়া আর কী? তাই বসল।

একটু অস্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলেন একটি সচ্ছল প্রাক্তন বীমা কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টার্সের চেয়ারম্যান সচ্চিদানন্দ,—কাগজ পড়লেন?

—ওই তো একমাত্র পড়ার আছে আজকাল। জ্ঞানের রাজ্য! এমন গম্ভীর মুখে বললে পিনাকী যাতে বিদ্রূপ বোঝায়।

জজবাবু তা বুঝলেন এবং যেহেতু অভিজিৎ খবরের কাগজে কাজ করে, খবরের কাগজের উপর কটাক্ষে সচ্চিৎবাবুর তাই ক্ষুন্ন হবার সংগত কারণ আছে, তাই তিনি কথাটার বৃক্ষ কাণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখা বার করতে চাইলেন,—আশু মুখুজ্জে মশায় বলতেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করার তোরণমাত্র!

এবারেও মাথা নাড়লেন সচ্চিদানন্দ।

জজবাবু বীমাবাবুকেই বললেন এবার, নৈর্ব্যক্তিক কথার পর,—আপনাকে বুঝি বলিনি কালকের কাগজে অভিজিতের লেখাটা চমৎকার হয়েছিল।

বয়স হয়ে গেলে, নির্গুণ পুত্রেও মুগ্ধ হন পিতা। অভিজিতের শত দোষ থাক্ গুণও তো অনেক। তাই একটু উৎসাহিত হয়ে বললেন সচ্চিদানন্দ,—অভির অবজারভেশন ভালো।

পিনাকী সে লেখা পড়েনি। পড়তেও ঔৎসুক্য দেখালে না। চুপচাপ বসে শুনতে লাগল। বলতে গেলে, এখানে এলেও, শ্রোতার ভূমিকাই তো নেয় সে। কথা আর ক'টা বলে? আজ তবু বলেছে। মনটা খুবই হাল্কা। তাই।

—আপনাকে বলে রাখছি, সচ্চিৎবাবু—জজবাবু বিষণ্ণ এবং গম্ভীর হতে লাগলেন, —আজ যে-যাই বলুন, একদিন সবাই মিলে বলতে শুরু করবেন, নেহরু ইজ এ টোটাল ফেলিওর। মনের কথাটাকে প্রচ্ছদে সাজালেন তিনি। বীমাবাবু লুফে নিলেন কথাটা: কোনো মানে হয়, মশাই স্পেকুলেটিভ বিজ্‌নেস্ ন্যাশ্‌নেলাইজ করার? আমরা যে-পরিমাণ বিজনেস্ করতাম, হচ্ছে এখন?

—ক্ষতি, ক্ষতি! লাভ-ক্ষতি বোঝাটাই তো অর্থনীতির মস্ত ব্যাপার? আর অর্থ-নীতির উপরই সমাজতন্ত্র। কে বোঝে? মন্ত্রী থেকে শুরু করে পরামর্শদাতারা বোঝেন কেউ? জটিল একটা অর্থনীতিকে প্রাঞ্জলভাবে বোঝাতে চাইলেন সবাইকে জজবাবু।

কিন্তু অর্থনীতিটা বীমাবাবুর এলাকার। তিনি সামান্য উষ্মা দেখিয়েই চুপ করে গেলেন। প্রেশারের ভয়ে। পরশু একবার শরীর খারাপ গেছে। উত্তেজনায়। পণ্ডিতজির মৃত্যুতে উত্তেজিত হয়েছিলেন তিনি। কেন বলতে পারবেন না। এখন ভাবতে গেলে দেখেন অনর্থক। কারো মৃত্যুতে কিছু পাল্টে যায় না। নেহরু গেলেন, নন্দ এলেন। কী হবে তাতে? নন্দ কি ফিরিয়ে দেবেন কোম্পানীগুলো আমাদের হাতে? ছেলেমানষি উত্তেজনা! অর্থনীতির আলাপেও এখন আর তাই তিনি উত্তেজিত হলেন না।

অর্থনীতির বই পড়া না থাকলেও, ক্ষতি আর লাভ কে না বোঝে? ক্ষতি হল জমিদারের, লাভ করছেন এঞ্জিনীয়াররা—এই তো জওহরলাল করে দিয়ে গেলেন।

পিনাকী বন্ধদের আলাপের পিঠে ভাবছিল। সে-ভাবনায় ক্ষোভই থাক্ আর ব্যথাই থাক তা সে এঁদের কাছে তুলে ধরতে যাবে কেন? জজবাবু বিচারক ছিলেন, যেদিন ছিলেন

—এখন তো আর তাঁকে কোনো কমিশনে বা ট্রাইবুন্যালে ডাকা হয়নি যে তাঁর কাছে নালিশ জানাতে হবে! বীমাবাবুর অবশ্যি সম্পত্তি বেহাত হয়েছে! কিন্তু তার মতো পৈতৃক সম্পত্তি বেহাত তো নয়। লিমিটেড কোম্পানী—দশের টাকা। তিনি তো অছি মাত্র—তা থেকে মন্দ কী গুছিয়ে নিয়েছেন? তবু, ব্যথার ব্যথী শুধু তাঁকেই বলা যায়। তাই ভেবে-চিন্তে নিয়ে এক গল্প ফাঁদল পিনাকী। ঘটনা-টা বীমাবাবুর কথার লাইনেই পড়ে।—শুনুন ব্যাপার—আমরা না কি শোষক ছিলাম—ব্রিটিশের মাস্তুতো ভাই! খাজনা কী নিতাম? দু'টো চারটে পয়সা। এইতো? তার উপর ভাগীদার সরকার। পেতাম কী? লবডঙ্কা! আর এখন? প্রজার মুখে শোনা মশাই, কারোক্কারোকে পঞ্চাশ-ষাট গুণ বেশি দিতে হচ্ছে! নিচ্ছেন কে? সরকার। সে-সরকার আবার প্রজাতন্ত্রদিবস পালন করছেন!

জজবাবু অবাক হলেন। যতোটা অবিষয়ী, ধরতে গেলে বোকাই, ভেবেছিলেন তিনি পিনাকীকে, যদিও সচ্চরিত্রও ভেবেছেন, দেখা যাচ্ছে সে তেমন বোকা নয়। বললেন,—তাই না কি? খাজনা এখন বেশি দিতে হচ্ছে?"

—প্রজার এক দঙ্গল এসে মশাই একদিন বাড়ি চড়াও! আবাদের দিককার লোক। ভাবলাম, জমিতে লোনা ধরলে এখন আর আমার কী? খাজনা মকুবের মালিক তো আর আমি নই! কান্নাকাটি করছিল ওরা। বাবু, কী সুখেই না ছিলাম, এখন মরে গেলাম। ভাবলাম—তখন তো বলোনি!

কমিশনে না বস্‌লেও শশাঙ্কশেখর সরকারী কৃষিনীতির উপর রায় দিলেন : আমরা যা বুঝি—এ যদি সমাজতন্ত্রই হয়, চাষীর সঙ্গে ষ্টেটের একটা ভালো রিলেশন মেনটেন করা উচিত।

—রিলশনটা ভালো কার সঙ্গে বলুন না? সচ্চিদানন্দবাবু আস্তে বললেন কথাটা।

—যাক্—সনিঃশ্বাসে বল্‌লেন জজবাবু,—নেহরু এরা পাসেস্ ইনটু হিষ্টরি। এখন দেখা যাক, কী হয়!"

মহুয়া নয়, মলুয়া এসে ঘরে ঢুকল, যে সব সময়ই এমন সাজগোজ করে থাকে যে এক্ষুণি সে কোথাও বেরোবে। মেজেন্টা হাত-কাটা ব্লাউজের উপর ছিমছাম ফিকে হলুদ শাড়ি—স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপে রং, জবা। মুঠো-মুঠো রাঙা জবা তার পায় দেয় অবশ্যি অনেকে কিন্তু তার প্রতীকে স্যান্ডেলের এই রং নয়। মেয়েদের লাল রং খুব পছন্দ, তার জন্যেও নয়। সুপ্রিয় বলেছে,—আলতা-টালতা পরিসনে মলু, তার চাইতে লাল-স্ট্র্যাপের চপ্পল ভালো। তা-ই কারণ। অন্য দুশ্চিন্তার কথাই ওঠে না।

মলুয়া এলো খবর দিতে,—দাদু, তোমাদের চা এখানেই পাঠিয়ে দেবেন—মা জিজ্ঞেস করলেন—না টেবিলে খাবে?

টেবিলে ভাত এবং চা-খাওয়া শশাঙ্কশেখরের সাব-জজিয়তির দিন থেকে অভ্যাস। মুন্সেফ যদ্দিন ছিলেন, মাটিতেই আসন পড়ত। শুধু চা তিনি খাননা—সঙ্গে খাবার চাই —তাই টেবিল। বাইরে সরবত খেতে আপত্তি নেই। বললেন,—টেবিলে? কেন? এখানেই ছোট একটা টেবিলের ব্যবস্থা করো না—আর মাকে বল—দেববাবু এসেছেন!

এবার বোধহয় মনে পড়ল পড়ল পিনাকীর সে যে প্রসেনজিৎ দেবের পুত্র পিনাকী-রঞ্জন দেব। বাবা খাওয়ানো ছাড়া খাননি কারো বাড়িতে। মনে পড়তেই পিনাকী দু'হাত তুলে বাধা দিলে,—না-না জজবাবু আমি এই মাত্র চা-খাবার খেয়ে এলুম। দু'বার চা খেলে আমার অম্বল হয়!

—তাহলে সরবৎ! একটা-কিছু? জজবাবু অনুনয়টা আদেশে পরিবর্তিত করলেন পৌত্রীর দিকে চোখ নিয়ে।

এ-কাজে এসে খুবই অসুবিধা অনুভব করছিল মলুয়া। মুখটা বলতে গেলে দুঃখিতই দেখাচ্ছিল। চলে যেতে যেতে বললে,—বলছি সুরেনকে।

জজবাবু উপস্থিত পড়শীদের বললেন,—রিটায়ার্ড লাইফে আড্ডা ছাড়া আর কিসে শান্তি বলুন। পড়শীরা জড়ো হয়েছে—কেমন ভালো লাগছে। যন্ত্ররাজ এসে জুটলে আরো ভালো লাগত। যদিও বেপাড়ার, পদ্মনাভ হলে তো আর কথাই ছিল না!

একটু যেন যৌবন ফিরে পেলেন বীমাবাবু,—পঞ্চপাণ্ডব!

—যেখানেই যাই, দেশ পবিত্র!—হো-হো করে হেসে উঠলেন জজবাবু।

কে জানতো জজবাবুর হাসির সঙ্গে-সঙ্গেই একটি হাস্যকর মূর্তি এসে দেখা দেবে —না এঞ্জিনীয়রবাবু, না পদ্মবিভূষণ সুমিত্র উপাধ্যায়।

বয়স ত্রিশ হবে। ট্রাউজার আর বুশশার্টের এম্নি রং যে লন্ড্রি থেকে টেনে পরলেও ময়লা দেখায়। কিম্বা ওটা এই যুবকের ময়লা রঙেরই গুণে। ময়লা—ওটাই খাঁটি বিশেষণ। কালো বলবার মতো কালো নয়, অথচ ফর্সা মোটেও দেখাচ্ছে না—ময়লা। ছুঁচো মুখো জুতোয় বোঝা যায় হাল-আমলের হাওয়াও আছে ওই ময়লার সঙ্গে। নাকে কাপড়ের খুঁট অবশ্যি গুঁজলেন না কেউ—না পিনাকীরঞ্জন, না সচ্চিদানন্দ না শশাঙ্কশেখর। কিন্তু তাঁরা যে প্রত্যেকেই জুতোর সঙ্গে যুবকটির মুখের মিল খুঁজছিলেন, তা ঠিক। একটু কৌতুক যেন ধরা ছিল সবারই মুখে। তা অবশ্যি জজবাবুর হাসির ফলস্মৃতিও হতে পারে। কিন্তু যুবকটির মুখ যে ধূর্ত শেয়ালের মতো ত্রিকোণ তা হয়তো একসঙ্গে সবাই ভাবছিলেন। তার উপর সিংহের বাবরীর মতো চুল। ঘরে উপস্থিত হয়েই যুবকটির হয়তো মনে হয়েছিল, যার খোঁজে আসা সে তো নেই দেখছি—বুড়োর দল বসে আছে—তাই চুলগুলো যদি অসম্বৃত হয়ে থাকে এখুনি তাতে চিরুনী চালানো দরকার। চুলে চিরুনী চালাতে চালাতেই যুবক জিজ্ঞেস করলে,—সুপ্রিয়দা এ-বাড়িতে থাকেন তো? কিন্তু যে-গলায় এ-জিজ্ঞাসা, তা মানুষের হলেও স্বাভাবিক মানুষের নয়। স্বরটা দৈর্ঘে, উচ্চতায় বিকট। আঁৎকে ওঠবার মতো।

ভুরু কুঁচকোলেন জজবাবু,—থাকেন। কেন?

—তাঁর সঙ্গে আমার একটা পার্সোন্যাল আলাপ আছে। আবার সেই আওয়াজ।

—তাঁর সঙ্গে আমারও একটা পার্সোন্যাল রিলেশন আছে, তাই জিজ্ঞেস করছি, কেন? জজবাবু বিরক্ত হলেন।

—তা আপনার রিলেশন থেকেই জেনে নিতে পারবেন কেন, যদি ডেকে দেন তাঁকে। চিরুনীটা পকেটে ঢোকালে যুবক।

যা-একখানা গলা তারপর চিরুনীটা হাতে আক্রমণও করতে পারত! তা যখন করেনি একটু আশ্বস্ত হয়েই জজবাবু সুরেনকে ডাকলেন। যুবকটিকে ঘর থেকে বার করে দেবার জন্যে নয়, সুপ্রিয়কে ডেকে দেবার জন্যে। কিন্তু যুবকটিকে বসতে বললেন না। প্রবৃত্তিই হল না বলতে। তিনি মনে-মনে এখন সুপ্রিয়র উপরই বিরক্ত হচ্ছিলেন। বিরক্তিকর কাজ সে অনেকই করে, এই রাস্তার জঞ্জাল ঘরে টেনে আনা সে-বোঝার উপর শাকের আঁটি মাত্র। সমাজতন্ত্রের যুগ বলেও নয় আজকাল নোংরামিরই যুগ—কিছু বলাও যায় না, বললে নোংরা এসে গায়ে ছিটকে পড়বে। তাই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন, যতক্ষণ না সুরেন আসে।

চুপচাপ। জলদ-গম্ভীর বলা চলে।

সুরেন এলো চৌকো একটা বেঁটে ছোট টেবিল নিয়ে।

কালবিলম্ব না করে জজবাবু হুকুম করলেন,—ছোটদাদাবাবুকে বলে আয় তাকে কে ডাকছে!

যুবকটির সঙ্গে সম্ভ্রান্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলেন না জজবাবু, তার নামও জিজ্ঞেস করলেন না।

জজবাবুর এ-মেজাজে অভ্যস্ত নয় পিনাকী। কিন্তু মেজাজটাতে সুখী হল। অভদ্র! নেহাৎ-ই অভদ্র এসব যুবক। চেহারা ভালো হলেও সিনেমার নায়কের ঢং-এ চলবে, আর খারাপ হলে তো কথাই নেই—এই ঢং! সে-ও অস্বস্তি অনুভব করল।

বীমাবাবুর ভাবান্তর নেই। মনে হল, ভাবনান্তরে যাননি তিনি।

যুবকটি নির্ভয়ে পায়চারি করছিল। বীমাবাবু লক্ষ্য করলেন, একটা পা' যেন ছোট। শরীরে খুঁত না থাকলে অস্বাভাবিক চরিত্র হয় না—অন্তত এমন অস্বাভাবিক গলার আওয়াজ! শুনে তাঁর ঘাড়টা যেন টনটনিয়ে উঠল! ইচ্ছে হয়েছিল বলেন : বাপু, একটু আস্তে কথা বলো। আস্তে।

সুপ্রিয় এসে উঁকি দিয়ে বললে,—ও অশোক! দাঁড়াও আসছি।

—দাঁড়াবনা সুপ্রিয়দা—অশোক পায়চারি থামিয়ে বললে,—আসুন। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকরা অসুবিধেয় পড়েছেন।

সুপ্রিয় বৃদ্ধ ভদ্রলোকদের চোখের এলাকায় ছিল না। সে হাসল না জিব কাটল কেউ দেখলেন না, অশোক ছাড়া।

সুরেন এসে ট্রের জিনিসপত্তরগুলো বেঁটে টেবিলে সাজাচ্ছিল। তাই মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন জজবাবু। এ-বয়সে পুত্রের চাইতে ভোজন-পাত্রে মন দেওয়া ভালো। অন্তত গতাসু গৃহিণীকেই মনে আনা যায় তাতে। তাঁরা কতো যত্ন করে রেঁধে-বেড়ে খাওয়াতেন—সে-কথাও মনে পড়ে। দেখলেন তো তিনি মেয়েদের চার-পুরুষ! মাকে দেখেছেন, তারপর স্ত্রী, বৌমাকে দেখছেন, দেখছেন পৌত্রীদের। এরই মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান হয়ে গেল। এরই মধ্যে ছাড়া আর কী। কতে দিনের বা ব্যবধান? বয়স হয়ে গেলে যে মানুষ শৈশবকে নাগাল পায়, তা ভাবতে পারলেন না শশাঙ্কশেখর। মনে হল তাঁর, এই তো মাত্র সেদিন তিনি মার মুখে 'শঙ্কু' ডাক শুনেছেন। ডাকের রেশটা শুনছেন এখনো। এতো পিঠাপিঠি তখন আর এখন। তারপর যে এ-নামে আর কেউ ডাকেনি—সেই দীর্ঘ সময়টা মন থেকে বেমালুম মুছে গেল। সুরেনকে দেখলেন না তিনি। মনে ভাবতে পারলেন, মা খাবার সাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন।

খাবারের প্লেট দেখেই দুশ্চিন্তা হল বীমাবাবুর! ঘিয়ের লুচি তো প্রাগৈতিহাসিক কালের কথা, এই দালদার লুচি কী করে তিনি গলাধঃকরণ করবেন? যদি অম্বল হয়? পেটের গোলমাল মানে তো প্রেশার বাড়া। অথচ এক-আধটুকরো দমের আলুর সঙ্গে এক-আধটা লুচি খেতেই হবে। শুধু আমের কুচিতে দায় সারা যাবে না। জজবাবু ক্ষুণ্ন হবেন। তিনি ব্যবসায়ী মানুষ। জীবনে কাউকে ক্ষুণ্ন করতে চাননি। মিছেই না লোকে দোষারোপ করেন তাঁকে। এখন এল-আই-সির পোষ্য হয়ে তাঁর কর্মচারীরাও। ওঁরা ক্ষুণ্ন হতে পারেন, এমন-কিছু কাজ কি করেছেন তিনি জীবনে? বলতে পারবেন, বোর্ড অব ডিরেক্টার্স যে ন্যায্য পাওনা থেকে এক কড়া তিনি বেশি নিয়েছেন?

পিনাকী আত্মচিন্তা করল না। অশোক নামক ইতর ছেলেটাকে দেখছিল সে। মুড়ি-মিশ্রির এক দর হয়ে গেছে আজকাল! আরো সমাজতন্ত্র করো! বস্তির নোংরামিতে নেমে যাও সবাই মিলে!

সুপ্রিয় তার সাকরেদকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে সশব্দে ঘরে ঢুকল। চোখ তুলে তাকালেন শশাঙ্কশেখর। নর্দমার নালা পাৎলুন—তার নীচে ছুঁচোমুখো জুতো। ওই ছুঁচোতেই চেনা যায় ওরা এক সানকির ইয়ার। উপরের জামা হ্যান্ডলুমেরই হোক আর টেরেলিনেরই হোক! তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন পিতা। সুপ্রিয়কে যে পুত্র বলে না ভাবলেও চলে এ-কথা মনকে তিনি শুনিয়ে রেখেছেন। যাকে দিয়ে কোনো আশা নেই, বিষয়ী ব্যক্তি দূরে থাকুন, সাধুসন্তরাও তার দিকে মন দ্যান না।

কিন্তু যাবার সময় অশোক গাধার মতো পেছন লাথি মেরে গেল। সুপ্রিয়দাকে পাশে পেয়ে বললে,—যে বুড়ো ভদ্রলোক খুব চটে গেছেন, বাড়িরই কেউ হবে—কে ইনি?

সুপ্রিয় কথা বললে না। সাকরেদকে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

ওদের বেরিয়ে যাবার যথেষ্ট সময় দিয়ে পিনাকীই প্রথম কথা বললে,—রাস্তার পাশের কাঁচা-ড্রেন থেকে কে ওটা উঠে এলো?

বীমাবাবু বাঁধানো দাঁতে কৃপণ হাসি হাসলেন,—মার্বেল প্যালেসই করুন আর রাজ-ভবনই করুন ইঁদুর-আর্শোলা তো আসবেই!

—নিন—বীমাবাবু, আমরা কেউ বিপ্র নই তবু ভোজনে নাচগান দেখে অভ্যস্ত। সানন্দে খেতে শুরু করুন। দেববাবু, একটু-কিছু মুখে নেবেন না? এক-আধটা আমের কুচি? শুধু সরবত? জজবাবু নিমন্ত্রণ-কর্তার ভূমিকা নিলেন।

পিনাকী কিন্তু বীমাবাবুর কথা ধরেই আত্মচিন্তায় মন দিয়েছিল এবার! কী আশ্চর্য, তার গায়েও আজ একটা গান্ধীপোকা এসে বসেছিল—মাধুরী টোকা দিয়ে যা ফেলে দিল। কী বদ গন্ধ না হলে হতো গেঞ্জিটায়! ওই ছুঁচোর সঙ্গে দেখা হবার ভূমিকাই বুঝি ওই পোকাটা! জজবাবুর কথায় হকচকিয়ে উঠে বললে,—আম? না, মাপ করবেন, জজবাবু। বলছেন—সরবতটুকুই খেয়ে নিই।

পিনাকী বোধহয় ভাবছিল, আমেও যে পোকা ধরে।

[আগামী বারে সমাপ্য]

একালের বাঙালী কবিরা নানাদিক থেকেই ভাগ্যতাড়িত। আধুনিকতার আন্দোলনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাদের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন, তাছাড়া পাঠকমনে রাবীন্দ্রিকতার দুর্লংঘ সংস্কার ত ছিলই আর সেই সঙ্গে ছিল রবীন্দ্রানুকারীদের প্রতিভা-হীন প্রগাঢ় অন্ধকার। এই বিরুদ্ধতার মূর্তি তখন কী ভয়ানক করাল রূপ ধারণ করেছিল, বিশেষতঃ পাঠকমনে বিমুখতার দৃঢ়পেশী কী লৌহদৃঢ় অনমনীয়তা লাভ করেছিল এখনকার নবাগত কবি বা পাঠকদের পক্ষে তার সম্যক অনুমান প্রায় অসম্ভব। সেই যুগাবর্তনের সন্ধিক্ষণকে রবীন্দ্রানুকারীরা আরও গাঢ়তর অন্ধকারের প্রলেপে আচ্ছন্ন করেছিলেন। তারা যে যুগসম্ভাবনার সঙ্গে মনোসম্পৃক্ত হলেন না তার কারণ তাদের প্রতিভাহীনতা। কিন্তু তবু পাঠকমহলে তারা বন্দিত হয়েছেন, তাদের কবিতা বা কাব্যগ্রন্থপ্রকাশে আগ্রহী সম্পাদক বা প্রকাশকের অভাব হয় নি। অথচ আধুনিক কবিদের কবিতা প্রকাশ করাই রীতিমত সমস্যা ছিল তখন, কাব্যগ্রন্থের তো প্রশ্নই উঠত না।

এবম্বিধ সূচনার কিছুকাল পরে, আধুনিকতা যখন বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে, কবিতার ওপর রাজনীতির স্থূলহস্তাবলেপ দেখা দিল। রাজনীতি ও কাব্যসাহিত্যের অসেতুসম্ভাব্যতার ভ্রান্ত তত্ত্বে আমি বিশ্বাসী নই, কিন্তু তবু 'স্থূল' শব্দটি যে ব্যবহার করলাম তারও কারণ বর্তমান। বহু কবির ক্ষেত্রেই রাজনীতি তখন অবশ্যগ্রাহ্য নির্দেশ হয়ে এসেছিল এবং রাজনীতিবিদরা কবিতার অভিভাবক হয়ে কাব্যের দর্শন নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছিলেন। তারা ফরমান জারি করলেন—কবিতাকে তন্ময় হতে হবে, কবিকে শ্রেণীসংগ্রামের এবং শ্রমিকশ্রেণীর জয়ের কথা ঘোষণা করতে হবে, আশার বাণী শোনাতে হবে ইত্যাদি। এর অন্তরালবর্তী সমাজহিতৈষণা শ্রদ্ধেয় হলেও কবিতার ক্ষেত্রে এইসব নির্দেশ যে ভ্রান্ত এবং হাস্যকর তা কবিমাত্রই জানেন। কবিতা কি হবে বা কি হবে না তা কবিরাই স্থির করবেন, রাজনীতিবিদরা নয়। কবিতার রূপ প্রত্যেক কবির অন্তর্বেদনার চারিত্র্য থেকে নির্ণিত হয়, বাইরের নির্দেশ সেখানে অর্থহীন।

কবিতা সম্বন্ধে এসব কিছু একটা গূঢ় তত্ত্ব নয়, অত্যন্ত সাধারণ কথা। তখনকার ফরমানকার রাজনীতিবিদরা নিশ্চয়ই এই সাধারণ কথাগুলোও জানতেন না, অথচ কবিতাকে তারা 'প্রগতিশীল' করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাদের প্রচারিত কাব্যতত্ত্বে এছাড়া আরো বহু অজ্ঞতার পরিচয় ছড়িয়ে ছিল এবং সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে—এই সব তত্ত্ব তাদের নিজেদের চিন্তা বা কাব্যবোধজাত নয়, বিদেশাগত পুঁথিপত্র থেকে সংগ্রহ করা। কবিতা-বিষয়ে অজ্ঞানতাবশতঃ সে সব তত্ত্বের সত্যাসত্য বিচারও তাদের ক্ষমতার বাইরে ছিল।

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এর ফল ভয়ংকর হয়েছিল। বহু তৃতীয় শ্রেণীর কবিতা মহৎ কাব্যের জয়টিকা লাভ করেছিল, ফলে বহু কবি বিভ্রান্তি এবং অন্ধকারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এবং রাজনীতিবিদদের ফরমানকে মান্য করা কর্তব্য জ্ঞান ক'রে স্বভাববিরুদ্ধ কাব্যরচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। সুতরাং অনিবার্যভাবেই তারা ক্ষয়িত হয়েছিলেন, কিন্তু পাঠ্য কবিতা রচনা করতে পারেন নি। অতএব সে সব রচনায় দেশ বা কবিতা কেউই

বিন্দুমাত্র লাভবান হন নি।

এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সৎ সমালোচক বা আধুনিকতার টিকাকারের অভাব। আজও আধুনিকতার অর্থ, প্রকরণ, বক্তব্য ইত্যাদির ব্যাখ্যা যথেষ্ট পরিমানে রচিত হয় নি, একালের সত্যিকারের প্রতিভাবান কবিদের কাব্যও তেমন আলোচিত হয় নি। আধুনিকতা যেহেতু সর্বসত্ত্বায় নতুনত্বের দ্যুতি নিয়ে এসেছিল, বক্তব্য এবং তার প্রকাশে রবীন্দ্রসংস্কার ত্যাগ করেছিল, পাশ্চাত্যভাবনার সঙ্গে অনেক অংশে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিল অতএব পাঠকদের কাছে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যারও প্রয়োজন ছিল। দুর্ভাগ্যবশত তা হয় নি। ফলে কবিরা প্রায় অপরিচয়ের অন্ধকারেই রয়ে গেছেন, বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে আজও তাদের কবিতা পৌঁছয় নি। এবং রবীন্দ্রসংস্কারবশতঃ তাদের মানসিক প্রতিরোধ আজও তেমনিই দৃঢ়। এ অবস্থা কবি বা কবিতার পক্ষে যে অতিশয় প্রতিকূল তা বলাই বাহুল্য।

এ প্রসঙ্গে ইংরেজ কবিদের সঙ্গে তুলনা অনিবার্যভাবেই মনে আসে। সেখানে খুব সাধারণ কবিদের সম্বন্ধেও অজস্র আলোচনা প্রকাশিত হয়, ডম মোরেসের মত সাধারণ কবির কবিতাও অনালোচিত থাকে না। যারা একটু খ্যাত (যেমন ম্যাকনিস, ডেল্যুই, ডিলান টমাস ইত্যাদি) তাদের কবিতা সম্বন্ধে ত আলোচনার অন্ত নেই। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ বা বিষ্ণু দে সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত ক'টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে যদিও এঁদের প্রতিভা প্রশ্নাতীত? সমালোচকদের এই অনীহা বা ঔদাসিন্য, আলোচনার এই অতিস্বল্পতা আধুনিকতার আন্দোলনকে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তার গতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। অজস্র আলোচনা, বিচার এবং বিতর্কের প্রয়োজন যখন অতিশয় তীব্র সমালোচকরা তখন নীরব থেকেছেন, বৃহত্তর পাঠকসমাজের সঙ্গে সেতুবন্ধনের কোন চেষ্টাই করেন নি। সুতরাং আধুনিকতাকে একান্ত অবহেলার মধ্যে বেড়ে উঠতে হয়েছে। অথচ অন্তত জীবনানন্দ দাশ বা বিষ্ণু দে-র কবিতা সম্বন্ধে ইতিমধ্যে একাধিক গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিৎ ছিল। তাছাড়া অরুণ মিত্র, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি আরো অনেক কবির কবিতা সম্বন্ধে বহু এবং বিস্তৃত আলোচনাও প্রকাশিত হওয়া উচিৎ ছিল। তা হয় নি। যেটুকু হয়েছে তার অধিকাংশই পুস্তক সমালোচনা মাত্র।

উপরোক্ত কবিদের মধ্যে মণীন্দ্র রায় কবিতা লিখছেন প্রায় পঁচিশ বছর ধরে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "ত্রিশঙ্কু মদন" প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। তারপরে তাঁর আরো নয়খানি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে। অথচ পুস্তক সমালোচনা ছাড়া তাঁর কবিতা সম্বন্ধে মাত্র একটি দীর্ঘ আলোচনা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে যদিও তিনি আধুনিকতার একজন বিশিষ্ট কবি!

মণীন্দ্র রায়ের সর্বাধুনিক গ্রন্থ তাঁর সংকলিত কবিতা। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত কবিতা ছাড়া কিছু অগ্রন্থিত নতুন কবিতাও এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। সংকলনগ্রন্থের বাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্যও এতে উপস্থিত অর্থাৎ কবির মানসিকতার পরিপূর্ণ রূপটি, তার প্রতিটি স্তর, প্রতিটি ভাঁজ এই গ্রন্থে পরিস্ফুট।

মণীন্দ্র রায়ের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? শব্দসন্ধান? ভূমিলগ্ন মানসিকতা? উপমা? দীর্ঘকাল ধরে তাঁর কবিতার পাঠক হয়েও এ বিষয়ে আমি মনস্থির করতে পারিনি। মণীন্দ্র রায়ের শব্দসাধন নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট। কাব্যসংস্কারহীন, অললিত এমন কি শুষ্ক ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দের দিকেই যেন তাঁর প্রবণতা। যেন লালিত্যে তাঁর অনীহা, অরুচি। অথচ বাংলা কবিতায় লালিত্যেরই রাজত্ব চিরকাল, ধ্বনির তারল্যের দিকেই তার স্বাভাবিক

প্রবণতা। মণীন্দ্র রায় যেন ইচ্ছে করেই সে পথ পরিত্যাগ করেছেন, সব পাঠকের পক্ষে রুচিকর না হতে পারে জেনেও বেছে বেছে, হয়ত রীতিমত পরিশ্রম করেই, কঠিন ধাতব ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দ আহরণ করেছেন।

শুধু শব্দনির্বাচনেই নয়, তাঁর ছন্দনির্ণয়ে, কথন ভঙ্গিতে এবং মেজাজেও সেই কাঠিন্য। যে-কোন কবিতা খুললেই তার প্রমাণ মিলবে; যেমন (১) 'শুধু কি দেখেছ ধ্বংস পেটে-হাত পথের যাত্রায়? / হাড়ের হাঁপড়ে শুধু ওঠাপড়া মৃত্যু দেখ তুমি?' (২) 'সূর্য নেমে গিয়েছে তবু এখনো রঙ ধরেনি, সোনালী আভা লাগেনি এই কলকাতার কপোলে; / ঘরণী মহানগরী তার মোহিনী শাড়ী পরেনি,/এখনো গৃহকাজের ছাপ হলুদ লাগা আঁচলে।' (৩) 'মাঘের সকালে তাজা রোদ/কাছিমের পিঠ মেলে আধোডোবা নৌকোর গলুইয়ে/পড়ে থাকে, পৃথিবীর ইচ্ছার ভিতর।'

দু'নম্বর দৃষ্টান্তে একটি মধুর ছবি আছে—'এখনো গৃহকাজের ছাপ হলুদ লাগা আঁচলে।' কিন্তু কবি তার মাধুর্যকে লালিত্যে নিমজ্জিত হতে দেবেন না বলেই যেন কবিতার ছন্দকে গদ্যভঙ্গিতে বেঁধেছেন। তিন নম্বর দৃষ্টান্তে কাছিমের পিঠের ছবিটি কাব্যসংস্কারবর্জিত এবং গতানুগতিক অর্থে কর্কশ, শ্রীহীন—যদিও তার প্রয়োগে কবি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তার যাথার্থকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এই কাঠিন্যের সাধনা কিন্তু তাঁর কাব্যকে কন্ঠরুদ্ধ করেনি, দুনম্বর এবং তিন নম্বর দৃষ্টান্তই তার প্রমাণ। কেননা, তাঁর মূল সাধনা ত কাব্যেরই—পাথর কুঁদে পাপড়ির নমনীয় মাধুর্যকে পরিস্ফুট করার।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কাঠিন্যের প্রতি মনীন্দ্র রায়ের এই পক্ষপাত কেন? প্রথমত, হয়ত রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্তির উপায় হিসেবে এ পথ বেছে নিয়েছিলেন তিনি, দ্বিতীয়ত হয়ত তারল্যের প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ আছে তাঁর মনে, তৃতীয়ত যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা বিক্ষত পরিপার্শ্ব। তৃতীয় কারণটি কবি নিজেই বিবৃত করেছেন তার 'কর্কশ গান' কবিতায়। নিজেকে কাকের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন :

> কোথায় গান? বিলাপধ্বনি পাঠায় শূনি মনে!
> বোঝ না তুমি, নালিশে তাই হয়েছি হতবাক্!
> মধ্যদিনে শীর্ণডালে তৃষিত এই কাক!
>
> কিন্তু হায়রে জানি, এই যে বসুন্ধরা—
> চক্ষে ইহার ছানি। অন্তরে ঘৃণধরা॥
> বীর্যশুল্কা ইনি, বিক্রমে নেই উদ্ধার।
> তাই কি ভাষায় চম্‌কালো রূঢ়ভাষণের অস্ত্র?
> মধ্যদিনের করুণাহীনের বিদ্যুৎবাহী বজ্র?

কবি যে কেন 'মধ্যদিনে শীর্ণডালে তৃষিত কাক', মধুকণ্ঠ কোকিল নন, তার ব্যাখ্যা ছাড়াও উদ্ধৃত কবিতাটি তাঁর ভূমিলগ্ন, জীবনলগ্ন মানসিকতার পরিচয়পত্রও বটে। মণীন্দ্র রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয় তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং সারা পৃথিবীর ওপর তার ভয়াবহ কালো ছায়াপ্রসার দেখা দিয়েছে। তারপর এসেছে দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতার আন্দোলন, দাঙ্গা, দেশব্যাপী দারিদ্র্য। মণীন্দ্র রায়ের মন মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি কখনোই নিরুত্তাপ থাকেনি, সমবেদনায় দ্রব হয়েছে। স্বাধীনতার আন্দোলনেও

তিনি কাব্যরচনা করে নিজের সহযোগকে চিহ্নিত করেছেন। সমাজচেতনা, মানবদরদ যেন তাঁর সহজাত, তাই কখনো তাঁকে তার ভূমি থেকে বিচলিত হতে দেখি না। পৃথিবীব্যাপী সংগ্রামী মানুষের প্রতি তাঁর আস্থা অত্যন্ত গভীর, তাই তিনি নৈরাশ্যে ব্যাকুল হননি কখনো।

মণীন্দ্র রায়ের সমাজচেতনা একদিকে তীব্র আবেগে কম্পিত অন্যদিকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে প্রকাশিত। তার ব্যাপ্তি এমনই যে উদ্ধৃতিযোগে প্রমাণ করবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তবু অন্ততঃ কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না—

১। মুক্তি মুক্তি! হাওয়ার ঝরনা ঢালে অভিষেক
সুবর্ণঝারি উষার আকাশে। মুছে যায় ছল।
... ...
নামে জীবনের মাঠে কাঁধে নিয়ে রোদের লাঙল
সূর্য—কৃষির দেশে বিদ্রোহী আদিম চাষী॥—(আদিম চাষী)

২। এখনো অনেক বাকী?
... ...
এখনো অনেক
কর্তারা বক্তৃতা পড়ে পত্রিকায়, শেয়ার সামলায়;
গিন্নিরা রেডিও খুলে পরচর্চা ফাঁদে:
বাবুরা আপিসফের্তা ট্রামের জানালা থেকে দেখে
ময়দানে মিটিঙের ভিড়:
বৌয়েরা দোতলা থেকে চুলের বিনুনী হাতে নিয়ে
দেখে পথে বাস্তুহারা মায়ের মিছিল।
... ...
এখনো অনেক বাকী। তবু
এখনি এসেছে দিন।—(এখনি এখানে)

৩। তুমি বৃন্ত যেন, পাপড়ি আমি।
দীপ্ত শিখা তুমি, আমি আধার।
দুটি পক্ষ একই আকাশগামী,
দুটি পংক্তি মিলে একই পয়ার!—(ভোরের স্বপ্ন)

অথবা 'আগন্তুক' কবিতায় ন'বছর পরে ঢাকার জেল ফেরত সেই লাজুক লোকটির প্রশ্নের আর্তনাদ: 'বলল সে: কেমন চলছে/সাহিত্য, জীবন?/বললাম: কবিতা কিছু, ছোটগল্প, আর/নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রসঙ্গীত, এই—/চলছে মন্দ না।

: আর কিছু?/ আর কি খবর? : কখনো এগিয়ে যাওয়া, একটু তোলপাড়, ফিরে আসা/ পথ খোঁজা, অপেক্ষা, এবং/কবিতা কয়েকটি, কিছু ছোটগল্প, আর/নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রসঙ্গীত, এই—

: এই শুধু? আর কিছু নয়?/ন'বছর—দীর্ঘ ন'বছর?

উদ্ধৃত কবিতা ক'টি ছাড়া মণীন্দ্র রায়ের আরও বহু কবিতার প্রতি আমার অনুরাগ একান্ত গভীর। এসব কবিতার গঠনশৈলী এবং স্বাদের অনন্যতা আমাকে মুগ্ধ করে।

মণীন্দ্র রায়ের উপমা, উৎপ্রেক্ষা, দৃশ্যবর্ণনা ইত্যাদিও আশ্চর্য মনোহারি এবং বৈশিষ্ট্যময়; তার নতুনত্ব এবং যাথার্থ মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। কয়েকটি উদাহরণ দিই—

১। না, আমি হাওয়ার হাতে টিনের মোরগ যে আনন্দে
ঘুরে ঘুরে নাচে মানমন্দিরের চূড়ায়, কখনো
চাই নি তা।—(আনন্দ এবং আনন্দ)

২। ......বীজের খোলস ভাঙতে চারা কেন তবে
বাঁকায় পিঠের ধনু? নদী ছুটে যায় না সাগরে
টর্চের আলোর মত ঋজু পথে?—(ঐ)

৩। এবং পৃথিবী আজ
যদিও গ্লোবের মত ডোরাকাটা বিরোধী রেখায়,—(অন্য আকাশ)

৪। আজ দেখি যৌবনের নষ্ট সম্ভাবনা
কণিষ্কের মুণ্ডহীন পাথরের মূর্তি—
বিশাল, করুণ।—(পাখি ডাকা ভোর)

৫। দেখেছি গোলাপ লিলি চামেলি জুঁইয়ের
বিলাসী বাগান......
বারান্দার কোণে তবু সামান্য টবের
গাঁদা ও দোপাটি (যদি ফোটে!)
বিবাহিতা স্ত্রীর মতো মুহূর্তে আপন হ'য়ে ওঠে।
—(শোনো, তবে শোনো)

৬। সুখের মুহূর্তগুলি প্রায়-বোবা প্রেমিক-প্রেমিকা—(উদ্যোগের ইতিহাস)

৭। শুধু মানুষেরি মন শিশুর খেলায়
চোঙে-বাঁধা লালনীল কাঁচ—
যতোবার নড়ে, ততো ভেঙে যায় বহুবর্ণ ছকে।—(শস্যের মাটি-যে)

মণীন্দ্র রায়ের সংকলিত কবিতার শেষ কবিতা 'এবার ভ্রূমধ্যে এস'। কবিতাটির শেষ স্তবকে উচ্চারিত প্রার্থনার গম্ভীর আবেগ এবং গভীর আন্তরিকতা মনকে নিঃশেষে মগ্ন করে—

স্বপ্ন করো, মগ্ন করো, করো প্রাণ আভার বসতি;
কেন্দ্রে টানো, কামনায়, কামাগ্নির ধাতুর ঘর্ষণে।
অশ্রু ঘাম রিরংসার দাহে তুমি এস স্নিগ্ধ জ্যোতি,
এবার ভ্রূমধ্যে এস মমতার তৃতীয় নয়নে॥*

মৃগাঙ্ক রায়

* মণীন্দ্র রায়ের সংকলিত কবিতা। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য চার টাকা।

সমালোচনা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—সুশীল রায়। জিজ্ঞাসা। কলিকাতা ২৯। মূল্য দশ টাকা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে উনিশ শতকের শেষার্ধকালের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির যোগ গভীর। আঠারো বছর বয়সে তিনি 'উদ্বোধন' নামে একটি কবিতা লেখেন। সেটি পরে, ১৩১৩র পৌষের ভারতীতে ছাপা হয়েছিল। 'ন্যাশন্যাল' নবগোপাল মিত্রের উৎসাহে, ১৮৬৮তে সে-কবিতা লেখা হয়। সেবার হিন্দু-মেলায় শিবনাথ শাস্ত্রী, অক্ষয় চৌধুরী আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—এই তিনজনে তিনটি কবিতা পড়েন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'উদ্বোধন' সেই আমলের সৃষ্টি। তাতে তিনি ভারতসন্তানের সত্যিকার জাগরণ দাবি করেছিলেন।

১৮৪৯এর ৪ঠা মে তাঁর জন্ম হয়; তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন ১৯২৫এর ৪ঠা মার্চ। ঠাকুরবাড়ির খোলা হাওয়ায়, দেশ-বিদেশের সাহিত্য-সংগীত শিল্পের স্বাদ পেতে-পেতে,—দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন মনে রেখে,—আদি ব্রাহ্ম সমাজের সংগীত-বিদ্যালয়ের সম্পাদনার সঙ্গে সঙ্গে,—হিন্দু-মেলার উৎসাহী কর্মী এবং সম্পাদকদের অন্যতম হিসেবে,—কখনো বা পারিবারিক জমিদারি পরিদর্শনের অবকাশে,—কিংবা হাটখোলায় পাটের আড়ৎ চালাতে চালাতে,—কখনো 'বিদ্বজ্জনসমাগমে'র [সূচনা ১২৮১, ৬ই বৈশাখ] প্রত্যক্ষতর মনোযোগের মধ্য দিয়ে, কিংবা ভারতী পত্রিকার [সূচনা ১২৮৪, শ্রাবণ] পরিচালনায় সহায়ক হয়ে,—নাটক-নাটকরচনা, অনুবাদ ইত্যাদি সাহিত্য-প্রয়াসের পথ ধরে তিনি জীবনকে যেন পিয়োনোর মত নতুন নতুন সুর তোলবার কাজে লাগিয়েছিলেন। "জীবন-স্মৃতি"তে রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, 'সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ।' সেই একই আনন্দে হিন্দু-মেলার আমলেই মাৎসিনি-গারিবল্ডি-ক্যাভুরের কথা ভেবেছিলেন তিনি। তাঁর গুপ্ত-সভা 'হামচুপামুহাফ্' সেইসব ভাবনার ফল। রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—'জ্যোতিদাদা এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ্বেদের পুঁথি মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।'

পাটের ব্যাবসাতে, নীলের ব্যাবসাতে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছিলেন তিনি। আবার, ১৮৮৪তে বরিশালে তাঁর স্বদেশী জাহাজ 'সরোজিনী' চলেছে,—তারপর 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'স্বদেশী', 'ভারত' 'লর্ড রিপন' এই আরো চারখানি জাহাজ কিনেছেন তিনি। সেই 'স্বদেশী' ডুবেছে কলকাতার বন্দরে! জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাহাজের ব্যাবসাও ফুরিয়েছে।

এইরকম আরো কতো ঘটনা, কতো অভিমুখিতা ছিল তাঁর জীবনে। রোথেনস্টাইন তাঁর আঁকা ছবির প্রশংসা করেছেন। এক সময়ে প্ল্যাঞ্চেটে মেতেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। নানা ভাষার চর্চা করে গেছেন তিনি। তাঁর সংগীত-সাধনার প্রসিদ্ধি সর্ববিদিত। ১৯০২-৩এ তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি ছিলেন। জাহাজের ব্যাবসা চালাতে-

চালাতেই 'ফ্রেনোলজির' চর্চা করেছেন কিছুদিন। তারই কাছাকাছি সময়ে ১৮৮৪র ১৯শে এপ্রিল তাঁর সহধর্মিনী কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেছেন। তারপরেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নানামুখী উৎসাহ নেভেনি। জীবনের শেষ সতোরো বছর রাঁচীর মোরাবাদী পাহাড়ে 'শান্তিধাম' তাঁকে কী রকম শান্তি দিয়েছিল, সে-বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু গুণগ্রাহীর কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। গবেষক ডক্টর সুশীল রায়ের বইখানি গভীর আগ্রহের সঙ্গেই পড়তে হয়। তিনি তাঁর আলোচনার প্রারম্ভেই যথাকথা জানিয়েছেন—'কথায় যাকে বলে লক্ষ রকমের কাজ, তিনি তাঁর একটি জীবনে তাই করে গিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একাই একটি ইন্‌স্‌টিটিউশন।'

জীবনী ও ব্যক্তিজীবন,—সমসাময়িক সমাজ ও কাল,—পারিবারিক পরিবেশ,—জাতীয়-চেতনা,—আত্মগঠন,—নাট্যশালা স্থাপন ও নাট্যাভিনয়,—রবীন্দ্রমানস-গঠনে,—সামাজিক বিবর্তন ও তার প্রভাব,—স্বদেশচর্চা,—সাহিত্যসাধনা,—বঙ্গসাহিত্যে স্থান,—সংগীতসাধনা,—চিত্রসাধনা—এবং বিভিন্ন কর্মোদ্যম—সূচীপত্রের এই প্রসঙ্গ-তালিকা থেকেই ডক্টর রায়ের আলোচনার ধারা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। 'পরিশিষ্ট' আছে, 'উল্লেখপঞ্জী'ও আছে। এটি তাঁর গবেষণার গ্রন্থ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গবেষণার ফলে তিনি ডি-ফিল্‌ উপাধি পেয়েছেন। কিন্তু 'গবেষণা' শুনলেই অনেক ক্ষেত্রে যে নীরস তথ্যতত্ত্বের আতঙ্ক মনে দেখা দেয়, সুশীল রায়ের পরিচ্ছন্ন রীতি সেদিক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অনেক তথ্য তিনি ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর কাছে পেয়েছেন। ১৮৭০ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চান্ন বছরের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলির কালানুক্রমিক সুদীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন পরিশিষ্ট অংশে। ১৮৭২ থেকে ১৯২৪—এই সময়ের মধ্যে রচিত তাঁর যাবতীয় রচনার প্রকাশকাল এবং নামের তালিকাও দেওয়া হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত সংগীতের তালিকাও স্মরণীয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজের আঁকা কাদম্বরী দেবীর ছবির প্রতিলিপি এবং আরো কয়েকখানি ছবির জন্যে বইখানির আকর্ষণ বেড়েছে।

তথ্য পরিবেষণের কৃতিত্ব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে গেলে এ-আলোচনা অনাবশ্যকভাবে বেড়ে যাবে। সংক্ষেপে বইখানির সর্বোত্তম আবেদন হোলো আলোচনার সংযম, বিনয় আর পরিচ্ছন্নতা। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য তুলে ডক্টর রায় লিখেছেন যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'এসে-ছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে' [পৃঃ ২০৭]। এই মনের উদ্ঘাটনের জন্য আলোচকের নিজের রুচির যে শুচিতা অপরিহার্য, লেখকের সেই রুচিগত ঐশ্বর্যই পাঠকের মনে স্থায়ী ধারণার বিষয় হয়ে ওঠে। ভূমিকায় অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখেছেন—'জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে আমার কেমন tragic figure বলে মনে হয়। তাঁর মধ্যে যেন বিষাদ ছিল।' লেখক সেই বিষাদের যে-সব ইশারামাত্র তাঁর এই প্রথম সংস্করণে দিয়েছেন, সেগুলি তিনি পরে আরো পরিবর্ধিত করবেন কী না, সেটা নির্ভর করবে তাঁর সময়, আগ্রহ এবং পারিপার্শ্বিক সমাজের ওপর।

হরপ্রসাদ মিত্র

উত্তরপঞ্চাশ—সঞ্জয় ভট্টাচার্য। সম্বোধি পাবলিকেশানস্‌। কলিকাতা ৯। মূল্য পাঁচ টাকা

রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ

সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলাম। এই বিদ্রোহ আরো শক্তিশালী ও সক্রিয় হয়ে ওঠে "কল্লোল" [প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৩০ সাল (১৯২৩)] গোষ্ঠীভুক্ত কবিদের রচনায়। "কল্লোল" পত্রিকার সঙ্গে আরও দু'টি পত্রিকার নাম মনে রাখা উচিত। এ দু'টি হল, "কালি-কলম" [প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৩৩ সাল (১৯২৬)] ও "প্রগতি" [প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৩৪ সাল (১৯২৭)] "কল্লোল" প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বাঙলার নব ভাব ও চিন্তাধারার সার্থক প্রতিনিধিত্ব করলেও "কালি-কলম" ও "প্রগতি" তার এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিল এ কথা না মেনে উপায় নেই। বস্তুত "কালি-কলম" ও "প্রগতি"-গোষ্ঠীর প্রায় সকলেই "কল্লোল"দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকা তিনটির সঙ্গে "বিজলী" ও "উত্তরা"ও নবীনের বিদ্রোহকে অনেক পরিমাণে সমর্থন জানিয়েছিল। এর পরে আধুনিকতার আন্দোলন বিশেষভাবে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে পরিচয়, কবিতা, চতুরঙ্গ ও পূর্বাশাকে কেন্দ্র করে। এই দিক দিয়ে কল্লোলোত্তর যুগকে পরিচয়-কবিতা-চতুরঙ্গ-পূর্বাশার যুগ বলা যেতে পারে। এই যুগে যে নতুন কবিকুলের আবির্ভাব হল তাদের মধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য অন্যতম। ধ্যানধারণায় তিনি কল্লোল-গোষ্ঠীর নিকট আত্মীয়। "সংকলিতা", "প্রাচীন প্রাচী", "অপ্রেম ও প্রেম", "পদাবলী" প্রভৃতি গ্রন্থের কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পরিণত মানসের ফসলে পূর্ণ "উত্তর পঞ্চাশ" প্রকাশে স্বভাবতই আগ্রহ জাগে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাব্যধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যিনি পরিচিত "উত্তরপঞ্চাশ" কাব্য-গ্রন্থপাঠে তাঁর প্রথমেই মনে হবে যে, তিনি পূর্বাপেক্ষা বেশী অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছেন এবং তাঁর কাব্যচিন্তার মধ্যে গভীরতাবৃদ্ধির অনুপাতে প্রসারণশীলতা কতকাংশে হ্রাস পেয়েছে। প্রকৃতি, প্রেম, মৃত্যু প্রভৃতি কয়েকটি স্থায়ী ও মৌল বিষয়কে নিয়েই তিনি গভীরতার অনুসন্ধানী। যে ইতিহাস ও সমাজচেতনা তাঁর যৌবনকালীন অনেক কবিতাকে যুগমানসের পটভূমিকায় প্রসারিত করে দিয়েছিল বর্তমান গ্রন্থে 'বুদ্ধের স্মরণে', 'গান্ধীজীকে', 'মৌলনা আবুল কালাম আজাদ', 'জীবনানন্দের মৃত্যুরাত্রির কবিতা', 'রবীন্দ্র-জন্মদিন', 'চীন', 'ভারতের প্রতি' প্রভৃতি কবিতায় তা' অনুভব করা যায়। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনানুভূতির প্রশ্নেই কবি এখানে হার্দিকভাবে জড়িত। তাই অনিবার্য রীতিতে এই গ্রন্থের অনেক কবিতাতেই ঘুরে ফিরে একই সুরের ঝংকার বেজে উঠেছে এবং আত্মমগ্ন কবি প্রধানত কয়েকটি স্থায়ী ভাবের আশ্রয়ে কতকগুলি উৎকৃষ্ট লিরিকের ফুল ফুটিয়েছেন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতার স্থায়ী ভাব রতি বা প্রেম। তাঁর প্রকৃতিচিন্তা, মৃত্যুচেতনা ও জন্মান্তরবোধ এই প্রেমের আশ্রয়েই বিকশিত হয়েছে। কল্লোল-গোষ্ঠীর কবিদের প্রেম ছিল হুইটম্যান, লরেন্স, বোদেলিঅর প্রমুখ কবিদের সুতীব্র দেহজ প্রেমের দ্বারা প্রভাবিত। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রেম এই কবিদের প্রেমের সঙ্গী হলেও তার মধ্যে ভারতীয় আত্মিক প্রেমের ঐতিহ্য উপস্থিত। ভারতীয় ধারণায় দ্বৈতাদ্বৈতভাবেই প্রেমের পূর্ণতা। ভারতীয় প্রেমের ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তা না থাকলে লেখা যায় না,—

মনে হয় গোপীযন্ত্র আমি—
আমিই বাজাই, আমি স্নায়ুধর স্বামী।
আমিই ফোটাই ছবি আমাকেই নিয়ে
স্ত্রীশরীরে, করি তাকে বিয়ে
ঘর করি, সুখে থাকি ভারি।
গানের সুরের শুনি পদ-কলি তারি॥ (জর্নাল : গোপীযন্ত্র)

এই একই সত্তায় পুরুষ ও নারীর কল্পনা বৈষ্ণবভাবের প্রভাবসঞ্জাত।

কামনাময় যান্ত্রিক সম্পর্ক নয়, প্রকৃতি ও প্রেমের অবলম্বনেই তাঁর কবিসত্তা লালিত ও প্রস্ফুটিত। 'আজও আমি কবি' কবিতায় তাঁর দ্বিধাহীন উক্তি—

জ্যোৎস্না, তারা, মেঘ-আঁকা আমার আকাশে
ছিল স্বপ্ন গভীর নিবিড়;
হৃদয়ের স্থির
কেন্দ্রে ছিল প্রেম যা সুরভি
তাই নিয়ে আজও বাঁচি, আজও আমি কবি॥

আজ পঞ্চাশোত্তরে এসে কবি তাঁর প্রেমের অতীত স্মৃতিকে রোমন্থন করছেন। কখনো পুরনো প্রেমকে তিনি বর্তমান পরিবেশে আস্বাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। 'লেকের সন্ধ্যায়' কবিতায় তাঁর স্বীকৃতি শোনা যায়, 'একটি নদীকে পথে মরু পেয়ে মরে যেতে দেখেছি যখন/ভাবিনি তোমাকে—সেই তোমাকে আবার পাবে মন/এখানে লেকের কাছে।' কখনো তাঁর মনে হয়, 'শৈশব, কৈশোর আর বাঞ্ছিত যৌবন/এ প্রৌঢ়ত্বে পাশাপাশি আছে।' (প্রৌঢ়ের উক্তি)। কোনো সময়ে প্রেমকে আহ্বান করে তিনি বলেছেন, 'তোমার মুখও মনে আসে/ফেনায়িত রবে।' (জন্মান্তর)। প্রেমের লীলায় প্রেমিকাকে পলাতকা মনে হয়। তখন স্মৃতিতে তার রূপার্চনা প্রেমস্থিতির অন্য এক রূপ। রোগশয্যায় শুয়ে কবি বলে ওঠেন, 'অন্ধকারে তোমাকেও খুঁজি/পলাতকা মেয়ে!/তুমি কোন অন্ধ বর্ষা পেয়ে/এসেছিলে অভিসারে তার ছবিখানি/মৃত্যু-অন্ধকারে আমি স্বপ্ন ক'রে আনি॥' (জর্নাল : রোগশয্যায়)। ব্যথা ও বিষণ্নতাতেই প্রেমের প্রকৃত রূপ ফোটে। তাই কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়, 'তোমার হাসি যে ছল/তোমার বিষণ্ন মুখ তোমার আসল/আজ বুঝলাম।' (জর্নাল : শুভ্রা)। প্রেমের লীলাখেলায় কখনো কবি বৌদ্ধদর্শনের প্রভাবে পরিনির্বাণকামী, আবার কখনো জন্মান্তরের ধারণায় প্রেমিকার উদ্দেশে তাঁর ভাষণ, 'যুগে যুগে তপোভঙ্গ করেছ যে সেই ইতিহাস/বয় আজ সুরভিত আমার নিঃশ্বাস॥' (জর্নাল : কুসুমিত)। রূপচেতনা প্রাকৃতপ্রেমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই রূপারতির আকাঙ্ক্ষায় কবির মনে হয়, 'হৃদয়ের জন্ম-নিকেতনে/কতবার জন্ম নিলে তুমি—/কখনো মরুর মেঘ, কখনো মৌসুমী,...' (জর্নাল : বিচিত্রা)।

প্রকৃতির সঙ্গে কবির প্রেমবিষয়ক একাত্মতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি কামনাকে প্রকৃতির সবুজ শাড়ি পরতে বলেন। প্রকৃতির রূপৈশ্বর্যের মধ্যেই তিনি প্রেমকে প্রকৃত-ভাবে আস্বাদন করতে সক্ষম। তাই তাঁর ঘোষণা, 'পৃথিবীর পরিচয়/চিরযুবতীর মতো পেয়ে গেছি ব'লে—/ভালো লাগে এ-স্নিগ্ধাকে ভোর সন্ধ্যা হলে॥' (জর্নাল : পরিচয়) অন্ধকারে মৃত্যুর অনুভবে বিষণ্ন মনে প্রকৃতির সকাল তাঁকে জীবনের পরিচয় দেয়। প্রকৃতির সবুজকে দেখে তাঁর উক্তি, 'তোমার সবুজ ছায়া দাও/দাও কন্যা রোগ যে উধাও/চিরদিন এ-সবুজে,—জীবন-লীলায়—!' (জর্নাল : সবুজে)।

কবির মৃত্যুচিন্তা তাঁর নিসর্গভাবনার সহোদর। মৃত্যু প্রেমকে স্মৃতির মধ্যে এনে মুক্তি দেয়। তাই 'কোন মৃতার প্রতি' তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'তোমার অন্বেষা নেই, কত মুক্ত আমি!' মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি মৃত্যুঞ্জয় আত্মার মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন।

'জর্নাল' কবিতাগুচ্ছেই এই গ্রন্থের মূল সুরটি বিধৃত এবং ভাবসম্পদ ও কারুকর্মের দিক দিয়ে এই কবিতাবলীই প্রতিনিধিস্থানীয়। কবি তাঁর প্রেম ও প্রকৃতির ধারণায় জীবনানন্দ দাশের সমধর্মী। প্রাচীন সাহিত্যের 'বারমাস্যা'র পরিকল্পনাকে তিনি আধুনিক

ভঙ্গিতে কাজে লাগিয়েছেন। সমকালীন চেতনার দিক দিয়ে 'চীন' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং ইদানীং চীন সম্পর্কে যে ক'টি ভালো কবিতা লেখা হয়েছে তাদের মধ্যে এটি অন্যতম। কবিতাটি যুগের হয়েও, যুগোত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনায় উজ্জ্বল।

ফুটুক অনেক ফুল—সে কি আগুনের ফুলঝুরি!
তুমি কি শানাবে ছুরি
তোমাকে ডাকলে আমি ভাই?
হৃদয়ের কোন ইতিহাসে লেখা নাই
এই নির্মমতা, অবিশ্বাস।
তুমি কলুষিত ক'রে দিয়েছ বাতাস
বসুধা কুটুম্ব ভেবে মন
ছিল ঘুমে, তুমি তাকে জাগালে ঘৃণায়,
সে মনোবীণায়
আজ শুধু বাজে রুদ্রতাল।
আমার আকাশ নীল, তোমার আকাশ থাক লাল॥

গ্রন্থের কবিতাগুলিতে একই রূপ ও রীতি লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ কবিতাতেই সমিল যৌগিক মুক্তক ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং অন্য ছন্দের তুলনায় এই ছন্দেই তাঁর স্ফূর্তি বেশী। কাব্য ভাবনার প্রকাশে সাধারণভাবে তাঁর ভাবরূপচিত্রসৃষ্টির প্রবণতা লক্ষণীয়। এখানে কয়েকটি সুন্দর ভাবরূপচিত্র সংকলন করে দেওয়া গেল—

১। আকাশের নীল পিরামিড হতে দিনরাত্রিঝরে
জীবনের আশ্রিত প্রহরে
রূপার্চনা করেছে রচনা (প্রেম)

২। চন্দ্রচূড় নীলাকাশ মেঘ-জটা মাথার উপর। (জর্নাল : ভোর)

৩। মাছের মতন সব গাছের পাতারা
খেলা করে বাতাসের জলে। (জর্নাল : বাতাসে)

৪। আস্তে হাওয়া-চুল আঁচড়ায় তাই নারকেল পাতার চিরুনি
মিহি রোদে....(জর্নাল : রোমান্তিক)

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতার বিশেষ গুণ হল স্বতঃস্ফূর্ততা, ঋজুতা ও পরিচ্ছন্নতা। কবিতাকে অকারণে জটিল না করে তিনি তাঁর অনুভূতিকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন এবং এইখানেই তাঁর কবিচরিত্রের সাফল্য। কবির দিক দিয়ে এই কবিতাবলী স্নিগ্ধ লাবণ্য ও প্রশান্তিময় খাঁটি লিরিক।

সুশীলকুমার গুপ্ত

সূর্যবেড়িয়ার করচা—রবি সেন। মিত্রালয়। কলিকাতা ১২। মূল্য চার টাকা।

আমার ধারণা বাংলা দেশে এখনও বাস্তববাদী গল্প উপন্যাসের সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয় নি। বস্তুতঃ শক্তিশালী দার্শনিক মনন পিছনে না থাকলে আন্তরধর্মী সাহিত্য সহজেই একঘেয়ে

এবং মনোবিকারে পরিণত হতে পারে। পক্ষান্তরে বাস্তববাদের সুবিধে এই যে লেখক একটু পরিশ্রমী হলে তিনি জীবনের পাঠশালা থেকে অজস্র উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন এবং সে উপাদানের মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য রয়েছে। বাস্তবের উপাদানকে দুইভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রাকৃতবাদী নির্বস্তিকতার ছত্রছায়ায় কোন মানবগোষ্ঠীর সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে তাঁদের জীবন-যাত্রা প্রণালীর পারম্পর্য আবিষ্কার করে থাকেন। পক্ষান্তরে বাস্তববাদী নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বাস্তবের তথ্যকে সংগঠিত করেন। তিনি সংস্কারবাদী হতে পারেন, অথবা সমাজের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারেন, অথবা সমাজের ব্যাধির কারণ অনুসন্ধান করতে পারেন।

বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের প্রভাব আপাতত স্তিমিত হয়ে এসেছে। তার বদলে আঞ্চলিক সাহিত্য নামে এক জাতের সাহিত্য প্রচুর পরিমাণে লিখিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য আঞ্চলিক সাহিত্য, অর্থাৎ, কোন বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ মাবনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রার বৈশিষ্ট্যকে উপজীব্য করে রচিত সাহিত্য অনায়াসে বাস্তববাদী প্রণালী অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু দুর্বল বাঙালী লেখকরা সে পথে না গিয়ে মূলতঃ বৈচিত্র্য বিলাসের মনোভাব নিয়েই অগ্রসর হয়ে থাকেন। তাঁরা যে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাকৃতবাদী প্রণালী অনুসরণ করেন তাও নয়। তাঁরা সাধারণতঃ কোন বিশেষ মানবগোষ্ঠীর রীতিনীতি আচার ব্যবহারের কিছু কিছু কৌতুকজনক বিশেষত্বকে একটি শস্তা রোমান্স-মূলক কাহিনীর মধ্যে বিধৃত করেন। ফলে কিছু মিঠে রোমান্স সরবরাহ এবং কিছু কৌতূহল চরিতার্থ করা ছাড়া এই সব সাহিত্যের আর কোন উপযোগিতা নেই।

রবি সেন রচিত "সূর্যবেড়িয়ার করচা"কে আঞ্চলিক সাহিত্য শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করা চলে। লক্ষ্য করেছি যে তিনি প্রচলিত ধারা অনুসরণ না করে কঠিনতর বাস্তববাদের পথ গ্রহণ করেছেন। তাঁর পথ শস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের পথ নয় বলেই তাঁর প্রয়াসটি আমার কাছে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে। সূর্যবেড়িয়া সুন্দরবন অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এখানকার মানুষদের অকরুণ প্রকৃতির বিরুদ্ধে এবং আরও বেশী অকরুণ স্বার্থান্বেষী মানুষদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। তারা অসাধারণ শক্তি সাহস এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতার অধিকারী; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের চেয়ে প্রতিপক্ষের শক্তি অনেক বেশী। এই অসমান সংগ্রামের ইতিহাসকে লেখক নির্মম সত্যনিষ্ঠা ও গভীর দরদের সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। কাহিনীর নায়কের নাম দ্বারিক। সে বলিষ্ঠ, কর্মঠ, মোটেই সংগ্রামবিমুখ নয়। তার কিছু চাষের জমি আছে এবং তা ছাড়াও সে নৌকা চালায়। কিন্তু এই দ্বিবিধ উপায় সত্ত্বেও সে পরিবার প্রতিপালনে সক্ষম হয় না। সমাজের বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের তাৎপর্য তার কাছে অজানা। সে যখন সপরিবারে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল তখন কারণ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে সে নিজেকে বিভ্রান্ত বিমূঢ় অসহায় বলে বোধ করল। নতুন জীবনের সন্ধানে সে দেশান্তরী হল। এই রুক্ষ জীবন-কাহিনীর মধ্যে মরুদ্যানের মতো রয়েছে দ্বারিকের শিশু পুত্র চরনের বিস্ময়বিমুগ্ধ শিশু-জগৎ এবং কন্যা সোনামণীর গোপন পদসঞ্চারী কিশোরী প্রেম। জীবনকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখার ফলে যে জীবন-রসের সন্ধান পাওয়া যায় লেখক তার খবর রাখেন।

লেখক যেসব দৃশ্যের অবতারণা করেছেন তাতে শুধু যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয়েছে তা নয়; তাতে যথেষ্ট নাটকীয়তা-বোধেরও পরিচয় আছে। সেইজন্যই লেখকের প্রতি মন বিরূপ হয় যখন দেখি যে তিনি দৃশ্যগুলিকে প্রয়োজনানুরূপভাবে বিস্তৃত

করেন নি। পদে-পদে তিনি কলমের রাশ টেনে ধরেছেন। এই জন্যই অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসটি একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস না হয়ে আসলে একটি রেখা-চিত্রে পর্যবসিত হয়েছে।

রবি সেন সম্পর্কে দুটি কথা অবশ্যই বলতে হবে। প্রথমতঃ তিনি প্রকৃতি-প্রেমিক; তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতির বর্ণনায় অনেক সময়ই কাব্যের স্বাদ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ তিনি জীবন-রসিক; তাঁর সৃষ্ট নর-নারীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। বইখানি যে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত তা পাঠকের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

অচ্যুত গোস্বামী

The Age of Discontent. *By* Dacia Maraini. Translated *By* Frances Frenaye. Weidenfeld & Nicolson. London. 18*s*.

শরীরের আদল, পোষাক, ভাষা ও বাইরের আরও অনেক স্বাতন্ত্র্য অতিক্রম করে অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, দেশেদেশে পড়ন্ত প্রাচীর। এমন একটি ধারণা সঙ্গত কারণে প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ডাচিয়া মেরাইনির "দি এজ অব ডিস্‌কন্টেন্ট" উপন্যাসটিতে উপস্থাপিত পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় হলে এই প্রত্যয় শিথিল হয়ে যেতে পারে। চেনা মহলের সঙ্গে তাদের হৃদয়গত কোন মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। মনে হবে, এই উপন্যাসের এই সব চরিত্রের সঙ্গে অন্তত এদেশের পাঠকের সমীকরণ অথবা একাত্মতা অসম্ভব। বলা হয়, অন্তত একালের জীবনের শীর্ষবিন্দু শহরগুলিতে পুরোন মূল্যবোধ ভেঙে গেছে, নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠেনি। শহরবাসীরা জীবনের অর্থহীনতার গলিত স্রোতে ভাসছে, ডুবছে। তথাপি দু'একটি ভাসমান কুটো ধরেও অতলের অন্ধকারের মারাত্মক টান প্রতিরোধের চেষ্টা স্বাভাবিক। এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের তেমন খড়কুটোরও বালাই নেই।

এই সব চরিত্রের সঙ্গে পরিচয়ের শুরুতে মনে হতে পারে, তাদের সহনীয়তা অসাধারণ বলেই হয়ত প্রাত্যহিকতার নানা দুঃসহ অভিজ্ঞতা তাদের মনে কোন গভীর আঁচড় কাটে না। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে দেখা যাবে, জীবনের প্রতি অবিশ্বাস্য অহীহা থেকে এই সহনীয়তা উৎসারিত। তারা যেন প্রায় কৈশোর থেকেই অনেক দেখে, অনেক জেনে, অনেক সহ্য করে জীবনের প্রতি ভয়ঙ্কর উদাসীন। একমাত্র আদুড় শরীর ছাড়া এই পৃথিবীতে তাদের টানবার মত কোথাও আর কিছু নেই। তাদের চোখে যখন কিছুই কিছুই কিছুই না, তখন যেমন করে হোক দেহমনে সাময়িক উত্তাপ এনে পরস্পরের নগ্ন শরীরে মগ্ন হওয়া ছাড়া তাদের আর কোন প্রিয়সাধ নেই।

উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র সতের বছরের স্কুলের মেয়ে এনরিকা। তার বাবা অক্ষম, রুগ্না মা ডাকঘরের কেরাণী। ক্ষয়িষ্ণু বনেদি বংশের অলস, অপদার্থ, স্বার্থপর যুবক সীজরের শরীর সে ভালবাসে। নিয়মিত সীজরের বাড়িতে উপযাচিকা হয়ে নিজের আদুড় শরীর উপহার দেওয়া তার অপ্রতিরোধ্য অভ্যেস। সতের বছরেই এনরিকার জীবনে পুরুষের সংখ্যা অনেক, কিন্তু সীজর তার প্রথম পুরুষ। সুতরাং সীজরের প্রতি তার প্রচুর পক্ষ-পাতিত্ব। এনরিকা তার বয়সের অন্য মেয়েদের থেকে কিছু আলাদা নয়; তার স্কুলের অন্য

মেয়েদের প্রাত্যহিক জীবনেরও একই আদল। বইটিতে শরীর সমর্পণের ঘটনা ছাড়া আর একটিমাত্র ঘটনা আছে। ঘটনাটি এনরিকার মা'র মৃত্যুর। বইটির প্রথম পাতায় যেখানে গল্পের শুরু, শেষ পাতায় সেখানেই শেষ।

আলবার্তো মোরাভিয়ার উপন্যাস প্রাত্যহিকতার নিখাদ প্রত্যক্ষ প্রতিভাস। ডাচিয়া মেরাইনি মোরাভিয়ার রচনারীতির উত্তরাধিকারী। হয়ত সেই কারণে অথবা অন্য কোন কারণে বইটি মোরাভিয়ার কড়া সুপারিশ পেয়েছে। হয়ত লেখিকা এনরিকার জবানিতে রোমের বাসিন্দাদের জীবনের চেহারা ঠিকঠাক ধরেছেন। তাহলে অবশ্যই তিনি পাঠকের সানন্দ স্বীকৃতি দাবি করতে পারেন। কিন্তু অর্থনৈতিক ছাড়া অন্য কোন অজ্ঞাত কারণে মানুষের মনুষ্যেতর জীবের মত দিনযাপনের কাহিনী যথাযথ বলে মেনে নেওয়া কঠিন।

মিতভাষিতা ডাচিয়া মেরাইনির রচনারীতির একটি লক্ষণ। মনে হয় তিনি নিজে এবিষয়ে খুব সচেতন। সেই কারণে সম্ভবত পাঠককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্যে তিনি কয়েকটি পঙক্তি সযত্নে বারবার ব্যবহার করেছেন। দুশ' পাতার বইটিতে একটিও উল্লেখ্য উপমা নেই। তবে একটির পর একটি পাখির খাঁচার উপস্থাপনায় প্রতীকতা থাকতে পারে। অবশ্য এই প্রতীকতা স্ববিরোধিতাদুষ্ট।

একটি নাবালিকার জবানিতে উপন্যাসটি রচিত। তথাপি কোথাও এক মুহূর্তের জন্যেও আবেগের প্রতি বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় নেই। জীবনের প্রতি নিখাদ অনীহা এই আবেগ-শূন্যতার কারণ। লেখিকা বইটির পাতায় পাতায় অবলীলায় দেহবিলাসের সরাসরি বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর বাক্‌ভঙ্গীতে মোটেই ইঙ্গিতময়তা অথবা তির্যকভাষিতা নেই। ইতালীয়ান থেকে ইংরেজিতে অনূদিত এই উপন্যাসের বাঙলা অনুবাদ করলে কেমন দাঁড়াবে ভাবতে গেলে চমকে উঠতে হয়। পাতায় পাতায় দেহবিলাসের নির্ভেজাল নগ্ন বিবরণ আমাদের সংস্কারে আঘাত করবে কি না সেকথা তুলছি না। একথা বলছি কারণ উপন্যাসটির চরিত্রানুগ বঙ্গানুবাদ সাহিত্য হবে না। সেই অনুবাদকে সাহিত্যের মর্যাদা দিতে হলে ইঙ্গিতময়তা অথবা তির্যকভাষিতার আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু তা হলে উপন্যাসটির চরিত্র পুরোপুরি বদলে যাবে।

সুধাংশু ঘোষ

সুরের আগুন—গোলাম কুদ্দুস। মুকুন্দ পাবলিশার্স। কলিকাতা ৪। ৪·৭৫ পয়সা।

বাংলাসাহিত্যে জীবনীলেখার একটি প্রচলিত ধারা আছে—মাতামহপিতামহাদির নামাবলী, জন্ম-শিক্ষা-জীবিকার সনতারিখের তথ্যভার এবং ব্যক্তিবিশেষের অনুকূলে নির্জলা প্রশংসা ও স্তুতির সঙ্কীর্তনসমারোহে মাল্যভূষিত এক প্রস্তরমূর্তি পাঠকের কাছে অনড় নিষ্প্রাণতায় দেদীপ্যমান হয়—রক্তমাংসের সজীবতায় তাকে বিশ্বাসযোগ্য করতে হলে ক্রিটিসিস্‌ম অব লাইফ প্রয়োজন, আর জীবনীপাঠের ফলশ্রুতি যদি প্রেরণাসংগ্রহ হয় তবে সাধারণ সামাজিকের সমানুভব তখনই সম্ভব যখন উত্থানের গৌরবের সঙ্গে পতনের পদ-স্খলনও অকপটে পরিকীর্তিত হয় জীবনীগ্রন্থে। এ দেশের আদিতম জীবনীসাহিত্য "রামায়ণে" বাল্মীকি রামগুণগান গাইবার জন্য লবকুশকে সুশিক্ষিত করলেও নিজে

রঘুপতির চরিত্রচিত্রনে বিধাতার মতই অপক্ষপাত।

এ যুগে অবশ্য জীবনীরচনার দায়িত্ব সাহিত্যিকের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে সাংবাদিকের কাছে ফেলে দেওয়া যায় ফিক্‌সানের স্পর্শদোষ বাঁচাবার জন্য, কিন্তু তাতে তথ্য কদাচিৎ সত্য হবার সম্ভাব্য পরিণাম লাভ করে। বরং তার চেয়ে নিজের কথা নিজে বলা অনেক ভাল অথবা নিজের কথা কোন সাহিত্যিকের জবানীতে। মামলা-জয়ে সত্যসাক্ষ্যই তো পর্যাপ্ত নয়, উকিলেরও অত্যাবশ্যক ভূমিকা আছে।

আলোচ্য জীবনীটি প্রকৃত প্রস্তাবে লেখকের জবানীতে মুন্সী মহম্মদ কাসেম ওরফে সুখ্যাত গায়ক কে. মল্লিকের আত্মকাহিনী। অধুনা গায়কের যশোরশ্মি নিষ্প্রভ হলেও মহম্মদ কাসেম অদ্যাপি আমাদের মধ্যে সশরীরে বর্তমান! প্রস্তাবনায় লেখক বলেছেন, 'যে মানুষ জ্যান্ত সে নিজের কথা নিজেই বলতে পারে। যার নামধাম বাড়ীঘর সবই স্পষ্ট তার কাহিনীতে পাখা মেলবার আকাশ সীমাবদ্ধ, সেখানে রঙের সঙ্গে রঙ ঘটনার সঙ্গে ঘটনার গোপনতার সঙ্গে প্রকাশ্যের অবাধ বিস্তারে সুযোগ সামান্য। সেখানে পান থেকে চূণ খসলেও বিপদ।'

কিন্তু এই বিপদের চেয়েও আশঙ্কার কথা হচ্ছে বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অত্যুৎসাহী এক শ্রেণীর পাঠককে প্রশ্রয়দান কিম্বা পার্শ্বচরিত্রগুলি সম্পর্কে মানহানির মামলা এড়াবার সতর্কতায় সাবধানী লেখনীর 'ধরি মাছ না ছুঁই পাণি' করে জীবনচর্যার কৃত্য সমাপন করা। "সুরের আগুনে"র লেখক এ বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ। আলোচ্য জীবনীতে সমাজে সবিশেষ পরিচিত মহিলা বা পুরুষ চরিত্রগুলিকে তিনি এক অনায়াস ভঙ্গীতে, অনাহত সারল্যে প্রকট করেছেন--'বোঝা গেল সবই। একজন পণ্যা রমণী আর একজন অটলের রক্ষিতা। সে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল,—মেয়েটির কি নাম?

—কমলা।

—বেশ নাম। তা কমলাকে আনবেন আমার কাছে, দেখব।

ঝরিয়ার এই কমলা বা ভবিষ্যতের কমলা ঝরিয়াকে পরদিন অটল নিয়ে এল মল্লিকের কাছে।'

কিম্বা,

'এদের মধ্যে ছিল গোরাচাঁদের কাকা আশু মল্লিক, নরেন লাহার কাকা কৃষ্ণচন্দ্র লাহা, বগুড়ার নবাব আব্দুস সোবহান চৌধুরী, আর্টার্নি আশু ধর, মহুরী চুন্নুলাল এবং আরো কেউ কেউ। বাগান পার্টী এক একদিনের খরচ বহন করত এক একজন।

সেখানে বাঈজীদের মধ্যে যেত মালকা আর গহরজান। আর যেত আশু মল্লিকের রক্ষিতা সারা ইহুদী। ভাড়াটে খ্যামটাওয়ালী থাকতো চারজন।'

লক্ষণীয় এই যে, কুৎসাগায়কের সুরে এ সব কথা বলা হয় নি। যে গুরুত্ব দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের সঙ্গে গায়ক-মল্লিকের আলোচনার খুটিনাটি বিবৃত হয়েছে সেই একই তাগিদে এসব চরিত্রের প্রসঙ্গ উপস্থাপনা।

কিন্তু তবু বলবো "সুরের আগুন" আপন সুরের গন্ধে কস্তুরী মৃগের উন্মাদ-বিচরণের কাহিনী নয় বরং কাসেমের দুর্মর ধনাগমতৃষ্ণায় কাহিনীর প্রায় প্রতিটি অধ্যায় আর্ত। র‍্যালি ব্রাদার্সের স্থায়ী চাকরীর সঙ্গে রেকর্ডের আয়, বাগানবাড়ীর বায়না ও অন্যান্য জলসা বা থিয়েটারের দক্ষিণা মিলে যে অঙ্ক দাঁড়ায় তা একজন সাধারণ গৃহস্থকে আর্থিক স্বস্তি দেবার পক্ষে সে যুগে যথেষ্ট বলেই মনে হয়। অমিতব্যয়ীর নিঃস্বতা

নিশ্চয়ই শোষিত সর্বহারাকে স্মরণ করাবে না যতই না রেকর্ড কোম্পানী বিদেশী পুঁজিপতি হউক। ভাবী শিল্পীর ভবিষ্যৎ উচ্চাশার বর্ণনায় যখন পড়ি, 'বড়-বড় যাচনাদারদের মাসে আয় হয় চার পাঁচশ টাকা! সন্ধ্যায় তারা বেরোয় কোচানো ধুতি পাঞ্জাবী আর বেলফুলের মালা গলায় দিয়ে। বিশেষ বিশেষ পাড়ায় তাদের সমাদর। মানু (মহম্মদ কাসেম) দেখে আর ভাবে। কত বছরের অভিজ্ঞতায় বড় যাচনদার হওয়া যায়!'—তখন গায়কের পরিণাম চিন্তা করে উৎসাহী হতে বাধে।

লেখক কিন্তু সব ক্ষেত্রে কাসেমের জীবনের শুধু ভাষ্যকার নন, অনেকক্ষেত্রেই তীব্র সমালোচকও। একটু অনুধাবন করলে অবশ্য বোঝা যাবে ব্যক্তি-কাসেম সেখানে উপলক্ষ্যমাত্র, সমাজের কোন কোন গোষ্ঠিকে আঘাত করাই তার লক্ষ্য। অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসপ্রবণতাকে শ্লেষ করা নিশ্চয়ই কাসেমকে বিদ্ধ করার জন্য নয়।

জীবনীকার এই গ্রন্থে তার নিজস্ব কাব্যপ্রবণতাকে সচেতনভাবে সংযত করেছেন। তবু উপমার তির্যক চাতুর্য বা অনুপ্রাসের গীতময় সৌন্দর্য সর্বতোভাবে লুকোনো সম্ভব হয় নি। 'বড়ালের আধখানা চাঁদকে ষোলোকলায় পূর্ণ করে বাজারে লাভের জ্যোছনার ধারা বইয়ে দিতে পারে' অথবা 'ত্রিবেণী সঙ্গম! মাঠের ধান, কণ্ঠের গান, আফিমের দোকান'।

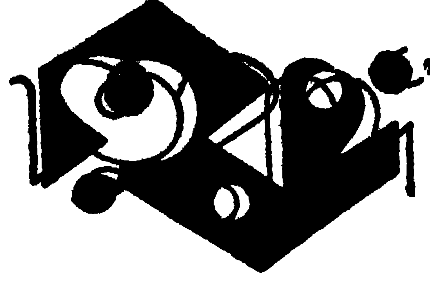
বাড়ী থেকে পালিয়ে মানু (কাসেম) চলেছে নির্দিষ্ট স্থানে—'মানু দুরু দুরু বুকে ত্রিবেণীতে নামল। মরগাতে পৌঁছাতে বিলম্ব হলো না। হাওড়ায় পৌঁছে ভয়ে ভয়ে কাঠের পুলও পার হল, তারপর হ্যারিসন রোড ধরে চলতে চলতে কখন যে সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে নিজেও টের পায় নি। শুধু তার চোখে পড়ল, রাস্তার উপর একটা বেঞ্চীতে বসে মুন্সেফ আলী তামাক খাচ্ছে।' (পৃ: ১২)

চলমানতার দ্রুতি ও গন্তব্যে পৌঁছানোর যতি অনুযায়ী বাক্যের স্থিতিস্থাপকতা লক্ষণীয়—কিম্বা ভাষার চিত্রল শব্দবর্ণময়তা, 'গান শেষ হতে না হতেই কোথা থেকে আকাশ জুড়ে ঘনিয়ে এল কালো মেঘের দল। বড় বড় ফোঁটা পড়তে সুরু হ'ল, আসরের অন্ধকারে মানুষ লাফিয়ে উঠল আনন্দে। ততক্ষণে মুষলধারে পড়ছে বৃষ্টি! আর সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বইছে হুহু করে। এমন জোরে হাওয়া দিচ্ছে আর বৃষ্টি হচ্ছে যে কার সাধ্য এখন অন্য কিছু ভাবে। হাজার হাজার লোক ভিজছে, হল্লা করছে আর যে যার বাড়ীর দিকে ছুটছে। কিছুক্ষণের মধ্যে পথঘাট গেল ডুবে, পুকুরগুলো গেল ভেসে, খড়ের বহু চালা গেল উড়ে।'

নেশাসক্তির ব্যাখ্যায় সহৃদয় লেখক যখন দার্শনিক ঔদার্যে বলতে থাকেন, 'অর্থ আর ক্ষমতা যাদের ভাগ্যে জুটল না তারা বেশীর ভাগ দুশ্চিন্তাকে ঢেকে ফেলতে হয় ছুটেছে ঈশ্বরের দিকে, নয় ছুটেছে বিদ্রোহের খোঁজে কিম্বা নেশার সন্ধানে। এ তিনের এবং দুইয়ের বিচিত্র মিশ্রণের লীলারই কি অন্ত আছে!'—তখন বিচিত্রগামী বিভিন্ন জীবন-প্রবাহেরও যেন সন্তোষজনক ধারা নির্দেশের হদিশ মেলে।

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

ত্রৈমাসিক পত্রিকা



শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭১

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

১৮৬৭

খৃষ্টাব্দ

হইতে

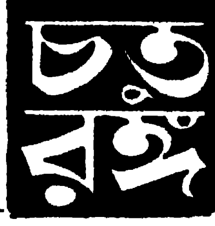
ভারতের সেবায়

নিয়োজিত

বামার লরী

কলিকাতা · বোম্বাই · নিউ দিল্লী · আসানসোল

ষড়বিংশতিতম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা



শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭১

ভারতবর্ষে বিজ্ঞান

হুমায়ুন কবির

গত বিশ পঁচিশ বৎসরে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধে জনসাধারণের মনোভাবের এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। বিজ্ঞানের কদর আগেও ছিল, কিন্তু আজ বুদ্ধিজীবিদের বিজ্ঞানের প্রতি যে ভক্তি, বা সরকার আজ যেভাবে বিজ্ঞানের প্রসারে সক্রিয় সহায়তা করছে, ত্রিশ বৎসর আগেও তা কেউ ভাবতে পারত না। দৃষ্টিভঙ্গীর এ পরিবর্তনের বহু কারণ রয়েছে, তার মধ্যে দুয়েকটির উল্লেখ করলেই চলবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে শিল্প উদ্যোগের যে বিপুল উন্নতি, তা সাধারণ মানুষকেও বিস্মিত করে। আণবিক শক্তির বিকাশে মানুষের চিরাচরিত জীবনধারার বিপ্লবকারী পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে মহাকাশে মানুষের বিজয় অভিযানের যে সম্ভাবনা আজ সম্ভব হতে চলেছে তার ফলে সমস্ত পৃথিবীতে বিজ্ঞান নতুন মর্যাদালাভ করেছে।

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই তাই আজ বিজ্ঞানশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিরাট প্রসার, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় প্রত্যেক দেশেই সমালোচনা শোনা যায় যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য যা করা প্রয়োজন, রাষ্ট্র তা পুরোপুরি করছে না। এ সম্বন্ধে প্রধানত দুটি অভিযোগ শোনা যায়। প্রত্যেক বৎসর বিজ্ঞানের ছাত্র সংখ্যা বেড়ে চলেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নতুন শিক্ষায়তন ও গবেষণাগার স্থাপিত হচ্ছে, শিল্প উদ্যোগে বৈজ্ঞানিকের চাহিদা বেড়ে চলেছে, ফলে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজন মত বৈজ্ঞানিক পাওয়া কঠিন। বৈজ্ঞানিকের সংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও যেমন একদিকে বৈজ্ঞানিকের অভাব, ঠিক তেমনি অন্যদিকে বিজ্ঞানের জন্য, অর্থব্যবস্থা বহুগুণ বাড়া সত্ত্বেও প্রায় সব দেশেই প্রয়োজনীয় অর্থের অনটন। আমাদের দেশ গরীব, কাজেই এখানে অর্থের অভাব অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার খরচ দিন দিন এত বেড়ে চলেছে, যন্ত্রপাতির সংখ্যা ও গুরুত্ব এত বেশী হয়ে উঠেছে যে ইংলন্ড অথবা জার্মানীর মতন সমৃদ্ধ দেশেও এ অভিযোগ সরব হয়ে উঠেছে। আণবিক গবেষণায় আজ বহুক্ষেত্রে এমন যন্ত্রের প্রয়োজন যে একটি যন্ত্র তৈরী করতে দশ কোটি টাকা লাগে।

প্রয়োজনের তুলনায় বৈজ্ঞানিকের সংখ্যাও সব দেশেই কম, তার ফলে সমস্ত দেশেই

নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমেরিকা ছাড়া অন্যান্য সব দেশেরই সম্মুখে এ সমস্যা এবং সে সমস্যা আরো বেশী জটিল হয়ে উঠেছে এইজন্য যে প্রায় সমস্ত দেশ থেকেই প্রতিভাশালী তরুণ বৈজ্ঞানিক আমেরিকায় যেতে চায়। আমেরিকা অভিমুখী এ অভিযানের প্রধান কারণ স্পষ্ট। আমেরিকায় যন্ত্রপাতি এবং গবেষণার অন্যান্য সুযোগ যে পরিমাণে মেলে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তার তুলনা নেই। সোভিয়েট রাষ্ট্রেও বিজ্ঞানের প্রগতির জন্য বিরাট চেষ্টার পরিচয় মেলে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমেরিকায় যন্ত্রপাতি এবং মালমশলা যত সহজে মেলে, সোভিয়েট রাষ্ট্রে তা মেলে না। তা সত্ত্বেও সোভিয়েট রাষ্ট্র থেকে বৈজ্ঞানিক যে সাধারণত আমেরিকা যায় না তার প্রধান কারণ যে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক সরকারী মঞ্জুরী ভিন্ন দেশের বাইরে যেতে পারে না।

১৯৬৩ সালে যখন ইয়োরোপ গিয়েছিলাম, বহুদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আমেরিকা যে এত মেধাবী তরুণ বৈজ্ঞানিককে টেনে নিচ্ছে, তার জন্য প্রায় সর্বত্রই উদ্বেগ লক্ষ্য করেছি। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাইজেনবের্গ আমাকে যা বলেছিলেন, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হাইজেনবের্গ বললেন যে, আমেরিকায় বৈজ্ঞানিকদের আর্থিক অবস্থা ইয়োরোপের তুলনায় অনেক ভাল একথা সত্য কিন্তু কেবলমাত্র টাকার আকর্ষণে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক দেশত্যাগ করে না। তাঁর মতে আমেরিকার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল এই যে সেখানে মেধাবী বৈজ্ঞানিকদের দলবদ্ধভাবে কাজ করবার সুযোগ অনেক বেশী বলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকের গবেষণা সার্থক হবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের যে পরিস্থিতি, তাতে একক ভাবে কোন বড় আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব। বিরাট প্রতিভা-শালী ব্যক্তি আজো হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে বিস্ময়কর আবিষ্কার করতে পারেন, কিন্তু প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষেও আজ একক চেষ্টায় কোন বিপ্লবকারী সিদ্ধান্তে পৌঁছনো কঠিন। যতবড় প্রতিভাই হোন না কেন, বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিষয়ে যে গবেষণা হচ্ছে, তার খোঁজ রাখতে না পারলে নতুন কিছু বলা সম্ভব নয়, এবং কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে এতবড় বিরাটক্ষেত্রে সমস্ত খবর রাখা প্রায় অসম্ভব। আমেরিকায় বহু মেধাবী বৈজ্ঞানিক আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করছেন বলে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা না হয়েও সেখানে কৃতী বৈজ্ঞানিক আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন। প্রধানত এই কারণেই আজ ইয়োরোপের বহু দেশ থেকে বৈজ্ঞানিক আমেরিকা যাচ্ছে।

হাইজেনবের্গ বললেন যে, আমেরিকার দিকে এ ধরনের একতরফা অভিযান বন্ধ করতে হলে দেশের মধ্যেই বৈজ্ঞানিকদের গোষ্ঠি গড়ে তুলতে হবে। পরস্পরের সহযোগিতায় আমেরিকায় যে ধরনের যুক্ত প্রচেষ্টা সম্ভব, দেশের মধ্যেই যদি সে ধরনের গবেষণার সুযোগ মেলে, তবে অনেক তরুণ বৈজ্ঞানিক দেশেই কাজ করতে চাইবেন। তার জন্য রাষ্ট্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন। তার চেয়েও বেশী দরকার বৈজ্ঞানিকদের পারস্পরিক সাহায্য, বিশেষ করে প্রবীণ ও তরুণ গবেষকদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি। হাইজেনবের্গ আরো বললেন যে, তরুণ বৈজ্ঞানিকদের যদি বছরে দু-বছরে বাইরে যাবার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, তবে দেশ ছেড়ে চলে যাবার কারণ অনেকটা দূর হবে। তিনি নিজে জার্মানীতে এ ধরনের বৈজ্ঞানিকগোষ্ঠী গড়ে তুলছেন। পরস্পরের সহ-যোগিতায় তরুণ বৈজ্ঞানিক সার্থক গবেষণার সম্ভাবনা দেখে এসব গোষ্ঠির দিকে এগিয়ে

আসছে। যাদের কাজে প্রতিশ্রুতি বেশী, তারা প্রতি বৎসর আমেরিকা, বৃটেন অথবা অন্য দেশে যাওয়ার সুযোগ পায়, অন্যেরাও প্রতি দু-তিন বছরে এভাবে বাইরে যেতে পারে। ফলে দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফলে বহু তরুণ বৈজ্ঞানিক আজ স্বেচ্ছায় এবং আনন্দে জার্মানীতেই থাকতে প্রস্তুত।

ইংলন্ডেও বৈজ্ঞানিকদের দেশত্যাগের সমস্যা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। গত দশ বৎসরে যাঁরা বিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় শতকরা দশজন দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। দুয়েক বছরের জন্য যারা বিদেশ যায়, তাদের সংখ্যা নিলে এ ধরনের দেশত্যাগীর সংখ্যা প্রায় শতকরা পঁচিশজন হবে। ভারতবর্ষে এ সমস্যা এখনো তত গুরুতর হয়ে উঠেনি, কিন্তু এ সম্বন্ধে ইংলন্ড যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করছে, সেগুলি এ দেশেও প্রযোজ্য। বিলেতে শিক্ষকের বেতন ও কার্যধারার উন্নতির উপর সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারারদের বেতন এখন পনেরো শো থেকে দু-হাজার পাউন্ড, রীডারদের বেতন আড়াই হাজার পাউন্ড এবং প্রফেসরদের বেতন তিন হাজার থেকে চার হাজার পাউন্ড। বিভিন্ন লেবরেটরিতেও এই অনুপাতে বেতনের ব্যবস্থা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের তুলনায় বৈজ্ঞানিকদের কাজের সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতা অনেকটা বেড়েছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু এখনো ইংরেজ বৈজ্ঞানিক আমেরিকা যেতে উদগ্রীব। রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট স্যার হাওয়ার্ড ফ্লোরী আমাকে বললেন যে, আমেরিকায় বেতন এখনো ইংলন্ডের তুলনায় বেশী, কিন্তু তার চেয়েও বড় আকর্ষণ যে সেখানে ছোটবড় সমস্ত বৈজ্ঞানিকের সুযোগ-সুবিধা স্বাধীনতা আরো অনেক বেশী। তরুণ বৈজ্ঞানিকদের যদি আরো বেশী উৎসাহ এবং গবেষণার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে বেতনের পার্থক্য সত্ত্বেও বহু ইংরেজ দেশে থাকবে, এ বিষয়ে তাঁকে নিঃসন্দেহ দেখলাম।

একেবারে কেউ বিদেশে যাবে না, এরকম দাবী কোথাও শুনিনি। ইয়োরোপের সকল দেশেই আজ একথা স্বীকৃত যে প্রত্যেক দেশের দু-দশজন মেধাবী বৈজ্ঞানিক বিদেশে গিয়ে কাজ করবেন। বর্তমান পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ভিন্ন বিজ্ঞানের প্রগতি হতে পারে না এবং সেই সহযোগিতার নিদর্শন হিসাবে প্রত্যেক দেশেই কিছু বিদেশী বৈজ্ঞানিকের অবস্থান বাঞ্ছনীয়। আজ যে এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে তার প্রধান কারণ এই যে সব দেশ থেকেই আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক চলেছে কিন্ত আমেরিকা থেকে অন্য দেশে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক যাচ্ছে, তার নমুনা মেলে না বললেই চলে। তাছাড়া দু-দশজন বৈজ্ঞানিক গেলে আপত্তি হত না, কিন্ত যদি দেশের বৈজ্ঞানিকদের একটা বিরাট অংশ দেশত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকে, তবে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবেই।

এ সম্বন্ধে আর একটি কথাও বলা প্রয়োজন। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বা লেবরেটরিতে সক্রিয়ভাবে বিজ্ঞানের চর্চা হয়, প্রবীণ ও নবীন বৈজ্ঞানিকেরা স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে গবেষণার আবহাওয়া সৃষ্টি করেন, সেখান থেকে কেউ অন্যত্র যেতে চান না। ভারতবর্ষেও এমন লেবরেটরি আছে যেখানে বৈজ্ঞানিক কাজ করে আনন্দ পান বলে অনেক বেশী বেতনের টানেও স্থানচ্যুত হতে চান না। তার জন্য অবশ্য উপযুক্ত নেতৃত্বের প্রয়োজন। যেখানে সে নেতৃত্ব মেলে, সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। যেখানে সে ধরনের নেতৃত্ব নেই, বহু বেশী বেতন দিয়েও সেখানে বৈজ্ঞানিককে বেশী দিন আটকে রাখা যায় না।

স্বাধীন আবহাওয়া যে বিজ্ঞানের অপরিহার্য অঙ্গ একথা সবাই মানে, তবু এদেশে

সেকথা বারবার বলা প্রয়োজন। আমাদের দেশ বহুদিন থেকে কর্তাভজা দেশ। পদমর্যাদা, বংশগৌরব, বয়সকে আমরা যে পরিমাণ গুরুত্ব দেই, ইয়োরোপের অনেক দেশেই তার নজীর মেলে না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যে তাই সময় সময় পদমর্যাদা বা বয়স ভারতবর্ষে বেশী গুরুত্ব লাভ করবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বয়স বা পদমর্যাদাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু বয়স বা পদমর্যাদাই যদি কৃতিত্বের একমাত্র মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়, তখন বিজ্ঞানের সমূহ সঙ্কট।

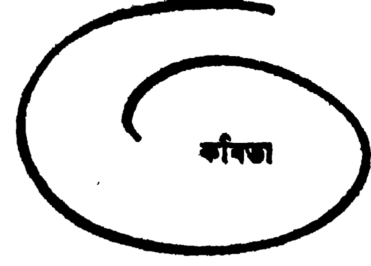
ভারতবর্ষে গত দশ-বারো বৎসরে বৈজ্ঞানিকদের বেতন ইত্যাদি অনেকটা বেড়েছে। পশ্চিমী দেশের সঙ্গে তুলনা করার দিন এখনো আসেনি, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য কর্ম-ক্ষেত্রে কর্মীদের যে বেতন মেলে, তা মনে রাখলে বিজ্ঞানকে আজ আর অবহেলিত ক্ষেত্র বলা চলে না। পাঁচ-ছয় বৎসর হল যে সায়েন্টিস্টস পুলের পত্তন হয়েছে, তার ফলে যে কোন মেধাবী বৈজ্ঞানিক কায়েমী চাকুরী না থাকলেও গবেষণার মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং লেবরেটরিগুলিতেও অনেক নতুন নতুন সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও আজো বহু তরুণ বৈজ্ঞানিক মনোমত কর্মক্ষেত্র পান না বলে দেশে বিজ্ঞানের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে।

পূর্বেই বলেছি যে বৈজ্ঞানিকদের গোষ্ঠি স্থাপন করেছে বলেই আমেরিকায় এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রে গত বিশ-ত্রিশ বৎসর বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি দেখা যায়। ভারতবর্ষেও সে ধরনের গোষ্ঠি তৈরী আজ অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রবীণ বৈজ্ঞানিককে তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে কিন্তু সেই সঙ্গে যদি তরুণ বৈজ্ঞানিকদের উপযুক্ত বিকাশের সুযোগ না দেওয়া হয়, তবে তার পরিণাম শুভ হতে পারে না। এ ব্যাপারে প্রবীণ বৈজ্ঞানিকদেরই এগিয়ে আসতে হবে। তাঁরা যদি অগ্রণী হয়ে নিজেদের তরুণ সহকর্মীদের কাজে সহ-যোগিতা করেন, সব বিষয়ে তাঁদের উৎসাহ দেন, তবে প্রবীণ ও তরুণ বৈজ্ঞানিকের সম্মিলিত চেষ্টায় নতুন আবহাওয়া গড়ে উঠবে। ছাত্রের কৃতিত্বে গুরুরই কৃতিত্ব একথা যদি শিক্ষকেরা সব সময়ে মনে রাখেন, তরুণ সহকর্মীর যে সম্মান প্রাপ্য, অকুণ্ঠভাবে সে সম্মান তাকে দেন, তবে তরুণ সহকর্মীরাও প্রবীণ বৈজ্ঞানিকদের নেতৃত্ব সাদরে স্বীকার করে নেবে। আজকাল বহুস্থানে প্রবীণ ও তরুণের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কোন কোন ক্ষেত্রে যে পারস্পরিক ঈর্ষা, তা দূর হয়ে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার সত্যিকার ক্ষেত্র গড়ে উঠবে।

বৈজ্ঞানিকদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ভিন্ন বিজ্ঞানের প্রগতি সম্ভব নয়, কিন্তু শিল্প উদ্যোগের সঙ্গেও যদি বৈজ্ঞানিকের যোগ না থাকে, তবে অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি ব্যাহত হয়। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অথবা ন্যাশনাল লেবরেটরির বৈজ্ঞানিক সাধারণত সাক্ষাৎভাবে শিল্পউদ্যোগের সঙ্গে যোগ রাখেন না, এমন অনেক বিধিনিষেধ আছে যার ফলে যোগ রাখা সম্ভব নয়। ফলে কিন্তু একদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা লেবরেটরির, অন্যদিকে শিল্পউদ্যোগের সমূহ ক্ষতি হয়। শিল্পউদ্যোগের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান করতে হলে বৈজ্ঞানিককে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচয় রাখতে হবে, কেবলমাত্র তত্ত্ব নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। তার ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনেক বেশী বাস্তব ও কার্যকরী হয়ে উঠবে। অন্যপক্ষে শিল্পউদ্যোগের লাভ হবে দুভাবে। দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা যদি শিল্পের সমস্যা নিয়ে ভাবেন, তবে সমাধান খুঁজে পাওয়া বহুক্ষেত্রে সহজ হবে। তাছাড়া, যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিদিনের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত, তাঁরা সব সময়ে নিরাসক্ত ভাবে প্রশ্নের বিচার করতে পারেন না। ফলে অনেক সমস্যার সমাধান সহজে মেলে না।

পায়ের তলার জমির উপর নজর আবন্ধ থাকলে পথভ্রান্তির সম্ভাবনা বেশী, তাই ব্যবসা-বাণিজ্যেই যাঁদের দৃষ্টি সীমাবন্ধ, তাঁরা বহুক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত বিচার করতে অপারগ। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বলা চলে। যাঁদের উপদেশ নিয়ে ব্যবসায়ী লাভ করতে পারবেন, শিল্পউদ্যোগে তাঁদেরই ডাক পড়বে বেশী। ফলে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের ব্যবহারিক কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিচার করা অনেক সহজ হবে।

বৈজ্ঞানিকদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং শিল্পউদ্যোগের সঙ্গে তাঁদের সক্রিয় যোগাযোগ প্রয়োজন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সবচেয়ে জরুরী হল আদর্শবাদী সত্যসন্ধানী নেতৃত্ব। বস্তুতপক্ষে, বৈজ্ঞানিকের একনিষ্ঠ সাধনাই বিজ্ঞানের প্রগতির মূল। সহকর্মীদের সাহায্য ও সহযোগ তাঁর কাজকে সহজ করে দেয়, কিন্তু তাঁর নিজের মনে যদি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং সত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ না থাকে, তবে ফল কখনোই আশানুযায়ী হয় না। আজকাল সব দেশেই বিজ্ঞানের আনুসঙ্গিক আড়ম্বর বেড়েছে, কিন্তু সে তুলনায় বৈজ্ঞানিক সার্থকতা বেড়েছে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন করা চলে। এক বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন যে, সোনার খাঁচায় পাখী গান গায় না, বিজ্ঞানের লেবরেটরির অট্টালিকা যত বড় হয়, সেই অনুপাতে বৈজ্ঞানিকের আদর্শবাদ কমবার সম্ভাবনাও বাড়ে। কথাটি পুরোপুরি সত্য নয়, আজো প্রতি দেশে বহু আদর্শবাদী বৈজ্ঞানিক সত্য সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করেছেন। ভারতবর্ষেও এমন মনীষীদের কথা আমরা জানি যাঁরা বিজ্ঞানকেই জীবনের সাধনা বলে গ্রহণ করেছেন। দেশের তরুণ বৈজ্ঞানিক যদি তাঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একনিষ্ঠ মনে বিজ্ঞানের সেবা করে, তবে এদেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।



ভারসাম্যে

অরুণ মিত্র

মানুষ ও শস্যের লক্ষণে
আমি আর বিচলিত নই,
আমার ভিত আমি শক্ত ক'রেই গেড়ে ফেলেছি।
যখন মাটিতে তুফান দেখা দেয়
এবং যে যেখানে আছে মুখ থুবড়ে পড়ে
যখন খামার আর গোলা তুলোধোনা হয়
এবং কারো মাথা গোঁজার একটা কোণও আর থাকে না,
আমার তা স্বাভাবিক লাগে,
আমার দৃষ্টিতে এমন স্থিরতা এসেছে;
আমি মনে মনে
ওঠাপড়ার ভারসাম্যে পোঁচেছি।

ছেলেমেয়েরা যদি মেঘের ছায়া দেখে সিঁটিয়ে ওঠে
কিম্বা বড়দের আঙুল
ধানের শীষ ছুঁয়ে সাপেকাটা নীল হয়,
আমি আর ভাবিত হই না।
ছটফটানি বলো, কুঁকড়ে যাওয়া বলো, ঢ'লে পড়া বলো
আমি বুঝতে পারি এ সবই
সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর প্রশান্তিতে বাঁধা,
এ সবই ঐক্যতানে লীন হ'য়ে থাকার জন্যে।

কেউ যখন বলে মাথার উপর আগুন-বৃষ্টি হচ্ছে,
আমার হাসি আসে;
শীতলতা যেন তপ্ত নয়!
এই আমি, আমি কি রোদ দেখি না?
কিন্তু আমি যে কোনো রোদকে
আমার কাঁচ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রঙীন করি—
আমার হাতের সেই বাহারের কাঁচ।

আসল কথা হল শান্ত হওয়া,
ঠোঁট বন্ধ ক'রেও তা হওয়া যায়
চোখ বন্ধ ক'রেও হওয়া যায়
মাটির উপর চিরদিনের মতো চিৎ বা উপুড় হ'য়ে তো বটেই

হিরণ্ময় ঢাক্‌নাটি সরিয়ে নেওয়ার পর
কি চমৎকার সরল সত্যের মুখ।

সকালের ভাবনা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দুধের গাড়িটা মোড় ঘুরতেই
পাশের বাড়ির ছাদে
মোরগগুলো ডেকে উঠল।

অন্ধকারকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে
সকালের প্রথম ট্রামও
এখুনি যাবে।

তারপরই চলন্ত সাইকেলে
দুপাশের গাড়িবারান্দায়, রেলিঙে, ফুলের টবে,
ঘরের মেঝেয়
গালে চড় মারবার শব্দে
সকালের কাগজগুলো
ঠাস্ ঠাস্ ক'রে পড়তে থাকবে।

রাত্রে জান্‌লা বন্ধ করতে গিয়ে ভেবেছি—
মাঠে ধান দাঁড়িয়ে,
এখন বৃষ্টি হওয়াটা ভয়ের।

কাল দিনটা কেমন গেছে
ছাপার হরফে
একটু বাদেই জানতে পারব।
আজকের দিনটার মনে কী আছে
এখনও জানি না।

হাত মুঠো করছি
আর খুলছি,
মুঠো করছি
আর খুলছি।

যে দিনটাকে আমি চাই
কিছুতেই মিলছে না।

শহরের রাস্তার ভীড়ে

ইভ্গেনি ইভ্তুশেংকো

শহরের জনাকীর্ণ রাস্তা দিয়ে আমি চলেছি
চারিপাশে এপ্রিলের মত্তোচ্ছ্বাস ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে,—
মনে একটা দুর্বিনীত তার্কিক চেতনা,
যৌবনের ক্ষমাহীন উন্মাদমতা।
ঝড়ের বেগে ট্রামে গিয়ে উঠ্ছি,
অকারণ অসত্য জবাব দিচ্ছি কাউকে-কাউকে,
দৌড়ঝাঁপ ক'রে চ'লেছি, অথচ
লক্ষ্যে পৌঁছতে পাচ্ছি না।
মাল-বোঝাই অজগর নৌকো
আর উড়ো-জাহাজগুলো আমাকে অবাক করেছে;
আমার নিজের কবিতাগুলো...
ওরা আমাকে অর্থ দিয়েছে প্রচুর,
কিন্তু ব'লে দেয়নি ওদের নিয়ে কী করবো আমি॥

অনুবাদ : দিলীপ মুখোপাধ্যায়

মুখোশ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

মিত্রা খবরের কাগজটা ঠিক পড়ছিল না—দেখছিল। বড়ো হরফগুলো—খুব বেশি চোখে পড়ে বলে' দেখা। নইলে ছবিতেই তার চোখ। মা কৃষ্ণ-ঠাকুর ভক্ত, অলক কৃষ্ণ-মেনন। তাই বাঁকা প্যাট্রিয়ট লেখা কাগজটাও আসে বাড়িতে অলকের হাতে। অলকের হাত থেকে মিত্রার হাতে আজ। সোজা প্যাট্রিয়ট কাগজগুলো সব বাবার দখলে। রাধাকৃষ্ণানকে চেনা যায়। কিন্তু একটা বক্তৃতা-সভায় পেছন ফিরে আর কোন্ কেস্ট-বিষ্টুরা বসে আছেন তা চেনাও যাবে না, চিনতে উৎসুকও নয় মিত্রা। মাঝখানটাতে ইন্দিরা গান্ধীকে বেশ দেখাচ্ছে। প্রোফিল। তার চাইতে যেন একটু বেশি। কাশ্মীরী জামা গায়ে। একটা হাত বাড়িয়ে আছেন হাসি-হাসি মুখে।

বাবা মারা গেলে ওম্নি হাসি-হাসি মুখে হাত বাড়াতে পারবে মিত্রা? নিজেকে ভাবলে সে। একটি মাত্র মেয়ে, কতো আদর ছিল তাঁর পণ্ডিতজীর কাছে। মিত্রাও যখন একটিমাত্র মেয়ে ছিল বাবার, কী আদরটাই না পেয়েছে! মনে আনতে পারে সে-দিনগুলো এখনও সে। ইচ্ছে করলেই পারে। ক্লাশ সেভেন পর্যন্ত ত সে ওম্নি কাশ্মীরী জামা-শালোয়ারই পরতো। সেভেন্থ হেভেন। ও-পর্যন্তই। তারপর সাতপাকের কথা ভেবে ভেবে বড়ো হওয়া! কী বিশ্রী!

ইন্দিরা গান্ধীর ছবিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল মিত্রা, যতোটুকু তাঁর জীবন জানে, তার দিকেও। এবং পাশাপাশি নিজের জীবনের দিকে। যৌবন পার হয়ে আসা যে কী অভিশাপ! কাগজটা ভাঁজ করে রেখে দিল মিত্রা। নেহরুর আলোকিত পথেই যে পৃথিবীর আশা—বড়ো হরফের এ-কথাটাও দেখল না।

বস্তুত, মিত্রার আর কী আশা? হাত বাড়াবে সে আর কোনোদিন? বাড়াবার সুযোগ হবে? কিন্টারগার্ডেনের বাচ্চাদের হাত ধরেই এখন কাটাতে হবে বছরের পর বছর!

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল মিত্রা। বুঝি একটু বিষণ্ণও।

পরিবর্তন আসছে তার চরিত্রে। গাম্ভীর্য। টীচারির জন্যেই হোক আর যার জন্যেই হোক। নইলে সিনেমার নায়ক-নায়িকা থেকে কি রাধাকৃষ্ণানে-ইন্দিরা গান্ধীতে চোখ ফেরায় মিত্রা? এক বছর আগেও কেউ ভাবতে পারত এ-কথা? স্বপ্নেও ভাবতে পারত? এম্নি সব ঘটনা আছে যাতে মানুষের চরিত্র বদলে দেয়।

অন্যমনস্ক হয়ে মিত্রা এ-ধারাতেই নিয়ে গেল মন। বাবা বলেন, যুদ্ধের সময়টাতেই নাকি বাঙালী চরিত্র এলোমেলো হয়ে গেছে। যুদ্ধ? সে তো তার আদরের সময় ছিল। কী আদর বাবার! 'মিতু কোথায়', 'মিতুর টফি নাও', 'মিতু ব্ল্যাক-আউটে ভয় পায়'—টুকরো টুকরো কথাগুলো এখনো মনে পড়ে। তখন কি আমরা কলকাতায়? আলোজ্বালা এই অন্ধকার কলকাতায়? কী অন্ধকার, কী অন্ধকার—এখনো এ কলকাতা!

রোদ-ওঠা সকাল বেলাটা ঝাপসা লাগল মিত্রার চোখে। হতে পারে চোখ তার খারাপ হতে সুরু করেছে। টীচারি করলে যা হয়।

সিপ্রা এলো। মাঝে-মাঝে আসে পড়া বুঝে নিতে। ইংরেজিই বেশি। হিন্দি না। 'চিড়িয়া বন্ যাও'—পদ্যটা নিয়ে দিদি ঠাট্টা করেন—বলেন,—সিপ্রার চিড়িয়াখানাতেই চলে যেতে হবে—যা শেখানো হচ্ছে! তারপরই রবীন্দ্রনাথ আওড়াতে সুরু করেন, 'ঘরের পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে বনের পাখী ছিল বনে।' যেন 'চিড়িয়া বন্ যাও' ভালো পদ্য নয়। আজ এসেছে 'আই হ্যাভ এ লিট্ল্ শ্যাডো'—পদ্যটা নিয়ে মুস্কিলে পড়ে।

সিপ্রা সেই 'সেভেন্থ হেভেনে' আছে এখন! সিপ্রাকে দেখেই আজ ভাবল মিত্রা। মিত্রা ছোট বোনের মুখে নিজের স্বর্গ খুঁজতে চাইল আজ। হেসে বললে,—দোয়েল এসেছ! দুলে-দুলে কোন্ গান আজ?

—শ্যাডো মানে ছায়া, না রে দিদি?

—কেন? ছায়াতে পেয়ে বসল না কি তোকে? কোন্ ভূতে বল্ তো!

—ছোট্ট ভূতে। সিপ্রা দুলে দুলেই বললে।

ছোট্ট ভূতেরও বা অভাব কি এখন? মিত্রা ভাবলে! অন্তত তাদের সময়টার চাইতে ঢের বেশি। এভ্রুসের সামনেই তো দেখতে পায় তেমন অনেক ভূত—ট্রাঞ্জিস্টার কাঁধে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! গান যে কেন ভালোবাসে মেয়েরা! কিন্তু ভাবনাটা দিয়ে হাসি বানিয়ে বললে মিত্রা—ইংরেজি ভূত? এবং হাত বাড়িয়ে সিপ্রার হাত থেকে বইটা নিয়ে ষ্টিভেন-সনের পদ্যটাতে চোখ বুলুতে লাগল।

সিপ্রার সেই বারো কি তেরো বছর বয়স যখন সে বাবাকে ভালোবাসে, মাকে ভালো-বাসে, দাদাকে ভালোবসে, দিদিদের ভালোবাসে। ঘরের বাইরে যদিও ভালোবাসাটা তখুনি হাত বাড়াতে চায়, তা বাড়িয়েছে শুধু ক্লাশের মধুমিতার উপর। পদ্যটাতে বলের লাফানোর কথা আছে ওম্নি লাফায় মধুমিতা স্কীপ করবার সময়--আর কী সুন্দর যে নাচে। নাচে অবশ্যি সিপ্রাও কিন্তু 'দারুণ অগ্নিবাণে'টার সঙ্গে যা ভালো পা চলে ওর সিপ্রার কি আর তেমন হয়?

পড়ার সময় নাচের কথা বা পেয়ারা খাওয়ার কথা মনে আসে সিপ্রার। ঐ তো ওর দোষ। মাঝে-মাঝে আনমনা হয়ে যায়। দিদি বই বন্ধ করে বলেন, যাও পড়াব না। টীচারি মেজাজ। তাই তো দিদির কাছে আসত না সে। মেজদিই পড়াত সিপ্রাকে যখন দরকার। সবাইকেই সে ভালোবাসে কিন্তু মেজদির মতো কি কাউকে? মেজদি তো নেই এখন। তাই দিদির কাছে আসা।

মিত্রা মুখ তুলে বল্লে,—বুঝলে না পদ্যটা?

মাঝে-মাঝে আজকাল দিদি 'তুমি' বলেন। তা-ও টীচারি মেজাজ।

—বাংলা মানে করে দাও, তাহলেই বুঝব!

—বুঝবে? তাহলে সত্যেন দত্তের 'মেথর'-পদ্যটা বুঝতে পারছিলে না কেন?

—ওসব নীলকণ্ঠ-ফণ্ট কী করে বুঝব?

সত্যি ও তা কী বুঝবে—একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল মিত্রা। বিষের ও কী জানে? বিষের তেতো কণ্ঠ নিয়েই আচ্ছন্নের মতো ইংরেজি-পদ্যের ছায়াবাজিটার বাংলা করে গেল মিত্রা। সিপ্রা বুঝল কি বুঝল না জিজ্ঞেসও করল না একবার। বইটা বন্ধ করে সিপ্রার হাতে দিয়ে বলল,—যাও পড়ো গে। পদ্য বারবার পড়বার জন্যেই।

সিপ্রা গেল কিন্তু অলক এলো তার প্যাট্রিয়ট ফিরিয়ে নেবার জন্যে।

—পড়লে? জিজ্ঞেস করলে অলক।

—পড়লাম। মিত্রা ঠোঁটে হাসির আভাস ফোটালে,—সিপ্রার পদ্য। অবশ্যি ইংরেজিই।

—পদ্য পড়বে, খবরের কাগজ পড়বে না—তাহলে তো বীট হয়ে যাবে।

বীট-নামটার সঙ্গে অপরিচিত নয় মিত্রা। এখন তো মার্কিনদেশ মোটর রপ্তানি করতে পারে না—এই পচা মাল নাকি পাচার করেছিল—তা-ও শুনেছে সে। আরো শুনেছে আণ্ডার-প্যাণ্ট-পরা সে মানুষগুলোর পেছনে নাকি কলকাতার কিছু ছেলেমেয়ে জুটে গিয়েছিল! অলকও জুটেছিল কি না কে বলবে?

—তুমিও তো লালই হচ্ছ—মিত্রা হাসিটা ঠোঁটে স্পষ্ট করলে, যাতে ঠোঁটের লালিমা এখনো ফুটে ওঠে, এবং থামলে না,—আমিও না-হয় হলাম, বীটও তো লাল।

—তুমি বোকা মেয়ে—তা হতে পারবে না। অলক জাঁকিয়ে বসল একটা শ্রীনিকেতনী মোড়ায়,—চিত্রার খবর জানো? ষ্টপ-প্রেস নিউজ?

দপ করে নিভে গেল হাসি মিত্রার ঠোঁট থেকে।

বুঝল অলক। বুঝল, চিত্রার খবরটা জানার কথা দিদিকে না বলাই উচিত ছিল। কিন্তু ছেলেমানষিতেই হোক আর মার্ক্সীয় শিক্ষায়ই হোক গোপনতা জানে না অলক। কোদালকে কোদালই বলে ফ্যালে। বন্ধুদের বেলায় যেম্নি, রাজনীতির বেলায় যেম্নি, ঘরেও তেম্নি। চিত্রা যখন রাত্রিতে দেরি করে বাড়ি ফিরছিল—অলক একদিন সকালে চায়ের টেবিলে পষ্টাপষ্টি এক দৃশ্য তৈরী করে তুলল। —বোর্ডিং-এ বা কোনো হোটেলে তুমি পার্মানেণ্টলি কবে যাচ্ছ? কাপে দাঁত ঘষে বলেছিল অলক। বাবা বিপন্ন, মার চোখ ছানাবড়া, দিদি ঠিক এম্নি কালো, সিপ্রা শরীরের দুলুনি থামিয়ে স্থির। চিত্রাও সাপের চোখে তাকিয়ে উত্তর দিয়েছিল,—বাড়িটা কি তোমার?—ভদ্রলোকের বাড়ি তো অন্তত। তোমার মতো স্ট্রীট্-ওয়াকার এখানে ঢুকতে পারবে না। অলক হিংস্র পশুর মতো লাফিয়েও পরতে পারত শিকারের ঘাড় কামড়ে ধরবার জন্যে, তা না করে স্ট্রীট্ওয়াকারের মতো অশ্লীল একটা ব্যাপারের ইঙ্গিত করল। কিন্তু শব্দটার গুরুত্ব হয়তো জানা ছিল না কারো, তাই এঞ্জিনীয়র পিতা বল্‌লেন,—চায়ের কাপে তুফান তুলো না। চুপচাপ চা খাও। চুপচাপ থেকেই চা খেলেন সবাই সেদিন!

ছবির ফিতের মতো ঘটনাটা চোখের উপর দিয়ে চলে গেল অলকের। হাত বাড়িয়ে বললে,—দাও কাগজটা।

—নাও। পড়েই তো আছে। মিত্রা নিস্পৃহতা ফুটিয়ে তুললে গলায় এবং শরীরের ভঙ্গিতে।

—তার মানে পড়োনি?

—কী হবে পড়ে? যে চলে যায় তাকে নিয়ে দু'দিনই তো হৈ-চৈ!

কাগজের সম্পাদকীয়টাই কপচাতে চাইল অলক,—পণ্ডিতজীর মতো আর কাউকে তো আমরা এতো বিশ্বাস করিনি। তিনি যখন নেই, এখন শুধু অবিশ্বাসের খেলাই চলবে।

মিত্রা পণ্ডিতজীকে মোটেও মনে আনল না, কিন্তু বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথাটা নিজের জীবনে জড়িয়ে নিলে। বিশ্বাসের ভেতর স্বার্থ ছাড়া আর কী আছে? স্বার্থ বিপন্ন বলেই তো অবিশ্বাসের আক্রোশ? যেখানে স্বার্থ সেখানে তো প্রতারণা চলবেই। কে চায় তোমার বিশ্বাস? ঠকবার জন্যেই তো বিশ্বাস করো। বিশ্বাস! কথাটাকে একটা কেন্নোর মতো মনে হল মিত্রার। যার দিকে তাকালেও ঘেন্না নিয়ে তাকাতে হয়।

ভঙ্গির অনীহা ঘৃণায় রূপান্তরিত হল। মিত্রা উঠে দাঁড়ালো। মনে ঘৃণা নিয়ে চুপচাপ বসে থাকা যায় না। একটা-কিছু করতে হয়।

জানালায় দাঁড়িয়ে মিত্রা দু'আঙুলে চাঁদির চুল টেনে টেনে বললে,—চিত্রা কী করেছে?

—ওঁরা দু'জন কালিম্পঙ যাচ্ছেন! গ্রীষ্মাবাসে!

—বাবাকে তা জানানো হয়েছে, না? মুখ ফেরালে না মিত্রা।

—বাবাও বা কী? চিঠি লিখতে গেলেন কেন ওকে!

জানালার গরাদে হাত রাখল মিত্রা। যেন কয়েদখানার গরাদে। বাইরে কেউ যেন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তার দিকেই তাকিয়ে রইল।

—এখন বাবার খুব কনসার্ণ দেখা যাচ্ছে—আমি যখন বলতাম, কী করেছিলেন তখন? অলকের গলা ক্রমেই অস্বাভাবিক হয়ে চলছিল।

—আমিও বা কেন বিশ্বাস করতে গেলাম তোমাকে—অদৃশ্য আগন্তুককেই যেন প্রশ্ন করল মিত্রা। বিশ্বাস করলে শাস্তি পেতেই হয়। যেমনি আমি শাস্তি দিয়েছি, তেমনি পেয়েওছি। নিজেকেই এবার শোনালে মিত্রা।

—কী করে দাঁড়াই বলো তো বন্ধুবান্ধবের সামনে? সব সময় আশঙ্কা। চিত্রার কথা পাছে কারো মুখে শুনি।

অলককে কি শুনছিল মিত্রা? শুনতে চাইছিল তার জীবনে দ্বিতীয় আগন্তুকের মুখে তার প্রশ্নের উত্তর। অনেক ছবির নায়ক নিজের মনের কথা কী বলে—তা-ই শুনতে চাইছিল যেন। পরের কথা শিখে শিখে নিজের আর কিছু বলবার আছে কি না তার, তা-ই শুনতে চায় এখন মিত্রা। বোঝাপড়ার আশায়? মনের পরিবর্তন হয় কখনো? হতে পারে?

—জানো, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সেদিন যোধপুর-পার্কে গিয়েছিলাম। অলক এবার দিদির মুখ ফেরাতে চাইল,—আমার সব সময় ভয় ছিল পাছে পার্কের রাস্তায় সেই কীর্তিমান অভিনেতাটিকে দেখে ফেলি!

বাইরের অদৃশ্য আগন্তুক এবার ঘরের ভেতর চলে এলো।

মিত্রা ফিরে তাকালো অলকের মুখে। যে-চোখে তাকালো, তাকেই বোধহয় কালিদাস চকিতহরিণীপ্রেক্ষণ-গোছের কোনো মোলায়েম ভাষা দিয়েছেন। কিন্তু এখনকার দৃষ্টিতে সে-চোখে তাকাতে গেলে নিশ্চয়ই সেখানে খানিকটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা আবিষ্কার করা যাবে।

অলক একটু অপ্রস্তুত হল। দিদিকে কোনোরকম আঘাতই সে দিতে চায় নি। ঘটনা সম্পর্কে তার ধারণা ছিল, দিদির সে-ব্যাপারে কোনো দোষই নেই। দিদির চেহারা এবং গানের গলা সেই কীর্তিমান অভিনেতাকে আকর্ষণ করেছিল। হয়তো দিদিকে প্রলুব্ধও করেছিল সেই ব্যক্তি। কিন্তু দিদির পা পিছলায় নি। জামাইবাবু অনর্থক একটা কাণ্ড করে বসলেন। জামাইবাবুর চরিত্রেই এখন সন্দেহ হচ্ছে অলকের। অধ্যাপকরা যা হয়ে উঠেছেন কেউ-কেউ। একজন তো এমন দর্শনও, কোত্থেকে ধার করে এনেছেন ঈশ্বর জানেন, আওড়ান যে পশুর দৃষ্টিতে তাকাতে গেলে মানুষকে মনে হবে লম্পট আর বেশ্যা! কে জানে জামাইবাবু সে-দর্শন পেয়েছেন কি না!

সব দিক সামলাতে গিয়ে এখন অলক বললে,—কিন্তু তুমি পড়লে পারতে, দিদি, কাগজটা! কাগজটা দিদির বিছানা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আবারও বললে,—যে যা-ই ভাবুন পণ্ডিতজীকে, সেকাল-একাল বাঁধবার এমন সেতু আর কেউ নেই।

কিন্তু পণ্ডিতজীর কথা কি শুনতে এখন ভালো লাগছিল মিত্রার। সেই অদৃশ্য ব্যাধ

তার সামনাসামনি এসে তীর ছুঁড়ে দিয়েছে। আহত বুক নিয়ে হরিণী ছুটতে চায়—কিন্তু পারছে না—এখুনি হয়তো ভূলুণ্ঠিত হবে। সত্যি, দাঁড়াতে পারছিল না মিত্রা—বিছানায় এসে বসল সে। কিন্তু বিছানায় এসেই যেন একটা হাসি তৈরী করে তুলতে পারল ঠোঁটে। অলকই বলতে পারত, সে-হাসিটা তার হাতে-ধরা কাগজে ছাপা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাসির মতো কি না!

কাগজ থেকে মুখ যখন তুললও অলক, সম্পাদকীয়র পৃষ্ঠাতেই তার মন। কাজেই চোখে কী দেখছিল না দেখছিল তা বোঝার উপায় নেই। বললে সে, খানিকটা ছাত্রদের ডিবেটের ভঙ্গিতেই,—পণ্ডিতজীকে আমাদের ভালো লাগে এ-জন্যে যে গান্ধীজির আকর্ষণে গেলেও তিনি মার্ক্সের শিক্ষাকে বাতিল করতে চান নি। ক্রিটিক্যাল অ্যাডোরেশন বলতে পারো—গান্ধীজিই হোন আর মার্ক্সই হোন এই বিশ-শতকীয় মনের নির্বিচার ভক্তি পান নি। বিশ-শতক তো সন্দেহবাতিকগ্রস্ত—না কি বলো?

—সন্দেহ? তাছাড়া আর কী? মিত্রা অনেকক্ষণ পর কথা বললে। হয়তো তাই খুব দুর্বল শোনালে তার গলা।

—কিন্তু সন্দেহ থেকে সব-কিছুই বাতিল করবার অভ্যাস জন্মালেই সর্বনাশ!

মনটা কি ছেলেমানুষ হয়ে গেল মিত্রার? অলকের বাক্যগুলো থেকে দু'একটা শব্দমাত্র সে তুলে নিতে পারছিল—বাক্যের অর্থ যেন ধরতে পারছিল না। তাই এবারও বললে, —সর্বনাশ?

—তাছাড়া কী?

—কী? আধো-উচ্চারণ করলে মিত্রা। কিন্তু চোখের সামনে অলককে যেন এ-জিজ্ঞাসা নয়। সেই অদৃশ্য ব্যাধ—ব্যাধের চোখে তাকিয়েই বললে মিত্রা,—কী? আর তখুনি যেন সাবালক হয়ে গেল তার মন, যার উপর ভেসে এলো আবেগের ভাষায় একটি পংক্তি: 'তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ'।

শান্তিনিকেতনে বসবাস করেও সম্প্রতি অলক ঢাকুরিয়া-যাদবপুরের অশান্ত এলাকায়, ভুলেও এখন রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে না। এই তো সেদিন রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন গেল—পঁচিশে বৈশাখ। কিন্তু কার দ্বারে সে ডাক দেবে? আভনের কবি বল্লম উঁচিয়ে সব দ্বারে প্রহরী। কী শেক্‌স্‌পীয়র-পেয়ার! হতে পারে, হিন্দিকে জখম করবার ষড়যন্ত্র! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কী দোষ করলেন? একবছর আগেই না পাড়ায়-পাড়ায় মাইক গর্জাচ্ছিল: 'আজি হতে শতবর্ষ পরে'? একবছর পরেই শেক্‌স্‌পীয়রের নেশায় রবীন্দ্র-নাথকে 'টু-বি অর নট টু-বি'র ধাক্কায় ফেলা! এসব অবশ্যি অলকের ভাবনা নয়, এখন সে 'পোলিটিক্যাল হ্যামলেট' পণ্ডিতজীকেই ভাবছিল এবং ভাবছিল বাঁকা প্যাট্রিয়টের ভাষায়।

উঠে দাঁড়াল অলক। এতোক্ষণে সে বুঝতে পারছিল, তার কথাবার্তায় দিদির মন থাকতে পারে না।

বললে সে প্রস্থানোদ্যত হয়ে,—আমাদের সভায় একটা গান গাইবে, দিদি?

এবারও চমকে উঠল মিত্রা—কোন্ শব্দে যে ঠিক বোঝা গেল না, 'সভা' না 'গান'—সে নিজেও হয়তো বুঝতে পারল না কোন্‌টা তার পক্ষে শব্দরূপী বাণ। কিন্তু কথা বলতে পারল, মুমূর্ষুর মতো হলেও কথা ফুটল তার মুখে,—সভা? কী সভা তোমাদের?

—থাক্, পরে বলব। অলক ঘর থেকে চলে গেল।

আর এবার স্পষ্ট দেখতে পেল মিত্রা সেই ব্যাধকে। এগিয়ে আসছে। দেখতে পেল

তার দিকে এগিয়ে আসছে। বুঝতে পারল, তার মৃত দেহটাকে এখন দু'হাতে আঁকড়ে ধরবে। রাত্রির আমিষ আহার্যের জন্যে।

সে যে মৃত নয় তা বোঝাতেই যেন মিত্রা চীৎকার করে উঠল।

দশ

সে চীৎকার গড়িয়াহাটার লোকরাও শুনবে আর পারমিতা শুনবে না? লতা মুঙ্গেশকারের গলা নয় যে গান ভেবে নিশ্চিত থাকা যাবে। ভয়-পাওয়া মেয়ের গলা। কে? সিপ্রা? মিত্রাদি? মিত্রাদিকে সহজে মনে আনতে চায় না পারমিতা। স্বামী-সোহাগে পাছে চিড় ধরে। অন্তঃস্বত্তা হলে মেয়েরা অনায়াসে দ্রুপদী হয়ে যায়। একেলে মেয়েরও সেকেলে ট্যাবু-টোটেম্‌বোধ ফিরে আসে, যার পরিস্রুত নাম মাতৃত্বই হবে। ভারি শরীরেও গলিতে ছুটতে ইচ্ছে হল পারমিতার। কিন্তু দেখলে, বাবাই চা থেকে উঠে গলিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। সুতরাং বাইরে না গিয়ে গলি-মুখো জানালার গরাদে মুখ চেপে দাঁড়াল সে। এ-চীৎকারে দাদুর আবার আজ কী হয় কে জানে? পারমিতা ভাবল কথাটা, কিন্তু সেদিকে উৎসুক হল না—এঞ্জিনীয়রবাবুর বাড়ির রহস্য তার চাইতে ঢের গভীর।

অভিজিতের খবরে উৎসাহ থাকা স্বাভাবিক। যেম্নি এ-সময়ে চা-য়ে থাকা তার স্বাভাবিক। ঘুমই তো ভাঙে তার সকাল আটটায়। আটটার দোষ কী? অফিসে রাত জাগতে না হলেও, ইংরেজি পত্র-পত্রিকা নিয়ে রাত তিনটে অবধি তো সে, বলতে গেলে, একটা ফরেন এফেয়ার্স-রই দপ্তর খুলে বসে! বিদেশী পানীয়ের সঙ্গে বিদেশী খবরের ক্ষুধা বাড়তে থাকে, তখন বাবা যদি ষ্ট্রোকে মারা যান পণ্ডিতজীর মতো, কিম্বা পারমিতা অ্যাক্রেমশিয়ায় সে-খবরও তার কাছে কিছু নয়। যদি সকালের চা-টা ভালো হয়, আটটার পর সে ভাবতে সুরু করে কলকাতার কথা, এমনকি, সাউথ গড়িয়াহাটার কথাও। কিন্তু শর্ত, সকালের চা ভালো হওয়া। পণ্ডিতজীরই মতো। সে বল্‌তও তার মদের আড্ডায় জামাই জয়ন্তের কাছে,—জানো, কেমন যেন পণ্ডিতজির মেজাজ হয়ে গেছে আমার... ষ্টাফ্‌ড্ চীকেনই শুধু নয়... বাক্যটা শেষ না করেই চোখ সরু করে ঠোঁটে মিহি মোলায়েম হাসি টানত।

একটা চুপচাপ, দোর-বন্ধ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আর কী খবর পাওয়া যাবে? সে তো আর এখনকার ছোকরা সাংবাদিক নয় যে শূন্যের উপর কাব্যি করে যাবে! খবরের কাগজ যেন ফ্রেঞ্চ জার্নালের জায়গা! তোরা গিয়ে অটোবায়োগ্রাফি লেখ্ না। শুনি তো পাব্লিশার এন্তার বেড়ে গেছে। বৃষ্টি হলেই তো গাছ বাড়ে না, গাছ বাড়লেও বৃষ্টি হয়! বিজ্ঞানের ভাষায় মন্তব্য করে বাড়ি ফিরে এলো অভিজিৎ।

'সেলারে' এলো সে কলকাতার খবরে মন দেবে বলে। দরজায় ষ্টেটস্‌ম্যান পড়ে আছে। ষ্টেটস্‌ম্যান। মনে-মনে হাসল অভিজিৎ। মনে তার কাব্যিও উঁকি দিল। যৌবনে অনেক শুনেছে যে-গানটা তারই পংক্তি : 'রোজ দিয়ে যাই একটি গানের ফুল তোমার দরোজায়'। ফুল! শব্দটার ইংরেজি উচ্চারণ করল অভিজিৎ। কারো উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই। ফুলবাণ-টান মনে পড়েও হতে পারে। কিন্তু কলকাতার খবরও তো সে-ই। কাগজটা দু' আঙুলে কুড়িয়ে নিয়ে অভিজিৎ ইজিচেয়ারে গেল। কাগজের খবর দেখবার আগে মনে এলো তার কাল বিকেলে যে এক ফুলোৎসবের খবরই কুড়োতে গিয়েছিল সে।

শ্বারভাঙ্গা-হলে। মল্লিকার খবর নয়। মল্লিকা নামটা কেন মনে এলো তার? যাক্‌গে, 'ভারতীয় সংস্কৃতি সংস্থা'র ফ্লোৎসব। সংস্কৃতি। বাবা, চতুর্ম্মুখ সৃষ্টিকর্তার ব্যাপার : কবি-প্রমুখ শিক্ষক, রাষ্ট্রনীতিক এবং জর্ণালিষ্ট বা সাংবাদিকের মিলনক্ষেত্র! কবে যে ছিল এই ভারতীয় সংস্কৃতি! আর মুঘল আমলের রক্তগোলাপ! না কি ইংরেজ আমলের ব্ল্যাকপ্রিন্স! ভটচাযের শাদা গোলাপও নয়। পণ্ডিতজী রক্তগোলাপ ভালোবাসতেন তাই তাঁর পোট্রেটের সামনে রক্তগোলাপগুলিতে স্তূপ তৈরী হল! ভারতীয় সংস্কৃতি! পাঁচ মিনিট থেকে অভিজিৎ চলে এসেছিল। এখন সে নিজের রাজ্যে পাজামায়, বর্মী চপ্পলে, হাওয়াই জামায়, তারপর ত্রিকোণ-টেবিলের গোলাপী-খড় রং-খয়েরি কাচপাত্রে। ভারতীয় সংস্কৃতি! গান্ধীজি তাহলে একটি নিছক অপলাপী! ঠোঁটের হাসিটা বিদ্রূপে ও বিষণ্ণতায় ভঙ্গি পাল্টালে। ছোট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে অশ্রুত কণ্ঠে বললে অভিজিৎ, মল্লিকা নামটা বোধহয় ভারতীয়। শাদা ফুল। ফুাল। আবার শেষ শব্দে ইংরেজি অ্যাক্সেণ্ট দিলে অভিজিৎ এবং শব্দের ধ্বনিটা শোনা গেল। নিজেই শুনল সে। হয়তো নিজেই শুনতে চায়। সাংবাদিক হলেও কারোকে শোনাতে চায় না।

ফুলোৎসবের খবরটা আছে। কাগজে চোখ নিয়েই দেখল অভিজিৎ। সামনের পৃষ্ঠায়ই আছে।

এসব বুদ্ধিজীবীদেরই কি প্রিয় ছিলেন জওহরলাল? হয়তো হ্যারোভিয়ান জওহর-লাল, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিতজী, আন্তর্জাতিক নেহরু—এ'দেরই প্রিয়। কিন্তু গান্ধীজির জওহর—চম্পারণের লাল? যাদের কথা লিখেছিল অভিজিৎ তিনদিন আগে—সেই ভারতের তীর্থযাত্রীদের শুভ্রকেশ বিগ্রহ? তিনি তবে কে?

বিষণ্ণ হয়ে উঠল অভিজিৎ। এঞ্জিনীয়রবাবুর বাড়ি থেকে মেয়েলি গলার ভয়ার্ত চীৎকারে যেম্নি চমকায় নি, বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল—বেঙ্গল-পটারির সর্বোচ্চ মূল্যের কাপে বিশুদ্ধ দার্জিলিং চায়ের সুরভিতে যেমন ন্যক্কার এসেছিল তার, তেম্নি এখন এই নির্জন ঘরে একটা বমি-বমি ভাব নিয়ে ভুগতে সুরু করল অভিজিৎ। হাত থেকে খবরের কাগজটা ছেড়ে দিলে।

তখন পারমিতাকে দেখা গেল। বি-ভিটামিনের অভাবে ঠোঁটের দু'কোণ শাদা। এতো সুন্দর ঠোঁট ছিল যার সে এই কুরূপ ঠোঁট ফাঁক করে জিজ্ঞেস করল,—কী হয়েছে, বাবা?

অপ্রস্তুত হয়ে বললে অভিজিৎ,—কার?

—সিপ্রারই তো! কী হল মেয়েটার?

—জানিনে তো। কাউকে বাইরে দেখলাম না।

—অলক? তাকেও দেখলে না?

—না।

বমি-বমি ভাবটা গেল বটে কিন্তু নতুন আরেকটা অস্বস্তিতে অভিজিৎ মুখ ফিরিয়ে নিলে। মেয়ের বেঢপ শরীরে তো লাগোয়া একটা অস্বস্তি আছেই—তাছাড়া পারমিতার মুখে অলক নামটা যেন তাকে এখন যন্ত্রণাই দিচ্ছিল। একটা পুরনো যন্ত্রণাকেই উস্কে দিচ্ছিল। মল্লিকা-নামের সঙ্গে যে-যন্ত্রণা মেশা! মল্লিকার সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার ফলেই পারমিতা অলককে বিয়ে করতে পারে নি—বিয়ে করতে হয়েছে জয়ন্তকে। বিয়ে করে সুখীই তো হয়েছে। দিব্যি স্ত্রীর কর্তব্য পালন করছে! মল্লিকাও নিশ্চয় আজ তেম্নি সুখী! তা ভেবেই হয়তো তার এখনকার অস্বস্তি!

কিন্তু মেয়েকে ভালোবাসা উচিত এবং যে তার সন্তান হয়ে আসছে তাকেও। তা-ই সনাতন রীতি। আধুনিক মনেও সনাতন বোধ খানিকটা রয়ে গেছে অভিজিতের। পণ্ডিতজির ভাবনাতেই গেল সে আবার। নতুন প্রধানমন্ত্রী নন্দর মতো দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে সম্ভাষণ জানালে না সে মেয়েকে, যেন কোনো অপরিচিতার দিকে তাকাচ্ছে, তেম্নি তাকিয়ে বললে,—জয়ন্ত আসছে তো রোজ?

হাসিতেও পারমিতার ঠোঁটদু'টো ভালো দেখালো না। বললে সে,—হাঁ। কিন্তু বোনের বিয়ে নিয়ে খুব ব্যস্ত এখন।

—বোনদের বিয়ে দিয়ে ফেলাই উচিত! অভিজিৎ সরু চোখে পালিশ ঠোঁটে হাসলে এবার,—দেখছ না, বাবা কেমন ঔচিত্যবোধে কাজ করলেন—আমার বোনদের সব বিয়ে দিয়ে দিলেন!

পারমিতা-ও তো অমিতব্রতর বোন! দাদা এখন মুন্যানিকের মেয়েদের নিয়ে যা-ই করুন, তিনিই তো কাণ্ডটা করলেন! অলকের সঙ্গে আমার কী হয়েছে না-হয়েছে ওম্নি বাবার মন ভাঙালেন—দাদুর তো ভাঙাবেনই। নিকট অতীতের উপর খানিকটা চোখ বুলিয়ে নিয়ে ধাতস্থ হয়ে গেল ফের পারমিতা। বললে,—দেখলে না চিত্রা কী কাণ্ড করে বসল!

পরের এসব কুকাণ্ডকে সমর্থন করতে না পারলে আর আধুনিক মন কী এবং শান্তিও বা কোথায়? তাই অভিজিৎ বল্‌লে,—মিত্রা, সত্যপ্রিয়—এদের ভেতরই কোনো গোলমাল ছিল—সব দোষ চিত্রার না-ও হতে পারে।

—না-না, দিদি যা করবেন তা-ই করবার ছিল চিত্রার নেশা! জানো না, মিত্রাদি যখন ছবিতে কণ্ঠ দিতেন তখন চিত্রার নেশা চেপেছিল চিত্রতারকা হবে!

এবার অবিকল পণ্ডিতজীর কথার প্রতিধ্বনি করলে অভিজিৎ,—এখনকার চেঞ্জ্‌ড্‌ সিচ্যুয়েশনে সেকেলে ভাব নিয়ে বসে থাকলে তো আমাদের চলবে না। আমাদের ভাবনারও পরিবর্তন চাই।

অলক আর তার বেলায় সে-ভাবনা কোথায় ছিল বাবার? কথাটা মনে এলেও চেপে দিয়ে বললে পারমিতা,—এঞ্জিনীয়রবাবু নিশ্চয় আসবেন দাদুকে বলতে ব্যাপারটা যে কী!

বাবার অস্তিত্ব সম্পর্কে এইমাত্র সচেতন হল অভিজিৎ। বাবার ভূমিকায় চলে গেলে কোন্‌ ছেলে বা ছেলের ভূমিকায় বাবাকে ভাবে? তিনি জীবিত থাকলেও না। কিন্তু সচ্চিদানন্দ তেমন বাবা নন, বিত্তের সঙ্গে পুত্র-পৌত্রের সম্পর্ক—রক্তের সঙ্গে নয়, এই মার্ক্সীয় ধারণা বিষয়ীর বুদ্ধিতেই তার মনে জন্ম নিয়েছিল। তাই সময় থাকতেই তিনি বিত্তসঞ্চয় করেছেন এবং ছেলেমেয়েদের পেছনে সর্বস্ব ঢেলে নিঃস্ব হয়ে যাননি। মোটের উপর কারো মুখাপেক্ষী তিনি নন। অর্থের জন্যেও নয়, সেবার জন্যেও নয়। তিনি জানেন, ছেলের কাছে হাত পাততে নেই, বৃদ্ধা স্ত্রী সেবা করবেন না, মেয়ে না, পুত্রবধু না আর নাত্‌নি তো পরস্য পর। প্রথম ষ্ট্রোকের পর ভেবেছিলেন, যদি তাঁকে শয্যাশ্রয়ীই হতে হয় তাহলে একজন নার্স রেখে নেবেন। সেদিনকার খবরও রাখেন তিনি এবং মার্ক্সীয় ভাবনায় নয়, অন্য এক বোধেই ভাবেন কেরেলার ক্রিশ্চিয়ান কোনো মেয়েই এ কাজে যোগ্যতমা। বাবার এ চরিত্রটাই হয়তো ভাবল অভিজিৎ। ভাবতে অসুবিধে ছিল না। সচ্চিদানন্দ প্রায়ই বলেন,—কথা আর কাজ—অন্দর আর সদর একই রকম তিনি ভেবেছেন বলেই জীবনে যা-কিছু উন্নতি না কি তাঁর। এ-যদি বাবার সত্যিকারের ফিলসফি হয়ে থাকে—এখানে এসে হাসল একটু অভিজিৎ—তাহলে এ-ফিলসফিটা কিছু-কিছু তার জীবনেও বর্তেছে!

সে যে সুরাসক্ত ঘরে-বাইরে কে না জানে সে-কথা?

পারমিতার কথার উত্তর দিতে একটু দেরি হল অভিজিতের বাবার ভাবনায় জড়িয়ে পড়ে। মেয়েকে খানিকক্ষণ অপেক্ষায় রেখে বললে সে অবশেষে,—ও ধরনের চীৎকারে তো বাবার প্রেশার বেড়ে যাবার কথা! জানো কিছু?

—মণিমা-ই তো ওখানে। পিতামহীর এই আদুরে নাম মা-ই পুপুকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন ছেলেবেলায়।

—মা কী করবেন? তিনি তো সব সময়ই হকচকিয়ে আছেন।

—তা-ই বুঝি? জানো না তো বুড়ির কী প্রেম! পারমিতা মুখ টিপে হাসল যাতে ঠোঁটের শাদা কোণ দু'টো ঢেকে গিয়ে হাসিটা সুন্দর দেখালে।

—কিন্তু বাবা তো মাকে কিছু করতে দেবেন না।

—করার আর কী আছে—পিলটা খাইয়ে দেওয়া তো!

ব্যস্। পিতৃমাতৃকৃত্য হয়ে গেল অভিজিতের। তবু আজ বলেই হল। ওই চীৎকারের দরুণ। একতলায় থেকে দোতলার খবর কে রাখে? বল্‌লে,—গৌরীকে পাঠিয়ে দাও এঞ্জিনীয়রবাবুর বাড়ি। জেনে আসুক কী ব্যাপার।

—মা? মা তো সব-কিছু জেনেই বসে আছেন!

—ইন্‌টুইশন? হাসলে অভিজিৎ। এবং অনুভব করলে সে যে এখন বেশ হাসতে পারছে! বিষণ্ণ পণ্ডিতজি এ-জন্যেই লোকের সঙ্গে মিশতে চাইতেন। ওই হাসির জন্যে। জনতায় খুশী হতেন। জনতা দর্শন-ভিখারী দেখলে বক্তৃতা ভালো হত তাঁর আর গোলমাল দেখলে ছেলেমানুষের মতো গাল দিয়ে উঠতেন,—চুপ রও বুরবক! শ্রদ্ধানন্দ-পার্কের একটা সভা মনে এলো অভিজিতের। ম্যাডাম চ্যাং-কাইশেককে নিয়ে এসেছিলেন। যুদ্ধের লাগোয়া সনগুলোতে—এদিকে না ওদিকে ঠিক মনে পড়ল না। কিন্তু নিজের যৌবনকে মনে পড়ল। মনে পড়ল মল্লিকাকে।

ইনটুইশনের ধারে-কাছেও গেলনা পারমিতা। বললে,—সব খবর তাঁর জানা। বললেন, চিত্রার কী খবর এসেছে তাই কাকিমা চেঁচিয়ে উঠেছেন! যেন দেখে এসেছেন! বুঝলে তো, আমাকে একটু টাইট্ দেওয়া—চিত্রার সঙ্গে আমার ভাব ছিল!

'টাইট্ দেওয়া'—অর্থটা বুঝলেও ভাষাটা নতুন শোনাল অভিজিতের কানে। জয়ন্ত আজকাল এসব ভাষা বলে না কি! অনুকম্পা ফুটে উঠল অভিজিতের চোখে অনুকম্পার হাসি।

—পুপু—বোধহয় গৌরী ডাকল।

—যাও—খবর হয়তো এসেছে—হাসিটা প্রসারিত হল অভিজিতের সমস্ত মুখে।

ঘরোয়া খবরের পালা শেষ। টেলিফোন-টেবিলের পাশে শৌখীন টেবিলে চোখ নিলে অভিজিৎ। নিউ-স্টেটস্‌ম্যানে-র অগোছাল স্তূপ, ফরেন এফেয়ার্সে-র আটপৌরে মোটা-সোটা চেহারা আর টাইমের ছিমছাম দেহগুলোতে খানিকক্ষণ রাখল চোখ। কাল রাত্রিতে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করা গেছে। এখন আর ছোঁবে না সে ওগুলো। এখন শুধু খানিকক্ষণ প্রতীক্ষা টেলিফোন বাজে কি না। অপর প্রান্তে মল্লিকার গলা? না, না সে আশা তার মোটেও নেই। এডিটরের আওয়াজই প্রতীক্ষা করছে সে। সব দিনই যে আসে তা নয়। হুকুম, যাকে ভদ্রভাষায় নির্দেশ বলা যায়।

সেকালেও প্রতীক্ষা ছিল, বিপ্রলব্ধ-সন্ধারা ছিলেন কিন্তু সিগারেটের মতো এমন একটা

আশ্চর্য ম্যাজিক ছিল না। যার ফলে প্রতীক্ষার দু'চার ঘণ্টা সময় ভস্মসাৎ হতে যেতে পারে, বিপ্রলব্ধের দুঃখ ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

পারমিতাকে বিদায় করেই সিগারেট নিয়েছিল অভিজিৎ ঠোঁটে। এখন তাতে অগ্নি-সংযোগ করলে।

আজকের খবরের উপর কী মন্তব্য হতে পারে কাল? সম্পাদকের ভাবনাটা নিজেই ভাবলে অভিজিৎ। কিন্তু জরুরি খবর কী—কর্তাব্যক্তিদের কাছে? অতএব সম্পাদকেরও তা-ই! সে-ই তো মুস্কিল! সুতরাং ভেবেও লাভ নেই। কাঁড়ি কাঁড়ি কাগজ ঘেঁটেও লাভ নেই। তবে, নেহরু-আদর্শ নিয়েই চলবে দিনকতক ক্যাপশান আর কমেন্ট! কিন্তু কতো শীগগীর যে আমরা ভুলে যাব নেহরুকে তা আজ ভাবতে পারছিনে! কথাটা অভিজিতের মনই মনের কাছে বললে। তার মানে, আমরা প্রমাণ করব, নেহরুকে আমরা ভালোবাসতাম না। যাঁরা ভালেবাসতেন, তাঁরা শূন্যতায় ভুগছেন। কালো ফিতে বা বড়বড় কালো হরফের কী দরকার তাঁদের? কম্প্লিট ভ্যাকুঅম! হাওয়া নেই।

বস্তুত, কা'কেই বা আমরা ভালোবাসি? নিজেকে? তা-ও না। সবাই হ্যামলেট হয়ে বসে আছি। লরেন্স অলিভারের অভিনয়টা মনে পড়ল অভিজিতের। অভিনয়। অভিনয় ছাড়া আর কী? ভা-ল-বা-সা। সিলেবল্ ভাগ করে অভিজিৎ শব্দটা উচ্চারণ করলে। কেটে-কেটে যেন ভেতরটা দেখতে চায় সে। হাড়ের সংস্থান, মাংসপেশীর ডৌল, রক্তের নাড়ী, স্নায়ুর শিকড়। জন্ম থেকেই কর্কট রোগে ভুগছে ও বেচারা। বাঁচাবার কোনো অষুধই নেই। আবিষ্কৃত হয়নি অন্তত আজ পর্যন্ত।

নেহেরুও একটা শূন্য, পাশাপাশি অভিজিৎ যেম্নি শূন্য। নেহেরুর পাশাপাশিই রেখেছে অভিজিৎ নিজেকে বরাবর। কিন্তু তার জন্যে যে সে কোনো সাংবাদিক বৈঠকে গিয়ে নেহরুকে হস্তিমূর্খের মতো প্রশ্ন করবে—তা কোনোদিন নয়। যৌবনে যেম্নি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গেছে নেহরুকে শুনতে, তেম্নি আর দু'-চারবার। ময়দানে ক্রুশ্চফের সঙ্গে পায়রা-উড়ানোর দিন বা ডক্টর রায়ের স্মৃতিসৌধস্থাপন-টাপন-ধরনের কোনো সুযোগে। দেখাটাই তো বড়ো নয় এবং কথা শোনা কথা বলাও নয়। প্রোফেশন্যাল প্রেমিক বা কবিদের বেলায় কী হয় ব্যাপারটা তা অবশ্যি অভিজিৎ জানে না। সে নিজেকেই জানে।

মূর্খ! নিরেট মূর্খ! নইলে কেউ প্রেমে পড়ে? এবার আর ফুল বললে না অভিজিৎ। যদিও মল্লিকাকে ভাবল সে। কেন প্রেমে পড়তে গিয়েছিল ও মেয়েটা? ওদের কান্নাই শোভা পায়, প্রেম নয়। কান্নাতেই ওরা অভ্যস্ত, প্রেমে নয়। প্রেমের চেহারাই আলোর, আগুনের। এক ট্যাগোর ছাড়া কেউ বোঝেন নি কথাটা। সবাই শরৎ-চাটুয্যের সাকরেদ। রেলিজিঅন অব ব্লাড। রক্ত, অশ্রু। দুই-ই লোনা জল! দু'টি চোখের টি-পটে তুফান তোলা! টাইফুন। এক-একটি সমুদ্রের অবতার! তা-ও যদি হত! ভেনাস্—ভেনাস্! ফুল! শেষটায় মূর্খকে বিদেশী পোশাক পরালে অভিজিৎ।

টেলিফোন বেজে উঠ্ল। সিগারেটটা অ্যাশ্ট্রের জলে ছুঁড়ে দিয়ে, হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল অভিজিৎ।

—মিঃ রয়?

—স্পিকিং।

—লাইক টু টেক্ এ কোলাম অন্ নেহরুস্ অ্যাশেস্?

—মোস্ট গ্ল্যাড্লি। হাসল অভিজিৎ ছাইদানীতে চোখ রেখে।

নীরব হয়ে গেল টেলিফোন।

এগারো

মলুয়া টেলিফোনে কথা বলছিল। অনেকক্ষণ। এখন ঠিক বিকেল নয়। তবে, দাদু বেরিয়ে গেছেন—লেকে অথবা যোধপুর পার্কে। বাবা অপিস থেকে আসেন নি। কাকু শেভ করছেন—এখন দু'বেলাই শেভ করেন। এর চাইতে নিরিবিলি সময় আর কখন পাওয়া যাবে তাই প্রাণভরে কথা বলে নিচ্ছিল মলুয়া। কথাও বা বলতে পারে সে বাড়ির কার সঙ্গে? এক কাকুর সঙ্গে বলা যায়—আর কার সঙ্গে? অবশ্যি, টেলিফোন বলে নয়, বাইরে বেরোলেই তার কথা বলতে ইচ্ছে করে। এমনকি যোধপুর পার্কের চওড়া রাস্তার মোড়ে জোড়া তালগাছের সঙ্গেও। 'কেমন আছো তোমরা জোট বেঁধে?' জিজ্ঞেস করলে মন্দ হয় কী? কতো বন্ধুকেই তো জিজ্ঞেস করছে সে এ-কথা।

এখন কথা বলছিল সে গীতার সঙ্গে, যে-নামটা আজকাল প্রায় কমননাউন হয়ে গেছে। বাবা হয়তো শ্রীকৃষ্ণের গীতা মনে রেখেই ও নাম রেখেছিলেন আর পড়াচ্ছেনও রামকৃষ্ণ মিশনের পাড়ায় মুরলীধর কলেজে কিন্তু গীতা যা একখানা মেয়ে হয়েছে! রাস্তায় সেধে-সেধে ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করে। ক্লাশের মেয়েরা ঠাট্টা করে,—তুই দেখছি সহস্র গোপী তৈরী করে তুলবি! হোক্, তবু মলুয়ার ক্লাশের মেয়েদের ভেতর গীতার সঙ্গেই কথা জমে বেশি।

—হ্যাঁ—শুধু ঘুমোলাম! মলুয়া বলে যাচ্ছিল,—শনিবার আর ক'টা পাওয়া যায় বল্? অ্যাঁ? ঠিক তা-ই। রোববারের দিবানিদ্রার প্রিপারেশন। কিন্তু না রে! শরীর মোটেও ভালো লাগছিল না! হ্যাঁ ভীষণ সর্দি। সর্দি। একটা হাঁচি দিই তো বুঝবি। বাঃ, কার সঙ্গে আবার? মহুয়ারও ছুটি—স্রেফ ছুটি। মহুয়া ওর বিছানায়, আমি আমার। ঈস্ বাবা—যা হয়েছিস তুই! অশোক? অশোক কেন আসবে? বলেছিল? মাইরি? ভারি ইন্টারেষ্টিং তো! তার মানে, তুই লেলিয়ে দিচ্ছিস? যাঃ—হতেই পারে না। বলে নিজেদের ও-কথা? হ্যাঁ-হ্যাঁ বীটরা? না বাবা, বীট-গাজর বাড়িতে তুলে লাভ নেই—বর্ষায় বিশ্রী ভোঁটকা গন্ধ। শীতে? দেখা যাক্। মুগ্ধ? বলিস কি? মণিপুর পাঠিয়ে দে—আসল চিত্রাঙ্গদা পাবে। ও, তা-ই বল্—অভিনয়ে মুগ্ধ। তা মণিপুরী ট্রুপের রাসলীলায় নিয়ে যা ওকে একদিন। রাসলীলা। বুঝছিস না? ওতো তোরই এলাকার বস্তু। বেরোব? না বোধহয়! সত্যি, সর্দি লেগেছে। ঘুমিয়ে তোকেই স্বপ্ন দেখলাম—তাই কথা বলবার দরকার হল। অশোককে দেখলে ভালো হত? নেক্সড্ ঘুমে চেষ্টা করা যাবে। বুঝলাম, বুঝলাম—অশোক-ম্যানিয়াতেই ধরেছে ইদানীং তোকে। তা বই কি! আমি যেতে বসেছি কি না! না-না, চায়ের আড্ডায়ও নয়, কফির আড্ডায়ও নয়। কাক্কু বাড়ি থেকে বার করে দেবেন। কী বলেন জানিসনে? তিনি নাকি নিওবীট—পুরনো জঙ্গল সাফ করবেন। আয় না! বেশ, আয়। কাকু? বেরিয়ে তো যানই! থাকবেন হয়তো বললে। দরকার আছে? তা তো তোর থাকেই। যাদবপুর থেকে সাঁথি—কার সঙ্গে তোর দরকার নেই? কাকুর সঙ্গে তো থাকবেই। কী—বুঝতে পারছিনে। ভার্স-ড্রামা? সে আবার কী? তুই লিখেছিস? বাঃ—দ্যাট্স্ এ নিউজ!...

দরজায় টোকা পড়ল। বাবা? কিন্তু গাড়ি গ্যারেজে ঢোকার শব্দ তো হল না। নাকি

হয়েছে—মলুয়া খেয়ালই করেনি। টেলিফোন স্ট্যান্ডে রেখে দরজায় দৌড়ুল সে।

বাবার বন্ধু সুমিত্র উপাধ্যায়!

মুখোমুখি হতেই উপাধ্যায় বললে,—গ্যারেজে গাড়ি নেই—অতএব বাবা নেই। কিন্তু তিনি গেলেন কোথায়? আজ তো অফিস ছুটি!

—আজ তো আরো সকালে বেরিয়ে গেলেন। মোটামুটি মোলায়েম হলেও বিরক্তিতে কাটা-কাটা হয়ে গেল কয়েকটা শব্দ।

—কী জানি! দাদু? তিনিও তো নেই বোঝা-ই যাচ্ছে। থাকলে তো অবারিত দ্বারই থাকত!

—দাদু আপনার বাড়ি যান নি?

—নাঃ। তা-ই বলে গেছেন নাকি?

—যান তো।

সুমিত্র ঘরে আসতে-আসতে বল্‌লে,—তা যান। সেকেলে মানুষদের কি আর আত্মপর ভেদ আছে!

সুমিত্র যে নিজেকে এই মুহূর্তে কোন্‌ কালে স্থাপন করতে চায়, তা ঠিক বোঝা গেল না।

সাহিত্যে পদ্মবিভূষণ সুমিত্র উপাধ্যায় ইদানীং নিরেট ফিলসফি আওড়াচ্ছেন তা নিয়ে হাসাহাসি হয় মলুয়ার ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে কিন্তু তাঁকে সামনাসামনি দেখে তো আর সে হাসতে পারে না। বেশ গম্ভীর হয়ে বললে মলুয়া,—আপনি বসুন, আমি কাকুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি!

—সুপ্রিয়! নামটা যেন আর্তনাদের সঙ্গে বেরিয়ে এলো সুমিত্রর গলা থেকে।

সুপ্রিয়কে সামনাসামনি পেতে চায়না উপাধ্যায়। তার মনে দৃঢ় ধারণা, যে ওম্নি পোষাক করে সে বিদেশী ভাবনার পুষ্যি না হয়ে যায় না! আর বাঙালী জাতটাই তা-ই। কস্মিনকালেও ভারতীয় নয়। আজ সুমিত্র উপাধ্যায় বাঙালী হয়ে গেছে বটে—কিন্তু পূর্ব-পুরুষ তো তাঁর এসেছিলেন ব্রহ্মার্ষিদেশ থেকে! ভারতীয় ধ্যান-ধারণার সেবক তার মতো কে আছে আর বাংলাদেশে—অন্তত কে প্রচার করছে আর সেই প্রাচীন ভারতের সত্যগুলো? ওম্নি তো আর ভারতরাষ্ট্রের উপাধি আর পুরস্কার হাতে আসে না।

মলুয়া ঠোঁটে ছোট্ট একটা হাসি তৈরি করে বল্‌লে,—বসুন না কাকুর সঙ্গে খানিকক্ষণ। বাবা তো এসেই যাবেন।

—তোমার বসতে আপত্তি নেই তো!

সুমিত্র সভয়ে বললে না সপ্রেমে, ঠিক বোঝা গেল না।

মেয়েরা অনুরোধের চাইতে হয়তো আদেশটাই বেশি পছন্দ করে। বলা যায় না, হয়তো সুমিত্রর কথায় মলুয়া আদেশেরই আভাস পেল—তাই বসল। অনিচ্ছা যে কী করে ইচ্ছা হয়ে যায় বলা যায় না!

—আপনি কী লিখছেন আজকাল? লেখকদের যে মামুলি কথা জিজ্ঞেস করতে হয় তা-ই করলে মলুয়া।

—লিখ্‌ছি? কই আর লিখছি?

—আমরা তো শুনি, পুজোর ছ'মাস আগে থেকেই লেখকরা নাকি স্নান-খাওয়ার সময় পান না!

—তবেই বোঝো—আমি কী লিখছি! আড্ডা দিয়েই তো বেড়াচ্ছি সব সময়!

তার জন্যে দুঃখিত হল না মলুয়া—দুঃখিত দেখালোও না। সুমিত্র উপাধ্যায় না লিখলে যে দেশ উচ্ছন্নে যাবে এমন কথা কোনোদিনই ভাবে না মলুয়া। বিশেষণ-অলা কতো উপাধ্যায়ই তো আছেন। কুলীনের অভাব কী—বাংলাদেশে? তিনটে-চারটে করে উপন্যাস লিখবেন একেক জন পুজোতে। লেখাবেন সম্পাদকরা। কাগজ নিয়ে তখন সবাই তো তাঁরা কন্যায়দায়গ্রস্ত! এবং কুলীন জামাই চাই! মলুয়া অবশ্যি পড়লে অকুলীনের লেখাই পড়ে। তাঁদের অভিজ্ঞতার সে শরিক বলে। বাবার বন্ধু বলে পড়তে গিয়েছিল সুমিত্র উপাধ্যায়ের লেখা। ভালো লাগেনি। কাকু বলেন, ও'রা ফিনিশ্‌ড্‌।

—আজকাল তো অনেক লেখক—অনেকে লিখছেন। যেন একটা মজার কথা বলল মলুয়া।

—তা লিখছেন। জানো তো আলোর নিয়ম? একটা ল্যাম্পের আলো ওই দেয়ালটা জুড়ে পড়লে যতোটা উজ্জ্বল দেখাবে—এই টেবিলটায় শুধু পড়লে তার চাইতে ঢের উজ্জ্বল হবে!

মাঝে-মাঝে সুমিত্র কথাবার্তায় বৈজ্ঞানিক উপমা ঢুকিয়ে দেয়, যেমনি পূর্বপুরুষের ঋক্‌বেদের কয়েকটি পংক্তি কণ্ঠস্থ করে রেখেছে মওকা বুঝে জাবর কাটবার জন্যে। এ মন্ত্র খুবই কার্যকরী হয় মাড়োয়ারী চিত্র-প্রযোজক ঘায়েল করতে। প্রত্নবিদ্যার ঘর বলে শুক্লার সালোঁতেও পড়তে চায় সে এ-মন্ত্র, কিন্তু তেমন কাজ হয় না। আর এখানে, জজবাবুর নাতনির সামনে, ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের 'পি-আর-ও'র মেয়ের সামনে সে মন্ত্র তো হাস্যকরই মনে হবে। বিচার-বোধ সুমিত্রর টনটনে। কোথায় কোন্‌ কথায় উপস্থিত হতে হবে বা প্রবেশ করতে হবে তা তার জানা। তবু মাঝে-মাঝে শিকার ফস্কে যায় না কি? ওইতো তার দুঃখ।

মলুয়া হাসির আলো ছড়িয়ে দিলে এবং যাতে বাবার বন্ধুর দুঃখ দূর হয় তেমন কথাই বল্‌লে,—দাদু বলেন, অসংখ্য তারা থাক্‌লে কী হবে, একা চন্দ্রই অন্ধকার দূর করে।

খুশী হল উপাধ্যায়। নিজের গায়ে জ্যোৎস্না মাখাবার সুযোগ এলেও স্বার্থত্যাগ করে বল্‌লে,—শরৎচন্দ্রের বেলায় তেমন হয়েছিল বৈ কি!

মলুয়ার মুখে হাসিটা বাঁক নিলে এবার,—আচ্ছা—চট্টোপাধ্যায় উপাধ্যায় নন কেন?

যদিও এতে চটবার কারণ ছিল সুমিত্র উপাধ্যায়ের, নির্বিকার থেকেই সে বললে,—ও'রা বাংলাদেশে এসে বোধহয় চটি পায়ে দিতেন।

—ও, আপনারা সবাই বিদেশের আমদানী?

—বাংলাদেশের লোক বলতে সত্যি কে আছে, বলো?

—দাদু বলেছিলেন ডক্টর রায় মারা যাবার পর—শেষ বঙ্গজ কায়স্থ গেলেন।

ডক্টর রায়ের কাছে খুব বেশি পাত্তা পায়নি সুমিত্র যদিও তার নামের ঢেঁকুর তোলে। একবার কপি-রাইটের মেয়াদ বাড়াবার জন্যে দরবার করতে গিয়েছিল, ডক্টর রায় এক-কথায় তাকে বিদায় করে দিলেন—ওটা আন্তর্জাতিক আইন, তার উপর তাঁর কোনো হাত নেই।

এবারও কাল নিয়ে প্রশ্ন তুললে সুমিত্র,—একালের মেয়েরা ওসব খবর রাখে না কি?

বুদ্ধি ঝলকে উঠল মলুয়ার চোখে,—কে বিদেশ থেকে এলেন, সে-খবর রাখতে হয় না?

এবার ভারতীয় আদর্শ নিয়ে বক্তৃতা দিতে পারত, ভারতের বহুবিচিত্র ভাবকে অন্বিত করবার ক্ষমতা নিয়ে সাহিত্যও করতে পারত কিন্তু শিকার ফস্কে যাবার দুঃখবোধও তার মনের সংবৃত্তিকে চেপে দিলে। তবু সংবৃত্তির মুখোশ না পরে উপায় কি তার মতো বয়স্ক

লেখকের? বিশেষ করে মলুয়াকে যখন কিছুতেই শুক্লা ভাবা যাচ্ছে না। শুক্লার সালোঁতে সে-রাত্রির দৃশ্যটা চকিতে চোখের উপর দিয়ে চলে গেল সুমিত্রর। সবাই মাতাল হয়ে পড়েছিল কিন্তু সুমিত্র নয়। সর্বসমক্ষে যতোটা উপভোগ করা যায়, করল সে শুক্লাকে। সুমিত্রর এ-জ্ঞান ছিল, মাতালরা মনেই রাখতে পারবে না কী তারা দেখছে! চরিত্রহীন হতে তোমার ক্ষতি কী—কেউ যদি তা না দেখে এবং দেখলেও ভুলে যায়?

চরিত্রহীনতার এই কৌশল মনে রেখেই সুমিত্র বললে,—তাই বুঝি? আমরা কবে দেখতে পাব সেই বিদেশ-ফেরত যোগ্য যুবককে?

যুবতীর কাছে যুবকের প্রশস্তি-পাঠ করেই বোধহয় বয়স্ক লোকের এগোতে হয়।

—পাবেন। ঘাবড়ালো না মলুয়া—টিপ-টিপ হাসতে লাগল।

—জানো—হাত নেড়ে বললে সুমিত্র,—শুধু রবীন্দ্রনাথের কথাই বলছিনে, সব লেখকই চিরকাল মনে-মনে তরুণ থেকে যান!

এবার 'তা-ই বুঝি?' বলার পালা এলো মলুয়ার—যে-কথাটা পঞ্চাশের পর বাংলা কথ্য ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং বিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের মেয়েদের মুখে যা প্রায়ই শোনা যায়। আশ্চর্য, সুমিত্রও তা সুযোগমতো ব্যবহার করে—শুধু উপন্যাসে নয়, নিজের মুখেও।

—অন্তত নিজের কথা বলতে পারি—আমার মনেই হয় না কলেজের দিন থেকে একটুও এগিয়ে এসেছি! সুমিত্র বললে।

এ-কথা যদি সে সুব্রতর মেয়ের কাছে না বলে বন্ধুবর সুব্রতকে বল্‌ত—তাহলে উত্তর পেত: তাইতো লেখাগুলো তোমার এডোলেসেন্টই রয়ে গেল! কিন্তু বাংলাদেশের হাড়ে ফরাসী সংস্কৃতি থাকলেও সুব্রতর মেয়ে মলুয়া ফরাসী মেয়ে নয় যে গুণে মুগ্ধ হয়ে বাপের বয়সী পুরুষের প্রেমে পড়বে। মলুয়া অবশ্যি জানে না, দাদু যে বাবার বন্ধুকে পদ্মনাভ বলেন। নিজেকে তারুণ্যে সিঞ্চিত করেও বিশেষ সুবিধে করতে পারল না সুমিত্র। মলুয়া বল্‌লে,—কলেজ-দিনগুলো খুব ভালো—তা-ই না? গীতাকে মনে পড়ল মলুয়ার। গীতা কি আসবে আজ? যদি আসে, নিশ্চয়ই আসবার সময় হয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়াল মলুয়া। বললে,—আপনি বসুন। আমি কাকুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিদায়-বাণী উচ্চারণ করলে সুমিত্র,—সময়টা বেশ কাটল—তা-ই না?

কিন্তু মলুয়া চলে গেল পর সুমিত্র সত্যিকরে মেপে দেখতে চাইল সময়টা ভালো কাটল কি না। একটা সময় নিশ্চয়ই ছিল যখন তরুণ-তরুণীরা বয়স্কদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করত। চল্লিশের দিনগুলোই তো সে-রকম। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তরুণীদের আকর্ষণের কথা ছেড়েই দিলাম, সুমিত্র উপাধ্যায়ও কি কম আকর্ষণ করতে পেরেছে মেয়েদের? কিন্তু এখন? এখন যেন আর তার চারপাশে তেমন চৌম্বক শক্তি নেই। শুক্লার কথা নয়—ওর দাক্ষিণ্য আজ এর উপর, কাল ওর উপর। মলুয়া—মলুয়াকেই ভাবছিল সুমিত্র। এই নিয়ে দু'চার দিন যা আলাপ হল, মলুয়ার কথায় তেমন উষ্ণতাই পেল না সে যা থেকে ভাবা যায়, ওকে সে টানতে পেরেছে।

একটু ছটফট করে উঠল সুমিত্র। যেন নিজের দিকে তাকাতে চাইল না। কী দরকার বা আত্ম-আলোচনার? সে তো আর কোনোদিন আত্মজীবনী লিখবে না—তার ধারণা সাধু না-হয় শয়তানই আত্মজীবনী লেখে। সাধু লেখেন, কতোটুকু তিনি শয়তান ছিলেন তা দেখাতে আর শয়তান লেখে কতোটুকু সে সাধু তা-ই দেখাতে। সুমিত্র নিজেকে সাধু

বা শয়তান—কোনোটাই ভাবতে পারে না। কিছু ভাবতে গেলে ভাবে, সে একটা মুখোশ পরে চলেছে।

এবার সময় সচেতন হল যেন সুমিত্র। সুপ্রিয়র আসবার সময় হয়েছে নিশ্চয়। মলুয়া গিয়ে তাকে আসতে বললে ছিমছাম হয়ে বেরোতে তার কতোটা সময় যেতে পারে? যতোটা-ই যাক্, সুপ্রিয়র মুখোমুখি সে হতে চায় না পাছে সে কোনো অপ্রিয় কথা শোনে। সুপ্রিয় সম্পর্কে সুমিত্রর ধারণাটা স্পষ্ট। সুপ্রিয় মার্কিন-সাহিত্যের ভক্ত হতে পারে, সুমিত্রর সাহিত্যে তার ভক্তি মোটেও নেই। জানে তা সুমিত্র। সুপ্রিয়র মুখে শাদামাটা শুনতে হয়নি—আকার-ইঙ্গিতেই বুঝতে পেরেছে। যাক্, আর যার জন্যেই হোক সুপ্রিয়র জন্যে তো এ-বাড়িতে তার আসা নয়।

সুমিত্র উঠে দাঁড়াল। চলে যাওয়াই ভালো। অন্য কোনো সময় এসে জজবাবুকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেই হবে।

দরজা পেরিয়ে ছোট বারান্দায় এলো সুমিত্র। এবং সভার কথাটা ভাবল। জওহরলালের জন্যে শোক-সভা।

গ্যারেজের পথে নেমে সুব্রতকে ভাবল না সুমিত্র, যে তার বন্ধু এবং যার মেয়ের সঙ্গে সে সময়টা বেশ কাটিয়ে গেল। ভাবল জওহরলালকে। ভাবল হয়তো জওহরলালের মুখোশটাকে। চোস্ত পা'জামা, শেরওয়ানি, গোলাপ ফুল। ওতেই হয়তো চোস্ত্ ইংরেজি-বুক্‌নিওয়ালারা ভুলতেন—তিনিও যে তাঁদের ভোলাতে না ভালোবাসতেন তা তো নয়! কিন্তু যে-ভালোবাসা তাঁর দরিদ্রের প্রতিনিধি গান্ধীজীর জন্যে ছিল—তা-ই তো তাঁর ভারত-আবিষ্কার! কে বা প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল থেকে সেই জওহরলালকে আবিষ্কার করতে পেরেছে!

মুখোশ-পরা জওহরলালকে মনে নিয়েই সুমিত্র জজবাড়ির গেট পার হয়ে এলো।

গড়িয়াহাটা রোড। কলকাতারই মোহিনী রাস্তা। যে-রাস্তায় এসে দাঁড়ালে সব ভুলে যেতে হয়। জন্ম-মৃত্যু, দেশ-কাল। শুধু একটা প্রত্যক্ষ ধাবমানতা। তারই বোধ চোখ থেকে মনে প্রবেশ করে।

কোথায় যাওয়া যায়? ভাবলে সুমিত্র। সামনে গড়িয়াহাটার সমান্তরাল যোধপুর পার্কের সড়ক। পার্কের চওড়া রাস্তা থেকে গুচ্ছ-গুচ্ছ মেয়েরা ফুলের মতো এ-সড়কে বেরিয়ে আসছে। সান-ফ্লাওয়ার, বোগান-ভিলি, ক্যানারি রঙের শাড়ি! নীল শাড়ির জোয়ার কবে একবার এসেছিল, চলে গেল—ভাবলে সুমিত্র। তখন বোধহয় মেয়েরা নিজেদের অপরাজিতা ভাবত!

শুক্লা! শুক্লাকে তো সভায় আমন্ত্রণ করা হয়নি। ট্যাক্সির সন্ধানে রাস্তায় চোখ চালালে সুমিত্র।

বারো

শনিবার বিকেল। এখনই না-হয় পদ্মবিভূষণ সুমিত্র উপাধ্যায়, ঘিয়ে-রঙের কলাপাতা-রঙের, দুধ-রঙের নতুন বাড়ি-দাঁড়ানো যোধপুর পার্ক থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে 'চল্লিশের অভিজাত-পাড়া বালিগঞ্জের দিকে চলেছে কিন্তু 'ত্রিশে? যখন সে বিত্তবানও নয়, তেমন-কিছু লেখকও নয়, বাংলা-সাহিত্যে পণ্ডিত বনবার জন্যে দীনেশ সেন টুকছে আর বিজ্ঞাপন

লিখে মেসের খরচ চালাচ্ছে তখন? তখনও অবশ্যি এম্নি শনিবার বিকেলে মাঝে-মাঝে সে ট্যাক্সি নিয়েছে বিশেষ পল্লীর দিকে। এখনো শনিবার এলে পুরনো ভাবনা যে সুমিত্রর মনে আসে না তা নয়। অনিশ্চিত উপার্জন আর অনিশ্চিত প্রেম—এই দার্শনিক সংজ্ঞায়ই সে তার শনিবার-চেতনাটাকে বুঝতে চায় এখন।

সঙ্গীতশ্রীর যদি কোনো খবর থাকে গ্রামোফোন-কোম্পানী থেকে কী অঙ্কের চেক সে পাচ্ছে—আর শুক্লা, ট্যাক্সিতে বসে তা-ই ভাবছিল সুমিত্র।

পনেরো মিনিট পরেই কিন্তু সুব্রত বাড়ি ফিরে এসেছিল। অফিস নেই কিন্তু কারখানায় কাজ ছিল। নতুন মেশিন-টুলস্‌গুলো নিয়ে পুজো ক্যাম্পেন সুরু হবে। কারখানা না দেখে ডিজাইন-ব্লক-লিটারেচার বাজেট কিছুই করবার উপায় নেই। তাছাড়া ইনকাম-ট্যাক্সের বাজ-দৃষ্টিতে তো বাজেটের অঙ্কও বাঁধা। অথচ বাঙালী পি-আর-ও পেয়ে বাংলা পিরিয়ডিক্‌লসের যে কী ভীড় জমবে বিজ্ঞাপনের আশায় তা ভাবতেই, এখুনি তার দুঃখ হচ্ছে।

সেই দুঃখিত মুখেই সুব্রত গ্যারেজে গাড়ি রেখে ঘরে এসে ঢুকল। সুপ্রিয় আর মলুয়া আলাপে ব্যস্ত ছিল কিন্তু বাবা কোথায়? দুশ্চিন্তায় ভুরুতে ঢেউ উঠল সুব্রতর। কিন্তু অন্য কিছু ভেবে কাকা-ভ্রাতুষ্পুত্রী সামলে গেল।

—বাবা বেরিয়েছেন আজ? দুজনকেই জিজ্ঞেস করল সুব্রত।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে যেন সুপ্রিয় বাবাকে খুঁজতে লাগল কিম্বা বাবার কথা মনে আনতে চাইল।

মলুয়া চটপট উত্তর দিলে,—দাদু তো সেই কখন বেরিয়ে গেলেন। সুমিত্রকাকু এসে-ছিলেন, বাবা!

—তা-ই নাকি? সুব্রত দাঁড়াল না।

সুপ্রিয়র একটা কথা মনে এলো বা একটা কথা বলবার দরকার হল তার,—তোমার সঙ্গে অভিজিৎবাবুর আলাপ আছে?

—তেমন নয়। কেন? মুখ ফেরালে সুব্রত।

—অলক বললে আছে। এঞ্জিনীয়রবাবুর ছেলে অলক। ওরা নেহেরুর একটা কণ্ডোলেন্স মীটিং করবে কাল—জায়গা পাচ্ছে না।

—জায়গা পাচ্ছে না? ভুরু তুলে একটু হাসল সুব্রত।

—একটা খালি-প্লট আছে অভিজিৎবাবুদের—বারোয়ারি দুর্গোপুজো হয় যেখানে।

—এঞ্জিনীয়রবাবুর সঙ্গেই তো সচ্চিৎবাবুর হৃদ্যতা থাকবার কথা—আর জায়গা তো সচ্চিৎবাবুরই—অভিজিতের নয়।

পিতৃপরায়ণ দাদার কথাটা তেমন ভালো শোনাল না সুপ্রিয়র কানে। সে বিরক্ত হয়েই বললে,—তুমি তাহলে অভিজিৎবাবুকে বলতে পারছ না?

—না। সুব্রত বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

সুপ্রিয় আর মলুয়া কতোক্ষণ কথা বললে না—সুব্রতকে ভুলতে যতোক্ষণ দরকার, ততোক্ষণ।

সুপ্রিয় হঠাৎ হাতঘড়ি দেখে বললে শেষটায়,—কোথায় তোমার গীতা—মিছিমিছি বসিয়ে রাখলে তো আমায়!

দাদুর ইচ্ছায় সংস্কৃত পড়েছে মলুয়া, সুমিত্র যদি সে-খবর জানত। যাক্‌, তাই মলুয়া

বলতে পারলে,—নিজেকে বিপ্রলব্ধ মনে হচ্ছে নাকি তোমার?

—সে আবার কী? জুতোর ছুঁচো-মুখে মেঝে ঠুকতে লাগল সুপ্রিয়।

—ধরো না, লুব্ধ হয়ে লব্ধ না হওয়া!

—লুব্ধ? মার্লিন মনরোর চাইতে ভালো তোমার গীতা?

—তার তো প্রতীক্ষায় ছিলে না!

—গীতার প্রতীক্ষায় আছি নাকি আমি?

—বলতেই রাজি হয়ে গেলে। নইলে শনিবার বিকেলে তুমি বাড়ি থাকবে!

—তুমি থাকলেই যথেষ্ট! সরু গোঁফের নীচে শাদা দাঁতের ঝিলিক এনে হাসল সুপ্রিয়, যে গোঁফকে সে উপর থেকে চেঁছে ঠোঁটের সমান্তরাল একটি সরু রেখায় পর্যবসিত করেছে।

—আচ্ছা! কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের গলার ঢেউ তুলে বল্‌লে মলুয়া তারপর তাড়াতাড়ি বললে,—তোমাদের সভায় আবৃত্তি হবে না!

—আমাদের সভা! ও তো অলকের বন্ধুবান্ধব করছে। আমি জওহরলালে মোটেও ইন্টারেস্টেড নই।

—কেনেডি-তে ছিলে?

—খানিকটা। কারণ, হি ওয়াজ এ ইয়াং ম্যান।

—ও, দাদুতে তাই তুমি ইন্টারেস্টেড নও!

—জানো—বয়সটা একটা মুখোশ, যতো বুড়ো হবে মুখোশটা তোমার মুখে এঁটে বসবে। দেখতে পাওনা, দাদার মুখেও আঁটতে সুরু করেছে!

—তোমার মুখে?

—আমি আলোর মতো এখনো স্বচ্ছ!

—এবং কাচের মতো ঠুনকো।

—মে বি। তাও বরং হওয়া ভালো ঝুট্ মুক্তো হওয়ার চাইতে।

—দেখছি তুমি শেষটায় ফিলসফার হয়ে যাবে।

—ফিলসফি আমার পেছন নেবে। আবার ঘড়ি দেখল সুপ্রিয়,—নাঃ, তোমার গীতা আর আসছে না।

—তুমি কোনো সংহিতাকে ভেবে ছটফট করছ নাকি?

—ও দ্যাট্ ব্লেসেড্ লেডি—উঁচু আওয়াজে হেসে উঠল সুপ্রিয়,—সুমিত্র-গৃহিণী! উপাধ্যায়ের স্ত্রীর নাম তা-ই না?

—কী জানি!

—উপাধ্যায় এতোক্ষণ আড্ডা দিয়ে গেল, তার স্ত্রীর নামটা জানলে না?

—তুমি বা জানলে কী করে?

—কে যেন বললে সেদিন—সংহিতা উপাধ্যায়ের একটা গল্প বেরিয়েছে কোন্ এক মেয়েলি কাগজে—স্টাইল নাকি হুবহু সুমিত্র উপাধ্যায়ের!

—তা-ই বুঝি?

—কে যে আসল লেখক তা-ই বোঝা যাচ্ছে না।

—স্পাইং সুরু করো।

—ওকে ব্ল্যাক-মেল করে কী হবে? ওসব পদ্ম-ছদ্ম এখন কুপোকাৎ—কামরাজ মানে

যা-ই হোক, ফুলের দিন হল অবসান! ভীষ্ম চাটুজ্যের গানটা শুনেছ? এবার সব ভীষ্মের আবির্ভাব হবে।

—তারই রিহার্স্যাল চলছে বুঝি তোমার।

—আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাউকে মানিনে।

মলুয়া ঠোঁটে হাসি টিপল। কাকুর বিরুদ্ধে সে কথা বলেনা—বলতে চায়না। এ নিয়েই তো বাড়িতে গোলমাল। কিন্তু কাকু না থাকলে এ-বাড়িতে থাকা যেতো? বাবা তো দিন-দিন লোহা বনে যাচ্ছেন আর মা খাপে-ঢাকা বাঁকা তলোয়ার। দাদু বুড়োদের মতোই দুর্বোধ্য। কী চান, না-চান সহজে বোঝা যায় না। আর মহুয়া তো ছেলেমানুষ! এক কাকু! মন খুলে অন্তত কথা তো বলা যায় তার সঙ্গে। তাছাড়া, চাল-তেল-মাছ, লোকসভা-বিধানসভার বাইরে তার একটা কালচার আছে। নইলে জজের বাড়ি কোর্ট হয়ে উঠত না?

—বাইশে শ্রাবণ তোমাদের কোনো ফাংশান হবে, কাকু? মলুয়া জানতে চাইলে তার "চিত্রাঙ্গদা"র অভিজ্ঞতা মনে এনে।

জজবাবু ঘরে ঢুকলেন। একা নয়। জুটিয়ে এনেছেন দেববাবুকে।

সুপ্রিয়, মলুয়া দুজনই সাংবাদিকের ক্যামেরার মতো ঘাড় সোজা করে তাকাল। তারা চেনে দেববাবুকে। ঠিক বাড়িঅলার মতো নয়, তবু তো তাঁর জমি কিনেই তাদের বাড়ি। বাড়ির খবর না রাখলেও বাড়ি-কেনার খবরটা দুজনই রাখে। একদিন ইনি জমিদার ছিলেন! শোভাবাজারের না শ্যামবাজারের সুপ্রিয়র ঠিক জানা নেই। কিন্তু পিনাকী-সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা আছে তার। বেশ শোভন-শোভন, লোভন-লোভন চেহারাখানা। বনেদী ভাবটা বজায় আছে। উড়ো জমিদারের ফতুর চেহারা নয়। যেমন উপাধ্যায়। পদ্মবিভূষণ সুমিত্র উপাধ্যায় নাকি আজকাল বলতে সুরু করেছে, তার পূর্বপুরুষ মেদিনীপুরের কোথায় যেন জমিদার ছিলেন। তাই সেকালের গেঁয়ো সঙ্ঘের উপর ক্ষেপে গিয়ে নাকি একটা বইও লিখেছেন! সমাজতন্ত্রের বাজারে সে বই কাটবে কেন? ফতুর জমিদারের ব্যবসায়েও ফতুর হবার দিন এসেছে! কিন্তু ইনি বারবার বাবার সঙ্গে কেন?

কিন্তু মলুয়া কথা বললে। উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—আমার এক বন্ধুর আসবার কথা আছে, দাদু—এলে পাঠিয়ে দেবেন উপরে। আমরা আছি। এসো কাকু।

দ্বিরুক্তি না করে মলুয়ার পেছনে চলে গেল সুপ্রিয়।

জজবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বললেন,—বসুন, দেববাবু! একটু সরবত আনতে বলব?

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বসল পিনাকী কিন্তু প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললে,—না-না—এ সময়ে সরবত আর না-ই বা হল।

সময়টা সত্যি তখন সন্ধ্যা। এমনি সন্ধ্যায়—পিনাকীর বাবাকে মনে পড়ল—প্রসেনজিৎদেব সদর মজলিশে বসতেন। ঝাড়-লণ্ঠনের আলোতে ছায়ার কাটাকুটিতে ঘরটা কেমন অদ্ভুত দেখাতো। খুব ছেলেবেলায় দেখেছে পিনাকী। সরবতের নয়, সরাবের মজলিশ বসত। ওকে বোধহয় সরাবও বলা যায় না—বেঁটে বোতল, জালি-দেওয়া বোতল—বিলিতি মদ। গাইয়ে-বাজিয়েও মাঝে-মাঝে কেউ-কেউ আসতেন! ছায়ার মুখোশে বাবা ছিলেন আলাদা মানুষ—মহা ফূর্তিবাজ। কিন্তু দিনের আলোয় তাঁকে কেউ তেমন দেখেছে? তটস্থ হয়ে থাকত বাড়ির ঝি-চাকর-রাঁধুনে বামুন, এমনকি মা পর্যন্ত! ও-পাড়ায় এখনও কেউ কেউ নাকি কাপ্তানী করে। কিন্তু বে পাড়ায় গিয়ে! ভদ্রঘরের মেয়েমানুষই নাকি

আজকাল জুটছে। তাদের নিয়ে পার্ক স্ট্রীটের পানশালায়—তারপর চৌরঙ্গী এলাকার সিনেমায়। কাপ্তানী করিস তো কর কর্তাদের মতো। পারবি মেয়েমানুষের পাড়ায় গিয়ে হাজার টাকার নোট ছিঁড়ে তাদের গায়ে ছুঁড়ে আসতে? পথের মেয়ে ধরে ধরে দু-পাঁচ টাকা দাদন দিয়ে কী হবে? সুদ আদায় হবে কোনোদিন?

জজবাবুকে দুঃখিত দেখালেন—পিনাকীকে আপ্যায়ন করতে পারলেন না সেজন্য তো বটেই তাছাড়া পিনাকীর কাছারী ঘরে আলাপের মাঝখানে যে এঞ্জিনীয়ারবাবুর বাড়ির দুর্ঘটনার খবর পেয়েছিলেন তা স্মৃতি থেকে তুলে এনেও খানিকটা। বললেন,—তখন জিজ্ঞেস করিনি—আপনি এঞ্জিনীয়রবাবুর খবর শুনলেন কোথায়?

পিনাকীর মনে তার বর্তমান ভাবনার রেশটাই ছিল তাই অন্যমনস্কভাবে বললে, —সচ্চিৎবাবুর ওখানে। কর্পোরেশন-ট্যাক্সের ঝামেলায় গিয়েছিলাম ও'র সঙ্গে পরামর্শ করে কোনো বিহিত করা যায় কিনা দেখতে। আপনার কাছেও আসতাম। তখনই শুনলাম ও'র মুখে।

—চিন্তিত হবার কথা।

এবার পিনাকীর সুযোগ মিলল, ভাবনার রেশে কথা ফুটিয়ে তুলবার। বললে, —আপনাদের ওই খুকী—যাকে এই মাত্র দেখলাম—পড়াশুনা করছে, না?

—মলুয়া? হাঁ মুরালীধরে পড়ছে।

মলুয়াকে নিয়েই তো জজবাবু চিন্তিত হচ্ছিলেন। পাড়ার এক বাড়িতে কলেরা বা বসন্ত হলে যেমন চিন্তিত হতে হয়, তেমনি। রোগের আক্রমণ তো এঞ্জিনীয়রবাবুর বাড়িতেই একা নয়, তাঁর বাড়িতেও রোগের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। সুপ্রিয়! এর জন্য সুপ্রিয়ই দায়ী। দুর্নীতির ক্যারিয়ার! জজবাবু ছোট ছেলেকে দোষী সাব্যস্ত করে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

—আজকালকার ছেলেমেয়েরা যে কী অদ্ভুত কেতা-দুরস্ত হচ্ছে—বাঙালিআনাটাই ছেড়ে দিলে! খানিকটা নিস্পৃহভাবে বললে পিনাকী।

—ওটা, জানেন, সিটি-লাইফের অভিশাপ! জজবাবু নিজ পরিবারের কায়দা-কেতার একটা সাফাই গাইলেন।

—যা বলেছেন! বিদেশ তো আর মাল রপ্তানি করতে পারছে না এখন, তাই ফ্যাশান রপ্তানি করছে।

আলাপটা এদিকে চলা নিরাপদ নয় ভেবেই জজবাবু তার মোড় এঞ্জিনীয়রবাবুর বাড়ির দিকে ঘুরিয়ে দিলেন,—বড়ো মেয়ের কী চিকিৎসা করাচ্ছেন এঞ্জিনীয়রবাবু? এ-ধরনের ন্যার্ভাস্ ডিস্অর্ডারের তো শুনেছি আজকাল ভালো-ভালো অষুধ বেরিয়েছে। ট্র্যাঙ্কুইলাইজার।

—উন্মাদের লক্ষণ ওটা না-ও হতে পারে। হয়তো নিছক ক্ষ্যাপামি! ছোট বোন ওর বরকে বিয়ে করল তাতে ক্ষেপে যাওয়াই তো স্বাভাবিক।

—তা চলুন না একবার ঘুরে আসা যাক্। পাড়ার আপদে-বিপদে খোঁজ-খবর না নিলে তো ওটা ভালো দেখায় না!

জজবাবু ভদ্রব্যক্তি। তা-ই অন্তত জানে পিনাকী। সামান্য পরিচয়েও তিনি এঞ্জি-নীয়রবাবুর বাড়ি যেতে পারেন। কিন্তু পিনাকী ও-ভদ্রতায় রাজি নয়। ভদ্রতার চাইতে আভিজাত্য বড়ো জিনিস। বীমাবাবু বা জজবাবুর বাড়ি সে আসে—জমির জন্যে তার কাছেই

তাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন, সে এক কথা আর তাছাড়া হালআমলের অভিজাত বলতে তো এ'দেরই বোঝায়। তাই এ'দের বাড়ি আসতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু তা বলে এঞ্জিনীয়র—যে কারিগরেরই একটা বড়ো সংস্করণ তার বাড়িতে পিনাকী যেতে পারে? সরকারের কাছ থেকে খেসারতের দ্বিতীয় কিস্তি বার করতে যে তাকে মাঝে-মাঝে উকিলের বাড়ি যেতে হয়, তাতেই তো তার মনে হয়, তার পূর্বপুরুষ নরকস্থ হলেন। তাই সবিনয়ে আপত্তি জানাতে গিয়ে একটা নাকিস্বর বার করল পিনাকী,—না। দেখুন, ওসব ব্যাপারে যেতে নেই। নেহাৎই ও'দের ঘরোয়া দুর্ঘটনা!

সত্যি তো! জজবাবুর মুখ যেন অন্যদিক থেকে আলোকিত হল। পিনাকীর সহানুভূতি দেখে অভিভূত হলেন তিনি,—ঠিক বলেছেন! আমরা উ'কি দিতে গেলে ও'রা আরো বেশি বিপন্ন বোধ করবেন।

যদিও ঘরোয়া আলাপেই পিনাকীর ঝোঁক ছিল বেশি, কেননা ঘরে ঢুকেই দুটি ছেলে-মেয়েকে যেভাবে আলাপে অথবা অন্যকিছুতে সে মগ্ন দেখেছিল, তাতে তার ভাবতে বাকি ছিলনা যে জজের এলাকাও দুর্নীতি থেকে মুক্ত নয়। ও অপবাদ যেহেতু জমিদারের এলাকারই ছিল—তা চারিয়ে যেতে দেখে মনে-মনে যে খুশী হয়ে ওঠেনি পিনাকী তা নয়। বেশ, কৌতূহল ও কৌতুকই অনুভব করে সে এসব ভদ্রঘরের কেলেঙ্কারির গন্ধ পেলে। তাই আবার সে সুপ্রিয়-সম্পর্কেই প্রশ্ন করল জজবাবুকে,—ঐ তো আপনার ছোট ছেলে? বেশ চালাকচতুর মনে হয় দেখলে!

জজবাবু কালো হয়ে গেলেন। যে-অপরাধীর রক্ত বহন করে তিনি অপরাধীর বিচারক হয়েছিলেন, তাঁর সেই পিতার অপরাধই যেন কালো ছায়া হয়ে তাঁর মুখে পড়ল এবার। তিনি আজীবন হয়তো নিরপরাধ থাকতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাতে কী হল? এ বোধহয় জার্মান পাণ্ডিত্যের একটা মহা-আবিষ্কার যে পিতামহ আর পৌত্র একই ধরনের হয়। হলেও তিনিই তো সে-রক্তের ক্যারিয়ার! একটু আগে সুপ্রিয়কে যে-ক্যারিয়ার আখ্যা দিয়েছিলেন তিনি মনে-মনে, এখন নিজেকে সে-আখ্যা না দিয়ে তিনি পারলেন না।

খুবই হ্রস্বীকৃত করলেন জজবাবু তাঁর বক্তব্য,—আজকালকার ছেলেরা যা হয়!

—কিন্তু আপনার বড়ো ছেলের তো খুবই প্রশংসা শুনেছি বীমাবাবুর মুখে—যেমনি আলাপী তেমনি গম্ভীরও।

সুব্রতকে ভাবলেন জজবাবু। বিদেশ ঘুরে এসেছে বহুবার তবু পিতৃভক্ত। কিন্তু বৌমার প্রতি কি তার আকর্ষণ আছে তেমন? নেই। ছেলে আর বৌ-এর ব্যক্তিগত জীবনে উ'কি দিতে চাননা তিনি কিন্তু প্রকাশ্যে যা দেখা যায় তা থেকে কি গোপনতার কোনো আভাসই পাওয়া যায় না? দুটি মাত্র মেয়ে সুব্রতর—আরো হতে পারত—হলে ক্ষতি ছিলনা। তাছাড়া ছেলের আকাঙ্ক্ষা তো সব বাপমায়েরই থাকে। সে আকাঙ্ক্ষাও যখন দেখা যাচ্ছেনা ওদের, তখন জন্মনিরোধের ধারায় না ভেবে ব্যাপারটা জজবাবু অপ্রীতির আলোতেই দেখছেন। তা নইলে বৌমা ইলেশন আর ডিপ্রেশনে ভুগবেন কেন? যাক্ ওটা সুব্রতই বুঝবে। তিনি পিতা হিসেবে পুত্রের কাছে যা আশা করেছিলেন, সুব্রতর কাছে তা পেয়েছেন। না পেলেও কি তাঁর ক্ষোভ করা উচিত ছিল? পাশাপাশি সুপ্রিয়কে ভাবলেন তিনি। সুপ্রিয়র যে তাঁর প্রতি কোনো শ্রদ্ধাই নেই—তার জন্যে তিনি দুঃখিত হন কিন্তু হওয়া কি উচিত? তাঁর নিজের কি কোনো শ্রদ্ধা ছিল তাঁর পিতার প্রতি? স্ত্রীর তেল-রং-এর ছবি আছে তাঁর শোবার ঘরে কিন্তু বাবার একটা ব্রোমাইড ফটোও নেই বাড়ির কোথাও।

অথচ বাবার নারায়ণগঞ্জের বাড়িতে নানা পোশাকের ছবি ছিল তাঁর। নারায়ণগঞ্জের মস্ত এক পাট-অফিসের বড়োবাবু ছিলেন বাবা। দু'লক্ষ টাকার পাট বিক্রি করে তিনি টাকা আত্মসাৎ করেন এবং গুদোম-ভর্তি শুকনো কচুরিপানায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে ইন্সিওরেন্স কোম্পানী থেকে টাকা আদায় করে চাকরি বজায় রাখেন। সে-টাকায়ই জজবাবুর প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্যে কলকাতায় এম-এ ল' পড়া এবং ল'তে ভালো পাশ করা। তারপর মুন্সেফি—সাবজজ—জজ। বাবার প্রতি শুষ্ক কর্তব্য করা ছাড়া আর কিছু কি করেছেন তিনি? কেনো শ্রদ্ধাই ছিলনা তাঁর বাবার প্রতি। অসাধু উপায়ে টাকা উপার্জনই শুধু নয়—সে-টাকার এক-চতুর্থাংশ তিনি ঢাকাতে এক রক্ষিতার পায়ে ঢেলেছেন। বিচারপতির মন নিয়েই তিনি মনে-মনে বাপ-সম্পর্কে এ-কথাগুলো স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারেন। আজ যদি বিচারপতির ছেলে সুপ্রিয় বাপকে ভণ্ড বলে—তাই নাকি বলে সে তার বৌদির কাছে—তাহলে বলতে পারে। আমি তো রক্তের ঋণ বহন করছিনে, সে করছে—জজবাবু নিজেকে শোনালেন।

কিন্তু পিনাকীকে শোনালেন অন্য কথা,—ওয়ান মাস্ট বি রোমান ইন রোম।

অর্থটা জানে পিনাকী কিন্তু সে-অর্থ সুব্রতর চরিত্র-ব্যাপারে কোন্‌দিক নির্দেশ করছে তা ঠিক ধরতে পারলনা। কাজেই স্মিতমুখে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না।

জজবাবুই অর্থটা পরিষ্কার করলেন জমিদার-নন্দনকে য়ুরোপীয় ইতিহাসে অনাধিকারী মনে করে,—রোমান-দেবতা জানুসকে জানেন তো? দু'মুখী দেবতা। যাঁর নামে জানুআরি মাস। তিনি যেমনি ভবিষ্যতের শান্তিতে চেয়ে আছেন তেমনি অতীতের সংগ্রামের দিকেও বিপরীত মুখে তাকিয়ে আছেন। সুব্রত প্রগল্‌ভ হতে জানে পেশারই খাতিরে আবার গম্ভীরও হতে জানে, কারণ অফিস-মাস্টার। ওর স্ত্রী-ও তা-ই।

পিনাকী ভাবলে, আপনিও কি তা-ই নন? ফলে হাসিটা পরিচ্ছন্ন করে বলল,—ও, তা-ই নাকি? কী জানেন, সবাই অল্প-বিস্তর তেমনি। মনে যা ভাবি, মুখে কি তা কেউ বলি?

অন্তত জজবাবু তো বলেন না। নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হতেই চাননা তিনি পারতপক্ষে। তাঁর অতীত শুধু তাঁর মৃতা স্ত্রী আর ভবিষ্যৎ—কোনো কমিশন আর নয়, কোনো কমিটির শীর্ষস্থানও নয় আর—শুধু সুব্রত—সুব্রতর আগে তার মৃত্যু। নিজের এই ক্ষুদ্র, হ্রস্বীকৃত ইতিহাসেই তিনি বসবাস করতে চান। শান্তিতে বসবাস? তা হয়তো নয়। তিনি এবার পরিবারের বাইরের এলাকায় চলে গেলেন,—না। কেউ না। দেখেছেন তো খবর, নেহরুর উত্তরাধিকার নিয়ে কেমন দলাদলি সুরু হয়েছে? সাধু কংগ্রেসীদের মনে এই ছিল কেউ ভাবতে পারত?

নিশ্চয়ই ভাবতে পারত। একি আর নতুন? ক্ষমতা দখল নিয়ে গান্ধীজীতে, সুভাষ বোসেতে দলাদলি হয়নি? জজবাবু তা বিলক্ষণ জানেন। তবু, শুধু নিজের বাইরে এনে মনটাকে ছেড়ে দেবার উদ্দেশ্যেই তিনি সেদিনকার খবরের কাগজের তিন কোলাম ব্যানার লাইনের খবরটার উপর মন্তব্য করলেন।

হাসল পিনাকী,—সাধুর দলে সাধুর ভেকধারী যে কতো তা কি আপনাকে বলে দিতে হবে?

কিন্তু পিনাকী বলল বলেই হয়তো ভেক ধরলেন জজবাবু,—যে-ই আসুন নেহরুর শূন্যস্থান কি পূর্ণ হবে?

কিন্তু এ-ধরনের ভেকের দরকার ছিলনা পিনাকীর। দা' হারালে যে সে কুড়োলের শোক করবে তা নয়। কোদালকে কোদালই বলতে চায় সে সব সময়। স্ত্রীকে সে বেণের মেয়ে বলতে ছাড়েনা আর নেহরুকে ছেড়ে দেবে? বললে সে,—না হলেও ক্ষতি নেই, হলেও বৃদ্ধি নেই, জজবাবু। গান্ধীজী নাকি বলেছিলেন জওহরলাল তাঁর উত্তরাধিকারী! সে-উত্তরাধিকারী গান্ধীজীর শান্তি অহিংসার এস্টেট্ রাখতে পারলেন? চৌ-এন-লাই সন্দেশ তো খেলুম—হিন্দী-চীনী ভাই-ভাইও কতো শুনলুম। কিন্তু যুদ্ধ তো করতে হল সে-ভাই-এর সঙ্গে! ও আমারি মতো উত্তরাধিকারী!

খুবই সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করলেন জজবাবু,—রাজনৈতিক নেতাদের এই দুর্ভাগ্য যে নিজের আদর্শকে বিনষ্ট দেখে তাঁরা মারা যান।

—আদর্শটা বিনষ্ট হয়ে প্রেতযোনী পায় কিনা! সজোরে হেসে উঠল পিনাকী।

জজবাবু হয়তো অসতর্ক হয়ে দর্শনের এলাকায় ঢুকে পড়েছিলেন, ভয় পেয়ে তিনি পেছু হটে এলেন। বললেন,—কিছুই না। শান্তি আর মৈত্রীর কথা তো বুদ্ধের আমল থেকেই চলে এসেছে—ও একটা ইউটোপিয়া!

—ঘরের মাগ কিলিয়ে বিশ্বের দরবারে গিয়ে শান্তি আর মৈত্রীর কথা বললাম—তার কোনো মানে আছে, মশাই? *প্রসেনজিৎ দেব পুত্রকে উত্তরাধিকার সূত্রে এস্টেটের সঙ্গে মেজাজটাও অন্তত দিয়েছিলেন—রাত্রির খোশমেজাজ আর দিনের বদমেজাজ। পিনাকীর মেজাজটা গরম হয়ে উঠল। কথা বন্ধ করলনা সে,—ভেক দিয়ে বেশিদিন লোক ভোলানো চলেনা। দুনিয়াটা বড্ড শক্ত ঠাঁই!

পিনাকীর উষ্মাটা জওহরলালের তর্পণ হিসেবে মেনে নিলেও ক্ষতি ছিলনা কিন্তু গরম কথাগুলো নিজের গায়ে মাখিয়ে নিয়ে জজবাবু ঘেমে উঠলেন। তিনি ভাবলেন, আজীবন তিনি বিচারকের ছদ্মবেশ নিয়েই আছেন—হাড়ে তিনি আসামী। নিজের কঙ্কালটাই তিনি চোখের উপর দেখলেন। সেই কঙ্কাল থেকেই আরো সব কঙ্কাল বেরিয়ে বলছে, সুপ্রিয় আর মলুয়ার গলায় বলছে, 'আমরা বিচারক হলে তোমাকে আসামী করব।'

হয়তো অস্ফুট আর্তনাদই করে উঠতেন জজবাবু—সুব্রতকে ডাকতেন, যদিনা ঘরে সে মুহূর্তেই একটি অপ্সরীর আবির্ভাব হত।

অপ্সরী চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞেস করলে,—মলুয়া আছে? শরীর বাঁকানো এমন ভঙ্গিতে যেন স্রোতে সাঁতার কাটছে। জামার যতোটুকু আছে আর শাড়িটা মনে হচ্ছিল ভেজা-ভেজা রঙের।

বৃদ্ধ আর প্রৌঢ় সেই কৈশোর-উত্তীর্ণার দিকে তাকালেন। মুগ্ধ যে হলেন না এমন কথা বলা যায়না। কারণ চোখ ফিরিয়ে নেবার আগ্রহ কারো ছিলনা।

তাই দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করতে হল মেয়েটিকে,—মলুয়া? আছে?

হঠাৎই যেন মনে পড়ল জজবাবুর, মলুয়ার এক বন্ধুর আসবার কথা আছে। মোহটাকে স্নেহবিগলিত করে বললেন তিনি,—আছে। এদিক দিয়ে চলে যাও উপরে।

উপরেই চলে গেল মেয়েটি।

তেরো

ছুটির একটা দিন আন-অফিসিয়্যাল কাজে গেল! যদিও কালও ছুটি—রোববার—

তবু আজ এখনো যখন সময় আর সুযোগ আছে ছুটির একটু আমেজ লাগাতে বাধা কী। সুব্রত তাই বেরোচ্ছিল। পাক্কা সায়েবের পোশাক। রাত্রির মতোই কালো ট্রাউজার-কোট, মোজা এবং জুতো। হোক্ না গরম। শার্টের উপর কোট সে ব্যবহার করে। যোধপুরে ক্লাব তো নেই—থাকলে হয়তো সেখানেও সে প্রবেশপত্র পেতো। যাচ্ছে সে ক্লাবেই কিন্তু তা-ও আন্-অফিসিয়্যাল। আড্ডা বলা-ই ভালো। সহকর্মীদেরই আড্ডা। অমিতাভ সরকারের শৌখীন আড্ডা-ঘরে। একটা নামও আছে তার, অবশ্য মুখে-মুখে, স্যাটারডে ক্লাব। আলাপ—পলিটিক্স অ্যান্ড পাবলিসিটি। দুটোই তো জনসাধারণের মন যুগিয়ে চলার ব্যাপার। কাজেই সুত্রান্বিত করা যায়। জুনিয়ারদের প্রবেশ নিষেধ—তাদের কেউ বা লাল কন্‌ফুসিয়াস মাও-ভক্ত, কেউ বা শাদা-লেনিন ক্রুশ্চফ-পরায়ণ। অবশ্যি অফিসারদের মধ্যেও যে তেমন-কিছু নেই বা ছিলনা তা নয় কিন্তু রং বদলে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে। 'লোককে নষ্ট বা আদর্শভ্রষ্ট করতে হলে তার হাতে টাকা দাও'—লুক বা মথি-লিখিত সুসমাচার নয়, ওটা সুব্রতরই কথা—মনে-মনে বলে অনেক সময়। বলতে হয়।

সুপ্রিয়, মলুয়া, আরেকটি মেয়ে পাশের ঘরে আড্ডা দিচ্ছে। বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়িতে যাবার সময় ঠিক ও-কথাটা নয়, ও-ধরনেরই আরেকটা কথা ভাবছিল সুব্রত। কালো পোশাকটার কথা, কালো রাত্রির কথা, এখনকার টুইস্টের কথা, টপলেসের কথা আর সেকালের মিস্টার হাইডের কথা। বিদেশীদের রাত্রির এই পোশাকটা খানিক যেন ট্রাইবেল নাচের মুখোশের মতো। ভিলাই-রুরকেল্লার পথে একবার সুব্রত ছউ-নাচ দেখেছিল। বীভৎস মুখোশ-পরা নাচ—হিংস্র জন্তু-জানোয়ার শিকার করতে হলে ও-ধরনের মুখোশের দরকার ছিল হয়তো অস্ট্রিক কালচার। হিংস্র পরিবেশে বীভৎস পোশাকই চলেছে তাই—চল্‌ছে। মিস্টার হাইডকে দুরাচারী হতে অষুধ খেয়ে মুখ বিগড়ে নিতে হতো—মুখোশের কাজ ফুরিয়েছিল, তারপর অষুধও নয়—ভাবলেই চলত নষ্ট মেয়েমানুষের কথা, বিগড়ে যেতো মুখ। মুখ না বিগড়ালেও বা কী আসে যায়? কালো পোশাকই তো আছে রাত্রির জন্যে। তারপর এ-ইঙ্গিত না থাকলেও চল্‌বে। শান্তির প্রতীক শাদা পোশাকেই হিংস্রতা চলবে অথবা রক্তধর্মপালন!

বাবাও বসবার ঘরে নেই। জমিদার-নন্দনের সঙ্গে ক্ষোভ-বিনিময় শেষ করে নিজের ঘরে গেছেন। নীচু তলায়ই তাঁর ঘর। এখন হয়তো নিজেকে বাবা নীচু তলার মানুষই ভাবেন। বৈষ্ণব বিনয়। ইটারন্যাল হিউমিলিটি? হতে পারে। মার ছবির দিকে তাকিয়ে মার কথা ভাববেন এখন। শান্তি। শান্তি? স্ত্রীর কথা ভেবে কোনোদিন শান্তি পাওয়া যায়? কী জানি!

এই তো সুব্রত স্ত্রীর কাছ থেকে এলো। মেয়েলি সন্দেহ, মেয়েলি উত্তেজনায় ভুগছেন মহিলা! সুপ্রিয় মলুয়াকে নষ্ট করে ফেল্‌ল! ওটা গেল তো গেলই—এখন মহুয়ার কী হবে? দিদির কান্ড দেখছেনা—বুঝছেনা কিছু? এঞ্জিনীয়রবাবুর মেয়েরা কী করেছে? কপালে চোখ উঠে গেল মহিলার!

সুপ্রিয় যে বাড়াবাড়ি না করছে তা নয়। সুব্রতও খানিকটা তাতে বিরক্ত। পাক্কা ওমেনাইজার হয়ে উঠছে সুপ্রিয়। শেষটায় থানা-পুলিশ পর্যন্ত না গড়ায়! তাহলে বাবার মাথায় বজ্রাঘাত হবে। ওটাই ভালো লাগছেনা সুব্রতর। বাবা বুড়োবয়সে অপমানিত হবেন, যন্ত্রণা ভুগবেন—ভাবতেই সুব্রত অন্য চেহারায় দাঁড়িয়ে যায়। ডক্টর জিকিল। বাবার যন্ত্রণার উপশম না হলে সত্যি তার ঘুম হয়না।

বাবার শান্তি নিয়ে বাবা এখন ঘরে। তাই ছুটি নিচ্ছে সুব্রত। নইলে অফিসের ছুটির দিনেও তো বাড়িতে তার ছুটি নেই। বাবাকে দেখতে হয়। বাবাও সপ্তাহের এই দুটো দিনের জন্যে উপোসী হয়ে বসে থাকেন। পুন্নামক নরকে? হাসল একটু সুব্রত।

গ্যারেজে গেল। গাড়ি ব্যাক্ করে রাস্তায় বেরিয়েই গেট হাট রেখে বাড়ি থেকে যেন ঊর্ধশ্বাসে পালাল সুব্রত। এক দৌড়ে স্টেশন রোডের মোড়। বাঁক। লেভেল ক্রসিং। ট্রেনের ঝামেলা না থাকলে ওপার। বাঁক। লেকের রাস্তা। বরাবর—বরাবর। বাঁক। লেক—তবু লেক। ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেনশান। বরাবর। দেশপ্রিয় পার্ক। ডান হাতি মেরুন দোতলা—থামো। অমিতাভ সরকার। পেতলের ডোর প্লেট। নীচতলায় গেরুয়া পর্দা সরিয়ে ঢুকলেই স্যাটারডে ক্লাব।

স্টীয়ারিং ধরে এ ছাড়া আর কিছু ভাবলে না সুব্রত। অন্য কিছু ভাবা উচিতও নয়। হাজার প্রণয়িনী থাকলেও গাড়ি নিয়ে কলকাতার রাস্তায় বেরোলে তাদের ভুলে থাকতে হবে।

প্রণয়িনী! গাড়ি লক করতে করতে শব্দটা বোধহয় উচ্চারণ করলে সুব্রত! এডিথ্! টাইপিস্ট গার্লের চেহারাটা মনে এলোও হয়তো একবার। কুর্গের মেয়ে! পশ্চিমী জিপ্সী-জিপ্সী চেহারা! বলে : গোয়ানিজের চাইতে ও না কি ভালো রান্না করতে পারে! প্রলুব্ধ করবার মেয়েলি কৌশল! সেকেলে যদিও। কফিটা চমৎকার করে—স্টাফ্ড্ চীকেনও মন্দ না—ফ্রাইড্ রাইস্। মুখের ভেতর জিবটা নড়ে চড়ে উঠল সুব্রতর পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকবার সময়!

অমিতাভ ছাড়া দ্বিতীয় মুখ যাকে দেখা গেল সে পেট্রলের পাব্লিসিটি করে। প্রভাস সমাদ্দার। অমিতাভ কোনো এক রেল-রাস্তায়। যাত্রী বাড়াবার জন্যে তীর্থের ইতিহাস জানতে হয়েছে তাকে এবং আড্ডা জমাবার জন্যে সতীর্থের ইতিহাসও। যদি পাব্লিসিটিকে তীর্থ বলা যায়। বিদ্যাস্থানই তো তা একরকম—বলা যাবেও বা না কেন?

সুব্রতকে দেখেই অমিতাভ ধোঁয়াটে গলায় বলে উঠল,—হ্যালো—ডিস্‌হেভেল্ড্ হেয়ার—রাইট ফ্রম্ এডিথ্স?

বন্ধুবান্ধবদের ইনটুইসান যে কী ভীষণ তা ভেবে একটু হাসল সুব্রত। এবং সহ-ধর্মিতা পালনের অভিপ্রায়ে পকেটের সিগারেট টিন বার করে খুঁটে একটা সিগারেট ঠোঁটে তুলল।

চুলটা সত্যি এলোমেলোই সুব্রতর। ওটা স্বভাব। হতে পারে এক কালে যে সাহিত্যে-টাহিত্যে মন ছিল, তারই রেশ রয়ে গেছে।

ঘরের দুই কোণে কাশ্মিরী টেবিলের উপর ফুলদানী—বাজারে-কেনা ফুলেই সাজানো। ল্যান্সডাউন রোডের উপর বাগান করবেন তেমন শৌখীন অমিতাভর বাবা ছিলেন না। অ্যাডভোকেট। ফুলের গন্ধের চাইতে পুরনো দলিলের গন্ধই তাঁর ভালো লাগত। বাড়ির সামনে যতোটুকু জায়গা তা রেখেছিলেন শাঁসালো মক্কেলদের গাড়ি পার্ক করবার জন্যে। গোল হয়ে তিন-বন্ধুতে যে জায়গাটায় বসল তাতে কাশ্মীরী গালিচা নয়, সাধারণ জুট-কার্পেট। ধূমপান চলে, পানীয় চলে না। তা-ও, অমিতাভ চেন-স্মোকার বলে দিশী গোল্ড-ফ্লেকের উপরে ওঠেনি। এ'দের সবারই বাজেটে চলতে হয়। তাই পরিমিতিজ্ঞান হারায়নি।

প্রভাস বল্লে,—কে বলেছিল—ওমর খৈয়াম না হাফিজ, বন্ধু-বাগান-বই-এ স্বর্গ তৈরী হয়?

—আমরা সেই স্বর্গের কাছাকাছি চলে যাই প্রতি শনিবার—আবার ঠোঁটের সিগারেট কাঁপিয়ে অমিতাভর ধোঁয়াটে গলা,—তা-ই না? কিন্তু সাকী কোথায় সুব্রত?

—সিলি!

—পাল্টে বললেই অমিট্ রায়ের বোন হয়ে যেতো! প্রভাস নিবু-নিবু চোখে বললে।

অমিতাভর বোন নেই বলে এ-ধরনের রসিকতা চলে।

কিন্তু ও-রসিকতায়ও সুব্রত খুশী হল না। এডিথ্ মুছে গিয়ে তার মনে এখন জন-সংযোগের ছায়া পড়ছিল—তা যেমন রাষ্ট্রনৈতিক, তেম্নি তার চাকরির অন্তর্গত বিষয়। চুপচাপ সিগারেট টেনে চলল সুব্রত।

প্রভাসের কথাটাকে অমিতাভ কিন্তু পাকা শিলপ-খেলোয়াড়ের মতো অনায়াসে লুফে নিল,—অমিতাভর বোন থাকলে অমিতাভর বাবা গৌরীদান করে যেতেন। জানো তো জজ আর উকীলদের জন্যেই ব্রিটিশ আমল তক্ মনুসংহিতা বেঁচে বর্ত্তে ছিল!

সুব্রত মিহি হাসিতে তার লম্বাটে মুখটা প্রায় হ্যামলেটের মতো করে তুলল। অমিতাভর কথায় পিতৃদ্রোহের আভাষেই হাসতে লাগল সুব্রত। সে নিজে পিতৃদ্রোহী নয় বলেই শুনতে মন্দ লাগল না কথাটা। সুপ্রিয়কে ভাবল সুব্রত। পিতৃদ্রোহী। সে বিরক্ত সুপ্রিয়র প্রতি। কিন্তু বিরাগটা কি আহত অনুরাগই নয়? ঠিক যেমন বাবার অবস্থা। বাবার স্বভাবই উঁকি দিয়ে যাচ্ছে তার স্বভাবে। একটা বয়সে মানুষ হয়তো পিতৃস্বভাবে আসে। নইলে আর 'হেরিটেজ' কথাটা আছে কেন? বাবা যেম্নি জওহরলালের নিন্দা করবেন না—অথচ নিন্দা শুনতে ভালোবাসেন। ওই জমিদার-পুত্রের সঙ্গে এতো ঘনিষ্ঠতা তো তারই জন্যে। জওহরলালের নিন্দা শুনবেন। যা বাচনিক স্তুতি চলেছে বাংলাদেশে জওহরলালের—তার চাইতে নিন্দা ভালো! বিষকুম্ভ পয়োমুখ! সুমিত্র বেশ বলে, বাংলা-দেশের ছেলে হয়ে ভাই, বিষপান করে নীলকণ্ঠ হয়ে আছি! উন্মাদ, উন্মাদ। সারা কলকাতাটাই লুম্বিনী পার্ক। সেকালের কুইনিনের মতো ট্রাঙ্কুইলাইজার প্রচার করা দরকার। সান্ন্যাল যদি থাক্‌ত! কমলেশ সান্ন্যালের আশায় গেরুয়া পর্দার দিকে তাকাল সুব্রত। অষুধ-কারখানার প্রচার-সচিব সান্ন্যাল। সান্ন্যালকে বলা যেতো, হাতের কাছে পেলে, ট্রাঙ্কুইলাইজারের প্রস্পেক্টের কথা।

পেট্রল-গ্যাসোলিনের প্রচার-সচিব প্রভাস একটু গ্যাস পেলো অমিতাভর কথায়। আবার দপ-দপ করে উঠল সে, সুব্রত আজ সম্ভবত মালাবার উর্বশীর চিন্তায়ই মগ্ন—

—হাঁ—হাঁ করে ধোঁয়া ছেড়ে বললে অমিতাভ—সিগারেটটা অ্যাশ-ট্রেতে ফেলে,—চুল তোমার যতো এলোমেলোই করো, সুব্রত, ওই বিদেশিনীকে কীলার করে তুলো না।

—না-না—সে-ভাবনা নেই। কথা বলল সুব্রত।—আপাতত আমি কংগ্রেসের আপ-অফিসিয়াল পাব্লিসিটি অফিসার সান্ন্যালকে ভাবছি!

হাত উল্টে ঘড়ি দেখল অমিতাভ,—আটটা সাত। হুঁ, আট মিনিটের মধ্যেই এসে যাবে।

কমলেশের আশঙ্কায় একটু ম্রিয়মান দেখালে প্রভাসকে। সে আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের তেল নিয়ে ব্যস্ত বলে ট্রেড-ইউনিয়নকে তেল দিতে পারে পণ্ডিতজীর উট্‌কো সমাজতন্ত্রকে নয়। ইউটোপিয়ায়ই ভুগে গেলেন জওহরলাল আর আমাদেরও ভুগিয়ে গেলেন। এই ভোগান্তির কথা বললেই ক্ষেপে ওঠে কমলেশ। আবাদী কংগ্রেসে তো অষুধের কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা ছিল না—কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী হতে ক্ষতি কী কমলেশের। কিন্তু আট মিনিট সময় যখন এখনো আছে, ফর্সা হয়ে উঠে বললে প্রভাস,—কে জানে দিল্লী দৌড়ুলো

কি না! 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্'—মন্ত্রে তো এখন কংগ্রেস-মঞ্চে হৈ-হৈ।

দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে অমিতাভ বল্‌লে,—মঞ্চ তো অভিনয়ের জন্যেই রে বাবা! আর তা মূক-বধিরের অভিনয় নয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কথা বলতে শিখিয়ে গেছেন, জওহরলাল শিখিয়ে গেছেন বাচাল হতে। গুরু, গুরু। সবাই গুরু। 'মূকং করোতি বাচালং'—শোলোকটাও জানো না, সায়েব? ইরাণ ঘুরে ফিনিশিং টাচ্ নিয়ে এসেছো!

—ইলেক্‌ট্রিক-ট্রেনের প্রেমেই দু'বাহু তুলে নাচছ—ইরাণ ঘুরে দেখে এসো আগে!

—ওখানে গিয়ে তো ট্রাফিক-পুলিশের মতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে মোটর গাড়ি গুনেছ! পেট্রোল নিচ্ছো আর দিচ্ছো!

দুই বন্ধুকে শুনছিল চুপচাপ সুব্রত। আট মিনিট শুনতে হবে। সিগারেটের তাপ লাগছিল ঠোঁটে। অ্যাশ্-ট্রেতে ভিজিয়ে দিলে সে সিগারেট। অ্যাশ্-ডে আজ। স্যাটারডে। অ্যাশ্ ওয়েডনেসডে নয়। তবু টি.এস. এলিঅটকে মনে পড়ছিল তার। অ্যাশ্ ওয়েডনেসডে : But when the voices shaken from the Yew-tree drift away|Let the other Yew be shaken and reply—জওহরলালের আব্‌ছা ধূসর গলা মনে পড়ল সুব্রতর। মর্মরধ্বনি! যেন আসতে আসতেই মিলিয়ে যেতো। মিলিয়ে গেল এবার চিরকালের মতো। স্তব্ধ সেই বৃক্ষ। তার ছাই পড়ে আছে। অ্যাশ্-ট্রেতে তাকালো সুব্রত। সেই মর্মরের উত্তর কোন্ বৃক্ষে পাব আর? আবছা হয়ে গেল যেন সুব্রতর দৃষ্টি আর শ্রুতি।

চৌদ্দ

রেডিয়ো-ফটো, টেলিপ্রিন্টারের কাটা কথা, দিল্লীর রাষ্ট্রনৈতিক সংবাদদাতার নোটে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আকণ্ঠ ডুবে ছিল অভিজিৎ কাল। অ্যাশ্-স্যাটারডের খবরটাকে সাহিত্যিক নক্সায় দাঁড় করিয়ে আজকের ম্যাগাজিন সেক্‌শনের ফীচার তৈরী করে তবে তার ছুটি হল। খাওয়া-দাওয়া ওখানেই প্রচুর হয়েছে, ঘরে এসে যা পানীয় কাগজ-ডোবা কণ্ঠে ঢালা। শুধু প্রোটিন হজমের জন্যে, সুনিদ্রার জন্যে—উত্তেজনার জন্যে মোটেও নয়। ওল্ড ওয়াইফের সঙ্গে যুবজনোচিত ব্যবহার করেই তো শেষ হয়ে গেছে! ওল্ড ওয়াইফের জন্যেই ইউলিসিস যাযাবর! মন্দ ভাবেন নি লর্ড টেনিসন!

সুনিদ্রা হয়েছিল—একটা থেকে পাঁচটা। তারপর আর না। 'অ্যাশ্ স্যাটারডে' প্রবন্ধের লেখক পাঠক-মনের তাড়া খেয়ে আর ঘুমুতে পারেনি। তাছাড়া সকালেই তার দৌহিত্র হবার খবর আসতে পারে। রাত দশটায় পারমিতা ম্যাটারনিটি হোমে গেছে। ভাগ্যিস্, সে-হুলুস্থুলুতে অভিজিৎ বাড়ি ছিল না! খবরটাও স্ত্রীর মুখ থেকে ভালো করে শোনেনি সে—হয়তো আলতো নেশায় বা ঘুমের জড়িমায়। সুনিদ্রার পর মনে পড়ছে এক-এক করে রাত্রির ঘটনাগুলো।

দৌহিত্র! রেডিয়ো ফটোটা ভেসে উঠল অভিজেতের চোখের উপর! রাজীব-সঞ্জয় মাতামহের চিতাভস্ম কুড়োচ্ছে। আরেকটা ফটো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লনে একটা গাছের নীচে সোফায় মাল্যভূষিত ভস্মাধার রাখছেন। ভস্মাধার! সিন্ধুসভ্যতা থেকে নীত গ্রীক-প্রথা। একটা 'ওড টু ইন্ডিয়ান আর্ণস্' লেখা যেতো!

'অ্যাশ্ স্যাটারডে' প্রবন্ধটা মনে এলো অভিজিতের। বিছানা ছেড়ে উঠল সে। স্ত্রীর প্রসাধনের কৌচে গিয়ে বসল। ঘরের ধূসর আলোয় ছাই-রং-এর ছায়া পড়ল আয়নায়

কিন্তু সেদিকে চোখ ছিল না তার। মশারির নীচে স্ত্রীর ঘুমন্ত দেহ থেকে চোখ ম্যাটারনিটি হোমের কতোগুলো অদৃশ্য দেহের উপর যেন বিতৃষ্ণা ছড়িয়ে দিল। তিন মূর্তি!

'তিন মূর্তি মার্গে প্রধান মন্ত্রীর বাড়িই নেহেরুর স্মৃতিসৌধ হবে'—দিল্লীর সংবাদ-দাতা।

রেডিয়ো-ফটোর তিন মূর্তির কথা ভাবল অভিজিৎ। ইন্দিরা-রাজীব-সঞ্জয়! কৌচ! অভিজিৎ উঠে দাঁড়াল। একটু চা হলে ভালো হত এখন। যাবে বাবার ঘরে? হিটারে চা করে নেবে? বাবা-মাকে না জাগিয়ে?

ব্রাশে পেস্টের ফিতে জড়িয়ে নিয়ে মুখে পুরে দিল অভিজিৎ। দিশী পেস্টে তার বমি-বমি হয়। অ্যালকোহলিক গন্ধ যতোটুকু বা ছিল মুখে ফরহান্স তা পরিস্কার করে দিলে।

বাথ-রুম থেকে এসে অভিজিৎ রোববারের জন্যে তৈরী। আলোর বয়স এক ঘণ্টা হয়ে গেছে তখন। দৌহিত্রের বয়স যদি আট ঘণ্টাও হয় অথবা যমজ দৌহিত্র—ক্ষতি নেই। কিন্তু মনের আরেকটু মেরামত দরকার। চা। ভালো চা। রাত্রিতে বাবা নার্সটাকে রাখেন না! ওদের হাতের চা-ই আলাদা। কিন্তু কে করবে এখন তেমন চা? অভিজিৎ নিজে? তাহলেই হয়েছে আর কি!

ছুটি-মনে সেলারে এলো অভিজিৎ। চার অভাবে মদ্য। মন্দ কী?

'জওহরলাল নেহরু জিন্দাবাদ'—মৌলানা আজাদ-সঙ্ঘের ব্যানারে লেখা ছিল কাল ময়দানে। আজকের দিনে বোধহয় সবাই মৃত্যুর পরও অস্তিত্ব মানেন। অস্তিত্ববাদের চিন্তা সবার মাথায়। স্মৃতি থাকলেই অস্তিত্ব আছে। স্মৃতিসৌধ নয়। কারো মনে স্মৃতি হয়েই মৃতরা বেঁচে থাকে। নট্ এ ব্যাড্ আইডিয়া! দেখতে গেলে গোড়ায় সেই প্রেম! জওহরলাল যা বিশ্বাস করতেন! সত্যি, হি ওয়াজ এ লাভেব্‌ল্ পার্সন! কতো ফারাক গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর—কিন্তু গান্ধীজী কি তাঁকে ভালো না বেসে থাকতে পেরেছেন? আর এই ময়দানের মুসলমানরা। সত্যি যেন তাঁরা একটা বড়ো-কিছু হারিয়েছেন—তাই হারাতে চাচ্ছেন না—হারালে যেন ফতুর হয়ে যাবেন—তাই 'জওহরলাল নেহরু জিন্দাবাদ!'

জিনের বোতলের ছিপি খুলল অভিজিত—গ্লাসে ঢালল। জিনে মুখে অ্যাল-কোহলিক গন্ধ হয় না। কিন্তু সকালবেলা সুরা-পানে সে কি অ্যালকোহলিকের উপসর্গ দেখাচ্ছে না? রোগী! অবশ্যি তেমন বেহিসেবী এখনো নয় সে, যাতে মস্তিষ্ক কাজ বন্ধ করে বসে থাকবে। সামান্য নেশায় একটা হারানোর ব্যথা আসে। পান-শেষে সোফায় এসে বসল অভিজিৎ।

ভস্মান্ত শরীর! কোথায় কবে যেন শুনেছিল অভিজিৎ কথাটা—অথবা পড়েছিল। এখন মনে এলো। কোন্ শরীরটা আসল? হয়তো ভস্মান্তই। গন্ধ নেই। শরীরের গন্ধ! ওটাকে মানুষ ভালোবাসতে পারে না। যখন ছাই হবে মিশে যাবে নিসর্গে—তখনই নিসর্গের শত্রু মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে—মনে আনবে, মনে রাখবে। কে ভোলে শত্রুকে? ঈশ্বরের মতোই অবিস্মরণীয় শত্রু। তাই তো নিরীশ্বর গৌতম বুদ্ধের মৈত্রী প্রচার!

কিন্তু কে বলেছিল 'ভস্মান্ত শরীর'? কে? কাল শুনেছে সে? না, আরো অনেক আগে? অনেক আগে হলেও কাল যেন মনে-মনে শুনেছে। 'অ্যাশ্ স্যাটারডে' লিখবার সময়। তুমি যা মনে-মনে ভাবো অন্য কেউ হয়তো তা মুখে বলে ফ্যালে। 'দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্যাট লাভ্ ক্রীপ্‌স্ ইন। মৈত্রী। জওহরলাল আমাদের মনের অনেক কথা বলে

ফেলেছেন। সাধে উই লাভ্ হিম?

ও! ঠিক মনে পড়েছে। ওই মেয়েটি। যে মাঝে-মাঝে আসেন এডিটরের কামরায়। ম্যাগাজিন সেক্সনে 'বার্ডস্ আই ভিউ'-ও লেখেন মাঝে-মাঝে। পৃথিবী পর্যটন করেছেন। বার্ড। ঠিক নামই নিয়েছেন। নীৎশে মেয়েদের পাখীই তো বলতেন। দেখে মনে হয় ফঙ্। জংলী পাখী। কী যেন নাম? জুলফির চুলকে সরু করলে অভিজিৎ। নামটা? অবশ্যি পাখীর নাম নয়। হাসল একটু অভিজিৎ। এইতো মনে পড়েছে! শুক্লা। ফর্সা হয়ে উঠল অভিজিৎ খানিকটা। কিন্তু উপাধিটা মনে পড়ছে না। পুরনো কাগজ খুঁজলেই হবে। যাক গে। কাল তার ফীচারের প্রুফে চোখ বুলোচ্ছিলো মেয়েটিও। অভিজিতের প্রবন্ধের শিরোনামায় এসেই বোধহয় বলে উঠেছিলেন : 'ভস্মান্ত শরীর।'

শরীর সম্পর্কে এখনকার মেয়েদের একটা গ্লানি এসে গেছে না কি? আসতেও পারে। অন্তত আসা তো উচিত।

এক শিপ্ নেবে এখন? শ্যাম্পেন? ত্রিকোণ টেবিলে তাকাল অভিজিৎ বোতল প্রায় খালি। না, থাক্। রাত্রিই শ্যাম্পেনের সময়।

মহিলাদের কথা ভাবলেই তা ভুলতে মদের দরকার হয় অভিজিতের। শ্যাম্পেনে যখন গেলনা সে, মহিলাতেই ফিরে এলো। শুক্লাতে! পিঠটা দেখতে ভারি সুন্দর মহিলার। প্রবন্ধের লেখকের সঙ্গে পরিচয় হল। বাষ্ট-ও দেখতে ভালো। ভালো তো কতোই দেখা যায় আর মুখের পরিচয়ও তো হয় কতো মহিলার সঙ্গে! তাতে কী? কিন্তু শুক্লাকে যে হঠাৎ মনে পড়ল? ওই 'ভস্মান্ত-শরীরে'র জন্যে।

কী লিখেছে সে? প্রথম প্যারাটা মনে আনতে চেষ্টা করল অভিজিৎ। নিজের রচনা তার মনে থাকে না, যেমন নবিশী কবিদের থাকে। তবু চেষ্টা করল। সপ্তাহের শেষ—যাত্রার শেষ দিয়ে সুরু। চিতাভস্ম থেকে ফিনিক্স উঠল—পাখা মেলল। তার আসল সত্তা। তারই সুরু হবে যাত্রা এখন। এ আন্তর্জাতিক নেহরু নয়—অ্যাশেস্ অব রোজেস্ নয়—নির্গন্ধ ভারতের জহর! অন্ধকার অতীতের আলো। শান্তি, মৈত্রী। যে পণ্ডিতজীকে আমরা ভালোবাসতাম তিনি জীর্ণবাস ত্যাগ করে এইতো নববাস গ্রহণ করলেন। ভারতের জলে-স্থলে ছড়িয়ে দাও আমাকে—আন্তর্জাকিতার পোষাক খসে পড়ল। এ তাঁর ভস্মান্ত শরীর।...

মাথা চুলকোল অভিজিৎ। মনে পড়ছে না ঠিক। মহিলার উপাধিটা ঠিক মনে পড়ছে না। উপাধি সহই নিজেব পরিচয় দিয়েছিলেন। একটু সম্ভ্রম এলো মেয়েটির প্রতি অভিজিতের। বোধহয় বলেওছিলেন যে, এডিটরের সঙ্গে তাঁর লন্ডনে পরিচয়। তবু ভালো, সোভিয়েট রাশিয়ার কোথাও যে নয়! হলেও অবশ্যি অভিজিৎ মেয়েটিকে সম্ভ্রান্ত অ্যাশ্ট্রোণটীই ভাবতো—আর-কিছু নয়, পাখী-টাখীও নয়, এয়ার-হোষ্টেসও নয়। সবার চোখে অভিজাত!

হঠাৎ কাঁধ নাড়িয়ে নড়ে-চড়ে বসল অভিজিৎ। যদি 'বার্ডস্ আই ভিউ' দেখা যায় আজকের কাগজেও? নিরুপায়! কী করতে পারে অভিজিৎ যদি শুক্লা বলে বসেন, শান্তি-নিকেতনের আচার্য্য ঋতুরাজ জওহরলাল তাঁর হাতে ছাতিমপাতা দেবার সময় গোলাপ-হাসি হেসেছিলেন! নিজেকে আলোর সামনে আনার এইতো মহা সুযোগ!

যাক্—গোলাপ-হাসি হাসতে পারেন জওহরলাল কিন্তু রকওয়েলের ফটোগ্রাফেই পণ্ডিতজীর ভস্ম রং ছিল। এবং মুখ, যে-মুখ সিংহলের আঁকা গান্ধীজীর মুখের

উত্তরাধিকারী। সাধারণ মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য যাঁরা চাইবেন, তাঁদের মুখে হাসি থাকতে পারে? ময়দানে পায়রা উড়োবার দিনে শাদা পোষাকে যে তিন মূর্তি শাদা হাসি হেসেছিলেন: নেহেরু, ডক্টর রায়, ক্রুশচফ—তা কি তাঁদের আসল চেহারা? স্বপ্নের হাসি। শিশুর দেয়ালা!

উঠে পড়ল অভিজিৎ। বেশ ফর্সা হয়ে গেছে তো! মেটারনিটি হোমে খবর একটা টেলিফোন—ভৃত্যবাহাদুর দয়া করে উঠে থাকলে এক কাপ চা—কাগজ—ম্যাগাজিন সেক্সন নয়, ফ্রন্ট-পেজ-নিউজেই মন দেয়া যাবে। পর-পর কাজগুলো মনে গুছিয়ে নিয়ে বারান্দায় এলো। সত্যি ততোটুকু ফর্সা হয়েছে কিনা যখন চা দেওয়া হবে—তা-ই দেখতে।

এম্নি ফর্সা হয়ে গেলেই রোজ ঘুম থেকে ওঠে অভিজিৎ। আবার সে সেলার মুখো হল টেলিফোনে যাবে বলে। কিন্তু ম্যাটারনিটি হোমটা কোথায় সে তো জেনে নেয়নি। জানবার ইচ্ছেই হয়নি কাল রাত্রিতে। স্ত্রীর খোঁজেই যেতে হবে আবার।

থাক্—নীচে তো নেমে আসবেনই মহিলা স্বামীর চায়ের সময়। মনে অশান্তি থাকলেও কর্তব্যগুলো ঠিক করে যায়!

ফিরে এলো আবার অভিজিৎ তার কৌচে। জয়ন্তরই টেলিফোন করা উচিত। হিসেবী মানুষ! কাজেই টেলিফোনের দায়িত্ব থেকে অভিজিৎ নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে এলো।

মুক্তি চাইল যেন মাতামহ হবার দায়িত্ব থেকেও। স্বামীর দায়িত্ব থেকে—পিতার দায়িত্ব থেকে, পুত্রের দায়িত্ব থেকে। একা। মন্দ কী? যেম্নি গান্ধীজী এক সময় একা হয়ে গিয়েছিলেন, জওহরলালও যেম্নি মাঝে-মাঝে একা হতে চাইতেন।

আবার উঠল অভিজিৎ। বোধহয় জিনের মাত্রাটা খুবই কম হয়েছে তার। নেশাগ্রস্ত মন ছাড়া বোধহয় একা থাকা যায় না। অভিজিতের দরকার নেশাগ্রস্ত শরীর। পেগ-গ্লাসে ভর্ত্তি করল সে জিন।

যে-কোনো সময় টেলিফোন বেজে উঠতে পারে। তখন একটা নতুন ভূমিকায় ফিরে আসতে হবে। পারমিতার ছেলের মাতামহ!

আত্মহত্যা কামনায় মানুষ যেম্নি ক্ষিপ্র, কম্পিত হাতে বিষপাণ করে, অভিজিৎ ঠিক পেগ-গ্লাসটা নিয়ে তা-ই করল।

এবার মৃত্যুর অপেক্ষা। চুপচাপ হয়ে বসতে পারল সে কৌচে। মৃত্যু—ছুটি, সব-কিছু ভূমিকা থেকে ছুটি। আসল সত্তায় চলে আসা। আর নকল চেহারায় চলবার দায় নেই। কারো জীবনের শরিক নই, নিজের জীবনেরও না।

এখন ভারতের গোলগোথায় কী হচ্ছে? নিউ দিল্লীতে? গান্ধীজী তো ক্রুশিফায়েড হলেন—সেন্ট পল, সেন্ট জন, সেন্ট পিটার একে-একে দেহরক্ষা করলেন সেখানেই। শান্তির বাণীতে শান্ত বিশ্ব তৈরী হল? অথবা শান্ত কি অন্তত সেই বধ্যভূমি?

সেন্ট জন! জনি! জনি ওয়াকার গ্রোয়িং স্ট্রং টিল ভুবনেশ্বর কংগ্রেস।

সিগারেটের খোঁজে বুশ-শার্টের বুক পকেটের উপর হাত বুলোল অভিজিৎ—না, বুকে পেন নয়। হলে মন্দ ছিল কী? বারোটার মধ্যেই ছুটি নিতে পারত। নিজের মুখোমুখি দাঁড়াবার যন্ত্রণা থেকে ছুটি!

পনেরো শ' টাকা মাইনে পেলেই কি যন্ত্রণা থাকে না? স্ত্রী-পুত্র-পৌত্র বাড়ি, ব্যাঙ্ক-আমানত থাকলেই যন্ত্রণা থাক্‌বে না? যার যার কারায় সে সে বন্দী। প্রহরীহীন কারা-কক্ষ। চাবি কিন্তু নিজেরই হাতে। তবু কেউ দরজা খুলে মুক্তি চাইবে না। যন্ত্রণা থেকে

চাইবে না মুক্তি।

কে করবে তাদের মুক্ত? বুদ্ধ, যীশু, গান্ধীজী, পণ্ডিতজী? তাঁরাও কি মুক্ত? তাঁদের মুক্তি দিতে পেরেছি আমরা? বেঁধে রাখতে চাচ্ছি। পঙ্গু ভালোবাসা দিয়ে বাঁধতে চাচ্ছি সবাই। প্রেমে! প্রেম—

মল্লিকা! কোথায় যেন একটা শব্দ শুনল অভিজিৎ। ধ্বনিহীন শব্দ। যৌবন-যন্ত্রণা? হাসল অভিজিৎ! হাসতে লাগল। ভাগ্যিস শুক্লা নামটা কোনো ফুলের নাম নয়। কিন্তু শাড়িটা ছিল যেন ফুলন্ত লতা। বোম্বে অ্যামব্রয়ডারি! বোম্বে কি আর যায়নি মহিলা? সেখানে কাউকে দেখলে মনে হয় না, তার জন্ম ভারতে? সিগারেটের নেশায় ঠোঁট চাটতে সুরু করল অভিজিৎ।

সন্ত্রস্ত ভৃত্য চা নিয়ে ঢুকল তখন। পেছনে নম্র আলোতে সঞ্চারিণী গৌরী।

পনেরো

গড়িয়াহাটায় সে-সকালে বাংলা দৈনিক হয়তো একমাত্র পিনাকীর বাড়িতেই খুশীর হাট বসিয়ে দিয়েছিল। যেন হাটখোলার ডাকসাঁইটের প্রসেনজিৎ দেবই মরদেহে তাঁর মজলিশ ঘরে এসে বসেছেন আবার এবং সময়টা সকাল আটটা মোটেও নয়, রাত আটটা। পানীয় বিলিতি সুরা নয়, আনন্দরস আর ইয়ার হেদোর ধারের হাঁদুবাবুর মতো রসিক কেউ নন —স্নায়ুরোগগ্রস্ত দুজন বালক, দুলু-বুলু।

হাঁদুবাবুর মতো হাত নেড়ে মুখ ভেংচিয়ে পিনাকীই দুলুবুলুতে হাসির হিক্কা তুলছিল। ছেলেগুলো সব সময় মুখ-গোমরা, আজ হেসে বাড়ি মাথায় করছে—মাধুরী তাই দরজায় দাঁড়িয়ে খুশী-খুশী মুখে কুমারী-স্মৃতি মনে এনে উপভোগ করছিলেন।

কৌমারহর পিনাকীর কোলে বাংলা দৈনিক খোলা। যদিও কাগজটা মাধুরীরই বয়সী তবু তাকে উরুতে রেখে পিনাকীর মনে যেন জীবনের প্রথম আনন্দ-স্মৃতি উথলে উঠেছিল।

পিনাকী গল্প বলছিল ছেলেদের কাছে: বাবার সঙ্গে কাশী গিয়েছিলুম একবার। গানের আসর জমত আমাদের কাশীর বাড়িতেও। ওস্তাদ মিঠেলাল আসতেন। আসরে কে এক বাঙালী ভদ্রলোক বাবাকে সারনাথে যাবার কথা বললেন। শুনে বাবার সে কী হাসির ধমক! বললেন: আপনি কি মশায় আমাকে জ্যান্ত চিতায় পাঠাতে চান? আমি কিন্তু ভারতবর্ষের সে সব শেঠদের কেউ নই যাঁরা চিতায় চৈত্য তুলে গোটা দেশটাকে সমাধি-তীর্থ করে গেছেন!

বালকরা পিতামহর গোঁফ-ওয়ালা চেহারাটার সঙ্গে সার্কাসের বাঘ-খেলোয়ারের চেহারার মিল পেয়েছিল, তাছাড়া মার কাছে শুনেওছিল, ঠাকুর্দা সোঁদরবনে বোটে বেড়াতে যেতেন। ফলে এন্তার শিকার-কাহিনী পড়ত ওরা—ভয়ে হিমসিম হত—স্নায়ু আরো অসাড় হত। বাবার মুখে যা শুনছে সে তো আর ঠাকুর্দার বাঘের এলাকায় যাবার কথা নয়, তাছাড়া বাবা যা ভঙ্গি করছেন তা যেম্নি নতুন, তেম্নি মজাদার, তাই দেদার হাসছিল ওরা।

—সমাধিতীর্থ? কথাটায় দুলুরও একটু খটকা লাগল।

—চার্চ দেখিস নি? চার্চ আর কি! বললে পিনাকী,—আমার তো ভয় ছিল নেহেরু চাচার ছাই কুড়িয়ে শেষটায় চার্চের বেল বাজানো হবে! নিদেনপক্ষে বৌদ্ধ মন্দিরের

জয়ঢাক। দেখা যাচ্ছে তা নয়! বাঁচা গেল!

নামমাত্র শোনা আর ফটোমাত্র দেখা নেহেরুতে উৎসাহিত হবার কথা নয় ছেলেদের। দুলুবুলুর কাছে নেহেরু তাদের ঠাকুর্দার মতোই কেউ। পিনাকীর প্রায়-স্বগতোক্তিতে স্ত্রীর কান থাকতে পারে কিন্তু ছেলেদের মন ছিল না, বুলু বল্‌লে,—ঠাকুর্দা সোঁদরবনে বাঘ শিকার করেছিলেন, বাবা?

দুলুবুলুকে মা-ই ঠাকুর্দাকে 'দাদু' বলতে দেয়নি।

—না-না। সে তো আমাদের মহাল ছিল! হৃতগৌরব পিতা ততোধিক হৃতগৌরব ছেলেদের মুখে তাকাল,—জওহরলাল নেহেরুর বাবা মতিলাল নেহেরু যেম্নি একবার সোঁদরবনে গিয়েছিলেন—বাবা-ও তেম্নি যেতেন। অনেকবারই গিয়েছেন।

—তুমি গিয়েছিলে?

যতটুকু বা গৌরবের কাছে ঘেঁষতে চেয়েছিল পিনাকী তার আগেকার কথায়, এখন যেন ছিটকে দূরে সরে এলো,—নাঃ।

হাট খুলতেন, বাজার খুলতেন সেকালের জমিদাররা এখন হাট মানেই খোলা হয়ে গেছে। পিনাকী খোলাখুলি কথা বলে—ওটুকুতেই যতোটা ঐতিহ্য আছে। তাতে মস্ত সুবিধে এই যে মনের যন্ত্রণা কম। অন্তত, যন্ত্রণায় উচ্ছন্নে যেতে হয় না। রাঢ়ের জমিদাররা না কি তা-ই গেছেন।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালো পিনাকী। যেন একটু উঁচু থেকেই তাকাল। ঘরের উচ্চতা থেকে। নিশ্চয়ই তখন মনে পড়েছিল পিনাকীর, এক জমিদার-নন্দন যে একটি বেণের মেয়েকে উদ্ধার করেছে। মনে পড়েছিল, মুঘল-আমলে জায়গীর পেয়ে যেম্নি নেহরু পরিবার বনেদী অভিজাত তার পিতৃপুরুষও তা-ই—আর তার স্ত্রীর পিতৃপুরুষের আভিজাত্য তো ব্রিটিশ-বেণিয়া-আমলের। মুচ্ছুদি-ঘর! এ-ও মনে পড়ল, পার্ক-সার্কাস ময়দানে কংগ্রেস হল যেবার—সে কলেজে পড়ে, তখন সভাপতি মতিলাল নেহরুকে দেখেছিল সে, সুভাষ বোস যেবারে জি-ও-সি। কী আশ্চর্য, তখন মনে হয়নি, আজকের কাগজ দেখে মনে এলো গোঁফ লাগিয়ে দিলে মোতিলাল নেহরুর চেহারা অবিকল বাবার মতো!

পিনাকীও ব্যারিষ্টার হতে পারত—মার তো খুবই ইচ্ছে ছিল কিন্তু বাবা বিলেত যেতে দিলেন না বলেছিলেন,—এজিটেটর হতে এতোই যদি ইচ্ছে—ল'কলেজে ভর্তি হয়ে যাক।

উকীল! বাবার মুখে শুনেই কথাটাতে ঘেন্না ধরে গিয়েছিল পিনাকীর। তারপর দানীবাবুর 'যোগেশ' অভিনয় দেখতে গিয়ে তো ভ্যালা এক কথাই শিখে এলো,—উকীল কী চীজ্ রে!

ঠিক ঘৃণা ফুটল না পিনাকীর চোখে, ভেসে উঠল বিদ্রূপ।

অর্থনীতিতে স্বাধীন হলেও মেয়েদের মেয়েলি স্বভাব যদি যেতো তাহলে তো মার্ক্সবাদকেই অভ্রান্ত বলতে পারতাম। মাধুরী পিনাকীকে যেন খানিকটা মুগ্ধ দৃষ্টিতেই দেখ্‌ছিল। অন্তত এ-পাড়ায় আসবার পর স্বামীর এমন চেহারা সে কোনোদিন দ্যাখেনি। শ্বশুর-ঠাকুরের ছবিটার সঙ্গে যেন স্বামীর চোখ-মুখ খানিকটা মিলে যাচ্ছে। তেজস্বী পুরুষ ছিলেন শ্বশুরঠাকুর। দেখলে ভক্তি করতে ইচ্ছে হয়। পতিভক্তিটা যেন ভুলেই গিয়েছিল মাধুরী। এখন, এইমাত্র তার মনে তা ফিরে এলো।

দরজা পেরিয়ে ঘরে এলো মাধুরী। এলেও শরৎ চাটুয্যের আমলের মেয়ে তো সে

নয়—মনে ভক্তি উপজিল আর ওম্নি টিপ করে নমস্কার। দুলু-বুলুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন মা,—সোঁদরবনের দিকটা নাকি পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে—চলো না পুজোয় বেরিয়ে আসব!

—কার বই-এ পড়লে? পরিহাসের হাসিতে ফিরে এলো পিনাকী, কোনো উপাধ্যায়-টুপাধ্যায়ের বই নয় তো? জজবাবুর বাড়িতে দেখা সুমিত্র উপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ল তার।

—উপাধ্যায়েরও একটা বই পড়েছি—সে তো তোমাদের নিয়েই লেখা!

পরিহাসে যোগান দিলে।

—আমাদের নিয়ে? আমাদের সে জানে কী?

—মেদিনীপুরের জমিদারদের নিয়ে—বাজে লেখা। তা সোঁদরবন না যাও চলো না দীঘাতে!

—তোফা সব জায়গার নাম বল্‌ছ তো—যেসব জায়গায় কংগ্রেসের্ হাত পড়েছে! আর বলবেও বা না কেন? কংগ্রেস তো বেণিয়াদেরই ছিল!

—তবু তো ছিল—কিন্তু তোমাদের কোন্ ভালো কাজটা ছিল, শুনি?

—যাও না শোলমারী। সুভাষ বোসকে জিজ্ঞেস করে এসো তাঁর পার্টি মৈমনসিং-এর জমিদারদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন কি না! পিনাকী গম্ভীর হয়ে গেল।

রাজনৈতিক আলোচনার যোগ্যতা বা রুচি কিছুই ছিল না মাধুরীর, তাই সে বললে, —বাঙালরা কী না করে!

অভিমানী বাঙালীর ভূমিকায় গিয়ে বললে পিনাকী, খবর তো রাখবে না—আজে-বাজে নভেল পড়বে! কংগ্রেসের স্বাধীনতার ইতিহাস বেরিয়েছে—যেম্নি তাঁরা জমিদারকে ছেঁটে দিয়েছেন, তেম্নি পুরানো দলকে। নেহাৎই সন্নেসি হয়ে গেলেন সুভাষ বোস, তাই না?

—রাজভবনে না কোথায় নাকি আসবেন সুভাষ বোস—নারে দুলু, তুই বলছিলিনে? মার কথায় অসাড় দুলু সাড়া দিয়ে উঠল,—হাঁ। আমাদের ক্লাসের শঙ্কর বলছিল। ওর বাবা কর্পোরেশন কাউন্সিলার—বাবার কাছে নাকি শুনেছে।

'রামচন্দ্র'-স্কুলের থার্ড ক্লাশের ছাত্র দুলু। 'রামচন্দ্র' নামের গুণে নয়, 'সাউথ পয়েন্ট' নামের দোষে ছিটকে এসে পিনাকী ছেলেকে রামচন্দ্রে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এ-ক্ষেত্রেও বাবার স্বভাবই কাজ করেছে পিনাকীর স্বভাবে, বাবার যে-স্বভাবের দরুণ সে বিলেত যেতে পারেনি।

পিনাকী প্রসেনজিৎ দেবের দিনের বেলাকার মেজাজে বললে,—কাউন্সিলার! ওসব বাবার ছেলেরাও রামচন্দ্রে পড়ছে না কি? সাউথ পয়েন্টে নয়?

ইংরেজী শুনলে একটু কাবু হয়ে পড়ে মাধুরী। তাড়াতাড়ি বললে সে,—তুমি শুনেছ না কি কিছু—সুভাষ বোস সত্যি আসবেন?

সুভাষ বোস যেকালে কর্পোরেশনের মেয়র সেটা প্রসেনজিৎ দেবের আমল। পিনাকী কর্পোরেশনের সঙ্গে সুভাষ বোসের কোনো সম্পর্ক খুঁজতে চাইল না, কর্পোরেশনের লোক ট্যাক্স বাড়াবার মতলবে ঘর গুণে যাবার পর থেকে সে এমনও ভেবেছে যে কর্পোরেশন-এলাকার বাইরে চলে যাবে এবার—বাঁশদ্রোণীর দিকে। বীমাবাবুই তাকে পরামর্শ দিয়েছেন। কর্পোরেশনের উপর তার রোষ স্ত্রীর মুখ থেকে সুভাষ বোসের নাম শুনতে তাই প্রশমিত

হল না—ফের বললে পিনাকী,—কাউন্সিলার। কাজের নামে নাম নাই ভোট কুড়োবার গোঁসাই!

বুলু অন্যমনস্ক চোখে তাদের বাগানটার দিকে তাকিয়ে হয়তো সোঁদরবনই দেখছিল এতোক্ষণ—যখন সে বুঝে নিলে মা-বাবার আর দুলুর সেখানে ফেরবার আর কোনো সম্ভাবনাই নেই তখন সে পশু-আভিজাত্যের কথা শোনালে পরিবারকে, যা সে-ও ক্লাশেরই কোনো ছেলের মুখে শুনেছে। বললে সে,—বাবা, তুমি একটা অ্যাল্‌সেশিয়ান পোষো না কেন?

—তা-ই পুষতে হবে দেখ্‌ছি। আর এ-পাড়ারই কারো নামে ওটার নাম রাখতে হবে! রোষের বশেই বলে গেল পিনাকী।

কিন্তু সে যে কার নাম, তা ঘোষণা করবার আর সে সময় পেল না—বীমাবাবু এসে উপস্থিত! পঙ্গু মানুষ। কচিৎ কদাচিৎ বেরোন। তিনি সশরীরে! আপ্যায়নে আর সৌজন্যে জল হয়ে গেল পিনাকী। মাধুরী ঘোমটাটা একটু বাড়িয়ে ছেলেদের নিয়ে প্রস্থান করলে। পিনাকী দাঁড়িয়ে বললে,—কী সৌভাগ্য! সকালবেলাতেই সৎ চিৎ আনন্দের দেখা পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা?

বৃদ্ধ এগোলেন,—আনন্দেরই খবর নিয়ে এসেছি, দেববাবু! কিন্তু বৌমা পালালেন কেন? এ-খবর তো বিশেষ করে ও'দেরই আনন্দের ব্যাপার!

দৈনিক পত্রিকার কোনো খবর যে নয় তা আন্দাজ করে নিলে পিনাকী—কিন্তু দস্তুর-মতো একটি সায়েব ছেলেকে ঘরে পুষে যে বীমাবাবুর কী ধরনের আনন্দ হতে পারে তা অনুমান করতে পারলে না। তবু, হাড়ে অসামাজিক হলেও তো সামাজিকতার সময়োচিত মুখোশ পরা যায়। তাই বলতে পারলে পিনাকী,—আপনার মশায়, ভরা সংসার—আনন্দের অভাবটা কোথায়? পঙ্গু বৃদ্ধকে দু'হাতে ধরে এনে গদী-আঁটা ছোট খাটে বসিয়েও দিলে সে।

সচ্চিদানন্দ খাটেও লাঠি ভর দিয়েই বসলেন। এবং খানিকটা আত্মহারা হয়েই যেন বল্‌লেন,—ভরা সংসারই আরো ভরা হবার খবর! আমাদের রাষ্ট্রের পক্ষে অবশ্যি দুঃসংবাদ! আমার দৌহিত্রী একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছে। মেটারনিটি হোম থেকে এইতো ভোরবেলা খবর এলো!

—বা-বা-বা! সোল্লাসে বললে পিনাকী! এই উল্লাস-জ্ঞাপনে যে তার আন্তরিকতা ছিল না, তা কিন্তু বলা যায় না,—তাহলে আপনি কী হলেন? প্রপিতামহ—না প্রমাতামহ?

—একটা-কিছু হলেই হল! এখন কি আর নিজের কিছু হওয়ার উপায় আছে?

বীমা-কোম্পানীর দালালি থেকে শুরু করে যিনি একটি বীমা-কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে পরিচালক-মণ্ডলীর সমর্থিত প্রতিনিধি হয়ে উঠেছিল এবং ফিরে শ'-পঞ্চাশ দালালের মারফৎ কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন দিনের পর দিন, তিনি যে এখন 'জীবন-কেন্দ্রে'র কেউ না এই বিশেষ কথাটা সচ্চিদানন্দের মুখে প্রায়ই সাধারণ কথার পোশাকে বেরিয়ে পড়ে।

সচ্চিদানন্দকে আশানুরূপ উজ্জ্বল না দেখে পিনাকীও একটু ম্লান হয়ে পড়ল। পিনাকী লক্ষ্য করছিল—গত কয়েকদিনে তাঁরা, পড়শীরা যেন পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছিল। যেমন একই মহালের চার-আনা, ছয়-আনা, আট-আনা মালিকদের মতো, খাজনা বাঁটোয়ারার সময়ে যেম্নি কাছাকাছি আসতেন তাঁরা। দেনা-পাওনার ধরণটা এক হলেই হয়তো মানুষ এমন হয়। দুঃখ-সুখেরও শরিকানা চলে। এই গভীর তত্ত্বে প্রবেশ

করে চুপচাপ রইল পিনাকী।

সচ্চিদানন্দ হাসলেন,—বিশেষ কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয়, আজ বিকেলে আমার বউমার ইচ্ছে আপনারা ছেলেদের নিয়ে আমাদের বাড়িতে একটু চা খাবেন। বউমা মাতামহী হলেন কি না!

সাতদিন আগে হলেও অম্বলের ওজর তুলত পিনাকী, এখন পূর্ণ নীরোগের মুখ নিয়ে বললে,—ও, নিশ্চয়। কিন্তু সচ্চিৎবাবু, আপনাকে একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে। এমন মিষ্টি খবর দিলেন! সন্দেশ। আমরা সিম্‌লে-এলাকার মিষ্টি ভালোবাসি কি না। গোল-পার্কে ওদের একটা দোকান হয়েছে। ফি-রোববার ছেলেদের মার ওদের জন্য কিছু সন্দেশ আনা চাই। ক্ষীরকদম্বটা কিন্তু ওদের চমৎকার।

—হেঁ—হাসিতে প্রসারিত করলেন বৃদ্ধ তাঁর মুখমণ্ডল,—এখন তো কদম ফুল ফুটবারই সময়! আর জন্ম! সে তো সন্দেশই বটে!

—বেশ সাহিত্য করতে পারেন তো আপনি—আধো অন্যমনস্কতায় বল্‌লে পিনাকী, —আপনার ওখানেও উপাধ্যায়-টুপাধ্যায় আসেন না কি?

—মুখ বেচে খেতাম তো একসময়—সব-কিছুই জানতে হত!

—হুঁ—পিনাকী উঠে দরজায় গিয়ে দুলুকে ডাকলে।

ফিরে এসে বল্‌লে—আমাদের আর তেমন কী—মরেই তো ছিলাম—মরার উপর খাড়ার ঘা দিলেন সরকার—কিন্তু যা-ই ভাবুন আর তা-ই ভাবুন—আপনাদের কিন্তু ধরে ধরে জ্যান্ত কবরে ঢুকিয়ে দিলেন!

—তাছাড়া আর কী? ছোট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, সচ্চিদানন্দ,—কী আর বলব, মশাই, এখন ওটার নাম হয়েছে 'জীবন-কেন্দ্র'। যেন ডাক্তারের সঙ্ঘ আর কি। আমরা তো জেনে এসেছি জীবনের ঝুঁকি নেওয়াই জীবন-বীমা কোম্পানীর কাজ। জানতাম জীবনের শিয়রেই মৃত্যু। জীবন বাঁচানোর দায়িত্ব তো কোম্পানীর নয়, রোজগেরে কারো মৃত্যুর পর তার পরিবারকে দুর্ভোগ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই জীবন-বীমা।

—তা জানেন না—চাল কম তাই শাপে বর হল। লাল গমের ভিটামিন খাইয়ে আপনাদের আয়ু বৃদ্ধি করাবেন যখন সরকার, তখন আর মৃত্যুভয় কোথায়? চীন তো হিন্দীর ভাই—যুদ্ধ বাধালেও আমাদের মারবে না। ডক্টর রায়ের মতো একজন সুচিকিৎসককে প্রধান মন্ত্রী করে দিলে দেখতেন, রোগ নির্মূল। মৃত্যু কোথায় মশাই? জওহরলাল কি মরেছেন? যোদ্ধা, কবি, প্রেমিক, নিরুপম, অসাধারণ-সাধারণ, জনপ্রিয়—এম্নি-ধারা বিশেষণের মানুষ মরতে পারে? দেশটাই আমাদের 'জীবন-কেন্দ্র' হয়ে গেছে যে!

কী আনন্দে যে আজ দেববাবু প্রগল্‌ভ তা যিনি মুখ বেচে খেতেন সেই বীমাবাবুও ঠিক বুঝতে পারলেন না। তবে ধরে নিলেন, এই হচ্ছে মওকা যখন বাঁশদ্রোণীতে গোপনে-রাখা এক বিঘে জমির কয়েক কাঠা পিনাকীকে গছিয়ে দেওয়া যায়। প্রস্তাব পেশ করবার প্রশস্ততর মুহূর্তের অপেক্ষায় রইলেন সচ্চিদানন্দ। যে-লাভে পিনাকী তাঁর কাছে এই গড়িয়াহাটার জমি বিক্রি করেছে, সে-লাভের অঙ্কটা কতোটা জমি কী দরে ছাড়লে পিনাকীর কাছ থেকে উশুল হয়ে আসবে তা-ই নিয়ে তিনি আপাতত ব্যস্ত রইলেন।

পিনাকীর ডাকে দুলু এলো না, এলো বুলু। তা-ও খুবই অনিচ্ছায় যেন তার আসা। পিনাকী প্রসঙ্গান্তরে যাবার সুযোগ পেয়ে একটু খুশী-খুশী মুখে জানতে চাইলে, দুলু কেন এলো না এবং সে কী করছে।

—প্ল্যাস্টার অব প্যারিসে ঠাকুর তৈরী করছে। জওহরলাল।

মূর্তি কথাটা শেখেনি বুলু—ঠাকুর কথাটা জানে এবং রমেশ পালের নামও। কিন্তু প্ল্যাস্টার অব প্যারিস কথাটা শিখেছে কারণ উপরের ক্লাশে ওই শক্ত খড়ি মাটি দিয়ে ঠাকুর বানানো শেখে ছেলেরা। অবশ্যি 'ক্র্যাফ্ট' ক্লাশে। 'ক্র্যাফ্ট' শব্দটাও নির্ভুল উচ্চারণ করতে পারে। 'রামচন্দ্রে' কি আর ইংরেজি শেখানো হয় না—সবই 'সাউথ পয়েন্টে' হয়?

ছেলের মুখে 'প্ল্যাস্টার অব প্যারিস' শুনে যতোটা খুশী হল পিনাকী, জওহরলালকে ঠাকুর বানানো হচ্ছে বলে ততোটাই ক্ষুন্ন হল কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাকে পরিহাসে ভাসিয়ে দিয়ে বললে,—রবি ঠাকুরের বিশ্ববিদ্যালয়ে জওহরলাল যখন আচার্য্য—শান্তিনিকেতন থেকে পেতেও পারেন ঠাকুর উপাধি! বললে,—মাকে মিষ্টি নিয়ে আসতে বলো—বীমাবাবু এসেছেন। বলতে পারবে তো? বীমা-বাবু। ইন্সিওরেন্স-বাবু বললে বুলু ভালো চিনবে কি না তা একবার ভেবে দেখলে পিনাকী।

—থাম্‌কা হ্যাঙ্গামা করতে যাচ্ছেন আপনি দেববাবু—এই তো আমি খেয়ে এসেছি। প্রেশারের রোগী, বোঝেন তো! সচ্চিদানন্দ লাঠির উপর হাত কাঁপাতে সুরু করলেন।

বুলুকে ছুটে যেতে বলে বিদায় করে পিনাকী সচ্চিদানন্দকে ধরলেন,—নাতনীর পুত্র-লাভের আনন্দে যখন প্রেশার হয়নি—সামান্য ক'টা বিহারীলাল খেলেও কিছু হবে না, মশায়!

—শুভদিন! বলছেন—তা একটি মাত্র সন্দেশ দিতে বলুন। শুভদিন আর ক'টা বা আসে জীবনে।

বীমাবাবুর তো শুভদিন বটেই কিন্তু সকালবেলা কাগজ হাতে নিয়েই পিনাকীর যে কেন মনে হয়েছিল আজকের দিনটাই শুভ তা সে সোজা বলতে গিয়েও বললে না। বাঁকিয়ে বললে,—শাস্ত্রী আসছেন জওহরলালের আসনে। আমাদের লোকায়ত-শাস্ত্রবচনটা হয়তো তিনি জানেন,—ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ? দিনটাকে শুভই বলতে হয়।

—পণ্ডিতজি ইজ ডেড, লং লিভ্ শাস্ত্রীজি—অ্যাঁ? হাসলেন বীমাবাবু।

—কাশীতে গিয়েছিলুম মশায় একবার—ওই একবারই, আর না। আমার পিতামশায়ও তীর্থ-ফিত্ত মানতেন না—যেতেন গঙ্গার হাওরাটা ভালো আর হিন্দু ঘরানা-গান ভালো-বাসতেন বলে। তীর্থগুলো চলছে মশায় ওসব দেশের যাত্রীরই ভীড়ে! যাদের বোধহয় হালের জনগণ বলা যায়। ওদের কাছে কে পণ্ডিত নন? ফোঁটা কেটে যে হাত দেখছে সে-ও পণ্ডিত!

সরকারের কৃষি-বাণিজ্য নীতিতে আহত দু'টি প্রাণী চুপচাপ রইল খানিকক্ষণ। অবশেষে সচ্চিদানন্দ বাণিজ্য-প্রস্তাবের ভূমিকা-স্বরূপ আরেকটি সংবাদ জানালেন পিনাকীকে, যাতে এ-'জমিদারনন্দন' খানিকটা প্রসন্ন হতে পারে,—জানেন তো, নেতাজীর চৌদ্দফুট স্ট্যাচু বসছে রাজভবনের দক্ষিণপূর্বে!

—ও, তা-ই নাকি? আমার বড়ো ছেলে তা-ই শুনে এসেছে স্কুল থেকে! তা, রাজ-ভবনের দক্ষিণপূর্বে কেন? দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকেই তো দিল্লীতে আসছিলেন নেতাজী —স্ট্যাচুটা সেখানে পাঠিয়ে দিলেই পারতেন ওরা!

—চৌরঙ্গীতে ঠাঁই হল না নেতাজীর! চৌরঙ্গীও তো রাজধানীর ওই যে কী বলে —জনগণেরই জায়গা। সারা কলকাতাই। পালিয়ে এলাম ঢাকুরেতে। এখানেও রাষ্ট্রপতির দেশের লোক হানা দিচ্ছে! চলুন মশাই এবার বাঁশদ্রোণীতে! কবে দেখতে যাবেন বলুন! রথ-দেখার শেষে কলা বেচবার চেষ্টা করলেন সচ্চিদানন্দ।

খাবার আসতে দেরি হল না। চা আসতেই যা-একটু দেরি। কথাটা স্মিতমুখ থেকে নির্গত হল বলে তার অভদ্র নগ্নতা ঢাকা পড়ল।

খেয়াল করলেও মন দিলে না তাতে পিনাকী। 'সোনার হাতে সোনার কাঁকণ' দেখে শুনে তো সে চিরকালই মুগ্ধ কিন্তু সম্প্রতি তার দৃষ্টি ছিল মাধুরীর হাতে ধরা রুপোর রেকাবি আর গ্লাসে। বিহারীলালের কতোটা কী ছিল তাতে নয়। মোহিতলালের পদ্যটার বাস্তব চেহারাতেও নয়। মুগ্ধ হচ্ছিল সে পৈতৃক তৈজসে। আজ সকাল থেকে কেমন যেন পৈতৃক রক্তটাকেই অনুভব করছিল পিনাকী তার প্রৌঢ় শরীরে। যৌবনে তুমি মোহিত-লালের পদ্যে মুগ্ধ হতে পারো কিন্তু যতোই বার্ধক্যের দিকে এগোবে ততোই প্রসেনজিৎ দেবের রক্তে চলে যাবে কিম্বা তাঁরও পিতা প্রসন্নকুমারের রক্তে। তাঁরা কেউ স্ত্রীকে ভালো-বাসতেন না। পিনাকী নিশ্চয়ই ভালোবাসে। কিন্তু আজ সকালে সে-ভালোবাসাটা ছাপিয়ে কি অন্য এক আনন্দে চলে যায়নি তার মন? দৈনিকের খবরের আনন্দ ছাড়াও হাট-খোলার প্রসন্নকুমারের রক্তের কোনো আনন্দে। রাত্রির শয্যায় কোনোদিন পিনাকী মার্লিন মনরোর নগ্নতা দেখেনি। নগ্নতায় সেকেলে উর্বশীর যেমনি আপত্তি ছিল, একালের উর্বশী কুলবধূদের বোধ হয় তেমনি আপত্তি। কিন্তু এই বীমাবাবুর মুখে এঞ্জিনীয়ার-বাবুর মেয়েদের কীর্তিকলাপ শুনে এবং স্বচক্ষে জজবাবুর নাতনীর পোশাক-পরিচ্ছদের বেআব্রু স্বচ্ছতা দেখে অবধি মাঝে-মাঝে ছবিতে দেখা ও খবরে শোনা মার্লিন মনরোকে ভেবেছে। স্বীকার করতে তার বাধা নেই। ভেবেছে তার বে-আইনী পিতামহীর কথাও। নচ্ছার বেদানা-পান্নার মতো নাম নয়—মনরোরই খানিকটা বাংলা-সংস্করণ মনোরমা নাকি নাম ছিল তার। নামটা বাড়িতে রাষ্ট্র ছিল। প্রসেনজিৎ দেব মোটেও শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন না। তাঁর পিতার আমলে তেমন জলপাত্র রাখা যে খুবই সহজ ও সচরাচর আভিজাত্য হয়তো রাত্রির মেজাজে কোনো-কোনো সময়ে বাড়িতে ঘোষণা করে থাকবেন। তবে তাঁর কামুকতা ছিল সংগীতে—বাইজিতেও তাই নিশ্চয়ই আপত্তি ছিল না। কিন্তু পিনাকী তুলসীপাতাই রয়ে গেল অদ্যাবধি। যা-কিছু সংরাগ স্ত্রীতেই সমর্পিত। তবে পুরোনো রক্ত শরীরে মাঝে-মাঝে কথা কয়ে ওঠে—পরিপার্শ্বের সাড়া পায় তাই মার্লিন মনরোর নামে ফূর্তি আসে—এঞ্জিনীয়ারবাবুর ডিভোর্সড্ মেয়েটিকে দেখতে ইচ্ছে হয়—যে এখন হিস্টিরিয়ায় ভুগছে, 'টপলেস'-কথাটার মানে আন্দাজ করে মনে-মনে সুখ পায়!

একালের উর্বশী হয়েও মাধুরী যে অন্তত দু'বছরে একবার শিশুসদনে যেতে পারছে না—তার জন্যে মাধুরীর মেয়েলি বদমেজাজ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ধনতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তিই সিমেন্টের কাজ করে। 'রাধারাণীর নিজের বাড়ি' হলেই হল। শরীর-ধর্ম পর্যন্ত বানচাল। পৈতৃক যৌতুক একটা বাড়ি আছে তো। তাই পূর্বপুরুষের অত্যাচারী রক্ত যে পিনাকীতে এসে শান্তি ভোগ করছে—এ মামলার খবর রাখে না মাধুরী। শঙ্কিত হলে সে শ্বশুরের তৈলচিত্রের সামনে দাঁড়িয়েই নিরাময় হতে পারে। ছেলেদের সঙ্গে হাসা-হাসিতে তার আপত্তি নেই। কোনো কোনো রাত্রিতে পিনাকীর অন্যায় আব্দার ঠেলে দিতেও তার দ্বিধা নেই। আবার ফিরিঙ্গি-পাড়ায় মানে চৌরঙ্গীতে পিনাকীকে নিয়ে মাঝে-মাঝে বেড়াবারও তার শখ আছে, যদিও মার্লিন মনরোর ছবিতে পিনাকী কোনোদিনই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যায়নি।

বীমাবাবু মাধুরীর দিকে নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে বললেন,—এক কাঁড়ি সন্দেশ নিয়ে এলে, মা! জানো না তো বুড়ো যে প্রেশারের রোগী!

—তাতে কী আছে? বললে মাধুরী,—বাবাও তো প্রেশারের রোগী—বলেন, আশু মুখুজ্জের পর আমিই বেঁচে আছি সন্দেশওয়ালাদের বাঁচিয়ে রাখতে!

—ও'রা ক্ষণজন্মা-পুরুষ—একপুরুষে একটিই হয়—না কি বলেন, দেববাবু? উদরের গ্যাসের চিন্তায় সচ্চিদানন্দ তাঁর আগেকার-পরেকার দুই পুরুষকেই গ্যাস দিলেন। আশা এই, শ্বশুর প্রশস্তিতে সস্ত্রীক পিনাকী খুশী হয়ে বাঁশদ্রোণীর কারবারটা সম্পন্ন করে ফ্যালে।

—বলতেও পারেন। মুখুজ্জেমশায় তো মেয়ের নামে 'এক্সটেনশন লেকচার' তৈরী করে গেছেন, আমার শ্বশুরমশায়ও মেয়েকে একটি বাড়ি দান করেছেন। দত্তরাও বোধহয় দাতা হন—না? যেন পুণ্যশ্লোক রাধাকান্ত দেবের অমায়িকতায় কথা বলে উঠলে ভদ্রাসন-ভ্রষ্ট হালআমলের পিনাকীরঞ্জন দেব।

দত্তদুহিতা খুশী-খুশী মুখে ভৃত্য-বাহিত একটা জলচৌকির উপর রেকাবি-গ্লাশ সাজিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবার ভঙ্গী এনে বললে,—খান। চারটে তো মাত্র সন্দেশ!

বৃদ্ধোচিত লুব্ধতায় চারটে কেন হয়তো চারশো গ্রাম সন্দেশও উদরস্থ করতে পারেন সচ্চিদানন্দ কিন্তু সামলে নিয়ে কথায় মগ্ন করলেন তিনি রসনাকে,—তুমি তো মা আমায় রুপোর থালায় সন্দেশ দিলে, আমি শুকনো জিবে তোমায় একটা সন্দেশ দিচ্ছি. আমার নাতনীর ছেলে হয়েছে—বিকেলে তোমাদের একটু যেতে হবে।

রুপোর একটা বাটির কথা মনে এনে মাধুরী বললে,—ও মা, তা-ই না কি। হ্যাঁ—তা নিশ্চয়ই যাব।

—দুটো তুলে নাও মা—দুটো খাচ্ছি—এবার রেকাবিতে হাত বাড়ালেন বীমাবাবু।

—না-না—নাছোড় হয়ে বললে মাধুরী,—সবটুকুই খেতে হবে আপনাকে. আমি খাইয়ে তবে যাচ্ছি।

পূব-বাংলার এক জমিদারের গল্প মনে পড়ল সচ্চিদানন্দর—অতিথি খেতে না চাইলে সে-জমিদার নাকি মারধোর করতেন। মনে পড়ে হাসলেন বৃদ্ধ এবং রেকাবিতে হাত বাড়াবার পর কখন যে পিনাকীর ব্যাঙ্ক একাউন্টে হাত বাড়াবেন তা ভাবতে ভাবতে অন্য-মনস্ক হয়ে ভোজনে মন দিলেন।

ইতিহাস থেকে নয়, গিরিশ ঘোষের "বিল্বমঙ্গল" পালা থেকে জেনেছিল পিনাকী বেণেরা অতিথি-পরায়ণ হয়। বেণের মেয়ের অতিথিবাৎসল্যে খুশী হল সে এবং এই সুযোগে বাঁশদ্রোণীর প্রস্তাবটা পেড়ে স্ত্রীর সমর্থন আদায় করতে চাইলে,—বীমাবাবু তো বলছেন—বাঁশদ্রোণীতে যেতে—শেষ কিস্তিটা পাওয়া গেলে আমিও ভাবছি, যাব।

বাঁশবেড়ে শুনলেও বাঁশদ্রোণী শোনেননি কখনও মাধুরী। তবে বাঁশ মানেই তো পাড়া-গাঁ, তা-ই আন্দাজ করে বললে,—পাড়াগাঁয়ে বুঝি প্রেশারের রোগীর পক্ষে ভালো।

স্বামী-স্ত্রীর কথায় উৎকর্ণ হতে গিয়ে একবার বিষম খাবার উপক্রম হল সচ্চিদানন্দর। জল খেয়ে ফাঁড়া কাটিয়ে বিশ্রাম নিতে চাইলেন একটু।

অতএব স্বামীস্ত্রীর প্রেশারের রোগী নিয়ে আলাপটা আর এগোল না।

—থাক্—আর খাবেন না—ক্ষীরকদম্ব খানিকটা শুকনো ত! পরিত্যক্ত একটা সন্দেশ-সহ রেকাবিটা তুলে নিয়ে মাধুরী চলে গেল।

সচ্চিদানন্দ ভাবলেন, বিশ্রাম নিতে গিয়ে তিনি ভুল করলেন। ভুলই করে এলেন তিনি বরাবর! বীমা কোম্পানী না করে যদি একটা অষুধের কোম্পানী করতেন, তাঁর টাকা

আজ খায় কে? সরকারও সেদিকে হাত বাড়াননি। নিশ্চিন্ত! যেন অবুধ কোম্পানীর পরিচালকরা টাকার কাঁড়ি তৈরী করছেন না—তৈরী করছিলেন এক বীমা কোম্পানীর পরিচালকরাই! কী আমার সমাজতন্ত্র! বিকৃত হয়ে উঠল সচ্চিদানন্দর মুখ।

প্রমাদ গুণলে পিনাকী। এবার না বীমাবাবু সত্যি-সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়েন! স্ট্রোক! দাঁড়িয়ে সে বললে,—শরীরটা ভালো বোধ করছেন না? চলুন, আপনাকে বাড়ি দিয়ে আসি।

সম্পূর্ণ সুস্থ সচ্চিদানন্দ পিনাকীর সহানুভূতিতে বিগলিত হলেন—যেমনি নার্স মেয়েটির সহানুভূতিতে হয়ে থাকেন। হাসলেন তিনি—অনেক কারণেই হাসলেন। হাসার কারণের কি অন্ত আছে এবং মানের? রাজাজি তো রাজ্যপাল থাকতে বলে গেলেন, হাসলে মুখের চেহারা সুন্দর হয়। এখন স্বতন্ত্র দলে গিয়ে অন্য কথা বলতে পারেন। তখন সুন্দর হবার দরকার ছিল। হাসতেন! আবার নার্স মেয়েটিকে ভাবলেন বীমাবাবু। মুখের উপর হাত বুলিয়ে হাসলেন এবার।

—চলুন—লাঠিটা হাতে তুলে নিলেন সচ্চিদানন্দ এ-শতকের গোড়ার দিকটার বাবুদের মতো—যাকে লাঠি বলা হত না, বলা হত ছড়ি। লেঠেল ছিল তো জমিদারদের। উকিলবাবুরা ছড়ি ঘুরিয়ে চলতেন। 'কী দিনই না ছিল'—গোছের কথা অবশ্যি তিনি ভাবলেন না, কারণ তখন তো তিনি বিত্তবান নন।

কিন্তু এখন তিনি জমিদার-নন্দনের সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ষোল

মেজাজটা ভালো ছিল না। কাল রাত্রির ঘটনায় মরা মানুষের মাথাও কি ঠাণ্ডা থাকতে পারে? আর সে তো সাহিত্যিক। স্বভাবতই মেজাজী। উপাধ্যায় তাই বাড়ির আব-হাওয়াতেও ঠাণ্ডা হতে পারছিল না। রাত্রিতে তো নয়ই—এই তো এখন প্রায় সকাল দশটা—এখনো না। ছুটির দিন, রোববার—সকাল দশটায় যোধপুর-পার্কে বেরোলে সাহিত্যিক তো সাহিত্যিক মুঘলাই মেজাজ পর্যন্ত বরফ হয়ে যায়—চাক-ভাঙা যোধপুরী-উদীপুরীরা সব রাস্তায় বেরিয়েছেন—এক-একটি মক্ষীরাণী, বোম্বে-এমব্রয়ডারিতে কিম্বা উদয়ভিলা-প্রিন্টে! সুমিত্র উপাধ্যায় যে কালে-ভদ্রে বেরিয়ে মেজাজ ঠাণ্ডা করে আসেনি তা তো নয়। কোনো তরুণী যদি তার দিকে তাকিয়েছে, তরুণীদের যেমনি পুরুষমাত্রের দিকেই তাকানো অভ্যাস, সে-অভ্যাসেই যদি বা তাকিয়েছে—সুমিত্র উপাধ্যায় যে সর্বজন-পরিচিত এই গর্ববোধে ঠোঁটে মিহি হাসি নিয়ে একটু এগিয়ে গেছে সে।—এ-পাড়ায়ই থাকি। আমি সুমিত্র উপাধ্যায়। আপনি? ওঃ—এ-ধরনের মৌখিক পরিচয়-পত্র বিনিময় হল তো আর কথাই নেই, সুমিত্র সেই তরুণীর সঙ্গে পথে হেঁটে বা ট্যাক্সিতে বসে গোল-পার্ক—সাফারি পর্যন্ত আধঘণ্টা কাটিয়ে এলো। মাথায় আগুন থাকলেও তখন তা বরফ না হয়ে পারে?

কিন্তু কাল রাত্রি থেকে? কেন যে সে একটা বাজে অজুহাতে শুক্লার সালোঁতে ঢুকতে গিয়েছিল কাল! এক মস্ত সাংবাদিকের সঙ্গে বসে আছে! নিউ ক্যাচ্-ই হয়তো। কোন্ দিন দেখা যাবে কোন্ মন্ত্রী বাগিয়ে বসে আছে। স্পষ্ট হেলেন। বোরাল থেকে কলকাতা এসেছে না গ্রীস থেকে ট্রয়! পুড়িয়ে মারবে! প্রাচীন ভারতে এ-ধরনের গণিকা

তো ছিলই—এখন আবার তৈরী হচ্ছে। উপাধ্যায় নিজের বংশলতার শিকড় মধ্যযুগীয় মুঘলদের পিছনে নিতে চায় না যখন রাজপুত সমাজে যোধপুরী-উদীপুরী থাকলেও সতীদাহ প্রচুর। যোধপুরীদের নজরে পড়তে চাইলেও সতীদের উদ্দেশে নমস্কার জানায়।

এই তো সংহিতা! নিখুঁত হিন্দু ঘরণী। তাকে ভালোবাসে না, সমীহ করে না উপাধ্যায়? জায়া কথাটা জ্ঞা-ধাতু থেকেও তো আসতে পারে—যার কাছ থেকে জানা যায় সেই জায়া। অন্তত সুমিত্রর কাছে তো সে মানেই দিচ্ছে সংহিতা। শিক্ষিকার মতোই মনে করে সে সংহিতাকে—যেমনি তার লেখাপড়ার দিকে দৃষ্টি, তেমনি চরিত্রের উপর। লেখাপড়াতে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। উপন্যাসের সপ্তম অধ্যায়টা আজ শেষ করতে হবে হুকুম এলে, একসঙ্গে সপ্তপদ যাবার স্মৃতিতে, মৈত্রীবোধে তা শেষ করে বইকি সুমিত্র।

সংহিতার আশ্রয়ে এসেও কাল নিরাময় হবার উপায় ছিল না। ঘর যে স্বাস্থ্যনিবাস তার এই অভিজ্ঞতা এবং সাহিত্য-ঘোষণাও মিথ্যা মনে হয়েছিল—হয়তো সামান্য অজুহাতে সংহিতার সঙ্গে তার ঝগড়া-ই হয়ে যেতো, শুক্লার কাছে যে-অপমান সে পেয়ে এসেছে তার ঝাল মেটাতো সংহিতারই উপর—রক্ষা যে গীতা এসে উপস্থিত। তার শ্যালিকা—গীতা। এ-বাড়িতে আর আসেনি—কী জানি কেন শ্বশুরমশাই আসতে দেন না—কাল রাত্রিতে নাকি এসে উপস্থিত। হঠাৎ—এ-পাড়ায়ই এক বন্ধুর বাড়ি এসেছিল—রাত কাটিয়ে যাবে দিদির সঙ্গে। বিদ্রোহ! যে-কারণেই হোক খুশী হবার কথা সুমিত্রর—মেজাজ শরিফ হবার কথা। কিন্তু তেমন হল না। আজ ভোরে যখন গীতা চলে যাচ্ছিল, 'সভায় এসো' কথাটা বললে বটে সুমিত্র কিন্তু ততোটা আন্তরিক উষ্ণতায় নয়। অথচ গীতা যোধপুরী-উদিপুরী থেকে কম যায় না!

কম কি যায় শুক্লাও—বরং ঢের-ঢের উঁচু ধাপের। 'সভায় এসো' কথাটা মুখে নিয়েই তো কালরাত্রিতে প্রথম সম্ভাষণটা জানিয়েছিল সে শুক্লাকে—ভেবেছিল পরে বৈষয়িক আলাপে যাবে। বৈষয়িক মানে গান-দুটোর ভাগ্য জানা। সঙ্গীতশ্রী ওদুটোর কোনো হিল্লে করল কিনা। অবশ্য শুক্লার সুপারিশ থাকলে সঙ্গীতশ্রী উপাধ্যায়কে সঙ্গীতরচনায় রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষও বলতে পারেন।

কিন্তু কী হল? সবই যেন আজকাল অকারণে ঘটছে! হঠাৎ রেগে গিয়ে বললে শুক্লা,—যাবো আরেক দিন। আপনাদেরই পাড়ায়। কিন্তু আপনার বাড়ি নয়।

যে-শুক্লা গাড়িতে এসে বাড়ি থেকে তাকে এক-রকম কিডন্যাপ করে নিয়ে যেতে পারে তার মুখে আজ এমন ঠাণ্ডা কথা অসামাজিক ছেলে-ধরাদের চিন্তায়ই নিয়ে গিয়েছিল সুমিত্রকে। কী যে সে করবে, বসবে না দাঁড়িয়েই কিছু বলবে, তৎক্ষণাৎ ভেবে পাচ্ছিল না।

কিন্তু তাকে কিছু বলতে হল না, শুক্লাই বললে আবার,—জানেন সান্ন্যাল,...শুক্লার পাশে-বসা অপরিচিত দিশী-সায়েব উৎকর্ণ হল,—পণ্ডিতজী আমাদের গণতন্ত্রের উপরের ধাপে নিতে চাইলেন কিন্তু আমরা 'বিহেভ' করতে শিখলাম না!

পদ্মবিভূষণ এমন বোকা নয় যে মন্তব্যটা সে কালকের রাত্রির ঘটনাটার সঙ্গে জড়িয়ে দেখবে না। একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল সুমিত্র। শুক্লাকে কাল যতোটা অপ্রকৃতিস্থ সে ভেবেছিল, তাহলে তা সে ছিল না! তাহলেও সুমিত্র এ-ধারায় ভেবে নিশ্চিন্ত হতে চাইল যে কোনো মেয়েই তো আপন লজ্জার কথা বাইরে আনে না, শুক্লা কি তা আনতে পারে! এ ভেবেই সে কথা বলতে পারল,—শ্রীযুক্ত সান্ন্যালকে তো আমার সঙ্গে পরিচিত করে দিলে না!

—সান্ন্যাল আপনাকে চেনেন! যেন এলিজাবেথ এসেক্সের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেবার ভূমিকা করল।

কিন্তু সান্ন্যাল অমায়িক হাসিতে বলল,—পদ্মবিভূষণ সুমিত্র উপাধ্যায়। দেখছেন—আপনার এখনকার নামটাও জানি।

সুমিত্র কি কাঠগড়ায় দাঁড়াল? এ প্রশ্নে তটস্থ হয়ে সে আর দাঁড়াতে পারেনি—একটা সোফাতে আশ্রয় নিয়েছিল। সান্ন্যালের বাংলা কথায় ইংরেজি উচ্চারণ শুনে একবার মনে হল সুমিত্রর, সান্ন্যালটা ছদ্ম উপাধি নয় তো? পাড়ার অভিজিৎ রায়কে মনে পড়ল তার। জজবাবু যাকে বাঁমাবাবু বলেন তাঁর ছেলে—পাঁড় মাতাল! অভিজিৎকে দূর থেকে দেখেছে সুমিত্র—কাছের থেকে কি এমন দেখাবে—শুক্লা যাকে সান্ন্যাল বলছে তার মতো দেখাতে পারে? শুক্লা যে বলছিল, গড়িয়াহাটা পাড়ায় যাবে—এর বাড়িতেই যেতে পারে, মদের আড্ডায়।

সোফার হাতল হাতে চেপে ধরে শুক্লা দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করলে,—সান্ন্যালকে আপনার চেনা উচিত ছিল।

হেঁয়ালিতে রইল না আর সুমিত্র, সান্ন্যালের মুখে তাকিয়ে সে অভিজিৎকে দেখতে পেল। হাত তুলে ভঙ্গীতে এবং কথায় নমস্কার জানালে।

নমস্কারটা বিদায়-নমস্কারও হতে পারত। কারণ সুমিত্রর আর বসবার ইচ্ছে ছিল না। ঠোঁটে একটা সপ্রতিভ হাসি বানিয়ে বললে সুমিত্র, আচ্ছা—শুক্লা, আজ চলি। আমাদের পাড়ায় তো যাচ্ছ-ই তুমি। দেখা হবে।

শুক্লা চুপচাপ ঠোঁট চাটলে।

কিন্তু সান্ন্যালের আরো কিছু বলবার ছিল। বললে সে,—আপনার কি মনে আসছে না, আমার সঙ্গে যে আপনার দেখা হয়েছিল। ধরুন, চল্লিশের কোনো এক সনে? সুমিত্রর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার জন্যেই একটু থামলে সান্ন্যাল, মনে আনবার চেষ্টা করছে সুমিত্র, চোখের চারপাশে ভাঁজ তুলে, কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা না করে সান্ন্যাল আরো সূত্র ধরিয়ে দিতে চাইলে—যখন আপনি ন্যাশন্যাল ওআর ফ্রন্ট অপিসে যাতায়াত করতেন!

লোকটা লালবাজারের কেউ না কি? অভিজিতের চেহারাটা মুছে গেল সুমিত্রর মন থেকে। অবিশ্বস্ত মনের ছবির উপর কেন নির্ভর করতে গিয়েছিল সুমিত্র, যার সাহিত্যে তার ছিঁটে-ফোঁটাও নেই?

শুক্লার ভঙ্গীতেই ঠোঁট চেটে বললে সুমিত্র,—যেতাম। তারপর সে কৌতুকের আশ্রয় নিলে আবহাওয়াটাকে সহজ করে তুলবার জন্যে,—তখন তো লালবাজার সত্যিকারের লাল।

হাসলে সান্ন্যাল কিন্তু শুক্লা হাসল না। তা হোক, আপাতত সুমিত্রর শুক্লার ভয় আর ছিল না। যে মেয়ে বিদেশ ঘুরে এসেছে, শিল্পী-সাহিত্যিকের শিথিল চরিত্রের কথা তার অজানা থাকবার কথা নয়। তা জেনেই যখন সে শালিগ্রামের পরামর্শেই হোক বা স্বেচ্ছায়ই হোক সালোঁ খুলে বসেছে—তাকে আর কী ভয়? এ তো আর উদ্বাস্তু মেয়ে নয় যে ব্ল্যাক মেলিং-এর আশঙ্কা আছে! আশঙ্কিত হচ্ছে সুমিত্র আপাতত সান্ন্যালকে নিয়ে। তবে সান্ন্যালের হাসিতে হয়তো তা-ও কেটে গেল। এবং এখন মনে আনতে চেষ্টা করল, সাউথ গড়িয়াহাটে সান্ন্যাল-উপাধির কোনো নেম প্লেট দেখেছে কি না।

—লাল! সান্ন্যাল হাসিটা হ্রস্বীকৃত করে বললে, জওহরলাল তখন জেলে। কিন্তু লালের কী আর অভাব ছিল? অবশ্যি ইয়্যাঙ্কো তাড়াবার জন্যে। আপনার বই-এর সেই

ইংরেজি অনুবাদটা আছে—দিতে পারেন আমাকে এক কপি? আমি সংগ্রহ করতে পারিনি।

বিপদে যে অপ্রস্তুত হতে নেই অনেক বিপদসঙ্কুল স্থানে পা দিয়ে সুমিত্র সে অভিজ্ঞতায় প্রস্তুত হয়ে গেছে। তাছাড়া রণেন মিস্তিরের মতো আজগুবি ঘটনা তৈরী করতে না পারলেও মিথ্যে ঘটনা বানানোর শক্তি তো অন্তত সুমিত্রর আছে।

কিন্তু সান্ন্যাল তার ঘটনা শুনতে আর এগোলেন না। অনেকদিন সাংবাদিকতা ছেড়ে দিলেও সে বৈদেশিক সাংস্কৃতিক ঘাঁটিগুলোর খবর রাখে। সুমিত্র উপাধ্যায়ের বইটার নাম সেখানেই শুনেছে সে। তার যে অনুবাদক হিসেবে দাবী ছিল এবং সুমিত্র উপাধ্যায় তা মিটিয়ে দেবার চুক্তি করেও যে মিটিয়ে দেননি—সান্ন্যাল তা শুক্লাকে জানালেও, উপাধ্যায়কে জানাতে চাইল না। সান্ন্যালের যে টাকার দরকার তা মোটেও নয়—কাহিনীটা সে শুক্লাকে জানিয়ে শুধুমাত্র মন্তব্য করেছিল হাউ ফানি।

—আচ্ছা! সুমিত্র উঠে দাঁড়াল,—আপনি তো এখানে আসেন। বইটা যদি সংগ্রহ করতে পারি—এখানেই পাঠিয়ে দেব।

সংগ্রহের কোনো প্রশ্নই ওঠে না—ট্রামে উঠে ভেবেছিল সুমিত্র। পঞ্চাশ-ষাটখানা এখনো তার কাছে আছে। পবিত্র-ওরা একশো বই আর একশো টাকা তাকে দিয়েছিল। ইয়াঙ্কী সৈন্যদের কাছে কতোটা বিক্রি করেছিল তা সে জানে না। বই-এর সব ঘটনাই সে নখদর্পণে রাখে। সান্ন্যালের নামটা যে কেন এ ঘটনা থেকে মুছে ফেলেছিল সুমিত্র তা তখুনি ভেবে দেখতে চাইল না।

ট্রাম থেকে নেমে যখন সে গড়িয়াহাটার বাস নিয়েছে—বাড়ি আসবার পথে আর ট্যাক্সির দরকার ছিল না—তখন মাত্র শুক্লাকে ভাবলে সে। গণিকা! শব্দটা তখনই প্রথম ব্যবহার করল সে। শালিমার গেছে, এখন সান্ন্যাল! পবিত্রদের দলে তো জমিদার-ব্যারিস্টার-অধ্যাপকও ছিলেন—তখন শুনেছিল তেমনি কার যেন বন্ধু সান্ন্যাল—তুখোর ইংরেজিতে। বিত্তবান নিশ্চয়ই। সংস্কৃতি-টংস্কৃতিগুলো মুখের প্রসাধন মেয়েদের—পোশাক, আসল মুখ দ্যাখো ওদের, টাকা শুধু টাকার উপর নজর। এমনি সেয়ানা সব! পাঁচ থেকে পঞ্চাশ। শুধু সুখের পায়রা হবার লোভ!

বাস থেকে নেমে যোধপুর পার্কে ঢুকবার মুখে শুক্লার পাশাপাশি মলুয়াকে রেখে একই রকম ভাবলে সে। সংহিতা সম্পর্কে এসব ভাবা উচিত নয় বলে এ-দৃশ্যে তাকে সে আনল না। ইদানীং হয়তো বয়সের দরুণই সুমিত্র খানিকটা ঔচিত্য-বোধে মন দিয়েছে। কিন্তু বিয়ের ঠিক পরটাতেও তা ছিল না। তারই প্রকাশকের প্রকাশিত একটা অশ্লীল বই-এর দীর্ঘ প্রশংসাপত্র লিখে দিয়ে তো শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে তার মনোমালিন্যই হয়ে গেছে। পাশাপাশি সে সময়টায় যে পরমহংস-ভক্তি চলছিল, ভদ্রলোক সেই ভক্তিমার্গেরই মানুষ। তা ঠাকুর তাঁকে মন্দ পুরস্কৃত করেননি।

চারদিকে বিদ্রূপ বর্ষণ করে খানিকটা হালকা হয়েই সুমিত্র বাড়ি ঢুকছিল। কিন্তু কিন্তু ঘরে আসা-ই তো নিজের মুখোমুখি হওয়া! দরজা বরাবর ওয়ার্ডরোব না থাকলেও। ওয়ার্ডরোব সায়েবি কেতা—গড়িয়াহাটে থাকে যোধপুর পার্কে না থাকলেও তার আভিজাত্য গড়িয়াহাটার নীচে যাবে না—এখানে তিন-ঘরের ফ্ল্যাট-ভাড়া পাঁচশ' টাকায় তো উঠেছে, তাছাড়া সেদিনও তো এই লেক-ওয়ালা এলাকা সায়েবদের ক্লাবই ছিল। আসবাব-পত্রে, পোষাকে-আশাকে ভারতীয় পদ্ধতি যতোটা অনুসরণ করা যায় ততোটাই ভালো—ভেবেছিল সুমিত্র! এই যে ছেলে-বুড়ো সবাই বিদেশ ছুটছেন এবং লেখকরাও, কোন্ বস্তুটা কে

উপার্জন করে আসতে পারল শুনি? বিদ্যাসাগর-মশায়ের এক স্মৃতি-সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল সুমিত্র উপাধ্যায়।

নিজের মুখোমুখি হওয়া মানেই সভা-সমিতি-লেখার জন্যে অনুরোধ-প্রার্থনার খবরে খুশী হয়ে সংহিতাকে বলা,—অনুরোধের বোঝা যে আর সইতে পারিনে, কী করি বলোত। একে লেখকের জীবনই বলা যায়, নিজের জীবন কেউ বলবে না। কিন্তু এ-জীবনটাকেই সুমিত্র নিজের জীবন বলে ভাবে এবং প্রচার করে। কারণ আর কিছুই নয়, ব্যক্তিগত জীবন তার বলার মতোও নয় এবং ভেবেও দেখতে চায় না। যদি ভাবেও, নিজেকে শোনায়, ও হচ্ছে ময়লা জলে পা দেওয়া, কলের জলে ধুয়ে ফেললেই হয়। যা-ই বলি আর তা-ই বলি, মানুষ তো পশুত্ব ছেড়ে দেবত্বে চলে যায় নি।

শোভনকেই প্রথম দেখল বাড়ি ঢুকে সুমিত্র। ড্রেন-পাইপ-পরা। এই প্রথম।

—ওটা কোত্থেকে যোগাড় করলে? ঠিক শাসনের ভঙ্গি আনতে পারল না সুমিত্র তার গলায়। যেন শাসনের সঙ্গে একটু কৌতূহল মিশে গেল।

—ছেলেরা সবাই তো পরে আজকাল!

—পরে জানি। কিন্তু তাদের পরা-টা তো তুমি কুড়িয়ে আনো নি।

—মা টাকা দিলেন।

—মাকে দেখিয়েছ?

—হুঁ। মা বললেন, ওরকম আবার কেন, জওহরলালের পা-জামার মতো করলেই পারতে!

—এক সময় জহর-কোট হয়েছিল বটে।

শোভন নৈশ-ভ্রমণে বেরোল কি না তা না ভেবেই সংহিতার খোঁজ করল সুমিত্র।

সংহিতা টেলিফোনে কথা বলছিল। সুমিত্র খুশী হয়ে পোষাক পরিবর্তন করতে গেল। ময়লা জলে পা দিয়ে এসেছে এখন বাড়ির জলে তা ধুতে হবে। বিকাশের ফোন ছাড়া আর কার ফোন হতে পারে? কালই তো সভার তারিখ। কাল নাকি ময়দানে মহা-নাগরিকদের এক শোকসভা হবে। বিকাশই যেন বলেছিল। বেশ ছেলেটি। বামপন্থী। তা বামপন্থী আজকাল কে নয়? জওহরলাল ছিলেন না? পোষাক পাল্টে ভাবলে সুমিত্র, ময়দানের শোকসভার আমন্ত্রণও হতে পারে। কিন্তু মহানাগরিকের ঘোঁটে কি তাকে ডাকবে? সুমিত্র ঠিক বুঝতে পারছে না, কে যেন মন্ত্রীদপ্তরে কলকাঠি ঘোরাচ্ছে যার ফলে প্রত্যাশিত কিছুই হচ্ছে না। শুক্লা? শুক্লাকে ঘিরে যারা আছে—তাদেরই চক্রান্ত? তাছাড়া আর কি? কে বলবে ওটা স্বতন্ত্র পার্টি নয়? নিজের সম্পর্কে ক্ষুদ্র চক্রান্তের কথা ভাবতে পারে না আর এখন সুমিত্র।

টেলিফোনের ঘরেই ফিরে এলো সুমিত্র, মানে বসবার ঘরে।

এই মাত্র সংহিতা ফোন রেখে চকচকে চোখে তাকিয়ে ছিল। খুশীর রেশ। সুসংবাদ সন্দেহ নেই।

সুমিত্র কৌচে হেলান দিয়ে জিজ্ঞেস করল,—বিকাশের সঙ্গে কথা বলছিলে?

—না-না। গীতা। গীতা বলছিল আসছে সে। রাত্রিটা থাকবে। ফোন থেকে কৌচে এলো সংহিতা।

—গীতা? কে গীতা?

—তোমার মনে নেই। আমাদের সব চাইতে ছোট বোন। দুই-আড়াই বছরের দেখেছিলে।

—ও। হাসলে সুমিত্র,—এখন ক'বছরের দেখতে হবে?

—কতো আর হবে? স্কুলফাইন্যাল পাশ করে সবে কলেজে গেছে!

—ডেঞ্জারাস! হাসতেই লাগল সুমিত্র।

—সে কী! ভুরু কুঁচিয়ে বললে সংহিতা।

—আজই তেমন বয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে এলাম। তুমি চেনো—সুব্রতর মেয়ে।

—জজ-বাড়ি? বাঃ, সেখান থেকেই তো টেলিফোন করছিল গীতা!

একটু বিবর্ণ হয়ে গেল সুমিত্রর হাসি। কিন্তু স্ত্রীর চোখের রঞ্জনরশ্মির কাছে হৃদয়-বিস্তৃতি নিখুঁত ধরা পড়ে যায়। তাই হাসিটাকে শব্দিত করে সে বলল,—তাহলে গীতা মলুয়ার বন্ধু। মলুয়ার কাছেই এসেছে—তোমার কাছে তোমার বাবার বাড়ি থেকে নয়।

সতীর উল্টো ধারাই আজকাল দেখা যায়, পতিনিন্দায় কোনো মেয়ে মরে না, পিতৃ-নিন্দায় মূর্চ্ছা যেতে পারে। মূর্চ্ছা গেল না সংহিতা, সুমিত্রর গলায় বিদ্রূপের একটা রেশ ছিল বলে মুষড়ে গেল। বললে,—দোষ কি সবটুকুই বাবার?

—না-না, আমারই দোষ।

আপোষ করে ফেলতে চাইল সুমিত্র। পুরনো ঝগড়া কে জীইয়ে রাখতে চায়? তাছাড়া সুমিত্র বা সংহিতা কারো এমন নন্দনতত্ত্বে প্রবেশ নেই যে আর্টে শ্লীল-অশ্লীলতার বেড়া ভেঙে দিতে পারে। অশ্লীল বই-এর প্রশংসা-পত্র দিয়েছিল সে এই কড়ারে যে প্রকাশককে তার কাছে গচ্ছিত এক শো ইংরেজি-অনুবাদ উপন্যাসটা ক্যাশ কিনে নিতে হবে। প্রকাশক দু'কিস্তিতে কেনবার প্রতিশ্রুতি দিলেন—তবে সুমিত্র নিমরাজি হয়ে প্রশংসাপত্রটা লিখে দিয়েছিল। দু'শো টাকা তো হাতে পাওয়া গেল! দ্বিতীয় কিস্তি নিতে আর প্রকাশক এলেন না। কিন্তু যাবে কোথায় বাপু? যেই সিনেমায় একটা বই ধরিয়ে দেওয়া তার ফাঁস পড়েই প্রকাশক হিড়হিড় করে চলে এলেন সুমিত্রর বাড়ি—একটা বই দিতে হবে—ব্ল্যাঙ্ক চেক ফেলে দিচ্ছি—অঙ্কটা বসিয়ে নিন। কোনো বই তখন সুরু করেনি সুমিত্র। কিন্তু প্রকাশককে জানালে, আদ্ধেক লেখা হয়েছে একটা বই, তা সে দিতে রাজি শুধুমাত্র এই শর্তে যে সংহিতার একটা গল্পগ্রন্থ ছাপতে হবে উপযুক্ত রয়েলটি দিয়ে। ওটা ছাপা হয়ে গেলে সুমিত্র উপাধ্যায়ের উপন্যাস পাবেন প্রকাশক। সংহিতা তখন মাত্র গল্পে হাত মক্স করছে—রান্নাবাড়াতেই তার হাত ব্যস্ত থাকত বেশি।

আপোষ করে সুমিত্র গীতার অপেক্ষায় রইল। কিন্তু আপোষ কি তেমন মেনে নিতে পারে সংহিতা? স্বামী যদি রোজ বাইরে যেতে থাকে অন্য নারীর মোটরে বা তাদের সঙ্গে আলাপ করতে তার সতিনি-ঈর্ষ্যা জন্মাতে বাধ্য। কিন্তু এসব ঈর্ষ্যা-টির্ষা তলিয়ে যায় স্বামীর যদি বিত্ত থাকে। কাজেই গীতা এলে গীতার উপর কড়া দৃষ্টি রাখল সংহিতা যেন জামাইবাবুকে দেখে গদগদ না হয়—সঙ্গে নিয়ে ঘুমোল এবং প্রায় সবটা সময়ই বাবার বাড়ির নানা খবর জানতে চেয়ে গীতাকে ঘরোয়া বানিয়ে রাখল। উপর থেকে দেখলে মনে হবে, অনেকদিন পর বোনকে পেয়ে সে সঙ্গছাড়া করতে নারাজ।

সব মেয়ে সেয়ানা। এই সিদ্ধান্তে এসে তবে রাত্রিতে একা ঘরে ঘুমুতে পেরেছিল সুমিত্র। একসময় শোভন আর গীতা যে বসবার ঘরে হাসাহাসি করছে তাতে সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিল ক্রমে।

সে-বিষণ্ণতা ঘুমেও কাটেনি। চায়ের পর যখন গীতা চলে যাচ্ছিল তখনও না।

বিষন্ন মুখেই জিজ্ঞেস করল সে সংহিতাকে,—গীতা যে তোমার সঙ্গে রাত কাটিয়ে গেল, বাড়ি গিয়ে কী বলবে?

—ও তো বন্ধুর বাড়ি থেকেই টেলিফোন করে দিয়েছে, বন্ধুর বাড়িতে থাকবে!

—তোমার বাবার টেলিফোনও হয়েছে—দেখছি ঠাকুরের কৃপা তো অগাধ!

উত্তর দিতে গেলেই ঝগড়া করতে হয়, তাই সংহিতা বাজারের ডাকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তবু সংহিতাকে বোঝা যায়, সেকেলে মেয়েলিপণা খানিকটা আছে। কিন্তু শুক্লা? পুরুষদের উপর সেয়ানা। মাতাহরির ভূমিকায় গ্রেটা গার্বোকে মনে পড়ল সুমিত্রর। কিন্তু কতো সেয়ানা আর হতে পারবে শুক্লা? সুমিত্রর চোখ ধরে ফেলেছে : মাতাহরি ইজ এ স্পাই! নইলে সে সেদিন মোটরে এসে তাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে হঠাৎ? এতো খাতির কেন ক্রমে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে এলো তার মনে। শালিগ্রামের পর সান্ন্যাল! পড়শী পি-বি সান্ন্যালেরই কেউ হবে! তার চারপাশে একটা ষড়যন্ত্র চলছে—নইলে কি, খবরের কাগজটার দিকে তাকালে সুমিত্র, ময়দানের সভায় সে বাদ পড়ে? মিছেই ভাবছিল কাল, রাষ্ট্রের সুনজরে সে আছে! আজই তার ধারণা বদলে গেল। এমন কি বিকাশকেও তার সন্দেহ হল। চীন-যুদ্ধের সময় যেম্নি বোঝা যাচ্ছিল না তাকে, সে ডানে কি বাঁয়ে—এখনও তাকে তেম্নি মনে হল। এর-ওর-তার মন ভাঙাতে একটা কিছু বললেই হল! পণ্ডিতজী তো নেই, এখন সব-কিছুই হতে পারে। এই তো স্বতন্ত্র পার্টির মওকা। রটিয়ে দিলেই হল, সুমিত্র উপাধ্যায় চীন-অ্যাম্বেসি থেকে টাকা খেয়েছে! খবরের কাগজের তো রটনাই পয়সা আনে বেশি—ঘটনার চাইতে! সান্ন্যাল তো সাংবাদিকই ছিল এককালে! রটিয়ে দিতে অসুবিধে কোথায়?

ভয় পেল না ঠিক সুমিত্র, পেলে তো স্নায়ু শিথিল হয়ে যায়—উত্তেজিত হয়ে উঠল তার স্নায়ু—মেজাজ বিগড়ে গেল। দুর্ঘটনা-থেকে-বেঁচে-আসা লোকের যেম্নি হয়। স্নায়বিক রোগই বলা যায় তাকে, যদিও ক্ষণস্থায়ী। সামনে কাউকে পেলে চেঁচিয়ে সে গালাগাল করে উঠত কিন্তু একা নির্জন ঘরে বলে কেমন যেন চোখে ঝিমুনি এলো। সোফায় অসাড় শরীরটা এলিয়ে দিল সুমিত্র। হয়তো ঘুমিয়েও পড়ল।

সংহিতা নতুন আকাশের খবর পেয়েছে—বুড়ো বাবা-মা, ভাই, ভাই-বৌ, বোনদের খবর. বাবাকে ঠিকেদারি করতে হয়েছে যুদ্ধের শেষেও কিন্তু ভাইদের যে বড়ো সে এঞ্জিনীয়র হয়ে বিদেশ ঘুরে এসেছে। এখন দুর্গাপুরে। গীতা গিয়েছিল। আয়রন-কোক-কেমিক্যাল্‌সের কথা নয়, স্বপ্ন দেখালো দামোদরের ধারে নিয়ন-আলা রাস্তাটার! বনের পাখীর কথায় খাঁচার পাখী একটু ছটফট করে উঠেছে বৈ কি! অন্তত আজকের সকালটা সে স্বামী-মনস্কতায় নেই।

শোভন ছোটমাসীকেই ভাবতে ভাবতে ড্রেন-পাইপে পোস্ট-অফিসের মোড়ে কাচা ড্রেন-বরাবর রাস্তাটায় দাঁড়িয়েছে। রোববার সকাল-বেলাকার শাড়ির মিছিলে তেমন মন থাকত না তার, ছোটমাসীর একটা কথায় সে সিঁদুর-পরা মেয়েদের ঠাটই লক্ষ্য করতে গেছে আজ। ছোটমাসী কাল বলছিল : বিয়ে হয়ে গেলেই কি একালের মেয়েরা বউ হয়ে যায় না কি!

কাজেই একা পড়ে থাকতে অসুবিধে ছিল না সুমিত্রর। বিকাশও যখন এসে উপস্থিত হয় নি।

যখন বিকাশ এলো, তার জুতোর শব্দেই জেগে উঠল সুমিত্র। একটু বিবর্ণ

দেখাচ্ছিল তাকে। লক্ষ্য করল বিকাশ।

—আপনি কি অসুস্থ সুমিত্রদা? বিকাশ উদ্বেগ নিয়ে বললে।

—না। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত্রিতে ভালো ঘুম হয় নি। সুমিত্রর স্বাভাবিক গলাই শোনা গেল।

বসল বিকাশ। কিন্তু সুমিত্র ভাবছিল, সে ঘুমিয়েছিল কি না। যদি ঘুমিয়েও থাকে, ঘুমোবার আগে সে গীতাকে ভেবেছিল কি না। যোধপুর লেকের জলে একটি মেয়ের আত্মহত্যায় গীতা এসে জড়াল কী করে। এ কী তার ভাবনা, না স্বপ্ন? দুঃস্বপ্ন যদি ভাবনা না-ই হয়, ভয় পেতে সুরু করেছিল সে—কী করত বলা যায় না—ভাগ্যিস বিকাশের জুতোর শব্দ হল।

বিকাশ ধূর্ত না হোক, মেজাজ বুঝবার ক্ষমতা তার আছে। যে ভবিষ্যতে সুপ্রিয়র দাদার মতো পাব্লিক রিলেশন অফিসার হবার বাসনা রাখে এবং এখুনি যে জলপাইগুড়ি, বীরভূম, মেদিনীপুর, বহরমপুর—ইস্তক ঢাকার যুব-সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে ফেলেছে, একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের সহজতর মেজাজ সে বুঝবে না? কাজেই পকেটস্থ আমন্ত্রণ-লিপিগুলো পকেটেই চেপে সে সুমিত্রর মেজাজোচিত প্রসঙ্গে এলো। সে জানে অভিজিৎ রায় সম্পর্কে সুমিত্রদার ধারণা ভালো নয়, তাই সে সুরু করলে,—জানেন সুমিত্রদা—আমরা ভেবেছিলাম ওই প্লটটা বুঝি অভিজিৎ রায়দের—যেখানে সার্বজনীন দুর্গোৎসব হয়। বাপ চোর, ব্যাটা মাতাল—ওদের জায়গায় হবে দুর্গোৎসব! ওটা বেচে-দেওয়া প্লট! কসবায় মেয়ের বাড়িতে থাকেন, এক বিধবা মহিলা ও-প্লটের মালিক তিনিই। সার্বজনীনের চাঁইদের ধরে জানা গেল। গেলাম। জওহরলাল নেহরুর শোক-সভা—জায়গাটা ব্যবহার করতে চাই, আমি বেপাড়ার হলেও বললাম পাড়ারই লোক আমরা। হয়ে গেল! কী বলেন সুমিত্রদা, মেয়েরা জওহরলালকে একজন মহান পুরুষই ভাবতেন!

পৌরুষের বিচারে না গিয়ে সুমিত্র তার অভ্যস্ত খোশামোদের ভঙ্গীতে বললে, —তোমাকে ঠেকায় কে? জলপাইগুড়ি থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত তোমার নাম শোনা যায়—আর কসবার মহিলা শুনবেন না?

ইঁদুরের আওয়াজ, ঘুমিয়ে থাকলেও বিড়াল শুনতে পায়। সুমিত্রার পর সংহিতা এলো,—ভাবলাম ভুলে গেলেন না কি! সভার কী হল?

—সে-কথাই তো বলছিলাম বৌদি, সুমিত্রদাকে—বিকাশ বিস্ফারিত হয়ে বললে, —সত্যি বলতে, মহিলারাই পণ্ডিতজীকে ভালোবাসতেন!

পণ্ডিতজী হলেও স্বামীর সামনে এই অনুরাগের কথা হয়তো কোনো বাঙালী মহিলা শুনতে রাজি নন—তাই সংহিতা কথাটার মোড় ফেরাতে চাইলে,—আপনি যখন আছেন, সভা হবে জানি। কোথায় জায়গা হল?

—গড়িয়াহাটায় সার্বজনীনের প্যান্ডেল যেখানে হয়।

—বেশ ভালো জায়গা! বলল সংহিতা,—প্যান্ডেল হয়ে গেছে?

—হতে আর কতোক্ষণ? পার্কেই তো ডেকোরেটারদের দোকান আছে। আর সভা তো কাল!

—কাল কেন? ময়দানে আজ সভা হচ্ছে। আজই তো ভালো ছিল। সংহিতা যেন ময়দানের সভার দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলে।

যা বলবার সংহিতাই যখন বলছে, উদাসীন দৃষ্টিতে সুমিত্র 'সত্যমেব জয়তে'র দিকে

তাকিয়ে রইল।

—ছাপাখানা থেকে কার্ডগুলো বার করতে পারব, আশা ছিল না—তাই একটা দিন হাতে রাখব ভাবলাম।

—তা ভালোই করেছ। সুমিত্র বিকাশকে ঘাঁটাতে চাইল না, সংহিতাকেও না। বিকাশ থেকে চোখ তুলে সংহিতার মুখে রেখে বললে,—বিকাশকে চা-টা দাও! বেচারি হয়তো কার্ড বিলিতে সারা সকাল কাটিয়ে এসেছে। সংহিতা উঠে গেল।

—হাঁ সুমিত্রদা—প্রায় একাই সব করতে হচ্ছে! জানেন তো এলাকাটা চীন-পন্থীদের।

তা জানে সুমিত্র, তার উপর এ-কথাও জানা হল যে চীনপন্থীদের সঙ্গে বিকাশের ইদানীং বনিবনাও হচ্ছে না। ড্রাগনের দাঁতে বিষ—প্রবন্ধটায় বিকাশ মাঝামাঝি চলেছিল —এ-ও হয়, ও-ও হয়। অনেকটা তার নিজেরই মতো। তাই যে জায়গায়ই তখন বিকাশের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে—সাক্ষীর হলপ-পড়ার মতো সুমিত্র বলেছে,—সর্বসমক্ষে বলে যাচ্ছি বিকাশ, তোমার প্রবন্ধটি খুব ভালো হয়েছে। এখন একটু গোলমালে পড়ে বললে সে, —কার্ড এনেছ—দেখি। এসেই কার্ডটা কেন দেখাল না বিকাশ, তা ভেবে ভেতরে একটা অস্থিরতা অনুভব করছিল সুমিত্র। তাছাড়া সেই দুই বন্ধুও আজ তার সঙ্গে নেই! বাংলাদেশে কোন্ রাজনৈতিক দল উঠতি, পড়তি বা কি তার খবর সুমিত্রর নখদর্পণে—সে-ব্যাপারে সে 'বিয়ার এন্ড বুল'—সাহিত্যও তার তেম্নি ধারায় চলেছে। এমন কি, তার সর্বশেষ রচনায় যে পিতৃতর্পণ করেছে সে তা জওহরলালের দিন ফুরিয়ে এসেছে ভেবেই। হতে পারে, ভুল হয়েছিল, এবং সে-ভুলের ফলেই ময়দানের সভায় সে আহূত নয়। কিন্তু তা-ও বা কে বলবে, এ-ভুল যে একদিন উচিত বলে গণ্য হবে না! এ-কথা তো মিথ্যা নয় যে ক্ষাত্রবীর্যের সঙ্গে শিল্পকলা গাঁটছড়া বেঁধেছিল একসময়।

কার্ডটা পকেট থেকে বার করতে একটু ইতস্তত করছিল বিকাশ, সেই অবসরে অনেকগুলো কথাই মনে এলো সুমিত্রর এবং নীরব কথার শেষে সরবে বললে,—এনেছ সঙ্গে?

—যেন হাসিতেই একটা অপকর্ম মুছে দেওয়া যায় তেম্নি মুখব্যাদান করে বিকাশ একটা কার্ড পকেট থেকে বার করে বললে,—আপনি পছন্দ করবেন না জানি—তবু কাজটা করতে হল।

সুমিত্র হাসল না। কার্ডটা বিকাশের হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে তার উপর চোখ রাখলে খানিকক্ষণ।

বিকাশ শুকনো ঠোঁট চাটতে লাগল জিব দিয়ে। কারণ সে-ও রণেন মিত্রের বুড়ি ছুঁয়েছে এবার। সভার প্রধান অতিথি রণেন মিত্র।

সুমিত্র মুখ তুলে তাকাবার আগেই একটা কৈফিয়ৎ দিতে গেল বিকাশ,—বৌদিও যা ভাবছিলেন, আমিও ভেবেছি, জানেন, ময়দানের সভার একটা ইউনাইটেড চ্যালেঞ্জ দরকার। রণেনদাকে সে-কথা বললাম। সমর্থন করলেন তিনি।

—সুমিত্রর কানে শুধু হয়তো 'রণেনদা' শব্দটাই এলো—আর কিছু না। বিত্তবানদের সহজাত বিরোধিতায় তো ভুগছিলই সুমিত্র তার উপর বিকাশের 'রণেনদা'র দুর্ঘটনায় পড়ে আবার সেই ঘুমের আগেকার মানসিক পরিবর্তন ঘটল তার। এবার স্পষ্ট স্নায়বিক বিকারই ধরা পড়ত বিকাশের কাছে যদি সে সাইকিয়াট্রিষ্ট হত।

মুখ তুলল সুমিত্র। বিবর্ণ মুখ গোলাপী হয়ে উঠেছে। রুদ্ধশ্বাসে যেন বলতে পারল সুমিত্র,—আমি যাব না।

যে-সন্দেহে বিকাশ এসেই নিমন্ত্রণ-পত্রটা দেখাতে চায়নি তা-ই ফলল দেখে শুকনো ঠোঁট আবার চাটল সে। খুবই অবনত হয়ে বললে,—অনেকেই রণেনদার কথা বলছিলেন কি না...

থুতনি উঁচিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সুমিত্র,—কে? পি-বি সান্ন্যাল? স্বতন্ত্র পার্টি? কে? আমার অনুমতি নিয়েছিলে আমার নামের সঙ্গে রণেনের নাম বসাবার আগে?

ধূর্ত হলেও বিকাশ এই চড়া মেজাজে ঠান্ডা হয়ে গেল।

সুমিত্র কার্ডটা ছুঁড়ে দিয়ে বললে,—আমি যাব না। যাও হেরম্বকে সভাপতি করো।

চলেই যাবে কি না হয়তো ভাবছিল বিকাশ, সংহিতা এসে দৃশ্যটার পরিবর্তন ঘটালে। চা আর দুটো ব্রিটানিয়া বিস্কুট নিয়ে হাসি মুখেই সে ঢুকল ঘরে। সুমিত্র এতো জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিল যে তা তার না শোনবার কথা নয়। শুনেছে সংহিতা আর এ-ও সে জানে আজ যে সুমিত্রর মেজাজ খারাপ। গীতাই তার কারণ। কিন্তু সংহিতাও বা কী করে জানবে অনেক কারণে যাতে গীতা একটি বিন্দু মাত্র।

—কী চেঁচামেচি সুরু করেছ? হাসি মুখেই ধমকে উঠল সংহিতা সুমিত্রকে এবং হাসি মুখেই বিকাশকে বললে,—শুধু চা-ই খেতে হবে। কিছুই করতে পারিনি। ছোট বোনটা কাল বিকেলে এসে সব লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেছে।

এবার ধূর্তামির পরিচয় দিলে বিকাশ। হাসি-মুখে বৌদির হাত থেকে চা-বিস্কুট নিয়ে ছোট বোনের আলাপে চলে গেল,—বাঃ, আপনার ছোট বান? কখনো দেখিনি তো।

—ওরা একেলে মেয়ে, সেকেলে দিদির বাড়িতে কি আসতে চায়। মর্জি হল, এলো।

সশব্দে বিস্কুট চিবিয়ে বললে বিকাশ,—যা বলেছেন, বৌদি! এখনকার ছেলেমেয়ে বড্ড বেশি চাপা। কী যে ওরা ভাবে আর কী যে ওরা বোঝে বলা মুশকিল।

ক্যালেন্ডারে তাকিয়ে শান্ত হয়ে আসছিল সুমিত্র—তা একত্রিশ মে'র জন্যেও নয়, রবীন্দ্রনাথের 'ঋতুরাজে'র জন্যেও নয়, ক্যালেন্ডারে পাঠনিরত রবীন্দ্রনাথের ছবির জন্যেও নয়। এই রোগের স্বভাবই তা-ই। কয়েক মিনিটে শান্ত হয়ে আসা। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়বে তখন। আলাপেও যোগ দেবে। কিন্তু শান্ত হলেও এ-মুহূর্তে সুমিত্র উপাধ্যায় ভাবতে পারছিল না তার আর কিছু বলবার আছে।

—সব পাগলা হয়ে গেছে আর কি! সুমিত্রকে এক পলক দেখে নিয়ে সংহিতা বললে। সে ধরে নিয়েছিল, গীতার সঙ্গে কথা বলতে এসেও যে সুমিত্র কথা বলবার সুযোগ পায়নি, তার জন্যেই মেজাজ খিঁচড়ে আছে সুমিত্রর।

—আমরা সবাই তা-ই বৌদি—বাড়িটাকে ভাবি কয়েদখানা! দারিদ্র্য আর রুগ্না স্ত্রী যাকে বাড়ির বাইরে রাখে আঠারো ঘণ্টা, বাড়ির আরাম উপভোগ করে বললে সে।

—অনেকে তো দেশকেই তা-ই ভাবে। সংহিতা হাসলে। ইঙ্গিতটা সে রণেন মিত্রকেই করছিল যে নিজের পয়সায় বিদেশ ঘুরে এসেছে।

সমস্ত দাঁত দেখিয়ে আবার হাসল বিকাশ,—ওটা, বৌদি, পণ্ডিতজী আন্তর্জাতিকতার হাওয়া এনে দিয়েছেন বলে!

এবার কিছু বলতে পারত সুমিত্র। কিন্তু তখন মাত্র সে ঘামতে সুরু করেছে।

চা শেষ হয়ে গিয়েছিল বিকাশের। কাপটা রেখে তারও বোধহয় হঠাৎ মনে হল, ঘামের দিন যে সামনে পড়ে আছে। আর হঠাৎ-ই—চলি বৌদি—বলে ইঁদুরের মতো নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

সতেরো

হিস্টিরিয়া। পাড়ার ডাক্তারবাবু সন্দেহ করে গেলেন। সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হবে। তাতে অসুবিধে ছিল না অসিতরঞ্জনের। ডক্টর দেব আছেন, একসঙ্গেই, এক কলেজে আই-এস্-সি পড়েছেন, তারপর অবশ্যি ছাড়াছাড়ি। কিন্তু বালিগঞ্জেই তাঁর হসপিটাল— দেশপ্রিয় পার্কে একদিন দেখা হয়ে গেল। তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন অসিতরঞ্জন, চিকিৎসক হিসেবে তাঁকে বাড়ি ডেকে আনতে হবে। পূর্ব-পরিচয়ের হৃদ্যতা প্রৌঢ় জীবনে যেমন সৌজন্যে পরিণত হয়, ক্বচিৎ-কদাচিৎ দেখাশোনায় তেমনি পরিচয়ই অমিয়কৃষ্ণের সঙ্গে থেকে যাবে অসিতরঞ্জনের তা-ই ভেবেছিলেন তিনি। কিন্তু অমিয়কৃষ্ণ সহৃদয় ব্যক্তি। মনের দিকে বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে তাকালেও, হৃদয়বত্তায় খাঁটি বাঙালী। মিত্রাকে মেয়ের মতোই প্রশ্ন করতে লাগলেন—গান আর পড়ানোর কথাই বেশি তারপর যতোটুকু চোখ আর পাল্‌স দেখা। অসিতরঞ্জনের কাছ থেকে ইতিহাস তাঁর শোনা ছিল, সেদিনকার চীৎকার সহ, মেয়ের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে যতোটুকু ইতিহাস বলেছিলেন অসিতরঞ্জন ততোটুকুই। ডায়গোনাসিস—হিস্টিরিয়া, অষুধ আপাতত ট্র্যাঙ্কুইলাইজার। ভায়োলেণ্ট না হলে শকের কথা ভাবেন না অমিয়কৃষ্ণ।

বিজ্ঞানী মানুষ অসিতরঞ্জন নিশ্চিত। কলকাতার ফাস্ট লাইফের সঙ্গে মেন্টাল পেশেন্ট বাড়ছে শুনে আরো নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু কৃষ্ণ-ঠাকুরের ভোগ-আরতিতে অভ্যস্ত কনকলতা তাতে পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারেন না। তিনি মেয়েকে মীরার ভজনে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করতে পারতেন কিন্তু তার চাইতে বেশি ফলপ্রদ মনে হল তাঁর দক্ষিণেশ্বর কালী। পুরনো প্রস্তাবটা পেশ করলেন তিনি স্বামীকে। স্বামী-স্ত্রী ও'রা তো যাবেনই স্থির করেছিলেন। সঙ্গে মিত্রাও চলুক। ছুটির দিন। রবিবার। সিপ্রার, অলকের স্কুল-কলেজ নেই। বাড়ি থাকবে। নিশ্চিন্ত।

স্ত্রী-কন্যা-সহ এঞ্জিনীয়র অসিতরঞ্জন দক্ষিণেশ্বর কালী দেখতে চললেন। একদিন যে তিনি বলেছিলেন শিবপুরে তিনি শিবের গাজন শিখে আসেননি, তা তাঁর মনে এলেও নিশ্চয় পাল্টাপাল্টি ভেবেছেন।

সকাল আটটার পরই বাড়ি এক-রকম খালি। রেডিওগ্রামে বসল সিপ্রা। তারপর ক্যারাম-বোর্ডে তাকালো। মেজদি নেই, কে খেলবে? দাদা সেই যে খবরের কাগজে মুখ-চোখ গুঁজেছেন, বাড়ি আছে কি নেই বোঝা-ই যায় না। নেপালী বাহাদুরকে নিয়ে চলে যাবে না কি কোনো বন্ধুর বাড়ি। সে-ই ভালো। তনুপুকুরের রত্না। সঙ্গে বাহাদুর শুধু বাহাদুরীর জন্যে। নইলে তনুপুকুর আর কদ্দুর? একাই বেশ যাওয়া যায়।

অতএব সিপ্রাও বেরোল।

ঝি রান্না ঘরে। গোল বারান্দায় অলক।

প্যাট্রিয়ট হাতে ছিল বটে, কিন্তু অলকের মন পেন্ডুলামের মতো রুশ-পন্থায় আর চীন-পন্থায় দোলা খাচ্ছিল। সম্প্রতি যাদবপুরের ছেলেরা রুশ-পন্থায়ই ভিড়েছে বেশি। দূর ছাই! কে যায় ওসব পন্থায়? তার চাইতে মহাজন যেন গত সে পন্থাই ভালো। জওহরলালের সমাজতন্ত্রবাদ। বিজ্ঞান-টিজ্ঞানের ঝামেলা নেই। হিউম্যানিটি পড়েও যার ইজ্জৎ রক্ষা চলে! মুশকিল, সেখানেও বোদলেয়ার—ঈশ্বর আর শয়তানের টেনিস বল—এ ছাড়ে তো, ও ধরে। তার চাইতে পুরনো গুরুদেবই ভালো। এই তো শোনা গেল :

'মন মোর মেঘের সঙ্গী...'। চলে যাব আবার শান্তিনিকেতনে। এবার না কি অকাল-বর্ষা ওখানে। সন্দীপের চিঠিতে জানা গেল। নামটিও রেখেছিল ওর বাবা-মা। গুরুদেবের মহামানবের! সোমা বিয়ে করতে কলকাতা পালিয়েছে—এখন মন তার মেঘের সঙ্গী! গেলে অবশ্যি বলা যায়—অলক অলকা থেকে এলো। কিন্তু মেঘদূত তো নই! সুপ্রিয় সেয়ানা। সে চায় স্ত্রী তার সতী থাক্, আর সব মেয়ে অসতী! ভালো করে আলাপ পর্যন্ত করিয়ে দেয়নি, বৌ-ভাতের দিন, সোমার সঙ্গে! দেখাদেখি হতে দু'জনেই যে অবাক হয়েছিলাম—ঠিক নজর রেখেছে সুপ্রিয়! সন্দীপকে জানানো হয়নি। কতো খবর যে চেপে রাখতে হচ্ছে—আমিও না শেষটায় দিদির মতো হিস্টিরিয়ায় ভুগি! না-না, শান্তিনিকেতন যাওয়া হবে না।

অলক গেটে তাকালো। বিকাশকে চাইছিল সে মনে-মনে। এখন জোরে জোরে কথা বলে যদি তাকে মনে-মনে কথার থেকে রেহাই দেয়। একা থাকা যে কী বিশ্রী!

বাবার কথা ভাবাই ভালো। বেশ ইন্টারেস্টিং! কী প্রগাঢ় প্রেমই না ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার উপর! কেননা, সেখানে এঞ্জিনীয়ারদেরই সব চাইতে বেশি সমাদর। বাবা তাঁর বিদ্যাটাকে মার চাইতে বেশি ভালোবেসেছিলেন! ব্রাহ্ম হলে মা হয়তো চারুলতাই হয়ে যেতেন—হিন্দু হয়ে রক্ষা। হিন্দুরমণীর যে কেন্টঠাকুর আছেন এ তো শুধু বাঙালীআনা নয়, রাজস্থানেও চালু হয়েছে!

একা-একাই মজা পেয়ে হাসতে লাগল অলক। সোমাকে সন্দীপকে মনে পড়ল! আহা! কোপাই-এর ধারে কতো প্রগাঢ় সন্ধ্যা অথবা বোলপুর ওয়েটিং-রুমে! তবু সন্দীপের একশ্চন্দ্র! সুপ্রিয়র তো অসংখ্য তারা। তাতেও তমোহনন হচ্ছে না। সোমা-তেও না! কাল সন্ধ্যার পর তো দেখলাম, একটি তারকা নিয়ে যোধপুর পার্কে ঢুকছে। মেয়েটাকে না আত্মহত্যা করতে হয় যোধপুর পার্কের লেকে। করেছিল না কি কে!

এখানে এসেই থেমে গেল অলক। তাদের বাড়িতেও যা হয়ে চলেছে—অন্যকে ভেবে কী লাভ। দিদির কথা, চিত্রার কথা যে বন্ধুবান্ধব কেউ শোনায় না তাকে, সে তো তাদের দয়া, সৌজন্য! মেয়েদের প্রতি একটা বৌদ্ধ অনীহা-ই এসে যাচ্ছে তার।

বাবা-তেই ফিরে এলো সে। মজার মানুষ বাবা। যে গ্লাসে রাখো, তেমনি চেহারা। এখন মার গ্লাসে আছেন। দপ্তরের কাঁচের গ্লাসে আর নয়। শ্বেতপাথরের গ্লাসে। মা যদি আগে মারা যান—বাবা তাজমহল তৈরী করতে পারেন। পয়সার টানা-টানিতেই যদি কবিতায় বা গীতায় ঝোঁকেন! সবাই এমনি! গ্রীক নাটকের অভিনেতা। মুখোশ পাল্টাচ্ছেন। এ-জন্যেই ও-নাটকগুলোকে ক্ল্যাসিক্স বলে কি না জিজ্ঞেস করতে হবে রীডারকে।

সঙ্গে-সঙ্গেই অলকের মনে না পড়ে উপায় ছিল না, বাড়িটা যে আধুনিক নাটকের মঞ্চ হয়ে উঠেছে। মনে পড়ল সিপ্রাকে। গান বন্ধ করে মেয়েটা কী করছে? দাঁড়িয়ে গেল, অলক। কিন্তু অশোভন কিছু দেখবার আশঙ্কায় ভেতরে গেল না। ডাকল,—সিপ্রা—উঁচু গলাতেই ডাকল।

কী দাদা? সাড়া শুনবার অপেক্ষায় রইল অলক। কিন্তু সাড়া এলো না। ভুরুতে ভাঁজ পড়ল তার। কিন্তু তবু ভেতরে গেল না। রেলিং-এ ঝুঁকে বাহাদুরকে ডাকল। সাড়া নেই। ও-ছোকরা গেল কোথায়?

দাঁড়িয়ে থাকা আর চলে না। কিন্তু দাঁড়াতেই হল। আশ্চর্য! গেট খুলে সুপ্রিয়

আসছে। সুখী-সুখী চলা—বরাত-ভালো ছেলে। অলকের চোখ পড়তেই তেমনি উঁচু গলায় বললে সে,—এসো, মাই ডিয়ার!

—সিঁড়িটা কোন্ দিকে? ফুলের পরিবেশ থেকে কথাটা ছুঁড়ে দিলে সুপ্রিয় উপরে।

—আমি যদি জুলিয়েট হতাম, হেসে উঠল অলক।

—তাহলেও লতা বেয়ে উঠতে আমি রাজি নই—সিঁড়িটা বলো!

—বাহাদুর থাকলে সে-ই বলে দেবে!

—কোথায়? তেনজিং-এর দেশোয়ালিকে তো দেখছিনে!

—তাহলে দরজা খুলে সামনেই পাবে।

বাহাদুরের অনুপস্থিতি বা সিপ্রার নীরবতা ভুলে গিয়ে সিঁড়ির শব্দে কান পাতল অলক। কিন্তু মনে এলো সিঁড়ি যে আধুনিক কবিদের এক মস্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে—যে-কবিয়ালদের খোশামোদ করে বিকাশ দাদা বনতে চায়! বিকাশ এখন না এলেই বাঁচে অলক। সে তো আর তার সভায় যাচ্ছে না—যে-সভার সভাপতি সুমিত্র উপাধ্যায়! পদ্ম-বিভূষণ! কী অন্যায়! মৌমাছি পাঠক ওই পদ্মমধুর লোভে দৌড়ুবে ও-দিকে! ইন্স্টিংক্ট-এ চরিতার্থতায় ঝাঁক-ঝাঁক নিওলিটারেট ভাববে এই তো আমাদের রবীন্দ্রনাথ! বাঃ, চমৎকার—সূর্য-চন্দ্র অস্ত গেছে, প্যাঁচার কী সুখ : ধরা যাক্ দু'একটি ইঁদুর এবার!

—বাড়ির মশা-মাছি শুধু তাড়িয়ে বসে আছো—ব্যাপার কী, অলক? গোলগাল চেহারার লোকের মতোই রসিকতা মুখে নিয়ে বারান্দায় ঢুকল সুপ্রিয়।

—ওয়েটিং ফর সাম্ বডি। অলক অল্প হাসিতে বললে,—বোসো।

—তা তো বোঝাই যাচ্ছে, যখন দুটো চেয়ার পেতে দাঁড়িয়ে আছো!

দু'চেয়ারে দু'জন বসে কেউ কারো কথা ভাবছিল না যখন, তখন অলক বললে, —তোমরা বিবাহিতরা কী ভাববে জানিনে, আমার মনে হয় পাশাপাশি দু'জন পুরুষই বসতে পারে, কিম্বা দু'জন মেয়ে।

—ড্রাইভিং জানো? জানলে ও-কথা বলতে না!

—জানলে অ্যাক্‌সিডেন্ট হত।

—হাসপাতালে ঘোরাফেরা করেছি জানো তো? অ্যাকসিডেন্টকে ঘটনাই মনে হয় না।

মন্দ লাগছিল না অলকের নিঃসঙ্গতায় সুপ্রিয়কে পেয়ে কিন্তু সুপ্রিয় যে বরাবর সকাল-বেলা রমণীসমাজ ছেড়ে তাকে পেতে এলো তা বুঝতে এখন কষ্ট হচ্ছিল তার।

—সুপ্রিয় খবরের কাগজে একটা চকিতদৃষ্টি দিয়ে বললে,—'অ্যাশ্ স্যাটারডে' পড়েছ? এ-রায়ের লেখা বাবা খুব সুখ্যাতি করছিলেন! চিতাভস্মের আদর হলে বুড়োদের তো খুশী হবারই কথা!

হালকা পর্দাটা মুখ থেকে সরে গিয়ে কেমন-যেন একটু পাথুরে দেখালো অলকের মুখ।

দাদার মতো সজ্জনের তালিকায়ই সুপ্রিয় অলকের নাম লিখে রেখেছে আর এখন সে অলকের কাছে এসেছে গায়ে খানিকটা সজ্জনতার হাওয়াই লাগাতে—কাজেই অলকের মুখের রঙ-বদলটা লক্ষ্য করে সে বললে,—যে যা-ই বলুক অলক, অভিজিৎ রায়ের কলমের হিম্মৎ আছে—কী বলো?

—পড়ব। সংক্ষেপে বলল অলক।

—পাড়াটার আভিজাত্য বাড়িয়ে দিলে এ-আর।

—তোমার হাওয়া বা কম যায় কিসে! নাটক আকাদামীর নজর পড়ল বলে তোমার উপর! অলক আবার অল্প একটু হাসলে।

—ঐ—ঠিক যা বলতে এসেছি তোমাকে! আমি কি জানি "চিত্রাঙ্গদা"য় এসে জুটবে কোন্ হাংরি না মাংরি! করেছ তো মৃতসৈনিকের অভিনয়—বাড়ি চড়াও হল এসে একদিন। নাম বেশ ইতিহাস-বিখ্যাত : অশোক!

—অশোকস্তম্ভের মতো সর্বত্রই তো ইদানীং ছড়িয়ে আছে এই নাম, ইস্তক হোটেলে!

—সে-বিখ্যাত হোটেল দেখলেও তো বলতাম—আড্ডা দেয় লেক-মার্কেটের রেস্তোরাঁয়! আমি-ও মরতে গিয়েছিলাম বালিগঞ্জের সংস্কৃতিতে!

শয়তানের মুখেও একদিন অনুশোচনা শোনা যায়! শুনতে মজা পেল অলক—বললে,—তোমাদের বাড়ি আসতে সুরু করেছে, অশোক—এইতো? ওরা তো প্রচার চায়! সুব্রতদা প্রচার-সচিব!

—কিন্তু মুশকিল তো সুব্রতদার মেয়ে "চিত্রাঙ্গদা" করেছিল।

—অশোক তো আর অর্জুন করেনি!

—কিন্তু নিজেকে অর্জুন ভাবলে তুমি কী করতে পারো

—আমি কী পারব! গুরুদেব থাকলে বুঝতেন কি করা যায়!

—না-না অলক! ওসব ছেলে এখন মেয়েদেরও নষ্ট করতে সুরু করবে!

দেখা গেল রাজ্যচ্যুতির ভয়ে শয়তান সন্ত্রস্ত! এবার অলক মজা না পেয়ে বললে, —মেয়েদের প্রতি একটু নিস্পৃহ হতে শেখো, সুপ্রিয়! যা-খুশী ওদের হতে দাও।

সজ্জনের কথা কিন্তু তার হাওয়ায় অবিকল সজ্জন হতে পারল না সুপ্রিয়। বললে, —মলুয়ার এক বন্ধু এসেছিল কাল—ওর পেছনেও লেগেছে অশোক!

—ও, যাকে তুমি এস্কর্ট করছিলে!

—তাহলে তো দেখেছ! সংহিতা উপাধ্যায়ের ছোট বোন!

এবার আবার মজা পেল অলক, সুপ্রিয় সুমিত্র উপাধ্যায়ের নাম করল না বলে। যা-হোক আর তা-হোক, রবীন্দ্র-সংস্কৃতি সুপ্রিয়র খানিকটা আছে। আর সোমা আসবার পর তো তার চাপমাত্রা উপরেই উঠবে, নীচুতে নামবে না। সোমার পাশাপাশি মার কথাও ভাবলে অলক। মা না থাকলে কি দিদির গান হত আর তার বাগান-বিলাস! সবুজ পাতায় ধরা ফিকে-মেজেন্টার চোখ নিলে অলক। মিত্রাকে ভাবলে। ভাগ্যিস দিদির গানের গলা তাই সেদিনকার সেই চীৎকারটা কান্নার মতো শোনালে, নইলে কী বিশ্রীই না শোনাত।

—ধরতে গেলে তো নাবালিকাই গীতা—মলুয়ার বয়সী। ফানে উৎসুক। যদি শুনতে অশোকের গলা—হাউ ফানি! সুপ্রিয় সব ছেলেকেই যেম্নি পিঁপড়ে ভাবে তেম্নি ভাব নিয়েই বললে।

—তুমি তো তোমার সৌজন্যে সব বয়সীদেরই টানতে পারো!

—আর তুমি তোমার সজ্জনতায়!

একটু চমকালো অলক। সোমা সুপ্রিয়কে তার কথা কিছু বলেছে না কি? কিন্তু সোমার কী-ই বা বলবার আছে! শান্তিনিকেতনে এক বছরের বেশি সোমা তাকে দ্যাখেনি। বসন্তোৎসবের কাঠিনাচে ওই একবারমাত্র পার্টনার হয়েছিল। তখনই যা-কিছু আলাপ। বন্ধু সন্দীপের আলাপিতা ও। সন্দীপ ওর উপর যথেষ্ট প্রলাপ বকত কিন্তু এমন লাজুক

নাচতে চাইল না! কলকাতায় এসে শুনেছে, বন্ধুদের নাকি বিশ্বাস করতে নেই—অদ্ভুত, অদ্ভুত—কথাটা মনে-মনে বলে সুপ্রিয়র মুখে তাকিয়ে তৃতীয়বার অল্প একটু হাসল অলক।

—পাড়ার সুখবর শুনেছ? সুপ্রিয় পালিশতর হয়ে বললে।

—বিকাশের সভা?

—ওটা দুঃসংবাদ। এ-আর গ্র্যান্ড-পা হয়েছেন!

—তা-ই না কি? তুমি ফাদার হচ্ছ কবে?

—তোমাদের ফাদার ফালোঁর মতোই হব একদিন দেখবে!

—সৌজন্যে প্রায় হয়ে গেছ, কিন্তু পা-পা!

—হাঁটি-হাঁটি পা-পাদের উপর বিন্দুমাত্র আমার আকর্ষণ নেই—যেম্নি আটমাস তেম্নি আশিবছর বয়সী!

—তাহলে অভিজিৎদার খবরটাও তোমার দুঃসংবাদ হওয়া উচিত ছিল!

—আমি তো বেপাড়ার মানুষ—এ-পাড়ায় অতিথি!

—সে কী? বাড়ি ছাড়বার মতলবে আছো না কি?

—দাও না তোমার অভিজিৎদাকে বলে একটা কিছুতে ঢুকিয়ে। সাংবাদিকরাই তো আজকাল রাজামানুষ! একটা-কিছু হলেই কেটে পড়তে পারি!

—কোন্ ভূত তোমাকে কিলোচ্ছে বলো তো, সুপ্রিয়?

অলকের গাম্ভীর্যটা হেসে ফাটিয়ে দিতে চাইল সুপ্রিয়,—বাবার ভূত। না মরেই যিনি ভূত হয়ে গেছেন!

হাসল অলক। দুঃখ-মিশেল হাসি। বললে,—বেঁচে থেকেও বা আমাদের কী ভবিষ্যৎ আছে?

—কী থাকবে আবার? পঞ্জাবসিন্ধুগুজরাটমারাঠাদ্রাবিড়উৎকল বাদবাকি বঙ্গটুকু গিলে নেবে! আমরা গ্রাস। ইঙ্গবঙ্গ দু' অর্থেই!

—আমাদের নিয়ে ওই তো মুশকিল!

—মুশকিলটা কোথায় দেখলে? আমরা জানি আমরা কী কিন্তু জানাতে চাইনে অপরকে। কেউ রবীন্দ্রনাথের টুপি পরে আছি, কেউ জওহরলালের!

—হুঁ। ক্রুশ্চফ-মাওসেতুং-এর টুপি নেই।

—তাইতো আমিও টুপি পরি। বুঝতে পারছ না? চওড়া হাসিতে দাঁত দেখিয়ে দুহাতে অলককে ঠেলে দিলে সুপ্রিয় তারপর উঠে দাঁড়াল,—চলি, কী বলো?

সুপ্রিয়র খাটো বুশ-শার্টটাকেই টানল অলক,—বোসো। ঝি আছে। চা তো চলবে। তুমিও একা, আমিও একা—বোঝাই যাচ্ছে!

বসল সুপ্রিয় কিন্তু চুপচাপ নয়, বললে,—চরিত্রহীনের ভালগারিটিতে চলে যাবো না তো?

[কার্ত্তিক-পৌষ সংখ্যায় সমাপ্য]

মস্কোয় এক সপ্তাহ

অম্লান দত্ত

মস্কোতে আমরা ছিলাম সাতদিন। ৩রা অগাস্ট পৌঁছি, ১০ই অগাস্ট মস্কো ছেড়ে যাই। গোটা সপ্তাহটা রাজধানীতেই কেটেছে; শহরের বাইরে যাবার অনুমতি আমাদের ছিল না।

ওদেশে এখন সরকারী নিয়ন্ত্রণ আগের চেয়ে লক্ষণীয়ভাবে শিথিল। প্রতি বৎসর বহু বিদেশী আসছেন। ভিজা পাওয়া সহজ। আমরা যদিও আমেরিকা থেকে লণ্ডনের পথে মস্কো যাত্রা করি তবু মস্কোতে প্রবেশের সরকারী অনুমতি পেতে কষ্ট হয় নি। তবে সাধারণ দেশপর্যটক হিসাবে ওদেশে যাওয়া ব্যয়সাধ্য—সরকারের অতিথি হিসাবে গেলে অবশ্য অন্য কথা। পর্যটকদের ভিতরও কেউ কেউ শুনেছি বিশেষ সুবিধা পান; আমরা পাই নি। ওদেশে প্রবেশ করবার আগেই হোটেলভাড়া ইত্যাদি চুকিয়ে দিতে হয়েছে, এবং পৌঁছবার পর সোভিয়েত 'ইনটুরিস্ট' নির্দিষ্ট হোটেলে থাকতে হয়েছে। হোটেলে বাস করবার এবং খাবার ব্যবস্থা করেই এঁরা ক্ষান্ত হন না; ঘুরবার জন্য গাড়ী (দিনে তিন ঘণ্টা) এবং সঙ্গে দোভাষী দেন। এসব সুবিধা আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে। এর আগেও বহুদেশে আমার যাবার সুযোগ হয়েছে, নরওয়ে থেকে জাপান পর্যন্ত। যেসব দেশের ভাষা আমি জানি না—কিন্তু আগে থেকে সর্তবন্ধভাবে দামী হোটেল, গাড়ী, দোভাষী ইত্যাদি গ্রহণ করতে হয় নি কখনও। মনে হল যে সোভিয়েত সরকার বিদেশী পর্যটকদের কাছ থেকে একটু বেশী পরিমাণে টাকা আদায় করে নিতে বদ্ধসংকল্প। তবু ওদেশে ঢুকবার পথ যদি আজ উন্মুক্ত হয়ে থাকে সেটাকে উন্নতিই বলব।

আমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হল বার্লিন হোটেলে। মস্কোর কেন্দ্রের কাছেই, রেড স্কোয়্যার থেকে দু'চার মিনিটের পথ। রেড স্কোয়্যারের পিছনেই বিখ্যাত ক্রেমলিন। এই ক্রেমলিনেই মস্কো নগরীর পত্তন হয়। এখানে এককালে ছিল জারদের প্রাসাদ আর একাধিক বিখ্যাত গীর্জা। এরই একটি গীর্জায় জারকে মুকুট পরান হত; সম্রাটের প্রতাপের সঙ্গে যোগ হত ধর্মের সমর্থন। এখন সে সব প্রাসাদ ও গীর্জা মিউজিয়মে রূপান্তরিত হয়েছে।

আমাদের একসপ্তাহের মস্কোবাসে একটি প্রধান কাজ ছিল কয়েকটি মিউজিয়ম ঘুরে দেখা। এরই একটিতে দেখান হয়েছে ওদেশের ইতিহাস—সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন। আধুনিক যুগের ছোট বড় প্রায় সকল ঘটনার সঙ্গেই লেনিনের নাম জড়িত। স্তালিনের নামের অভাবটা জ্বল জ্বল করছে। ইতিহাসের সূত্র ধরে আমরা একটির পর একটি ঘর পেরিয়ে গেলাম। উনিশ শ' বিশের শেষ বছরগুলি ছাড়িয়ে এলাম; শুরু হল প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা। ত্রিশের দশকের শেষদিকে খ্রুশ্চভের ছবি এদিকে ওদিকে দেখা গেল। কিন্তু স্তালিন কোথাও নেই। দোভাষীকে প্রশ্ন করলাম, 'স্তালিনের জীবদ্দশায় আপনি কখনও এখানে এসেছেন?' 'এসেছি।' 'তখন এখানে স্তালিনের ছবি ছিল বলে মনে পড়ে?' 'ছিল হয় তো, মনে পড়ে না।' এরকম রাষ্ট্রের আজ্ঞানুগত বিস্মরণশক্তি দেখে চমৎকৃত হলাম।

সরকারী বড় বড় স্মৃতিশোধ ছেড়ে এবার এগিয়ে গেলাম অন্যপথে। বলশেভিক বিপ্লব সাধিত না হলেও রাশিয়াকে আমরা চিনতাম তলস্তয়ের দেশ হিসাবে। মস্কোর

একটি বাড়ীতে তলস্তয় কিছুদিন বাস করেছিলেন। দুয়েকটি প্রধান বইও (যেমন, রেজারেকশন) এখানে বসে লিখেছিলেন। বাড়ীতে ঢুকছি এমন সময়ে এক বৃদ্ধা একটি ঘড়িতে ঘণ্টা বাজিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। সরল হাসি। বৃদ্ধাকে একালের লোক বলে মনেই হল না। যেন কেউ ঘণ্টা বাজিয়ে হঠাৎ মুহূর্তের জন্য অন্য কোনো যুগকে ফিরিয়ে আনলেন। বাড়ীতে এক একটি ঘর এক একজনের জন্য আগের মতই সাজান আছে। কোনটি তলস্তয়ের স্ত্রীর ঘর, কয়েকটি বিভিন্ন কন্যার, কোনটি ভৃত্যের। দোতলায় এক কোণে তলস্তয়ের পড়বার ঘর। দরজার কাছে এক জোড়া জুতো—উনি নিজের হাতে তৈরী করেছিলেন। একটি সাইকেল, এতে করে উনি ঘুরে বেড়াতেন। নীচু ছাতের ঘর। জানালার ধারে ধারে বাইরে থেকে গাছের শাখাপ্রশাখা ঝুঁকে পড়েছে এবং ঘরের অভ্যন্তরে একটা নিবিড় গভীরতার ভাব সৃষ্টি করেছে। বাড়ীর পিছনে ঠিক বাগান নয়, বরং একটি ছোট বন, আর তার মাঝে মাঝে একা বসবার জায়গা।

মস্কোর প্রান্তেই পাস্তেরনাকের বাড়ী। আমরা স্বভাবতই যেতে উদ্‌গ্রীব ছিলাম। আমাদের পরিচিত দুয়েকজন ভারতীয় সেখানে গিয়েছেন। মুস্কিলের ভিতর আমাদের ঐ বাড়ীটির ঠিকানা জানা ছিল না। ভেবেছিলাম বিদেশী পর্যটকদের ঘুরিয়ে দেখান যাঁদের কাজ তাঁরা নিশ্চয়ই ঠিকানা জানবেন। হোটেলে খোঁজ নিতে ও'রা বললেন, দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করুন। দোভাষী বললেন, পাস্তেরনাকের বাড়ী কোথায় জানি না: আপনাদের গাড়ীর চালককে জিজ্ঞাসা করে দেখা যেতে পারে। চালকেরও এক কথা, ঠিকানা জানেন না। আমরা অগত্যা দোভাষীকে বললাম, আজ বেরোতে এখনও একঘণ্টা দেরী হবে; এর ভিতর যদি সম্ভব হয় খোঁজ নিয়ে দেখুন ঠিকানাটা মেলে কি না। এক ঘণ্টা পর দোভাষী এসে জানালেন, পাস্তেরনাকের বাড়ী কোথায় কেউই বলতে পারছেন না। তারপর তিনি এমন একটা কথা যোগ করলেন যার অর্থ আমার কাছে এখনও রহস্য হয়ে আছে। বললেন, 'উনি ইদানীং মারা গেছেন কি না তাই ওঁর ঠিকানা আমরা এখনও জানি না।' উনি কি বলতে চেয়েছিলেন যে, পাস্তেরনাকের উপর স্বিমত দূর হতে আরও কিছু সময় লাগবে; তার আগে সরকারী দোভাষীর পক্ষে এ বিষয়ে কিছু না-জানাই নিরাপদ? আমরা ঠিকানা যোগাড় করে যেতে পারলে উনি বাধা দিতেন না বলেই আমার ধারণা।

দেশে অর্থনীতি পড়ান আমার পেশা। কাজেই মস্কোয় দুচারজন অর্থনীতিবিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার বাসনা ছিল। হার্ভার্ড ছাড়বার আগে ওখানকার একজন অধ্যাপকের কাছ থেকে মস্কোর কয়েকজন অর্থনীতিজ্ঞের নামঠিকানা সংগ্রহ করেছিলাম। উত্তর পাবার সম্ভাবনা কম এই মর্মে আমাকে আগে থেকেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। তবু পাঁচজনের নামে চিঠি লিখি—এ'দের তিনজন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রায় কোন চিঠিরই উত্তর পাই নি। এর কারণ অন্তত অংশত এই যে, অগাস্ট মাসে ওঁদের গ্রীষ্মাবকাশে অনেকেই রাজধানীতে থাকেন না। বাইরে থেকে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় দেখালেন দোভাষী। বিরাট অট্টালিকা। ভিতরে প্রবেশ করি নি। ভিতরে যেতে ছাড়পত্র প্রয়োজন হয়। এ ব্যবস্থাটি পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখি নি।

আলাপ আলোচনার সুযোগ হল অন্যত্র। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য মস্কোতে একটি ইনস্টিটিউট আছে। সেখানকার ইতিহাস বিভাগের একজন প্রধান-ব্যক্তির সঙ্গে আমার দুচারজন বন্ধুর পূর্বপরিচয় ছিল। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে

ভদ্রলোকের অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমি অর্থনীতিবিদ্ জেনে উনি আমাদের আলোচনায় ইনস্টিটিউটের দুজন অর্থনীতিজ্ঞকেও ডেকে এনেছিলেন। এঁদের একজন কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে গবেষক, অন্যজন কাজ করেন প্রধানত বিদেশে পুঁজি নিয়োগের সমস্যা নিয়ে।

ঐতিহাসিক বন্ধু বিভাগীয় কাজ সম্বন্ধে প্রথমে আমাকে খানিকটা ধারণা দিলেন। ইতিহাসকে ওঁরা চারটা অধ্যায়ে ভাগ করে নিয়েছেন : প্রাচীন, মধ্যযুগীয়, আধুনিক ও সমকালীন। সমকালীন বলতে ওঁরা বোঝেন মোটামুটিভাবে প্রথম মহাযুদ্ধ ও রুশবিপ্লবের পরের যুগ। বাকী যুগবিভাগটা মার্ক্সীয় ছকে বাঁধা : আধুনিক যুগ হল সতর শতকে ইংলন্ডে যে রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল তার পরবর্তী কাল, বা ধনতন্ত্রের যুগ; সামন্ততন্ত্র নিয়ে মধ্যযুগ; প্রাক্‌সামন্ত ক্রীতদাস প্রথাকে আশ্রয় করে প্রাচীন যুগ। রুশ-দেশের বা ভারতবর্ষের ইতিহাসেও কি আধুনিক যুগ শুরু সতর শতক থেকে? ওঁরা বললেন যে, বিশেষ দেশ নিয়ে এরকম প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু এটাই হল পৃথিবীর ইতিহাসের যুগবিভাগ। মনে পড়ল যে, মিউজিয়মে রুশ ইতিহাস প্রদক্ষিণের গোড়ায় দোভাষী এই যুগবিভাগটা একবার দ্রুত আমাদের বলে নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক বন্ধু বললেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের সমকালীন ও আধুনিক যুগ নিয়ে ওঁদের কাজ হয়েছে। মধ্যযুগ বিষয়েও কাজ অনেকটা এগিয়েছে। প্রাচীনযুগ সম্পর্কে কাজ সমাপ্ত হলেই ভারতবর্ষের একটা সম্পূর্ণ ইতিহাস বের করা সম্ভব হবে। ওদেশের পুস্তকালয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্যবহার্য অনেক পুঁথি ও অন্যান্য মালমসলা আছে। এদেশের ইতিহাস গবেষকদের কাজে লাগা সম্ভব। আমরা নিশ্চয়ই মস্কোয় প্রণীত ভারতের বৃহৎ ইতিহাস দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকব।

ইতিহাস থেকে আলোচনা ঘুরল অর্থনীতির দিকে। ওঁদের মতামতের ব্যাখ্যা শুনলাম। পৃথিবীর দেশগুলিকে ওঁরা তিনভাগে ভাগ করেন। কিছুদেশ সমাজতান্ত্রিক, যেমন সোভিয়েত দেশ; কিছু ধনতান্ত্রিক, যেমন মার্কিন দেশ; কিছু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পেরিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে বেশ খানিকটা এগিয়েছে, যেমন সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিক থেকে ওঁরা মার্কিন দেশের সঙ্গে ব্রিটেন বা সুইডেনের বিশেষ কোন পার্থক্য স্বীকার করেন না। পর্তুগালের সঙ্গে ডেনমার্কের বিরাট তফাৎটা ওঁদের সংজ্ঞায় 'ধনতন্ত্র' নামের নীচে চাপা পড়ে যায়। প্রশ্ন করলাম ভারতবর্ষকে ওঁরা কোন পংক্তিতে রেখেছেন? উত্তর : ভারত ধনতান্ত্রিক দেশ। কৃষি বিশেষজ্ঞ বললেন, এবার আপনাদের পথ বেছে নেবার সময় হয়েছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভারতের কৃষিসমস্যার সমাধান সম্ভব নয়; সেজন্য চাই সমাজতন্ত্র। ঐতিহাসিক বন্ধু পৃথিবীর ইতিহাস খানিকটা ঢোকালেন এই অবসরে। উনিশ শতকের গোড়ায় মানুষের ধারণা ছিল, ধনতান্ত্রিক পথেই শুধু আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব। অন্যমতে যাঁরা সেদিন বিশ্বাসস্থাপন করেছেন তাঁরা ছিলেন আকাশকুসুমে বিশ্বাসী। তারপর এল মার্ক্স-লেনিনের চিন্তা আর সোভিয়েত দেশের আর্থিক পরিকল্পনা। আজ আমরা জানি যে, পথ একটা নয়, দুটো।

আলোচনাটা সাম্প্রতিক ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত করবার জন্য কৃষি বিশেষজ্ঞ আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, বলুন তো গত তিনবৎসরে আপনাদের খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ছে না কেন? আপনাদের কৃষির প্রধান সমস্যাটা কি? আর এর সমাধানের পথটাই বা কি? উত্তরে আমি ওঁদের স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, গত তিনবৎসরে রুশ বা চীন দেশেও খাদ্য-

শস্যের উৎপাদনে কোনো উৎসাহজনক বৃদ্ধি নেই—কাজেই সমস্যাটা একা ভারতের নয়; আর সমাধানের কোন সহজ নির্দেশও কম্যুনিস্ট ব্যবস্থায় নেই। কৃষির লক্ষণীয় উন্নতি দেখা গেছে জাপানে—সেটা সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়। এবার ওঁরা চীনের কম্যুন প্রথার খানিকটা নিন্দা করলেন। স্তালিনীযুগের জোরজবরদস্তির সমালোচনাও শোনা গেল; কিন্তু খ্রুশ্চভের যুগেও কৃষি সমস্যার সমাধান হচ্ছে না কেন এবিষয়ে মৌন রইলেন। তারপর বললেন, জাপান আর ভারতবর্ষ এক কথা নয়। অবস্থার তারতম্য আছে। তাছাড়া জাপানে জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ হয়েছে, কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানা সেখানে প্রতিষ্ঠিত, সমবায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিও সক্রিয়। আমি বললাম, এ সবই স্বীকার্য। তবে জাপান সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়। জাপান অথবা ডেনমার্কের কৃষিব্যবস্থাকে গতানুগতিক অর্থে ধনতান্ত্রিক বললেও ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থাকে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, পথ দু'টি নয়, বহু। কিন্তু একথাটা ওঁরা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইলেন না। দু'টি পরস্পর বিরোধী সমাজব্যবস্থার ধারণাই ওঁরা আঁকড়ে আছেন।

কোন কোন বিষয়ে ওঁদের চিন্তার গোঁড়ামি কমেছে, মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে, এরও প্রমাণ পরে পেলাম অন্যত্র।

ভারতীয় দূতাবাসের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বাড়ীতে এক সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সেখানে দেশীবিদেশী আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপের সুযোগ হল। ভারতীয় অতিথিদের ভিতর একজন গড়গড় করে রুশ ও পোলিশ ভাষায় কথা বলতে পারেন। জনান্তিকে ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বহুদিন তো পোল্যাণ্ডে কাটালেন; ওখানকার সাধারণ লোক রুশদের কোন চোখে দেখে?' উনি হেসে বললেন, 'দুচক্ষে দেখতে পারে না।' সরকারী বন্ধুত্ব অবশ্য অব্যাহত। জাতীয় মনোমালিন্যের পিছনে আছে ইতিহাস; সরকারী বন্ধুত্বের পিছনে রাজনীতি।

ক্রমে রুশ-চীন সম্পর্ক নিয়ে কথা উঠল। ভারতীয় দূতাবাসের বন্ধুটি আমাকে বললেন যে, চীনবিরোধী মনোভাব রুশদেশে সাধারণ লোকের ভিতরও ব্যাপক। জিজ্ঞাসা করলাম, চীনের বিরুদ্ধে এ'দের বক্তব্য কি? উনি বললেন, বক্তব্য বহুবিধ, তবে দু'টি কথা বিশেষ করে শোনা যায়। প্রথম কথা, চীন যুদ্ধবাজ, শান্তির প্রতি চীনের টান কম। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েতের কাছ থেকে নানা সাহায্য পাবার পরও চীনেরা রুশদের সন্দেহের চোখেই দেখছে। কৃতজ্ঞতার আভাসও নেই। মনে পড়ল যে, সাহায্যের পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা, এই ধরনের একটা আক্ষেপ একাধিক দাতা দেশের মুখেই শুনেছি। নিঃস্বার্থভাবে দেওয়া, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করা, দুইই কঠিন কাজ। আমাদের প্রতিবেশী ছোট দেশগুলিকে সাহায্য করতে গিয়ে আমরা এ সমস্যা এড়াতে পারব কি না জানি না।

সেদিনকার সান্ধ্য সম্মেলনে দুজন সোভিয়েত নাগরিকও উপস্থিত ছিলেন। এ'দের একজন সাংবাদিক। কথাচ্ছলে তাঁকে বললাম, এমন একদিন ছিল যখন আপনারা বিশ্বাস করতেন যে দেশে দেশে সংঘাতের মূলে আছে ধনতান্ত্রিক স্বার্থের বিরোধ। বিশ্বাস করতেন যে, সাম্যবাদী দেশগুলির ভিতর ভ্রাতৃত্ব অবশ্যম্ভাবী। আজ দেখছেন যে, সাম্যবাদ এলেও জাতীয় সংঘাত দূর হয় না। ভদ্রলোক উত্তরে ইতস্তত করলেন না। বললেন, কথাটা আমাকে মানতেই হচ্ছে। মনে হল মার্ক্সবাদের দৃঢ় প্রত্যয়ে অজান্তে চিড় ধরেছে। অবশ্য মৌখিকভাবে মার্ক্সবাদ স্বীকার করা এখনও এখানে দস্তুর।

এখানে ওখানে কয়েকজন ভারতীয় শিক্ষার্থীর সঙ্গে দেখা হল; কেউ বা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে পড়ছেন, কেউ বা কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করছেন। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছি, আপনারা তো এদেশে বেশ কিছুদিন রইলেন; অনেকের সঙ্গে তো আলাপও হয়েছে; এ'দের ভিতর কি কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বড় রকমের মতভেদ দেখেছেন? উত্তরে প্রায় সবাই প্রথমে বলেছেন যে, মতভেদ—বিশেষত রাজনৈতিক প্রশ্নে মতভেদ—এখানে দেখা যায় না। দক্ষিণ ভারতীয় একটি বুদ্ধিমান ছাত্র প্রায় চার বৎসর ওদেশে থেকে ডক্টোরেট ডিগ্রীর কাজ শেষ করেছেন। তিনি বললেন, দেখুন আমি এদেশের লোকও নই, কম্যুনিস্টও নই। অথচ মাসের পর মাস একই সুর, একই সিদ্ধান্ত এখানকার খবরের কাগজে পড়ে পড়ে আর রেডিওতে একই কথা শুনে শুনে আমারই প্রায় বিশ্বাস হয়ে গেছে যে এই হল একমাত্র সত্য। কাজেই এদেশের লোককে আর দোষ দিই কি করে! তিনটি প্রধান দৈনিক কাগজ চলছে এখানে, সবটাতেই একই কথা। এরপরও আমি প্রশ্ন করেছি, মতভেদ কি সত্যি নেই? ভেবে চিন্তে তখন এ'দের কেউ কেউ বলেছেন যে, তরুণদের ভিতর একটা নতুন ধারা লক্ষ্য করা যায়—এ নিয়ে নবীনে প্রাচীনে মতবিরোধও ঘটে। এ'দের ভিতর একদল পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট। পশ্চিমের গান এ'দের পছন্দ; পছন্দ পশ্চিমের সাহিত্য, ব্যক্তি-স্বাধীনতা—বিশেষত সামাজিক ক্ষেত্রে। এর ধাক্কা রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় এসে পৌঁছয় না। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি ঝোঁকটাও অনেকক্ষেত্রে তারুণ্যের সাময়িক চাঞ্চল্য হিসাবেই ফুরিয়ে যায়। তবু এইখানে একটা নতুন আন্দোলনের পূর্বাভাস যেন পাওয়া যায়।

শুধু মস্কো দেখে সারা সোভিয়েত দেশের জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়। তবু মোটামুটি একটা ধারণা দর্শকমাত্রেরই হয়। মস্কো থেকে দেশে ফিরবার পথে কলকাতার জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে প্লেনে দেখা হয়। তিনি সোভিয়েত দেশে এসেছিলেন ডেনমার্ক থেকে; অসুস্থ স্ত্রীকে কোন আরোগ্য নিকেতনে রেখে এবার দেশে ফিরছিলেন। কথায় কথায় বললেন যে, ডেনমার্কের তুলনায় সোভিয়েত দেশে জীবনযাত্রার মান স্পষ্টতই নীচু। বৃটেন থেকে এসেও এই ধারণাই হয়। ওসব পাশ্চাত্যদেশের তুলনায় মস্কোর নাগরিকদের আর্থিক অবস্থা যে এখনও অসচ্ছল এটা বুঝতে গবেষণার দরকার হয় না, পথের লোকদের দিকে দুদণ্ড তাকিয়ে থাকলেই বেশভূষার পার্থক্য থেকে এটা বোঝা যায়।

প্রশ্নের উত্তরে দোভাষী বললেন যে, ওখানে মাঝারি মজুরী এখন একশ' রুবল। নিম্নতম মজুরী আশি রুবল যাঁরা চাকুরীতে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত তাঁদের জন্য। অস্থায়ী নিয়োগে মাইনে ষাট রুবলও হতে পারে। সরকারী হারে এক রুবল ১·১ মার্কিনী ডলারের সমান। অর্থাৎ, এক রুবলের সরকারী মূল্য পাঁচ টাকার একটু বেশী। শুনেছি যে বেসরকারীভাবে রুবল পাওয়া যায় এর প্রায় অর্ধেক দামে।

দ্রব্যমূল্য সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল থাকতে পারে। আহার্য ও পরিধেয় বস্তুর মূল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব বেশী। দোকানে জুতোর যে দাম দেখেছি তাতে এক রুবলকে একটাকার সমান ধরলে আমাদের দামের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জামা কাপড়ও তেমনই মহার্ঘ। হোটেলে খাবার জন্য আমাদের টিকেট দেওয়া হয়েছিল। সকালে খাবার টিকেটের দাম মাথাপিছু এক রুবল দশ কোপেক (সরকারী হারে ছ'টাকার খানিকটা কম); দুপুরে আহারের জন্য আড়াই রুবল (তের টাকার উপর); সন্ধ্যায় আহারের জন্য তিন রুবল ত্রিশ কোপেক (প্রায় সাড়ে সতর টাকা)। ঐ দামে পুরো খেতে গেলে অবশ্য খাদ্যের পরিমাণ আমার মত লোকের পক্ষে প্রয়োজনের অধিক। এক কাপ কফির দাম দশ আনার মত; একটি ডবল অমলেট দু'টাকার সামান্য বেশী। চা এক কাপ চার আনার ভিতরই পাওয়া যায়—

তবে সেই সঙ্গে দুধ নেই; দুধ চাইলে বেশী দাম দিতে হয়। প্রধান আহারের সঙ্গে প্রচুর সাদা ও কালো রুটি মেলে। তবে সচ্ছল পাশ্চাত্য দেশে না চাইতেই রুটির সঙ্গে মাখন আসে; মস্কোর ভোজনাগারে আলাদা দাম দিয়ে মাখন আনাতে হয়। ওখানকার বড় বড় হোটেল রেস্টুরেন্টের আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, অনেকটা সময় হাতে না নিয়ে খেতে বসা বিপজ্জনক। প্রাতরাশের জন্য এক ঘণ্টা সময় হাতে রাখা চাই, মধ্যাহ্ন আহারের জন্য দেড় ঘণ্টা। খাদ্য টেবিলে এসে পৌঁছে অতি ধীরে। সরকারী ভোজনালয়ে ওঁরা খদ্দেরকে তুষ্ট করতে বড় ব্যস্ত নন। কোন কোন জিনিসের দাম কিন্তু বেশ সস্তা। গ্রামোফোন রেকর্ড মেলে স্বল্পমূল্যে। লেনিনের বক্তৃতার কয়েকটি রেকর্ড কিনেছি এক একটি দশ আনায়। লেনিনের বক্তৃতা বলেই হয় তো এতো সুলভ; কিন্তু ভালো গানের রেকর্ডও খুসী মনে কিনবার মত অল্পদামে পাওয়া যায়। মস্কো নগরীতে যাতায়াতের ব্যবস্থা অতি উত্তম। এতো অল্পখরচে ঘুরে বেড়াবার এতো ভালো ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোনো বড় শহরে নেই বলেই আমার বিশ্বাস। গ্রীষ্মে আইসক্রীম জনপ্রিয়; দামও অতিরিক্ত নয়। বাসস্থান অপ্রতুল, কিন্তু বাড়ীভাড়া কম। তা ছাড়া বিনামূল্যে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য তো সোভিয়েত দেশের বিশেষ খ্যাতি আছেই।

দেশে ফিরবার পর বন্ধুদের কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, ও দেশের লোকেরা কি সুখী? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। ইংলণ্ডে, বেলজিয়মে, আমেরিকায় আরও দীর্ঘদিন বাস করেছি—কিন্তু ওসব দেশের লোকেরা সুখী কি না তাও জানি না। সুখের সঙ্গে সভ্যতার বা সমৃদ্ধির কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আবিষ্কার করাও সহজ নয়। সোভিয়েত দেশের লোকেরা অন্যান্য দেশের লোকের মতই সুখে-অসুখে আছে, এটাই ধরে নেওয়া ভালো। অন্যান্য সমাজের মতই সোভিয়েত সমাজে ভালোমন্দ নানা লোকের সংমিশ্রণ। ভুক্তভোগী ভারতীয় ছাত্রের মুখে শুনেছি যে, মস্কো শহরেও পকেটমার অজ্ঞাত নয়, ভিক্ষা চাইবার মত মানুষও আছে। এদের সংখ্যা নিশ্চয়ই অতি সামান্য। তবে মাতালের সংখ্যা সামান্য নয়। সর্বত্রই ওদের চোখে পড়ে পুলিশের সতর্ক পাহারা সত্ত্বেও। এটা কি অসুখের লক্ষণ? মনে রাখা ভালো যে ইয়োরোপের সমৃদ্ধতম দেশ সুইডেনেও মাতলামির আধিক্য লক্ষণীয়।

মস্কো শহরে একটি রবিবারের কথা মনে পড়ে। নাস্তিক্যবাদী প্রচার সোভিয়েত রাষ্ট্রের একটি বৈশিষ্ট্য; কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসীদের উপাসনাগৃহে সমবেত হবার অধিকার আছে। সেদিন আমাদের দোভাষী আসেন নি। আমার স্ত্রী হোটেলে জিজ্ঞাসা করলেন কোন গীর্জা আছে কি না কাছে। উত্তরদাত্রী মহিলা বললেন, কাছে নেই; তবে কয়েক মাইলের ভিতর আছে—ট্যাক্সি নিয়ে যাওয়া সম্ভব। ঠিকানা যোগাড় করে আমরা রওয়ানা হলাম। ট্যাক্সিচালক একে তাকে জিজ্ঞাসা করে পথে বিপথে ঘোরাঘুরি করে অবশেষে গীর্জার সামনে আমাদের পৌঁছে দিলেন। বড় রাস্তার উপরে প্রবেশদ্বার নেই; ঘুরে ঢুকতে হল।

গীর্জার অভ্যন্তর অতি সুন্দর। সুপ্রাচীন উপাসনা গৃহ; দেয়াল ছেয়ে ঐতিহ্যবাহী নানা সুদৃশ্য চিত্র; ঘর লোকে ভর্তি। পাঠে ও সঙ্গীতে ঘরটি ধর্মীয়ভাবে ভরপুর। পাশ্চাত্ত্যদেশের গীর্জার মত এখানে উপাসকেরা পংক্তিবদ্ধভাবে দাঁড়ান না। সর্বক্ষণই লোক আসছে যাচ্ছে; যার যতক্ষণ খুসী দাঁড়াচ্ছে; অনেকটা আমাদের দেশের মন্দিরের মত। লক্ষ্য করলাম, উপাসকদের অধিকাংশই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। যুবক-যুবতী অনুপস্থিত নয়, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম।

পরদিন দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করাতে উনি বললেন যে ও'দের দেশে শতকরা পনর-কুড়িভাগ লোক ধর্মে বিশ্বাসী। সংখ্যাটা উনি কোথায় পেয়েছেন জানি না। আরও বললেন যে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ভিতরই ধর্মবিশ্বাস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কথাটা চিন্তা করবার মত। আজ যাঁদের বয়স পঁয়ষট্টি বলশেভিক বিপ্লবের সময় তাঁদের বয়স ছিল আঠার। এ'দের যৌবন কেটেছে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত দেশে। চল্লিশ বছরের কর্মজীবন কেটেছে এই নতুন সমাজে। তারপর বৃদ্ধবয়সে এ'রা আবার ধর্মের দুয়ারে ফিরে এসেছেন।

মনে পড়ল এই সঙ্গে ক্রেমলিনে লেনিনের অবিকৃত মৃতদেহ। প্রতিদিন অগণিত লোক লাইন বেঁধে যায় শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এই মৃতদেহের পাশে। মৃত্যুর ঊর্ধ্বে এ'রা লেনিনের স্মৃতিকে পূজার বেদিতে স্থাপন করেছেন। অবিকৃত মৃতদেহের প্রতি মানুষের বহু হাজার বৎসরের একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের ভাব আছে। এ দেশেও গান্ধীজীর নশ্বর দেহকে রক্ষা করবার বিশেষ ব্যবস্থা হলে তারই টানে ভারতের অগণিত গ্রাম ও শহর থেকে মানুষের ভিড়ের অন্ত থাকত না। কিন্তু আমরা তা করি নি। সোভিয়েত সরকার ধর্ম মানেন না; কিন্তু দেশের ধর্মভাবকে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতির প্রতি আকৃষ্ট করবার এখানে চেষ্টার ত্রুটি নেই। হঠাৎ মনে হল, শতাব্দী অবসানের আগেই লেনিন ওদেশে যীশু খৃষ্টের শিষ্য হিসাবে গৃহীত না হলেও দুজনেই হয়তো পাশাপাশি পূজো পাবেন।

মস্কো নগরীকে ভালোবাসার পক্ষে এক সপ্তাহের পরিচয়ই যথেষ্ট। ভারতের প্রতি সোভিয়েত দেশের মনোভাব প্রীতিপূর্ণ। এই প্রীতির খানিকটা রাজনীতি বটে; কিন্তু রুশদেশের মানুষের ভিতর একটা স্বাভাবিক বন্ধুভাব আছে যেটা আকর্ষণীয়। ওদের মতামত যদি বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যশূন্য তবু মত প্রকাশে সেই উন্নাসিকতা আমি লক্ষ্য করিনি প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের, বা 'অনুন্নত' দেশের সঙ্গে 'উন্নত' দেশের বাক্যালাপে যেটা প্রায়ই প্রতীয়মান। আরও আশার কথা এই যে, মস্কোর প্রশস্ত পথে মানুষের চলাচল আজ ক্রমেই অবাধ। আশা করা যায় যে বিদেশের সঙ্গে সোভিয়েত দেশের ভাবের আদান-প্রদান ক্রমশই প্রশস্ততর হবে। তাছাড়া সাময়িক রাজনীতিকে ছাড়িয়ে চোখে পড়ে এক বিচিত্র ঐতিহ্য। বারবার মস্কো ত্যাগ করেও কোন এক বিখ্যাত রুশ লেখক বলেছিলেন, আমি চিরকালের মস্কোবাসী। মস্কো আমাদেরও প্রিয় সেইসব আশ্চর্য সাহিত্যিকদের জন্য মস্কো যাঁদের প্রিয়।

হরিয়া

মনীশ ঘটক

রাত দশটায় ক্লাব থেকে বাড়ী ফিরে, হাতমুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে গেলেন ধ্যানেশবাবু। ধরা, ধ্যানেশবাবুর চতুর্থ কন্যা, খাবার তদারক করে বাবার। পাশে এসে বসল।

খাওয়া শেষে নিজের ঘরে এলেন। ধরা এ কথা সে কথার পর শুতে যাবার আগে জানিয়ে দিয়ে গেল বাড়ীর ছোকরা চাকর হরিয়া খুব মার খেয়েছে ছেলের হাতে। ছেলে কলেজে পড়ে।

—মা'র বারণ সত্ত্বেও লুকিয়ে তিনটের শো'তে সিনেমায় গেছল হরিয়া—'পূজা-কা-ফুল' দেখতে। পাশের বাড়ীর গুপে আর দোষাদদের ছেলে পতিতের সাথে। ঝিকে বলে গেছে, ওর সম্পর্কে কে বৌদি আছে তার ছেলে হয়েছে, খবর পেয়ে দেখতে যাচ্ছে। কিন্তু আসল কথা কে যেন ফাঁস করে দিয়েছে, ও-ও অস্বীকার করে নি।

—তা মারধোর করলে কেন? বকে দিলেই হোত।

—বক্‌লে কি আজকাল আর আমলে আনে? দুর্দান্ত বারমুখী মন হয়েছে, এখন খালি সিনেমা মাথায় ঘুরছে। সেদিনও ত জন্মাষ্টমীর রাতে মা পয়সা দিলেন, হোলনাইট ছবি দেখে এল। তাতেও আশা মেটে না ওর।

—আজ পয়সা পেল কোথা?

—শুনলাম গুপে তার মায়ের কাছে দু'টাকা চেয়ে নিয়েছে। তাই দিয়ে গেছে। আর তাছাড়া, খুচ্‌রো-খাচ্‌রা যখন যা পায়, জমায় একটা টিনের কৌটোয়। খরচ করে শুধু সিনেমায়। কি বাতিক যে হয়েছে ছবি দেখার।

ধরা ওপরে চলে গেলে ধ্যানেশবাবু সিগারেট ধরিয়ে একটু লেখাপড়ার কাজে মন দিতে চেষ্টা করলেন। বিলিতী ম্যাগাজিনের ছবি দেখলেন দু'একপাতা, স্ট্যান্‌লি গার্ডনার-এর আধপড়া পাতামোড়া জায়গা খুলে পেরি মেসন'এর কীর্তিকলাপ অনুধাবন করবার চেষ্টা করলেন, মন বসল না। রবিবাবুর পঞ্চভূত খুললেন, কি পড়লেন মনে দাগ কাট্‌ল না।

রাত বাড়তে লাগল। শব্দ নেই, তবু যেন গম্ভীর কার গলার আওয়াজ গম গম করতে লাগল কানে। কিছু নেই চোখের সামনে, তবু মনে হল যেন অনেক কিছু ঘটে যাওয়ার দর্শক তিনি।

বই বন্ধ করে হরিয়ার কথা পূর্বাপর ভাবতে চেষ্টা করলেন ধ্যানেশবাবু।

বছর পাঁচেক আগে হরিয়া এসেছিল তাঁর বাসায়। তখন ভাড়া বাড়ী, বাড়ীতে গরু-বাছুর ছিল। সংসারের কাজ গিন্নী ঝির সাহায্যেই চালিয়ে নেন, গরুর খবরদারির জন্যে ছোঁড়া গোছের লোক দরকার ছিল।

হরিয়া এক রিক্‌শওয়ালার ছেলে। রিক্‌শওয়ালার বোধ হয় পক্ষান্তর ঘটেছিল, আরো অনেক ছেলেপুলে ছিল তার, যারা কেউ হরিয়ার আপনভাই বোন নয়। হরিয়া তাই প্রায় গলগ্রহই ছিল। পাঁচটাকা মাসবেতন কাজে ঢুকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল তার বাপ।

বারো-তের বছর বয়স তখন হরিয়ার। বয়েস আন্দাজে অসুরের মতো খাট্‌তে পারত। গরুর তদারক ছিল, ভাড়াবাড়িতে টিউবওয়েল ছিল না, ছিল ইঁদারা—দিনে অন্তত দু'শো বালতি জল তুলতে হোত। সব কাজে এগিয়ে আসা ছিল হরিয়ার স্বভাব। পরিশ্রমের কাজ একটা একটা করে সবকটাই এসে পড়তে লাগল তার ঘাড়ে। অম্লান মুখে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেতে পারত ছোকরা।

গিন্নীর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। কর্তা, কি ছেলে যখন বাজারে যেতেন, সমস্ত দিনের অথবা দিনদুয়েকের আবশ্যকীয় মশ্‌লাপাতি টুকিটাকি একসাথে আনতে দিতে পারতেন না কখনো। ফলে দিন ভোর, 'ওরে জিরে নে আয় এক ছটাক মোড়ের দোকান থেকে,' না হয় 'যাত চট্‌ করে শুক্‌নো লঙ্কা আনত দু আনার' লেগেই থাকত।

শুক্‌নো লঙ্কা যদি বা আনল পনেরো মিনিট পরে, অম্‌নি আবার 'ওই দ্যাখ্‌, পাঁচ-ফোড়নের কথা ভুলে গেছি। যাত শিগগির—'

আলস্য ছিল না হরিয়ার ধাতে। চরকির মতো ঘুরত, আবার তার মধ্যে জবার চারা, পুঁয়ের চারা এনে লাগাত, পাখীর বাচ্চা এনে খাঁচায় পুরত, কঞ্চিতে সুতো পরিয়ে হাতছিপ বানিয়ে পুঁটিমাছ ধরত। গিন্নী মনে মনে খুশী হলেও মুখে প্রকাশ করতেন না, তবে পক্ষপাত জন্মে গিয়েছিল তাঁর হরিয়ার ওপর।

ধ্যানেশবাবুর এত সব নজরে আনার কথা নয়, আনতেনও না। হরিয়া তাঁর লক্ষ্যের মধ্যে এল যখন থেকে শোবার ঘরে দৈনিক বিছানা করা বিছানা তোলার ভার নিল সে।

এ কাজটা উট্‌কো বাইরের লোক করে এটা পছন্দ করতেন না তিনি। ঢিলেঢালা নন তিনি, তবু নিজের ঘরে পয়সাকড়ি কাগজপত্র সব সময় চাবি বন্ধ করে রাখতে পারে না মানুষ। এ পর্যন্ত ঘর মোছবার সময় একবার ঝি ঢুক্‌ত ঘরে, আর সব টুকিটাকি কাজ মেয়েরা দেখত।

তাঁর শোবার ঘরে হরিয়ার আক্রমণ ভালো চোখে দেখেন নি তিনি। আর তা ছাড়া, যেটা খুব স্বাভাবিক এবং প্রায় প্রত্যেক গেরস্তবাড়িতেই হয়—গিন্নীর যার ওপর টান, কর্তা তাকে সুনজরে সাধারণত দেখেন না। অপরপক্ষে কর্তার পেয়ারের লোক গিন্নীর বিষনজরে পড়বেই।

হরিয়ার ক্ষেত্রে গিন্নীর পক্ষপাত তেমন প্রকট না হলেও এ'চে নিতে বেগ পেতে হয়নি। ধ্যানেশবাবু তাই মুখে কিছু না বললেও সদয় ছিলেন না ছোঁড়ার ওপর।

একবার'ত জলজ্যান্ত চুরিই ধরে ফেলেছিলেন তিনি। রাত্রে ফিরে শার্টের পকেটে দু'খানা নোট আর রেজকি রেখে শুয়েছিলেন। সকালে মর্নিংওয়াক করে ফিরলেন যখন, বিছানা ওঠানো হয়ে গেছে। হরিয়াকে গিন্নী ম্যুনিসিপাল স্কুলে প্রাইমারী ক্লাসে ভর্তি করে দিয়েছিলেন, সে স্কুলে গেছে। যাবার আগে তাঁর ঘরের কাজকর্ম সেরে গেছে।

ড্রয়ার খুলে ছেলেকে বাজারের টাকা বার করে দিয়ে ভাবলেন শার্টের পকেট থেকে রাতের খুচ্‌রো তুলে রাখা যাক। পকেটে হাত দিয়ে দেখেন একটি টাকা রয়েছে, আর একটি নেই। প্রথমে ভাবলেন কাউকে দিয়েছেন বোধ হয়। মনে পড়ল না। মেয়েরা কাজেকর্মে নিতেও পারে। জানলেন নেয়নি।

একটা টাকা কিছু বৃহৎ ব্যাপার নয়, তবে আদৌ কিছু খোওয়া যাওয়াও মেনে নেয়া অসম্ভব। তা ছাড়া, এর আগে কখনো কিছু যায়নি।

হাজার অভাবে পড়লেও ছেলেমেয়েরা না বলে কিছু নেবে না, জানতেন। গিন্নী

ভুলেও এ ঘরে ঢোকেন না। ঝি ঘর মুছে যায়—সে আছেও ঢের দিন। কখনো সন্দেহ করবার মতো কিছু করে নি সে। বাকী থাকে এক হরিয়া। নিঃসন্দেহ এ তার কাজ।

যেমন মনে হওয়া, খুন চেপে গেল তাঁর মাথায়। বয়সও কিছু কম তখন, আর ঠিক সেই সময়টা নানা বিশৃঙ্খলায় মন ছিল অশান্ত। হরিয়া ফিরতেই তাকে নিয়ে পড়লেন, এই মারেন কি সেই মারেন।

সে ত কিছুতেই কবুল করে না। পুলিশের ভয় দেখাতে ভেউ ভেউ করে কাঁদে। চোখে জল দেখে স্বভাবতই মেয়েদের টান পড়ে তার সপক্ষে। ফলে বাক্যবাণ সহ্য করতে হয় ধ্যানেশবাবুকেই।

—কোথায় খরচ করে এসেছেন নিজেই, ভুলে গেছেন। দেখলেই হয় হরিয়ার বাক্স-প্যাঁটরা জামা-কাপড়—ওত স্কুলে গেছিল, লুকিয়ে রাখতে'ত পারে নি—ইত্যাদি।

প্রথম উত্তেজনার পর ধ্যানেশবাবুর মনেও খট্‌কা লেগেছিল। এমন হওয়া বিচিত্র নয়, যে কাউকে ক্লাবে দিয়েছেন, মনে নেই। কিন্তু না, ঠিক মনে পড়ছে, সার্ট খুলবার সময় বুকপকেট থেকে দুখানা নোটই মাটিতে পড়েছিল, উনি তুলে রেখেছিলেন।

বললেন সে কথাটা। বললেন, যে এই কারণেই তাঁর ঠিক মনে আছে, নোট দু'টোই ছিল, একটা নয়।

হরিয়ার ভয় তখন কেটেছে। তার সমর্থকেরা দলে ভারী, সাহসও ফিরেছে। সে বলল, মাটি থেকে কুড়িয়ে একটা নোট রেখেছে সে বাবুর তোষকের তলায়।

বেরোল সেখান থেকে। জব্দ হয়ে গেলেন ধ্যানেশবাবু বাড়ীর লোকের কাছে। কিন্তু তাঁর মনের খট্‌কা ঘুচ্‌লো না। তাঁর মনে হোলো হরিয়া নিশ্চয় সরিয়েছিল। তোষকের তলায় রাখাও তারি কাজ। যদি তাঁর নজরে না আসতো তবে ঠিক বার করে নিতো তাক বুঝে।

কিন্তু ও নিয়ে আর কিছু বলেন নি তিনি। মনে মনে বিরূপ হয়ে রইলেন হরিয়ার ওপর।

দূরদেশে মেজছেলের এ্যাক্‌সিডেন্টের খবর এল যেদিন, ধ্যানেশবাবু তখন ডবল প্লুরিসিতে শয্যাশায়ী। আত্মীয়স্বজনের সহায়তায় গিন্নী রওনা হয়ে গেলেন ছেলের কাছে। বাড়ীতে আর সব ছেলেমেয়ে ও হরিয়া রইল। সংসারের ভার, তাঁর পরিচর্যার ভার, সব মূলত এসে পড়ল ধরার ওপর।

একসময় দিন দশেকের জন্য এমন অবস্থা হোলো যে ধ্যানেশবাবুর মনেও পড়ে না কিভাবে কেটেছে সে কটা দিন। ঠিক অজ্ঞান নয়, অর্ধবিস্মরণের অস্বস্তিকর ক'টা দিন।

অস্বস্তির কি অন্ত ছিল? দূরদেশে ছেলে হাসপাতালে, মোটর দুর্ঘটনায় মাথার খুলি ভেঙে গেছে। কৃত্রিম খুলি লাগাতে হবে। প্ল্যাষ্টিক সার্জারি চলছে, খবর আসে নিয়মিত, তাতে সান্ত্বনা থাকলেও মন অশান্ত থাকেই।

ধরার য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষা। পড়ার ফাঁকে বাপের শুশ্রূষা ওষুধ খাওয়ানো এ সব করার পর কতটুকু আর সময় পায়।

রান্নাবান্না কে করে খোঁজ রাখেন না ধ্যানেশবাবু। অন্য ছেলেমেয়ে নিজেদের পড়াশুনার ফাঁকে ঘরের আর বাইরের যাবতীয় কাজ করে যায় বুঝতে পারেন। ছোট মেয়ে এষা ফাঁক পেলেই কাছে এসে বসে, গায়ে মাথায় হাত বুলোয়। সবচেয়ে ছোট আদরের সন্তান এষা, সে যে কোনো কিছু নিজে করে উঠ্‌তে পারে, আগে কখনো ভাবতে পারেন নি

তিনি। এখন দেখলেন সময় এলে সেও সব কাজেই হাত লাগাতে পারে।

ঝি চাকরের কোনো খোঁজখবর রাখা দরকার মনে হয়নি।

অসুখের ঘোর কেটে আসতে ধ্যানেশবাবু টের পেলেন পরিচর্যায় হরিয়ারও অংশ আছে, এবং সেটা গৌণ নয়।

দুপুরে ছেলেমেয়েরা কলেজে স্কুলে গেলে দরজার পাশে ঠায় বসে থাকে হরিয়া উস্‌খুস্‌ করে উঠলে এগিয়ে আসে। হয় জলের গেলাস, নয়ত পিকদানি, নয়ত চেম্বারপট, যেটা যখন দরকার সামনে এনে ধরে। ঘড়ি ধরে দুপুরের দু'খোরাক ওষুধ খাওয়ায় একটায় তিনটেয়।

মেয়েরা ফিরলে চা কফি যা করবার, করে। ফাই ফরমাসে হরিয়ার পরমোৎসাহের কথা আগে বলেছি। উন্মুখ হয়ে থাকে ধরা কি এষা ফল, বিস্কুট, রুটি কিছু আনতে ফরমাস করে কি না।

ধ্যানেশবাবু শুনেছেন সাইকেল চড়া শিখে নিয়েছে হরিয়া। কাছের দূরের যাবতীয় কাজে ফাঁক পেলেই সাইকেল ধরে টানে। ছেলের কাছে সে জন্যে তাড়াও কম খায় না, শুনতে পেয়েছেন।

জানতে পেরেছেন, রান্নার কাজ ধরা একাই করে। ওর পরীক্ষার পড়ার কাজে ক্ষতি হচ্ছে, জেনেও নাচার তিনি। সক্ষম থাকলে অনেক ঘরের কাজে তিনি নিজেই অংশ নিতে পারতেন, কিন্তু নিরুপায়। দেখে যাওয়া ছাড়া কিছু আর করবার নেই তাঁর—হাজার ইচ্ছে থাকলেও।

এবার কাছে খবর পেলেন, রুটি তৈরী ইত্যাদি কাজ হরিয়া শিখে নিয়েছে, প্রায়ই করে, এবং ভালো করে। ধরার কাজে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করে হরিয়া। ফলে হরিয়ার দোষগুণ সম্বন্ধে ধরা ওয়াকিবহাল হয়েছে সম্প্রতি।

শুয়েই শুয়েই লক্ষ্য করেন কাজের পারিপাট্য। একবার বলা কাজ বারদিগর বলে দিতে হয় না। টেবিল ঝাড়া, বিছানা তোলা, ধ্যানেশবাবুর হাত ধরে বসবার ঘরের বিছানায় দিনের মতো শুইয়ে দেয়া, ডাক্তার এলে ইঞ্জেকসনের ছুঁচের জন্যে জল ফোটানো, সেরামের ভাঙা কাঁচ রাস্তার ডাস্টবিনে ফেলে আসা—এইগুলো ধ্যানেশবাবুর চোখে পড়ে। যথাযথ হয়ে যায় এসব কাজ।

পারিপাট্য দিয়ে তাঁকে আকর্ষণ করে হরিয়া। আলস্যহীনতা দিয়েও। লক্ষ্য করেছেন যে ওর থেকে থেকে পূর্বতন সঙ্গীসাথীর সাথে আগে যেমন বেরিয়ে যাওয়া ছিল অজান্তে —এখন সেটা কমে এসেছে।

নতুন স্বাদ পেয়েছে খেলাধুলোর। আর পাঁচটা ভদ্রলোকের ছেলেদের সাথে বাসার সামনের মাঠে ক্রিকেট খেলে বিকেলে। তাতেও পটুতা দেখায়। যে কোন কাজ, বাড়ীর কি বাইরের, আবশ্যকীয় কি খেলার সবতাতেই সমান মনোনিবেশের ক্ষমতা রাখে ছোকরা। মনোনিবেশের সাথে কর্মনিষ্ঠা যুক্ত হলে সাফল্য আসেই—গুরুতর প্রতিবন্ধক না থাকলে।

ধ্যানেশবাবুর সেরে উঠতে প্রায় দুমাস কেটে গেল। হাসপাতালে ছেলে বিপন্মুক্ত হবার পর গিন্নীও ফিরে আসেন দেশান্তর থেকে। হাসপাতালে বসবাস দীর্ঘস্থায়ী হবে জানা গেছে। বিদেশ থেকে মাথার কৃত্রিম অংশ আনিয়ে লাগাতে হবে, সেও সময়সাপেক্ষ। দুর্ঘটনার প্রাথমিক ধাক্কার বিপদবোধ ও ভয় কেটে গিয়ে এখন দুরবস্থাকে সহনীয় করবার মনোভাব এসে গিয়েছে—সুদিনের আশার আলো দেখা যাচ্ছে, শুধু প্রতীক্ষায় থাকতে হবে।

গিন্নী ফিরে আসার পর বাড়ীর অবস্থা আগের মতো, অর্থাৎ তর্জন চেঁচামেচি ও ঝঞ্ঝাট ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে নতুন বাড়ী তৈরীর কাজ সুরু হয়েছে।

একটুকরো জমি কেনা ছিল কাছাকাছি। বাস্তুপূজা করাই ছিল, এইবারে ভিৎ গাড়া সুরু হল। ইঁট সিমেন্টের ঝামেলা দস্তখৎ মারফৎ ধ্যানেশবাবু মেটান, খবরদারির ঝক্কি পোয়ায় ছেলেমেয়ে। ঠিকেদার মিস্ত্রি মজুর খাটানো ব্যাপারে ধ্যানেশবাবু সাক্ষাৎ অংশ নেন না। অপারগ বলে নয়, শারীরিক অসমর্থ বলে। তার ওপর কিছু সুস্থ হয়ে উঠ্‌তেই রুজিরোজগারের ধান্দায় ব্যাপৃত হতে হয়। দু-আড়াই মাসের অকর্মণ্যতায় সঞ্চয়ের টাকায় টান পড়ে গেছে। বয়েস বাড়ার সাথে খরচের পরিধিও বিস্তৃততর হচ্ছে, যুগের সাথে তাল রেখে ছেলেপুলে নিয়ে স্বল্পবিত্তের সামাল দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌ছে প্রতিদিন।

পেরে উঠ্‌লে খাট্‌তে পেছপা নন ধ্যানেশবাবু। ফলাফল নিরপেক্ষ হয়ে খাটুনির কথা ভাবতে আত্মপ্রসাদ হয় বটে, তবে সংসার চলে না। গীতার উপদেশের সাথে দৈনন্দিন চালডাল তেলনুনের সংঘর্ষ বাধাতে চান না তিনি।

শুধু ভরসা রেখে কাজ করে যান। আত্মপ্রত্যয়ে আস্থা রাখেন, নিয়মিত পরিশ্রমেও কম আস্থা রাখেন না। দুয়ে মিলে চলে যায় ভালোভাবেই।

নতুন বাড়ী আধা তৈরী হতেই উঠে আসেন ও'রা। বেঢপ লম্বাটে জমি, এক কোণায় বাড়ী তুলে দক্ষিণটা ফাঁকা রেখেছেন ধ্যানেশ বাবু। ছ্যাঁচা বাঁশ আর রাংচিতে দিয়ে ঘেরা চৌহদ্দী বানিয়ে দু'দশটা সখের গাছও পুঁতেছেন। কিন্তু ছাগলের উৎপাত যদিবা রোখা যায়, হনুমানের উপদ্রব বেড়ার বাঁধ মানে না। [illegible] ভরসা, সে তার ধনুক আর গুল্‌তি দিয়ে যন্দুর পারে হনু তাড়ায়। কিন্তু বীর হনুমানেরা অল্পবয়সী ছেলে কিম্বা স্ত্রীলোক দেখলে আদৌ ভয় পায় না, বিকট মুখ ভ্যাংচায়—তেড়েও আসে মাঝে মাঝে।

বাগান তৈয়ারীতে হরিয়া তাঁর দোসর হয়ে ওঠে। আগে ভাড়াটে বাড়ীতে ছিল আগাছা লাগানোর ঝোঁক, এখন এ বাড়ীতে তাঁর বাছাই করা চারা পোঁতা, জল দেওয়া, মাটি নিড়োনো—সব তাতেই হরিয়া আগুয়ান। কখন যে বাড়ীর যাবতীয় কাজ, গরুর তদারক সেরে সময় করে উঠ্‌তে পারে বুঝে উঠ্‌তে পারেন না ধ্যানেশবাবু। ধীরে ধীরে তাঁর মনে হরিয়ার ওপর নির্ভরশীলতার ভাব জাগে, তবে পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠ্‌তে পারেন না।

কারণ থাকে। খুচরো রেজ্‌কি এদিক-ওদিক হলে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু ধরা একাদ্দিন দেখেছে দেরাজে চাবি লাগিয়ে রেখে ধ্যানেশবাবু বাথরুমে গেলে হরিয়া দেরাজে হাত দিয়েছে। নেয়নি, অথবা নিতে পারেনি কিছু। কিন্তু হাতটানের অভ্যাস যায়নি। তার পর থেকে চাবি বিষয়ে ধ্যানেশবাবু নিজে সব সময় পেরে না উঠ্‌লেও ধরার সতর্ক দৃষ্টি থাকে কখন কোথায় ফেলে গেলেন তার ওপর। হরিয়া কি টের পায় না? পায়। কিন্তু ভেতর থেকে অদৃশ্য কোনো শক্তি ওকে ছিঁচ্‌কেমির দিকে ঠেলে।

গিন্নী সম্প্রতি ধুয়া তুলেছেন, হরিয়া নাকি খাবার, মিষ্টি, বিস্কুট ইত্যাদি ফাঁক পেলেই মুখে পুরে দেয়। এটা গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য করেন না ধ্যানেশবাবু। নিজের ছেলে বয়সের কথা মনে পড়ে। এখনো, এ বয়সে মাঝে মাঝে বরাদ্দর বাইরে এক-আধটা সন্দেশ যে আলগোছে মুখে ফেলে দেন না, এমন নয়।

অর্থাৎ সোজা বাংলায়, হরিয়ার ওপর কৃপামিশ্রিত স্নেহের ভাব তাঁর মনে বাসা বাঁধে।

যে কোন সংসারের জীবনযাপনের জালে যারা জড়িয়ে পড়ে তারা একদিন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। হরিয়াও ধীরে ধীরে তাই হয়ে উঠ্‌ছে অনুভব করেন ধ্যানেশবাবু।

হরিয়ার বয়েস এখন ষোল-সতেরো। এখন তার সঙ্গীসাথীরা প্রায় সবাই আশপাশের বাড়ীর কমবয়সী ভদ্রলোকের ছেলেরা। ছেলেরা সবাই ভদ্র, তা' নয়, বাউণ্ডুলে, রকবাজ, স্কুল-পালানো—এই জাতই বেশী। যুগের হাওয়ায় প্রায় সবারই গলায় হিন্দী ছবির গান, পরণে ড্রেনপাইপ আর টি' সার্ট। হরিয়া যেহেতু চাকর—তার বেশভূষাও তাই খানিকটা ভব্য এখনো আছে। গলায় গানের রেশ সামান্য শোনেন ধ্যানেশবাবু, তবে ধরা বলে যে দুপুরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গলা ছেড়ে 'কোই মুঝে জংলী কহে' তান ধরে।

এদিকে অন্য বিপদও দেখা দিয়েছে—সহৃদয় প্রতিবেশীদের হরিয়াকে ভাঙানোর অভিযান। তারা প্রথমে হাত করেছে ওর সৎ বাপ রিক্‌সওলাকে। বুঝিয়েছে ও বয়সের ছেলে দিনমজুর খাটলেও মাসে ৫০৲|৬০৲ রোজগার করবে, আর টাকাটা বাপের হাতেই যাবে। বাপও টাকাটাই বোঝে। ধ্যানেশবাবু শুনেছেন ওর মাস মাইনে হরিয়ার হাতে পৌঁছয় না কখনো—ওর বাপ এসে নিয়ে যায়। বাপ পাকেপ্রকারে আরো টাকা নেয়। হরিয়ার মায়ের অসুখ, সাহায্য দশটাকা। একটা নতুন রিক্‌সা আগাম বায়না দেবে, হরিয়ার বেতন থেকে আগাম পঁচিশ টাকা। এমনি লেগেই আছে।

ওদের জাতভাইদের মধ্যে খুড়ো জাতীয় একজন পচাইয়ের দোকানে কাজ করে। সে এসে টানে,—মাসে পঁচিশ টাকা পাবি। এখানে'ত পাস মোটে দশ।

প্রতিবেশীদের মধ্যে থেকে ভাঙ্‌চি আসে,—চলে আয় আমার এখানে, বারোটাকা দেব।

প্রলোভনের আর অন্ত নেই। কিন্তু হরিয়া কি জানি কেন ভেড়ে না। ধরা বলে যে ও এবাড়িতে ছেলেমেয়ের সামিল হয়ে গেছে, একটু মার্জিত জীবনের স্বাদ পেয়েছে, চাকরের মতো হেনস্থায় থাকে না, অভাব বলতে সত্যিই কিছু নেই, খাওয়া পরা জামা-কাপড় ছেলে-মেয়েদের সাথে সমান করে পায়। ওর আদৌ ইচ্ছে নেই বেশী রোজগারে মজুর হতে কি পচাই বিক্রী করতে। সে এটা বেশ জানে যে ও সব কাজে খাওয়া পরা নেই আছে নগদ রোজগার, আর সে রোজগারের পাই পয়সা নেবে তার বাপ।

বেশী মাইনের প্রলোভন ওকে টলাতে পারে না, তবে বয়োধর্মে বারমুখি মন হয়েছে, নগদ পয়সা হাতে পায় না, যদ্দুর সম্ভব হাতে পায়ে ধরে ধরার কাছ থেকে নেয়, খালি সিনেমা দেখার জন্য। আর অন্য কোনো বাতিক নেই সম্প্রতি।

ওদের সমাজে অপরাধবোধ জিনিসটা বড়ো শিথিল। সরকারী পুকুরে লুকিয়ে মাছ ধরা কি কারো বাড়ীর গাছের ফলফুলুরি সংগ্রহ করা দোষের মনে করতেই পারে না, চোখে পড়লে ধ্যানেশবাবু বকেন, কিন্তু তাঁর সন্দেহ হয় এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি বাড়ীর আর সবাই গ্রাহ্যে আনেন না।

রাত একটার ঘড়ি বাজতে চমকিত হলেন ধ্যানেশবাবু। ভোর পাঁচটার ট্রেনে বাইরে যেতে হবে তাঁকে। বাপরে, হরিয়ার পূর্বাপর কাহিনীর জাবর কেটে কখন যে এত রাত হয়ে গেছে টেরও পান নি তিনি।

স্যুটকেস গোছানোই আছে। রিক্‌স বলা আছে, ভোর রাতে এসে ঘণ্টি বাজাবে। তা ছাড়া যে'টায় উঠতে হবে, মনস্থ করে শুলে ঠিক ঘুম ভাঙে তাঁর।

টাকাকড়ি জামার বুক পকেটে রেখে জামা খুলে টাঙিয়ে রাখেন। নয়া পয়সা রেজকিতে টাকাখানেক পাশের পকেটে রাখেন—একটি আধুলি রাখেন রিক্‌সা ভাড়া দেবেন বলে। চাবি বালিশের তলায় রেখে শুয়ে পড়েন তিনি। ঘুমের আগে মার খাওয়া হরিয়ার ক্লিষ্ট মুখ কল্পনায় চোখে ভাসে, নিজেকে যেন অপরাধী বলে মনে হয়।

ভোরে ঘুম ভাঙলে বাথরুমে যান, কিন্তু হরিয়াকে ডাকেন না। একটু চা খেয়ে যেতে পারলে বেশ হ'ত, কিন্তু, থাক।

বাথরুম থেকে ফিরতে দেখতে পান হরিয়া তাঁর ঘর থেকে দেশলাই নিয়ে বেরোচ্ছে— ষ্টোভ ধরাবে।

বলে,—চা, না কফি?

—যা হয়, তাড়াতাড়ি কর, বেশী সময় নেই।

ঘরে ঢুকতেই হরিয়ার থতমত ভাব তাঁর চোখ এড়ায় নি। কিন্তু আমলে আনেন না। কাপড়চোপড় ছেড়ে তৈরী হয়ে বসেন, হরিয়া চা এনে দেয়।

খেতে খেতে, যেন ঘুষ দিচ্ছেন, এমনি সুরে বলেন,—এই টাকাটা রাখ। আনা আষ্টেকের সরষের খোল এনে গোলাপ গাছগুলোর গোড়ায় দু-চামচ করে দিবি। আর ইউক্যালিপটাস চারাগুলোতেও, বুঝলি?

হরিয়া ঘাড় নাড়ে। সুটকেস তুলে দেয় রিক্সতে। ছাতা এগিয়ে দেয়। রাতের নির্যাতনের ছাপ চোখে মুখে থাকলেও সহজভাবে যে হরিয়া এসব কাজগুলো করে তার জন্য যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

সরষের খোলের চেঞ্জটা কি হবে, তার উল্লেখ করেন নি তিনি। যদি ফেরৎ না দেয়, আর মনে মনে সেটাই বোধ হয় চান,—না হয় না দিক্। আহা, কালকে অমন মার খেয়েছে।

স্টেশনে পৌঁছে সুটকেশ-ছাতা নিয়ে নেমে পড়েন। রিক্সা ভাড়ার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে চেঞ্জও বার করেন।

চক্‌চকে আধুলিটি নেই।

হরিয়ার থতমত ভাব, রাত জেগে পূর্বস্মৃতি রোমন্থন, সব মনে পড়ে যায় এক সাথে।

আশ্চর্য, একটুও রাগ হয় না তাঁর। রিক্সা ভাড়া চেঞ্জ থেকে মিটিয়ে টিকেট ঘরের দিকে যেতে যেতে হো হো করে হেসে ওঠেন আপন মনে। নিশ্চিন্ত প্রশান্তির হাসি। মুক্তিস্নানের হাসি।

একবার কেবল ভাবেন, সরষের খোলের চেঞ্জটা ফেরৎ দিতে বললে হোতো।

তারপর, আবার ক্ষমায় ভরে ওঠে মন।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চেতনা

নীহাররঞ্জন রায়

ইতিহাসের ক্ষেত্রে এবং ইতিহাস রচনায় এমন একটি চিন্তাধারা বিদ্যমান, যে-চিন্তাধারায় ইতিহাসকে দেখা হয় কোনও একটি দেশকালধৃত জাতির গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ের উপায়রূপে। দেশ ও কালের প্রেক্ষাপটে সেই জাতির যে বিশিষ্ট গুণলক্ষণ ধরা পড়ে, তার মৌলিক ও গভীর চরিত্রের যে-পরিচয় প্রকাশ পায়, তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও দুর্বলতার যে-ধারাগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইতিহাসের প্রবহমান ধারাস্রোতের পশ্চাতের সেই ইঙ্গিতটি জানাই এ-ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য। এই চিন্তাধারার অনুগামীরা এমন দাবী অবশ্যই করেন না যে, এইসব চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা একান্তভাবে জাতির সহজাত সম্পদ, বা শুধুমাত্র তাহার জন ও ভাষার একত্ব-বৈশিষ্ট্যের ফল কিংবা কেবল সেই বিশেষ দেশ ও কালান্তর্গত বিশিষ্ট প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর দান। বস্তুত, জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার অন্তর্নিহিত মৌলিক প্রতিভা এবং প্রবণতাও যে ইতিহাসের আবর্তন-বিবর্তনের দ্বারা নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত, জন, ভাষা, ভৌগোলিক পরিবেশ, সমাজবিন্যাস, অর্থনীতি প্রভৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত একথা এ'রাও অস্বীকার করেন না। এইসব প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের কথা স্বীকার করেও তাঁরা বলেন, দেশকালধৃত জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যতো পরিবর্তন-শীলই হোক, কালে-কালে তার যতো বিবর্তনই ঘটুক, আসলে এই সব মৌল চরিত্র-লক্ষণই অব্যবহিত পরবর্তী যুগের সৃজ্যমান ইতিহাসের নির্দেশক ও নিয়ামক। এই সব চরিত্র লক্ষণ পরবর্তী কালের হাতে যে উত্তরাধিকার দিয়ে যায়, ভবিষ্যতের জন্য যে অস্পষ্ট নির্দেশ আভাসে-ইঙ্গিতে রেখে যায় শুধুমাত্র তারই আলোকে পরবর্তী কালের মানুষ অনুরূপ বা সদৃশ পরিস্থিতিতে সজ্ঞান সচেতনতায় নিজের কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করতে পারে। অর্থাৎ এই চরিত্র-লক্ষণগুলিই আসলে পরবর্তী যুগের দিশারী। এইসব চরিত্রবৃত্তির কোনো কোনোটি আবার যুগযুগান্তের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এমনভাবেই উত্তীর্ণ, শতাব্দীর পর শতাব্দীর আবর্তনে-বিবর্তনে, সংকটে-সংঘর্ষে তাদের যথার্থতা এমন নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত যে সেগুলোকে তাঁরা, আপেক্ষিক বিচারে, জাতীয়-চরিত্রের বিশিষ্ট মৌল লক্ষণ বলেই গণ্য করেন।

ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় জনসাধারণের ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণাও ছিল অনুরূপ ধরনের; ভারতেতিহাস ও ভারত-সংস্কৃতির যে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা তিনি করেছেন তাও এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই। কাজেই যে ইতিহাস-দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের মনন-কল্পনায় উদ্ভাসিত, তার বিচার-বিশ্লেষণ যেমন একদিকে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপের সামগ্রিক উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক, অন্যদিকে তেমনি তা আমাদের অতীত সম্বন্ধে চেতনা-বোধকে পূর্ণতর ও উজ্জ্বলতর করার জন্যও প্রয়োজনীয়।

চল্লিশ বছর বয়সে রচিত একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-ভাবনা এক গভীর ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত হয়েছে। সেখানে স্পষ্টই তিনি ইতিহাসের সঞ্চরণশীল সৃজনী রূপকে একটি সজীব সত্তারূপে কল্পনা করেছেন, যে-সজীব সত্তাই, তাঁর মতে, চলমান বর্তমানের রূপকার। অস্থির বর্তমানের সকল চপলতার পশ্চাতেই সেই মৌন অতীতের গোপন স্পর্শ।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

কথা কও, কথা কও।
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী,
অচেতন তুমি নও—
কথা কেন নাহি কও!
তব সঞ্চার শুনেছি আমার
মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয়
রেখে যাও মোর প্রাণে!
হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা-মাঝে
স্থির হয়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপন-হৃদয়ে
কথা কও, কথা কও।
কথা কও, কথা কও।
কোন কথা কভু হারাওনি তুমি,
সব তুমি তুলে লও—
কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও।

২

যে ঐতিহ্য, ধ্যান-ধারণা ও সংস্কার-অনুশাসন জাতি উত্তরাধিকাররূপে পায় তাকে সমসাময়িক কালের দাবী ও প্রয়োজনের সঙ্গে কতটা গভীর এবং বিস্তৃতভাবে সমন্বিত ও সমীকৃত করা হয় তাই জাতির প্রাণশক্তি বিচারের অন্যতম মাপকাঠি। কি মনন-কল্পনায়, কি কর্মকৃতিতে, কি ব্যক্তিচরিত্রে সর্বত্র এই মাপকাঠি সমান প্রযোজ্য। যেভাবে অতীত ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা হয়, যেভাবে তার নবরূপায়ণ ঘটে, যেভাবে নতুন প্রাণবেত্তা সঞ্চার করে তাকে ভবিষ্যৎ কালে বিসর্পিত করা হয় তাও ঐ মাপকাঠির অঙ্গ। জাতির ইতিহাসে, বিশেষত

ইতিহাসের সেইসব পর্বে, যখন জাতি তার মূলগত সাধনা বা অন্তর্নিহিত ধর্ম অনুযায়ী ভবিষ্যৎ-প্রসারের পথটিকে মোটামুটি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে চাইছে, তখন তো ঐতিহ্যের এই স্বাঙ্গীকরণ প্রচেষ্টা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম পাদ এই ঐতিহাসিক-পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই সময়েই ভারতবর্ষে একের পর এক এমন অনেক চিন্তানায়কের আবির্ভাব ঘটে, যাঁদের সকল চিন্তাভাবনা ও কর্মপ্রচেষ্টা একান্তভাবে নিয়োজিত হয়েছিল আমাদের সমসাময়িক জাতীয় সাংস্কৃতিক আদর্শের ভিত্তি-রচনায়। রামমোহনের হাতে এই পদ্ধতির সূচনা এবং বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে, নানা বিরোধ-সংঘর্ষ উত্তীর্ণ হয়ে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পর সম্ভবত রবীন্দ্রনাথেই তার সার্থক পরিণতি। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ এমন এক জাতীয় আদর্শের স্রষ্টা, বিস্তারে ও ব্যাপ্তিতে, বিচিত্রতায় ও বৈশিষ্ট্যে যার অন্তর্নিহিত প্রসারণক্ষমতা প্রায় অপরিসীম।

সদ্যোক্ত পদ্ধতির রূপায়ণের জন্য এইসব মনীষীদের প্রত্যেককেই সচেতনভাবে ভারত-বর্ষের অতীত ঐতিহ্যের পুনর্বিচার ও সংস্কারে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল এবং নিজ নিজ শিক্ষা-দীক্ষা, প্রভাব-পরিবেশ, মনন-কল্পনা, মানস-প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তাঁরা তা করেওছিলেন। জাতির মুখপাত্র হয়ে ওঠার ঐকান্তিক কামনায় এবং ভবিষ্যতের যে-বাঞ্ছিত পথে তাঁরা জাতিকে পরিচালিত করার প্রয়াসী তার অনুসন্ধানে অনিবার্যভাবেই তাঁদেরকে জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্মতা খুঁজতে হয়েছিল এবং ঐতিহ্যের যে পুনর্বিচার ও মূল্যায়নের কথা আগে বলেছি তা সেই একাত্মতা-সাধনেরই অঙ্গ। ইতিহাসের এই অমোঘ নিয়মটি সমসাময়িক কালে সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে জওহরলাল নেহরুর জীবনে, কর্মক্ষেত্রে ও ব্যক্তিত্বে। হ্যারো আর ক্যাম্ব্রিজের মানস-সন্তান জওহরলাল, সম-সাময়িক পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার যা কিছু মহৎ তার প্রতিভূ। অথচ এই নেহরুকেও অপেক্ষা-কৃত পরিণত বয়সে ভারত-আত্মার সন্ধানে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে, তবেই তিনি দেশ ও দেশবাসীর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন। আর এই একাত্মতা সাধনের ফলেই অর্জিত হয়েছিল স্বীয় কালের দাবী অনুযায়ী দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ব্যক্তিত্বের নবরূপায়নে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণের অধিকার।

এই আত্মিক যোগসাধনের কাজটি রবীন্দ্রনাথ কিভাবে সম্পন্ন করেছিলেন? সন্দেহ নেই, অভিনিবিষ্ট ইতিহাস-চর্চা এবিষয়ে তাঁর সহায়ক হয়েছিল। আমরা জানি, ভারতবর্ষের এবং অন্যান্য প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাসপাঠে তাঁর কী গভীর অনুরাগ ছিল। আজীবন রবীন্দ্রনাথের পাঠস্পৃহা ছিল অনির্বাণ; ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে, এমনকি সাধারণভাবে ইতিহাসতত্ত্ব বিষয়ক রবীন্দ্রনাথ-পঠিত অগণিত গ্রন্থের কিছু কিছু এখনো বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। বইগুলির প্রতিটি পাতার মার্জিনে পেন্সিলে ও কালিতে লেখা তাঁর বিস্তারিত নোট এবং টীকা-টিপ্পনী দেখলে বুঝতে দেরী হয় না যে, কী গভীর মনোযোগ সহকারে কত প্রভূত শ্রমস্বীকার করে তিনি এসব বই আদ্যোপান্ত পড়েছিলেন। নিজের রচনায় পাদটীকা সংযোগ বা প্রমাণপঞ্জী নির্দেশের অভ্যাস রবীন্দ্রনাথের কোনদিনই ছিল না; হয়তো পেশাদারী পণ্ডিত ছিলেন না বলে, সে প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেননি। কিন্তু তাঁর রচনাগুলি একটু খুঁটিয়ে পড়লেই যে সকল সূত্র থেকে তিনি তথ্য বা তত্ত্ব সংগ্রহ করেছেন তার হদিশ মেলে। ইতিহাসসহ সমাজবিজ্ঞানের যতো বই রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে পড়েছিলেন, সহজেই

অনুমান করা যায়, তার তালিকা সুবৃহৎ; এবং এও খুব স্বাভাবিক যে ভারতবর্ষের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক সমকালীন কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থই সে-তালিকার বহির্ভূত ছিল না। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁদের রচনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল তার তালিকায় রয়েছেন হেগেল ও স্পেঙ্গলার, ফ্রেজার ও সরোকিন, ওয়েস্টারমার্ক ও কেয়ারিলিং, গুয়োজো ও সীলি প্রভৃতি।

এই ব্যাপক অধ্যয়ন অনিবার্যভাবে তাঁকে মানস-প্রস্তুতির প্রথম পর্বে, প্রায় তরুণ বয়সেই, প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধ-রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। অবশ্য, তার পরেও নানা প্রসঙ্গে ইতিহাসের এলাকায় তাঁর অবিরাম আনাগোনা সারাজীবন ধরে চলেছে। বস্তুত, সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে যতো প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন তার অধিকাংশই তো গভীর ইতিহাসবোধে উজ্জ্বল এবং কোন না কোন ভাবে তাঁর ইতিহাস-দৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। বিশ্ব-ইতিহাস ও বিশ্ব-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্ব ও দিক সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘদিনের চিন্তা-ভাবনা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে তিনি বারংবার এইসব প্রবন্ধে উপস্থিত করেছেন। বিংশ শতকের সূচনায়ই দেখতে পাই, তাঁর দূরদর্শী মন ছায়াবৃত আফ্রিকা সম্বন্ধে গভীরভাবে উৎসুক; এই ঔৎসুক্য তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জাগ্রত ছিল। ভাবলে অবাক হতে হয় যে সত্তর বছরের বার্ধক্যেও হেইলীর "অ্যাফ্রিক্যান সার্ভে"-র মতো বিরাট গ্রন্থ আগাগোড়া পড়বার উৎসাহ, অধ্যবসায় এবং আগ্রহ তাঁর ছিল। হেইলীর গ্রন্থ তাঁর হৃদয়ে যে দোলা লাগিয়েছিল তারই বেদনা-মথিত প্রকাশ দেখতে পাই আফ্রিকার আত্মাকে নিয়ে রচিত তাঁর পরমাশ্চর্য গদ্য কবিতাটিতে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভারতীয় সংস্কৃতিব বিচার-বিশ্লেষণ এবং আলোচনা-মীমাংসার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণায় রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনার প্রতিটি মুহূর্তে ভারত-ঐতিহ্যের মূলগত ঐক্যে উপনীত হবার এক নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। তারই জন্য বেদ উপনিষদ থেকে আরম্ভ করে নিজের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত অতীতের যেখানে যা-কিছু সৃষ্টি-শীল, যা-কিছু জ্ঞানকে সমৃদ্ধ, কল্পনাকে উদার এবং দৃষ্টিকে প্রসারিত করার কাজে সহায়ক, তা তিনি দু'হাত দিয়ে গ্রহণ করেছেন। এমনি করেই সৃষ্টিশীল ঐতিহ্যের গোমুখীতে বার বার অবগাহন করে তাকে তিনি আত্মার সম্পদ ও সত্তার অঙ্গ করে তুলতে চেয়েছেন। ভারত-আত্মার যে-রূপ তাঁর ধ্যান-কল্পনায় উদ্ভাসিত ছিল নিজের ব্যক্তিসত্তাকে তার মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন করে দিয়ে, সেই বিরাট একের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করাই ছিল রবীন্দ্র-নাথের আধ্যাত্মিক আদর্শ।

৩

প্রথম বয়সের রচনাপঞ্জী থেকে দেখা যায় যে, ষোল বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের অদূরবর্তী অতীত কালের ইতিহাস সম্পর্কে কৌতূহলী (তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক প্রবন্ধ 'ঝাঁসীর রাণী' প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে) এবং পঁচিশ উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই তাঁর কৌতূহলও অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র বিস্তৃততর হয়ে শুধুমাত্র ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ব ও দিকেই ছড়িয়ে পড়েনি, বিশ্ব-ইতিহাসের প্রাঙ্গনকেও স্পর্শ করেছে। কিন্তু যথার্থভাবে

বলতে গেলে, উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথম দশকে, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ত্রিশ ও চল্লিশের মধ্যবর্তী, তখনই তাঁর মনন-কল্পনায় গভীর ইতিহাসবোধের স্ফুরণ দেখা যায়। এই সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভারতীয় সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করে তিনি দীর্ঘ একগুচ্ছ প্রবন্ধ রচনা করেন, এবং এই সময়ের মধ্যেই সেগুলি প্রকাশিত হয়। তাঁর পঞ্চাশ-পূর্তির বছর ১৯১২ সালে "ভারতবর্ষে ইতিহাস ধারা" রচনাটি প্রকাশিত হয়। এই রচনায় বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও আলোচনার বিস্তার দেখলে নিঃসংশয়ে বোঝা যায় যে ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভারতীয় সংস্কৃতির অস্পষ্ট ঊষালোকিত আদিম পর্ব থেকে আরম্ভ করে মুঘল-মারাঠা রাজপুত-শিখ আমল পর্যন্ত ইতিহাসের অলিতে-গলিতে তাঁর সহজ স্বচ্ছন্দ বিচরণই শুধু শেষ হয়নি, অধ্যায়ন-অন্বেষণ বীক্ষণ-মনন এবং আলোচনা-গবেষণা দ্বারা তিনি একটি স্পষ্ট সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, আর্যদের আদিম নিবাস—আর্য-আর্যপূর্ব ও অনার্যদের প্রচণ্ড জাতিসংঘাত—নিরবচ্ছিন্ন বিরোধ-সংঘাতের পথে আর্য-অনার্যের সংস্কৃতির মিলন ও সমন্বয় প্রচেষ্টা—শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শভেদ এবং সংঘাত-সমন্বয়ে একের দ্বারা অন্যের গভীর রূপান্তর—হিন্দুধর্মের যথার্থ রূপ ও প্রকৃতি—ভারতীয় সভ্যতায় আচার-আচরণ, স্মৃতি-শাসন ইত্যাদির সঙ্গে আত্মিক ও মননগত আদর্শের অসামঞ্জস্য—ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজবিপ্লবের অভিজ্ঞানরূপে মহাভারত—রামায়ণে মৃগয়া-জীবী আরণ্যক দক্ষিণখণ্ডে কৃষিসভ্যতা বিস্তারের ইঙ্গিত—বর্ণভেদ প্রথার দুঃসহ অমানবিকতা অথচ সামাজিক স্থিতিরক্ষায় ও জনসাধারণের সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তা-বিধানে তার গুরুত্ব—ভারতীয় জনসাধারণের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মানস-সংস্কৃতির প্রভাব—হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণের যথার্থ স্থান ও দায়িত্ব—আশ্রমজীবন ও হিন্দুবিবাহ রীতির বৈশিষ্ট্য—মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র—প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতীয় ধ্রুপদী আদর্শের অভিব্যক্তি—ভারতবর্ষের সমাজজীবনে মেলা ও উৎসবের গুরুত্ব—অশোক ও তাঁহার কাল—ভারতেতিহাসে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা—মুঘল ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য—মারাঠা-ইতিহাসের চরিত্রস্বাতন্ত্র্য—রাজপুত, শিখধর্ম এবং শিখ-গুরুদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব—অষ্টাদশ শতকের সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যশাসিত রাজ্যগুলিতে ভারতীয় সমাজদেহের ক্রমিক অবক্ষয়—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তুলনামূলক বিচার প্রভৃতি ভারত-ইতিহাসের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা-পরিধির অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, এই সময়েই তিনি প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ধম্মপদেরও অনেকখানি অংশ অনুবাদ করেন এবং সেই সূত্রে তার উপর কিছু কিছু আলোচনাও প্রকাশ করেন। মধ্যযুগের মরমীয়া সাধক কবীরের অনেক দোঁহাও এই সময় তাঁর হাতে কাব্যরূপান্তর লাভ করে।

এই দুই দশকে রবীন্দ্রনাথ-রচিত ঐতিহাসিক বা ইতিহাস-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম, সেইসব প্রবন্ধ ও আলোচনা যেগুলি মুখ্যত ইতিহাসধর্মী। এইসব রচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবেই আর্যদের ভারতে আগমন থেকে সুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত সুবিস্তৃত কালের ইতিহাস-প্রবাহ পর্যালোচনা করেছেন।

দ্বিতীয়, স্বল্পায়তন একগুচ্ছ প্রবন্ধ, যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে ঐতিহাসিক, কিন্তু যথার্থবিচারে যেগুলিকে অর্ধ-ঐতিহাসিক বলাই সঙ্গত। এইসব প্রবন্ধে প্রাচীন ঐতিহ্যের

পুনর্বিচার ও নতুন মূল্যায়নকে তিনি স্বীয় বক্তব্য প্রতিষ্ঠার কাজে লাগিয়েছেন। 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' (১৮৯১), 'নূতন ও পুরাতন' (১৮৯১), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৯৪), 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা' (১৯০১), 'ব্রাহ্মণ' (১৯০১), 'সমাজভেদ' (১৯০১) প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে।

তৃতীয়, পূর্বোক্ত দুই দশকে রচিত ও প্রকাশিত আর একগুচ্ছ প্রবন্ধ যা স্পষ্টতই সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যামূলক। কিন্তু এক্ষেত্রেও ইতিহাস থেকে সংগৃহীত তত্ত্ব ও তথ্য প্রবন্ধগুলির প্রধান আশ্রয় এবং রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-ব্যাখ্যা তার প্রধান ভিত্তি। 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' (১৮৯৩), 'রামমোহন রায়', 'মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে' (১৮৯৮), 'রাজনীতির দ্বিধা' (১৮৯৩), 'অপমানের প্রতিকার' (১৮৯৩), 'সফলতার সদুপায়' (১৯০৪), 'দেশীয় রাজ্য' (১৯০৫), 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণ' (১৯০৭), 'পথ ও পাথেয়' (১৯০৬ ?), 'সমস্যা' (১৯০৬) প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত।

চতুর্থ পর্যায়ের রচনাগুলির সূচনা উনিশ শতকের অন্টম দশকে, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বিশের কোঠায়। এই রচনাগুলির মধ্যে প্রবন্ধ ছাড়াও রয়েছে অনেক উপসনান্তিক ভাষণ এবং কিছু কিছু ধর্মীয় সাহিত্যবিষয়ক নিবন্ধ ও খসড়া। এর বৃহত্তম অংশ তাঁর ব্যক্তিগত প্রেরণার মূল উৎস উপনিষদের বাণী বিশ্লেষণে এবং তাদের মর্মোদ্ঘাটনে নিয়োজিত। কয়েকটি প্রবন্ধ আমাদের দুই মহাকাব্য—মহাভারত ও রামায়ণের—ভাবসত্য উন্মোচনে এবং সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত। আর বাকী অংশে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, বাঙালী বৈষ্ণব সাহিত্য, উত্তর-ভারতীয় অন্যান্য সাহিত্য, বিশেষ করে, মধ্যযুগের মরমীয়া সাধকদের রচিত গান ও দোঁহা এবং সর্বোপরি, বাংলার গ্রামীন কৃষিজীবনোৎসারিত বাউল গান, ছড়া ইত্যাদি বিস্মৃতপ্রায় লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের উপনিষৎ-অনুরাগ এবং ঔপনিষদিক প্রেরণার কথা এত সুপরিজ্ঞাত যে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। নিতান্ত অল্প বয়সেই যে তিনি বৈষ্ণব কবিতার ঐতিহ্যের সঙ্গে সহমর্মিতা খুঁজে পেয়েছিলেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীই (১৮৮৪) তো তার প্রমাণ। তবে অনেকেই হয়তো একথা জানেন না যে, বিদ্যা-পতি ও চন্ডীদাস সম্বন্ধে তাঁর প্রথম গদ্যরচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮১ সালে এবং তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে 'পদরত্নাবলী' (১৮৮৫) সংকলনে ও সম্পাদনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। এ-তথ্যও অল্প লোকেই জানেন যে, দশ বছর ধরে তিনি বিদ্যাপতির পদা-বলীর একটি নোতুন সংস্করণ তৈরীর কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। সংকলনের সম্পূর্ণ পান্ডুলিপি তিনি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের হাতে দিয়েওছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সংকলনটি কোনদিনই প্রকাশিত হয়নি। বাংলার লোকসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'বাউলের গান' প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালে, এবং এই বছরই তিনি বিস্মৃতপ্রায় লোকগীতি, লোকগাথা ও ছড়া সংগ্রহের জন্য জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান এবং পরের বছর নিজেই 'ছেলেভুলানো ছড়া' ও 'মেয়েলী ছড়া'র উপর দুইটি প্রবন্ধ রচনাও প্রকাশ করেন।

পঞ্চম পর্যায়ের রচনাগুলি সৃষ্টিমূলক। এর মধ্যে গীতিকবিতা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে কাহিনী কাব্য, নাটক এবং অন্তত একটি উপন্যাস, 'গোরা' (১৯০৮)। এই রচনা-গুলির প্রত্যেকটি ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংস্কৃতিগত ও আদর্শগত ধারণা দ্বারা গভীরভাবে রঞ্জিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সেই সময়ে এই বহির্দৃষ্টির প্রেরণা কাব্যে ও নাট্যে ভিড় করে এসেছিল ইতিহাসের সঞ্চয় নিয়ে।' গীতিকবিতা ও কাহিনী কাব্যের

মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় মানসীর (১৮৯৬) অন্তর্ভুক্ত 'গুরুগোবিন্দ', সোনার তরীর (১৮৯৪) কয়েকটি কবিতা, চিত্রা (১৮৯৫), চৈতালী (১৮৯৬), কল্পনা (১৯০০), কথা (১৯০০), কাহিনী (১৯০০), নৈবেদ্য (১৯০১), খেয়া (১৯০৭) এবং গীতাঞ্জলির অন্তত দুইটি কবিতা। সকলেই জানেন, কথা ও কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কাহিনীকাব্যগুলির, ('যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়') ভিত্তি হচ্ছে মূলত, বেদ, রামায়ণ-মহাভারত ও বৌদ্ধ উপকথা, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, শিখ, রাজপুত ও মারাঠা ইতিহাস বা চারণগাথা থেকে সংগৃহীত কাহিনী। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সাংস্কৃতির ও আত্মিক ঐতিহ্যের যে-সব মহৎ ভাবনা তাঁর কবিচিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল তাই তিনি রূপায়িত করেছেন কল্পনা ও নৈবেদ্যের কবিতাগুলিতে এবং গীতাঞ্জলির দুটি প্রধান কবিতায়। ঔপনিষদিক আশ্রমজীবন এবং প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ তো ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মাচর্য বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার মধ্যেই পাওয়া যায়। ভারতীয় ঐতিহ্যের কি কি আদর্শ ও সূত্র, রীতি ও নিয়ম তাঁর সৃজনমুখী মনে সাড়া জাগিয়েছিল, কোনগুলিকে তিনি গ্রহণ ও অনুসরণযোগ্য মনে করতেন বিসর্জন (১৮৮৯-৯০) ও মালিনী (১৮৯৬)—এই দুটি নাটকে তা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। কল্পনা নৈবেদ্য ও খেয়ার গীতিকবিতাগুলি সম্পর্কেও একথা সমান সত্য।

উদাহরণ এবং নজীরের সংখ্যা হয়তো একটু বেশিই হলো; কিন্তু আমার ধারণা, ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের জন্য এর প্রত্যেকটির উল্লেখ অপরিহার্য। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক দৃষ্টি যে উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথম—এই দুটি দশকেই গড়ে উঠেছে, সে-তথ্যটিও আমার বিবেচনায়, বিশেষ মূল্যবান। লক্ষণীয় এই যে, সদ্যোক্ত দুই দশক জুড়ে বাংলাদেশের উপর দিয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও চিন্তাগত আলোড়নের এক গভীর ঝড় বয়ে গেছে। দেশের এই আলোড়িত উদ্বেলিত সামাজিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরই ছিল সর্বাপেক্ষা স্পষ্টোচ্চারিত; তাঁর চেয়ে বেশি গভীর ও সক্রিয়ভাবে, এমন ঐকান্তিক আন্তরিকতার সঙ্গে যুগপ্রয়োজনের কথা আর কেউ সেদিন ব্যক্ত করেন নি। আমাদের সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের মূল কাঠামোটি রূপ নিয়েছিল এই দুই ঐতিহাসিক দশকে এবং সেই রূপায়ণের নায়ক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অন্য যাঁরা এই কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত। ১৯১১ সালে, পঞ্চাশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রতিভার মধ্যাহ্ন গগনে, তার পূর্বেই নিজের ধ্যান-কল্পিত ভারত-আত্মার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তি ও মানস সত্তার সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘদিনের অধ্যয়ন, অন্বীক্ষণ ও বিচার-বিশ্লেষণের ফলাফলকে জনসাধারণের নিকট সূত্র-সংক্ষিপ্ততায় উপস্থিত করার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় ১৯১২ সালে তিনি তাঁর অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' রচনা করেন। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের শীর্ষস্থানীয় যদুনাথ সরকার এই প্রবন্ধটিকে এতই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছিলেন যে, তিনি নিজে অগ্রণী হয়ে মডার্ন রিভ্যুতে তার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ নিজে আর একবার প্রবন্ধটির ইংরেজী তর্জমা করেন। এর অনেক আগে, ১৯০২ সালে তিনি 'ভারতবর্ষের

ইতিহাস' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। মোটামুটিভাবে এই দুটি প্রবন্ধকেই তাঁর ইতিহাস-চর্চার সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করলে খুব ভুল হয় না। ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রবাহ মূলত কোন পথে অগ্রসর হয়েছে, ইতিহাসের তপস্যা শতাব্দীর পর শতাব্দী সংঘাত-সংঘর্ষ ও সংকোচন-প্রসারণের বিঘ্নসঙ্কুল পথে কী কী মূলগত আদর্শ ও মূল্যবোধ গড়ে তুলেছে তার একটা মোটামুটি দিগ্‌দর্শন পাওয়া যাবে এই দুটি প্রবন্ধে। পরবর্তী জীবনে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তিনি যা কিছু লিখেছেন তা সবই এই প্রবন্ধ দুটিতে উপস্থাপিত প্রতিপাদ্যের সমর্থনে বা সম্প্রসারণে।

৪

রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হবার পূর্বে এই দুই দশকের রচনা ও বক্তৃতা ইত্যাদি থেকে ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে, এমনকি ইতিহাস-রচনা বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিকোণ কি ছিল তা জেনে নেওয়া উচিত।

'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : 'ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন-কাহিনীমাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, এক দল যদি বা যায় কোথা হইতে আর-এক দল উঠিয়া পড়ে—পাঠান-মোগল-পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

'কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়, এ-সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনাখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে।

'তখনকার দুর্দিনেও এই কাটাকাটি-খুনাখুনিই যে ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার তাহা নহে। ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটনা, তাহা তাহার গর্জনসত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না—সেদিনও সেই ধূলিসমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্মমৃত্যু—সুখ-দুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও, মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান।......

'ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। যে ব্যক্তি রথ্‌চাইল্‌ডের জীবনী পড়িয়া পাকিয়া গিয়াছে, সে খ্রীস্টের জীবনীর বেলায় তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারি তলব করিতে পারে; যদি সংগ্রহ করিতে না পারে তবে তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে এবং সে বলিবে, যাহার এক পয়সার সংগতি ছিল না তাহার আবার জীবনী কিসের? তেমনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফ্‌তর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, 'যেখানে পলিটিক্স নাই সেখানে আবার হিস্ট্রি কিসের; তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল খেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়াও যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সেই প্রাজ্ঞ।'

অন্যত্র, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে আর্য-অনার্য মিলন উদ্‌যোগে বিশ্বামিত্র, জনক ও রামচন্দ্রের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'এই জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র যে পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন সে কথা হয়তোবা কালগত ইতিহাসের দিক দিয়া সত্য নহে, কিন্তু ভাবগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন ব্যক্তি পরস্পরের সন্নিকটবর্তী'। উক্তিটির গভীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য লক্ষণীয়।

এই প্রবন্ধেরই আর এক জায়গায় তিনি মহাভারতকে মহাকাব্য না বলে বলেছেন আর্যজাতির ইতিহাস : 'আর্যসমাজের যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ব্যাস তাহাদিগকে এক করিলেন। সুধু জনশ্রুতি নহে, আযসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাটমূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত।...আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে, কিন্তু ইহা যথার্থই আর্যদের ইতিহাস। ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি এই সমস্ত জনশ্রুতিকে গলাইয়া পোড়াইয়া বিশ্লিষ্ট করিয়া ইহা হইতে তথ্যমূলক ইতিহাস রচনা করিবার চেষ্টা করিত তবে আর্যসমাজের ইতিহাসের সত্য স্বরূপটি আমরা দেখিতে পাইতাম না।'

রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক ও অর্ধ-ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলিতে আর একটি ভাবনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। তাঁর মতে, প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক কালে প্রতি জাতিই হয় সচেতনভাবে নয়তো নিজের অজ্ঞাতে একটা কেন্দ্রীয় সত্য, একটা মূলগত ভাবাদর্শ গড়ে তোলে। একে বিশেষ কোন সংজ্ঞায় বিধিবন্ধ করা হয়তো কঠিন, কিন্তু একটু গভীর ভাবে কান পাতলেই জাতির হৃদয়ে তার স্পন্দন শোনা যায়। জাতির এই মূলপ্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ প্রাণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রাণ যেমন জীবদেহের সবচেয়ে জরুরী অঙ্গ, এই মূল-প্রকৃতিও জাতীয় জীবনের পক্ষে তেমনি অপরিহার্য। অথচ, প্রাণের মতোই কোন বিশেষ সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট করে বিচারবুদ্ধির পরিধিতে একে পাওয়া কঠিন। জনসাধারণের জীবনের এই মূলপ্রকৃতিটিকে খুঁজে বার করা, জাতির অন্তরতম সত্তার নিত্যলক্ষণটিকে যথার্থভাবে চিহ্নিত করা, তাঁর মতে, ঐতিহাসিকের প্রধান দায়িত্ব। এই ধারণার স্বতঃসিদ্ধ রূপে রবীন্দ্রনাথ একথাও বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক দেশ ও জাতিই সচেতন বা অবচেতনভাবে তার ইতিহাসের মাধ্যমে কতকগুলি মৌলিক মানবিক সমস্যার সমাধান খোঁজে, এবং সেইসব সমস্যা সমাধানের পথেই এমন কিছু কিছু মূল্যবোধও সৃষ্টি করে যার উত্তরাধিকার ও লালনপালনের দায়িত্ব পরবর্তী কালের হাতেও এসে পেঁাছয়। সেইসব সমস্যা ও তার সমাধান, সেইসব মূল্যবোধ ও তাদের বিবর্তন, তাদের চরিত্র ও প্রকৃতি, জনমানসে তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া সবই ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানের বিষয়।

এই কারণেই, রাজবংশের বৃত্তান্ত বা রাষ্ট্রযন্ত্রের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোন ঔৎসুক্য ছিল না। বস্তুত, ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণে নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর তিনি বরাবর নিন্দা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একান্তভাবে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক। এবং কোনো কারণেই তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সামান্যতম পরিবর্তন করতেও সম্মত ছিলেন না। বার বার তিনি একথাই বলতে চেয়েছেন যে, ভারতবর্ষে সুচিরকালের ইতিহাসে ভারতবাসীর জীবন কোনদিনই রাজা বা রাষ্ট্রনির্ভর ছিল না, ভারতবর্ষের সমাজদেহে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রাধান্যও কোন দিন স্বীকৃত হয় নি। ভারত-

বাসীর জীবনে দিল্লী চিরদিনই দূরে-অস্ত্। রবীন্দ্রনাথের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জীর দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখলে ভারতবাসীর জীবন ও সংস্কৃতির মহত্তম ঐশ্বর্যই আমাদের অগোচরে থেকে যাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির অনিবার্য স্বতঃসিদ্ধ রূপেই ইতিহাসের বস্তুভিত্তিক বিচার-বিশ্লেষণ অপেক্ষা ভাবগত ব্যাখ্যার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। তাঁর মতে, কি ব্যক্তিজীবন কি সমাজজীবন বিশেষকালের বস্তুভিত্তি দ্বারা যতটা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, ভাবাদর্শের প্রভাব তার চাইতে একটুও কম নয়। তথ্যের খুঁটিনাটি সম্পর্কে অতিরিক্ত আগ্রহ, ঘটনার সঠিক কাল নিয়ে সূক্ষ্ম তর্কবিতর্ক, বহি-র্জীবনের ঘটনার উপর আত্যন্তিক গুরুত্ব আরোপ প্রভৃতি যেসব বিষয় সাধারণ ইতিহাসে প্রাধান্য পেয়ে থাকে, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অবজ্ঞা ছিল গভীর।

তাই বলে, ইতিহাস শুধুমাত্র আকস্মিকতার মালা, কেবলমাত্র আপতিক ঘটনার সন্নিবেশ, এমন বিশ্বাসও তাঁর ছিল না। তাঁর বরং বিশ্বাস ছিল, ইতিহাসের গতি প্রবাহে একটা গভীর ঐক্য বর্তমান, কার্য-কারণসম্বন্ধের একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতোই ইতিহাসের অন্তরালে বয়ে চলেছে। বহির্জীবনের ঘটনার উপর দৃষ্টিনিবন্ধ রাখলে সব সময় এই কার্যকারণসম্বন্ধ নজরে পড়ে না, কিন্তু সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ভাবগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস আলোচনায় অগ্রসর হলে সে সূত্রটি সহজেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। সেই ঐক্য জাতির সেই আভ্যন্তরিক প্রকৃতির সন্ধানই প্রকৃত ঐতিহাসিকের দায়িত্ব। সেই গভীর ঐক্যটিকে ধরতে পারলে তবেই দেশ ও কালান্তর্গত ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি যথার্থভাবে জানা সম্ভব।

রাজা-মহারাজাদের দ্বারা উৎকীর্ণ শিলালিপি বা তাম্রলিপি, রাজবংশমালায় উল্লেখিত ঘটনা বা বিবরণপঞ্জী, রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি উপাদানের উপর পেশাদারী ঐতিহাসিকেরা যতটা গুরুত্ব আরোপ করেন, এদের প্রামাণিকতায় তাঁরা যতটা বিশ্বাসী, রবীন্দ্রনাথ এইসব রাজকীয় উপাদানের উপর ততটা আস্থাবান ছিলেন না। যে উৎস থেকে এগুলি উৎসারিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নিরপেক্ষ না হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া, জনজীবনের ঘনিষ্ট পরিচয় লাভের পক্ষে এইসব উপাদান, তাঁর বিবেচনায়, অনেকটা অবান্তর। তাই তিনি জনসাধারণের লৌকিক ও মানসজীবন এ-দুয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, রীতি-নিয়ম, সংস্কার-অনুশাসন ইত্যাদি এবং এইসব সামাজিক রীতিনীতির উদ্দেশ্য ও সার্থকতা গভীরভাবে অনুধাবনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সব তথ্য ও উপাদানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা জনসাধারণের লৌকিক ও মানসজীবনের উপর অধিকতর আলোকপাত করতে সক্ষম।

ইতিপূর্বে, উনিশ শতকের শেষ দশকেই তিনি আমাদের অশিক্ষিত নিরক্ষর পল্লী-বাসীর হৃদয়োৎসারিত কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পাতায়, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায় স্বদেশকে সন্ধান করার জন্য দেশবাসীর নিকট আহ্বান জানিয়েছিলেন। এইসব উপাদান থেকেই তিনি দেশের আভ্যন্তরিক হৃদয়গত বিবরণ সংগ্রহ করতে বলেছিলেন। অনুরোধ করেছিলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, অনুষ্ঠিত মেলার তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করতে, তীর্থস্থান ও দেবমন্দিরগুলির ইতিবৃত্ত সংকলন করতে। কারণ তাঁর মতে, এইসব তথ্য ও উপাদানেই দেশের মনকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়। গ্রাম্য উপকথা আর ইতিবৃত্ত, মেয়েলী আর ছেলেভুলানো ছড়া, লোকগীতি ও লোকগাথা ইত্যাদির সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস—সাহিত্যিক, নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য ছাড়াও, সমাজ ও

দেশবাসীর ইতিহাস-নির্মাণে এগুলির যে বিশেষ মূল্য রয়েছে, রাজকীয় দলিলপত্রের চেয়ে এগুলি যে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য উপাদান সেদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি তিনি বারবার আকর্ষণ করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার অল্প কিছুদিন পরেই, ১৮৯৪ সালে পরিষৎ কর্তৃক আয়োজিত এক সভায়, ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে তিনি ঐতিহাসিক মূল্যের দিক থেকে এইসব উপাদানের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। প্রথমাবধি উচ্চকোটি ও লোকায়ত এই উভয় স্তরের শিল্পে ও সাহিত্যে, চিন্তা-ভাবনায় ও ধ্যান-ধারণায় তিনি ইতিহাস-চর্চার যতটা উপকরণ পেয়েছেন, ইতিহাসের রুদ্ধপুরীর দ্বার-উন্মোচনের যতটা সংকেত পেয়েছেন, পেশাদারী পণ্ডিতদের ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণে তা কোনোদিনই পান নি।

৫

যে-দুই দশকের রচনার কথা আমি ইতিপূর্বে বলেছি, তার মধ্যে থেকেই রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক চিন্তাধারার বিবর্তনের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সকলেই জানেন, উনিশ শতকের শেষ কয়েকটি বছর এবং বিশ শতকের প্রথম দশ-পনেরো বছর আমাদের দেশের চিন্তানায়কদের মধ্যে দেশের অতীত ইতিহাস জানবার এবং জাতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শের সঙ্গে একাত্ম হবার একটা সচেতন প্রচেষ্টা কী বিপুল উদ্যমে চলেছিল। বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বুভুক্ষু জ্ঞানতৃষ্ণাকে কিছুটা অন্তত মেটাবার সর্বপ্রথম চেষ্টা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। উভয়েই, বিশেষ করে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ছিলেন ঠাকুরপরিবারের ঘনিষ্ট বন্ধু। এবং রাজেন্দ্রলালই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মনে ইতিহাস সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বা রাজেন্দ্রলাল, কারো পক্ষেই রবীন্দ্রনাথের বুভুক্ষা মেটানো সম্ভব ছিল না। পরবর্তী জীবনে তিনি দুজন পেশাদারী ঐতিহাসিক—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও যদুনাথ সরকারের সান্নিধ্য ও সাহচর্য পেয়েছিলেন। সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই সাহচর্যের ফলে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উপকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই যে, তখনকার দিনে ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রায় সকল পর্বেই তথ্য নিতান্ত স্বল্প এবং জ্ঞান একান্ত অসম্পূর্ণ বলে, আর কিছুটা বা সদ্যজাগ্রত ভারতীয় জাতীয়তা-বাদের তৎকালীন চরিত্রধর্মের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমসাময়িক সকল চিন্তানায়কেরই দৃষ্টি মুখ্যত আকৃষ্ট হয়েছিল ভারত-ইতিহাসের প্রথম পর্বের প্রতি অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের দিকে এবং অংশত, মুসলিম শক্তিবর্গের সঙ্গে রাজপুত-মারাঠা-শিখ জাতির যুদ্ধবিগ্রহের দিকে। ইতিহাসের এই দুই পর্বের বিচার-বিশ্লেষণও তখন চলেছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। রবীন্দ্রনাথও হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবপরিমণ্ডলের সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন নি। ফলে, ভারতবর্ষের অতীত আলোচনায় তাঁর মধ্যেও সেই দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ পড়েছে। অধিকন্তু, বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের আবহাওয়ায় মানুষ। তাঁর চোখে প্রাচীন ভারতের স্বপ্ন, মনে আশ্রম আর তপোবনের হাতছানি। জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের এই যৌথ প্রভাব তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর গভীর স্বাক্ষর রেখে গেছে। ১৮৯০ সাল থেকে ১৯০৫—০৬ সাল পর্যন্ত তাঁর সকল ঐতিহাসিক ও সৃষ্টিধর্মী রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গির চিহ্ন রয়েছে। তাঁর এই সময়কার রচনাগুলিতে প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা এবং প্রাচীন কালের রীতিনীতি সম্পর্কে অতিরঞ্জিত আদর্শ-আরোপ এবং অতিরিক্ত গুণকীর্তনের একটা প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু

১৯০৫—০৬ সালের শেষাশেষি আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে যখন জাতিগত ক্রোধের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে এবং হাত-জোড়-করা ভিক্ষের আবেদন যখন চোখ-রাঙানো ধমকের স্তর পেরিয়ে ক্রমশ হিংসাত্মক কার্যকলাপে আত্মপ্রকাশ করে তখনই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম অনুভব করেন যে রাষ্ট্র যখন তৈরী নেই তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের চেষ্টা করা আসলে পথ ছেড়ে অপথে চলা। মত্ততার সপ্তকে সপ্তকে ক্রোধের সেই তৃপ্তিসাধন দেশের সামাজিক মানস ও সাংস্কৃতিক জীবনেও সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির প্রশ্রয় জোগাচ্ছিল, হৃদয়াবেগকে অন্ধ উৎকট দেশভক্তির শূন্য বালুচরের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল, যার ফলে দেশের বিদ্যাবুদ্ধিও ক্রমশ চাপা পড়ছিল, অন্ধবিশ্বাসের নিকট আত্মসমর্পণের বন্ধ্যাত্ব যুক্তি-বিচারকে গ্রাস করে ফেলছিল। বলা বাহুল্য, মানসজীবনের এই বন্ধ্যা ভবিষ্যৎ রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হয়নি; তাই তিনি শুধু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতৃত্বেই ইস্তফা দিলেন না, সব কিছু ফেলে ফিরে গেলেন তাঁর শান্তিনিকেতনের আশ্রমে। এর ফলে তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিরও গভীর রূপায়ন ঘটল। ১৯০৫—১০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর মানস-জীবনে ও হৃদয়াবেগের ক্ষেত্রে যে-ঘাতপ্রতিঘাত চলেছে তাই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর মহাকাব্যপ্রতিম উপন্যাস 'গোরা'য়। ১৯১০—১১ সালের মধ্যে তিনি তাঁর পূর্বতন হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠেন এবং তাঁর বিচারভঙ্গী অধিকতর বিশ্লেষণপ্রবণ, সমন্বয়ধর্মী ও বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে। তখন থেকেই তিনি ভারতবর্ষের নব উদ্বোধনকে পৃথিবীর উদ্বোধনের অঙ্গরূপে বিচার করতে সুরু করেন। বুঝতে পারেন যে, এখন থেকে যে-কোনো জাতি নিজের দেশকে একান্ত স্বতন্ত্র করে দেখবে, যুগসত্যের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটবে। চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চাকেই তিনি বললেন, এ-যুগের শিক্ষার সাধনা। তাঁর এই বিশ্বচিত্তমুখী দৃষ্টিভঙ্গিই আমরা প্রতিফলিত হতে দেখেছি 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' (১৯১২) প্রবন্ধে।

কিন্তু হিন্দু জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং আদর্শবাদী দৃষ্টিকোণ সত্ত্বেও তাঁর ইতিহাস বিষয়ক আলোচনার সূচনা-পর্ব থেকেই একটি বিষয় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ না করে পারে না। তা হচ্ছে, শতাব্দীর পর শতাব্দীর বিবর্তনের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষ যে সকল চিরন্তন মূল্যবোধ এবং নিত্যলক্ষণ গড়ে তুলেছে তার অন্তর্নিহিত ঐক্যটিকে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে আমাদের নজরে আনা। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের নিত্যলক্ষণ বলতে তিনি সেই সব মূল্যবোধ ও প্রবণতাগুলি বেছে নিয়েছেন যা মূলগতভাবে মানবিক, উদার, প্রগতিশীল এবং সর্বজনীন; আর সেইহেতু, এই মূল্যবোধগুলি যতখানি জাতীয় প্রায় ততখানিই বিশ্বজনীন। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করবে, পরিপূর্ণতাকে একটা অপূর্ব আকার দান করে তাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করে তুলবে। বারবার তিনি বলেছেন যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আর-এক মহাদেশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত, তার মধ্যে সত্যের একটা সামঞ্জস্য আছে। তাই দেশের জন্য যে-চিন্তা করতে হবে সে-চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎজোড়া। তাঁর এইসব উক্তি থেকে বুঝতে দেরী হয় না যে, সংকীর্ণ ঐতিহ্যবাদী অন্ধ দেশপ্রেমে তাঁর অনুরাগ ছিল না। তাই হিন্দু জাতীয়তাবাদী থেকে ভারতীয় মানবতা-বাদীতে এবং ভারতীয় মানবতাবাদী থেকে আন্তর্জাতিকতাবাদীতে তাঁর মানসিক উত্তরণ অতি সহজেই সম্ভব হয়েছে। এবং এই রূপান্তরে তাঁর মানসসত্তায় বা আবেগসত্তায় কোন রূঢ় আঘাত লাগেনি। ১৯১৪ সালে, আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে, ১৯১৭ সালের

মধ্যেই তাঁর এই মানসিক রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার পর তিনি আর কোন ঐতিহাসিক বা অর্ধ-ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখেন নি। ১৯১৪ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিনি সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে যেসব প্রবন্ধ লেখেন ('সভ্যতার সংকটে' যার পরিসমাপ্তি) এবং যেগুলি 'কালান্তর' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়, তার মধ্যে বিশ্ব-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিচার ও ব্যাখ্যা করার এই দূরদৃষ্টিই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই প্রবন্ধগুচ্ছে তাঁর মানবতাবাদী বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি যত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, এমন আর কোথাও নয়।

৬

এইবার ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল প্রতিপাদ্যগুলি সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে উপস্থিত করা যেতে পারে।

তাঁর প্রথম সিদ্ধান্ত, পৃথিবীর সকল দেশের এবং সকল সভ্যতার ঐতিহাসিক সাধনা ও পরিণতি বিচারের মানদণ্ড কখনো এক হতে পারে না। তাঁর সমসাময়িক কালে ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্রের আবর্তন ও বিবর্তন, রাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন ও রূপান্তরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই ছিল প্রচলিত ঐতিহাসিক রীতি। কিন্তু এই রীতিটি যে সর্বত্র সমান প্রযোজ্য নয়, একথা নানা প্রসঙ্গে তিনি বার বার বলেছেন। তাঁর মতে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের চরিত্র ও প্রকৃতি কোনোকালেই রাষ্ট্রতন্ত্র নির্ভর নয়, সব সময়ই মূলত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে রাষ্ট্রভিত্তিক রূপে কল্পনা করা বা সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার বিচার করা ভুল। ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারা এদেশে প্রবাহিত হত সমাজকে কেন্দ্র করে, সমাজের চরিত্র ও প্রকৃতি অনুসারে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের সামাজিক-রাজনৈতিক আদর্শ ছিল, স্বদেশী সমাজ প্রতিষ্ঠা, স্বদেশী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নয়। স্বদেশীরাষ্ট্র বলতে তিনি রাজনীতিনির্ভর স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বুঝেছেন; কিন্তু দেশের তেমন স্বাধীনতায় তাঁর আস্থা ছিল না। তাঁর দৃষ্টি ছিল স্বয়ং-শাসিত আত্মকর্তৃত্বসম্পন্ন সমাজের দিকে, যে-সমাজে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সকলেই সক্রিয় অংশীদার। ফলে, জাতি-সেবার ফলিত দিকটায় তাঁর দৃষ্টি ছিল সেইসব সমস্যার দিকে যেগুলি প্রধানত সামাজিক ঐক্য ও সামঞ্জস্য, সামাজিক সংহতি ও আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠারই সমস্যা। ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল, এইসব চরিত্রলক্ষণ ভারতীয় ঐতিহ্যে কতটা স্বাক্ষর রেখেছে, তা কতটা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে তারই অনুসন্ধান। যা-কিছু ঐক্যের বিরোধী এবং সংহতির পরিপন্থী, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তাই অকল্যাণকর এবং অমানবিক। সুস্পষ্ট ভাষায় সকল প্রকার অশুভ ভেদবুদ্ধির নিন্দা করতে তিনি কোনদিন কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

তাঁর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, মাঝে মাঝে বাদ-বিসংবাদ, সংঘাত-সংঘর্ষ ও আক্রমণ, সামরিক মনোভাবের ছোটোখাটো ক্ষণস্থায়ী পদস্খলন সত্ত্বেও ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির মূল প্রচেষ্টা চিরদিনই বিরোধী ও বিরুদ্ধ শক্তিগুলির দুঃসাধ্য সমন্বয়ের চেষ্টায় নিয়োজিত। এই ঐক্য ও সমন্বয় প্রচেষ্টার কোনদিন বিরাম ঘটেনি। যে উপকরণগুলি কোনোমতেই মিলতে চায় না তাদের বোঝা ঘাড়ে করেই ভারতবর্ষকে শত শত বৎসর চেষ্টা করতে হয়েছে, যারা বিচ্ছিন্ন কী উপায়ে তারা সমাজের মধ্যে সহযোগী রূপে থাকতে পারে; যারা বিরুদ্ধ

কী উপায়ে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা সম্ভব; যাদের ভিতরকার প্রভেদ মানবপ্রকৃতি কোনো মতেই অস্বীকার করতে পারে না, কিরূপ ব্যবস্থা করলে সেই স্বাভাবিক ভেদকে স্বীকার করেও সামাজিক ঐক্যকে যথাসম্ভব মান্য করা যায় এবং সমাজজীবনের সকল প্রবন্ধই এক সাধারণ উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত হয়। বিচিত্রকে এক করার এই যে সাধনা তা কিন্তু বহুকে বিনষ্ট করে সকলকে একাকার করে দেওয়া নয় বরং বিরাট একের মধ্যে সকলের স্বস্বপ্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করে, পরস্পরের অধিকার সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে সকলের অন্তর্নিহিত গভীরতর সাধারণ ঐক্যবোধকে জাগ্রত করা। নিজের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য ও অনৈক্য, জনসংগঠন ভিন্ন ভিন্ন নরগোষ্ঠীর রক্তসম্পর্ক এবং স্বতোবিরোধী শক্তির সমাবেশ, সমাজ ও ধর্মমতের বিভিন্নতা, রাজনীতি ও অর্থনীতির অসঙ্গতি প্রভৃতির প্রতি যেমন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তেমনি সকল অসঙ্গতি-অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও, এমনকি সকল বিভেদ-বিরোধ উত্তীর্ণ হয়েই ভারতীয় ভূখণ্ডের যে দৃঢ়সন্নিবন্ধ ভৌগোলিক ঐক্য, ভারত-ইতিহাসের যে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা, ঐক্য সংহতি ও সমন্বয় সাধনের যে দুর্দমনীয় প্রচেষ্টা ইতিহাসের সকল যুগেই ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে, সেই ধ্রুব-সত্য সম্বন্ধেও আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। বস্তুত, কতো বিচিত্র ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির কতো বিভিন্ন মানুষ কালে কালে এই ভারততীর্থে এসে মিলিত হয়েছে; ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধানতম সমস্যাই তো ছিল এই বিচিত্র এবং বিরুদ্ধ শক্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান, অন্তরপ্রকৃতির এবং গভীরতর ঐক্যে তাদের সমীকৃত করা।

তাঁর তৃতীয় সিদ্ধান্ত, বহিরাগত অভারতীয় সামরিক অভিযানের নিকট নতি-স্বীকারের যেসব দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায়, ভিনদেশাগত রাজা, সেনাপতি ও রাজবংশগুলির নিকট ভারতবর্ষের এই যে সামরিক ও রাজনৈতিক পরাভব, তা আসলে ভারতীয় সমাজদেহেরই দুর্বলতার লক্ষণ। সামাজিক বাধা-নিষেধের যে জড় জঞ্জাল, অর্থ-নৈতিক বিরোধ-বৈষম্যের যে দুঃসহ অবিচার সমাজদেহকে তিলে তিলে নির্বীর্য করে তুলছিল, সমাজের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল এই পরাভবগুলি তারই ইঙ্গিত। বর্ণভেদ ও বাধা-নিষেধের শৃঙ্খল, সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি, আঞ্চলিক ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ, লোভ ও ক্ষমতার অপব্যবহার, ব্যক্তি ও সমাজজীবনের ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের অবহেলা প্রভৃতি অপরাধগুলি একান্তভাবে অমানবিক এবং সেইহেতু, অসামাজিক, এমনকি সমাজ-বিরোধী। এইসব অপরাধ পুঞ্জীভূত হয়ে যুগে যুগে ভারতবর্ষের সমাজদেহে যে-অবক্ষয়ের সূচনা করেছে, তাই পরিণামে সামরিক ও রাজনৈতিক পরাভবকে অনিবার্য করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের বিচারে, ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীর শত্রু কোনোদিন বাইরে থেকে আসেনি, তা সব সময়ই সমাজদেহের অভ্যন্তরে লুকিয়েছিল।

তাঁর চতুর্থ সিদ্ধান্ত, ধনমানের জন্য, প্রভুত্ব অর্জনের জন্য হানাহানি কাড়াকাড়ি বা নিছক সামরিক-রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের উপায় রূপে ঐহিক ঐশ্বর্যসমৃদ্ধি কোনোদিনই সৃষ্টিকারী পরিবেশ-রচনার সহায়ক হয় না। প্রতিযোগিতার এই হানাহানি জাতিকে ক্রমশ উগ্র হিংস্রতার দিকে টেনে নিয়ে যায়, তাকে প্রচণ্ড সংঘাতের মুখ নিয়ে দাঁড় করায়, সভ্য-নীতিকে বিপর্যস্ত করে তোলে। অন্য সব কিছুকে তুচ্ছ করে লোভের বশে, উদ্দেশ্য-সাধনের খাতিরে এই যে ঐহিক সমৃদ্ধি তা মানুষের মনুষ্যত্বকে সংকীর্ণ করে দেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এতো আসলে মানবশক্তির ক্লীবত্বসাধন। তাঁর চিরদিনের আক্ষেপ

ছিল যে, বিস্তীর্ণ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য অধিকার এবং উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক শোষণ পরিণামে ইংরেজের চরিত্র ও জাতীয় সত্তাকেই অধঃপতনের পথে ঠেলে দিয়েছে। য়ুরোপের অন্য যে সব জাতি ইতিহাসের সেই পন্থা অনুসরণ করেছে, তারা কেউ একই পরিণতির হাত থেকে অব্যাহতি পায়নি। তাঁর অন্যতম প্রধান সিদ্ধান্ত এই যে, ক্ষণস্থায়ী ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা ছেড়ে দিলে, ভারতবর্ষ 'কোনোদিনই রাজ্য নিয়ে মারামারি, বাণিজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করেনি।' ভারতবর্ষ সৈন্য ও পণ্য নিয়ে কোনো কালেই কোনো দেশকেই আলোড়িত-আতঙ্কিত করে বেড়ায়নি, 'গৌরবের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির কাহিনীকে বড়ো বড়ো অক্ষরে আপন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে অঙ্কিত করেনি। ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে, তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা।' সর্বত্র সে শান্তি ও সান্ত্বনা, ঐক্য ও সামঞ্জস্য স্থাপনের দ্বারা মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, তপস্যার দ্বারা অর্জিত এই যে গৌরব তা রাজচক্রবর্তিত্বের চেয়ে বড়ো। ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটা মৃত্যুহীন শক্তি আছে, এইখানেই রবীন্দ্রনাথ তার সন্ধান পেয়েছেন। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সকল যুগে, সকল দেশে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যই হচ্ছে সমাজের ভিত্তি; এবং তাই প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম।

স্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় ঐতিহ্যের বিচার-বিশ্লেষণ করে পঞ্চম যে-শিক্ষাটি তিনি লাভ করেছিলেন তা এই : কোন দেশই নিজেকে শুধু আপন ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ করে, ক্রোধে বা বিদ্বেষে, উচ্চ বা হীনমন্যতায় নিজেকে অন্যান্য দেশের সহযোগিতা ও সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একান্তভাবে আপন গণ্ডীর মধ্যে মহত্ত্ব অর্জন করতে পারে না। বিশ্বের মধ্যে, সকলের সংস্পর্শে ও সহযোগিতায় দেশের চিত্তের যে উদ্বোধন তাকেই তিনি বলেছেন, দেশের যথার্থ মুক্তি। তিনি তাই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, দেশ যেমন তার নিজের চিত্তভূমি কর্ষণ করে আপন অন্তরপ্রকৃতি থেকে শক্তি সঞ্চয় করে, তেমনি অন্য দেশের জীবনপদ্ধতি, আদর্শ-উদ্দেশ্য এবং কর্মপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে সেই সব উৎসমূল থেকেও প্রেরণা লাভ করে। এই কারণেই, দেশ নিজের মধ্যে যেমন বিশ্বকে উপলব্ধি করে তেমনি বিশ্বের মধ্যেও নিজের আত্মার ব্যাপ্তি খুঁজে পায়। তাঁর মতে, বিদেশের ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধি দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া যেমন হীন পরশ্রীকাতরতা, তেমনি সমগ্র মানবজাতির উত্তরাধিকারলব্ধ সম্পদ শুধুমাত্র বিদেশী দূতের মারফতে আমাদের দুয়ারে এসেছে বলে অভিমানে ও সংকোচে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে দেশের চিত্তকে উপবাসী রাখাও প্রচণ্ড নির্বুদ্ধিতা।

আমি জানি, ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির তথ্যঘনিষ্ঠ ও বিষয়নিষ্ঠ অনেক জিজ্ঞাসু ছাত্রই হয়তো রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত এবং তার আনুষঙ্গিক টীকা-ভাষ্যের সঙ্গে একমত হবেন না। কিন্তু একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, রবীন্দ্রনাথ পেশাদারী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির কোনো বিশেষ পর্ব বা বিষয় সম্বন্ধে অথবা তার সামগ্রিক ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ বিষয়মুখী গবেষণামূলক কোনো ইতিবৃত্ত রচনার চেষ্টা করেন নি। তিনি শুধু তাঁর সমসাময়িক দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিত থেকে ইতিহাসের মোটা মোটা ঘটনাগুলির উপর নজর বুলিয়ে তাঁর সৃজনধর্মী মন ও সংবেদনশীল অনুভবশক্তির সাহায্যে একথাই জানতে চেষ্টা করেছিলেন যে, কী নিয়মে কিসের প্রেরণায় ইতিহাসের পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে ভারতীয় সমাজদেহ গড়ে উঠেছে, কিসের শক্তিতে তার উন্নতি ও সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং

কিসের অভাবে সেই সমাজদেহের অবক্ষয় ও পতন ঘটেছে। ইতিহাসের এই নিগূঢ় নিয়ম অনুসন্ধানের-পিছনে তাঁর একটি গভীরতর উদ্দেশ্য ছিল। সে-উদ্দেশ্য : ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তব্যাপী সাধনা ও সিদ্ধির প্রাণধর্মটি আবিষ্কার করা; সমাজের প্রাণশক্তি কোন্ উৎস-মূল থেকে কী উপায়ে শক্তি সঞ্চয় করে গৌরবের শিখরচূড়ায় আরোহণ করেছে, এবং কোন দুর্বলতায় সেই সমাজই আবার নিত্যধর্মকে খর্ব করে বিকৃতির পথে বিশ্লিষ্ট হয়েছে তার গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন। স্পষ্টই বোঝা যায়, তাঁর উদ্দেশ্য যেমন সৃষ্টিধর্মী এবং পদ্ধতিও তেমনি নির্বাচনমূলক। স্বভাবতই তিনি ইতিহাস থেকে শুধু সেসব তথ্যই বেছে নিয়েছেন যা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপোষক বা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার চেয়েও লক্ষ্যণীয় এই যে, তিনি তাঁর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ভারতবর্ষ ও ভারত-বাসীর ইতিহাসের সেই সব বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতাগুলিকেই উল্লেখযোগ্য মনে করেছেন যেগুলি নিঃসংশয়ে মানবিক ও নীতিসম্মত, সর্বজনীন ও উদার এবং সেই হেতু প্রগতিশীল। সমাজদেহের যাকিছু জীর্ণ-সংকীর্ণ, অন্ধ-অচল, সংস্কারবিমুখ ও প্রগতির পরিপন্থী তাকেই তিনি সযত্নে পরিহার করেছেন। অর্থাৎ সমাজদেহ থেকে তিনি এমন সব বীজই বেছে নিয়েছেন যাদের উর্বরতা এখনো অক্ষুন্ন, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের সম্ভাবনা আজও বিদ্যমান। তাঁর উদ্দেশ্যকে যে আমি সৃষ্টিমূলক বলেছি তার কারণ, আসলে তিনি তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নিজের ধ্যান-কল্পনার ভারতবর্ষকেই সৃষ্টি ও নির্মাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন।

৭

ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির আধুনিক ছাত্রদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইতিহাস-দর্শন সম্বন্ধে কী কী সমালোচনা এবং কোন্ কোন্ বিরুদ্ধ-যুক্তি উত্থাপন সম্ভব?

সমালোচনার প্রথম এবং প্রধান যুক্তি, রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ সূক্ষ্ম-বিচিত্র তথ্য ও তত্ত্বকে উপেক্ষা করে ইতিহাসের একটা সম্পূর্ণ সামগ্রিক রূপ ইঙ্গিতে-সংকেতে আভাসিত করতে চেয়েছেন। ফলে, দূর থেকে তিনি শুধু অরণ্যই দেখেছেন, অরণ্যের ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষরাজির শাখাপ্রশাখার জটিল বাহুবিস্তার দেখেননি। অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন অজস্র তথ্য ও উপাদান এমন বহু বিরুদ্ধযুক্তি রয়েছে যা স্পষ্টত তার সিদ্ধান্তগুলির বিরোধী। এ-যুক্তির অকাট্যতা আমিও মানি; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এর কী জবাব দিতেন তাও আমার অজানা নয়। তিনি বলতেন, প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক পরিবেশে সমাজজীবন ও সমাজমানসের এমন একটা কেন্দ্রবিন্দু থাকে যা তার প্রাণশক্তির উৎস। এই প্রাণশক্তি সকলের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ-ঐকান্তিকতার সম্মিলিত ফল, সকলের জ্ঞান-চিন্তা ও মন-মনন থেকেই তার উৎপত্তি। সমাজদেহের অভ্যন্তরে যে সকল বিরোধী শক্তি পরস্পরকে লঙ্ঘন করে, আঘাত করে, সীমাবদ্ধ করে, পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাদের আত্মখণ্ডন সত্ত্বেও এই প্রাণশক্তি একটা অখণ্ডরূপে যুগ-জীবনের সামগ্রিকতায় প্রতিফলিত না হয়ে পারে না। ইতিহাসে তো এই গভীর সমগ্রতারই দাম, যে-সমগ্রতা শুধু অরণ্যের মধ্যেই আভাসিত, শাখাপ্রশাখার আলোড়ন-আন্দোলনে নয়, লতাগুল্মের মর্মর-গুঞ্জনেও নয়।

সমালোচনার দ্বিতীয় যুক্তি, রবীন্দ্রনাথ শ্রেণীভেদ এবং সম্পদ-সম্বন্ধের বিরোধ-বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে এই সব বিরোধ-সংঘর্ষের ভূমিকা সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন না। এই অভিযোগটি আমার মনে হয়, আংশিকভাবে সত্য। কারণ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কিছু বিরোধ, যেমন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রদের মধ্যে এবং বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত অগণিত অন্ত্যজ জন-গোষ্ঠীর স্তরে-উপস্তরে, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে, হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ এবং স্বার্থ-সংঘাতের কথা তাঁর অজানা ছিল না। এবং আপাতদৃষ্টিতে ধর্মীয় ধ্যারণার বিরোধ মনে হলেও আসলে যে শ্রেণীভেদ এবং সম্পদ-সম্বন্ধের বৈষম্য থেকেই এইসব স্বার্থসংঘাতের সূচনা, তাও তিনি জানতেন। কিন্তু ইতিহাসের কোনো পর্বেই এইসব শ্রেণী-সংঘর্ষ ও অর্থনৈতিক বিরোধ ভারতীয় সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতির নির্ণায়ক ছিল, একথা তিনি মানতেন না। ইতিহাসের কোনো যুগে ভারতবাসীর যে মূলগত চরিত্রলক্ষণ বা আদর্শগত প্রবণতা তাকে একমাত্র শ্রেণীবিরোধের যুক্তি দিয়ে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় বলেও তিনি মনে করতেন না। বস্তুত, ইতিহাসের কোনো অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রতিপাদ্য হচ্ছে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক প্রবাহ বিবর্তিত হয়েছে সমাজকে কেন্দ্র করে। এবিষয়ে তাঁর বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তন-কাহিনীকে তিনি আসলে সামাজিক প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠানগুলির বিবর্তনের ইতিবৃত্ত বলেই মনে করতেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নয় এবং ভারতবর্ষের রাষ্ট্রতন্ত্রের স্থান সমাজতন্ত্রের নিচে—এই বিশ্বাসে তিনি ভারতবর্ষের জন্য একটা সামাজিক লক্ষ্যও স্থির করেছিলেন। এইটিই সমালোচনার তৃতীয় যুক্তি। একথা অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বৃটিশ শাসন অল্পবিস্তর স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করে দেবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের জীবনধারা বহুলাংশে সমাজকেন্দ্রিকই ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জায়গায় ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ছবি এঁকেছেন তাতে মনে হয় তাঁর ধারণা ছিল, রাষ্ট্র নয়—সমাজই ভবিষ্যতেও আমাদের জীবনপ্রবাহের কেন্দ্র থাকবে। এমনকি, সচেতনভাবে তার চেষ্টা করার জন্য তিনি আমাদের উপদেশও দিয়েছেন। ইতিহাস এই একটি ক্ষেত্রে অন্তত, রবীন্দ্রনাথের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। সমাজ-সম্বন্ধের বহু শতাব্দীব্যাপী বিরোধ-বৈষম্যের অনিবার্য ফল হিসাবে, সামাজিক পদ্ধতির বিবর্তনের অমোঘ নিয়মেই যে পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল, মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতে পারেন নি। অথচ সমাজ ও রাষ্ট্রের অভেদত্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি তো সেখানে দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল। ভারতবর্ষেও যে অনুরূপ লক্ষণ দীর্ঘদিন ধরে ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, এমনকি তাঁর জন্মের পূর্বেই যে সে-আভাস একটা স্পষ্ট আকার নিয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের নজরে পড়েনি। হতে পারে, সমাজ-সম্পর্কের মধ্যে ব্যক্তির পূর্ণতাসাধনের আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর চিত্তকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে রেখেছিল বলে, এই স্থূল তথ্যটি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেনি।

কিন্তু, ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি যে পরস্পর-বিরোধী জাতি ও নরগোষ্ঠীর, ধর্ম ও দর্শনের, শ্রেণী ও বর্ণের, জীবনোপায় ও জীবনপদ্ধতির সহাবস্থান ও সংহতি সাধনের এক অবিরাম প্রচেষ্টা, রবীন্দ্রনাথের প্রধানতম এই সিদ্ধান্তটি সম্পর্কে সংশয়ের

কোনো অবকাশ নেই। লক্ষ্য ও উপায়ের বিশুদ্ধিতা বিধান যে চিরদিনই ভারতবর্ষের সাধনার সামগ্রী, বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন যে ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম, প্রেম, দয়া, ভক্তি, সহনশীলতা ও সহৃদয়তাই যে ভারতীয় মূল্যবোধের প্রধান অঙ্গ—এ-কথাও তো অস্বীকার করার উপায় নেই। আর এই সব চরিত্র-লক্ষণ এবং মানবিক মূল্যবোধই যে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইতিহাসের নিয়ামক হওয়া উচিত সেই ঐকান্তিক কামনা তো এত ক্ষয়-ক্ষতি অনৈক্য-বিচ্ছেদের মধ্যেও আমাদের চিত্তে এখনো জাগরূক।

একথা স্মরণ করার প্রয়োজন আছে যে রবীন্দ্রনাথই আমাদের যুগে ভারতবর্ষের চিরাগত ঐতিহ্যের মহত্তম প্রতিভূ। তিনিই প্রথম ইতিহাসের এই রূপরেখাটিকে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট আকারে আমাদের সামনে উপস্থিত করেন। আমাদের সমসাময়িক জাতীয় আদর্শ সেই ইতিহাসের আলোকে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা।

আধুনিক সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের হাল আমলে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক—সব ক্ষেত্রেই নতুনভাবে পথ সন্ধানের একরকম আগ্রহ যে দেখা যাচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। একথা ঠিক যে, বাংলা সাহিত্যে গত প্রায় শ-দেড়েক বছরের মধ্যে বড়ো বড়ো উদ্ভাবনী প্রতিভার দেখা পাওয়া গেছে অনেকবার। উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভাষা-পরিমার্জনের যে ব্যাপক সূচনা দেখা দিয়েছিল, শেষ পঞ্চাশ-বছরের উজ্জ্বল সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে তা ছিল অত্যাবশ্যক প্রাক্-কর্তব্য। কিন্তু কেবল ভাষার চিন্তা,—অর্থাৎ অন্যলক্ষ্যনিরপেক্ষ অবিমিশ্র ভাষার চর্চা বা ভঙ্গির খেলা যে-কোনো যুগেই সুস্থ সাহিত্য-কর্মের লক্ষণ বলে ভাবতে বাধে।

রামমোহনের আমলে আমাদের ভাবজগতে যে প্রবল রাজসিকতা দেখা দেয়, পারিপার্শ্বিক নানা ভাবনার ঢেউয়ে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ঘাতপ্রতিঘাতে, সেই প্রথম উদ্দীপনার পর্ব থেকে আমরা সেই কর্মনিষ্ঠা এবং উদ্দীপনার ওপর নির্ভর রেখেই শতাব্দী পার হয়ে এসেছি। সেকালে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাকুলতা ছিল,—ধর্ম ও সমাজঘটিত অনেক সংস্কারের তাগিদ ছিল,—শিক্ষা-সংস্কারের আগ্রহও তুচ্ছ ছিল না। সেই সঙ্গে মনের বিনোদন-পিপাসাও সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকারে, রূপে এবং লীলায় আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে, বঙ্কিম-মধুসূদন-গিরিশচন্দ্র বা রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-অমৃতলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদ ইত্যাদি অনেক লেখকের অনেক রকম রচনায় নানা ভঙ্গি এবং বিবিধ বক্তব্যও দেখা দিয়েছে।

লেখকমনের এই ব্যাপক এবং বহুধা জাগৃতি একালে অনুপস্থিত। আজকাল সমাজ যেন ক্রমেই ভেঙে পড়ছে, পুরোনো বিশ্বাসগুলি অনেকটা নিস্তেজ হয়ে গেছে, কোনো-কোনোটা এখন প্রায় নিশ্চিহ্নও বটে। আমাদের শতকের প্রথম পঞ্চাশ-বছরের মধ্যেই দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে,—এবং তার আগেই শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই লোকান্তরিত; চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি পেঁছে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধও পরিসমাপ্ত!

সেই প্রথম শতকার্ধ-সীমায় এসে নতুন সাহিত্য-সম্ভাবনার যৎসামান্য চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল বটে, কিন্তু ১৯৫০ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত—অন্তত এই চোদ্দ-বছরের মধ্যে সত্যিই গভীরভাবে নাড়া দিতে পারে, এমন কোনো সুখ-দুঃখের ঢেউ আমাদের হাল-আমলের নতুন সাহিত্যে ব্যক্ত হয়েছে কি না, সেটা বিতর্কের বিষয়।

কিন্তু বিতর্কের ঝাঁজ থাক্—সেটা উত্তেজনার জিনিস। শুধু সেই অর্থেই এখানে বিতর্কের কথা নয়;—লেখক এবং পাঠক দু'পক্ষেরই আত্মচিন্তার দাবি মনে আসে। এবং সেই সূত্রেই আমাদের উনিশ-শতকের কথা এসে পড়ে।

বড়ো লেখক ঘন ঘন আসেন না, ঠিকই। কিন্তু ব্যাপক উৎসাহ ব্যতিরেকে মননের ক্ষেত্রে কোনো বড়ো ঘটনাও ঘটে না। উনিশ-শতকে আমাদের সাহিত্যের ধারায় প্রায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত,—এবং গত-শতকের বেড়া ডিঙিয়ে এপারে এসেও প্রথম পঞ্চাশ বছরের প্রায় সবটাই নিরন্তর নানা উৎসাহের ধাক্কা ছিল। তারপর, সত্যিই কেমন যেন লক্ষ্যহীনতার ব্যাপক ছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

'লক্ষ্যহীনতা' শব্দটা এখানে লেখকদের উদ্দেশ্যে কোনো অনুযোগ নয়, বরং পাঠকেরই

অদৃষ্টের স্বীকৃতি। যাঁরা কল্লোল-পর্বের,—বা কল্লোলের অনেকটা কাছাকাছি ছিলেন যাঁরা, তাঁদেরই গল্প-উপন্যাস এখনো গল্প-উপন্যাসের বাজারে চাহিদার সামগ্রী। শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষ, শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবী ইত্যাদি লেখক-লেখিকারা এ-দলে পড়েন না, কিন্তু এঁরাও পাঠকের প্রিয়। এঁদের কারও সম্বন্ধেই কোনো অনাদরের কথা উঠছে না এখানে, শুধু এই ধারণাটুকু জানাতে ইচ্ছে করে যে, ইতিমধ্যে আমাদের মনের হাওয়া এবং জীবনের গতি যে সত্যিই অনেকটা বদ্‌লে গেছে এবং প্রতিদিনই বদ্‌লে যাচ্ছে, সে-সব কাহিনীর সাহিত্যিক চেহারাটা এখনো আমাদের লেখকদের পরীক্ষাধীন। এই পরীক্ষায় যাঁরা ব্যাপৃত আছেন, তাঁদের জীবনবোধে যদি যথার্থ উদ্দীপনার তাগিদ না থাকে, তাহলে কেবল পরীক্ষাই হবে এবং পরীক্ষাই চল্‌তে থাকবে। এই সমকালীন পরীক্ষার দিনে ভাঙনের বাড়াবাড়ি ঘটাই প্রত্যাশিত। এই বাড়াবাড়ির ভাবটা লক্ষ্যহীনতার কারণ হতে পারে।

বোধ হয়, সৃষ্টির কাজে বিষাদ এবং শুভ-আস্তিক্যবিশ্বাস, দুয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা মানা দরকার। যে বিষাদ শুধুই বিকারের ছবি আঁকে, তাকে বিশ্বাস নেই। সেও ভাবালুতা।

আমাদের হাল-আমলের কবিতা এবং নাটকের আলোচনা যে-পরিমাণে হচ্ছে, গল্প-উপন্যাসের ভঙ্গি বা বক্তব্য বা লেখকদের মনোভূমি সম্পর্কে ঠিক সে-রকম ব্যাপক আলোচনা নেই। সাহিত্যিক প্রবন্ধ বিরল। ইস্কুল-কলেজের পাঠক্রমানুমোদিত সাহিত্যের বইগুলি নিয়েই বাংলায় এখন প্রবন্ধচর্চা চলছে বললে খুব অন্যায় হয় না। বাংলা সাহিত্যের যে-অঞ্চলটি সৃষ্টিকর্মের দিক থেকে সত্যিই আধুনিক, সে-অঞ্চলের আলোচনায় প্রবীণ রসিকের দল যদি না অগ্রসর হন, তাহলে সত্যিকার সৃজনধর্মী সত্যার্থী লেখকরা হয় ভঙ্গিমাত্র-মনোযোগী সমসাময়িকদের অপরিণত বিচারবুদ্ধির অনুমোদন পেয়ে যোগ্যতর সমাদরে বঞ্চিত থাকবেন, না-হয় অনতিবিলম্বে এই সাম্প্রতিক উদ্দীপনাহীনতাই তাঁদের গ্রাস করবে।

একথা অনেকেই বলে থাকেন যে, আমরা এখন ইতিহাসের অদ্ভুত এক পরিবর্তন-যুগে বাস করছি। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতন গল্প-উপন্যাসের ধারাতেও সেই হাওয়া বইছে। লেখকরা নতুনত্ব খুঁজছেন। 'ছোটগল্প: নূতন রীতি' নামে যে পুস্তিকা-পর্যায় বেরিয়েছে ইতিমধ্যে, তাতে প্রথম গল্পটির লেখক ছিলেন শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। সে-গল্পের নায়ক পরিমল সম্বন্ধে গল্প-পরিচিতি অংশে প্রকাশক-সম্পাদকের পক্ষে বলা হয়েছিল—'বস্তুত পরিমল আধুনিক মানুষেরই প্রতিচ্ছবি—যে মানুষ কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী গুপ্ত বাসনা ও নৈতিক মূল্যবোধের অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত।' এই পরিমলের ছবি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে লেখক তাঁর এই 'দুঃস্বপ্ন' গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদেই ডিমের ছবি তুলে ধরেন—'ডিমের ছবি মনে পড়িয়ে দেয়। হাঁসের ডিমের গায়ে বিকেলের হলুদ-রঙ লেগেছে। ঠিক হলুদ না, একটু লালের ছিটা আছে। না, তাও হল না। উপমাটা মনঃপূত না হওয়াতে সে মনে মনে বিরক্ত হল, চোখ ফিরিয়ে নিল, দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ভাবতে আরম্ভ করল, বস্তুত এখন কিসের সঙ্গে ওই মুখ, আর মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়া স্টোভের সাদাটে লাল গরম আলোর তুলনা চলে।'

এইভাবে উপমা ভাবতে-ভাবতে গল্প-প্রবাহে এগিয়ে যাওয়া, কিংবা লেখকমনের তদবস্থার অন্য কোনো ভাবনা এনে ফেলা এঁদের এই নতুন রীতির দ্রষ্টব্য জটিলতার

লক্ষণ। এ রীতি যে কতকটা জটিল এবং অনেক জায়গাতেই গল্পের প্রত্যাশা উপেক্ষা করে কবিতার মর্জি ছুঁয়ে যাবার দিকে ব্যগ্র, সে-অভিজ্ঞতা যথার্থ। চেতনাস্রোতের ভাষারূপ ফুটিয়ে তোলবার খেয়াল,—সেইসঙ্গে প্রবৃত্তি, পারিপার্শ্বিক শাসন, মনের ঘাত-প্রতিঘাত ইত্যাদি সবকিছুই দেখানো বা দেখাবার চেষ্টা আমাদের সাম্প্রতিক এই গল্প-ভঙ্গির মধ্যে গণ্য। এই ভঙ্গির কয়েকটি উদাহরণ দেখা গেল তাঁর "শ্বাপদ শয়তান ও রুপালী মাছেরা"* নামে গল্প-সংগ্রহে।

সব পাঠকের সাহিত্যবোধ সমান নয়। যাঁরা গল্প পড়তে বসে আদি-মধ্য-অন্ত বিভাগে ঘটনাগতির পূর্ণতা বা চরিত্রের সম্যক উম্ঘাটন চান,—সেই সঙ্গে মানব-জীবনের বহু যন্ত্রণা মেনে নিয়েও জীবন সম্বন্ধে শুভ-আস্তিক্যবিশ্বাস, সৌন্দর্যবিশ্বাস ইত্যাদি অস্বীকার করতে নারাজ, তাঁদের কাছে এ-পরীক্ষা কী রকম মনে হবে, সেটা তাঁদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত বিবেচনার বিষয়। কিন্তু মানুষের জগতে শ্বাপদ, শয়তান ইত্যাদির অস্তিত্ব আমাদের আধুনিক গল্প-সাহিত্যের লেখকদের মনে যে খুবই যন্ত্রণা দিচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। এ এক বিষাদ এবং অবসাদের বেলা। এ বড়োই জটিলতার খেলা। এতে ঠিক অসংলগ্নতা নয়,—কেমন যেন অচেনার ভাব জাগিয়ে রাখবার সংকল্প প্রকাশিত হচ্ছে এবং তারই মধ্যে মাঝে মাঝে সুন্দর সাদৃশ্যের উদাহরণ আছে। পড়তে পড়তে মনে হয় যেন একজন মন-মরা কবি তীব্র কোনো অবিশ্বাসের কথা লিখতে বসেছেন,—কিন্তু সব কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরতে তাঁর সত্যিই তেমন উৎসাহ নেই। শুধু স্পষ্ট ঘোষণার অভাব বলেই যে পাঠকের এই দ্বিধাবোধ, তা নয়। সবাই জানেন, ঘোষণা ব্যাপারটাই প্রচারসচেষ্ট। শিল্পের লক্ষ্য সার্থক ব্যঞ্জনার দিকে। আর, সেজন্যই বিষয়বস্তুরও বিশিষ্টতা থাকা চাই। অর্থাৎ, বাইরে থেকে দেখলে যে-কোনো ঘটনাই ঘটনা মাত্র। লেখকমনের সূক্ষ্ম এবং গভীর বোধে এক-একটি ঘটনার চেহারা এক-এক রকম,—এবং প্রত্যেকটিই বিশিষ্ট। কিন্তু এ বিশিষ্টতার প্রমাণ তো অন্য কোথাও নয় এবং কিছুতেই নয়,—প্রমাণ কেবল রচনায়।

'শ্বাপদ' গল্পটি একটি বালকের আত্মকথার মধ্য দিয়ে অন্য একটি বালকের পরিচয় এবং বাল্যাবস্থায় বা বয়ঃসন্ধিকালে স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণের বৃত্তান্ত। এ-কথা খুবই সোজাসুজি বলা গেল। কিন্তু শিল্পকর্ম ঠিক এরকম সোজাসুজি ব্যাপার নয়। তাতে ছায়া, মায়া, ইশারা রাখতে হয়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাতে কার্পণ্য করেন নি।

ঝকমকে নাগরিকতার সঙ্গে প্রবৃত্তির আদিম আকর্ষণের নাটক এই 'শ্বাপদ'। এতে কবিত্ব আছে, সুন্দর সুন্দর বর্ণনা আছে;—নর-নারীর আকর্ষণের আদিরস আছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এ আমাদের আধুনিক সুখ-দুঃখের চিরস্মরণীয় কোনো সত্যিকার আধুনিক ঢেউ নয়। এ যেন প্রবৃত্তিবাদের রূপকথা। বলা বাহুল্য, এ নামটাও নিন্দার নয়,—তৃপ্তির, —এবং অতৃপ্তিরও।

হরপ্রসাদ মিত্র

---

* শ্বাপদ শয়তান ও রুপালী মাছেরা—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। ফসল প্রকাশনী। মূল্য ২·৫০।

সমালোচনা

More Roman Tales. *By* Alberto Moravia. Selected and Translated by Angus Davidson. Secker & Warburg. London. 18*s.*

'জীবন কী বিচিত্র'—একথা বলে বলে গল্পকারের কোনোদিন ক্লান্তি নেই। অন্ততঃ মোরাভিয়ার নয়। বর্তমান গল্পসংগ্রহ, এর পূর্বতন সংগ্রহের মতোই রোমের শ্রমিক-সমাজকে আশ্রয় করে। নায়কনায়িকারা হয় কাগজের ফিরিওয়ালা নয় চাকরাণী, ট্যাক্সি-ড্রাইভার, অথবা ভিখিরি, কিম্বা মোটরমিস্ত্রি, দোকানের কর্মচারী। যুদ্ধোত্তর ইতালীর প্রথম যুগে এদের মধ্যে যে অভাবের তাড়না ছিল তা এখন আর প্রায় নেই। গত কয়েক বৎসরে ইতালী ইয়োরোপের বড়লোকসমাজে ঠাঁই পেয়েছে। অর্থনীতি ফুলে ফেঁপে উঠেছে। সঙ্গে শ্রমিকসমাজের সমস্যাও অন্যরূপ নিয়েছে, কেবল খাওয়া পরার জোগাড় নিয়ে কেউ আর ব্যতিব্যস্ত নয়। এলিয়টের what shall I do now, what shall I do যেন প্রত্যেকেরই মুখে মুখে। এদের জীবনে নরনারীর প্রেম সর্বপ্রধান বস্তু। আর যাই করুক বা না করুক, সবাই প্রেম করে। প্রেম যেন এক বিরাট কিম্বদন্তী, অথবা মুদ্রাদোষও বলা যেতে পারে। ঘরে বাইরে আহারে বিহারে প্রেম যেন জীবনপাত্র উছলে পরছে অহরহ। রেস্তোরাঁয়, নাচঘরে, সস্তা সিনেমায় আর চটকদার বই-এর মলাটে মলাটে প্রেমের পসরা। অথচ সত্যকার প্রেম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। শুধু দু'একটি গল্পে তার কিছু ইসারা আছে, তাও নানা বিকৃতির মধ্যে গুপ্তপ্রায়। ক্যাথলিক দেশ হলে কী হবে, ধর্ম নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই এই সমাজে। দেশের বাইরে, এমন কি রোমের বাইরে কেউ কখনো পা দেয় নি। অভ্যাস, সংস্কার ও স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণ চৌহদ্দির মধ্যে আত্মচেতনা-হীন, বৃহত্তর বোধ বর্জিত, পারিপার্শ্বিকের দ্বারা শৃঙ্খলিত প্রত্যেকটি চরিত্র যেন তার এক অমোঘ, নির্ধারিত পথে সরল বিশ্বাসে, বিনা চিন্তায় ভিড়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছে। অথচ তারি মধ্যে সর্বদাই অস্থির। কীসের এক তাড়নায় হঠাৎ চলে যায় সমুদ্রতীরে, আর দুই নায়িকার ফেরে পড়ে হাবুডুবু। সাম্নের গাড়ীকে পেরোতেই হবে, পেরোতে গিয়ে হাসপাতালে হাত পা ভেঙে পড়ে থাকা; যে মেয়ের সঙ্গে নাচতে ভালো লাগে তার সঙ্গে প্রেম করতে ভালো লাগে না—এ সমস্যার সমাধান কী? কেউ ঠকায়, কেউ ঠকে; কেউ খুন করে, কেউ বা খুন হয়। কিন্তু সব পরিণতিই যেন আসলে এক, বিশেষ ইতরবিশেষ নেই। কেউ মরে গেল বা বাঁচল, কেউ প্রার্থিতা পেলে বা না পেয়ে অন্য কাউকে আঁকড়ে ধরলে তখনকার মতো, কিছুতেই কিছু আসে যায় না।

প্রায় প্রতিটি গল্পেই মোরাভিয়া 'আমি'-র আশ্রয় নিয়েছেন। হয়ত এতে চরিত্রের মনের ভিতর পথসন্ধান করে নিতে সাহায্য হয় লেখকের। অবশ্য 'আমি' সর্বত্রই পুরুষ। যেহেতু মেয়েদের মধ্যেই খাঁটি ভালোবাসার কিছু অবশিষ্টাংশ দেখা যায় সেহেতু এই পুরুষ দর্শকের ভূমিকায় লেখক অবতীর্ণ। একঘেয়েমি ছাড়াও এই 'আমি'-র মধ্যে একটা আড়ষ্টতা এবং বিরক্তিকর শঠতা আছে। প্রায় প্রতিটি গল্পই অবসর সময়কে ঘিরে। এই অবসর

কীভাবে ব্যয়িত হয়, তার মধ্য দিয়ে চরিত্রের স্বরূপ কীভাবে দেখা দেয় বা চরিত্রের অন্তর্নিহিত সমস্যা ধরা পড়ে এতেই মোরাভিয়ার কৌতূহল। 'শিল্পী' গল্পে নায়ক ('আমি') চিড়িয়াখানার ভক্ত। সুযোগ পেলেই সেখানে গিয়ে জানোয়ারদের দেখে সময় কাটায়। একটি নতুন মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে, তাকে যে সেখানেই নিমন্ত্রণ করবে তাতে আর আশ্চর্য কী। গ্লোরিয়া কিন্তু জানোয়ারের মর্ম বোঝে না, চেষ্টা করেও নায়কের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারে না। হাতীর চামড়া দেখে তার গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে। যা ঘটে তাতেই বিপত্তি। শেষে শিম্পাঞ্জি বোধ হয় তার চিড়িয়াখানার প্রতি অভক্তি টের পেয়েই একতাল কাদা ছুঁড়ে মারে। জামা-কাপড় নষ্ট, সারা সন্ধ্যেটা মাটি। রেগে মেগে মেয়েটি চলে যায়। 'শপথ' গল্পের নায়িকা নায়কের অসুখে মুহ্যমান হয়ে মানত করে আর কখনো সমুদ্রস্নানে যাবে না যেহেতু সমুদ্র তার প্রিয়। কিন্তু নায়ককে জানায় না, বরঞ্চ তাকে বাধ্য করে অন্য একজনকে নিয়ে যেতে। অন্য নারীসহ নায়ক সেখানে গিয়ে দেখে নায়িকা অপেক্ষমাণ। মেয়েদের চুলোচুলি সব লেখকেরই কৌতুকের খোরাক যোগায়, তবে এক্ষেত্রে একজন বিতাড়িত হবার পর দেখা গেল এই ঘটনার ফলে মেয়ে পুরুষের চেতনার কী এক শুদ্ধি ঘটেছে, যার ফলে দুজনের মধ্যে ভালোবাসা নতুন করে ফিরে এল, দেখা গেল আসলে দোষেগুণে মিলে এই দুই মানুষ পরস্পরের টান ছাড়িয়ে যেতে পারে না। তাদের তৃষ্ণা এবং বিতৃষ্ণার বিসম্বাদের মধ্যে কোথায় একটা স্থিতি আছে। প্রেম এবং হিংসা অনেক গল্পেই বৈপরীত্য থেকে একাত্মতায় গিয়ে পেঁছয়। সব গল্পগুলি এতটা উৎরোয়নি। প্রতি গল্পেই ঘটনা ও ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্য আছে।

কিন্তু বই শেষ করে উঠ্‌লে মনে হয় যেন যে চরিত্রগুলি বিভিন্ন ছিল সেগুলি যেন আবার এক মূর্তি ধারণ করছে। প্রাচীন রোম শহরের বিরাট রাস্তা আর সরু অলিগলি বেয়ে একই ধরনের পোষাকে একইভাবে চুল ফিরিয়ে, একই ধরনের পোষাকে, একই ছাঁদে হেঁটে অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভালো করে চেনা না থাকলে তাদের একই লোক বলে ভুল হতে পারে, যেন সারি সারি আয়নায় প্রতিফলিত। পড়তে পড়তে মনে হয় যাদের একই বলে মনে হয়েছিল আসলে তারা কী আশ্চর্য আলাদা। পড়া শেষ হলে মনে হয়, প্রথম ধারণাটাই ঠিক। বৈচিত্র্যটা সাজানো। গোছালো লেখক রোজ সকালে হাতমুখ ধুয়ে নিয়ম করে দু'ঘণ্টা লিখে কিছু বৈচিত্র্য সাজিয়েছেন। ঘটনা ও চরিত্রের সংস্থাপন প্রায় জ্যামিতিক। প্রত্যেকটি চরিত্র পটভূমি থেকে স্পষ্ট চেহারা নিয়ে বেরোচ্ছে। মনস্তত্ত্বের শেষ নেই। কিন্তু ব্যক্তিচরিত্রের প্রতি লেখকের যে নিবিড় মমতাবোধের ফলে লেখকের পর্যবেক্ষণ আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়, রসে জারিত হয়, তা অনুপস্থিত। গল্পের মজবুত কাঠামো, বর্ণনার স্পষ্টতা, ধৈর্যশীল পর্যবেক্ষণ, চরিত্রচিত্রণ, কিছুতেই মন সাড়া দেয় না। চরিত্রের প্রতি নিবিড় মমতা বিদ্যা নাইপলেরও নেই, কিন্তু "হাউস ফর মিস্টার বিশ্বাস"-এ একটা জোরালো তিক্ততার স্বাদ অন্ততঃ আছে যার মধ্য দিয়ে লেখকের একটি নিজস্ব তীব্র বোধ আমাদের মনে এসে পেঁছয়। মোরাভিয়ার বেলা রোমক চরিত্রদের মতোই আমরা তাঁর নায়কনায়িকাদের দেখি কেমন নিস্পৃহভাবে, যেন আমরা তাদের অনাত্মীয় অথচ শত্রুও নই, তাদের প্রতি আমাদের রাগও নেই ভালোবাসাও নেই, তাদের বৈচিত্র্যের উনিশ-বিশে আমাদের কিছু আসে যায় না। আমরা শুধু পথের ধারদিয়ে যেতে যেতে থেমে দেখি তাদের ছলাকলা, তাদের নাট্যকারেরও বটে। এ হেন উত্তাপহীন বৈচিত্র্যদর্শনে বিরক্তি আসে থেকে থেকে। "আগস্টিনো" বা "ডিসোবিডিয়েন্স" তরুণ মনের একটি নিভৃতরূপ দেখা গিয়েছিল।

মোরাভিয়ার প্রথম দিকের রচনার সেই সুকুমার ভাবটি কেটে গেছে। "ওমান্ অভ রোম"-এর থেকে এই বাহ্যতার এবং অন্তর্নিহিত শুষ্কতার আরম্ভ, এখনো তার শেষ দেখা যায় নি।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

সমর্পিত শৈশবে—অরুণ ভট্টাচার্য। সাহিত্য। কলিকাতা ২০। মূল্য তিন টাকা।

বর্তমান কালে কবিতা রচনা করে যাঁরা সুনাম অর্জন করেছেন, অরুণ ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে একজন। সুনাম অর্জন করা যায় দুই বা ততোধিক উপায়ে। এর মাত্র দু'টি উপায়ের কথা বলা যাক—প্রথমতঃ, ভালো লিখে; দ্বিতীয়তঃ, ভালোমত যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। ভালো মন্দ মাঝারি ইত্যাদি সর্বস্তরের কবি সাহিত্যিকের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলার ফলেও নাম হয়। এ রকম নাম-করাকে অনেকে বলেন—অক্লেশে নাম-করা। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ব্যাপারটা ঠিক এর বিপরীত। কেননা, ক্লেশ এতে অনেক; অতগুলি মানুষের মনোরঞ্জন করা সহজসাধ্য কাজ নয়। এই ভাবে মানুষের মন রক্ষা করা হয় বটে, কিন্তু এতে নিজের মান রক্ষা হয় না। কেননা, রচনা-কাজটির দিকে তেমন মনোযোগ দেবার সময়ই ওতে পাওয়া যায় না, সমস্ত সময়টাই খরচ হয়ে যায় পথে প্রান্তরে।

কবির কাজ আলাদা। মাঠে-ময়দানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে অবশ্যই হবে, বেড়ানোও উচিত; কিন্তু রচনা-কাজটির সময়ে তাঁকে হতে হবে একা। নিজেকে নিঃসঙ্গ করে নিতে হবে, নিজের মনকে নিজের প্রকোষ্ঠের মধ্যে আবন্ধ করে নিতে হবে। তবেই কবি নিজের দেখা যেমন পাবেন, নিজের রচনার সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ তেমনি হবে।

প্রসঙ্গত, একটা কথা মনে পড়ল, সে কথাটা হচ্ছে—কবিতা-আন্দোলন। কবিতা-রচনার কাজটা যখন কবির একার, তখন এই কবিতা-ব্যাপারটি নিয়ে আন্দোলন বুঝি সম্ভব নয়। কবিতা রচনা করে কবি আলোড়ন তুলতে অবশ্য পারেন।

কিন্তু আলোড়ন এ কালে কেউ তুললেন না। ইচ্ছে করে তুললেন না—এমন কথা অবশ্য বলছি নে। ওটা সাধ-ইচ্ছের দ্বারা হয় না, ওটা হয় সাধ্য দিয়ে।

আমাদের দুঃখ এই, এমন সাধ্য আছে তেমন কবির দেখা এ যুগে আমরা পাই নি। তা যে পাই নি তার জন্যে হতাশ হবারও কথা নয়; তেমন কবির জন্ম হয় শতাব্দীতে হয়তো একটা, কিংবা হয়তো তার চেয়েও কম। কিন্তু তেমন কবি এল না বলে কবিতা-রচনা বন্ধ হয়ে যেতে পারে না, কোনো কালেই তা হয় নি। অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের মত কবিতাও তার ধারা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলবেই।

এ কালে তাই চলছে। পথের ধারে দাঁড়িয়ে আমরা সেই কালের যাত্রার ধ্বনি শুনছি। সে ধ্বনি কখনো আমাদের মর্মে গিয়ে আঘাত করে, কখনো-বা মনের সমস্ত বর্ম ভেদ করে হৃদয়েও আঘাত করে, অথবা করে না। তবু আমরা কান পেতে শুনি সেই ধ্বনি—

> কয়েকটা পাগল মিলে ভাবছিল কবিতা লিখবে।
> ভাবলেই লেখা যায় এমন ভাবনা নিয়ে তারা
> গোল গোল অক্ষরে অবশেষে লোলচর্ম এক বৃদ্ধের
> ছবি আঁকলে। লিখলে নীচে কবিতার চমৎকার ভাষা। পৃ ১৬

এই প্রসঙ্গে স্বগত একটা কথা বলা যাক—যাঁরা কবিতা লেখেন, সহজ ও সুস্থ ও স্বাবলীল মানুষেরা তাঁদের তো পাগল বলেই মনে করেন। কোনো ব্যাপার নিয়ে পাগল হতে না পারলে কি সে কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়? সুতরাং মনে হচ্ছে, অরুণ ভট্টাচার্য যে কয়টি পাগলের কথা বলেছেন তাঁরা কবি ছাড়া অন্য কেউ নয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা জিজ্ঞাস্য আছে—ছত্রগুলির ছন্দ ঠিক আছে তো? কানে একটু বেসুরো লাগল বলেই এ কথা জিজ্ঞাসা করছি।

অথচ, অন্যত্র ছন্দের কারুকার্য দেখিয়েছেন কবি—

গৃহস্থ ঘরের সামনে বৃষ্টি নামল অজস্র ধারায়
বারান্দায় সিঁড়িতে দূরে রেলিঙের কমলা শাড়ীতে
যেন সে যৌবনবতী রমণীর স্নিগ্ধ উপমায়
মিলিত প্রচ্ছন্ন ছবি।

—পরাজিত প্রতিবিম্বটিরে, পৃ ৫০

অরুণ ভট্টাচার্য হৃদয়বান কবি। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে উদ্ভট আঙ্গিকের শরণাপন্ন তিনি হন নি। কবিতা তিনি শৌখিন হিসেবে গ্রহণ না করে জীবনের অঙ্গ হিসেবেই যে গ্রহণ করেছেন তার প্রমাণ হচ্ছে তাঁর নিষ্ঠা। তিনি জানিয়েছেন যে, এই গ্রন্থে '১৩৬৪ থেকে ১৩৭০ এই দীর্ঘ সাত বছরে রচিত' কবিতা সংকলিত হয়েছে। মোট ৭১টি কবিতা আছে বইটিতে। এ বই তাঁর এই সাত বছরে লিখিত কবিতার যেন চতুরঙ্গ, চার ভাগে তিনি কবিতাগুলি ভাগ করেছেন—প্রেম নৈঃসঙ্গ ছবি, দরজার ওপারে, যৌবন-তরঙ্গ বয় ও আনন্দিত।

ইতিপূর্বে তাঁর কাব্যগ্রন্থ "মিলিত সংসার" আমরা পড়েছি; কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠ করে মনে হল অরুণ ভট্টাচার্য ইতিমধ্যে জীবনের সঙ্গে আরও যেন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে পেরেছেন, জীবনে আরও অভিজ্ঞতা যেন জমে উঠেছে। এ সবের প্রকাশ আছে—'সাম্প্রতিক' (পৃ ১২), 'নিরুক্ত' (পৃ ২৭), 'কথামালার কয়েকটি চরিত্র অনুসরণে' (পৃ ৪০-৪৩) প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতাতে।

কয়েকটি বানান ভুল থেকে যাওয়ায় বইটির মর্যাদা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এবং, 'ভাংগলো' (পৃ ৩৮), 'গংগা' (পৃ ৫৫) প্রভৃতি বানান কি কবি ইচ্ছে করে লিখেছেন?

সুশীল রায়

সপ্তক—সমকালীন সাহিত্য সংকলন। সপ্তক প্রকাশনী। ঢাকা। মূল্য দুই টাকা।

চেষ্টা করে আর যা কিছুই হোক, মাতৃভাষার হেরফের সম্ভব নয়। মাতৃভাষা আরক্ষার জন্য কিছু বঙ্গভাষাভাষীকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাণবলি দিতে হল, এটাই আক্ষেপের। রাজনীতি বা ধর্মনীতির ঊর্ধ্বে যদি কোন দিন ভাষানীতি স্থান পায়!

ঐতিহ্যে সংলগ্ন হয়ে থাকা নিশ্চয়ই কাম্য বিশেষ ক'রে যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথের মত সম্পদ আছে। অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতা বা সন্নিহিত এলাকার কথ্যভাষা যদি প্রমথ চৌধুরীর পৌরোহিত্যে সাহিত্যের চণ্ডীমণ্ডপে স্থান পেয়ে থাকে তবে বিভক্ত বাংলার

পূর্বভাগেও কেন আজ নতুন সাহিত্যসেব্য ভাষার জন্ম হবে না? নতুন ভাষারীতির প্রজন্মে চৌধুরীর মত লোকের যদি বা অসম্ভাব হয়ে থাকে লোকসাহিত্যের কাছে দীক্ষা নিতেই বা এ যুগে সংকোচ কেন? ভাটিয়ালী-সারিজারির ভাষা নিতান্তই স্থানীয় নয়। মৈমনসিংহগীতিকার আবেদন তো জেলার বেড়ায় আট্‌কে নেই।

সতেরো বছরে অবশ্য কতই বা আশা করা যায়। মাতৃভাষা অপহরণের আশঙ্কায় যদি সাহিত্যিককে বিনিদ্র থাকতে হয়, নতুন সৃষ্টির সমাচার সে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সুলভ নয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ জন্মালে লণ্ঠন হাতে খুঁজতে যেতে হবে না, শরৎচন্দ্র-নজরুল জন্মালে এ পারেও শাঁখের আওয়াজ শোনা যেত। কিন্তু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারাশঙ্কর? আবুল ফজলের "রাঙ্গা প্রভাত" সাহিত্যিক মানদণ্ডে কোন্ পর্যায়ের? এ দেশের বাংলা ভাষাভাষীরা এ বিষয়ে কি অন্যমনস্ক?

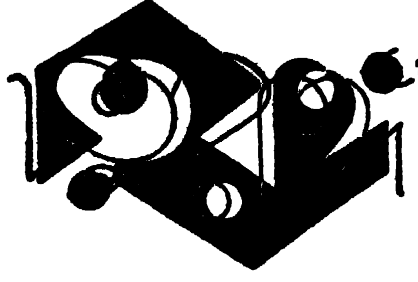
আলোচ্য ক্ষীণকায় সংকলনটি আমাদের সাহিত্যিক কৌতূহল চরিতার্থ করতে সক্ষম নয়—এক বিশেষ গোষ্ঠির সাহিত্যসৃজনের স্বাক্ষরমাত্র। আর গোটা ছয়েক ছোট গল্পে (যতই না কেন প্রতিনিধিত্বমূলক হোক) সমাজমানসের অভ্যন্তরে কতটুকু উঁকি দিয়ে দেখবার সুযোগ আছে। তবু অধিকাংশ রচনাই সরল ও আন্তরিক—দৃষ্টি আকর্ষণের অর্বাচীন চেষ্টা যে একেবারে নেই তা নয়।

প্রথম গল্প দেবব্রত চৌধুরীর 'অন্বেষণ'। প্রৌঢ়ত্বের উপান্তে পৌঁছে চিরঞ্জীব তালুকদার অস্থির হয়ে উঠেছে স্মৃতির দংশন থেকে অব্যাহতি পেতে। অতীত অনাবশ্যক, বর্তমানেও আস্থা নেই তাই স্মৃতিবিজড়িত ভিটের খড়ের চালে আগুন জ্বালিয়ে সে অনাগত আর্তিতে ছুটে যায় ভবিষ্যতের দিকে।

দ্বিতীয় গল্প শওকৎ আলীর 'তৃতীয় রাত্রি' বীভৎসতার পঙ্কপরিবেশে প্রেমের শতদল ফোটাবার সার্থক প্রয়াস। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিক্ষাজীবীদের নিয়ে লেখা গল্প মনে পড়বে। এ গল্পের নায়ক অবশ্য সার্কাসের পাকা খেলোয়াড় ওস্তাদ সাজাহান চৌধুরী। নায়িকা কাননবালা মহিলা-উপগুপ্ত না হয়েও দেহাতীত প্রেমের সন্ধান পেয়েছে মারীগুটিকায় জর্জর রুগ্ন সাজাহানের মধ্যে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা দুটি গল্প সেবব্রত চৌধুরীর 'কৃষ্ণপক্ষ' আর হায়াৎ মামুদের 'অবিনাশের মৃত্যু'। 'এখন কৃষ্ণপক্ষ দাদু, চাঁদ দেখা যাবে না'—'পাখীরা সব ঘর ছেড়ে পালিয়েছে, কাল রাতে ওদের চীৎকার আর ডাকাডাকি শুনেছি'—প্রতীকী ব্যঞ্জনায় কবিতার মত ম্লান ও মেদুর। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্প মনে হবে 'অবিনাশের মৃত্যু'। দাঙ্গার ভীতিমন্থর পরিবেশে মনে হবে কে যেন, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—সে কান্না সান্ত্বনা আকর্ষণ করে না সমগ্র প্রতিবেশকেই শোকাকুল করে তোলে, কিম্বা কোন সর্বস্বান্ত পথিকের বুকফাটা আর্তনাদ, যে পথিক সত্যি সব খুইয়েছে—মনুষ্যত্ব, সভ্যতা, প্রেম—সব।

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

ত্রৈমাসিক পত্রিকা  কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭১

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ষড়বিংশতিতম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা



কার্তিক-পৌষ ১৩৭১

মালবজাতির দেশ

দীনেশচন্দ্র সরকার

গাঙ্গেয় উপত্যকার দক্ষিণে, বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে, বুন্দেলখণ্ডের পশ্চিমে এবং আরাবল্লী পর্বতের পূর্বে অবস্থিত বিস্তৃত অঞ্চলটিকে মধ্যযুগ হইতে মালব বলা হইতেছে। প্রাচীনকালে এই দেশের পশ্চিমাংশের নাম ছিল অবন্তি; উহার রাজধানী ছিল সুবিখ্যাত উজ্জয়িনী নগরী। মালবদেশের পূর্বভাগে আকর বা দশার্ণ জনপদ অবস্থিত ছিল; বিদিশা ছিল উহার প্রধান নগরী। সিপ্রা নদীর তীরবর্তী উজ্জয়িনী আজিও তাহার প্রাচীন নাম বহন করিতেছে। প্রাচীন বিদিশা নগরীর বর্তমান নাম বেসনগর। উহা বেতোয়া (প্রাচীন বেত্রবতী) নদীর তীরস্থিত ভেলসা নগরীর সন্নিকটে অবস্থিত।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যখন দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন মালবজাতি পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্গত মণ্টগোমারী অঞ্চলে বাস করিত। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর কিছুকাল পূর্বে মালবেরা রাজস্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। পঞ্জাবে ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক যবন, শক, পহ্লব এবং কুষাণদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত মালবজাতির স্থানচ্যুতির সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, রাজস্থানে আসিয়া মালবেরা বর্তমান টংক জেলার অন্তর্গত উনিয়ারার নিকটবর্তী নগরীগ্রামে রাজধানী স্থাপন করে। নগরীগ্রামের তৎকালীন নাম ছিল মালবনগরী।

এই মালবজাতির সহিত সম্পর্কিত হইয়াই যে প্রাচীন অবন্তি ও আকর-দশার্ণ জনপদ পরবর্তীকালে মালবদেশ নামে পরিচিত হয়, তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে বর্তমান মালবের এই নূতন নামকরণ জনপ্রিয় হইয়াছিল, সেবিষয়ে ঐতিহাসিকগণের সম্যক্ ধারণা আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ আমরা দেখিতে পাই, গুপ্তোত্তর যুগের সাহিত্য ও লেখাবলীতে যেখানেই মালবদেশের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, সে সমস্ত ক্ষেত্রেই উহাকে বর্তমান উজ্জয়িনী অঞ্চল বা মালবের সহিত অভিন্ন ধরিয়া লওয়া হয়।

সপ্তম শতাব্দীর সূচনায় মহাকবি বাণভট্ট তাঁহার "হর্ষচরিতে" থানেশ্বর, কান্যকুব্জ ও গৌড়ের নরপতিগণের প্রসঙ্গে মালবরাজের উল্লেখ করিয়াছেন। ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ঐহোলি শিলালেখে বাদামির চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী বাহুবলে লাট

(রাজধানী—সুরত জেলার অন্তর্গত নৌসারী), গুর্জর (রাজধানী—ভরোচ জেলার অন্তর্গত নান্দীপুরী) এবং মালবদিগকে দমন করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। রাষ্ট্রকূট-বংশীয় তৃতীয় গোবিন্দের রাজত্বকালে (খ্রীঃ ৭৯৪-৮১৪) তদধীন লাটদেশের (অর্থাৎ দক্ষিণ গুজরাতের) শাসনকর্তা কর্ক দাবি করিয়াছেন যে, গুর্জরপ্রতীহার-রাজগণের আক্রমণ হইতে মালব দেশকে রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহাকে গুজরাতে স্থাপন করা হইয়াছিল। অনেকে এই সকল ক্ষেত্রেই 'মালব' বলিতে বর্তমান মালব বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু এ ধারণা সত্য বলিয়া বোধ হয় না।

হর্ষচরিতকার মালব বলিতে কোন দেশ বুঝিতেন, তদ্রচিত "কাদম্বরী"তে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। "কাদম্বরী"র একস্থানে বিদিশা নগরীর প্রান্তবর্তিনী বেত্রবতী নদীতে মালববিলাসিনীদিগের জলক্রীড়ার উল্লেখ দেখা যায়। আবার গ্রন্থের অন্যত্র উজ্জয়িনীকে অবন্তিদেশের নগরীরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বাণভট্ট পূর্বমালবকে 'মালব' এবং পশ্চিমমালবকে 'অবন্তি' বলিয়া জানিতেন। এইরূপ নাম-করণের স্মৃতি পরবর্তীকালেও মুছিয়া যায় নাই। কারণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাৎস্যায়নকৃত "কামসূত্রে"র 'জয়মঙ্গলা' টীকার রচয়িতা যশোধর মালবদেশীয় নারীকে 'পূর্বমালবভবা' এবং অবন্তিদেশের নারীকে 'উজ্জয়িনীদেশভবা' ও 'পশ্চিমমালবদেশীয়া' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এমনকি সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত "শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে"ও পশ্চিম ও পূর্ব মালবের নাম যথাক্রমে 'অবন্তি' ও 'মালব' দেখা যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই আকর-দশার্ণের 'মালব' নাম জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল; কিন্তু অবন্তিদেশের 'মালব' নাম তখন পর্যন্ত জনপ্রিয় হয় নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে মগধের গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য পশ্চিম ভারতের শকরাজ্য অধিকার করেন। তখন হইতে পশ্চিম মালবে ঔলিকরবংশ এবং পূর্ব মালবে তথাকথিত 'উত্তরকালীন গুপ্তবংশ' রাজত্ব করিতে থাকে। এই দুইটি রাজবংশই মালবজাতীয় ছিল বলিয়া বোধ হয়। উত্তরকালীন গুপ্তরাজগণ মালবজাতীয় ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের রাজ্য মালবদেশ নামে পরিচিত হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। পাশাপাশি দুইটি রাজ্যের এক নাম থাকিতে পারে না। তাই সম্ভবতঃ এ সময় ঔলিকর রাজ্যের নাম মালব হইতে পারে নাই।

কিন্তু চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী যে পূর্বমালব জয় করিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ, তিনি যে মালবজাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহারা দক্ষিণ গুজরাতের লাট ও গুর্জরদিগের প্রতিবাসী ছিল বলিয়া বোধ হয়। আবার রাষ্ট্রকূট লেখমালার মালবও পূর্বমালব হইতে পারে না। কারণ লাটদেশের শাসনকর্তার পক্ষে দূরবর্তী পূর্বমালব হইতে গুর্জরপ্রতীহার আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট লেখাবলীর 'মালব' অবশ্যই গুজরাত অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এই সম্পর্কে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএন-চাঙের সাক্ষ্য অত্যন্ত মূল্যবান।

হিউএন-চাঙ্ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম ভারতে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি উজ্জয়িনী (Wu-she-yen-na) এবং মালব (Mo-la-p'o) নামক দুইটি স্বতন্ত্র দেশের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণিত 'মালব' পূর্বমালব নহে। কারণ তিনি বলিয়াছেন যে মালবদেশটি Mo-ha (অর্থাৎ গুজরাতের মহী) নামক নদীর তীরে অবস্থিত এবং খেটক (বর্তমান খেড়া, Kaira) ও আনন্দপুর (বর্তমান বড়নগর) ঐ দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চালুক্য-রাষ্ট্রকূট লেখমালার 'মালব' এই গুজরাত অঞ্চলস্থিত জনপদ বলিয়া বোধ

হয়। অবশ্য সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দশকে কাঠিয়াবাড়ের মৈত্রকবংশীয় নরপতি শীলাদিত্য ধর্মাদিত্য উল্লিখিত মালবদেশ অধিকার করেন এবং শীঘ্রই প্রথম খরগ্রহ কর্তৃক উজ্জয়িনী অঞ্চলে মৈত্রকবংশের আধিপত্য প্রসারিত হয়। এই সময়ে কিছুকালের জন্য গুজরাতের মালব এবং বর্তমান পশ্চিমমালব একটি জনপদে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু দশম শতাব্দীর সূচনাতেও কবি রাজশেখর তাঁহার "কাব্যমীমাংসা"তে মালবদেশকে অবন্তি (উজ্জয়িনী অঞ্চল) এবং বৈদিশ (বিদিশা-ভেলসা অঞ্চল) হইতে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে পশ্চিম ভারতীয় জনপদসমূহের তালিকাতে দেখা যায়—'অবন্তি-বৈদিশ-সুরাষ্ট্র-মালবার্বুদ-ভৃগুকচ্ছাদি'। এখানে সুরাষ্ট্র (কাঠিয়াবাড়) এবং অর্বুদ (আবুপর্বত) নামক অঞ্চলদ্বয়ের মধ্যে মালবদেশ উল্লিখিত হইয়াছে। এই মালব হিউএন-চাঙ বর্ণিত গুজরাত অঞ্চলস্থিত মালব বলিয়া বোধ হয়।

পরমারবংশের আদি রাজগণ রাষ্ট্রকূট সম্রাটদিগের সামন্তরূপে গুজরাতের খেটক প্রভৃতি অঞ্চল শাসন করিতেন বলিয়া অনুমান করা যায়। কারণ দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে পরমাররাজ হর্ষ সীয়ক তদীয় সামন্ত খেটকাধিপতির অনুরোধে মহীনদীর তীরাবস্থিত স্কন্ধাবার হইতে তাম্রশাসন দান করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, হিউএন-চাঙের উল্লিখিত মালবদেশও এই অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। আবার পরমাররাজগণ যে মালবজাতীয় ছিলেন, তাহারও কিছু প্রমাণ আছে।

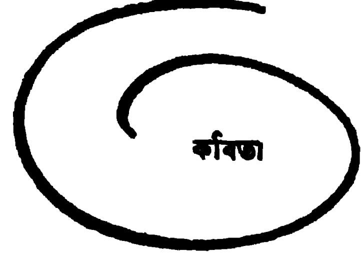
হর্ষ সীয়কের তাম্রশাসনে তাঁহার পিতামহ প্রথম বাক্‌পতিকে রাষ্ট্রকূটবংশীয় দ্বিতীয় কৃষ্ণের বংশধর বলা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, তাঁহার ধমনীতে রাষ্ট্রকূটবংশের কোন রাজকন্যার রক্ত প্রবাহিত ছিল। কিন্তু শীঘ্রই রাষ্ট্রকূট এবং পরমারবংশীয় রাজগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। তাই পরমারবংশের উত্তরকালীন লেখাবলীতে রাষ্ট্রকূট সংস্রবের বিষয় উল্লিখিত হয় নাই।

হর্ষ সীয়ক দাবি করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রকূট সম্রাট খোট্টিগণ (খ্রীঃ ৯৬৮-৭৩) তৎকর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ৯৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ধনপালের "পাইয়লচ্ছী"তে এই ঘটনাটি ভিন্নাকারে উল্লিখিত হইয়াছে। ধনপাল বলিয়াছেন যে, মালবেরা রাষ্ট্রকূট-রাজধানী মান্য-খেটনগর অগ্নিদগ্ধ করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল। ইহা হইতে মনে হয় যে, "পাইয়লচ্ছী"র গ্রন্থকার পরমারবংশীয় হর্ষ সীয়ককে মালবজাতীয় বলিয়া জানিতেন। হর্ষ সীয়কের পুত্র দ্বিতীয় বাক্‌পতি মুঞ্জ ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উজ্জয়িনী অধিকার করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পরমারবংশীয় মালবেরা দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম মালবে আধিপত্য বিস্তার করে। তাহারা ধারানগরী (বর্তমান ধার) এবং মণ্ডপদুর্গ (বর্তমান মাণ্ডু) প্রতিষ্ঠা করিয়া সুদীর্ঘকাল পশ্চিম মালবে রাজত্ব করিয়াছিল। সম্ভবতঃ দশম শতাব্দী হইতেই প্রাচীন অবন্তিদেশের 'মালব' নাম জনপ্রিয় হইতে থাকে।

উপরে প্রাচীন মালবজাতির যে কয়েকটি উপনিবেশের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও কতিপয় স্থানের মালব নাম পাওয়া গিয়াছে। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারনাথ প্রয়াগ অর্থাৎ বর্তমান এলাহাবাদ অঞ্চলে মালব নামক স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তর-প্রদেশের ফতেপুর জেলায় 'মালবা' নামের একটি গ্রাম আছে। দক্ষিণ ভারতে 'মলব' নামক দু-একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি কল্যাণের চালুক্যবংশীয় ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের (খ্রীঃ ১০৭৬-১১২৭) সামন্ত অনন্তপাল দাবি করিয়াছেন যে, তিনি উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত সাতটি মালব দেশ জয় করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা হইতে সাতটি বিভিন্ন মালব দেশের

অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় কিনা, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু 'মালব' বা 'মলব' নাম দ্রাবিড়ভাষার 'পর্বত'বোধক 'মলৈ' শব্দ হইতে উদ্ভূত; তাই দক্ষিণ ভারতে একাধিক পার্বত্য জাতিকে 'মালব' বা 'মলব' বলা হইত বলিয়া বোধ হয়।

প্রমাণপঞ্জী: (১) বাণভট্টকৃত "কাদম্বরী", হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৯ ও ১৮৩; (২) *Epigraphia Indica,* Vol. VI, p. 6, verse 22 ; Vol. XXXIV, p. 138 ; (৩) দীনেশচন্দ্র সরকারকৃত *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India.* pp. 91-92 ; (৪) রাজশেখরকৃত "কাব্যমীমাংসা", *Gaekwad Oriental Series,* p, 9 ; (৫) বাৎস্যায়নকৃত "কামসূত্র", ৬।৫।২২ ও ২৪ এবং তদুপরি যশোধরকৃত জয়মঙ্গলাটীকা; (৬) হেমচন্দ্র রায়কৃত *Dynastic History of Northern India,* Vol. II, pp. 848-51 ; (৭) হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীকৃত *Political History of Ancient India,* 1938 ed., p. 492 ; (৮) *Bombay Gazetteer,* Vol. I, Part ii, pp. 400, 569 ; (৯) Watters On Yuan Chwang's *Travels in India,* Vol. II pp. 242-47 ; ইত্যাদি।



ধর্ম বলেছিল

দিব্যেন্দু পালিত

ধর্ম বলেছিল, এসো, কাছে এসো, সম্মুখে দাঁড়াও—
রোদ্দুর এখন খুব খেলা করে পায়ের পাতায়;
প্রসারিত বরাভয়, ঐশ্বরিক হাতে আছে তাবৎ চাতুরি;
এসো, কাছে এসো, ক্রুশবিদ্ধ হই তোমার আলোয়...

স্মৃতি বলেছিল, আছে কৌটায় ভ্রমর পরিপাটি—
জীয়ন্ত, যদিও দাঁত মাড়িগুলি তেমন সুদৃশ্য নয় আজ;
অদৃশ্য বীজাণু মাংস ক্রমাগত কীটদষ্ট করে;
তবু আমি দিতে পারি প্রত্যাবর্তনের সুখ, আমি দিতে পারি...

প্রেম বলেছিল, রক্ত সহ্যের অতীত কাজ করে—
বিষুবের নির্ভরতা সয়েছি দীর্ঘদিন, এখন নিয়তি
কিংবা তার প্রতিবিম্ব, শ্বাস ফেলে প্রতিটি নিঃশ্বাসে;
আমার শীতোষ্ণ ঘরে তবু আছে বিশ্রাম আশ্রয়...

ধর্ম, স্মৃতি, প্রেম নিয়ে কতকাল অলিন্দে তোমার
বিশিষ্ট বাতাস শুধু ছুঁয়ে গেল অন্তিম বিষাদ!

আমার ছেলেকে

শামসুর রহমান

খবর্দার খোকা তুই কোনোদিন শিল্পের মৃগকে
দিবিনে ঘেঁষতে ত্রিসীমায়। বরং ডিঙিয়ে বেড়া
ভাষ্য, টীকা, দর্শনের মহানন্দে নিশ্চিন্তির ডেরা
বাঁধিস মনের মতো। জীবনকে সঁপে দিয়ে ছকে
বাজাবি ঢোলক নিত্য; চাকরির চরম নাটকে
সাজলে নিখুঁত হুকোবরদার, সমাজের সেরা
মুরুব্বির তল্পি ব'য়ে সামলালে নথিপত্র ঘেরা
অস্তিত্বকে, পৌঁছে যাবি উন্নতির প্রশস্ত সড়কে।

পক্ষান্তরে শিল্পের আঁতুড় ঘরে আছে কালকূট
হতাশার। রাত্রিদিন বিষাক্ত হাওয়ায় শ্বাস টেনে
কী পাবি অবুঝ তুই? অন্তহীন যন্ত্রণা, বিষাদ
অথবা পতন শুধু। সাফল্যের বিখ্যাত মুকুট
ক'জনের ভাগ্যে জোটে? তার চেয়ে স্থূলচর্ম বেনে,
বীমার দালাল হওয়া ভালো, ভালো ফূর্তির আস্বাদ।

আশ্চর্য

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

আমার প্রেমের মুখ স্মৃতি হয়ে সারা ঘরে ঘোরে,
জীবন আশ্চর্য!
আমার স্মৃতির ফুল গন্ধে রঙে জাগে রোজ ভোরে,
জীবন আশ্চর্য!
আমার ফুলের কাছে একটি মৌমাছি আসে রোজ,
জীবন আশ্চর্য!
আমার মনের কণ্ঠে মৌমাছির গান কি সহজ!
জীবন আশ্চর্য!

সুখে-দুঃখে সুখী এই সৃষ্টি চলে কত বর্ষ ধরে,
জীবন আশ্চর্য!
অলক্ষ্য আঙুলে কার দিন-রাত্রি জপমালা ঘোরে,
জীবন আশ্চর্য!
প্রতি মুহূর্তের আমি সে-মালার গণিত জীবন,
জীবন আশ্চর্য!
আশ্চর্য জীবনে শুধু চমকালে মৃত্যু সাধারণ
থমকায় আশ্চর্য!

নগর কলকাতার অর্থনৈতিক সমস্যাবলী

শান্তিকুমার ঘোষ

কলকাতার উদ্ভব হয়েছে কয়েকটি গ্রাম থেকে। কোনো সুচিন্তিত পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে নয়, যখন যে রকম দরকার সেই সময়ের প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে মূলত এই নগরের সম্প্রসারণ হয়েছে। কলকাতার প্রায় ৬৫ লক্ষ অধিবাসীদের প্রয়োজন যে গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, নগরের আবশ্যিক সুযোগ-সুবিধা সেই হারে বাড়ে নি। পানীয় জল, রাস্তা-ঘাট, যানবাহন, জলনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধানের যে ব্যবস্থা এখানে আছে তা যথেষ্ট নয় এবং প্রায়শ তার অবনতি ঘটছে। কলকাতা মেট্রোপলিটান পরিকল্পনা সংস্থা হিসাব করে দেখিয়েছে যে, আগামী পঁচিশ বছরে কলকাতা মেট্রোপলিটান জেলা অর্থাৎ প্রায় ৪২৫ বর্গ-মাইল ব্যাপী হুগলী নদীর দু'পাশের শহর অঞ্চলে শতকরা অন্তত ৫০ ভাগ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হবে। বছরে শতকরা ৬ হারে জনবহুল এই জেলার আর্থিক উন্নয়ন করতে গেলে, এমন কি ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের এখনকার মান বজায় রাখতে হলে সমগ্র অঞ্চলটির কল্যাণ সাধনের বিধি-বন্দোবস্তের উন্নতি করা দরকার।

কলকাতা নগরের আয় বেড়েছে মন্দগতিতে; জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তা কোনো মতে সমতা রক্ষা করতে পেরেছে। উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ না করলে এই নগরীর আর্থিক অবস্থা ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়তে বাধ্য।

বৃহত্তর কলকাতার ব্যাঙ্ক, শিল্প ব্যবসা প্রভৃতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতি অনেকটা সন্নিহিত অঞ্চল, আসামের চা-বাগান এবং বিশেষ করে দুর্গাপুর-আসানসোলের শিল্প-সম্প্রসারণের মুখাপেক্ষী। কলকাতায় যে সব সুযোগ-সুবিধা (যেমন বিবিধ আনুষঙ্গিক শিল্প, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা, বন্দরের ব্যবহার) পাওয়া সম্ভব, দুর্গাপুর-আসানসোলের শিল্পোন্নয়ন সেগুলির চাহিদা বৃদ্ধি ঘটাবে। শেষোক্ত অঞ্চলে কলকারখানার প্রসার, কলকাতায় যে অত্যধিক চাপ বর্তমানে দেখা যায় তা কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে; শিল্প স্থাপনের ভিন্ন একটি জায়গা এবং শ্রমিকদের কাজ করবার নতুন একটি ক্ষেত্র পাওয়া যাবে।

শিল্প হচ্ছে কলকাতা অঞ্চলের কর্মসংস্থান ও আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। ১৯৬১ সালে এই নগরের বিভিন্ন কর্মে রত ১১·৭ লক্ষ লোকের মধ্যে ২·৩ লক্ষ কর্মী শিল্পে নিযুক্ত ছিল, তার ভেতর আবার ১·৭ লক্ষ জন রেজিস্ট্রীভুক্ত (১০ জনের অধিক কর্মী সমন্বিত যে কারখানায় বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করা হয়, অথবা ঐ শক্তি ব্যবহার করা হয় না এমন ২০ জনের বেশী শ্রমিক-সমন্বিত কারখানা) কারখানায় কাজ করতো। অঞ্চলটির অন্যতম মুখ্য শিল্প পাট-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের বেশী সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। অন্যদিকে, বলবিদ্যাসম্মত ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের যে দ্রুত বিকাশ হবে সেটা আশা করা যায়। ১৯৬১ সালে কলকাতা মেট্রোপলিটান জেলার ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক (২,৫৩,০০০); বয়ন শিল্পে ২,৪৭,০০০ জন কাজ করতো।

কলকাতার শিল্প-সংক্রান্ত অর্থনৈতিক সমস্যা জটিল হয়ে উঠেছে নানা সামাজিক কারণে। নগরের জনসমষ্টির শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ এসেছে পার্শ্ববর্তী পল্লী অঞ্চল ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে। আকর্ষণ করে এ-রকম কাজ-কর্মের সুযোগ কলকাতার

যথেষ্ট না থাকলেও, গ্রামদেশে কাজের অভাব ও ক্রমিক দুর্দশায় তাড়িত হয়ে সেখানকার অধিবাসীরা ঐ নগরে চলে আসে। বাইরে থেকে লোকের এই স্বাভাবিক আগমনের উপর গত আঠারো বছর ধরে উদ্বাস্তু আসার ফলে নগরের জনবসতির ঘনত্ব বেড়ে গিয়ে প্রতি বর্গমাইলে ৭৬,৪৯০ হয়েছে। লোকবসতির নিবিড়তার দিক থেকে দেখলে কলকাতা পৃথিবীর সব চেয়ে ঘন নগরগুলির অন্যতম---এই ব্যাপারে তার স্থান রোমের (৮৩,৮৫০) পরেই।

নগর অভিমুখে লোকের আগমন কলকাতার জনসংখ্যা গঠনে একাধিক অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করেছে। প্রথমত, আগন্তুকদের অধিকাংশ হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, যারা স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনের সুবিধা ও শৃঙ্খলা থেকে বঞ্চিত (১৯৫৭-৫৮ সালে নগরের জন-সমষ্টির শতকরা ৬৫ ভাগ ছিল পুরুষ এবং ৩৫ ভাগ নারী)। বেশী সংখ্যায় একজন সদস্যের গৃহী ও মেসে-থাকা পরিবার অর্থাৎ কোনো রকম সম্পর্কহীন লোকদের উপস্থিতির ফলে কলকাতার সমাজজীবনে স্বভাবত স্থিতির অভাব ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বাইরে থেকে লোক আসার দরুন শহরের জনগণ যে সব কাজকর্ম করে থাকে তার পরিবর্তন ঘটেছে। আদমসুমারির পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, দেশ-বিভাগের আগে, ১৯১১ ও ১৯৩১ সালের মধ্যে জনসমষ্টির শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ ছিল বাণিজ্যে নিযুক্ত। পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে বাণিজ্যেরত কর্মীদের শতকরা অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়ে ১৯৫১ সালে ৩২·৫৫-এ পৌঁছেছে। আগন্তুকরা প্রধানত ব্যবসায়ী, দক্ষ বা অদক্ষ কর্মী হয়ে থাকে। নবাগতদের বেশীর ভাগের কারিগরি বিদ্যা বা শিল্পসংক্রান্ত দক্ষতা নেই; অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই তাদের কাজের সংস্থান সম্ভব হয়েছে আর্থিক ব্যবস্থার প্রত্যন্ত অংশে। স্থানীয় প্রতিযোগিতা প্রবল নয় এমন বিশেষ ধরনের কাজ করে বলে স্বাভাবিক জনসংখ্যার অনুপাত হিসাবে আগন্তুকরা স্থিতিশীল।

আগামী বছরগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার ও আসামের শ্রমিক বাহিনী যে সমধিক পুষ্ট হবে তাতে সন্দেহ নেই। ঐ অতিরিক্ত কর্মীরা যদি তাদের এখনকার বাসস্থান বা তার কাছাকাছি অঞ্চলে কাজ না পায় তাহলে অতীতে যেমন ঘটেছে, সেই রকম, উদ্বৃত্ত কর্মীদের বেশ কিছু কলকাতা অঞ্চলে চলে আসবে। তখন বাড়তি কর্মপ্রার্থীদের তুলনায় কাজের সুযোগ বাড়ানো হবে জরুরী সমস্যা।

স্পষ্টত, কাজকর্মের প্রয়োজনীয় সুযোগ বৃদ্ধি নির্ভর করবে প্রাগুক্ত চারটি রাজ্যের অধিকতর শিল্পোন্নয়ন, সরকারী ও বেসরকারী অংশে মূলধন নিয়োগ ও কলকারখানায় শ্রমনির্ভর উৎপাদন প্রণালী প্রয়োগের উপর। দুর্গাপুর, বোকারো, রাঁচি, রাউরকেলা প্রভৃতি নির্মীয়মান শিল্পকেন্দ্রের চারদিকে কর্মপ্রার্থীদের কাজের সম্ভাবনা সম্প্রসারিত হবে আশা করা যায়। বড় কলকারখানা ঘিরে বিবিধ শিল্প গড়ে উঠলে পুরানো শহরের প্রসার ও নতুন শহরের উৎপত্তি হবে; সেই সঙ্গে কারখানাগুলির চারদিকে ও শহরগুলিতে নানা রকম কাজের জন্য কর্মীদের চাহিদা যাবে বেড়ে।

কলকাতা নগরে কর্মরতদের বেশ কিছু লোক আর্থিক ব্যবস্থার প্রত্যন্ত অংশের (ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ, জিনিসপত্র মজুত রাখা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ এই অংশের অন্তর্ভুক্ত) উপর নির্ভরশীল। শিল্প বা মাধ্যমিক অংশে যেখানে কর্মীদের শতকরা ২৬ ভাগকে নিযুক্ত দেখা যায়, প্রত্যন্ত অংশে সেখানে শতকরা ৭১ ভাগ কাজ করে। কলকাতার আর্থিক ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য হল সেখানে বহু লোক নানা প্রান্তিক ধরনের (যেমন,

রিকশাচালক, রাস্তার ফেরিওয়ালা) কাজে নিযুক্ত। অধিক উৎপাদনক্ষম উন্নত ধরনের কাজে এই সব ব্যক্তিদের লাগাবার বন্দোবস্ত করা দরকার।

কলকাতায় শিল্পে যত লোক কাজ করে তার প্রায় সমানসংখ্যক ব্যক্তি সেখানকার বাণিজ্যে নিযুক্ত। উত্তর-পূর্ব ভারতের একটা বিশাল অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কলকাতা বন্দরের মুখাপেক্ষী। ভারতের মোট আমদানী পণ্যের শতকরা ৪০ ভাগ ও রপ্তানী পণ্যের শতকরা ৪৫ ভাগ কলকাতা বন্দর দিয়ে আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। চা, পাট ও পাট-শিল্পদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে এখান থেকেই দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের বেশীর ভাগ উপার্জন করা হয়। ১৯৬১-৬২ সালে কলকাতার শুল্ক অঞ্চলে আমদানী কর থেকে ৫৮ কোটি ৩০ লক্ষ, রপ্তানী শুল্ক থেকে ৭ কোটি ২০ লক্ষ এবং আবগারি থেকে ৭৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা আয় হয়। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতের প্রধান বন্দরগুলিতে মোট যে ৮,৪৮২টি জাহাজ এসেছিল তার ভেতর শুধু কলকাতা বন্দরে প্রবেশ করেছে ৩৪৩·৪৬ লক্ষ টনের ১,৭৮৬টি জাহাজ।

কলকাতা বন্দর যেমন তার পার্শ্ববর্তী সমগ্র অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করে থাকে তেমন ঐ অঞ্চলের শিল্প ব্যবসার উপর বন্দরটি নির্ভরশীল। কিন্তু কলকাতা নগরের পাট-শিল্প ছাড়া অন্য শিল্প খুব কমই বন্দরটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। এর তাৎপর্য হচ্ছে কলকাতা বন্দরের উন্নয়ন, কোনো বিশেষ শিল্পের বিকাশ নয়, সমগ্র পূর্ব ভারতের বৈষয়িক কর্ম ও রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসারের সাথে জড়িত। সেই রকম, ঐ বন্দরের উন্নতি না করলে বৃহত্তর কলকাতা অঞ্চলের আর্থিক অবস্থা ক্রমে নিস্তেজ হয়ে যাবে।

জনাকীর্ণ ও শিল্পোন্নত উত্তর-পূর্ব ভারত অঞ্চলের পণ্য কলকাতা বন্দর দিয়ে আদান-প্রদান করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। সমুদ্র ও কলকাতার মধ্যে জাহাজের যাতায়াত কোনোদিনই সহজ ছিল না। ডায়মণ্ডহারবারের উপরের দিকের নদীতে চড়া ও বাধা থাকায় অনবরত পলিমাটি পরিষ্কার করবার দরকার হয়। কি রকম আকারের জাহাজ নদীপথে যেতে পারবে তা নির্ভর করে ঐসব চড়ার উপরকার জলের গভীরতার উপর। চড়া প্রভৃতি পার হবার জন্য জাহাজকে জোয়ারের অপেক্ষা করতে হয়। উলুবেড়িয়া, ডায়মণ্ডহারবার (অথবা কুলপি) ও সাগরে থেমে একটি জাহাজের নদীপথে কলকাতা বন্দরে আসতে সাধারণত ছত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ ঘণ্টা লাগে।

ইদানীং কয়েক বছর ধরে পলি জমে হুগলী নদীর গভীরতা নষ্ট হওয়ায় কলকাতা বন্দরের শ্বাসরুদ্ধ হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬১ সালের ভেতর কয়েকটি ঋতুতে প্রতি বছর প্রায় দু'ফুট করে নদীর নাব্যতা কমে গেছে। নাব্যতা এক ইঞ্চি হ্রাস পেলে জাহাজকে যেহেতু ৫০ থেকে ৬০ টন বোঝা কমিয়ে দিতে হয়, হুগলীর ক্রমিক অবনতির ফলে ঐ নদীতে জাহাজের মাল বইবার ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি।

সেই সঙ্গে, নদীর জল বেশী লবণাক্ত হয়ে যাওয়ায় নগরে জল সরবরাহের ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কলকাতা বন্দরের প্রয়োজন ছাড়াও, নগরের গৃহস্থালি ও কলকারখানার কাজে ব্যবহারের জন্য হুগলী নদীর উপরের অংশে জল বেশী থাকা দরকার। (অঞ্চলটির কারখানাশিল্পে যে পরিমাণ জল লাগে তার শতকরা ৭৩ ভাগ আসে নলকূপ থেকে, শতকরা ১৫ ভাগ কলকাতা পৌর জলসরবরাহ ব্যবস্থা হতে যোগান দেওয়া হয়।) ফরাক্কা বাঁধনির্মাণ সম্পূর্ণ হলে অবস্থার উন্নতি হবে আশা করা যায়।

কলকাতা বন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করা সত্ত্বেও একটা নির্দিষ্ট আকারের

(১৫,০০০ টন) চাইতে বড়ো জাহাজ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না এবং ফলে মাল নিয়ে আসা বা পাঠাবার দরুন অযথা অতিরিক্ত জাহাজ-ভাড়া লাগে। নদীর অবনতির ফলে বাড়তি যে সব খরচ হচ্ছে সেগুলি হলো (১) নদী ব্যবহার্য রাখার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়; (২) বন্দরের পণ্য আদান-প্রদানের জন্য আগের চাইতে বেশী সংখ্যায় জাহাজের দরকার হয়েছে বলে বাড়তি যে খরচ লাগছে; (৩) জোয়ারের আশায় বন্দরে জাহাজকে অপেক্ষা করতে অতিরিক্ত যা সময় লাগে; (৪) বোঝা হালকা করবার জন্য অনেক জায়গায় জাহাজের থামার খরচ; (৫) কলকাতায় অপ্রত্যাশিতভাবে দেরি হয়ে যাওয়ায় অন্যান্য বন্দরে পণ্য না পাওয়া বা আগে নির্ধারিত কার্যসূচী পালন না করতে পারার দরুন খরচ; এবং (৬) দ্রব্য আদান-প্রদানে আগের চেয়ে বেশী খরচ পড়ায় রপ্তানী পণ্য ও আমদানী দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি; প্রথোমক্ত কারণে রপ্তানী বাণিজ্যের হ্রাস। কলকাতা মেট্রোপলিটান পরিকল্পনা সংস্থার একটি হিসাব অনুসারে নদীর অবনতির জন্য বাড়তি মোট খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় মোটামুটি ১৪০ লক্ষ টাকায়।

কলকাতা বন্দরে যে সব জাহাজ প্রবেশ করে বা ছেড়ে চলে যায় সেগুলির বোঝা কমিয়ে দিতে হলে এবং খাদ্যশস্য, কয়লা ও খনিজ লোহা আদান-প্রদান করতে কলকাতার দক্ষিণে নদীপথে প্রায় ৫৬ মাইল নীচে হলদিয়ায় একটা নতন বন্দর স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতা বন্দরে এখন যে সব সুযোগ-সুবিধা আছে, কেবল তার সম্প্রসারণের জন্য গোড়ার দিকে হলদিয়া বন্দরে ব্যবস্থা কবা যেতে পারে। কিন্ত শেষ পর্যন্ত হলদিয়ায় যাতে শিল্পোন্নয়নেব একটা নিজস্ব দৃঢ় ভিত্তি রচনা করা যায়, এবং নতন কর্মপ্রার্থীদের জন্য যাতে কলকাতার বদলে হলদিয়া অঞ্চলে কাজের সংস্থান কবে দেওয়া সম্ভব হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এই অর্থে, বৃহত্তর কলকাতার আর্থিক অগ্রগতি হলদিয়ার উন্নয়নের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।

বর্তমানে কলকাতা বন্দর থেকে ২০ লক্ষ টনের কিছু বেশী কয়লা জাহাজে করে ভারতের উপকূলবর্তী নানা স্থানে পাঠানো হয়। হলদিয়ায় বন্দর তৈরি হলে প্রায় ২০ লক্ষ টন কয়লা বিদেশে রপ্তানী করা কঠিন হবে না। সেই রকম, কলকাতা বন্দর থেকে বর্তমানে যেখানে ছয়-সাত লক্ষ টন খনিজ লোহা বিদেশে পাঠানো হয়, প্রধানত বরাজামদা অঞ্চলের ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টন খনিজ লোহা সেখানে হলদিয়া দিয়ে রপ্তানী করা যাবে। খনিজ লোহা বইবার বড়ো জাহাজের পক্ষে কলকাতা বন্দরে প্রবেশ করা সহজ নয়। হলদিয়া বন্দরে চল্লিশ হাজার টন পর্যন্ত জাহাজ অনায়াসে যাতায়াত করতে পারবে। আকস্মিকভাবে কোনো জাহাজ হুগলী নদীতে ডুবে যাওয়ার ফলে কলকাতা বন্দরে যাবার প্রবেশপথ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পণ্যবাহী জাহাজগুলিকে পরিপূরক বন্দর হলদিয়ায় পাঠানো যাবে।

শিল্প-বাণিজ্যে কলকাতার ক্রমবর্ধমান জনগণের কাজের সংস্থান করে দেওয়ার মতো, তাদের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ নির্মাণের প্রয়োজন জরুরী হয়ে উঠেছে। শহরবাসীদের এক চতুর্থাংশ বাস করে বস্তিতে; বস্তি তাদের কর্মস্থলও অনেক ক্ষেত্রে। লোকের ভিড় ও অল্প আয়ের দরুন শোচনীয় অবস্থার ভেতর বস্তিবাসীদের জীবন-যাপন করতে হয়। অবস্থার অবনতি হয়েছে বিশেষ করে ন্যূন পৌর স্বাচ্ছন্দ্য বা সুবিধার অভাবে। বস্তি-গুলো প্রায় ক্ষেত্রে খুব অস্বাস্থ্যকর; ঘরের শতকরা ৭ ভাগ অন্ধকার এবং শতকরা ৬০ ভাগে কিঞ্চিত সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে; প্রায় এক চতুর্থাংশে প্রবল বৃষ্টির সময় জল জমে এবং একের তিন ভাগ সারা বছর স্যাঁতসেঁতে থাকে। সেখানকার পরিবারদের মাত্র অর্ধেকের

গৃহের ভেতর কলের জল আছে---সেই কল আবার কয়েকটি পরিবার ভাগ করে ব্যবহার করে; শতকরা ৩০ ভাগের বেশী লোকের জন্য জল যোগানের আদৌ কোনো ব্যবস্থা নেই: প্রায় এক-চতুর্থাংশ বাসস্থানে উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী অনুপস্থিত। নগর কলকাতার অধিবাসী-দের দুয়ের তিন ভাগ থাকে কাঁচা বাড়িতে এবং একাধিক সদস্য-সংবলিত পরিবারদের শতকরা ৫৭ ভাগের বাস করার জন্য মেলে মাত্র একখানা ঘর। হিসাব করা হয়েছে যে, তিন লক্ষের বেশী গৃহহীন লোক কলকাতা শহরের ফুটপাতে বাস করে।

অধিক সংখ্যায় যে সব পরিবার কলকাতায় বাস করছে তাদের জন্য, পুরনো যে সমস্ত বাড়ি ভেঙে পড়ছে সেগুলোর জায়গায়, বস্তিতে যারা থাকে তাদের বাসের জন্য, যাদের আবাস সংকীর্ণ তাদের বাড়তি জায়গা দেওয়া---এ সমস্ত উদ্দেশ্যেই নতুন গৃহ নির্মাণ দরকার। কলকাতায় গৃহস্থদের সংখ্যা প্রতি বছর ৭,০০০-এর বেশী হারে বাড়ে, সুতরাং বাসের ব্যবস্থারও সমান সম্প্রসারণ বাঞ্ছনীয়। বছরে শতকরা প্রায় দুই হারে পাকা অট্টালিকা-গুলির অবচয় হচ্ছে এ রকম ধরলে জীর্ণ গৃহের বদলে প্রতি বছর কমপক্ষে ৫,০০০ আবাস তৈরি করতে হবে। হিসাব করা হয়েছে যে, বর্তমানে ২০৫,০০০ গৃহস্থ রেজিস্ট্রীভুক্ত বস্তিতে এবং ১৫০,০০০ গৃহী অন্য বস্তিতে বাস করে। ৩০ বছরের ভেতর বস্তির ঐ সব বাসিন্দাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করতে হলে বছরে ১২,০০০-এর মতো বাসস্থান নির্মাণ করা প্রয়োজন। গৃহের অভাব মেটাতে গেলে তাই প্রতি বছর সবশুদ্ধ অন্তত ২৪,০০০ আবাস তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনের এই বহরের তুলনায় এখন কলকাতায় বছরে ৬,০০০-এর কম বাসস্থান নির্মিত হয় (গৃহনির্মাণ কমে এসেছে পৌর এলাকার ভেতর বাড়ি তৈরি করবার উপযোগী খোলা ও উঁচু জমির অভাবে, বাড়ি তৈরির খরচ বেড়ে যাওয়ায় এবং ইস্পাত, সিমেন্ট ও অন্যান্য মাল-মসলার যোগানে প্রায়শ সংকট দেখা দেওয়ার ফলে)। নির্ণীত এই হিসাব থেকে বাসগৃহ সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে।

গৃহনির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ বলে কলকাতার অধিবাসীদের বেশীর ভাগ উপযুক্ত বাসস্থান থেকে বঞ্চিত। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেনের পরিচালনায় ১৯৫৭-৫৮ সালের একটি তদন্ত থেকে জানা যায় যে, কলকাতার পরিবারদের শতকরা ৮৪ ভাগের মাসিক আয় হচ্ছে ২০০ টাকা বা তার কম; শতকরা ৬৬ ভাগের প্রতি মাসের আয় আবার ১০০ টাকারও নীচে। অসচ্ছল অবস্থার এই সব পরিবার তাদের আয়ের শতকরা ১৫ ভাগ গৃহের জন্য ব্যয় করতে পারে। কাজে-কাজেই ঐ পরিবারদের শতকরা ৬৬ ভাগ মাসে ১৫ টাকা এবং আরো শতকরা ১৮ ভাগ মাসিক ৩০ টাকার বেশী বাসাভাড়ির উপর খরচ করতে অক্ষম।

বাড়ি তৈরি করতে এখন যা খরচ লাগে তাতে আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য বা সুবিধা আছে এরকম দেড়খানা ঘর অর্থাৎ প্রায় ২৩৮ বর্গফুট আয়তনের মেঝে-বিশিষ্ট গৃহ নির্মাণ করতে কমপক্ষে ৫,৭০০ টাকা পড়বে। জমির খরচ এবং মূলধনের উপর একটা ন্যায্য আগম ধরলে, ঐ রকম বাড়ির ন্যূন ভাড়া হবে মাসে ৭০ টাকার মতো। স্পষ্টত, নতুন বাড়ীগুলি কলকাতার পরিবারদের অধিকাংশের সামর্থ্যের বাইরে। ফলে, স্বল্প আয়ের বেশীর ভাগ পরিবারদের পুরনো জীর্ণ বাড়িতে অথবা বস্তিতে ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করতে হয়।

বাসগৃহ সমস্যা কেবল অল্প আয়ের পরিবারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যে সব গৃহস্থদের প্রতি মাসের আয় ২০০ এবং ৭৫০ টাকার ভেতর, তাদের মাত্র একের পাঁচ ভাগের নিজেদের বাড়ি আছে; মাসিক ৭৫০ টাকার বেশী আয়ের গৃহীদের শতকরা ৬০ ভাগ ভাড়া-

করা ফ্ল্যাটে থাকে। কলকাতার সমস্ত পরিবারদের শতকরা মাত্র ৭·২ ভাগ নিজের গৃহে বাস করে।

অল্প ও মাঝারি আয়ের পরিবারদের জন্য কলকাতার ভেতর যদি আবাসের বন্দোবস্ত করতে হয় তাহলে বহুতল-বিশিষ্ট ইমারতের এক-একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ অংশ বা ফ্ল্যাট তাদের কেনবার সুবিধা করে দিতে হবে। মরগেজ ঋণের সাহায্যে দীর্ঘ-মেয়াদী ইজারার ভিত্তিতে যাতে ঐ সব পরিবার ফ্ল্যাটের মালিক হতে পারে সেরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সব চেয়ে ভালো হয়। (নিজের জমি না থাকলে বাড়ির জন্য বর্তমানে জীবন-বীমা কর্পোরেশন থেকে মরগেজ বা বন্ধক ঋণ পাওয়া যায় না। শহরের জমি দুর্মূল্য হওয়ায় অনধিক আয়ের পরিবারদের পক্ষে ঐ শর্ত পূরণ করা সম্ভব নয়।)

কলকাতা শহরের বাইরে গৃহ নির্মাণের উপযোগী স্বল্পমূল্যের জমি পাওয়া গেলে কম ও মাঝামাঝি আয়ের লোকদের জন্য ব্যবস্থা করা সহজ হবে। সেক্ষেত্রে বহির্দেশ অঞ্চল থেকে শহরে যাতায়াতের সুবিধা করে দেবার জন্য সরকারী সাহায্যের দরকার হতে পারে। নব-নির্মিত অঞ্চলে অল্প আয়ের লোকদের থাকার বন্দোবস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার শিল্পোন্নয়ন, সেই সব অধিবাসীদের জন্য কর্মকেন্দ্র স্থাপনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

উপযুক্ত পরিমাণের অর্থ নেই বলে সরকারের পক্ষে বাসগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে বিশেষ অর্থ সাহায্য করা সম্ভব নয়। কলকাতা অঞ্চলের গৃহসমস্যার সমাধানের জন্য শহরবাসীদের তাই নিজেদেরই বেশীর ভাগ অর্থের সংস্থান করতে হবে।

বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন এবং বস্তি উচ্ছেদের জন্য ১৯৫৮ সালে আইন পাশ করা হয়েছে। ঐ আইন অনুসারে মানুষের বাসের অনুপযুক্ত কুটিরগুলি ভেঙে দেওয়া যেতে পারে এই শর্তে যে, বস্তির এক মাইল ব্যাসার্ধের ভেতর (বস্তির বহু ব্যক্তি তাদের গৃহের খুব কাছাকাছি অঞ্চলে কাজ করে) বস্তির লোকদের জন্য বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বস্তির এক মাইলের ভেতর পরিমিত খরচে উপযুক্ত ফাঁকা জমি পাওয়া যায়নি বলে কলকাতায় বস্তি তুলে দেওয়ার কাজ বিশেষ এগোয় নি (বস্তির লোক-দের বাড়ি তৈরির জন্য যে সরকারী অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় তা-ও যথেষ্ট নয়)। বস্তি উচ্ছেদের বড়ো কোনো পরিকল্পনা বর্তমানে গ্রহণ করা সম্ভব নয়; যে সব বস্তি নগরের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে কেবল সেগুলিই তুলে দেওয়া যেতে পারে। এখনকার মতো তাই সেখানকার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পরিস্রুত জল, স্নানাগার ইত্যাদির ব্যবস্থা দ্বারা বস্তির দ্রুত উন্নয়নের চেষ্টা করা ছাড়া উপায় নেই।

দেখা যাচ্ছে যে, নাগরিকদের কল্যাণ সাধনের জন্য আবশ্যিক সুযোগ-সুবিধার দ্রুত সম্প্রসারণ কলকাতার একটি জরুরী প্রয়োজন। যে অবস্থার মধ্যে এই নগরের অধিকাংশ লোক জীবন-যাপন করে তার উন্নতি যেমন বাঞ্ছনীয়, কলকাতায় বর্তমানে যে সব সুবিধা আছে সেগুলি বজায় রাখা বা তাদের ক্রমিক অবনতি নিবারণ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

নগর-কলকাতার সংস্কার ও উন্নতির জন্য তার আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। নাগরিক জীবনের উন্নতিবিধান করতে যেমন রাজস্ব লাগে, উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণে তেমনি মূলধনের দরকার হয়। শিল্পের ক্রমবিকাশ ও বাণিজ্যের প্রসার দ্বারা নাগরিকদের আয়ের বৃদ্ধিসাধন না করলে তাদের পক্ষে কলকাতার পরিকল্পনামূলক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা কঠিন হবে। কলকাতার সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য তার বৈষয়িক অগ্রগতি তাই বিশেষ মনোযোগ ও প্রচেষ্টার অপেক্ষা রাখে।

মুখোশ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ছুটির দিনে সকালবেলাটা বসবার ঘর সামনের দু'তিন হাত ঘাস সুব্রতকেই ছেড়ে দিতে হয়। শশাঙ্কশেখর তখন এক তলার নিজের ঘরেই চা খান, খবর কাগজের খোঁজ না নিয়ে জগদীশবাবুর পকেট-গীতায় মন দেন। চা খেতে যদি বা উঠে চেয়ারে গেলেন, গীতা-পাঠের বেলায় শয্যায়ই এসে বসেন। কারণ, শয্যা থেকেই দেয়ালে ঝোলান শয্যা-সঙ্গিনীর তৈল-চিত্রটি চোখ-বরাবর দেখা যায়। কারণ, গীতাটি তাঁর গতাসু শয্যাসঙ্গিনীরই পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের একমাত্র মনোসঙ্গিনী ছিল এবং প্রায়ই তখন তিনি স্বামীকে অনুরোধ করতেন শ্লোকগুলো বই-এর ব্যাখ্যার চাইতে ভালো করে তাঁকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে। তাঁদের সময় সহধর্মিনীরা স্বামীর মুখেই তো নিষ্কাম কর্মের কথা শুনতে চাইতেন। এখনকার বিবাহিতা স্ত্রীরা শয্যাভাগিনী হতে পারেন কিন্তু সহধর্মিনী তো নন।

দেয়ালে যিনি শুধু ছবি নন, আকাশের অরুন্ধতী নক্ষত্রের মতোই সত্য—এখন তাঁর উদ্দেশ্যেই শশাঙ্কশেখর গীতা পাঠ করেন যেহেতু তাঁর জীবিতাবস্থায় সতীর অনুরোধ পতি রক্ষা করেন নি। এখন নিষ্কাম কর্ম বুঝতে এবং বোঝাতে কোনো অসুবিধাই ছিল না। আর বস্তুত, নিষ্কাম কর্ম ছাড়া এখন তিনি আর কী-ই বা করছেন? তিনি শুনেছেন, ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশনেও তাঁর নাম নেই। না থাক্! এই যে, তার পরও, জওহরলালের মৃত্যু-খবরটা পাড়ায় রটাতে ছুটলেন তিনি, দেববাবুর কাছে, বীমাবাবু অসুস্থ বলেই তাঁর কাছে নয়—তা কি নিষ্কাম কর্মের এলাকায় পড়ে না?

আজ অবশ্যি অবিনাশী আত্মার খবরই নিচ্ছিলেন জজবাবু, যখন জওহরলালের দেহ পঞ্চভূতে মিশে গেছে। আত্মার প্রতীক শেষ ইচ্ছা-টিচ্ছা কিছু নয়, যেটা খবরের কাগজের পরিবেশে তিনি ভাবতে পারেন। বিশুদ্ধ আত্মারই খবর নিচ্ছিলেন তিনি গীতায়:

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

আত্মা কি হত্যাকারী হতে পারে? না। হত হতে পারে? না। যারা আত্মাকে জানে না তারা এরকমই মনে করে! আত্মা মারেও না, মরেও না।

তার মানে, খুনীর আত্মা খুনী নয়, আমি যে খুনীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি আমার আত্মাও বিচারক নয়। খুনীর আত্মাও মরবে না, আমার আত্মাও তাকে মারে নি। অবসর-প্রাপ্ত বিচারপতি শশাঙ্কশেখর কেমন যেন বিপন্ন-বোধ করলেন। যেহেতু তিনি রূপনারাণের কূলে জেগে ওঠেননি তার জন্যেই এখনকার জাগ্রত অবস্থাটাকে তাঁর স্বপ্ন বলে মনে হল। তিনি যদি আত্মা হয়ে থাকেন তাহলে তিনি বিচারক নন, অতীতেও বিচারক ছিলেন না। তবু তিনি নিজের পিতার বিচার করেছেন, খুনীর বিচার করেছেন, সুপ্রিয়র বিচার করে চলছেন! স্বপ্নেই এসব হতে পারে। কিন্তু সত্যে কি, তাই বলে, তিনি জেগে উঠলেন? তাহলে আর বিপন্ন-বোধ করবেন কেন?

কখন যে গীতার পৃষ্ঠা থেকে তার আঙুলগুলো সরে এসেছে এবং বইটা বন্ধ হয়ে গেছে, তিনি তা বলতে পারবেন না। যদি তাকে আত্মস্থ বলা যায়, আত্মস্থ হলেন তিনি

সোমা এসে যখন ঘরে ঢুকল।

সোমা-ই সম্প্রতি 'বাবা'র ঘরে আসতে সুরু করেছে। সুব্রত আসত—এখনও আসে, বাবা যখন তাঁর ঘরে। মনিকা আসে না। মলুয়া আসে না। মহুয়া আসত, আসে। সুপ্রিয় আসে না। সোমা আসছে। আসছে, যখন তাদের ঘরে সে একা। সুপ্রিয় নেই। থাকে বা কতোক্ষণ? ঘুমের সময়টা আর তার আগে ও পরে এক-এক ঘণ্টা। বাড়ি থাকলেও এ-রুটিনের বাইরে এক মিনিট বেশি নয়। মলুয়ার পড়ার ঘরেই আড্ডা তার।

শ্বশুরকে 'বাবা' ডাকতে হয় জানত সোমা—বিয়ের আগেই জানত—শান্তিনিকেতন থাকতেই। কিন্তু সে-'বাবা'র ঘরে যে আসতে হয় তা কি জানত? সে যখন শান্তিনিকেতনে, তখন রবীন্দ্রনাথ নেই। মা তাকে বলে দিয়েছিলেন? না। বাবা? বললেও, মনে নেই। মণিকা তো বলেই নি—সুব্রতও না। সুপ্রিয় কথা বা বলে ক'টা—আর এমন বাজে কথা বলবে! তারই বোধহয় মনে হয়েছিল, 'বাবা'র ঘরে তার আসা দরকার। 'বাবা' এমন এক চোখে কী এক প্রত্যাশায় তাকিয়েছিলেন প্রথম আশীর্বাদ করে, তারপর কি আর কাউকে বলতে হয়? এই বিশেষ ঘটনায় সোমা বোধহয় মেয়েদের স্বভাবের সাধারণ সূত্রটা ধরতে পেরেছিল। গল্প-করা নির্বোধ কৈশোরে যেম্নি তাদের আপত্তি নেই, তেম্নি সহজ তাদের চঞ্চল তারুণ্য, তেম্নি মা হওয়া, মাতৃত্ব পাওয়া। যখনকার যা শরীরই তাদের মনকে শিখিয়ে দেয়, তা-তা-ই করে যায় মেয়েরা। অন্তত সোমার মতো মেয়েরা।

—এসো মা, শশাঙ্কশেখর পুত্রবধূকে সাদর আহ্বান জানালেন,—বোসো।

—বসব কেন? দাঁড়ানোই তো ভালো!

—তুমি তো আর আসামী নও। বহুদিন পর জজবাবু 'আসামী'-শব্দটা মুখে আনলেন এবং এ-শব্দ উচ্চারণের পর কস্মিনকালেও যা করতেন না তা-ই করলেন আজ। প্রচুর হেসে উঠলেন।

কিন্তু সোমা তো জানতে পেরেছে তার স্বামী যে অবসরপ্রাপ্ত জজের কোর্টেও আসামী। স্বামী তার নিজের কাছে তা হোক কিন্তু অপরের চোখে তা-ই হবে অন্তত সোমার মতো স্ত্রী তাতে দুঃখিত না হয়ে পারে না!

—কী ব্যাজার হয়ে গেলে? তখনও রীডিংগ্লাস ছিল শশাঙ্কশেখরের চোখে। সোমার ঠোঁটের আশেপাশে ছোট, আবছা রেখাগুলোও তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন।

—কই, না তো! একটু হাসল সোমা।

—বাবু বেরিয়ে গেছেন?

সুপ্রিয়? তা তো গেছেই। কিন্তু কোথায় সোমা তা জানে না। মলুয়ার ঘরে উঁকি দেয়নি সে। সামান্য একটু ঘাড় কাৎ করলে সোমা।

—মলুয়া গেছে সঙ্গে?

—জানিনে। কিন্তু কাল তো বলেছিল মলুয়া খুব ভোরেই গীতার বাড়ি চলে যাবে!

—খুব ভোর হয়েছে তার এখন?

আবার ঠোঁটে সেই অল্প হাসি দেখা গেল সোমার। বিদ্যুতে বারবার চমকে-ওঠা মেঘের মতোই তো তরুণীরা হয়।

—গীতা বুঝি সেই মেয়েটি, কাল যে এসেছিল! শশাঙ্কশেখর কি একটি মুগ্ধ বা মধুর মুহূর্ত স্মরণ করলেন? তাঁর গলার পরিবর্তন হয়ে গেল। চড়া থেকে খাদে।

—হাঁ। খুব মিশুক, চটপটে।

—এখনকার মেয়েরা তো তা-ই হয়।

শশাঙ্কশেখর মনে আনতে চেষ্টা করলেন, এখনকার মেয়েদের নিন্দা তিনি কোথাও করেছিলেন কি না, লেকের বেঞ্চিতে, দেববাবুর কাছারীঘরে, উপাধ্যায়ের বসবার ঘরে, বীমাবাবুর দোতলার বিছানায় বসে কিম্বা এঞ্জিনীয়র বাবুর গোলবারান্দায়? না, তেমন-কিছু নয়। বরং লেকের ধারে যুবকদের মুখেই অশালীন কথা শুনেছেন এখনকার মেয়েদের সম্পর্কে। 'ওগো কাঞ্জিভরম তুমি পোঁছিলে অসম্ভ্রমে...' এক যুবকের মুখে শুনেছিলেন তাঁরা লেকের বিকেলে পদ্যটা। মনে আছে। তাঁর সহকর্মী কবির রোডের ঘোষবাবু ঘোষণা করেছিলেন, 'কাঞ্জিভরম্' মানেটা জানেন তো মশায়? কাঞ্জিভরম্ টিসু—শাড়ি, শাড়ি! পদ্যের মানেটা উপলব্ধি করে বেঞ্চির যে-ক'টা বাঁধানো দাঁতই চিকিয়ে উঠুক—ঠিক আজকের মতোই বিপন্ন বোধ করে শশঙ্কাশেখর বাড়ি এসেছিলেন এবং মলুয়াকে সেদিন বাড়িতেই দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন,—তুমি কাঞ্জিভরম টিসু ব্যবহার করো না তো? —ও-নাম তুমি জানলে কী করে দাদু? কৌতুকে হেসে উঠেছিল মলুয়া।

নিন্দা তিনি করেন নি কোথাও বসে—তবে প্রশংসাও করেন নি। এখন প্রশংসা করছেন। সোমা তাঁর ঘরে এসে কুশল জানতে চাইছে পর থেকে প্রশংসা করছেন সোমাকে। মনে-মনে। এবং মুখ ফুটে সুব্রতর কাছে—লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে লক্ষ্মী জুটিয়ে আনলাম—জানো। ছোট বৌ যে লক্ষ্মী তা শুনল সুব্রত কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া যে কে ঠিক বুঝতে পারল না। বাবা স্বয়ং, না সে নিজে, না সুপ্রিয়।

কিন্তু শশাঙ্কশেখর 'লক্ষ্মীছাড়া' কথাটা সমস্ত পরিবারেই চারিয়ে দিয়ে কথাটা বলেছিলেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর তার সংসার লক্ষ্মীছাড়া হল না তো কী? তিনি যেমন ছিলেন, মণিকা কি তেমন হতে পারল? নতুন বৌ যখন, সে-ও অবশ্যি প্রণাম করতে আসত ভোরবেলা—তা-ও শাশুড়ির নির্দেশে। তারপর তিনি গত হলেন, সুব্রত বিদেশ গেল—মলুয়া কি তখন জন্মেছিল,—না কয়েকমাস পর?—সুব্রতও এরোড্রোম ছাড়ল, মণিকাও বাপের ঘরে গিয়ে যেন বাঁচল। সোমা কেমন হবে এখনো ঠিক জানেন না শশাঙ্কশেখর। কিন্তু আজ, এখন, তাকে মেয়ের মতো ভাবতে মনে একটুও ইতস্তত ছিল না। তাঁর।

সোমা তো এখনকারই মেয়ে—মলুয়ার চাইতে বড়ো জোর তিন-চার বছরের বড়ো হবে—তাই এখনকার মেয়ের বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ মন্তব্য না শুনে খুশীই হল সে। মলুয়া-গীতাকে তার নিজের ভালো লাগুক আর না-ই লাগুক।

—মলুয়া বলছিল, গীতা নাকি আপনাদের উপাধ্যায় মশায়ের কী আত্মীয়া হন। পরিচ্ছন্ন হেসে বললে সোমা।

—তাই না কি? তাহলে তো পদ্মনাভকে জিজ্ঞেস করতে হয়! শশাঙ্কশেখর উৎসাহী হলেন আলাপে। আগেকার চাইতে একটু বেশি উৎসাহী।

—আপনি পড়ছিলেন? শ্বশুরের কোলে গীতা-তে চোখ পড়ল সোমার। মাথা নুইয়ে নিলে—কারো উপর শ্রদ্ধায় নয়, পড়ায় ব্যাঘাত করবার সঙ্কোচে।

—পড়ার যোগ্যতা কি আছে, উল্টে পাল্টে দেখছিলাম।

বিনীত কথাও বোধহয় বাঙ্ময় তপের অন্তর্ভুক্ত গীতা-পাঠে যা বলতে অভ্যাস করছিলেন শশাঙ্কশেখর। নইলে, ইচ্ছে করলেই তাঁর মনে পড়বে, তিনি যখন মৈমনসিংহে সাবজজ, এজলাসে বসেই রায়ে চোখ বুলুচ্ছিলেন একদিন, সরকারী উকীলবাবু—যথেষ্ট পদস্থ ব্যক্তি, ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন,—হুজুর কি রায় দেখছেন? ব্যাঘাতে বিরক্ত

হলেন সাবজজবাবু,—মুখ তুলে বললেন প্রশ্নকর্তাকে,—না, চিত্রাঙ্কণ করছি! উকীলবাবু নিশ্চয়ই ফ্যাকাশে হলেন কিন্তু তাঁর মুখে তাকাবার প্রবৃত্তি ছিল না সাবজজবাবুর। কিন্তু আজ? সোমা যদি জেরাও ধরে কোনো অপ্রীতিকর কথা বলবেন না শশাঙ্কশেখর। গীতার 'বাঙ্ময় তপ' ছাড়া এ আর কী?

প্রায় জেরাই ধরলে সোমা,—বাঃ, আপনারই যোগ্যতা নেই?

—ছিল—ছিল তোমার শাশুড়ি,—দেয়ালে তাকালেন এবার শশাঙ্কশেখর,—শুচিস্মিতা। যোগ্যতা এ'দের ছাড়া আর কার হবে!

এ-ধরনের কোনো ভাব মনে নিয়ে শাশুড়ির দিকে আগে তাকায়নি সোমা, মণিকা যেদিন প্রথম এই ছবিকে প্রণাম করাতে নিয়ে এসেছিলেন তাকে এ-ঘরে সেদিনও না। এখন তাকালো এবং মনে হল সোমার সে একটি পবিত্র, সরল মুখ দেখছে—যেমন ঘুমিয়ে থাকলে সুপ্রিয়কে অনেকটা দেখায়।

কিন্তু পবিত্রতা নিয়ে শশাঙ্কশেখর আর সোমা পাঁচ সেকেণ্ডও থাকতে পারলেন না, বাড়ি মাথায় করে এসে ঢুকল মহুয়া,—জানো দাদু—কাকিমা—শোনো—এইমাত্র দিদি টেলিফোন করলে, বাড়ি আসবে না। গীতাদির সঙ্গে বৈজয়ন্তীমালার 'ফ'ুলো কি সেজ' দেখতে যাবে! কেমন ফাঁকি বুঝতে পারছ?

—ফাঁকি? বুঝতে পারছিলেন না শশাঙ্কশেখর।

সোমা হাত বাড়িয়ে মহুয়াকে টেনে এনে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইল। মিশল মহুয়া এক মুহূর্ত কিন্তু ফাঁকির নমুনা বোঝাতে আলগা হয়ে বললে,—কাল আমি বলে রাখলাম, বৈজয়ন্তীমালা দেখব—দিদি রাজি হল। আজ, গীতা না ফিতা কে—তার ওখানে গিয়েই প্ল্যান পাল্টে দিলে!

হাসলেন শশাঙ্কশেখর,—গভর্নমেণ্টই প্ল্যান পাল্টান—তবে গভর্নমেণ্ট কি না শামুকের গতিতে পাল্টান—পাঁচ বছর পর-পর! এ তো মলুয়া— ক'ঘণ্টা পর পাল্টালো?

—ন্-না! দাঁড়ানো নাচের ভঙ্গীতে লাফাতে সুরু করলে মহুয়া,—কেন আমি বৈজয়ন্তীমালাকে দেখব না!

সোমা নীচু হয়ে মহুয়ার থুতনিতে হাত দিয়ে বললে,—মাকে বলেছো?

—বলি নি-ই আবার—ঠোঁট দু'টো মুখের ভেতর থেকে বাঁকা হয়ে গেল মহুয়ার, অনেকটা ফোটা গোলাপের পাপড়ির মতো।

শশাঙ্কশেখর উঠে দাঁড়ালেন,—বাবা কোথায়? এখনও কাগজ পড়ছেন।

—গিয়ে দেখতে পারো না? জজের উপর বিরক্ত হয়ে মহুয়া চলে গেল।

সোমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন জজবাবু,—ঠিক আমার মার মেজাজ পেয়েছে!

সোমা নিজের মেজাজটার কথাই ভাবলে। বলা যায়, বিচার করলে। মেজাজ সে দেখাতে পারছে না। দেখালে তো দেখাত সুপ্রিয়রই উপর। মলুয়া তো ঘরের মেয়ে—মলুয়া ছাড়াও গীতা-ফিতার মতো আরো অনেক মেয়ে যে সুপ্রিয়র আছে, তা কি সোমা বুঝতে পারছে না? খুবই পারছে। ভেবে তার মন খারাপ হতে পারত, মেজাজ দেখাতে পারত। কিন্তু কিছুই তার হয় না, কিছুই সে করতে পারে না। সন্দীপকেই ভাবে সে তখন—শান্তিনিকেতনের বিদ্যাভবনেই চোখ চলে যায় তার। দেখা হবে কি আর কোনোদিন? যেম্নি অলকের সঙ্গে দেখা হল? দেখা হলে তো এম্নি চমকে উঠবে সে, অবাক হবে। তারপর যদি কথা-ই বলে কী বলবে সোমা? সন্দীপ কী জিজ্ঞেস করবে? 'ভালো আছো?'

কেমন চোখ-মুখ হবে তার তখন? শান্তিনিকেতন থেকে যেদিন চলে আসবে সেদিন যেম্নি সে তাকিয়েছিল, বিষণ্ণ, তেম্নিই তো তাকাবে? যেন সন্দীপের প্রশ্নটা এখুনি শুনল সোমা। শুনল এবং ভাবল কী উত্তর দেবে সে। ভালো আছে কি সোমা? ভালো আছে। বাবার কাছে বলেছে সে, মার কাছে বলেছে, ভাই-বোন-আত্মীয়দের কাছে বলেছে। এখানেও সে দেখিয়েছে সে ভালো আছে। 'বাবা' বলেছেন,—মণিকার মতো আটপৌরে হয়ে থেকো না মা, বাড়ির বৌদের ওতে ভালো দেখায় না! রঙীন শাড়ি পরবে—ভালো ভালো রঙের। তা-ই পরে সে বাবার ঘরে আসে। দেখায় সে ভালো আছে। কিন্তু নিজেকে সে দেখাতে পারে কি, সে ভালো আছে? ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় একা দাঁড়িয়ে বলতে পারবে কোনোদিন,—সোমা, তুমি ভালো আছ—? জানে না। দাঁড়িয়ে এ-কথা সে আনেনি মনে, আনবে না। কিন্তু এখন? সন্দীপের জিজ্ঞাসায় কী বলবে সোমা? কিছুই না। শুধু সন্দীপের মুখের বিষণ্ণতাটা নকল করে তার মুখ চুপ করে থাকবে। চোখ কাঁপবে না, ঠোঁটও না। পাথর? কী জানি, পাথরই হয়ে যেতে হবে কি না তাকে। ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে মেঝে থেকে যখন চোখ তুলল সোমা, শশাঙ্কশেখর আর ঘরে নেই।

কিছুই করবার নেই এ-বাড়িতে। এখন কী করবে? কিছুই না।। মণিকার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে ছায়ার মতো। দিদি যদি দয়া করে দু'একটা কথা বলেন, সে-ও বলবে। তা-ও ছোট-ছোট কথা। অল্প কথা। দাদার পথে কখনো পড়লে দাদা তাঁর অপিসের হাসিই বোধহয় হেসে জিজ্ঞেস করেন,—ভালো? যেম্নি ফ্যামিলি-ফিজিসিয়ান মাঝে-মাঝে এসে রোগী পরিবারকে জিজ্ঞেস করেন। মলুয়া? মলুয়া বোধহয় সুখই পায় না তার সঙ্গে কথা বলে। বিয়ের আগে যে ভালোবাসেনি, স্বামীকেই প্রথম ভালোবাসতে এসেছে সে বোকা মেয়ের সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে? এই তো মলুয়ার ধারণা।

সোমাকে কি তাহলে বোকা-বোকা দেখায়—পাথর নয়? কিন্তু পাথরই তো সে হতে চায়! 'কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি—অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি—' পাথর যে-স্বপ্ন দ্যাখে সে স্বপ্ন দেখতে পারবে না সোমা? সোমপায়ী ইন্দ্রের ধর্ষণ—ধর্ষণ—ধর্ষণই চলবে দিবা-রাত্রি?

পটে-লেখা দেয়ালের মহিলার দিকে তাকালো সোমা। কী ভীষণ ময়লা দেখাচ্ছে তাঁর মুখ—কী ভীষণ...

উনিশ

খবরের কাগজ দেখা হয়ে গিয়েছিল সুব্রতর। অভিজিৎ রায়ের লেখাটার সুখ্যাতি সে-ই বাড়িতে প্রচার করেছে। বাবাকে যখন বলছিল, তখন সুপ্রিয় বেরোচ্ছে। প্রাইভেট সেক্টরের প্রচার সচিব নিশ্চয়ই পাব্লিক চয়েসের কথা ভাবছিল—যা শুধু তার পেশায় এলেই ভাবতে হয় তা নয়, সাহিত্যিকদের ভাবতে হয়, রাষ্ট্রনেতাদের ভাবতে হয়, মান-মর্যাদা-ভোট কুড়োতে ভাবতে হয়। কিন্তু কী আশ্চর্য, যে রাষ্ট্র আজ পাব্লিক সেক্টার তৈরী করে তুলছেন—সেখানে প্রধান মন্ত্রী প্রাইভেট চয়েসে তৈরী হবে। মোরারজি না শাস্ত্রী, তা বলবেন সপার্ষদ কামরাজ! সব জায়গায়ই বিপরীত চাল! ফলে, আমরা যেখানে আছি সেখানেই। নিউট্রেলাইজ্‌ড্‌ না হয়ে উপায় কী!

এ-ধরনের ছোট-খাট ভাবনা শেষ না করতেই শশাঙ্কশেখর এ-ঘরে এলেন। সুব্রত

উঠে দাঁড়াল। এখন বাবার এই ঘর এবং খবরের কাগজ। সচ্চিদানন্দবাবু সুস্থ থাকলে আসবেন—সুমিত্র তো আজকাল আর তার বন্ধু নয়, বাবারই বন্ধুব্যক্তি—সে-ও আসবে রববার সকালটা কাটিয়ে যেতে! 'পাব্লিক চয়েস'টা হয়তো সরে যাচ্ছে সুমিত্রর উপর থেকে, নইলে রববার সকালে তো জ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকের বাড়ি কনিষ্ঠদের তীর্থস্থান হবার কথা। আড্ডা আর বসে না বাড়িতে, 'প্রাইভেট চয়েসের'ই তাই ভক্ত হয়ে উঠছে পদ্মবিভূষণ ক্রমে!

কিন্তু শশাঙ্কশেখর খবরের কাগজ খুঁজলেন না। বললেন,—মলুয়ার টেলিফোন তুমি ধরেছিলে?

—না। হাসল সুব্রত,—টেলিফোন তো আজকাল মহুয়াই ধরছে—সব টেলিফোন।

শশাঙ্কশেখর হাল্কা হয়ে গেলেন,—দাও বেটিকে টেলিফোন-গার্ল করে!

সুব্রত হাসতে লাগল।

শশাঙ্কশেখর বসলেন। খবরের কাগজের দিকে একপলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। স্পর্শ করলেন না। 'অ্যাশ ওয়েডনেসডে'র খবর তিনি জানেন। তাঁর মনে হল, অন্তত তাঁকে দেখে ভাববার কথা যে তাঁর মনে হচ্ছে, কাগজটাতে যেন জওহরলালের চিতাভস্ম লেগে আছে। হয়তো মনে-মনে তিনি ইদানীংকার পড়াশুনো থেকে 'পিতৃমেধে'র মন্ত্রও উচ্চারণ করলেন: 'হে অগ্নে যঃ প্রেতঃ তে আহুতঃ চিতৌ মন্ত্রেণ সমর্পিতঃ।' যেন একটা দেশলাই জেবলে কাগজটা আগুনেও সমর্পণ করতে পারেন তিনি।

কিন্তু সুব্রত বললে,—অভিজিতের প্যারাগ্রাফগুলো পড়বেন, বাবা। সচ্চিদানন্দবাবু নিশ্চয়ই আসছেন আজ!

—জানো, আজ এম্নিতেই বেশ একটা আনন্দ অনুভব করছি! হাসলেন শশাঙ্কশেখর।

কেন তা না জানলেও সুব্রত শুনতেই পাচ্ছিল, বাবার গলা আজ বেশ হাল্কা। বললে সে,—ছুটিছাঁটার দিনে আমাদেরও হয় ও-রকম।

—আমার তো রোজই ছুটি কিন্তু রোজ যেমন নয়, আজ যেন তেমন একটা-কিছু মনে হচ্ছে!

—তার মানে হয়তো প্রেশারটা থেকে কিউরড হয়ে গেছেন।

—হতে-ও পারে!

কিন্তু প্রেশার কমুক আর আনন্দের সাগর থেকে বানই আসুক—তার কারণটা জজবাবু বিলক্ষণই জানেন। স্ত্রীসঙ্গ। যে-স্ত্রী গীতাপাঠ শুনতে চেয়েছিলেন তাঁর মুখে, তাঁকে আজ গীতাপাঠ শুনিয়ে এসেছেন তিনি। আজই যেন প্রথম। আজই যেন প্রথম শুনলেন স্ত্রী। আজই যেন তিনি শোনাতে পারলেন। নইলে ও-রকম স্বপ্নাচ্ছন্নতা হবে কেন তাঁর! সোমাকে একটু বেশি কেন ভালো লাগবে? এমন কি হয়তো মলুয়াকেও।

বাবা সুস্থ আছেন, শ্যাম্পেনের মতো ছুটির একটা মৃদু নেশা যেন সচকিত করে তুলল সুব্রতর স্নায়ু। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া যায় বেশ। পথের হাওয়ায় গোলাপী হয়ে উঠবে মন। নিউ মার্কেটে কি এখন গোলাপ পাওয়া যাবে। ফুল কেনে না সে অনেকদিন। কবে কিনেছিল? সে এখানে নয়। লন্ডনে। বিদেশিনীর মুখটা ঠিক মনে পড়ল না। তার এখনকার হায়াসিন্থ গার্লের মতো কি? ওরা সব দেশেই এমন একরকম হয়! ভাবনায় আর বেশি এগুলো না সুব্রত। বাবার সামনে এগোতে চাইল না মন। বললে,—আপনি একটু ভালো বোধ করলে, ঘুরে আসতাম!

খারাপ বোধ করলেও শশাঙ্কশেখর যা বলতেন তা-ই বললেন,—যাবে। বেশ তো

যাও। ছুটির দিন তো আউটিং-এর জন্যেই!

হাসি মুখে রাম দশরথের কাছ থেকে বনে যাবার অনুমতি নিয়ে গেল। নিউ মার্কেটের ফুলবনে। পার্ক ম্যানসন। ফ্ল্যাট নম্বর?

কিন্তু অচিরেই দৃশ্যে ভরত প্রবেশ করল। অলকের অলকাপুরী থেকে ফিরে এসেছে সুপ্রিয়। বাবাকে টেলিফোনের পাশে দেখে সুপ্রিয় খুশী হল না।

কিন্তু সুপ্রিয়কে দেখে আজ শশাঙ্কশেখর মুখ ফিরিয়ে নিলেন না। বরং এতোক্ষণ যে খবরের কাগজটাকে অচ্ছুৎ অশুচি মনে করেছিলেন তা হাতে টেনে নিয়ে উঠি-উঠি করে বললেন,—বসবে এ-ঘরে? বোসো?

আঙুলে বাঁ কানের লতিটা ঘষে ঘাড় নোয়াল সুপ্রিয়। কিছু বললে না।

শশাঙ্কশেখর উঠে দাঁড়ালেন, যেতে যেতে বলে গেলেন,—আমি ঘরেই আছি। দেববাবু এলে পাঠিয়ে দিও।

'হুঁ' 'হাঁ' কিছু না বলে সুপ্রিয় এসে টেলিফোনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডায়াল ঘুরিয়ে যে নম্বর নিল তা গীতার।

—হ্যালো। গীতা, না মলুয়া? সত্যি, চিনতে পারছিনে। টেলিফোনে তোমাদের সবার গলা এম্নি একরকম আসে! কী? মলুয়া পাশেই আছে? শোনো গীতা, আজ বিকেলে তুমি আসছ তো? না-না, ওসব বুঝিনে—বৈজয়ন্তীমালা দেখতে চাও, তো রক্তমাংসে দেখিয়ে দেব! বাঃ, আলাপ থাকবে না, বালিগঞ্জ পাড়াই তো আমার টারগেট! ভার্স ড্রামাটা নিয়ে এসো—নাট্যকারিণীকে শুক্লা গাঙুলির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। সে কে? তুমি কি কলকাতা আছো, না বোম্বেতে! শুক্লা গাঙুলিকে চেনো না? ও তোমাদের সিনেমার আকাশের তারকা-ফারকা নয়। চৌরঙ্গীর আকাশের নিয়ন-সাইন! অথচ—চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা! পদ্য। আমার হবে কেন? নাম? কেন বলব? ভার্সড্রামা লিখছ, পূর্বসূরীদের নাম জানো না? জানো? এলিয়ট? না-না, এলিয়ট রোড জানি—কাব্যের ট্রেন রবীন্দ্রনাথের স্টেশনে থেমে গেছে আমার। কী? মলুয়া হাসছে? পড়েছে না কি ও এলিয়ট? না। তবে? এই গীতা—শোনো। জরুরি খবর। হাঁ, আসবারই খবর। আসতেই বলছি। শুক্লাকে না-ই দেখলে—তোমার জামাইবাবুকে দেখতে এসো। কেন। বেশ, বলব না। কিন্তু ব্যাপার কী? কাল না গেলে ওখানে? তাহলে বলছ কেন জামাইবাবুর কথা না বলতে। আচ্ছা—আমার এখানেই এসো, শোনা যাবে। রাত হয়ে গেলে আসতে ক্ষতি কী? তোমায় পেঁাছে দেব। ট্যাক্সিতে কেন? দাদার গাড়িরও তো ছুটি আজ। তাহলে এই কথা।

ফোন রাখল সুপ্রিয়। কিন্তু এখন কোথায়? হাত উল্টে ঘড়ি দেখল। এগারোটা। তারপর বারোটা। এক ঘণ্টা সময় আছে সোমার মুখোমুখি না হবার।

কিন্তু সোমার কী করবার আছে? শ্রীনিকেতনী একটা মোড়ায় বসে সুরেনকে বাজার বোঝাচ্ছিল মণিকা। এখনো নীচে নামেনি। রোববার। সুব্রতর অফিসের তাড়া নেই। তাছাড়া, দাদা এই তো মাত্র বেরিয়ে গেলেন। তাড়া নেই দিদির। ঠাকুর জানে একটা ভারি ওজনের টিফিন খাইয়ে দিয়ে সাতটা থেকে ন'টা তার ছুটি। দশটায় আবার 'জনতা' নিয়ে বসলেই হবে। সোমা কী আর করবে? তার তো সব দিনই, সারাদিন ছুটি। মণিকার কাছেই গিয়ে সে অগত্যা দাঁড়াল। রোববার যে মাংস হয় মাছের উপর তা-ই সে শুনছিল। প্রত্যেক রোববারই হয় আর সুরেনই তা কিনে আনে কিন্তু প্রত্যেক রোববারই তাকে মনে

করিয়ে দিতে হয় পনেরো শ' গ্রাম মাংসের কথা। অবশ্য গড়িয়াহাট বাজারে ভালো পাওয়া না গেলে যে কসবা যেতে হবে তাকে তা সুরেন বিলক্ষণ মনে রাখে। (তা তার লাভ্‌স্‌ লেবারও বলা যায়, বিশুদ্ধ প্রেমের মেহনত। মাংস-কেনার আভিজাত্যে কসবার একটি নবীনা ঝি তার প্রতি লুব্ধ হয়েছে।)

পুনঃ পুনঃ পনেরো শ'-টা বোঝাচ্ছিল মণিকা সুরেনকে—শুনতেও ক্লান্তি লাগছিল সোমার। হাই তুলল। তবু দাঁড়িয়ে রইল সে। নইলে আর কোথায় যাবে? একা একা ঘরে? বাড়িতে একটা রেডিও নেই। কেউ গান পছন্দ করেন না। সুপ্রিয়কে সে বলেছিল, —তাহলে একটা গ্রামোফোনই আনো। —আর তুমি সারাদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবে? তা-ই না? জানো ভালো জিনিস ব্যবহারে-ব্যবহারে শূকরের মাংস হয়ে যায়। জানবে না—ওতো আর রবীন্দ্রনাথ লিখে যাননি! স্ত্রীর কাছে সুপ্রিয় মুখোশ খুলে দাঁড়ায়, দেখায় সে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত মোটেও নয়।

স্ত্রীর কাছে কে না মুখোশ খোলে? অনেক বুদ্ধ অবতারই তো নৃসিংহ অবতার স্ত্রীর কাছে। কিন্তু তা-ও বোধহয় ভূমিকাতেই অবতরণ। সুপ্রিয় অন্তত জানে পাশব উপভোগে সোমাকে পেয়েই সে তাকে ঘৃণা করতে সুরু করেছে। সুপ্রিয় অন্তত জানে মেয়ের মুখের রবীন্দ্রসঙ্গীতের পালিশ ওদের ফেস-পাউডার ছাড়া কিছু নয়।

এখন সে ভাবছিল, মাছমাংসমসলাআনাজ নিয়ে ব্যস্ত যে-মহিলাটি তিনি কি পছন্দ করতে পারেন টেরিকটনের পোশাকে যে ভদ্রলোকটি বেরিয়ে গেলেন তাকে, বা সেই দিশী-ফিরিঙি এই ঘরের বউকে পছন্দ করতে পরেন? এণ্টনি ফিরিঙি আর ক'টা হয়? অথবা 'বাবা'র ঘরের দেয়ালে যে যন্ত্রণার মুখ দেখে এলো সোমা এইমাত্র, সে-মুখ কি তৃপ্তিতে হাসিখুশী এই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে পছন্দ করতেন, যেদিন তিনি আমাদের উপাচার্যের মতো বিচারপতি ছিলেন? হতেই পারে না, হয় না। তবু থাকতে হয় এক সঙ্গে, থাকে মানুষ। বনের পশুকেও পোষা করে ঘরে রাখে। একটা ময়ূর-পোষার কথা বলবে না কি সে সুপ্রিয়কে! কেকাধ্বনি ভালো লাগবে নিশ্চয়ই সুপ্রিয়র।

সোমা যখন নীচে নেমে যাচ্ছিল তখন বোধহয় রবীন্দ্রনাথকেই ভাবছিল : 'ময়ূর, করোনি মোরে ভয়!' ঠোঁটে হাসির ঢেউ উঠছিল তার। কিন্তু সে ভাবেও নি, বসবার ঘরে সুপ্রিয়কে পাবে, বাবাকে বা মহুয়াকে নয়।

নববধূর মন্থর-চাঞ্চল্যে বসবার ঘরেই এলো সোমা।

সোমার সঙ্গে মুখোমুখি হবার ভয়টা ফ্যাকাশে করে তুলল সুপ্রিয়র মুখ। শুকনো তালু থেকে আশ্চর্যবোধক একটা শব্দ বেরোল,—সোমা! দন্ত্য 'স'-টা তালব্য হয়ে গেল।

—এলাম তোমাকে বলতে—ময়ূর পাওয়া যায় নিউমার্কেটে?

—সে কি কোনো ফুলের নাম? শান্তিনিকেতনী? ধাতস্থ হয়ে গেল সুপ্রিয়।

—না-না, অশোকের রান্নাঘরে যার মাংস রান্না হতো! হেসে উঠল সোমা—নিঃশব্দ, হয়তো বা বীভৎসই সে-হাসি।

কুঁড়ি

বাঁমাবাবুর বাড়ি যাবার মুখে যে মহারাজ অমৃতানন্দ এসে হঠাৎ হাজির হবেন তা জমিদারনন্দন পিনাকীরঞ্জন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। পরমুহূর্তেই অবশ্যি ভাবলে

পিনাকী, বীমাবাবু তো গৃহী হয়েও সচ্চিদানন্দ, তাঁর বাড়ির আনন্দোৎসবে যাবার মন তৈরী হওয়া মাত্র সন্ন্যেসী অমৃতানন্দের মন তা ক্রুশ করল। মনোবিভূতি তো এঁদের সাংঘাতিক—ভূত-ভবিষ্যতে প্রসারিত। পিনাকী অবশ্যি জানে না, শুনেছে। মাধুরীর মুখে শুনেছে। মহারাজ অমৃতানন্দর প্রবেশ-পথ তো মাধুরীই খুলে দিয়েছিল। গোলপার্কে মাঝে-মাঝে ট্যাক্সিতে গিয়ে সে তো সিমলের সন্দেশই কিনে আনত না মহারাজদের কিছুকিছু আনন্দ-সন্দেশও সংগ্রহ করে নিয়ে আসত। আমার তো নাম পাল্টে শম্ভূরঞ্জন হলেই ভালো ছিল—তীর্থদর্শনে আমাকে তো সঙ্গী নেয় না মাধুরী, নেয় ভৃত্য শম্ভূকেই। ভৃত্যও জানে, এ হল কর্ত্রীর সংসার—আমি তো কবেই বাতিল, সন্ন্যেসি! রঙ্গভরা কথাগুলো ভাবে পিনাকী অমৃতানন্দকে দেখলেই।

বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হবে। দোহারা। লম্বাটে টানা মুখ। ছোটছোট চুল। হঠাৎ মনে হয় প্লেয়ার্স ছাঁট। কিন্তু গেরুয়া। খেলোয়াড়ও ভাববার অবকাশ নেই। অমায়িক কথা। মুখের ফর্সা রঙের মতোই যেন ফর্সা কথাগুলো। শিক্ষিত। অন্তত পিনাকীর চাইতে ঢের বেশি। এলে মাধুরী এই অমৃতানন্দকে দিয়ে গৃহশিক্ষকের কিছু-কিছু কাজ করিয়ে নিতে চায়। বলে,—দুলু-বুলুকে কিছু বলে যাবেন না? দুলু বুলুর পড়ার ঘরে গিয়ে বলেনও তিনি। কিন্তু কী বলেন, পিনাকী জানে না, খোঁজ নিতেও ইচ্ছে নেই। জমিদারের ঘুণধরা রক্ত যে কোনোদিনই বিবেকানন্দ হবে না তা সে মৃত্যুর মতোই সত্য বলে জানে।

পিনাকী অমৃতানন্দর দর্শনেই হার্দ্য সম্ভাষণ জানালে,—আসুন, মহারাজ!

—ভালো? সব ভালো তো?—ক'দিন আসতে পারিনি—তিনসুকিয়া যেতে হয়েছিল। অমৃতানন্দ সাবলীল ভঙ্গিতে একটি চেয়ারে বসলেন।

ছোট খাট খাট থেকে উঠে দাঁড়াল পিনাকীরঞ্জন,—এখানে আপনার আরাম হবে।

—তা বটে! হেসে উঠে এলেন অমৃতানন্দ,—এ তো আর দুলুবুলুর পড়ার ঘর নয়! খাটেই আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন মহারাজ।

—ওদের দেখে কী বুঝছেন? কম্যুনিষ্ট হয়ে যাবে না তো! পিনাকী ভেবে নিয়েছিল, জওহরলালেরও কম্যুনিষ্ট হয়ে যেতে বেশি বাকি নেই। বিত্তবানের ছেলের বিবেকানন্দ হবার ভয় নেই কিন্তু কম্যুনিষ্ট হবার পথ প্রশস্ত।

—আজকাল অল্পবিস্তর কে তা নয় বলুন! শিক্ষাদীক্ষায় উজ্জ্বল দেখালেন অমৃতানন্দ,—সমাজসেবা কার না মনে? আমি নাম বলব না, আপনাদের পাড়ারই একজন বিত্তবান আমাকে একটি গ্রাম দান করতে চান, শর্ত: শহরের সমস্ত সুযোগ-সুবিধে ওখানে করে দিতে হবে—টাকা যা লাগে তিনি দেবেন। হওয়াটাই চান তিনি।

—খুব ভালো কথা! গাঁয়ের লোক ভীষণ ধূর্ত, মশায়—শেয়ালের সঙ্গে বসবাস করেই ওরকমটা হয়েছে। জানেন তো, আগে শেয়ালগুলোকে দহে ডুবিয়ে মেরে তবে কলকাতা হয়েছিল। মিছিমিছি তো শেয়ালদহ নাম নয়—বৈষয়িক আলাপে উত্তেজিত হয়ে উঠল পিনাকী, ইংরেজরা যে কলকাতা তৈরী করেছিল, সে ইতিহাসও হয়তো মৃদু ব্যথার মতো একটু খুঁচিয়ে দিল তাকে; কথা শেষ করল না সে, একটু থেমেই বললে আবার,—গাঁয়ে গিয়ে প্রথমত শেয়ালগুলোকে মারুন, মশায়। বৈষয়িক উত্তেজনাতেই হয়তো 'মহারাজ', 'মশায়'—সম্বোধনে চলে গেল।

আবার হাসলেন অমৃতানন্দ। ক্ষমাসুন্দর হাসি। বললেন,—সাহস হয় না, জানেন?

ওই শর্তে সাহস হয় না। সিমেণ্ট কোথা পাব? ধরুন, টিউবওয়েলে তো সিমেণ্ট দরকার। জলটাই আসল। যেম্নি মানুষের জীবন ওটা—তেম্নি চাষবাসেরও তো—গাঁয়ের স্বাস্থ্যের দিক থেকেও। কিন্তু কলকাতায় নিউ ইয়র্কের মতো মস্ত-মস্ত বাড়ির প্ল্যান—সব সিমেণ্টই তো ওখানে যাবে!

—আপনাদের গোলপার্কের বাড়িও তো কম সিমেণ্ট খায় নি পিনাকীও হাসলে।

—ওটা বিদশী-অতিথি-শালা। লাইব্রেরী। সমাজসেবারই তো বৃহত্তর দিক!

অমৃতানন্দকে কি বিবেকানন্দর মতো দেখাচ্ছে খানিকটা—তাকিয়ে ভাবতে লাগল পিনাকী! দত্তরা বেশ সুপুরুষ। যতো বাগানের দত্তরা। মাধুরী যে এখনো সুন্দরী তা-ও ভাবল পিনাকী। কিন্তু আজ হঠাৎই মনে এলো তার, মাধুরী তেম্নি এক দত্ত পরিবারের মেয়ে বলেই সন্নেসী বিবেকানন্দের রক্তের টান ভুলতে পারেনি। বেলুড়মঠে সে যায়নি। কিন্তু গোলপার্কে যেতো সে সিমলার রসে নয়, সে-রক্তেরই টানে।

গম্ভীর হয়ে পিনাকী দরজায় চোখ নিয়ে বললে,—যান, ভেতরে যান, ওঁরা আছেন সব।

—তা-ই যাচ্ছি। কাজটা সেরে আসছি। চটপট উঠে অন্দরে চলে গেলেন অমৃতানন্দ।

কাজ আর কী? দেখাশোনা করা আর খবরবার্তা নেওয়া। জন-সংযোগ। সেবার কাছে আছেন যাঁরা, করতেই হয় তাঁদের—জনসংযোগ রক্ষা করতে হয়। বাছবিচার নেই। যেম্নি উদ্বাস্তুদের সঙ্গে তেম্নি—এই তো শোনা গেল কে এক বিত্তবান, মহারাজের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস—ধর্মবিশ্বাস নয়, কর্মবিশ্বাস। নিশ্চয় সে-বিত্তবান একটি গাঁয়ের মালিক! জমিদার কি গেছে? তাঁরা সব অন্য নামে রয়ে গেছেন। যেমন তার শ্বশুর-ঘর। কলকাতার উপর দশবারো খানা বাড়ি—মস্ত জমিদারি! আছেন জমিদার। এইতো এম্নি জমিদারের সঙ্গে সংযোগ মহারাজের যেম্নি উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সংযোগ। তেম্নি হয়তো এখনকার কুলীন এঞ্জিনীয়রদের সঙ্গেও—নইলে পাড়াগাঁকে শহর বানাবেন, কাদের সাহায্যে?

শহরে আর পিনাকীর ইচ্ছে নেই। তাই পাড়ার এঞ্জিনীয়রবাবুকে মনে এলেও—যাতায়াতে তাঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে, এমন ইচ্ছা পিনাকীর মনে এলো না। বাঁশদ্রোণী যাওয়া তো তার একরকম ঠিকই। কিস্তিটা পেলেই হয়। মাধুরীর আপত্তি হবে না। স্কুল-টুল থাকলেই তার হল। সে-ও তো আজকাল জন-সংযোগের এক পাণ্ডা হয়ে উঠেছে। বীমাবাবুর স্ত্রী, পুত্রবধূ, দৌহিত্রীর জিজ্ঞাসাবাদেই নেশাগ্রস্ত আজ। তাছাড়া মহারাজের সন্ধান তো তার উদ্বাস্তুদের হাতে কিছু টাকা ঢালবার জন্যেই। মাধুরীর তহবিল থেকে কতো গেছে এ-পর্যন্ত তার খোঁজ নেয়নি পিনাকী, নিতে চায়নি। স্ত্রীধনে তার কেন উৎসাহ থাকবে? তার পাঁটা সে ল্যাজেই কাটুক আর মাথায়ই কাটুক—পিনাকী আপত্তি জারি করতে যাবে কেন? তাই শেষ কিস্তির টাকাটা হাতে এলে সে যখন বাঁশ-দ্রোণীতে বীমাবাবুর জমির অংশীদার হতে যাবে, তখন মাধুরীরও আপত্তি হতে পারে না। এ-বাড়ি থাকে তো থাকুক না, মাধুরী এখানে থাকবে, থাক! সে আর এখানে নেই। ১৯৬৫-তে যদি গড়িয়াহাটা ব্রীজ শেষই হয় তাহলে এ-ও দ্বিতীয় চৌরঙ্গী না হয়ে যাবে না। আসা যাবে তখন বড়োদিনে। দেখা যাবে দিশী মেম-সায়েবদের ফূর্তি! এখনকার গানে, খানায়, পোষাকে তো আধাসায়েব বনেই গেছে বাঙালী না হয় দু'বছর পর পুরো সায়েবই দেখা যাবে! যোধপুর ক্লাব আবার।

আর যাঁর বাড়িতে সে আজ নিমন্ত্রণে যাচ্ছে—সেই বীমাবাবু—তাঁর পুত্রটিও বা কী?

কেউ বলবে অভিজিৎ রায় বাঙালী? রয় অ্যাভন-ট্যাভন একটা নাম নিয়ে নিলেই পারে!

অ্যাভন আর শেক্স্পীয়ার নিয়ে যা মাতলামি চলছে, তাই হয়তো অ্যাভন-নামটা মনে এলো পিনাকীর। সঙ্গে সঙ্গে মনে এলো যৌবনে শেক্স্পীয়র পড়ার দিনগুলো। মল্লিকের তখনই রাত্রিতে ঘুম হত না—এখন তো আসবেই না হয়তো আধেক রাত ব্লুফক্স টুইস্ট করে এলে কারো ঘুম হয়—সায়েবদের হতে পারে। তখন বলত মল্লিক,—জানিস, পিঙ্কু, কোন্ পাপে লেডি ম্যাক্বেথ মা পেয়েছি? বাবা ঘুমোবেন না ভেবেছিলেন তাই মার মতো সঙ্গেনী জুটিয়েছিলেন। এ-রক্তে ঘুম নেই। কডর শ্যাল শিলপ নো মোর। জানি তাই ব্রোমাইড ধরেছি! ব্রোমাইড থেকে মদে খুব সহজেই প্রমোশন পেল মল্লিক—হয়তো বিলেত যাবার আগেই। হচ্ছে তো! শেক্স্পীয়রের চরিত্র বাঙালীদের মধ্যেই হচ্ছে! তার পৈতৃক পাড়ায়ই হয়েছে! পেনেটিতে যাও—এক পড়ন্ত জমিদার বাড়িতে এখন না-হয় রবীন্দ্রোৎসব হয়। দেয়ালে তাকাও—সব অয়েল-পেণ্টিং—সায়েবদের পেছনে কতো তেল-খরচ। রাঁধা নাচাবার জন্যে নয়। লাট-বেলাটের মেজাজ খোশ রাখবার জন্যে। সায়েব চিত্রকরের আঁকা ওথেলোর দৃশ্যাবলী! "ওথেলো" বইটা তো মেমদের সাবধান করবার জন্যে! খবর্দার, নেটিভদের সঙ্গে যেও না—গেলে ডেসডিমোনা হবে!

এসব ভাবতে গিয়ে খুবই আরাম পেল পিনাকী। তার যদি সিগারেটের অভ্যাসও থাকত, তাহলে এই আরামে একটা সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে দিব্যি পাঁচ-দশ মিনিট তার বাগানের ফলফুল গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারতো!

বাগানের দিকে সে তাকালো ঠিক কিন্তু নাকে সিগারেটের আমেজি গন্ধ নিয়ে নয়। সেদিনকার সেই গান্ধীপোকাটার গন্ধই যেন কী এক স্নায়বিক রহস্যে নাকে এলো তার! হয়তো গান্ধীজিকে মনে পড়ল আর গান্ধীজিকে যে সে কোনোদিনই পছন্দ করতে পারেনি তা-ও হয়তো মনে এলো! তিনিই তো সুভাষ বোসকে তাড়ালেন! শৌলমারির সাধু কি সুভাষ বোস? জিজ্ঞেস করলে হয় মহারাজকে!

অন্দর থেকে সদরে এলেন আবার অমৃতানন্দ। পেছনে সশ্রদ্ধ মাধুরী।

শৌলমারির কথা ভুলে পিনাকীরঞ্জন হয়তো এখন মাধুরীর পরিবর্তিত মুখটাই এক নজর দেখে নিলে। এমন দেখা যায় আজকাল মাঝে-মাঝে মাধুরীকে। মার্ মুখে কি দেখেছে পিনাকী এ-ধরনের কোনো ভাব? দেখেছে। পুজোর ক'টা দিন। দুর্গা-ঠাকুর যদ্দিন মণ্ডপে থাকতেন, মাত্র সে-ক'টা দিন। বাবাকে ভয় করতেন মা কিন্তু ভক্তি হয়তো করতেন না। ভক্তি। ভক্তিই বোধহয় বলা যায় একে, যা সে এখন মাধুরীর মুখে দেখল আর দেখেছে মাঝে-মাঝে যখন সে বাবার ফটোটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তখন। আমার সামনে কখনো এ-মুখে দাঁড়ায়নি মাধুরী—দাঁড়াবেও না—কথাটা নিজেকে শুনিয়ে একটু হাসলে পিনাকী। তারপর মহারাজকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালে,—এ-পাড়ায় সবার সঙ্গে দেখাশোনা শেষ তো?

—এ-পাড়ায় আর কোথায় যাই—ওই আপনাকে যাঁর কথা বললাম, তিনটে চা বাগান আছে তাঁর আসামে—তিনিও দয়া করে মাঝে-মাঝে স্মরণ করেন তা-ই যাওয়া। দরজায় দাঁড়িয়েই বললেন অমৃতানন্দ, ঘরে এলেন না।

আজ যে শম্ভুকে নিয়ে বেরিয়েছিল মাধুরী তা শুধু রুপোর বাটি পালিশ করাবার জন্যে নয়, মহারাজেরও খোঁজ নিতে! হাল্কাভাবে কথাটা ভেবে হাল্কা কথাই বললে পিনাকী,—তা আপনিও তো তিনসুকিয়া ঘুরে এলেন—চা-বাগানবাবুকে নিশ্চয়ই বাগানের

খবর দিতে পারবেন!

—অবশ্যি তিনি বলেছিলেন যাবার তারিখটা জানিয়ে যেতে, তাঁর বাগানের ম্যানেজারদের লিখে দিতেন যেখানেই যাই সুব্যবস্থা করতে। কিন্তু হঠাৎ যেতে হল—তারিখটা জানানো হয়নি। হাসতে লাগলেন অমৃতানন্দ।

এটুকু বুঝবার ক্ষমতা ছিল পিনাকীরঞ্জনের, যাঁরা সেবার কাজে আছেন, তাঁদের আর সেবার দরকার হয় না। বললে সে,—চা-বাগানবাবু হয়তো আপনাকে পাব্লিক রিলেশন অফিসার করতে চান। সেই অজ্ঞাত বিত্তবানের উদ্দেশ্যে বিদ্রুপ-বাণ নিক্ষেপ করে পিনাকী হেসে উঠল!

—সে যোগ্যতা আমার কোথায়! আমি তো জ্ঞানীগুণীকৃতীসমাজে তাঁদের কথাবার্তা শুনতে আসি—কারো সঙ্গে সংবসনে যাবার যোগ্যতা কই?

'সংবসন' কথাটার মানে আন্দাজ করে পিনাকী বললে,—আপনার গেরুয়ায় ঢের শান্তি, মহারাজ—যাবেন না শাদা-পোশাক-পরা শান্তির হরবোলাদের সঙ্গে কথা বলতে!

—কিন্তু শীলম্ সংবসনাৎ জ্ঞেয়ম্—ঘনিষ্ঠতায় না এলে কার স্বভাব জানব বলুন। কথাটার প্রায় অর্ধেক মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বললেন অমৃতানন্দ। তারপরই যাবার তাড়ায় বলে উঠলেন,—আচ্ছা—চলি আজ।

এতক্ষণে কথা বললে মাধুরী এবং দুঃখিত মুখে,—জানো, স্বামীজি একটুকিছু মুখে নিলেন না!

—আপনার সিমলের সন্দেশ তো—আরেকদিন হবে! স্বামী-স্ত্রী দুজনের কাছেই ঘাড় কাৎ করে সম্মতি নিয়ে অমৃতানন্দর ঋজু দেহ দৃশ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

শ্রদ্ধা, ভক্তি, দুঃখ প্রভৃতি সুলভ ভাবগুলো মাধুরীর মুখ থেকে তিরোহিত হয়ে তা স্বভাবে ফিরে এলে পিনাকী বললে,—তৈরী হয়ে নাও—ক'টা বাজে?

—আমরাও নিমন্ত্রণে যাই আর দুলু-বুলুও ফাংশানে, সভায় যাওয়া সুরু করুক। সুরু তো করেইছে—পড়াশুনো কিছু হবে না! মাধুরী ছেলেদের শিক্ষা-দীক্ষা না-হওয়ার আশঙ্কায় নিজেদের দায়ী করে বিষণ্ণ হল।

—মহারাজ বললেন—পড়াশুনো হবে না?

—তিনি বলবেন কেন? তিনি তো আমার কথা শুনে হেসেই উঠলেন! ও'দের ওখানে ছেলেরা ভালো ফল করে—হাসবেন না!

দুলুবুলুর জন্যে মোটেও চিন্তিত না হয়ে চিন্তিত দেখিয়ে বললে পিনাকী,—হুঁ।

—আমি তো বললাম স্বামীজিকে—দু'টি গরীব ছেলের পড়াশুনোর সমস্ত খরচ দেব, তাদের আশীর্বাদে যদি দুলুবুলুর কিছু হয়! তোমার যা-কিছু হয়েছে, কেন? শোভা-বাজার-বাগবাজারের কোন্ গরীব ছেলে শ্বশুরমশাই-এর হাত থেকে স্কুলের মাইনে না পেয়েছে!

দত্ত-বাড়ির মেয়ের হাত খোলা, হাটখোলার মানুষরাও পিছিয়ে ছিলেন না কিন্তু সে-সব ভাবনায় নিবিষ্ট হল না পিনাকী, কোনো ভাবনায়ই নিবিষ্ট হতে চায় না সে, বিশ্ব-সংসারটা যে চলছে কোন্ ভাবনায়, শুনি? এমন একটা প্রশ্ন করেই সে ভাবনার মাছিগুলোকে তাড়িয়ে দেয়। এখনও নিশ্চিন্ত মনে স্ত্রীর সঙ্গে পরিহাসে সময়ক্ষেপ করতে চাইল সে, যে সময়টুকু হাতে আছে বীমাবাবুর বাড়ি যাবার আগে,—বাবা দাতা না হলে কি দত্তবাড়ির মেয়ে ঘরে আনেন?

—কিন্তু তুমি কী-টা হলে শুনি? মাধুরী ঠোঁট কামড়ে হাসলে একটু।

—কিছুই না। কিছু যে হতেই হবে তার কী মানে আছে?

—বেশ, না হলে। কিন্তু দুলুবুলুকে তো তোমার মতো বসিয়ে রাখব না!

—বসিয়ে রাখবে কেন? লক্ষ্মীছাড়া করে দাও!

—হাঁ, তোমার এই ছোট-খাটের সিংহাসনে তুমি নারায়ণ শিলাই হয়েছ।

—তবু তোমার কাছে নারায়ণ শিলা—কেউ তোর তার আজ কষ্টিপাথরেরও দাম দেয় না।

—কী করে দেবে? স্যাকরারাও তো না কি উজাড়!

—সবাই উজাড় হবে, দাঁড়িয়ে থাকবে কতোগুলো লোহালক্কড়!

লোহালক্কড় চুম্বক-শক্তির পাল্লায় পড়ে কিন্তু লোহালক্কড়ের যে চৌম্বক শক্তি আছে, তা জানা ছিল না পিনাকীর। হঠাৎ মাধুরীকে ঘোমটা টেনে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখে এবং তার স্থলাভিষিক্ত এঞ্জিনীয়রবাবুকে দেখে অবাক হয়ে লোহালক্কড়ের আকর্ষণের কথাটাই ভাবলে পিনাকী। কোনো দিন জজবাবুর এই 'যন্ত্ররাজ' এ-বাড়ির মাটিতে পদার্পণ করেছে বলে মনে পড়ল না তার। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? আজকের সারাটা দিনের হাল্কা মেজাজের বশেই পিনাকী এঞ্জিনীয়রবাবুকে অভ্যর্থনা জানালেন,—কী সৌভাগ্য—এঞ্জিনীয়রবাবু, আসুন—বসুন, না এখানে কেন? চেয়ারটাতেই বসুন।

—চৌকিতেও আপত্তি ছিল না—হাসি-হাসি মুখে বললেন অসিতরঞ্জন,—তবে কি না সারা জীবন তো টেবিলেই কাজ করেছি—চেয়ারে লোভ রয়ে গেছে! হাতের মুঠোর মোড়কটা তখনও দেখালেন না তিনি।

—তবু খাট-চৌকির লোভ কার না থাকে—মুখের মিহিন পর্দায় হাসির হাওয়া লাগল পিনাকীর,—সারাদিন টেবিল-চেয়ার করলেও তো রাত্রিতে খাট-পালঙ্গ চাই!

যে মহিলাকে সরে যেতে দেখলেন অসিতরঞ্জন তিনি যে বিগত-যৌবনা নন, সে-কথাই হয়তো ভাবলেন তিনি, যদিও সকাল থেকে শুরু করে ঠিক আগেকার মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি শুচিতায় সমস্ত সময়টাই যাপন করছিলেন। বিয়ের আলাপে কুমারীরা যেম্নি রাঙা হয়ে ওঠে, যৌন ইঙ্গিতে বিবাহিতরা তেম্নি খানিকটা চাঙা হতে বাধ্য। একটু সোজা হয়ে বসে অসিতরঞ্জন বললেন,—আমাদের মশায়, রিটায়ারমেন্ট ফ্রম এভ্‌রিথিং। হাতের মুঠো খুললেন অসিতরঞ্জন,—গিয়েছিলুম দক্ষিণেশ্বর! কিছু প্রসাদ। স্ত্রী বললেন, তীর্থের প্রসাদ প্রতিবেশিদের মধ্যে বণ্টন করতে হয়। নিয়ে এলুম আপনার জন্যে।

হাত বাড়িয়ে মোড়কটা হাতে নিয়ে বললে পিনাকী, কী অদ্ভুত যোগাযোগ এঞ্জিনীয়র-বাবু—এইমাত্র বেলুড়ের এক মহারাজ পদার্পণ করে গেলেন আর তিনিও গেছেন আপনি এলেন দক্ষিণেশ্বরের প্রসাদ নিয়ে! আমার বোধহয় দিন ফিরল!

এবার এঞ্জিনীয়রবাবু সচ্চিদানন্দবাবুর কথার মোড়ক এখানে আসার আসল অভিপ্রায়টা উপস্থিত করলেন,—দিন তো ফিরেইছে—সচ্চিদানন্দবাবুর মুখে যা শুনলাম! বাঁশদ্রোণীতে না কি জায়গা নিচ্ছেন। বেশ জায়গা—যেম্নি নিরিবিলি তেম্নি সুন্দর। কী রকম কন্‌স্ট্রাকশান হবে, ভাবলেন কিছু? হাসিতে বেশ তীক্ষ্ন দেখালেন এঞ্জিনীয়র।

মাধুরীর সঙ্গে আলাপে যে লোহালক্কড়ের কথা পেড়েছিল পিনাকী তা-ই এখন মনে পড়ল। কিন্তু তা কী বাঁশদ্রোণীতে বাড়ি করার মন থেকে? না। কিন্তু মনের গভীরে কী সব থাকে মানুষের, কে বলবে? হাসল পিনাকী, বললে,—তেমন কিছু ম্যাচুর করলে

বাঁমাবাবু আর আপনিই তো খবর পাবেন সর্বাগ্রে!

দক্ষিণেশ্বর ভ্রমণে মিত্রার খানিকটা সুস্থতাই নয়, আরেকদিকেও তেমনি যে খানিকটা ফল হাতেহাতেই পাওয়া যাবে, তা দেখে এঞ্জিনীয়রবাবু কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজিয়ে নিলেন।

একুশ

বাড়ি ফিরতেই হবে। ভাবছিল অভিজিৎ। এদিকে মেয়রের ডাকে ময়দানে যে জন-সমাগম আজ তার উপর সেকেণ্ড লীডার লিখবার তলবে অফিসঘরে অভিজিৎকে এখনো বসে থাকতে হচ্ছে। এখন ক'টা? হাতঘড়ি দেখল অভিজিৎ। সাড়ে ছয়। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের একটা কথার উপরই চোখ নিল সে এই তৃতীয়বার: 'জওহরলালজি ওয়াজ এ ম্যান অব প্রোফাউণ্ড সিম্প্যাথি—' কার উপর সহানুভূতিশীল ছিলেন পণ্ডিতজী? ময়দান-সভার প্রিণ্টটার দিকে তাকাল অভিজিৎ। স্টাফ-ফটোগ্রাফারের তোলা ছবি। প্রথম সারির কয়েকটি মেয়ে অধোবদন। আর কেউ না। বিশেষ একটি বিবাহিতা মহিলা। মহিলারা না কি পণ্ডিতজীকে বীর ভাবতেন! হেলেনিক সংস্কৃতি এখনো বেঁচে থাকলে কী কাণ্ডই না হ'ত! হেলেনিক! শুক্লাকে মনে পড়ল অভিজিতের। ও কি বলেছিল ওদের পূর্ব-পুরুষের কালচার হেলেনিক ছিল? যাক্ গে, শুক্লা বিবাহিতা নয়। গৌরী, মল্লিকা এরা সব বিবাহিতা। সভায় এলে হয়তো ওই মহিলার মতোই অধোবদন হত। মোটের উপর অভিজিৎ এমন এক পুরুষ নয় যাকে ওরা বীর ভাবতে পারে।

কলমটা রেখে অভিজিৎ একটা সিগারেট ঠুকে ঠোঁটে নিলে। প্রথমত, সিগারেট মহিলাদের পরম শত্রু। দ্বিতীয়ত, রাত জেগে পড়াশুনো। সুরাটা কি তেমন? না-না—ওটা তো বীরভোগ্যা! হেসে অগ্নিসংযোগ করলে অভিজিৎ তার সিগারেট!

কী করতে যে মানুষ মানুষের কাছে আসে! সিম্প্যাথি? দুঃখে বিষণ্ণ হতে আর সুখে হাসি-হাসি? অসম্ভব। দরকার ছাড়া মানুষ কারো কাছে যায় না। পণ্ডিতজী মাঝে-মাঝে পর্বতের ডাকে সব ছেড়ে-ছুঁড়ে পালাতেন। কেন? তাঁর বিপন্ন মন দেখতে পেতো সন্ধ্যার হিমালয়ে গোলাপী রঙ আর আত্মার চোখে দেখতে পেতেন তুষারের শুভ্র প্রশান্তি!

বিপন্নতা আর প্রশান্তি। আছে অভিজিতের? বাবা-মা, গৌরী-অমিতব্রত-পারমিতা আর যে বাচ্চাটা এলো—সবাই মিলে তারা একগুচ্ছ গোলাপ! তাছাড়া আর কী? শুধু সাদা জিনে প্রশান্তি। 'লাইফে'র মার্কিনী জীবনটাকেও মনে হয় নিস্তরঙ্গ!

নিজের রচনার দিকে চতুর্থবার চোখ নিলে অভিজিৎ। ধোঁয়াটে চোখ। সিম্প্যাথি! সিম্প্যাথি নিয়ে কী লিখেছে সে? নিশ্চয়ই সহানুভূতিশীল ছিলেন জওহরলাল। মস্ত সহানুভূতিশীল। কতো অনুভূতির মানুষকেই না তিনি টেনেছেন। সহানুভূতির চৌম্বক শক্তি বিরাট। ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে যাঁরাই আছেন, জওহরলালের শোক-সভায় মিলিত হয়ে অধোবদন হবেন! অনুভূতিশীলতা সাহিত্যিকেরই ধর্ম। রাষ্ট্রপতি যেখানে দার্শনিক—প্রধানমন্ত্রীর তো কবি হওয়াই উচিত সেখানে! ঋতুরাজ! তার জন্যে কিসের শোক? যযাতির মতো বার্ধক্যহীন সে—মৃত্যুহীন!

হাসল অভিজিৎ। এসব কথা কি সে বিশ্বাস করে? কোনোদিনই না। রবীন্দ্রনাথের

মৃত্যুর পর বাংলাসাহিত্য আর ছোঁওয়া যায়? একটু আন্তরিকতা আছে কারো রচনায়? সব জার্নালিজম্—ইয়্যালো, হোয়াইট না-হয় রেড্। যোধপুর পার্কের ওই পদ্মবিভূষণ না কি আমার মতোই হোয়াইট জার্নালিজম্ চালিয়েছে! কে বল্লে? কে? সান্যাল? সান্যালই হয়তো!

বাবা বুড়োদের সমাবেশ করলেন, নইলে সান্যালদম্পতীকে পানীয়ের নিমন্ত্রণ করা যেতো আজ বেবিটার হেল্থ ড্রিঙ্ক করা যেতো!

স্ক্রিব্লিং প্যাড থেকে লেখা পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে দাঁড়াল অভিজিৎ। ঘড়ি দেখল। পৌনে সাত হয়নি। ট্যাক্সি নিয়ে সাতটায় পৌঁছুনো যাবে গোলাপ-বাগানে। সিগারেটটা ছাইদানির জলে ডুবিয়ে—এডিটরের কামরায় যাবে বলে আপন কামরা ত্যাগ করল সে। লেখাটায়—এ স্ক্রিব্লিং-এ এডিটরের প্রয়োজন মিটবে তো? সম্পাদকের সামনে যখন সহকারী বিশেষণটা আছে তখন তাকে কতোদিন থেকেই তো প্রয়োজনের তেতো পিলে সহানুভূতির সুগার-কোটিং আশঙ্কা করে সম্পাদকের কামরায় যেতে হয়েছে!

কিন্তু কামরায় ঢুকেই অবাক অভিজিৎ! সম্পাদকের সামনে পাশাপাশি চেয়ারে সান্যাল আর শুক্লা! অদ্ভুত, অদ্ভুত! পরিচিতরা হঠাৎ মনে এলে তাদের সঙ্গে দেখা না হয়ে আর উপায় থাকে না। টেলিপ্যাথি?

মিহি হাসিতে আর ভুরুর টানে দুজনকেই সম্ভাষণ জানালে অভিজিৎ।

ওটা ঠিক কথা বলবার সময় নয়। প্রতীক্ষার কয়েকটি মুহূর্ত। যার জন্যে প্রতীক্ষা সে ছাড়া চারপাশে, বাইরের এবং মনের চারপাশে যখন আর কেউ নেই। পরীক্ষক তোমার পরীক্ষার খাতা তোমার সামনে দেখে চলেছেন তাঁর লাল পেন্সিলের ডগা উঁচিয়ে—পেন্সিলের টানের উপর তোমার পাশ-ফেল ঝুলছে। কোথায় তাকাবে তুমি আর? ভুলে যাবে ভুরুর টান। ছিলার টান ভুলে অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদের চোখ তোমার।

এ-পরিহাসের কথাও মনে এলোনা অভিজিতের তখন যে আজ সে মাতামহ কিন্তু যৌবনের পরীক্ষার দায় তার আজও ঘুচল না।

যখন সম্পাদক, ও. কে. বললেন, শুধু তখনই নিষ্কৃতি তখন চারপাশ যেন কথা কয়ে উঠল, মনও বলতে পারল, আর কতোদিন, এই লেখা-লেখা খেলা আর কতোদিন খেলতে হবে? কবে বলতে পারব, যা লিখেছি শুধু তা পরীক্ষা পাশের জন্যে?

শুক্লা বললে,—আপনার কামরায় আমরা যাব ভাবছিলাম, রায়!

—ও—স্বপ্নোত্থিতের চমক আনলে অভিজিৎ চোখে-মুখে।

এডিটর হয়তো ফার্স্ট লীডারে ডুব দিয়েছিলেন। সান্যাল বললে,—চলুন, চলুন অভিজিতবাবু। এডিটরের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। এখন আপনার দু-পাঁচ মিনিটের ধৈর্য প্রার্থনা করছি। তারপর ধরুন, আধঘণ্টাটাক্ কলমের শ্রম!

শুক্লা আর সান্যাল প্রায় একসঙ্গেই হাসল এবং দাঁড়ালও প্রায় একসঙ্গে। হোক না তার সেলারের ইয়ার সান্যাল তবু সম্পাদকের ঘরের গাম্ভীর্য অটুট রেখে অভিজিৎ নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো।

যা শোনাবার জন্যে ধৈর্য প্রার্থনা করছিল সান্যাল তা শুনে অভিজিতের মনে হল, এ এক সেনসাশানাল নিউজ। একসময় সান্যালর সাংবাদিকতায় যথেষ্ট দক্ষতা ছিল, খবরটা জানাতে যেন সে-প্রতিভাই তার ফিরে এলো। এবং তার যে গুণ ছিল নৈর্ব্যক্তিকতা, তা-ই। কিন্তু শুক্লা ইমোশনাল হয়ে উঠছিল প্রায়ই। এবং তা না হয়ে যখন তার উপায় ছিল না,

কারণ সে মেয়ে এবং মূল ঘটনাটা তাকে নিয়েই তখন পাঁচ মিনিট কেন পনেরো মিনিট সময় কী ভাবে যে চলে গেল অভিজিৎ বলতে পারবে না। ধৈর্যের পরীক্ষা তাকে মোটেও দিতে হয়নি, শুক্লার অস্বাভাবিক স্বীকারোক্তি শুনতে।

খবরটা সুমিত্র উপাধ্যায়কে নিয়ে—যিনি পদ্মবিভূষণ এবং যোধপুর পার্কে থাকেন। শুনেছে অভিজিৎ। একেলে হতে গিয়েছিল উপাধ্যায় শুক্লার সঙ্গে মেলামেশা করে। কিন্তু সেকেলে বুড়ো শালিখের ঘাড় যাবে কোথায়? সান্যালকে খাটিয়ে নিয়ে টাকা দেয়নি—এই সব নোংরামি ঘাঁটতে অনুরোধ করছে সান্যাল। এডিটরকে না কি রাজি করিয়েছে শুক্লা। আমাকে বলা কেন? অভিজিৎ মন থেকে সায় পাচ্ছিল না। সান্যালের ভালো পেন্—একটা প্যারা লিখে দিলেই পারে!

তাছাড়া, হাতঘড়ি দেখলে অভিজিৎ। সাড়ে সাতটা। তাড়া খেলে আবার সে গোলাপ বাগানের। ভুরুতে ঢেউ উঠল আর ঠোঁটে সিগারেট।

গোলাপী হাসিতে শুক্লা বললে,—এখন তো আপনার দশ মিনিটের ব্যাপার, শ্রীযুত রায়। তারপর দয়া করে যদি আমার ওখানে একটু পান করে যান!

বেশ কৌতূহলী হয়ে তাকাল এবার অভিজিৎ শুক্লার মুখে—সান্যালের স্ত্রীও পানাসক্ত—সুশ্রী কিন্তু কেমন যেন একটু কাঠিন্য আছে সে সুশ্রীতায়—কিন্তু শুক্লা? হয়তো ক্লিওপাত্রার মতো দেখায় কখনো-সখনো, এখন তো দিব্যি মোনালিসার টোলখাওয়া পৃথুল গালে বাঙালিনীর রহস্যময়তা উঁকি দিচ্ছে। মনে মল্লিকার জায়গায় যেদিন প্রথম গৌরী এসে দাঁড়িয়েছিল সে-রাত্রির ছায়াটা ভেসে গেল অভিজিতের মনের উপর দিয়ে। তারপর অমৃতব্রতর জন্ম, পারমিতার জন্ম। অমি আর পুপু কতো বড়ো হয়ে গেল! মুনিকের মেয়েরা কী রকম? অলকের সঙ্গে পুপুর বিয়ে হলে মন্দ হত না! হয়তো এতো শীগগীর মা হত না পুপু। পুপুর বেবিটার 'নিরো' নাম রাখলে কেমন হয়? দিক্-না আবার পুড়িয়ে রোম—দিব্যি লায়ার বাজাবে সমুদ্রগুপ্তের মতো খাটিয়াতে বসে! গোলাপ বাগানের কথা মনে পড়ল অভিজিতের। ঘড়ি দেখল আবার!

শুক্লা অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললে,—রয়, প্লিজ! দশটা মিনিট ডিভোট করুন।

অনুনয়ে বিশ্বাস নেই অভিজিতের, মল্লিকাও অনুনয় করেছিল—অভিদা, আমাকে তুমি চেয়ো না—অনেক ভালো মেয়ে পাবে, সুখী হতে পারবে! ও কিছুনা, মেয়েরা অনুনয় করেই। কিন্তু শুক্লার চোখে, অনুনয়ের জ্যোৎস্নার ভেতরেও যেন একটা জ্বালা দেখতে পেল। মরালিটিকে যতোই ভাসানে পাঠাক অভিজিৎ, সে-শুভ্র প্রতিমার মরাল যেন ভেসে এলো তার মনে। সান্যালকে বললে সে,—আপনি লিখুন না সান্যাল—আমি দেখে দিচ্ছি যদি আমার কোনো সাজেশন থাকে বলব।

—আমার কলমে মরচে ধরে গেছে—আপনিই লিখুন। সান্যাল ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে বললে।

একটি মেয়ে তাঁর শালীনতায় আঘাত পেয়েছে। ভাবল অভিজিৎ। স্ক্রিবলিং প্যাডটা টেনে নিয়ে আর দ্বিরুক্তি করলে না।

কাগজের উপর খস-খস শব্দটা যখন পূর্ণ যতি নিলে, শুক্লার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সান্যালের মুখেও ধোঁওয়ার কুয়াশা আর নেই। বিত্তবানের বা অ্যাল্কোহলিকের পালিশ তার মুখে, যে-পালিশে বয়স ধরা পড়ে না।

অভিজিৎ লেখাটাতে চোখ বুলোল। ইয়ালো জার্নালিজম হয়ে গেল না তো?

প্যাডটা সে সান্যালের সামনে এগিয়ে দিলে।

—দেখুন, যদি সংশোধন করতে হয়। উপাধ্যায় এক্সপোজড্ হওয়া চাই—কিন্তু লেখাটা অব্জেক্টিভ হওয়াই ভালো।

দ্রুত পাঠে কাজ সেরে সান্যাল পাতাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে এডিটরের কামরার উদ্দেশে যাত্রা করলে।

একা, শুক্লার মুখে তাকালো এবার অভিজিৎ। দুর্লভ হলেও অনভ্যস্ত মুহূর্ত নয়। কাজেই প্রায় অমিতব্রতর বয়সে চলে যেতে পারল সে।

—আপনার চুলের ব্ল্যাক্প্রিন্সটা সত্যি আজ সিগ্নিফিকেন্ট! বললে অভিজিৎ ঠোঁট এলানো হাসিতে।

—ও, তা-ই? থ্যাঙ্কস্ মিঃ রয়!

কথাটাকে বিদেশী মহিলার মতো নিতে পারল শুক্লা। খুশী হল অভিজিৎ। বাবার সেই রূপসী নার্সকে মনে পড়ল তার যার সঙ্গে কথাবার্তায় সে খুশী হত।

—আচ্ছা বলুন তো—অভিজিৎ চোখে কৌতূহল তুলে ধরল,—জওহরলালকে কী ভাবে আপনারা গ্রহণ করেছেন। মানে, মহিলারা।

—পণ্ডিতজী? আওয়ার স্যাডেন্ড্ লাভ!

—বিষণ্ণ গোলাপ?

—নিঠুর দরদী!

দ্যাট্স্ দ্য ওয়ার্ড। নিঠুর। আমার লীডারের প্রুফটা দেখে যেতে হচ্ছে। কথাটা কোন্ শব্দে ভালো শোনাবে বলুন তো—ক্রুয়্যাল না হার্ডেন্ড?

—পণ্ডিতজী সম্পর্কে? এপ্রিল ইজ দ্য ক্রুয়্যালেস্ট মান্থ ব্রিডিং লাইলাক আউট অব ডেড ল্যান্ড!

—রাইট্। মাও-সে-তুঙের ফুল ফোটানো নয়!

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল। হতে পারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণে—কিন্তু সুর মেলাল সরু তারের সঙ্গে মোটা তার। এবং সে অর্কেস্ট্রায় সান্যাল প্রবেশ করে বলল, —রয়ের রচনা কি এডিটর ডিস্-অ্যাপ্রুভ করতে পারেন?

বাইশ

রাত দশটা অবধি সমস্ত তল্লাটে চোঙ মুখে লোক বার করতে হয়েছে এই ঘোষণা দিয়ে : বন্ধুগণ, আমাদের প্রিয় নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর তিরোধানে দক্ষিণ-পূর্ব ঢাকুরিয়ার শোকসন্তপ্ত অধিবাসীদের একটি বিরাট সমাবেশ আগামী কাল বিকেল পাঁচটায় যোধপুর পার্কে পোস্টাফিসের বিপরীত দিকে সার্বজনীন পূজামণ্ডপে আহ্বান করা হচ্ছে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন সর্বজনপ্রিয় সাহিত্যিক রণেন মিত্র এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন প্রাক্তন বিচারপতি শশাঙ্কশেখর বসু। আপনারা এই শোক-সমাবেশে দলে দলে যোগদান করুন। তপুপুকুর বিকাশের নিজের এলাকা—সেখানে নিজেই সে চোঙ মুখে নিয়েছে। তার খাতিরে পাড়ার একশো ছেলেমেয়ে তো অন্তত ভীড় করবে সভায়! সত্যপ্রসাদ যাদবপুরের দিকটা দেখছে। তাছাড়া বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী আর চীন-পন্থীরা তো ঘরেরই মানুষ—হাল আমলে সিনো-সোভিয়েট বর্ডার আর অ্যাফ্রো-এশিয়ান কন্ফারেন্স

নিয়েই না যা-একটু দলাদলি! আর পণ্ডিতজী বিশ্বপ্রিয়, তাঁর শোকসভায় এসব ইস্যু উঠতেই পারে না। সারাদিন টই টই করে, কোথায় কপিবাগান, কোথায় বাপুজী কলোনী, নস্করপাড়া, আর শহীদনগর—শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড আর সেলিমপুর রোড—রাস্তায়, রকে, লাইব্রেরী ঘরে, চায়ের দোকানে, পাইপ-কারখানার পাইপের উপর বসে আপোষ-মীমাংসার কতো জটলার পর বিকাশ একটু ক্লান্তই হয়েছে কাল। সবার উপর, জজবাবুকে প্রধান অতিথিতে রাজি করানো। অলকের জন্যেই হল! বরং অলকের আগ্রহে। সুমিত্রদা চটে গেছেন শুনে অলকেরই আগ্রহ দেখা গেল জজবাবুকে প্রধান অতিথি করবার—তাছাড়া এমন ভরসাও দিলে, দিদির যদি শরীর ভালো থাকে, সভায় গান গাইবেন। মিত্রা চৌধুরীর গান—ফাঙশান তো ওখানেই মাৎ—কী দরকার আছে সুমিত্র উপাধ্যায়ের! যাক্, ক্লান্তির শেষে বেশ সুখেই ঘুমোচ্ছিল বিকাশ। সুতরাং খানিকটা বেলা পর্যন্তই।

জাগতে হল ছোট বোনের চেঁচামেচিতে—চেঁচামেচিই যার অভ্যাস এবং যদি তাকে বদ্-অভ্যাস বলো, দারিদ্র্যই যার জন্যে দায়ী।

চোখ মেলে বললে বিকাশ,—চা, এনেছিস?

—ঈঃ সুখ কতো! বয়েই গেছে আমার চা-বাহিনী হয়ে তোমাকে জাগাতে!

—তাহলে মুখে ওই হট্টগোল কেন? পাশ ফিরে শুলো বিকাশ।

—বাঃ, এক মহিলা বসে আছেন—উনি পাশ ফিরে শোলেন!

বালিশের উপরই ঘাড় ফিরিয়ে বললে বিকাশ,—কে, মিত্রাদি?

—আমি কী জানি কে তোমার মিত্রাদি—উঠবে তো ওঠো। মেজাজ দেখিয়ে বোন চলে গেল।

বিকাশ উঠল। নিজের তাড়ায়ই উঠল। লোকজন আসতে সুরু করেছে বাড়িতে—এই কৌলিন্যবোধের আভাসে একটু সপ্রতিভ হল তার বসবার ভঙ্গীটাও। তারপর যতোটা ব্যস্ত না হলেও চলত ততোটা ব্যস্ততায় এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়া। তৃতীয় ঘর তো আর নেই। যেটা আছে—তেরপল-ঝোলানো একফালি বারান্দা বা রান্নাঘর।

কিন্তু একী! বৌদি! অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে সশব্দেই বলে উঠতে পারত বিকাশ,—বৌদি? কিন্তু, সংহিতার বেশভূষার পারিপাট্যে বিকাশের বিধবা মা সন্তানের সৌভাগ্য চিন্তা করে মহিলাটিকে আগেই আগলে রেখেছিলেন বলে কোনো সম্ভাষণই বেরোলোনা বিকাশের মুখ থেকে!

সংহিতাই কথা বললে প্রথম,—ঘুমুচ্ছিলেন বুঝি? আমি কিন্তু এঁর সঙ্গে আলাপে দিব্যি জমে গেছি!

—আলাপ! কেমন যেন দৃষ্টিহীনের মতো চারদিকে তাকালেন বিকাশের মা,—আমি কি আলাপ করবার যুগ্যি মানুষ!

এবার বিকাশ মুখ খুললে,—মা, চা দিয়েছ বৌদিকে? না। বলোনা বিনুকে আমাদের দু'জনকে দু'কাপ চা করে দিতে।

মা উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু জিজ্ঞাসা ছাড়া নয়,—মুখটুখ ধুলিনে!

—বেড্-টীই হোক না আজ! চা দিয়ে কুলকুচো করে নেব। পাঠিয়ে দাও তো আগে। অভ্যাস ঢাকবার কোনো প্রয়াসই যেন ছিলনা বিকাশের। বা প্রয়োজন।

ছেলেটি সবসময়ই আন্তরিক। ভাবলে সংহিতা। কিম্বা, তার ভাবার প্রয়োজন ছিল। বললে—মুখটুখ ধুয়ে চলুন না আমাদের ওখানে। ওখানেই চা হবে!

মা যেতে-যেতেও দাঁড়ালেন। কী বলে বিকাশ তা-ই শুনবার জন্যে। কোথায় পাবেন তিনি এখন পাঁচ নয়া পয়সা যে এক প্যাকেট চা হবে? আজ কি চা হয়েছে নাকি? তিনি আর বিনতা ঘুম থেকে উঠে হাত গুটিয়েই তো বসে আছেন! সকাল থেকেই মেয়েটা মেজাজ করছে। ওর-ও বা দোষ কী? কুড়িতে বুড়ী হয়েও যখন আইবুড়ো, মেজাজ হবে না? কিছু দেখছে বিকাশ?

—আজ মাপ করবেন, বৌদি! এক্ষুণি ডেকোরেটারের কাছে দৌড়ুতে হবে।

মুখ ব্যাজার করে মা চলে গেলেন।

সংহিতাও একটু বিষণ্ণ হল তবু আশা ছাড়লে না,—পার্কেই তো দোকান আছে ডেকোরেটারের—সেখান থেকে আর কদ্দুর। তাছাড়া আপনার দাদার শরীরটা ভালো নেই। তাই তো আপনাকে ধরে নিতে এলাম। গোপালকে পাঠালে বাড়ি খুঁজতেই তার একমাস। নিজেই চলে এলাম!

—শরীর ভালো না! কী হয়েছে সুমিত্রদার?

—মেজাজ খারাপ হলেই, জানেন তো, ও'র শরীর খারাপ হয়ে যায়! কারো সঙ্গে কথা নেই! কাল খেয়েছে কি না খেয়েছে—বিকেল পাঁচটায় বেরিয়েছে আর আসেন না—। আটটা বেজে যায়, দশটা বেজে যায় আসেন না। শোভনকে জজবাবুর বাড়ি পাঠালেম—সেখানেও নেই। তারপর ফিরে এলেন প্রায় এগারোটায়। কোথায় ছিলে? কোনো উত্তর নেই। বলুন তো কী বিপদ!

—হুঁ—ঠোঁট দু'টো জড়ো করে ভাবলে বিকাশ।—কী জানেন, বৌদি, সুমিত্রদার আজকের সভায় আসা উচিত ছিল। আসবেন না। অগত্যা জজবাবুকেই প্রধান অতিথি করলাম।

এবার পুরোপুরি বিষণ্ণ সংহিতা। হঠাৎ যেন একটা অদৃশ্য স্পঞ্জ তার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত চুপসে নিলে। ফলে তৎক্ষণাৎ সংহিতা কিছু বলতে পারলনা।

কিন্তু বিকাশ তৎক্ষণাৎই তার ধূর্তামির প্রতিভা দেখালে। একদিন যে তার পাঁচ নয়া পয়সার অভাব ঘুচে হাতে পাঁচশ' টাকা আসবে তারই সূচনা দেখা গেল তার কথায়,—শতো হোক বৌদি, রণেন মিত্তির সেক্স নির্ভর—লেফ্‌ট থিঙ্কার বলতে সুমিত্রদা ছাড়া আর কে আছেন?

আশা-ভঙ্গতাই যেন কথা কয়ে উঠ্‌ল,—তবু তো আপনারা রণেন মিত্তিরকেই আন্‌লেন! ও'র আছে কী? ও'র "ভ্যাঁ করো তো বাপু"—বইটাতে পশুচরিত্র ছাড়া আর কী আছে?

—হ্যাঁ। কিন্তু দেখুন মজা, ওটারই ছবি হচ্ছে আবার!

—শুটিং-টা চিড়িয়াখানায় হবে তো? দুঃখের হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখে সংহিতা।

—হলে ভালো হত! বিকাশ মাথা নীচু করে ঘাড় দোলালো,—কিন্তু কী জানেন, সমস্ত কলকাতাটাকেই তো আবার সোঁদরবন গ্রাস করে নিয়েছে!

মেয়েদের চাইতে পশু আর কে ভালো চেনে বা ভালোও বাসে! সংহিতা চুপচাপ থেকে ভারসাম্যে আসতে চাইল।

বিনতা-বোনটি প্রবেশ করল এবার এ-দৃশ্যে।

—দাদা, তোমার বালিশের নীচে তো কিছু পেলাম না। নেই নাকি?

সবদিক থেকে নিরাপদ দৃশ্য থেকে অদৃশ্য হওয়া। তাই প্রস্থান করবার উদ্যোগ করে

বললে বিকাশ,—বৌদি—এক মিনিট। মুখটা ধুয়ে আসছি। বাসি মুখে কথা বলতে নেই।

কিন্তু বাসি লোকের সঙ্গে? ভাই-বোন চলে গেলে ভাবলে সংহিতা। ঠোঁট বেঁকে উঠল খানিকটা। যেখানেই মুখ ধুতে যাক বিকাশ, মনে হল তা আরেক গ্রহে। 'আজ বুঝি তুমি বাসি হয়ে গেছ মনের অনেক ব্যবহারে'—কার যেন একটা পদ্য পড়েছিল সংহিতা। পংক্তিটা মনে আছে। মনে এলো। খুব বেশি ব্যবহার্য নয় বলেই মনে ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে মনে এলো সংহিতার বিকাশও যে পদ্য লেখে। আন্তর্জাতিক কুলী-জাগরণের উপর বিকাশের নজর। কয়েকটা পদ্য উনি দেখিয়েছিলেন। সংহিতা তা থেকে দুটো একটা পংক্তি মনে আনতে চেষ্টা করল। অব্যবহৃত কোনো পংক্তি কি মনে লুকিয়ে আছে? খুঁজে আনলে কাজ হত।

কিন্তু তার আগেই হয়তো বিকাশ বালিশের বা তোষকের নীচে কিছু পয়সা খুঁজে পেয়েছিল, ফলে সে যখন দু'কাপ চা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল—সংহিতা সময় মেপে বুঝে নির্লে, চা-টা ঘরে তৈরী নয়, কোনো স্টলের এবং কাপগুলোও তা-ই। প্রথম ধাক্কায় খাবে না স্থির করল সংহিতা কিন্তু সে যখন বিকাশকে খোশামোদ করতেই এসেছে, না খেয়ে উপায় কী? তা-ও সে খুব দ্রুতই ভেবে নিলে।

—চা-টা খেয়ে দুজনে একসঙ্গেই বেরোনো যাবে—কী বলেন বৌদি? কালো ঠোঁট হাসিতে বিকশিত করে দন্তরুচি দেখালে বিকাশ।

বললেন বৌদি কিন্তু বিশুদ্ধ বেরোনোর কথাও নয়, দাঁত বেরোবার কথাও নয়। চায়ের কথাই,—আপনি না চায়ের উপর একটা পদ্য লিখেছিলেন?

—কোন্‌টা বলুন তো? লিখে তো ছিলাম। চীন-হাঙ্গামার সময়ও লিখেছিলাম, সুমিত্রদাও যখন পদ্য লিখছিলেন। এ-ধারার পদ্যগুলো পড়ে সুমিত্রদা খুব সুখ্যাতি করেছিলেন। বিকাশ সংহিতাকে একটা কাপ গছিয়ে দিয়ে বললে।

কাপের চায়ের দিকে তাকিয়ে সংহিতা বল্‌লে,—হুঁ, উনি বল্‌ছিলেন, বিকাশের একটা প্রাইজ-ট্রাইজ পাওয়া উচিত! দেখছি।

—না-না, আমরা কী প্রাইজ পাবো, বৌদি! বিকাশ যেন লজ্জায়ই কাপে মুখ লুকোলো।

—প্রাইজ-ট্রাইজ দেওয়া ব্যাপারে উনি তো আছেন কোথাও-কোথাও।

টপ্‌ সিক্রেট বেফাঁস করবার ভঙ্গী বৌদির মুখে দেখলেও বিকাশ অন্তত ততোটুকু চালাক যে সুমিত্রদার সঙ্গে মেলামেশা সুরু করবার আগেই এ সিক্রেট-টা সে জানত।

—আছেন। সনিঃশ্বাসে বললে বিকাশ।

শব্দটাতে সংহিতা যেন বিড়ালের মিঁউ শুনতে পেল, হুলোর 'ম্যাও'-ও না। অষুধে কাজ হলনা। ডোজ বাড়াতে হবে। চায়ে চুমুক দিয়ে সংহিতা মুখ তুলে বলে উঠ্‌ল,—মনে পড়েছে—আপনার কবিতার দুটো পংক্তি। 'চায়ের পাতা শুকোতে হবে, ভাজা হবে, তাজা পাতা কালো হবে / গায়ের রঙ কালো হবে আমাদের মতো কুলীর চামড়ার ঘোর কালো।'—তা-ই না?

ঠোঁটের কালো চামড়া কুঁচিয়ে তুলে বল্‌লে বিকাশ,—'টসে'র দোকানে বরাত ঠুকে ঢুঁ মেরেছিলাম একসময়, বৌদি—কিন্তু টসে হেড পড়লনা, টেল পড়ে গেল।

—পড়বে—হেড্‌-ও পড়বে। কাপে আর্ধেকটা চা রেখে হেসে মাদুর থেকে উঠে গেল সংহিতা,—চলুন।

—হ্যাঁ, আপনাকে পার্কে পেঁৗছিয়েই আমি সোজা রাস্তা ধরব।

এবার মেয়েলি অস্ত্র ছুঁড়ল সংহিতা, বিষণ্ণ অনুনয়ে বললে,—আপনার দাদাকে দেখতে যাবেন না একটি বার।

সুমিত্র উপাধ্যায় সব বুড়ি ছুঁয়ে রাখতে জানে আর বিকাশ বুঝি তা জানেনা? কাপটা রেখে বললে বিকাশ,—ঝামেলাটা চুকে যাক, বৌদি, সন্ধ্যার পর ঠিক পেঁৗছে যাব!

তেইশ

শিববাবুর ইলেকট্রিক্যাল্‌স্‌-এর দোকানের ফুটপাথে দাঁড়িয়েছিল অলক। একা। সামনে যোধপুর পার্কের শিরীষ না তালের দিকে চোখ নাকি পোস্ট-অফিস এলাকার গেরুয়া করবী গাছটায় তা ঠিক বোঝা যাচ্ছিলনা। বিষে বিষক্ষয়। রক্তকরবীর বিষ যে গেরুয়া করবীতে উধাও তা-ই কি ভাবছিল অলক—তার দিদির কথা ভাবছিল? দক্ষিণেশ্বর ঘুরে এসে বস্তুত বেশ ছিল মিত্রা। বিকাশের অনুরোধে গাইতে পর্যন্ত রাজি হল, 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো, প্রভু......' সভায় গাইতে রাজি হল! কিন্তু না, এ মিরাক্‌ল্‌-এর চাইতে ঢের বেশি সেন্‌সেশান্‌ল্‌ ঘটনা তার মনে। "প্যাট্রিয়টে" নয়—যে-ইংরেজি কাগজটায় সে-ঘটনা, তা সে পুলিশের রুলের নক্সায় রোল করে নিজের উরুতেই ঘা মারছিল থেকে থেকে।

শিববাবু গণেশকে ধুঁয়ো খাইয়ে তাঁর কাউন্টারের ওপাশে গিয়ে যে চোখ বুঁজে ধ্যানস্থ ছিলেন তা-ও অনেকক্ষণ। এখন তিনি ব্যাটারি পরীক্ষায় নিযুক্ত কিম্বা কোনো ফ্যানের মোটর ওয়াইন্ডিং। তা-ও প্রায় শেষ হয়ে এলো, এখন সহকারী এলেই অলকের সঙ্গে আলাপ জুড়বেন কিম্বা কাউন্টারে বসে কথা ছুঁড়বেন,—সভার কদ্দুর, অলকদা?—শিববাবুর দোকানের সামনে যে যুবকদের জটলা হয় প্রায় রোজ, তারা সবাই বয়সে শিববাবুর ঢের-ঢের ছোট হলেও তিনি প্রত্যেকটি যুবককে 'দাদা' ডেকে খুশী। বোধহয় ব্যবসায়িক দস্তুরে নতুবা যুবকমাত্রকেই মস্তান মনে করেন বলে।

কিন্তু শিববাবুর কথা সুরু হবার আগেই দেখা গেল, বিকাশ পোস্ট অফিসের মোড়ে এক মহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, বা তাঁকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে দক্ষিণ-বরাবর রাস্তায় হনহনিয়ে এগিয়ে আসছে। অলকের চোখ-সোজা যখন বিকাশ, এতোটা সময়ের চাপা বাষ্প ভক্‌ করে মুখ দিয়ে বেরোলো অলকের,—এই যে—

ফিরে তাকাল বিকাশ। অলককে দেখতে পেলে। হাত তুলে লাল-সেলামের ভঙ্গীতে হয়তো অপেক্ষাই করতে বললে তাকে। কেননা, সামনের ওই ডেকোরেটারের দোকানে তার এখন জরুরি কাজ।

অপেক্ষা করতেই হল অলককে। সত্যপ্রসাদের কারখানা কি আজ ছুটি? ওই সর্দার মজুরটা এলেও অভিদার কাগজের নিউজ-লিটারেচারটা নিও-লিটারেটটাকে বলা যেতো! শিববাবুর কাছে ওটা বলা আর ওঁকে কালী সাজানো এক কথা! কালী ব্যানার্জির মতো স্মার্ট অভিনয় মোটেও করবেন না, মা কালীর মতো জিব কেটে বল্‌বেন,—ছি-ছি, সম্মানী লোকের নামে মিথ্যে বদনাম—কাগজগুলোর পেশাই হয়েছে আজকাল তা-ই। উপাধ্যায় তাঁর খদ্দের—সুতরাং সম্মানী ব্যক্তি!

অলক এবার পায়চারি সুরু করলে। যেন আওরঙ্গজেবের ভূমিকায় দারার মৃত্যুদণ্ড হাতে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে দানীবাবু পায়চারি করছেন। সেকাল থেকে একালে এসেও না

ভুললাম আমরা পায়চারি, না মৃত্যুদণ্ড! গীতামাহাত্ম্যে সম্প্রতি অবসর-প্রাপ্ত বিচারক শশাঙ্কশেখর যদি তা ভুলে থাকেন!

কিন্তু তাঁর বাড়িতে সংবাদটা কীভাবে গৃহীত হল? সুপ্রিয়টাও বেরোচ্ছে না—কী করে বা জানবে অলক? সুব্রতদার বন্ধু উপাধ্যায়! একটা বিশ্রী আবহাওয়া ওবাড়িতে নিশ্চয়ই। জজবাবু প্রধান অতিথি হতে না বেঁকে বসেন! আচ্ছা করে যজাবেন তাহলে বিকাশকে!

অভিদার কাছে একবার গেলে হতো! পারমিতা তো এখন মা—সবকিছু নিশ্চয়ই মুছে গেছে এখন সবার মন থেকে। এমনকি পারমিতার মন থেকেও। আমার? অলক প্রতীক্ষার অসহিষ্ণুতাটাকে প্রেম-বিষয়ক চিন্তায় মগ্ন করে দিতে চাইল। ডান-ইতো বলেছিলেন—গুরুদেবও যাঁর প্রেমের অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ ছিলেন—ডান, হুঁ জন ডানেরই এ-কথা—

> Love is a growing, or full constant light;
> And his first minute, after noone, is night.

অনেক মূর্খ আছে বিশ শতকের মানুষকে যারা আঠারো শতকীয় ফিজিক্যাল ভাবে—বিকাশ তো হস্তিমূর্খই কিন্তু এ-এলাকাটাই বোধহয় তা-ই। পণ্ডিতমূর্খ উপাধ্যায় বা কী! তিনি নাকি রবীন্দ্রনাথ! মেটাফিজিক্সের ছিঁটে-ফোঁটা তোর হাড়ে নেই. তুই কিনা রবীন্দ্রনাথ! তোর night কী? বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাতের কাগজের রুলটা দিয়ে একটা গুঁতো দিলে। পদ্য তো লিখেছিলি, বুঝিয়ে দে না ডানের night মানে কী? স্বপ্নকে মানিস জীবনে, প্রতীক বুঝিস?

কিন্তু কে লিখলেন, 'নটোরিয়াস নাইট ক্লাব'-এর প্যারাটা কাগজে? অভিদা? উহুঁ। অভিদার স্টাইলই এমন নয়। এতোটা অবজেকটিভ নন অভিদা। দৈনিক কাগজ ছেড়ে দিয়ে সাহিত্যের বাজারে এলে তিনি তরুণ মহলকে নাচিয়ে তুলতে পারতেন শুধু জার্নাল লিখেই। যদিও ওই কুখাদ্য খেতে নেই তবু মদের বিকল্প পানীয় তো বটেই ওধরনের সাহিত্য! ক'জন তরুণ আর ব্লুফক্সে যেতে পারে, একটা সাপ্তাহিক কেনা কারো পক্ষেই কঠিন নয়!

এতোক্ষণে তবু ব্লুফক্স-যানেওয়ালাকে দেখা গেল। সুপ্রিয় আসছে। এদিকেই আসছে। সুপ্রিয়কে অলক মনে-মনে চাইছিল। টেলিপ্যাথি। কিন্তু টেলিফোনেই যেন কথা বলে উঠল অলক,—হ্যালো—

সুপ্রিয় হাসছে। শরীরের দুলুনিটা একটু বেশি। তাই মনে হল। অলকও হাসল।

দোকান থেকে কথা ছুঁড়লেন শিববাবু,—সভা কখন হচ্ছে, অলকদা?

তার দিকে না তাকিয়েই বললে অলক,—যাবেন নাকি?

—বাঃ, পাড়ার একটা কাণ্ড, যাবোনা?

—কাণ্ড? হাঁ ওটা বেপাড়ায়। এখানে তো ক্রিয়াকাণ্ড!

—ঐ একই!

কাণ্ড বলতে শিববাবু স্ক্যাণ্ডেল বোঝান নি কিন্তু শব্দটাকে ওই মানেতে নিয়ে গিয়ে অলক নিজেই একটু বিব্রত হল। নিজের বাড়িটাকে মনে পড়া স্বাভাবিক। শিববাবুর শেষ কথাটার পর তাই সে দোকানের সীমানা ছাড়িয়ে সুপ্রিয়র দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল।

অলক মেয়েদের উপর বীতশ্রদ্ধ। সুপ্রিয়কে ওমেনাইজার ভাবলেও, সে সঙ্গে অলক এ-ও ভাবে অচিরেই সুপ্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক হয়ে যাবে নিজের ভূমিকা অনুচর রাসভ

অশোককে দিয়ে।

খুব মন্থরে আসছিল সুপ্রিয়। তার মানে তার কোনো এন্‌গেজমেন্ট নেই আজ সকালে। তার মুখোমুখি হবার আগে অলক আবার ডানকেই ভাবলে। উর্বশী আর ফিরবে না। সে গৌরব-শশী অস্ত গেছে। ওদের রাত্রির দিকেই ঝোঁক কিনা বেশি। বড়ো জোর উষাকাল পর্যন্ত থাকতে পারে প্রেতিনীরা। হ্যামলেটের নিহত পিতার মতো। রক্তে হিংসার বিষ ঢুকিয়ে দেবার জন্যে! নীলকণ্ঠ সমুদ্র-গরল খেয়ে ফেললেন—উর্বশী ভেনাস জাতীয় সামুদ্রিক প্যারাগন অব অ্যানিমেলসগুলোকে গিলে ফেলতে পারলেন না? পারমিতাকে ভাবলে অলক। দুপুরের পরই রাত্রিতে চলে গেল! ডান দয়া করে দুপুর পর্যন্ত ওদের রেখেছেন। কিন্তু সুন্দরী শুকতারারা সকাল পর্যন্তই শোভা—রোদের আভা এলো কি উধাও। সাধে ওদের পর্দানশীন করেছিল মধ্যযুগ? অন্ধকারেই ওদের মজা। নারীপ্রধান লিচ্ছবীর বৈশালীকে সাধে 'রমনীয় বৈশালী' বলেছিলেন গৌতম বুদ্ধ! ডান রমণীয় রাত্রির কথা ভেবেই যদি প্রেমের আলোকে দুপুরের পরমহূর্তে বিদ্যাপতির 'ঘোর যামিনী'তে ডুবিয়ে থাকেন, সেই দিক্‌ভরা 'তিমিরে' তিনি তাঁর ঈশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছেদই ভেবেছেন নিশ্চয় যেম্নি বিদ্যাপতি ভেবেছেন, 'হরি বিনে দিন-রাতিয়া' কীভাবে কাটাবেন?

ভাবনার এ স্রোত হয়তো মিত্রার ঘাটেও পেঁছুত কিন্তু ততোক্ষণ সুপ্রিয় এসে অলকের সামনে দাঁড়িয়েছে। 'হ্যালো'র উত্তর মুখে নিয়েই সুপ্রিয় অলককে বললে,—কী হে মুরুব্বি, পদ্মবিভূষণকে ভস্ম করে বুড়ো জজকে তাঁর উত্তরাধিকারী ঠাওড়ালে?

—তা তো হয়েইছে বিকাশের ধূর্তামিতে! এখন দেখতে হবে এ স্পার্কলিং এশেসে আর্নটা আন্‌লেমেণ্টেড কি না—হাতে-ধরা কাগজের রুলটা সুপ্রিয়র দিকে বাড়িয়ে বললে অলক।

—দেখেছি। সুপ্রিয় ডাক্তারি শাস্ত্রে অল্পবিদ্যায় ভয়ঙ্কর এফেক্ট তৈরী করতে চাইল সভার মাতব্বরদের ভেতর,—খবরটা অ্যাল্‌কোহলিকের হ্যালুসিনেশনও হতে পারে!

—অ্যালকোহলিক হলেও অভিদা পারমিতার বাবা—একটু তির্যক হয়ে উঠল অলকের মেজাজ,—জজবাড়ির রায় কি প্যারাটা অভিজিৎ রায়ই লিখেছেন?

—জজসায়েব তো তা-ই দিলেন। উপাধ্যায়ের কাছে বাবা শুনেছেন, একবার না কি তোমার অভিদা উপাধ্যায়ের সাহিত্যকেও আক্রমণ করেছেন।

—তারই লেমেণ্টেশন চলছে বুঝি উপাধ্যায়ের এখন তোমাদের বাড়ি বসে?

—ধেৎ—উপাধ্যায় আর আসবেন ভেবেছ। কিন্তু তোমাদের মুস্কিল হতে পারে। বাবা তোমাদের সভায় প্রধান অতিথি না-ও হতে পারেন!

—বললেন নাকি তোমাকে?

—আমাকে! বিচারক তাঁর ক্রিমিন্যাল ছেলের সঙ্গে কথা বলেন! নাটকীয় হাসি হেসে উঠল সুপ্রিয়।

—কোথায় শুনলে তাহলে?

—বাবা-তে দাদাতে বৈঠক হচ্ছিল টেলিফোনের ঘরে। টেলিফোনে গিয়ে জনশ্রুতি নিয়ে ফিরলাম। ইভসড্রপিং নয়!

—না-না তুমি আড়ি পাতবে কোন্ দুঃখে? যা করবে সবার চোখের উপর! উপাধ্যায়ের মতো পদ্মে বিভূষিত নও তো!

—তা বলে ড্রেনের গন্ধ পেতে চেয়ো না কিন্তু আমার শরীরে। অশোক—ড্রাগনের

শুঁড় থেকে গীতা-উদ্ধার করে একাদশ অবতার হয়ে গেছি!

—গীতা? ও, তোমার সেই যোধপুরী বেগম!

সুপ্রিয় হাসিতে ব্যঙ্গধ্বনি শুনিয়ে বললে,—আচ্ছা কম্প্যারেটিভ লিটারেচার, বলতে পারো, বেগমের সঙ্গে আমাদের রূপকথার ব্যঙ্গমীর কী সম্পর্ক?

—বুঝতেই পারো, ব্যঙ্গার্থে বেগমরাই সব ব্যঙ্গমী—সোনার খাঁচার পাখী!

—তাই বলো! আমিও ভাবছি, স্বর্ণকারের আত্মহত্যার দিনেও কেন আমাদের বেগম-দের এমন সালঙ্কারা কন্যা সাজবার ঝোঁক!

সোমাকে মনে পড়ল অলকের গীতাকে নয়। যে-মেয়ে ছিল কণ্বমুনির আশ্রমের শকুন্তলা সে আজ দুষ্মন্তের প্রাসাদে এসে হীরামুক্তামাণিক্যের ছটায় কী একটুও ছটফট করে উঠছে না? বৌভাতের দিনের সোমার মুখটা মনে আনতে চাইল অলক! শার্ঙ্গরবকে দেখে শকুন্তলা চমকে উঠেছিল! মনে কি পড়েনি তার শুধু সপ্তপর্ণী হাতে নিয়ে আশ্রম থেকে বিদায় নেবার দিনগুলো? এই আষাঢ় কি আসবে না তার বহুযুগের ওপার হতে? মনে পড়বে না কবির ছন্দে গাঁথা বর্ষামঙ্গল। 'দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ—পরো দেহ ঘিরি মেঘনীল বেশ।' লাল বেনারসী পরা সোমার মনে কি পড়বে না সেই দিনগুলো? হয়তো মনে পড়বে না। হয়তো পড়বে। দিদির কি মনে পড়েনি তাঁর সমস্ত অতীত—সমস্ত অতীত বজ্রগর্ভ মেঘের মতো ফেটে পড়েনি কি সেদিনকার সে-চীৎকার? তিনিও তো শান্তিনিকেতনের মেয়েই ছিলেন। কাল কি দক্ষিণেশ্বরে দেখে এলেন তিনি বিদ্যাপতিরই সেই রাত্রি: 'তিমির দিক ভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরিকো পাঁতিয়া—' ডানের স্থির আলো সেই তমসাবৃতার চোখে কী অস্থির অথবা নিমগ্ন। কালের উৎসমুখ দেখেই কি দিদি স্থির হয়ে গেলেন? সুস্থ? যে গূঢ় তমসা ফ্রয়েডের উপলব্ধিতে ছিল না—তাঁর 'ইদ্' যে-ইদমের নাগাল পায়নি—যা শুধু ভারতের উপলব্ধিতে ছিল—ছিল ভারতীয় প্রতীকে—কালির রহস্যের কালিকা-মূর্তিতে, তার সান্নিধ্যেই কি নিরাময় হয়ে গেলেন না দিদি?

হঠাৎ অলককে চুপচাপ দেখে একটু বিব্রত হয়েই যেন সুপ্রিয় বল্‌লে,—তোমাদের শান্তিনিকেতনের মেয়ের কথা বলছিনে—সোমার কথা! ধরো মলু—বা উপাধ্যায়ের শ্যালিকা—ওরা তো পড়াশুনো করছে কিন্তু সোনালি সাজবার কী লোভ!

অলক যেন স্বপ্ন থেকে কথা বলে উঠল,—সোমা! গীতা সোনালি পাউডার চুলে মাখে না তো, ওর জামাইবাবু যেম্নি চন্দনের গুঁড়ো গায়ে মাখেন?

—তাতেই কি আর চন্দন হওয়া যায়? দাদা আজ সত্যি মোরোস্। জওহরলালের মৃত্যুতেও তাঁকে এমন দেখা যায়নি।

—সুব্রতদা? হ্যাঁ, তোমাদের বাড়ি তো উপাধ্যায় আসতেন। এখনো যেন অলকের কথাগুলো সংশ্লিষ্ট হচ্ছিল না।

—তুমি কি মনে করো না উপাধ্যায় ডুম্‌ড হয়ে গেলেন!

—কী জানি!

—অবশ্যি ডক্টর রয় থাকলে হয়তো বেঁচে যেতেন! ডক্টর রায়ের মতোই চাপা হাসিতে সুপ্রিয় মুখটা প্রশস্ত করে তুলল।

হয়তো সুপ্রিয়র এ হাসির সঙ্গে অলক তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা ডক্টর রায়ের ফ্যুল্-ফিগার অয়েল-পেণ্টিংটার মুখের হাসি মেলাতে চাইল, হয়তো বা অধ্যাপকদের উপরই সুপ্রিয়র এই দুর্বোধ্য হাসিটাকে ছড়িয়ে দিয়ে সে নিজের জামাইবাবুর কথাই ভাবলে।

কিম্বা সব জামাইবাবুর কথা, যারা শ্যালিকাদের শরীরের উপর দাবী জানাতে একটুও ইতস্তত করে না। যা-ই সে মনে-মনে করুক বা ভাবুক, সুপ্রিয়কে শুনিয়ে সে বললে, —চরিত্রহীন!

—কে, আমি! হেসে উঠল সুপ্রিয়,—তাহলে তো শিল্পী হয়ে গেলাম!—'মদনভস্মের পর' কবিতাটা পড়েছ নিশ্চয়, চরিত্রহীনতায় শিল্পীদের আর 'মনোপালি' নেই।

—তাহলে তো জমিদারির মতো চরিত্রের পরগাছাটা উচ্ছেদ হয়েছে, বলো! বাঁচা গেল! চরিত্র নিয়ে যে কতো ভুগেছি!

কিন্তু এই চরিত্রহীনতার আলাপে সাক্ষাৎ চরিত্রের মতো ঋজু দেহে এসে প্রবেশ করল বিকাশ,—এক-কথায়ই ডেকোরেটার কাৎ। কাতের খবর বলতে সুপ্রিয়কে দাঁত দেখাতে হল তার,—যাঁহাতক শোনা আপনার বাবা প্রধান-অতিথি, হাতজোড় ওম্নি। বললে,—তা-ই দেবেন। সভা-টভা হয়ে গেলেই, যা পাওনা হয় মিটিয়ে দেবেন।

সুপ্রিয়কে খুশী দেখাল না। অলক কাগজের রুলটা বিকাশের হাতে গুঁজে দিয়ে বললে,—পড়ো। ফিফ্থ্ পেজ।

—কী? হতভম্ব হয়ে গেল বিকাশ।

– উপাধ্যায়ের নিউজ। এনাদার মিঃ হাইড।

নির্বাক হয়ে বিকাশ বানরের চুল-বাছার ভঙ্গী আঙুলে এনে পৃষ্ঠাটা বার করে চোখ নিঝুম করে ফেলল।

সুপ্রিয় বললে,—মনে হয়, মলুর আর গীতার ধারণাটাও ভালো নয়—জানো অলক, রাদার আনকাইন্ড—ওদের মুখে যতোটুকু শুনেছি উপাধ্যায় সম্পর্কে, তাতে মনে হয়!

—হুঁ।

—জানো, মেডিক্যালম্যান অনেকে বলেন, মানুষ যখন মারা যায়—তার শরীরের সব দুর্বলতা একসঙ্গে কথা বলে ওঠে। ভাবছি, উপাধ্যায়ের বেলায় তা-ই হল কি না।

বিকাশ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বললে এবার,—সুমিত্রদাকেই যে এসব লেখা হয়েছে তা হয়তো অনেকেই বুঝবে না। নাম তো নেই।

—নামটা লালবাজারে ঠিকই থাকবে। এবং এ-লালবাজার চাইনীজ রেড্ নয়। সুপ্রিয় অলকেই দৃষ্টি নিবন্ধ রাখলে।

বিমূঢ়ের হাসিতে বললে বিকাশ,—বৌদি নিশ্চয় খবরটা দেখেছেন!

চব্বিশ

ওস্কার ওয়াইল্ডের নায়ক ছাড়া অভিজিতের কৈশোরে কোন্ পুরুষ বা আয়নায় বারবার গিয়ে দাঁড়াত? সচ্চিদানন্দের যে-ভাই শহরের শৌখীন নাটকের অভিনেতা ছিলেন এবং প্রচুর মদ্যপান করে চল্লিশ বছর বয়সে লিভার সিরোসিসে মারা গেছেন—তাঁর যৌবনে, অভিজিৎ তাঁর মুখেই ওস্কার ওয়াইল্ডের নাম প্রথম শোনে। এবং নিজের যৌবনে ওস্কার ওয়াইল্ড পড়বার সময় জানতে পারে বোদ্‌লেয়ারের 'বাবুরীতি'র উত্তরসাধক ছিলেন এই দ্রোহী সাহিত্যিক। চির যৌবন কে না চায়—যযাতি তাঁর বার্ধক্যে চান নি? গ্যেটে-রবীন্দ্রনাথ চান নি? সচ্চিদানন্দ চান নি? তা-ই যদি না হবে, যুবতী নার্সের কী দরকার ছিল তাঁর? ইচ্ছে করলে মা বা গৌরী ওটুকু কাজ করতে পারতেন। বাবা চাননি, তাই

ওঁরাও করেন নি। ভেবেছে কোনো-কোনো সময় অভিজিৎ। ভেবেছে মেয়েলি পুরুষদের, যাঁরা আয়নায় দাঁড়ান বারবার অথবা যৌবন চান। মৃত্যু ছাড়া আর কোনো সত্য যে-জীবনে নেই—সে-জীবনের যৌবন মুখোশ ছাড়া কী?

প্রত্যেকদিন মদ খাবার সময় মৃত্যুকেই ভেবেছে অভিজিৎ এবং নেশার মুখোশ পরেছে—যা যৌবন ফিরিয়ে আনতে পারে। যখন নেশা থাকে না তখন সে সত্যের কতো কাছাকাছি। বৃদ্ধ। মৃত্যুর সন্নিকটে।

অ্যালকোহলিকের মতো সকালেও তাই যৌবন-রস পান করতে সুরু করেছিল অভিজিৎ, মদকে হলাহল ভেবেও।

আজ পয়লা জুন। তার আগে পয়লা মে ছিল। মে ডে। দিনটাকে হিটলার পালন করে তার রংটা ব্রাউন করে দিয়ে গেছে। তাই তো ব্রাউন মে ফ্লাওয়ার! গেরুয়া। কেন যে এ-ফুল শুক্লার বাগানে! অল্প নেশায় কাল রাত্রির ঘটনা স্মৃতি হয়ে গেছে। শুক্লার বাড়িটা নর্ডিক হিটলারের বের্লিন হয়ে গেছে যেন। বিয়ার সেলার! হ্যাকার ব্রাউ বিয়ার! আজকাল আর পাওয়া যায় না। ওয়েস্ট জার্মেনীতে অমিতব্রত কী খায়? বেশ আতিথেয়তা শুক্লার। বিদেশী মহিলাদের মতো। বেশি পড়াশুনো করেই মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মনে হয়। অ্যাল্‌কোহলিক! সন্দেহ হচ্ছে, সত্যি উপাধ্যায় তার শীলতাহানির চেষ্টা করেছিলেন কি না—না কি ওটা অ্যাল্‌কোহলিক শুক্লার স্রেফ হ্যালুসিনেশান। নিউজটা বেরিয়ে গেল! একটু অস্বস্তি অনুভব করছিল অভিজিৎ। woman is paragon of animal-beauty! শুক্লার হাসির স্মৃতির সঙ্গে অ্যালসেশিয়ানের ডাক মিশিয়ে শ্রুতির পরীক্ষা করল অভিজিৎ। হাসল মনে-মনে। আত্মজীবনীতে বলেন নি জওহরলাল, কতোদিন পরে কুকুরের ডাক শুনলাম!

একা একা কথা বলছিল অভিজিৎ। কুসুম চা দিয়ে গেছে। গৌরী আসেনি। গোসাঘরে। দোষ নেই। পারমিতার পুত্রোৎসবে তো উপস্থিত থাকে নি অভিজিৎ! শুক্লা। ডেসডিমোনার শুভ্র রুমালের মতো শুক্লাকে হাতে নিয়ে ওথেলো বলতে চাইল : ইট্ ইজ দ্য কজ্! শুক্লা না গৌরীর মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে! মল্লিকাকে জানে না সে। গোপন রাখতে পারত যেকালে অভিজিৎ সেকালের ঘটনা মল্লিকা। এখন সে মৃত্যুর অনেক কাছাকাছি। খ্রীষ্টানদের মতো কিছুই গোপন রাখতে চায় না—যেমন শুক্লাও। কিম্বা গোপন রাখতে পারে না।

শুক্লার সুরেলা গলার একটা কথাই এখন অভিজিতের শ্রুতিতে বেজে উঠল,—জানো রয়, আমি মনের কামারশালায় আমার জাতির জন্যে বিবেক গড়ে তুলতে চাই! বোধহয় জয়েসিয়ান কথা। জাতি, বিবেক কে এসব। কার প্রতীক? মেয়ে? মেট্রিয়ার্কি? শুক্লার বিয়ার সেলারে ওকে মেয়ে-হিটলারই মনে হল নাকি কাল? কী সচ্ছন্দে সান্ন্যালকে আর আমাকে 'তুমি' বলে গেল। যেন আমরা গোয়েবল্‌স্‌-গোরিং! মন্ত্রী-সেনাপতি! হ্বাগ্‌নার শোনাতেও চেয়েছিল। রেকর্ড না কি আছে! পুরোপুরি সিম্বলিক শুক্লা! আমাদের জাতীয় সমাজতন্ত্রের মেয়ে! বণিকপুত্র শালিগ্রামটা কেন? স্বতন্ত্রপার্টির কোনো ক্লুপ? জজবাড়ির সুব্রত বলতে পারে! বেচারি উপাধ্যায়! লালশিবিরে পা বাড়িয়ে গ্যাস্‌চেম্বারে যাবে এখন।

কিন্তু কী আন্‌ফর্‌গেট্‌বল্‌্ ভয়েস মেয়েটার—জিনের মিহি নেশায় অভিজিৎ যেন শুক্লাকে ওর বয়সের পনেরো বছর পেছনে ঠেলে নাৎসী জার্মেনীর কোনো মার্লিন ডিয়াট্রিক

বানিয়ে গান শুনতে চাইল : 'ফলিং ইন্ লাভ্ এগেন'। কিন্তু ধুয়ো উঠছে—কালকের দৃশ্যটা থেকেই ধুয়ো উঠছে! শালিগ্রাম আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে সবার ঠোঁটের সিগারেটে। শুক্লারও! মাতাল বেটি ডেভিসের অভিনয় দেখছিল অভিজিৎ। ইট্ হ্যাপেন্‌ড্ ওয়ান-নাইট!

আধবোঁজা চোখের উপর পিছির ঝালর, নীলচে ধুয়োর পেছনে আধবোঁজা স্বর, —কে বলতেন, শালিগ্রাম—মালার্মে? 'আই পুট সাম্ স্মোক্ বিটুইন্ দ্য ওয়ার্ল্ড এণ্ড মিসেলফ'?

অভিজিৎ দাঁড়াল। মা-বাবার কাছে যেতে হয়! জয়েসীয়ান নায়কের মতো অনুশোচনায় চীৎকার করে উঠতে চাইনে আমি ওঁদের মৃত্যুর পর,—তোমরা আমায় বাঁচতে দাও! অপরাধ সে সন্তান হিসেবে অনেকেই করেছে। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় বাড়ি না ফেরবার অপরাধ বুঝি অসহ্য। কার মনে, মা-বাবার? তা সে জানে না। নিজের মনেই যেন অসহ্য। শুক্লার সেলার তবু যা হোক, পার্গেটরির আগুন। অপাপবিদ্ধ হতে ইচ্ছে করছে তার! কিন্তু নেপথ্যের রাজা কি তার বরাবরই শুভ্র নয়—ধোঁয়ার আড়ালের রাজা? তার পানাসক্তি কি তাকে ইনার সেল্‌ফের মুখোমুখি বসতে শেখায়নি?

পর্দা ঠেলে বারান্দায় যাচ্ছিল অভিজিৎ—সামনে গোরী। পারমিতার মা। কাল যে পারমিতা মা হয়েছে। যে পারমিতার মুখে 'গ্যাস্' কথাটা কী হাল্কা, কী সহজ! দম বন্ধ করে দেয় না—জমাট করে দেয় না রক্ত। কিন্তু দিয়েছে তা কতো উদ্বাস্তু ইহুদী ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও সেদিন। সমস্ত বাঙালীর উদ্বাস্তু হতে ক'দিন বাকি?

তবু যেন বারান্দায় এসে গোরীর শরীরে একটা মায়ের গন্ধ পেল অভিজিৎ। বলা যায়, একটা সুষমার গন্ধ; মিষ্টি, স্বাদু গন্ধ। তার ছেলেবেলাকার বড়ো রান্নাঘরের গন্ধ। গ্র্যান্ডের টেবিলে যা নেই—গোরীর ডাইনিং টেবিলেও যা ছিল না। শুধু মার রান্না-ঘরেই ছিল, ডালে-ডালনায়, শুকতোতে, ভাপের মাছে, পায়েসে, লুচিতে, মালপোতে, কলা-পেয়ারা-শশা-কমলার গন্ধ মেশানো ভোগের আতপ চালে! গোরীর টেবিলে কারখানার তৈরী জেলিতে কি সে গন্ধ ছিল? মালপোর গন্ধ টোস্টে? কিন্তু নিখুঁত পেলো মার রান্নাঘরের গন্ধ অভিজিৎ এ বারান্দায়—গোরীর সঙ্গে।

—হাসপাতালে টেলিফোন করেছ? গোরী বললে।

—ওটা তো জয়ন্তরই জানানোর কথা, তা-ই না? খুব তন্ময় হয়েই বললে অভিজিৎ।

—কাল জয়ন্ত বলে গেছে, আজ হাসপাতালে যেতে পারবে না—ওর বোনকে দেখতে আসবে আজ!

—কী করে জান্‌ব, বলো—পালিশ ঠোঁটে হাসল অভিজিৎ,—আসা তো হল না কাল আমার। এমন ধরে পড়লেন কাল মহিলা!

—কে? মিসেস্ সান্ন্যাল? খুবই নিস্পৃহ শোনালে গোরী। সব বয়সী মেয়েই স্বামীকে সন্দেহ করতে পারে কিন্তু গোরী তা কোনো বয়সেই করেনি। হতে পারে বিয়ের আচার থেকেই এ-বোধ জন্মেছে কিম্বা পরবশ্যতার ঐতিহ্য জন্ম দিয়েছে এ-বোধ যে সন্দেহ করে লাভ নেই।

—বলতেও পারো! শেষটায় না অলকদের বাড়ির মতো একটা ডিভোর্স হয়ে যায়! অভিজিৎ হাসিটাকে হার্দ্য করলে।

পারমিতা যার মেয়ে, 'ডিভোর্স' শব্দটাকে অলুক্ষণে ভাববার তার সঙ্গত কারণ আছে।

গৌরীর ভুরু কুঁচকোল খানিকটা। বললে,—থাক্। তুমি কোথাও বেরোচ্ছ—

হয়তো নেশায়, কিম্বা একটা নতুন অনুভবে আজকের বারটা যেন ভুলে গিয়েছিল অভিজিৎ,—কী বার আজ? সোম—না মঙ্গল। মঙ্গল আমার ছুটি!

—সোমে তো মঙ্গল-টঙ্গল ভুলে বসে আছো! চোখের হাসিটা তরুণীর তড়িৎ-ঢালা করে গৌরী বললে,—যাও যেখানে যাচ্ছ, আমি ফোন করে জানাছি!

—মা-বাবাকে দেখতে যাচ্ছি—

অবিশ্বাসে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দিল গৌরী অভিজিতকে।

সোমরস-টস্ কী যেন বলছিল কাল শুক্লা। রসই হোক আর সুরাই হোক—তাকে এখনো অ্যালকোহলের মতো বিষ ভাবতে পারল না অভিজিৎ। এ এমন এক রসায়ন যার পথে সব-কিছু অমূর্ত। অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্ট। চোখে অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্ট আর্ট জন্ম নেয়। বস্তুত—বস্তুবিশ্বই তো এখন মায়া—অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্ট—নিউট্রন-প্রোটন। পুরুষ-প্রকৃতি আইডিয়া আর ইগো। মেয়েরা তো সাক্ষাৎ অহঙ্কার—পুরুষ অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট প্রেম। মেয়েদের বাস্তব প্রতিষ্ঠা চাই—অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-অলঙ্কার-যানবাহন সব। পুরুষের মনে একটা বাউল বসবাস করে। কোন্ বিদেশী লেখকও বলেছিলেন কথাটা। সিঁড়ির গোড়ায় যেতে যেতে অভিজিৎ নামটা মনে আনতে চেষ্টা করল। গ্রাহাম গ্রীণ। যিনি থ্রিলার ছেড়ে সাহিত্য রচনা সুরু করেছিলেন! আর আমরা? সাহিত্য ছেড়ে থ্রিলার!

সুমিত্র উপাধ্যায়! সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে উপাধ্যায়কে পাশাপাশি মনে আনল অভিজিৎ। ও'র যে-বইটার চিত্ররূপ দেখেছিল সে—ওটা তো স্রেফ থ্রিলার! সাহিত্য যে উনি কবে লিখেছেন তা জানে না অভিজিৎ। শুক্লা বললে। কাল মাত্র শুনল সে পদ্মবিভূষণ সুমিত্র উপাধ্যায় একদিন সাহিত্যিক ছিলেন।

দোতলার বারান্দায় এসে বাবার ঘরে তাকালো অভিজিৎ। মা-ও নিশ্চয় সেখানে। নার্স তো নেই। 'একদিন আমি শিশু ছিলাম'—কেন যে মনে এলো কথাটা অভিজিতের! গোলাপী নেশায়? না তুলতুলে কোনো শিশুর গোলাপী হাত-পা স্মরণে এনে? পারমিতার একদিন বয়সী বাচ্চাটা কেমন হয়েছে দেখতে? কার মতো?

পর্দা ঠেলে বাবার ঘরে ঢুকল অভিজিৎ। বাবা আধ-শোওয়া। মা বসে আছেন পায়ের কাছে। নেশা না থাকলে হয়তো পতিদেবতার একটা হাস্যকর ছবি চোখে ধরা পড়ত অভিজিতের। কিন্তু এখন সে বাবার পায়ের উপর চোখ রাখল। চোখ ঝাপসা হলেও দেখতে পেলো রুক্ষ—একজোড়া রুক্ষ পা।

গত সন্ধ্যার ব্যবহারে সচ্চিদানন্দ যতো দুঃখিতই হোন, জজবাবু-এঞ্জিনীয়রবাবু-দেববাবু সবার কাছেই অভিজিতের পক্ষ নিয়ে বলেছিলেন : এখন তো কাগজের অফিসেই কাজের পাহাড়—তাই হয়তো জিতু আসতে পারল না—ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল যুগে মশাই, পাল-পার্বন হয়তো উঠেই যাবে। এখনও তেম্নি প্রশান্ত গলায় বললেন সচ্চিদানন্দ,—এসো।

মা দরজায় তাকালেন। কিন্তু চুপচাপ। মুখে কোনো রেখাই নেই যা দেখে কোনো মনোভাব আঁচ করে নেওয়া যায়।

তবু এগোল অভিজিৎ—মার দিকেই এগোল। 'একদিন আমি মার কোলে শিশু ছিলাম' আবার কথাটা মনে এলো হয়তো অভিজিতের—অধিকরণ যোগ করে। 'মার অধিকারে ছিলাম আমি'—কর্ত্রীত্বে ভূষিত করলে মাকে অভিজিৎ। সেই সুগন্ধ পেল আবার। যেন আপেলের গন্ধ। তাকালো বাবার ওষুধপথ্যের টেবিলটার দিকে। না, আপেল নেই। এখন

তো আপেলের দিনও নয়।

—উনি চোখে ঝাপসা দেখছেন—ক'দিন থেকেই, বলছিলেন। সচ্চিদানন্দ ছেলেকে স্ত্রীর চোখের দোষের কথা জানালেন, অভিজিতকে মার কাছে সন্তর্পণে আসতে দেখে।

—তা-ই বুঝি, মা? একটু দূরেই থমকে দাঁড়াল অভিজিৎ।

—ঝাপসা দেখাই তো ভালো তারপর একেবারেই না দেখা। মা মাথাটা উপরে-নীচে দুলিয়ে বললেন।

মা সেই যুগের মেয়ে যাঁদের জানা ছিল যেখান থেকে যাত্রা সুরু সেখানেই ফিরে আসতে হবে। পৃথিবীর কক্ষের মতোই তাঁদের পথ। ঋতু ধরে-ধরে ছেড়ে-ছেড়ে আসা। কেন এমন, প্রশ্ন নেই। বাপের স্নেহ থেকে স্বামীর প্রেমে আসা, স্বামীর প্রেম থেকে মাতৃত্বে আসা, মাতৃত্ব থেকে দৌহিত্রের কৌতুকে—তারপরই যদি পিতৃগৃহ থাকত সেখানেই হয়তো ফিরে যেতেন তাঁরা। 'ইন মাই বিগিনিং ইজ মাই এন্ড'। পিতৃগৃহ নেই মার তাই স্বামীর কাছেই আবার আশ্রয় নিয়েছেন, পুত্রে-দৌহিত্রে লগ্ন হয়ে থাকেন নি। এখন কি স্বামীও আবার খারাপ লাগতে লাগল, যেমন হয়তো লাগত, আমি যেদিন শিশু ছিলাম!

অভিজিৎ একটু কুঁজো হয়ে জিজ্ঞেস করলে,—সব-কিছুই বুঝি তোমার খারাপ লাগছে?

—মরলে ভালো না? জীবন-মরণের ব্যবধান যেন মা বুঝতে পারছিলেন না।

অভিজিৎ সোজা দাঁড়িয়ে বললে,—না।

মানুষকে বিশ্বাসে উজ্জীবিত করতে হলে যেমন বিশ্বাসীর ঋজু ভঙ্গি আনতে হয় শরীরে তা-ই আনলে অভিজিৎ।

সচ্চিদানন্দ বিষণ্ণ মুখে বোধহয় ছোট এলাচ চিবুচ্ছিছেন। অভিজিতের মনে হল এবার যেন পায়েসের গন্ধ পেল সে।

মা বোঁজা-বোঁজা চোখে আর ঠোঁটে হাসি নিয়ে বললেন,—কেন?

—মরবে না। তা-ই।

বাবাকে একটু সুখী মনে হল। বললেন,—তোমার মাকে নিয়ে যাও না কোনো ওপথেলমিকের কাছে—চেনা আছে?

আমার হাতে মার ভার দিচ্ছেন বাবা? কোনোদিন তো দিতে চান নি! কিন্তু অবাক হল না অভিজিৎ। এখন বোধহয় কিছুতেই অবাক হতে নেই। এক্ষুনি যদি মেঝেতে একটা গাছ গজিয়ে যায়। আর শেকস্পীয়রের নাটকের একটা দৃশ্যের মতো তা এগিয়ে আসতে সুরু করে তাহলেও অস্বাভাবিক মনে হবে না অভিজিতের। বলবে সে : চমৎকার!

—বেশ তো, যাওয়া যাবে! রাসবিহারী এভিনিউতেই তো চক্রবর্তীর চেম্বার আছে। কী বলো মা? যাবে। তা-ই তো!

মা হাত বাড়ালেন। কিচ্ছু বললেন না।

এইমাত্র কি হাঁটতে শিখেছে অভিজিৎ। এগোলো সে। ভুলে গেল তার মুখে যে দুধের গন্ধ নেই।

মা যেন অভিজিতের মাথাটা নাগাল পেতে চেষ্টা করলেন, অ্যালকোহলিজ্‌মে যে-মাথা শূন্য হয়ে যায় নি। কিম্বা শতকীয় রোগ নিঃসঙ্গতায়।

একটু নীচু হল অভিজিৎ।

মাথায় হাত দিতে পারলেন মা। হাত দিয়ে বললেন,—যাবো।

যে-সময়টায় অভিজিৎ বলে কেউ ছিল না সে-সময়টাকেই কি নাগাল পেল সে, মা যখন শিশু ছিলেন!

মাথা সোজা করে অভিজিৎ বললে,—আজ যাবে? অবশ্য কাল আমার ছুটি।

—কাল। বেশ, কাল।

মাকে কী প্রবোধ দিয়ে এলো সে? সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে ভাবছিল অভিজিৎ। কাল। কাল এবং কাল। টুমরো এণ্ড টুমরো। ডিউপ অব টুমরো ইভ্‌ন্ ফ্রম্ এ চাইল্ড্। মা-হারা শিশু কিন্তু আজ মার ছবি পেল!

বারান্দায়ই ছিল গৌরী। অভিজিৎ জিজ্ঞেস করলে,—পুপু কেমন আছে?

—ভালো।

মাথা নেড়ে 'সেলারে' ঢুকে গেল অভিজিৎ। পারমিতা যেদিন পুপু ছিল। মাথা নাড়বার সময় হয়তো ভাবল সে। যার জন্যে ঘরটার 'সেলার' নাম—সেই ত্রিকোণ টেবিলটার কাছে আর গেল না অভিজিৎ। ত্রৈমাসিক *20th Century* কাগজটা হাতে নিলে ফোনের টেবিল থেকে—কাল শুক্লার কাছ থেকে এনেছে। আজ পড়ে জানাবে কেমন লাগল—বলে এসেছিল কাল। কাল। গত কাল আর আগামী কালের মতো নয়।

পঁচিশ

জজবাবু রাজি হলেন না। পদ্মনাভর শূন্য আসন পূর্ণ করতে রাজি ছিলেন তিনি। কিন্তু যোধপুর পার্কের জনৈক সম্মান-প্রাপ্ত সাহিত্যিকের নামে যখন জনৈকা শিক্ষিতা মহিলার সম্মানহানির অভিযোগ আনা হয়েছে দৈনিক কাগজে, অবসর-প্রাপ্ত হলেও শশাঙ্ক-শেখরের বিচারপতির সত্তা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। সে-উত্তেজনা যখন বিষণ্ণতায় রূপান্তরিত, যা সবরকম উত্তেজনারই পরিণতি, তখন সদলে সুপ্রিয় তাঁর শোবার ঘরে প্রবেশ করে জানলে বাবা প্রধান অতিথি হতে রাজি নন।

বিকাশের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কোথায় একজন মুরুব্বির সঙ্গে হার্দ্য সংযোগে ভবিষ্যৎটা তার ফর্সা হয়ে যেতো—না এ কী সংবাদ।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সুপ্রিয় বিকাশ আর অলককে বোঝালে, কেন একজন কুখ্যাত লোকের আসনে বাবা বসতে নারাজ!

অলক বুঝতে রাজি ছিল কিন্তু বিকাশের মনে অন্য চিন্তা বা অন্নচিন্তা তখন সুপ্রিয়র কথায় মাথা নাড়তে নাড়তে সে বসবার ঘরে এলো। এই প্রথম। এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভাবলে, সুমিত্রদার মতো, এই না শেষও হয় তার।

খানিকক্ষণের জন্যে কৌচে ছড়িয়ে বসলও ওরা তিনজন, একঘণ্টা আগে যেখানে শশাঙ্কশেখর আর সুব্রত চিন্তামগ্ন হয়ে বসে গেছেন।

কিন্তু চিন্তার কোনো বালাই-ই ছিল না সুপ্রিয়র। বললে সে—অলককেই বললে, —বুঝতেই পারো আমি যখন ইম্মর‍্যালিষ্ট আমার বাবা কতোটা মর‍্যালিষ্ট হবেন। এবং যদি কখনো আমার পুত্র জন্ম নেয় সে ফিরে আবার কতোটা মর‍্যালিষ্ট। ইউজেনিক্সের নিয়মই তা-ই।

এ-ধারার বংশালোচনায় বিকাশের মন ছিল না কারণ সে অসচ্ছল পিতার অসচ্ছল পুত্র। অলককে সে-ও বললে,—গেঁয়ো যোগীই ভালো—কী বলো, অলক? হিড়িম্বা-

নন্দনকেই বলি।

—ঘটোৎকচ আছেন কলকাতায়? অলক হাসতে লাগল।

—হাতি তো সব মেরে ফেলা হচ্ছে জ্যুতে! সুপ্রিয় হাসিতে যোগ দিলে।

—নিউ আলিপুর হচ্ছে কি না ও এলাকায়। বিকাশ তার দন্তে শুধু হাসতেই জানে না, দংশনও করতে জানে।

—ব্রিজটা যে ছাই কবে শেষ হবে আমাদের! বিকাশের দাঁত বসল না সুপ্রিয়র চামড়ায়। বসলেও সে-রক্তে বিষের ক্রিয়া নেই, দেখা গেল।

—মিত্রাদি গাইবেন তো, অলক? সভায় মন নিয়ে গেল আবার বিকাশ

কিন্তু জিজ্ঞাসাটা নীতি-দুর্নীতির আবহাওয়ায় ভেসে এলো বলে অলক হাসি নিবিয়ে বললে,—আজ ত দিদি সম্পূর্ণ সুস্থ। তাছাড়া, পণ্ডিতজী তো মেয়েদেরই 'হিরো'-ই ছিলেন!

—হুঁ। স্টেটসম্যান ময়দান-সভার ছবি ছেপে তা-ই দেখাচ্ছে। সুপ্রিয় বললে।

—তুমিও কম যাও কিসে? মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো ড্রাগনের কুণ্ডলী থেকে তুমিও তো কন্যা উদ্ধার করেছ! অলক হাসিতে ফিরে এলো।

—ভালো। সুপ্রিয় নড়ে-চড়ে উঠল,—করব, গীতাকে একটা টেলিফোন? ওর জামাইবাবুর খবরটা পেয়েছে কি না দেখতে হয়।

সুপ্রিয় টেলিফোনে হাত বাড়াল। আবার জামাইবাবু-প্রসঙ্গ! অলক উঠে গিয়ে বিকাশকে টানলে,—চলো যাবে না কি হেরম্ব কবিরাজের বাড়ি!

বিকাশ তড়িৎস্পৃষ্ট মরা ব্যাঙের মতো লাফিয়ে উঠল।

অলক সুপ্রিয়কে বলে গেল,—পূর্বরাগটা জনসমক্ষে করতে নেই—চলি আমরা, সুপ্রিয়।

সুপ্রিয়র আপত্তি ছিল না। কেন না, উপাধ্যায়ে সে মোটেও কৌতূহলী নয়, শোক-সভাতেও নয়—কাল বিকেলে নীলঅঞ্জনঘনপুঞ্জ ছায়ায় অম্বরটি যা সম্বৃত ছিল আজকের ফোরকাষ্টও তা-ই, যদি বিকেলে তেমন একটি সম্বৃত অম্বর পাওয়া যায় তাহলে কোনো সতনু মেয়ের 'অসম্বৃত কাঁখের ভিত' দেখবার তো পরম মুহূর্তই বলতে হবে।

বিকাশ অলককে নিয়ে বাইরে এসে বললে,—জজবাবু বাঁক্‌ড়োর দু'টো ঘোড়া দিয়ে টেবিল সাজিয়েছেন কেন বলো তো! এমন দু'টি অশ্বমেধের ঘোড়া বাড়িতে থাকতে?

—কী বলতে চাও, ফার্টিলিটি কাল্ট?

—বড়োলোক বুড়োদের তো ওই আফশোষ, নাতিনাতনীতে বাড়ি ভরে যায় না কেন! চালের দোকান লুঠ করতে হয় না তো ওদের! লুঠ করে যা আলিবাবার ধন এককালে জড়ো করেছেন, মন পঞ্চাশে উঠেও তো ওঁদের মন্বন্তরে ভোগায় নি!

লালশিবিরের বলেই যে বিকাশের জজবাবুর উপর উষ্মা তা তো নয়—সভাটা তিনি পণ্ড করতে চান বলেই তার আক্রোশ স্বাভাবিক—তা-ই ভেবে নিয়ে চুপচাপ হাঁটতে লাগলে অলক বিকাশের পাশে-পাশে।

ডেকোরেটারের কাজ সুরু হয়ে গেছে সার্বজনীন জমিতে।

পাশ কাটিয়ে যাবার মুখে হাঁকল বিকাশ,—ও মিস্ত্রীভাইরা—শেষ করতে পারবে তো পাঁচটায়?

একটি কণ্ঠ শোনা গেল,—ঠিকার মাঠের লোককে তা বলতে হয় না, বাবু!

অলক হেসে বললে,—লকা-ফকা কী বললে হে? আমাকে গালাগাল দিলে না কি?

—এঞ্জিনীয়ররের এলাকার ছেলে যদি অলক হয়—মিস্ত্রির মাঠের ছেলের নাম লকা হতে ক্ষতি কী? বিকাশ হাসলে জজবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই প্রথম।

—শুধু অলকাপুরীই নয় একটা লকাপুরীও আছে দেখা যাচ্ছে!

—সুমিত্রদা বলতে পারতেন ওটা লঙ্কার অপভ্রংশ কি না!

—প্রমীলারাজ্য না কি?

—কে বলবে! মেয়েতে উৎসাহ মোটেও নেই বিকাশের। থাকবার কথাও নয়। বোনটি যে তার ভোর থেকেই লকার মাঠের মেয়েদের মতোই গলাবাজি সুরু করে তার জন্যে যতোটা মেয়েতে নিরুৎসুক সে, তার চাইতে বেশি শুধু এ-কারণে যে মেয়ে নামক সুন্দর জন্তুগুলোকে বিয়ে না দিয়ে উপায় নেই।

—অলকার মেয়েরাই হয়তো অন্য নামে লকার মাঠে আছেন! হাসল অলক।

—সব ভূশণ্ডীর মাঠে! গম্ভীরভাবে বললে বিকাশ!

—ওটা কিন্তু এ এলাকা! দেখছ তো কী পরিমাণ তালগাছ!

—বিশেষ, যোধপুর পার্ক।

দেববাবুর বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল ওরা।

—আমরা কিন্তু নারকেলকুঞ্জে আছি!

—ওটাও-ও দক্ষিণীফল। লঙ্কা থেকে আমদানী!

—লঙ্কা-সমসমাজিদের মুখ থেকে শুনেছ না কি?

—তেলেঙ্গানা-কেরালাও হতে পারে। মুখ টিপে হাসল বিকাশ, যা অস্বাভাবিক তার পক্ষে; দাঁত না দেখানোই অস্বাভাবিক।

কেউ-কেটা হয়ে উঠল না কি আজকাল বিকাশ। এই শোকসভাটা না করতেই? তাছাড়া, সুমিত্রদার জন্যেও তো বিশেষ শোক দেখা যাচ্ছে না! ধূর্ত, ধূর্ত! ভাবলে অলক। রাষ্ট্রনীতির পাঁড় মাতালরা যা হয়! রাষ্ট্রনীতিতে গান্ধীজী আর পণ্ডিতজী আনবেন প্রেম-মৈত্রী! স্বয়ং ঈশ্বর নেমে এলেও তা হবে না!

স্টেশন রোডের মোড়ে আসবার আগে ওদের আর কথা হল না। কাছেই হেরম্ব সেনগুপ্তর 'পার্বতী কুঞ্জ'। মায়ের নাম পার্বতী ছিল এ-ধাপ্পাই দিতে চায় হেরম্ব। আসলে, পর্বতভ্রমণ করে এসে খাসিয়া না লেপচা মেয়েদের নিয়ে হেরম্ব একটি পর্নোগ্রাফি লেখে এবং পুজোর হিড়িকে তিন মাসে পাঁচহাজার বই কেটে যায়। ফলে প্রচুর রয়েলটি, আগাম চুক্তি, চিত্র-প্রযোজকের নেক-নজর প্রভৃতিতে অতিদ্রুত 'পার্বতী কুঞ্জ' গড়ে ওঠে। উপাধ্যায়ের সার্টিফিকেটও ছিল এই সাফল্যের পেছনে। সে বলেছিল,—এই নবমহাভারতে আমরা দ্রৌপদীকে নগ্নভাবে চিনতে পারলাম। কিন্তু এই দুঃশাসন-সুলভ দৃষ্টির ফলে হেরম্বের ক্রেতা বাড়লেও, শ্বশুরের কোপদৃষ্টি পড়ল। এসব ঘটনা অবশ্য বিকাশ আর অলক জানে না—সুমিত্র-হেরম্ব প্যাক্টের খবর যুযুৎসু রণেন মিত্র বিলক্ষণই জানে। বিকাশ জানে, সাহিত্যিকরা কেউ কারো ভালো চান না।

—রণেনদা আসছেন জানলে ঘটোৎকচ আবার কী বলে বসে, কে জানে? বিকাশ চিন্তিত মুখে হাঁটতে লাগল।

—কেন, শ্রাদ্ধমণ্ডপটাকে কুরুক্ষেত্র ভাববে—হয়নি জীবনানন্দ দাশের বেলায়? আমি অবশ্য জানিনে, শুনেছি! অলক হাসতে লাগল।

চেঙ্গ-ফেঙ্গ বোধহয় কিছু না—কোন্ আত্মীয়ের বিয়েবাড়িতে হয়তো ডেকচি-কড়াই-হাতা-খুন্তি সাপ্লাই দিতে গিয়েছিল হেরম্ব। দেখা গেল সামনের বারান্দায়ই সে আসীন। সামনের ছোট বাগানে কলাবতী গাছ। তাহলেও কলাগাছ আর হাতির শুঁড় ভেবে নিতে অলকের কষ্ট হল না। কিন্তু সিদ্ধিদাতাতে নমস্কার জানিয়ে গেটে ঢুকল বিকাশ।

—হেরম্বদা—আপনার কাছেই আমরা এসেছি। বিকাশ পূর্ববৎ দন্ত-বিকশিত করল।

খবরের কাগজটা—সেই সুমিত্রর নিয়তিবাহী কাগজটা পাশেই ভাঁজকরা ছিল হেরম্বর। চোখ ছিল কলাবতী গাছে, তখনও অপ্রসবা কলাবতী গাছে উদাস। মুখ ফেরালে সে। বললে,—কী খবর? পেয়েছি—তোমাদের নিমন্ত্রণচিঠি পেয়েছি!

আজ হেরম্বকে একটু নরম দেখে দুজনেই হয়তো খুশী হল, দুজনই উঠে এলো বারান্দায়।

—সেই তো বলতে এলাম, হেরম্বদা—বিকাশ ভণিতা সুরু করলে।

বামপন্থী দল রাষ্ট্রে অধিকার করলে যে প্রোপ্যাগাণ্ডা মিনিস্টার হবে—মানে ডক্টর গোয়েরল্‌স্, তাকেই দেখতে লাগল চুপচাপ অলক।

—কী? কী? কী বলবে, বলো! হেরম্ব উৎকর্ণ হল।

—সুমিত্রদা তো অসুস্থ। ভীষণ!

বিকাশের কথাটা ব্লটিং পেপারের মতো হেরম্বর মুখ থেকে সবটুকু লাল কালি শুষে নিলে।

নম্রতার গলায় আওয়াজ বেরোলো,—হুঁ।

—তিনি তো সভায় প্রধান অতিথি হতে পারছেন না—আপনাকে এ-দায়িত্ব নিতে হবে, হেরম্বদা।

—আমি? হেরম্ব বোধহয় সুমিত্রর নিয়তির সঙ্গে নিজের নিয়তির সমীকরণ করেছিল: কাগজটা অনিচ্ছুক আঙুলে তুলে নিয়ে বললে,—এই নিউজটার দরুণই হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সুমিত্র।

—না হেরম্বদা—পাশের একটা লম্বা বেঞ্চিতে এতোক্ষণে বসবার সুযোগ পেল বিকাশ,—মাথায় একটু গোলমাল হয়েছিল আগে থেকেই। আজ সকালে বৌদি আমার বাড়ি এসেছিলেন। এই নিউজ পড়ে না কি আনম্যানেজেব্‌ল্ হয়ে উঠেছেন। মিথ্যা বানিয়ে তুলতে একটু ইতস্তত করল না বিকাশ।

—কী সর্বনাশ! মুখে আতঙ্ক ফুটিয়ে তুলল হেরম্ব।

—বৌদি বললেন দুটো পুজো কনট্র্যাক্ট ছিল, দুটোই সকালের টেলিফোনে খতম। চোখ কপালে তুলে বলল বিকাশ।

বেঞ্চির পাশে দাঁড়ানো অপরিচিত ছেলেটির জন্যেই অপ্রকৃতিস্থ হল না হেরম্ব। নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করে বললে,—খুবই দুঃখের খবর!

কিন্তু খবরটা যে দিল তাকে মোটেও দুঃখিত মনে হল না। বিকাশ সেসব তরুণেরই পীর হতে চায়, যারা বাবা মারা গেল কতো দ্রুত শবটাকে কেওড়াতলা নিয়ে যেতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চালায়। এ-নিষ্ঠুরতা হয়তো কলকাতার জায়গার অভাবই তৈরী করে তুলেছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যদি বিকাশের মনে কোনো দুরাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়ে থাকে তবে সুমিত্র। অতএব সে নিশ্চয়ই ভাবতে পারে জ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকরা নিপাত গেলেই কনিষ্ঠদের পক্ষে মঙ্গল। কনিষ্ঠ বলতে তো এখন আর একটি-দুটি নয়, শ'য়ে-হাজারে। এতো

কনিষ্ঠের জায়গা কোথায়? হেরম্ব সেনগুপ্ত তো বলেই: ট্রেনের ফার্স্টক্লাশ কামরায় আমরা আগে উঠে গা' লাগিয়ে বসেছি—তোমরা, ছোটরা, উঠতে এলে আমরা উঠতে দেব কেন, কেন জায়গা ছেড়ে দেব! হেরম্ব সেনগুপ্তকে দিয়ে কিছু কনিষ্ঠ তাড়ানো—কাজ ফুরোলে পাজী।

—সে-দুঃখ পরে করা যাবে হেরম্বদা—বিকাশ ব্যস্ততার ভাণ আনলে চোখে মুখে এবং অসহিষ্ণুতার ভাণ করে ঘোড়ার মতো পা' ঠুকে।—বলুন—আপনি রাজি। নইলে আমাদের মুশকিলে পড়তে হবে।

—রণেন সভাপতি হচ্ছে? হেরম্ব আর সুমিত্রলগ্ন হয়ে রইল না।

—তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ও'র পপুলারিটি বাড়ছে কি না।

—ও'র সাহিত্য-রীতিটি কী?

—উনি তো বলেন। মহাভারতীয়। নিয়তিবাদ। কখনো ভাঙবেন, কখনো গড়বেন।

অসহ্য মনে হল অলকের। না বলে সে পারল না,—ভুলে যাচ্ছ, বিকাশ, ওটা সাহিত্য-সভা নয়, পণ্ডিতজীর জন্যে শোক-প্রকাশ!

—সে তো ময়দানে হয়েই গেছে! আবার কী! বিকাশ ঘাড় ফিরিয়ে হাসল।

অলকের মনে হল, বিকাশের মাথায় একজোড়া শিং থাকলে ওকে বলদের মতো দেখাত না, ঠিক শয়তানের মতোই দেখাত।

হেরম্ব হেসে বললে,—পণ্ডিতজী তো একজন সাহিত্য-রসিকও ছিলেন। আমরা সাহিত্যিকরা না-হয় তাঁর সেদিকটা নিয়েই আলোচনা করব।

অলক মুখ ফিরিয়ে নিলে। পণ্ডিতজীর সাহিত্য-বোধ নিয়ে আলোচনা করবে হেরম্ব সেনগুপ্ত যে কলকাতা বুঝতে ফিরিঙ্গি-কেচ্ছাই বোঝে শুধু এবং তাই বুঝে শহরতলীতে এসে ঠাঁই নিয়েছে!

কিন্তু হেরম্বর কথায় সম্মতির ইঙ্গিত পেয়ে বিকাশ চটপট দাঁড়িয়ে গেল,—পাঁচটায় আমি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাব, হেরম্বদা!

—তা-ই এসো। নির্বিকার চিত্তে বললে হেরম্ব এবং বলে গেল,—তা-ই ভালো। লেখায় বসলে তো আর হুঁশ থাকে না ঘড়িতে ক'টা বেজে গেল! হাসিতেই বিদায় সম্ভাষণটা জানাতে চাইল হেরম্ব।

ওরা যখন স্টেশন-রোডে, ডায়মণ্ডহারবারের দিকে একটা গাড়ি যাচ্ছিল। অলক বললে,—হেরম্বর বারোটা কখন বাজাবি, বিকাশ?

—সে কী? হকচকিয়ে উঠল বিকাশ।

—আমার তো মনে হচ্ছে—কাগজে সুমিত্র উপাধ্যায়কে বেফাঁস করেছিস তুই এবং তোকে যারা পোষ্য নেবে ভাবছে, সেই সাপ্তাহিক!

—কী যে বলিস!

—না-না, ওদের বারোটা বাজালে আমার আপত্তি নেই—আমার তো ইচ্ছে হয় হেরম্বকে ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেনে তুলে দিতে—বাজারে-সাহিত্যিক যখন, মাছের বাজারটা চিনে আসুক। তাছাড়া, ও দরজা দিয়েই তো সায়েবরা তাঁতির বাজার সুতোনুটি ঢুকে ফিরিঙ্গি তৈরী করেছিল—সে-ধুরন্ধর মাটির গন্ধটা শুঁকে আসুক শুঁড় দিয়ে হেরম্ব।

উপসংহার

জজবাবু আজও গীতা-পাঠ করেছেন, মৃত্যুর বা নব-জীবনের জন্যে মন তৈরী করবার জন্যে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

মরজীবনে বিশ্বাস করে সম্প্রতি তিনি অমরতায় আস্থা আনছিলেন। কিন্তু মর-জীবনেই যে বাস-পরিবর্তন করে দিতে হয় তা বসবার ঘরে যাবার আগে তিনি ভাবতে পারেন নি। কাগজটা নিয়ে সুব্রত ময়লা মুখে বসে আছে—যে মুখ শশাঙ্কশেখর কোনোদিন দেখেছেন বলে মনে পড়ল না।

—সুমিত্রকেই কারা ব্লেকমেইল করেছে, বাবা! কথাটা বলবার জন্যেই যেন সুব্রত বাবার অপেক্ষায় ছিল।

—কী ব্যাপার? স্বর্গ থেকে লাফ দিয়ে যেন শশাঙ্কশেখর মর্ত্যে পড়লেন—লাফের আশঙ্কাই ফুটে উঠল এখন তাঁর মুখে। সুব্রতর মুখোমুখি বসে তিনিও রেখাকুটিল করে তুললেন মুখ। অবিশ্বাসের রেখা। মর জীবনে অবিশ্বাস।

—এসব মেয়ে হয়তো ব্লু ফক্সেরই মেয়ে—কেন যে এদের সঙ্গে মেশামেশি করত সুমিত্র। নিজের 'হায়াসিন্থ' গার্লের কথা ভেবে চিন্তিত হচ্ছিল সুব্রত। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লাইফে এলে কী হবে, মৌমাছির মতো তো মেয়েরা নয় যে টাকার মধুতে লুব্ধ হয়ে ফুলে-ফুলে ঘুরবে আর সব প্রেম থাকবে মৌচাকে! পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে নিজের একটি মৌচাক চাইবেই টাইপিষ্টগার্ল—যেখানে সে মক্ষিরাণী। নিশ্চয়ই সুমিত্রকে কোন এক মক্ষিরাণী ভুলিয়েছে সে-সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত। তা-ই সুমিত্রর দুর্দিনে সহানুভূতিশীল হয়েই বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল সুব্রত।

জজবাবু ব্লু ফক্সের নাম এই প্রথম শোনেন নি। সুপ্রিয়র প্রসাদে কানে এসেছে নীল শেয়ালের ইংরেজি নামটা। মেয়ে-ব্যাপারে যে ব্রহ্মার মতোই শিল্পী-স্রষ্টাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না তা জেনেই তিনি পদ্মবিভূষণকে পদ্মপাণি বিষণ্ণ বুদ্ধ ভেবে 'পদ্মনাভ' নাম দিয়েছিলেন। তিনিও তো 'পদ্মনাভ' নাম শরণ করেন শয়নের আগে। তাতে ঘুম ভালো হয়। অন্তত স্বপ্ন। সারা রাত তিনি মৃত স্ত্রীকে স্বপ্নে পান।

—মেয়েরাই অপবাদ দিলেন উপাধ্যায়কে? অপরাধীর মতোই বললেন জজবাবু।

সুব্রত বাবার হাতে কাগজটা রেখে উঠে চলে গেল—যা সে কোনদিন করে না। ঘরে এলো। এলিয়টের হায়াসিন্থগার্ল কি বোষ্টনের না লণ্ডনের? বোষ্টনের মুখ পাতলা। লণ্ডনেরই হবে। তবে এখন তো লণ্ডনেও ভীষণ কীলার হয়। হায়াসিন্থগার্লের কথা-গুলো অস্পষ্ট মনে পড়ল তার : 'আলোর ভেতরের স্তব্ধতায় তাকিয়ে আমি কিছুই তো জানতে পারিনি!' অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের চেলা-চামুণ্ডারা যা বলতে পারে। ইংল্যাণ্ড! মহাযানকে কী পছন্দই না করেছেন টয়নবী! এলিয়ট ব্যাঙ্কে কাজ করবার সময়ই হয়তো বুদ্ধভক্ত। আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লাইফেও মেয়েরা ভিক্ষুণী হয়ে চলেছে। তবু স্বধর্ম। পরধর্মে লণ্ডন নিহত। আমাদের সেই ভয় নেই। কিন্তু কী জানতে চায় তার হায়াসিন্থ গার্ল বা বাড়ির মেয়েরা? মণিকা, সোমা, মলুয়া, মহুয়া? দীপশিখার কথা ভাবলেনা সুব্রত। মার জীবনের সঙ্গে-সঙ্গেই যা এ-বাড়ি থেকে উঠে গেছে। বাল্‌বই

ভাবলে। তার ভেতরের স্তব্ধতার কথা ভাবলে। গাঁয়ের ছেলে কলকাতায় এসে বাল্ব ফিউজ হলে যে মজা পায় তেমন ইতর মজার কথাও সুব্রত ভাবতে পারল না। তার প্রাক্তন এঞ্জিনীয়ারিং মন নিয়েই তারের ভেতরকার বিদ্যুৎকে ভাবলে—বাধা পেয়ে প্রজ্বলনের কথা। মণিকা মাঝে-মাঝে দপ্ করে ওঠে! কেন? তারের ভেতরকার সহজ বিদ্যুৎ প্রবাহ—তার সহজ-জীবনযাত্রায় যখন বাধা আসে তখনই দপ করে জ্বলে ওঠে। কম্প্লিট কম্বাশ্চনের স্তব্ধতা নেই—তেল পুড়ে যেখানে লুপ্ত—যেমন মা, যেমন ভিক্ষুণীরা মাটির দীপ জ্বেলে তার দিকে তাকিয়ে নিষ্কম্পভাবে নিজেদের লুপ্ত করতে শিখতেন। এই তো ময়নামতীতে সে-সম্প্রদায়ের বিহার পাওয়া গেছে সেদিনমাত্র! সেদিন থেকে মার দিন—বাংলা-সনের বয়স হবে কমপক্ষে—১৩৭০ বছরের ব্যবধান! একই রকম লুপ্ত করে দেওয়া। বাবার দেয়ালে মাত্র একটা ছবি। মণিকা ভুলেও দেখতে যায়না—প্রণাম করা তো দূরের কথা!

মণিকা ঘরে ছিলনা। অপিসে বেরোবে সুব্রত। তাই সুরেনকে দৌড় করাতে গেছে মণিকা রান্না ঘরে। বাবা-মায়ের মতো স্বামী-স্ত্রী এরা নিশ্চয়ই। সুব্রত ভাবছিল স্নানে যাবার আগে যতোটুকু সময় পাওয়া যায়—ততোটুকু সময় যেন সে আজ ভেবেই কাটাবে।

শেভিং-এ বসল সুব্রত। সে-কিছু দার্শনিক নয় যে কাজ ছেড়ে চিন্তায় মন দেবে। এতোটা সময় যে সে দিয়েছিল তা-ই একটা ব্যতিক্রম। তার সহজ জীবনে একটা বাধার দরুণই এতো-কিছু ভাবা। বাধা সুমিত্রর খবর। ভাবনার পাহাড়টার বাঁকের দিকে তাকাল সে এখন। যোধপুর পার্কের ঝিলের কচুরি-পানা থেকে ময়নামতীর ভিক্ষুণী—জমিদার-অধ্যুষিত মামাবাড়ি মৈমনসিংহের অধিত্যকায় ঢাল—তারপর বরাবর দক্ষিণের সমুদ্র-ঘেঁষা বরিশালের শ্বশুরালয়। হায়াসিন্থগার্লের উপকূল আর বঙ্গোপসাগরের উপকূল খুবই কাছাকাছি—উচ্চতায় কি না তা সুব্রত জরিপ করতে পারলনা তবে ছেলেবেলায় শুনেছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা আর কচুরীপানা প্রথম মহাযুদ্ধেরই ফসল। মৃত্যু আর জীবন।

জীবন! কী জীবন জানতে চায় তার অপিসের আলোকিত ঘরে বসে হায়াসিন্থ-গার্ল? কী জীবন? শেভিং-ক্রীমে তেমন ফেনা ছিল না। স্বামী-পুত্র-চাকর-বাকর? এই কি জানতে চায় টাইপিষ্ট মেয়েরা? ডালহৌসীর অপিস-বাড়ির মেয়েরা? বিবাহিতা আছেন কেউ-কেউ, তাঁরা বা কী চান? সংসারের জন্যে টাকা—না স্বাতন্ত্র্যের জন্যে? যতোটা ফেনা উঠল—তাতেই ব্লেড চালাল সুব্রত। মণিকা জজবাড়ির সোনার সংসারের স্তব্ধতায় তাকিয়ে কী জানল যাতে সে মুখর হয়ে ওঠে মাঝে-মাঝে—তারপর অবশ্য ঝিমিয়ে পড়ে।

মুখ পরিষ্কার হতে বেশিক্ষণ লাগল না। কাজের সঙ্গে চিন্তা জড়ালে কাজের গতি বেড়ে যায়। চিন্তা তো একটা পাওয়ার—হর্স-পাওয়ার! সুমিত্র আর আসবে কি? এলে জিজ্ঞেস করা যেতো, অশ্বমনোরথ মানে চিন্তার হর্সপাওয়ার কি না! তা-ই হবে। নইলে ছ'মাসের পথ ছ'দিনে কী করে আসা যেতো। সিরাজউদ্দৌল্লার আমলে কী স্টীমার চলেছে —না পালের-জাহাজ! ভারতচন্দ্র তো সেদিনেরই কবি! আদিরসের কবি! কিন্তু রাজনীতির প্যাঁচ জানতেন! ভারতচন্দ্রকে সুমিত্রর সঙ্গে মেলাতে চাইল এবার সুব্রত মনে-মনে।

স্নানের জন্যে তৈরী হল এখন সুব্রত। তার আগে মার পাশাপাশি মণিকাকে আনতে চাইলে। মণিকার সঙ্গে তার বিয়ে বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা নয়—ভারতচন্দ্রের কালের সে-ঘটনা এখন অবশ্য অহরহই হচ্ছে। কিন্তু মণিকা মার মেজাজের কেন নয়? মাঝখানে ওই মহাযুদ্ধ—যা বিপ্লব এনে দেয়। রাশিয়ায় সেটা চোখে দেখা গেল—লেনিন ভ্রূণহত্যা আইনসঙ্গত করলেন। ও তো আর অহিংস বিপ্লব নয়! মার সময়ে যে কুমারীর ভ্রূণ

জন্মাত না তা তো নয়—বিদ্যারই যখন তা হয়েছিল—কিন্তু তখন সুন্দরদেব সেই বিদ্যাদের বিয়ে করতে হত—অ্যাবরশনিষ্টদের কাছে ঠেলে দিত না। কী জানি—আগুনে-চিতার রসটস না কি ছিল!

এ সব চিন্তায় নিজেকে পঙ্কিল মনে করবার ইচ্ছা বোধহয় বিশুদ্ধ বুদ্ধির মানুষেরও হয় না, যদি তাঁরা বিবাহিত হন। চিন্তায় কে পঙ্কিল নয়? কিন্তু সুমিত্র এ কী করতে গেল? সত্য হোক, মিথ্যা হোক এ-সব কেলেঙ্কারি অবশ্য চিরস্থায়ী হয় না। সুব্রত নিজেকে ভাবলে। তার ভেতরের ডার্টি লিনেন যেন বেরিয়ে পড়ছে। ওয়াশ দরকার। স্নানে যেতে দেরি করলে না আর সে।

কিন্তু জজবাবু? খবরটা দু'বার, তিনবার খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়লেন তিনি। ভাবতে চাইলেন, 'যোধপুর পার্কের জনৈক সাহিত্যিক' পদ্মনাভ না-ও হতে পারে কিন্তু সুব্রত যখন সুমিমত্রকেই সন্দেহ করছে, বন্ধু বন্ধুর অনেক গোপন কথাই তো জানে, তখন তিনি আর বেনিফিট অব ডাউটে পদ্মনাভকে মুক্তি দিতে যাচ্ছেন কেন? দ্যান নি কি? এজলাসে বসে এমন বেনিফিট কোনো আসামীকে দ্যাননি কি জজবাবু? সমস্ত কর্মজীবনটা খুঁজতে সুরু করলেন তিনি। ফলে. নিবিষ্ট হতে পারলেন না, অস্থিরতা বাড়ল। উঠে পড়লেন শশাঙ্কশেখর। কোথায় যাবেন? কোথায় যাওয়া যায়।

কাগজটা কৌচে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। তিনি তার বাবার বিচার করেছেন, খুনীর, শ্লীলতাহানির বিচার করেছেন, সুপ্রিয়র, মলুয়ার বিচার করেছেন কিন্তু নিজেকে বিচারের সময় যখন এলো—তখন শশাঙ্কশেখর বাইরের ঘরের এজলাসে আর বসতে পারলেন না। তার মনে হল, ঘরটা অপরাধের সরজমিন হয়ে গেছে। সুপ্রিয়র জন্যে নয়, সুপ্রিয়র ওই নোংরা অনুচরের জন্যেও নয়, মলুয়ার জন্যে নয়—যে এসে প্রায়ই টেলিফোনে বসে, ঈশ্বর জানেন, কার সঙ্গে কথা বলে—পদ্মনাভর জন্যে কি? পদ্মনাভকে আসামী ভাবতে পারছেন তিনি? না।

নিজের ঘরেই এলেন তিনি—স্ত্রীর কাছে, যিনি দেয়ালে আছেন—এ-ঘরে একদিন ছিলেন, তাই আছেন। কেউ নেই—এ কি হতে পারে? গীতায় বিশ্বাস থাকলে ভাবতে পারে কেউ যে একজন ছিল, আজ নেই? বেশ পরিবর্তন মাত্র। যেম্নি জজের ধরাচুড়ো থেকে তিনি ধুতিফতুয়ায় এসেছেন তেম্নি এ-থেকে নগ্নতায় চলে যাবেন চিতা থেকে প্রেতের শরীরে। নিরালম্ব। বায়ুভুক। আরেক পোষাক যতোদিন না সুব্রত শ্রাদ্ধ করে পিতৃলোকে তাকে শান্তি দেয়। হিন্দু আইন নয়, হিন্দু সংকার—রিচুয়্যাল ভাবলেন শশাঙ্কশেখর। 'মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর'—না। সুব্রতই ত্রাণ করবে তাঁকে পুৎ নামক নরকে যখন প্রেত হয়ে থাকবেন তিনি।

কিন্তু নরকে তো তাঁকে যেতে হবে। কেন? পত্নীর দিকে তাকালেন প্রেত শশাঙ্কশেখর। বিবস্ত্র। নব দেহ। তাঁরই আরেকটি দেহ। এনে দিয়েছিলেন কি পেত্নী—না-না পত্নী। নিজেকে প্রেত ভেবে হঠাৎ স্ত্রীকে পেত্নী ভেবে বসলেন শশাঙ্কশেখর। জজবাবুর পোষাকে ফিরে এসে বললেন: অন্যায়। তাঁর মনে হল এবার তিনি এজলাসে ঢুকেছেন নিজের বিচার করবার জন্যে। পত্নী সাক্ষী। আর গীতা—তাঁর বাইবেল। কে ছোঁবে? পত্নী তো ওটা ছুঁয়েই জীবদ্দশায় নিষ্কাম হয়ে গিয়েছিলেন। মানে একরকম ডিভোর্স। এঞ্জিনীয়রবাবুর মেয়ে, এখন বোঝা গেল, লম্পট স্বামীকে ডিভোর্স করেই এসেছে। তা নইলে হিষ্টিরিয়া পরমহংসদেবের স্থানে গিয়ে সারতে পারে। মেয়েটি গোড়া থেকেই হয়তো

ধার্মিক। শান্তিনিকেতনে মানুষ। হবার কথাই!

শশাঙ্কশেখর পুত্রবধূ সোমাকে ভাবলেন। শান্তিনিকেতনের স্নিগ্ধ মেয়ে! জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্নার উপর জ্যোৎস্না জড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি বেনারসী-স্মৃতির চান্দেরা শাড়ি দিয়ে। শুভরাত্রি—বৌভাতে। কী করতে পারেন তিনি এই জ্যোৎস্না যদি সুপ্রিয়র মতো অন্ধকারকে ডিভোর্স করে।

অনেক অপরাধীর মুখ দেখেছেন জজবাবু—কাঠগড়ায়—অনেক হয়তো অপরাধ না করেও কাঠগড়ায় অপরাধী, অনেক হয়তো অপরাধ করেও কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে গেছে! বিচারপতি কী সাধ্য, কী যোগ্যতা আছে তোমার বিচার করবার?

জজবাবু দৃশ্য থেকে প্রস্থান করলেন অধোবদনে। কিন্তু শশাঙ্কশেখরও কি রইলেন? কোলে কম্পিত শশকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু শশাঙ্ক। শুনল : 'তুমি করো না, করবার ক্ষমতা নেই বলে।' কে শোনাল, দেয়ালের ওই ছবি না সুপ্রিয়? পদ্মনাভ? মলুয়া? গীতা? শশাঙ্কের ইচ্ছে হল—মুমূর্ষু জন্তুটাকে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্ত্রীর পকেট-গীতাটা বুকে চেপে ধরে। স্বীকার করে, হাঁ আমি ওই মেয়েটিতে লুব্ধ হয়েছিলাম যার নাম গীতা।

গীতাটা হাতে তুলে নিলেন শশাঙ্কশেখর—দেয়ালে তাকালেন। দেয়ালের ছবির অবোধ্য মুখে তাকিয়ে বল্‌লেন,—এখন গ্রহণ করবে তো আমাকে?

আরো কী হত, কী বলতেন শশাঙ্কশেখর বলা যায় না—দেববাবুকে যদি দরজায় দেখতে না পেতেন।

পূর্ববৎ ভদ্রতা দেখাতে হয়তো একটু দেরিই করে ফেললেন শশাঙ্কশেখর তাই পিনাকীরঞ্জনকেই বলতে হল,—ও ঘরে আপনাকে না পেয়ে অন্দরেই ঢুকে পড়লুম।

—অন্দর! তখনও শশাঙ্কশেখর ভেবে ঠিক করতে পারলেন না প্রাক্তন দেববাবুকে নিয়ে কী করা যায়। কী বলা যায় ও'কে।

পিনাকীরঞ্জন এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঘরেই ঢুকে পড়ল,—ভেবেছিলাম ও-ঘরেই আপনাকে পাব।

—ও ঘরে? শশাঙ্কশেখরের মুখ থেকে পাকা ফলের মতো নিঃশব্দে শব্দটা ঝরে পড়ল।

পিনাকীর খেয়াল হল এবার জজবাবুর মুখের দিকে তাকাতে। তাকালো সে। কিন্তু ডক্টর রায়ের দৃষ্টি তো তার নেই যে রোগীর মুখে একপলক তাকিয়েই রোগ বলে দেবে! তাকিয়ে ভাবলে শুধু পিনাকী আজ যেন সে জজবাবুকে অন্যরকম দেখছে। কোথায় গেল সে হাসি, হাত বাড়িয়ে 'আসুন-আসুন' বলাও বা নেই কেন? কিন্তু যেহেতু সে ফ্রয়েডের রোগী নয়, অন্তত এখনও হয়নি—যা প্রায় প্রত্যেক জমিদার-নন্দনই, তাই জজবাবুর রোগটাও সে বুঝতে পারল না। একটু ইতস্তত করে বললে,—একটা খবর দিতে এলাম আপনাকে। বেরিয়েছিলাম বীমাবাবু আর এঞ্জিনীয়রবাবুর সঙ্গেই বাড়ি থেকে। ভাবলাম, আপনাকে খবরটা দিয়ে যাই।

জজবাবুরও এতোক্ষণে খেয়াল হল যে তাঁকে পরের কথা শুনতে হবে—যা চিরকালই শুনে এসেছেন। শুনে রায় দিয়েছেন। তাই একটু নড়েচড়ে বল্‌লেন,—কাগজের খবরটা?

—না। তবে ওটাও বলাবলি করছিলেন ও'রা। আমার একটা নিজস্ব খবর আছে কিনা।

—বসুন। ধাতস্থ হলেন শশাঙ্কশেখর। চোখের ইঙ্গিতে খালি চেয়ারটা দেখালেন।

পিনাকী চেয়ারে গিয়ে বসলেন, বললেন,—বলতে এলাম—আপনাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

—চেঞ্জে? যিনি কিছুক্ষণ আগে পোষাক পরিবর্তন করছিলেন 'চেঞ্জ' কথাটাই তাঁর মুখে সহজে ফুটল।

—চেঞ্জের পয়সা পাব কোথায়? এখন কি আর বাবার আমল আছে? খবরটার ভেতর ভাঙল না এখনো পিনাকী।

জমিদারের ছেলের যে দারিদ্র্য স্বীকার করবার সৎসাহস আছে তাকে আজ একটা নতুন আলোতে নিয়ে শশাঙ্কশেখর ফর্সা হয়ে উঠলেন। বললেন,—পৈতৃক ভিটেয় ফিরে যাবার মন হল না কি আবার?

—তা কি আর ফিরে পাব? ওখানে হুণের নজর। পিনাকী তার ইতিহাস জ্ঞান দেখাতে পেরে খুশী হয়ে উঠল,—গৃহিণী রাজি হয়ে গেলেন—যোগাযোগ—অদ্ভুত! বেলুড়ে-দক্ষিণেশ্বরেও বলতে পারেন!

মাঝখানকার গঙ্গায় যেন একটা চুবুনি খেয়ে উঠলেন শশাঙ্কশেখর। হেঁয়ালি। এ-ও একটা যোগাযোগ। হেঁয়ালিতে পড়তেই যেন হবে আজ বারবার। বললেন, স্বামী-সন্তরা যে এ-পাড়ায় আসছেন তার সূত্র ধরেই বললেন,—এঞ্জিনীয়ারবাবুর কথা বলছেন—তিনি বেলুড়েও যাচ্ছেন না কি আজ—আপনিও সস্ত্রীক?

—না-না। হাসল পিনাকী,—এঞ্জিনীয়ারবাবুও কথাটা পাড়লেন আর স্ত্রীও সেদিনই রাজি হলেন। বীমাবাবু বাঁশদ্রোণীতে একটা জায়গা নিতে বলছিলেন। গিন্নী তো একালের বিত্তবানের মেয়ে—যেতে রাজি নন। সেদিন এঞ্জিনীয়রবাবুও বললেন, বাঁশদ্রোণীতে গেলে কন্‌স্ট্রাক্‌শানটার ভার ওঁকে দিতে! এতো উঁচুর এঞ্জিনীয়র—ভাবুন, কোথায় নেমেছেন—যা হোক, হিউমিলিটির একটা আশ্চর্য মর‍্যাল ফোর্স আছে বোধহয়, সেদিনই স্ত্রী বললেন—তোমার ব্যাঙ্কের জমা যা-কিছু আছে তা দিয়ে বাড়ি হয় না—ওই বাঁশদ্রোণী না কি বলছিলে ওখানে? আমার জমা, আপনাদের কাছ থেকে কুড়িয়ে যা নিয়েছিলাম, তার অবশিষ্ট যা-কিছু!

গল্পের মেজাজে চলে এসেছিল পিনাকী কিন্তু জজবাবু শুনছিলেন যেন একটা নতুন কথা: হিউমিলিটি। শুনছিলেন পিনাকীর কথায়—ভাবছিলেন এঞ্জিনীয়রবাবুকে, এক মেয়ের অসুখে কী পরিবর্তন তাঁর। চেঞ্জ! বাস-পরিবর্তন। যুক্তির পথে চলে আসছিল তাঁর মন। বিচারে বসলেন আবার এবং যা বললেন তার শেষাংশ বিদেশী শয়তানের উক্তি হলেও বিচারকের,—কী জানেন দেববাবু—ভক্তদের বিনয়ের জলেই বোধহয় আমাদের নোংরা কাপড়চোপড়গুলো ধোওয়া উচিত! সে জলের রং গিরিমাটির। মানুষের বিচার-ক্ষমতা তাকে পশুর চাইতেও পাশব করে তোলে।

বিচারকের মুখে বিচার-ক্ষমতার নিন্দায় বিচলিত করতে পারত পিনাকীকে। কিন্তু কিছুই তো বিচার করেনি জীবনে। যা হবার তা হবে—এই তার আজীবন ধারণা। বাঁশদ্রোণীতে যে তার বাড়ি হবে, তাতে তার কতোটুকু চেষ্টা? যখন হবার হলই। মাধুরী রাজি—এঞ্জিনীয়রবাবু আর বীমাবাবুর প্রস্তাব! এর মধ্যে সে কতোটুকু?

হাসির মেজাজেই বললে পিনাকী, গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশনটা দেখেছেন তো? কী রং? সিমেন্টের রং—এঞ্জিনীয়রবাবুরা ঢুকবেনই তো গেরুয়া রঙের গেট দিয়ে!

দেয়ালের ছবির মুখের গেরুয়া রঙের দিকে একপলক তাকালেন জজবাবু,—আকাশ-

চাষীই হই আর স্কাই-স্ক্রেপারই তুলি—জানলেন দেববাবু, একদিন তো মাটিতেই মিশতে হবে সবার। দেখলেন তো জওহরলাল!

—দেখে তো এলাম—হাসতে লাগল পিনাকী,—সার্বজনীন পুজোর আরেক আয়োজন। পামগাছগুলোর আঙিনায় চাঁদোয়া—জওহরলালের পুজো হবে!

জজবাবু কপালে বলি তুললেন, যাতে তাঁকে অনেকটা টি. এস. এলিয়টের চল্লিশের দশকের চেহারার মতো দেখা গেল,—ভাবনা কী জানেন—জওহরলালের সমাজতন্ত্র ছেড়ে না জওহরলালপুজো সুরু হয়—স্টালিনকে নিয়ে তা-ই হয়েছিল।

—চিন্তা কী? তারপর একজন ক্রুশ্চফ আসবেন।

জজবাবু বিনয়ব্রত থেকে পুরোপুরি সমাজতন্ত্রে মন নিয়ে এলেন এবার। ব্যর্নাড শ' বুদ্ধিমতী মেয়েদের যেমনি ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র বুঝিয়েছিলেন পিনাকীকে খানিকটা তেমনি ধারাতেই বোঝাতে সুরু করলেন তিনি,—বাবার আমলের কথা বলছিলেন না, দেববাবু? সে যে কী সুন্দর আমল গেছে আমি তো দেখেছি—জমিদারও দেখেছি, চাষীও দেখেছি—রাজায় প্রজায় কী চমৎকার সম্পর্ক। ঠাকুরবাড়ির জমিদারী পদ্মাপাড়ে ছিল—নিশ্চয় জানেন। সাবজজ হিসেবে ও-অঞ্চলে ছিলাম তো আমি। স্বচক্ষে দেখেছি—সেই পিতাপুত্রের সম্পর্ক। সংস্কৃতির আদান-প্রদান। উকীল-মোক্তার-হাকিম-কোবরেজ এ'রা তো প্রজা আর জমিদারের মাঝামাঝির মানুষ? সবারই সেই এক ভদ্র-শালীন আচার-ব্যবহর। চোখের উপর রবিঠাকুরকে দেখলেন না? জমিদারের ছেলে ছাড়া এখনকার ধনপতির বা সমাজপতির কোনো ছেলে বলতে পারবেন,—'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে'? আমরা কী পেয়েছি সে-আমল থেকে তা আজ কেউ বিচার করে—জমিদারী উচ্ছেদ করো; তাতেই সমাজ-স্বর্গ তৈরী হয়ে যাবে! সুন্দর পরিচ্ছন্ন গৃহস্থালী, বয়স্কের প্রতি সম্মান, দরিদ্রের প্রতি দয়া—পাইনি আমরা জমিদারি আমল থেকে? অন্য বিষয় বাদই দিলাম। এখন পাচ্ছি নোংরা বস্তি, নোংরা কথাবার্তা, নোংরা পরিবেশ। গার্হস্থ্যবিজ্ঞান গলা টিপে গেলাতে হয় ইস্কুল কলেজে। বুঝুন।

খুশী হবারই কথা পিনাকীর এবং খুশী সে হলও। এবং তা দেখাতেই যেন বললে, —ছেলেরা এসেছিল সভায় যাবার নিমন্ত্রণ জানাতে—ভেবেছিলুম একবার যাব। যাব না, কী-বলুন?

জজবাবু প্যাঁচ মারলেন কথায়,—পাড়া ছেড়েই যখন চলে যাচ্ছেন, পাড়ায় সভায় আর যাবেন কী করতে?

—আপনিও তো নাকি প্রধান অতিথি হতে নারাজ, শুনলাম!

—হুঁ। জজবাবু একটু থামলেন,—এখন হয়তো রটিয়ে দেবে আমি অ্যান্টি জওহরলাল। বীমাবাবুর নামেও তো কতো রটিয়েছে! এঞ্জিনীয়রবাবুর মেয়েদের নামেও কুকথা রটাতে আর কদ্দিন—উপাধ্যায়ের নামে কী রটিয়ে দিল, দেখেছেন তো আজকের কাগজে?

সে কাগজ দেখেনি পিনাকী কিন্তু রটনার ঘটনাটা শুনেছে বীমাবাবু আর এঞ্জিনীয়র-বাবুর মুখে, যখন তাঁরা বাঁশদ্রোণীর ব্যাপারটা সাঙ্গ করতে এসেছিলেন। বললে তাই, —এঞ্জিনীয়রবাবুর বাড়ির দুর্ঘটনার খবরেই তো মাধুরী রাজি হলেন বাঁশদ্রোণী যেতে। ভয় পেয়ে গেছেন, ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে! উপাধ্যায়ের ঘটনা শুনলে তো আজই বাড়ি ত্যাগ করবেন।

বাঁশদ্রোণী তো নয় যেন বংশীধ্বনি শুনলেন জজবাবু শব্দটায়—পাশে হস্তচ্যুত গীতার দিকে তাকালেন। না-না, কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কি আর বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ হতে পারেন? বঙ্কিমচন্দ্রও তো হাকিম ছিলেন, তাঁর বিচারে শ্রীকৃষ্ণ কি আদর্শপুরুষ হতে পারলেন? ভেবে যেন খানিকটা শান্তি পেলেন জজবাবু, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে আপীল পাঠালেন না, লোয়ার কোর্টের বিচার শিরোধার্য করলেন। আসলে জজবাবু আজ বিচারে বসতেই রাজি নন। অন্য কথা ভাবলেন। মেয়েদের বোধহয় স্কুল-কলেজ আছে আজ—তাই সোমাকে দরকার। সোমাকে ডাকলেন তিনি, দেববাবুকে সরবত দেবার জন্যে।

পিনাকী জজবাবুর ডাক-হাঁকে এমনি মোচড়াতে সুরু করলে যেন কেঁচোর গায়ে নুন পড়েছে,—কেন আর বাড়ির মেয়েদের খামকা কষ্ট দেওয়া বলুন, তো—আপনার সৌজন্য, আতিথেয়তা আপনাদের ছেড়ে গেলেও চিরদিন মনে থাকবে।

এবার ঠিক হিউমিলিটিতে দীক্ষিত হয়ে উঠলেন জজবাবু,—যদি কিছু শিখে থাকি, জানলেন দেববাবু, জমিদারি আমল থেকেই—ধনপতিদের আমল থেকে কিছু নয়। তাঁরাও অবশ্যি ভদ্র, অমায়িক, সজ্জন হতে পারেন। পাড়াতেই তো, শুনেছি নাকি, তেমন দু'চার আছেন—এই তো বীমাবাবু, তিনি তো ধনপতিদের দলেই, দিব্যি একটা নিষ্কাম এসে গেছে মনে! আপনি তো ত্যাগের ভেতর দিয়েই চলেছেন! আপনার মতো হতে পারলাম কই?

বীমাবাবুকে আর যা-ই মনে করুক পিনাকী, নিষ্কাম, ত্যাগী মোটেও মনে করে না। অসুখ-বিসুখে ভগবানের উপর যতোটা পিনাকীর নির্ভর, এবং এঞ্জিনীয়রবাবুও যতোটা তা হয়েছেন—বীমাবাবু কি তা-ই। অসুখে ডাক্তার-নার্স সব-কিছু চাই তাঁর! এ না হলে কি ছেলে শুঁড়িখানা খোলে বাড়িতে! তাছাড়া, বাঁশদ্রোণীতে তাঁর প্লট বেরোল কী করে? যাক্ গে—যাক্। নিজের কথাই যে ভাবেনি কোনোদিন—পরের কথা সে ভাবতে যাবে কেন? ভেবেছে—নায়েবমশাই-এর কথা, যাঁর নামে চুরির অভিযোগ ছিল? আর চুরি! কে শিখিয়েছেন ও'দের? বাবা-ঠাকুর্দারাই। নায়েবকে মাইনে তো দিতেন দশ থেকে পনেরো। বলে দিতেন,—আর যা-কিছু করে-কম্মে খাও গে! তার মানে, এক হাত প্রজার ধানে আরেক হাত জমিদারের পাওনা খাজনায়! দু'হাতে লুঠ আর কাকে বলে!

যে যাকে নিয়ে ভাবলেন খানিকক্ষণ জমিদারনন্দন আর জজবাবু। তারপর কাচের গ্লাসে সরবত নিয়ে সোমা ঢুকল এই আত্মনিমগ্নদের ঘরে।

কিন্তু আজ যেন জমিদার-নন্দন পিনাকী মুক্তপুরুষ, তাই সোমার প্রবেশে বিশুদ্ধ, নিষ্কাম, নন্দনে নন্দিত হয়ে বললে,—বাঃ।

ট্রে-ধরা হাত কাঁপল একটু সোমার অপরিচিতের মুখে এই তারিফের ধ্বনি শুনে।

জজবাবু বুঝতে পারলেন পিনাকীকে। আজ যেন তাঁর মন সবার মনকে ধরতে পারছে। একটি বিন্দু থেকে মস্ত একটা বৃত্তে প্রসারিত। বাদ-ছাঁদ দিয়ে বাঁকা-চোরা এলাকা তৈরী নয়। মোটের উপর সবার মনের শরিক হতে পারছেন তিনি, যেমনি দেববাবুর, সোমার, সোমার স্বামী সুপ্রিয়র, মলুয়ার, উপাধ্যায়ের—সবার, শুধু সুব্রতর নয়, মহুয়ার নয়। দেখতে পারছেন মনিকাকে স্বার্থপরতায়, দুর্বলতায় মেয়েটা যে অসঙ্গতি-পূর্ণ—এখনকার বেশিরভাগ মানুষই যা হয়। তিনি দেখলেন তো আজীবন দৈবতজীবনের শরিক কেউ যদি থেকেও থাকে সে সিঁড়ি দিয়ে নামছে—যেন দার্জিলিং-এর জলা পাহাড় থেকে নীচে ওই চ্যালার মতো বিষাক্ত ট্রেনটাতে যেতে হবে। ম্যালে এলো, সঙ্গিনীকে বেছে নিল, নামছে—স্বার্থপর দু'জনই তাই একটু পথ নেমেই দুর্বলতা! তারপর সেই বিষাক্ত

ট্রেনে কলকাতা আসা, সঙ্গতি নেই—তবু এক কামরার যাত্রী! চলতে হবে—কলকাতা পর্যন্ত। যদি ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে দু'জনের কেউ মারা যায়? জজবাবু দেয়ালে তাকালেন। তারপর দরজায় মনিকাকে আশা করে তারপর সোমার মুখে—এখনো কাঞ্চনজঙ্ঘার লাইট-এফেক্ট যেন তিনি খুঁজলেন তিনি সোমার মুখে জলপাহাড়ের বাড়ির জানলা খুলে। ভোরের সোনালি! বিষে নীল হতে কতোক্ষণ?

বললেন,—মা, এই দেববাবু! দেবচরিত্রের মানুষ! তাঁর মুখে তারিফ পাওয়া চাট্টি-খানি কথা নয়!

মুখ তুলে রুপোলি হাসি হাসল সোমা—ক'দিন আগেও তার কোমর থেকে যে রুপোলি কল্কাটা ঝুলত—তারই মতো চিক্‌চিকে হাসি ফুটল দাঁতে!

মা বলতে বোধহয় সাধ জাগল পিনাকীরও। বললে,—ওসব তোমার বাবার বাড়িয়ে বলা মা—দেব উপাধি ধরে আছি বলে উনি ভাবেন আমরা সবাই দেবতার বাচ্চা। মোটেই কিন্তু তা নই! গৃহপালিত পশু বলতে পারো! দ্বিজুবাবু ঠিক চিনেছিলেন আমাদের; মানুষ আমরা নহি তো, মেষ।

পংক্তিটাতে অন্য যতি দিয়ে বললে পিনাকী। এবং ট্রে থেকে গ্লাসটা তুলে নিলে।

সোমা হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইল। সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মী উঠে দেব-অসুরের দিকে যেমনি বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়েছিলেন, সে-ছবিটা মনে আনতে পারলে—সোমার দাঁড়ানোর সঙ্গে মেলানো যেতো!

পিনাকীরঞ্জন দেব সুধা না বিষ পান করছিল বোঝা গেল না। অবশ্যি সবই তার পক্ষে সমান—এমনি শিব হয়ে গেছে বা বরাবরই ছিল সে। উলঙ্গ হতেও তার দ্বিধা নেই, শব হতেও না, পাথর হতেও না! সম্প্রতি সে পাথর ছাড়া আর কী? মাধুরী জল ঢালছে! মধুরই তো লাগছে জীবন। কোনোদিন কোনো আশাই সে করেনি—কাজেই সুখী।

লুব্ধতা দেখালেন শশাঙ্কশেখর। যদিচ তিনিও শিব। কিন্তু সতীকে যেন মনে পড়ল। দেয়ালের ছবিতে তাকালেন তিনি আবার। আসুরিক মনটাকে সমাধিস্থ করতে।

বললেন,—সুপু বেরিয়ে গেছে? না বেরোলে বলো তো আসতে।

ঘাড় কাৎ করে আজ্ঞা-পালন করতে গেল সোমা।

পিনাকী এক চুমুকেই বিষামৃত গলাধঃকরণ করে বললে,—সভায় কে কে আসছেন—জানেন তো? এঞ্জিনীয়রবাবু বললেন—অবশ্যি ছেলের মুখ থেকে শোনা খবর,—রণেন মিত্র, হেরম্ব সেনগুপ্ত—চেনেন না কি?

—চিনিনে। কিন্তু নাম পরিচিত। ও'দের বই দেখেছি সোমার কাছে!

—দু'জনই নাকি পদ্মবিভূষণের শত্রু-পক্ষ।

—তা হোন। জওহরলালের?

—মিত্র নাকি চীনপন্থী—ওকে যে কেন আনা হল! পাড়ায় না জানি ধরপাকড় লেগে যায়!

—হুঁ—ও ছেলেটারই কৌশল! ওর চেহারা দেখেই বুঝেছি! চিন্তিত হলেন জজবাবু।

বিকাশ বা অলক, যারই কৌশল বুঝে থাকুন জজবাবু, কৌশলীদের সম্পর্কে উৎসুক হল না পিনাকী। উঠে দাঁড়াল। তার খবর বলা হয়েছে। রেডিও স্টেশনের বার্তা-পরিবেশকের মতো চুপচাপ হয়ে গেল সে।

—এ কী! বসুন! কাতরোক্তি করলেন শশাঙ্কশেখর। একা থাকতে যেন ভয় পাচ্ছেন—পাছে বিষণ্ণতা এসে তাঁকে গ্রাস করে।

পিনাকী তো জানে না, সে আসবার আগে একা-একা জজবাবু কী পাগলামি করেছেন, কাজেই 'বসুন'-কথায় পূর্ব-পূর্ব সাক্ষাৎকারের 'আসুন-বসুন'-কথার চাইতে ভাব-ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলে না, যাবার মেজাজেই বললে,—নাঃ—যাই এখন! আপনারও তো স্নান-খাওয়ার নিশ্চয় সময় হল।

পিনাকীকে দরজায় দেখে জজবাবু যেমন তার উপস্থিতিটা বুঝে নিতে সময় নিচ্ছিলেন, তাকে দরজা পার হতে দেখেও তেমনি তার অস্তিত্বের অভাবটা বুঝে নিতে দেরি করলেন। কেন যে এমন হচ্ছে তা ভেবে দেখবার বিচারশক্তিও যেন ছিল না তাঁর। ভাবতে পারতেন এটা স্ট্রোকের পূর্বাভাস কি না কিন্তু শরীর সম্পর্কেই তাঁর কোনো চেতনা ছিল না। শুধু ভাবলেন, আবার শশাঙ্কশেখর সামনের শাদা-দেয়ালে ঝোলানো ছবিটাতে রঙের খেলা দেখতে পারেন—দার্জিলিং-এ জলাপাহাড়ের বাড়ির জানালা খুলে কাঞ্চনজঙ্ঘার আকাশে একদিন যেমনি দেখতে পেয়েছিলেন। লাইট-এফেক্ট-এর ফোকাস তো সূর্য ছিল সেখানে। কিন্তু কেমন যেন একটা শব্দ শুনেছিলেন সেদিন। মনে পড়ল। শুধু শব্দটাকে মনে পড়ল। তিনি স্ত্রীর ছবিতে তাকালেন। শব্দটা ওখান থেকে আসতে সুরু করবে কি? না তাঁর চোখ থেকে। আলোর শব্দ। আলো থেকে শব্দ।

কিন্তু এখন বোধহয় শব্দটা ছিল সুব্রতর জুতোর। সে ঘরে এলো। বাইরে শব্দ হল। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করবার শব্দ। তারপর হয়তো নিমগাছে হাওয়ার শব্দের সঙ্গে মেশানো ঘরের ফ্যানের প্রায়-অশ্রুত শব্দ মেশানো একটা কিছু ঘরে-বাইরের শব্দ।

অপিসে বেরোচ্ছে সুব্রত—অপিস-কামরার জ্যোৎস্নায় হায়াসিন্থ-গার্ল, সে প্রজাপতির হালকা পাখায় সেখানে বসতে যাচ্ছে। বীঠোফেনের মুন-লাইট সোনাটা শুনেছে সুব্রত—ছবিটা জানে। জ্যোৎস্নায় ফুলের উপর প্রজাপতি বসল কি শয়তান পেছন থেকে ছায়া ফেলল। সুব্রত সুমিত্রর শিক্ষা পেয়েছে—প্রজাপতির লঘু-ডানার অনুভব তার থাকলেও কোনোদিন হায়াসিন্থ-গার্লকে ছুঁতে যাবে না। প্রুস্ত পড়া আছে তার। তাঁর উপন্যাসের শেষ-পৃষ্ঠায় নায়িকা যা করে, ঔপন্যাসিক সুমিত্র উপাধ্যায়ের স্বকীয় জীবন-উপন্যাসের নায়িকাও তা-ই করল। সালোঁর মেয়েটি কী করল? এ খদ্দেরকে পছন্দ করল না। So she expresses herself on her experience with her former lover—দরজায় আসবার আগে ইংরেজি বুকনিটাই তার জিবে এলো সহজে।

দরজায় দাঁড়িয়েই বললে সুব্রত,—সুপুকে ডাকছিলেন, বাবা? সোমা বলছিল। সে তো কখনই হাওয়া!

—হাওয়া! শশাঙ্কশেখর বুঝতে পারলেন না তার বেশি কী আর বলবেন।

—আপনি উঠে চান-টান করুন। বাবার শুশ্রূষায় চকিত মন দিয়ে গেল সুব্রত অপিসে বেরোবার আগে।

তখনো দুপুর নয় কিন্তু এ ঘরে চট্ করে যেন কোনো আদিভৌতিক ম্যাজিকে রাত্রি হয়ে গেল। রাত্রিটাকে অনুভব করলেন শশাঙ্কশেখর কিন্তু কবি ডানের মতো তার কথা দিতে পারলেন না প্রেমাবসানে ইঙ্গিত এনে বা রবীন্দ্রনাথের ছেলেমানুষি কথায়ও যেতে পারলেন না: দুপুর বেলা রাত হয় না কেন?

দিবা-স্বপ্ন। সে-রাত্রিতে দেবীর মুখোশটা নারীর মুখ থেকে খসে পড়ল। সব

মেয়ের মুখ থেকে। পিশাচী। স্তাঁদাল যেন ঘুরছেন নেপোলিয়াঁর সঙ্গে। গ্যেটের সঙ্গে দেখা—শয়তান নিয়ে যাঁর কারবার ছিল। সব শয়তানী। পিশাচী তারপর।

দেববাবুর ত্যক্ত গ্লাসে তাকালেন শশাঙ্কশেখর, অন্ধকারের জ্যোৎস্নায় তাকালেন : গ্লেসিয়ার—গ্লাস। সল্স প্রজেক্ট। ঝিল যোধপুর পার্ক। জয়পুর-যোধপুর। পদ্মবিভূষণ। লেক। ডাল লেক। ডালচাল। নেফা। শিলং। জল। জলাপাহাড়। কাঞ্চনজঙ্ঘা। নামছে ঘামছে। ট্রেন। যোধপুর। পার্ক। তালগাছ। নিমগাছ। তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে। রবীন্দ্রনাথ। গ্লেসিয়ার। ছেলে-মেয়ে পিলপিল করা। শান্তি। নিকেতন। হাট। লালছায়া। সোমা-সোম—সোমবার। আজ। পদ্মনাভ। প্রজাপতি। শাদা ছায়া। কালো-লাল-শাদা। শাদা-লাল-কালো। শাদা-চিতা-কালো। ছাই। ভস্ম। ছাইভস্ম। শিলং-দার্জিলিং-হিমালয়। কাশ্মীর। লেক। রবীন্দ্র সরোবর। দেবদারু। পাইন। লেক। পদ্মবিভূষণ। পদ্মমধু। পাইনে-প্যাল। আনারস। টলষ্টয়। আনা। ডিভোর্স। শয়তানী। ডাল—ডার্লিং—ডার্লিং ডাল লেক। গ্লাস—জল। দেববাবু—দেবদারু—বাঁশদ্রোণী—বাঁশধ্বনি—বাঁশী। কিচ্‌মিচ্‌—কিসমিস—মিষ্টি—কিস্‌। বাঁশী। জুতো। ছেলেমেয়ে। মুখোশ। মাস্‌ক্‌স্‌। মার্ক্স। লাল জওহরলাল। শাদা—গান্ধী—জওহরলাল। কালো—মৃত্যু। লাল-শাদা-কালো। রাত্রি। গরম। ফ্যান। ফ্যান দাও। মন্বন্তর।—সোমা। জল। স্বপ্ন বা চিন্তা। ভেতরের সমস্ত অন্ধকার বাইরে এনে রৌদ্রে শুকোতে দিতেন। হালকা চান্দেরা শাড়ির মতো। জ্যৈষ্ঠের গরম দুপুরে ফ্যানের হাওয়ায় শুকোতে হত। শাড়ি উড়ত। সবুজ-মেটে রং উড়ত। শুভরাত্রি ভাবতেন শশাঙ্কশেখর। শুভ-দৃষ্টি। তাকাতেন তিনি দেয়ালে স্ত্রীর ছবিতে। নিমগাছের কল্কা-পাতার সবুজ কলকাতা থেকে দূরে এসে উড়ত হাওয়ায়। হালকা হতে থাকতেন তিনি। কালোর ভার কমে গিয়ে ধূসর। তারপর শাদা। তবু হালকা, পরিচ্ছন্ন এতেই তিনি হলেন খানিকটা।

সোমাকে ডাকতে ইচ্ছে করল যখন তাঁর একগ্লাস জলের জন্যে, সুপ্রিয় এসে ঘরে ঢুকল।

—আমায় ডেকেছিলেন, বাবা? সুপ্রিয় কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

—তোমায়? আচ্ছন্নতা কাটেনি শশাঙ্কশেখরের কিন্তু কেটে গেল হঠাৎ,—ও, হাঁ—সোমাকে বলেছিলাম তোমাকে ডেকে দিতে!

জীবনের স্মৃতিতে এই ডাকার ঘটনা কোথাও খুঁজে পেল না সুপ্রিয়, বাবার এমন ফর্সা, শুকনো মুখও না। কাচের মতো স্বচ্ছ যেন। বাবার খানিকটা কাছে এগোতে চাইল সুপ্রিয়। পায়ে লেগে দেববাবুর রাখা গ্লাসটা গড়িয়ে গেল মেঝেতে। গড়াল খানিকটা। ভাঙল না। নীচুতে চেয়ে সুপ্রিয় ভাবলে, বাবা বোধহয় আমার হাতে আজ জল খেতে চান।

॥ সমাপ্ত ॥

টি. এস. এলিয়ট : সমালোচক

শিশিরকুমার ঘোষ

এলিয়টের কৃতিত্ব কাব্যে না কাব্যসমালোচনায় বলা শক্ত। এই দুয়ের—অর্থাৎ তাঁর কবি-কীর্তি ও সমালোচনা প্রবন্ধাদির—সম্পর্ক নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। সে যাই হোক সমালোচনার বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহ ও বিচরণ দীর্ঘকালের, কাব্যরচনার আদি ও অন্তে তার একাধিক প্রমাণ। "দ্য সেকরেড উড" গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁকে বলতে শুনি যে তিনি মোটেই অজ্ঞজনের সঙ্গে এবিষয়ে একমত নন যে সৃজনীমূলক প্রতিভা সমালোচনাশক্তির অপেক্ষা উন্নততর অবস্থা। তাঁর এহেন সুভাষিতাবলী তথাকথিত নব্য সমালোচনার মূল সূত্রের কাজ করেছে। এলিয়ট শুধু যুদ্ধোত্তর (১৯১৪-১৮) কবিকুলের অগ্রণী নন, সমালোচকরূপেও তিনি পথপ্রবর্তক বটে, যদিও স্বভাবত তাঁর মন শাশ্বতীর উপাসক বা প্রত্যাশী। এলিয়ট কোনো দিনই বৃহৎ সমালোচনা গ্রন্থ লেখেন নি। তাঁর অধিকাংশ রচনাই আকারে ছোট, কিন্তু তাদের ব্যঞ্জনা ও বিস্তৃতি বিস্ময়কর। এখানে তাঁর সমগ্র সমালোচনা সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, কয়েকটি উদ্ধৃতির সাহায্যে তাঁর বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাধারণ পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো।

'এক সময়ে আমি মনে করতাম,' এলিয়ট বলেছেন, 'যে একমাত্র সেইসব সমালোচকদের লেখাই পাঠযোগ্য যাঁরা শিল্পক্ষেত্রে মহৎ সৃষ্টির অধিকারী।' তত্ত্বটি নূতন নয়, তিনি আবার এভাবে তা উত্থাপন করছেন কেন? এলিয়টের ধারণা এই সব শিল্পী-সমালোচকেরা সমালোচনার কালে কোনো রকম গোপন বা অবদমিত সিসৃক্ষা প্রকাশ বা সন্ধান করবেন না। অর্থাৎ তাঁদের সমালোচনা সমালোচনাই হবে, তার পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধি থাকবে না। কিন্তু প্রশ্ন : ওয়ার্ডওয়ার্থ, কোলরিজ বা শেলী কি শিল্পী-সমালোচক নন? তাঁদের কথা এলিয়ট বিস্মৃত হলেন কি করে? আদতে এলিয়ট এদের পছন্দ করেন না। রোমান্টিক-বিরূপতা এলিয়ট সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। মোটকথা, সৃজনীমূলক, বা আবেগধর্মী, বা 'হুইগ' ('উদ্ভট'?) সমালোচনার পক্ষপাতী তিনি একেবারেই নন। কিন্তু আনাতোল ফ্রান্স যিনি সরাসরি বলেছিলেন যে সৎ সমালোচনার অর্থই হোলো একটি মহৎ রচনাকে আশ্রয় করে মানবাত্মার এ্যাডভেঞ্চার, তিনি কি বিদগ্ধ শিল্পীগোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত নন? এলিয়টের মতে হয়তো নন।

এমন নয় যে এ সহজ সত্য এলিয়টের জানা নেই যে 'যেখানে সমালোচক নিজেই আবার শিল্পী সেখানে সন্দেহ করার অবকাশ থাকতে পারে যে তাঁদের বিচারগত ফতোয়া আদতে নিজ নিজ কাব্যরীতির স্বপক্ষাচরণ মাত্র'। তাঁর নিজের সমালোচনাও কি সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে না? কয়েক বছর আগে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি শেষ পর্যন্ত সেকথা স্বীকার করেছেন।

সমালোচনার রূপ ও রীতি যাই হোক না কেন, এলিয়টের মতে সমালোচনা না করে উপায় নেই, 'নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সমালোচনাও অবশ্যম্ভাবী'। 'কাব্য কি?' এই প্রশ্ন তোলার অর্থই হোলো সমালোচনার যাথার্থ্য স্বীকার করা। এবং 'যেহেতু কাব্যরচনায় যথেষ্ট বুদ্ধির প্রয়োজন হয় সেইহেতু তার অনুশীলনেও যে মস্তিষ্ক প্রয়োগ প্রয়োজন একথা

বোঝা সহজ'। উক্তিটি শুনতে হয়তো ভাল, কিন্তু কাব্যরচনার ক্ষেত্রে যে মনন ক্রিয়াশীল এবং কাব্যসমালোচনায় যে মনন অপরিহার্য, তারা কি এক ও অভিন্ন? যাই হোক, এলিয়ট মনে করেন 'বহু শিল্পী অপরের চাইতে উৎকর্ষ লাভ করেছেন সে কেবল তাঁদের বিচার-বুদ্ধির জোরে'। (তাঁর এই শাণিত বচন প্রধানতঃ রোমান্টিক কবিদের প্রতিই নিক্ষিপ্ত।)

কিন্তু সমালোচনার প্রয়োজন কোথায়, কেন, কি কারণে বা কোন অবস্থায়? এ বিষয়ে এলিয়ট একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন : 'তখনই সমালোচনার প্রয়োজন দেখা দেয় যখন কবিতা জনচিত্তের সার্থক প্রকাশ হবার কাজে ব্যর্থ হয়েছে।' অর্থাৎ নূতন কবিতা জন্মের সমকালীন বা প্রাক্কালে দেখা দেবে নূতন কাব্যজিজ্ঞাসা। কথাটি ভেবে দেখবার মত। দুর্ভাগ্যবশতঃ বরাবরের মত এই প্রসঙ্গেও এলিয়ট রোমান্টিক সমালোচনার নজিরকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন এবং এর ফলে তাঁর তাঁর বক্তব্য নিঃসন্দেহে দুর্বল হয়েছে।

"দ্য ইউস অফ পোয়েট্রি এ্যান্ড দ্য উইস অফ ক্রিটিসিজম্" গ্রন্থের উপসংহারে এলিয়ট এই অভিমত জানিয়েছিলেন যে সমালোচনার ব্যাপারে তাঁর কোনো নিজস্ব সূত্র বা মতবাদ নেই। একথা সত্য যে তিনি কোনো ইসথেটিকস্ বা 'প্রিন্সিপলস্ অফ লিটারারি ক্রিটিসিজম্' লেখেন নি। কিন্তু তাঁর যে নিজস্ব বেশ কিছু মতামত, আদর্শ বা বিশ্বাস আছে তা তিনি গোপন করতে চান নি বা পারেন নি। সংক্ষেপে, এলিয়টের সমালোচনার দুটি প্রধান বক্তব্য বা আশ্রয় হোলো : সংহতি এবং ঐতিহ্য। 'ঐতিহ্য' শব্দটি, এলিয়ট ভাল করেই জানেন, অধিকাংশ ইংরাজের কাণে শ্রুতিমধুর ঠেকবে না। ১৯১৯ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত বিবৃতি 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তি-প্রতিভা' (Tradition and the Individual Talent) পড়লে এলিয়টের সমালোচনার মূল সুর বা সূত্রটি বুঝতে দেরী হয় না। 'আমি তখন আলোচনা করছিলাম শিল্পীর ভূমিকা সম্পর্কে এবং, আমার বিবেচনায়, শিল্পীর পক্ষে কি ধরনের ঐতিহ্যবোধের প্রয়োজন; সাধারণভাবে বলতে গেলে সংহতির (order) সমস্যাই প্রধান। আমার মতে সমালোচনার ভূমিকা ঐ একই সমস্যার অন্তর্ভুক্ত।' এর সঙ্গে সহজেই যুক্ত হয়েছে ঐতিহ্যপ্রসঙ্গ, এলিয়টের ভাষায়, সেই 'বৃহত্তর সার্থকতার প্রসঙ্গ'। 'উত্তরাধিকারসূত্রে একে পাওয়া যাবে না (যেহেতু তাঁর ভাগ্যে জোটে নি?)...একে লাভ করতে হলে দস্তুরমত মেহনত করতে হবে।' এই মেহনত করার অন্যতম অর্থ হোলো ঐতিহাসিক বোধ বা দৃষ্টি অর্জন করা, যাকে এলিয়ট বর্ণনা করেছেন অতীতের অতীতত্ব দিয়ে নয়, বরং চলমান বর্তমানেও তার প্রাণপ্রবাহের সাহায্যে: 'কালাতীত ও সাম্প্রতিকবোধ উভয়কে এক করে দেখতে পারা চাই।' এই সমদৃষ্টি বা দেখার দ্বারাই শিল্পী সত্যকারের ঐতিহ্যবোধ অর্জন করেন। আরও স্পষ্ট ভাষায় : 'লেখক কেবল তাঁর নিজের যুগের কথাই লিখবেন না, তাঁর প্রয়োজন এমন একটি ইতিহাসচেতনার যার মধ্যে হোমারের কাল হতে আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য এবং তাঁর স্বদেশের সাহিত্য সহ-অবস্থিত, এবং এই সমগ্রের সমাহার বহন করছে একটি বিশেষ সঙ্গতি।' এর থেকে এলিয়ট যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা এই যে 'কোনো কবি বা শিল্পী তাঁর সম্পূর্ণ সার্থকতা একক বা নিঃসঙ্গভাবে পেতে পারেন না'।

প্রথম দিকে এলিয়টের মনোজগৎ বা সাহিত্যদর্শনে ঐতিহ্যচেতনা মূলতঃ সাহিত্যধর্মী ও ইউরোপীয়। উভয়ের উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে তিনি বারংবার দান্তের উল্লেখ করেছেন, দান্তে যাঁর সংস্কৃতি 'সমগ্র ইউরোপের প্রতিভূ', কোনো দেশবিশেষের নয়। পরে ধর্মাশ্রিত আলোচনার পথে পা বাড়ানোর কালেও দান্তের উদাহরণ এলিয়টকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

লক্ষ্য করার বিষয়, মধ্যযুগীয় মানসের ইংরেজ কবি চসার সম্পর্কে এলিয়ট বলতে গেলে নীরব।

স্বভাবের উজান বেয়ে এলিয়টের পরবর্তী সাহিত্য সমালোচনা ক্রমশঃ তাত্ত্বিক ও ধর্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠলো। দেখা দিলো এক ধরনের মতুয়া মনোভাব। যেমন সেই স্মরণীয় ও কিছুটা কণ্টকৃত আত্মপরিচয়: রাজনীতির ক্ষেত্রে আমি রক্ষণশীল (এলিয়ট সরাসরি 'royalist' কথাটি ব্যবহার করেছেন), সাহিত্য ব্যাপারে ধ্রুপদী এবং ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে এ্যাংলো-ক্যাথলিক। এলিয়ট আরো বলেছেন: 'আমি স্বভাবতই বিশ্বাস করি যে আমাদের পক্ষে সত্যিকারের ঐতিহ্যবোধের অর্থ: তাকে খৃস্টীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম ও অনুগামী হতেই হবে।' (এলিয়ট কি তাহলে মধ্যযুগীয় সনাতনী? 'প্রগতি'-তে তাঁর সত্যিই কোনো আস্থা নেই। খৃস্টানমাত্রেরই নেই, থাকতে পারে না।) পরবর্তীকালে, "এসেজ, এনসেন্ট এ্যান্ড মডার্ন" বইটিতে 'ধর্ম ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে কোনো প্রকার দ্বিধা না করে তিনি ঘোষণা করেছেন যে সাহিত্যবিচার 'সর্বকালে কোনো না কোনো নৈতিক আদর্শের দ্বারা চালিত হয়েছে এবং হবেও'। 'সাহিত্যরসিক হিসাবে আমাদের জানা দরকার কি আমাদের পড়তে ভাল লাগে। কিন্তু খৃস্টান এবং সাহিত্যরসিক হিসাবে কি আমাদের ভালো লাগা উচিত তাও জানা দরকার।' পরে মতবাদ আরো অকুণ্ঠিত: 'আমি এ-প্রসঙ্গে যা-কিছু বলবো তা কেবল এই সাধারণ বক্তব্যের সমর্থন মাত্র, তা হোলো এই যে নিঃসংশয় এবং তাত্ত্বিক বিচারই সাহিত্য সমালোচনাকে সম্পূর্ণতা দিতে সক্ষম।' তাই "প্রিন্সিপলস্ অফ লিটারারি ক্রিটিসিজম্"-প্রণেতা, আই. এ. রিচার্ডসন যখন, নিজ মতামতের স্বপক্ষে, "দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড"-এর এই বলে প্রশংসা করেন যে 'কাব্য ও সর্বপ্রকারের প্রত্যয়ের দায় হতে মুক্ত' এই অভূতপূর্ব কাব্যগ্রন্থ, সে খবরে এলিয়ট—ততদিনে তাঁর ধর্মান্তর ঘটেছে—যে প্রীত হন নি তার কারণ বোঝা কঠিন নয়। ধর্মনিষ্ঠ সমালোচকের পক্ষে অ-ধর্মী কবি আখ্যা মেনে নেওয়া চলে কি করে? তাছাড়া এলিয়ট ইতিমধ্যে খৃস্টীয় সমাজ ও সভ্যতার,[১] ক্যাথলিক ধর্ম ও আন্তর্জাতিক ঐক্যের দিকে পা বাড়িয়েছেন। এখন তাই শোনা যাবে: 'ঐতিহ্যবিষয়ক সমস্যাটি স্বভাবতই আমার কাছে আগের মত আর অত সরল ঠেকে না, তার বিশুদ্ধ সাহিত্যিক বিচার বা সমাধান করাও আমার পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়।'

তবে এলিয়ট ধর্মান্ধ সমালোচক নন। তাঁর সম্পাদনায় *Criterion* ত্রৈমাসিক পত্রিকা দীর্ঘকাল ইউরোপ-আমেরিকার নানা মতাবলম্বীদের খোলা ময়দান ছিল।। অন্যান্য বৃহত্তর প্রসঙ্গ ও সাহিত্যাতিরিক্ত প্রবণতা সত্ত্বেও এলিয়ট একাধিক উজ্জ্বল সাহিত্য-চিন্তামণি, বিশ্লেষণ ও ইঙ্গিত রেখে গিয়েছেন। বহু রীতি ও খ্যাতির হেরফের ঘটিয়েছেন এই একক ও নিষ্ঠাবান সাহিত্যবিচারক। আধুনিক কালে কাব্যনাট্যের পুনরুজ্জীবন, জেকোবীয়ন বা শেইকসপীয়ার-পরবর্তী নাটকের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে মেটাফিজিকল কাব্যকলার প্রবল প্রাদুর্ভাব—"শেষের কবিতা"-র অমিট্ রে বাঙালী-বাঙালী অনুবাদ সমেত ডান্ থেকে উদ্ধৃত করেছে—ড্রাইডেনের প্রতি অর্ঘ নিবেদন, মিলটনকে তাঁর উচ্চাসন থেকে স্থানচ্যুত করা, অধিকাংশ রোমান্টিক কবিদের নস্যাৎ করা—এ সমস্তের মূলে আছেন টি. এস. এলিয়ট ও তাঁর গুটিকয়েক শাণিত প্রবচন।

এলিয়ট-সমালোচনার অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে রোমান্টিকবিরোধিতা। তাঁর নব্য-ধ্রুপদী দৃষ্টিকোণ থেকে রোমান্টিক কবিকুলকে মনে হয়েছে উন্মার্গগামী বিদ্রোহী,

[১] The Idea of a Christian Society: *Notes Towards the Definition of Culture.*

অপরিণতমনস্কের দল। গ্যয়টের—যদিও গ্যয়টের সম্পর্কে এলিয়টের শ্রদ্ধা মোটেই অবিমিশ্র নয়—উক্তির প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেছেন : 'জীবনের ক্ষেত্রে রোমান্টিকতার স্বপক্ষে বলার হয়তো অনেক কিছুই আছে, কিন্তু সাহিত্যে সে অপাঙতেয়।' এই রোম্যান্টিক উৎপাতকে তিনি যেন কিছুতেই ভুলতে বা বরদাস্ত করতে পারেন না—তাই সুযোগ পেলেই ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের প্রতি শ্লেষ করেছেন, শেলীকে 'cad' বলার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ড্রাইডেন-প্রশস্তি গাইবার কালে তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'কিন্তু যেখানে ড্রাইডেন আমাদের তৃপ্তিসাধনে অক্ষম, উনবিংশ শতাব্দীও তো তথৈবচ; এবং যেখানে উনবিংশ শতাব্দী ড্রাইডেনকে নিন্দাবাদ করেছে, সে-নিন্দা তার নিজেরও প্রাপ্য।' ব্লেক প্রসঙ্গে ঐতিহ্যবাদী এলিয়টের এই কথাই মনে হয়েছে যে প্রাণবান ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত না হতে পারা প্রতিভাবান শিল্পীর পক্ষে কি ভয়ানক বিপদজনক ও দুঃখের কথা।

সব কিছুকে ছাপিয়ে আছে মেটাফিজিকল্ কাব্যরীতির স্বপক্ষে তাঁর সূক্ষ্ম, স্বল্প ও সতেজ ব্যাখ্যা ও বিবৃতি। অধ্যাপক গ্রীয়র্সনের সংকলনের এই সংক্ষিপ্ত রিভিউ আধুনিক ইংরেজি কাব্যে এক অভিনব দিগ্‌নির্দেশ। এলিয়টের ভাষায়, '(কাব্যরীতির) এই পার্থক্য যে বিভিন্ন কবিদের মধ্যে অল্পবিস্তর রকমফেরের মধ্যে আবদ্ধ তা নয়। এ হোলো এমন একটা কিছু যা ডান্ বা লর্ড হার্বার্ট এবং টেনিসন ও ব্রাউনিঙের যুগের মধ্যে ইংল্যান্ডের মানসলোকে ঘটেছে, এই পরিবর্তন হোলো বুদ্ধিজীবী ও ভাবপ্রবণ কবিদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য। টেনিসন ও ব্রাউনিঙ উভয়েই কবি, এবং তাঁরা মননক্ষমও বটে; কিন্তু যেভাবে গোলাপের সুগন্ধ অনুভব করা যায় তাঁদের মননে অনুভূতির সে স্পর্শ নেই। ডান্-এর কবিতায় মনন এক রকমের অভিজ্ঞতা, যা তাঁর অনুভবের এক সামগ্রিক পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম। কবিমানস যখন সৃজনকর্মের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, সে তখন নিয়তই বিপরীত অনুভবের একীকরণে সক্ষম; সে তুলনায় সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা খণ্ডিত, বিসদৃশ এবং সম্পর্করহিত। সে মানুষ ভালোবাসে অথবা স্পিনোজা পড়ে, এই দুইয়ের মধ্যে—বা টাইপরাইটারের শব্দ বা রান্নার গন্ধ—কোনো যোগাযোগ নেই, কিন্তু উপযুক্ত কবিমানসে এ সমস্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সর্বদাই এক নূতন সম্পূর্ণতা লাভ করে চলেছে।'

প্রসঙ্গতঃ আধুনিক কাব্যের দুর্বোধ্যতা এবং কাব্যকলায় নৈর্ব্যক্তিকতার মূল্য নিরূপণ করার ব্যাপারে এলিয়টের বিভিন্ন নির্দেশ সুবিদিত। তাঁর অনেক পূর্বজের—যথা টি. ই. হিউম, আর্ভিং ব্যাবিট, এজরা পাউন্ড, রেমি দ্য গুরম', ও পল ভ্যালেরি—প্রতিধ্বনি শোনা যাবে এই সমস্ত সূত্রে ও তাদের শাস্ত্রীয় আলোচনায়। কাব্যে নৈর্ব্যক্তিকতার মূল্য ও হেতু সম্পর্কে এলিয়টের বিচার প্রাঞ্জোচিত। এবিষয়ে তাঁর মতামত সহজেই মনে দাগ কাটে, যদিও এলিয়ট সম্পূর্ণ বিস্মৃত, বা জানতে চাইবেন না সে-কথা, যে রোম্যান্টিক কবিরাও স্বধর্মানুযায়ী এক ধরনের নিশেষ নৈর্ব্যক্তিকতা, সাধারণীকৃতি দাবী করতে পারেন।

এই বিষয়ে এলিয়টের কয়েকটি স্মরণীয় উক্তি উদ্ধৃত করা হোলো—

'শিল্পীর প্রগতির অর্থ হোলো নিত্য আত্মাহুতি, ব্যক্তিসত্তার বিলোপ।'

'শিল্পী যতই বিশুদ্ধ ও পরিণত হবেন, ততই তাঁর মধ্যে অনুভবে পীড়িত মানুষ এবং যে-মন সৃষ্টি করে এদের মধ্যে বিভেদ দেখা যাবে।'

'কবিতার অর্থ নয় ভাবালুতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া, তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়াই কাব্যের উদ্দেশ্য; কবিতা নয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, এবং অহংবোধ হতে মুক্তিই তার

কাম্য। অবশ্য যাঁরা অনুভবক্ষম এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এসবের হাত থেকে রক্ষা পাবার সঠিক অর্থ শুধু তাঁরাই জানেন।'

এলিয়টের এ-অভিমত যদি সত্য হয় যে 'অন্যান্য কাজের মধ্যে মহৎ সমালোচক যে কেবল একটি বিলুপ্ত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ঘটিয়ে থাকেন তাই নয়, বরং ঐতিহ্যের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলির যথাসাধ্য সঙ্গতিসাধনেও যথেষ্ট সচেষ্ট হবেন,' তাহলে এলিয়টের স্থান নিঃসন্দেহে সেই ব্রাহ্মণ্যকুলে। আর একথাও যদি সত্য হয় যে 'কাব্য-সমালোচক কবিতার সমালোচনা করে থাকেন কাব্যসৃষ্টির উপায় হিসাবে' তাহলেও সে কার্যে এলিয়টের অনুরূপ যোগ্যতা ও সফলতা ক'জন আধুনিক কবি-সমালোচকের ক্ষেত্রে সত্য হয়েছে? অবশ্য তাঁর বহুতর বিরাগ ও অসঙ্গতির কথাও একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। ঐতিহ্যের সন্ধানে তাঁকে একাধিক বিচিত্র দেবদেউলে অর্ঘ্য নিবেদন করতে হয়েছে: দান্তে, ডান্ ও ড্রাইডেন—বিচিত্র সে ত্রিমূর্তি বা ত্রিশরণ।

কিন্তু শ্রদ্ধানিবেদন ও কৃতজ্ঞতা মতৈক্যের অপেক্ষা করে না। কৈশোরে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, *Criterion* পত্রিকায় তাঁর শেষ, বীর্যবান অথচ সকরুণ সম্পাদকীয়। তারপর বহু বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, এলিয়টের রচনার হেরফের ঘটেছে, বিমুগ্ধতার ঘোর কাটিয়ে আমরাও তাঁর নূতন নিরিখ করতে শিখেছি। কিন্তু 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তিপ্রতিভা'-র এই আশ্চর্য নিদর্শন বিস্মৃত হবার নয়। "দ্য ইউস অফ পোয়েট্রি অ্যান্ড দ্য ইউস অফ ক্রিটিসিজম্"-এ এলিয়ট জানিয়েছিলেন সে 'গত তিনশ' বছর ধরে সমালোচনা সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্যের বহু অদলবদল ঘটেছে, এবং ভবিষ্যতেও এ পালাবদলের দায় থেকে রক্ষা নেই।' এবং যেহেতু আমাদের অর্বাচীন ও শতধাবিভক্ত সমাজে কোনো সাধুসম্মত বিচার বা সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা নেই, *lingua communis,* 'যাদেরই সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা আছে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করে যাওয়া ছাড়া তাদের আর করণীয় কিছু নেই।' প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবত এলিয়ট সেই কাজ করছেন। এবং তার অতিরিক্ত আরো অনেক কিছু। সাহিত্যে, শিল্পে ও জীবনে সর্বপ্রকারের অসারতা, মোহাচ্ছন্নতাকে তিনি সবলে ও সর্বপ্রকারে উপেক্ষা করেছেন, তিনি চেয়েছেন জীবনের ও শিল্পবোধের উজ্জীবন, অতীতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, বিমুক্ত হয়ে নয়। আগামী যুগে সাহিত্যের নব রূপায়ণ ঘটতে বাধ্য, তত্রাচ এলিয়টের সাহিত্যকৃতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশংকিত হবার হেতু বা প্রয়োজন নেই। তাঁর স্থান প্রথম শ্রেণীতেই থাকবে।

লাজুক অথচ উন্নাসিক, তাঁর আকস্মিক নম্রতাও কম আশ্চর্যের নয়। দীর্ঘকাল আগে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'অন্যের জন্য আপনারা যে অনুকম্পা দেখাবেন, নিজের জন্যও আমি তারই প্রত্যাশী।' পথিকৃৎ, এই বিদগ্ধ অগ্রজ অবশ্যই সে-দাবী করতে পারেন। অনুকম্পার অতিরিক্ত তিনি, নমস্য।

শোভাযাত্রা

সুশীল রায়

তাকে সৎ বললে তার সব পরিচয় দেওয়া হল না, তাকে বলতে হবে অনেস্ট, তাহলেই তার চরিত্রের কিছুটা পরিচয় হয়তো পাওয়া যাবে।

সত্যি, খুবই অনেস্ট মানুষ এই পরেশ পুরকায়স্থ।

পরেশ নিজেই বলে, 'অনেস্টি ইজ দি বেস্ট পলিসি। এটা যদি সবচেয়ে সেরা পলিসি তাহলে পলিসি হিসেবে অন্তত অনেস্টি অনুসরণ করে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

পরেশ বুদ্ধিমানও। সুতরাং অনেস্টি সে অনুসরণ করে চলেছে রীতিমত মনোযোগ দিয়েই।

তার মনে জোর আছে, সেইজন্যে হাজার রকমের বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে বেশ সচ্ছন্দে চলে যাচ্ছে তার জীবন। কোনো বাধাকেই সে বাধা বলে মানে না, বিপত্তিতেও বিপন্ন হতে সে রাজি না।

সে বলে, 'বুদ্ধি যদি থাকে তাহলেই সব ব্যাপারে ব্যুৎপত্তি অনায়াসেই এসে যাবে।'

বুদ্ধিটা হচ্ছে তার মূলধন, আর অনেস্টিটা হচ্ছে তার পলিসি।

বেশ কৃতী পুরুষ হয়ে উঠেছে পরেশ পুরকায়স্থ বেশ অল্প সময়ের মধ্যেই।

কিন্তু যারা তাকে ভালো করে চেনে তারা পরেশের এই কৃতিত্বে অবাক হয়ে যায়। তাদের অবাক হওয়া দেখে পরেশ হাসে। সে বুঝতে পারে ওরা পরেশকে চিনে ফেলেছে।

যারা তাকে চিনে ফেলেছে তাদের ঘাঁটায় না পরেশ পুরকায়স্থ, তাদের সঙ্গে বেশি করে ভাব করে, তাদের সঙ্গে হাসাহাসি করে, তাদের সঙ্গে গলাগলি করে, কোনো একটা অছিলা নিয়ে তাদের খুব সুখ্যাতি করে, তাদের খুব খাতির করে।

এতে কাজ হয়। উপকারই হয়। যারা তাকে চিনে ফেলেছিল তারা মনে করে তারা নিশ্চয় ভুল চিনেছিল তাকে, আসলে পরেশ হচ্ছে একটা ইয়ে—

পরেশ বিশেষ-কিছু একটা মানুষ না, একজন অতি সাধারণ মানুষ। কিন্তু তার চলন-বলনের কায়দা দেখে, নাক উঁচু করে চলার ভঙ্গি দেখে সকলে একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই তাকে বলত, 'উঃ, ও একটা জিনিস।'

কিন্তু এমনই ব্যাপার যে, যাকে একদিন সকলে বলত জিনিস, এখন তাকেই বলছে অন্য কথা, বলছে—জিনিয়স।

এখন কেউ আর ইয়ে বলে লাগসই কথা খোঁজে না।

এখন সকলেই একবাক্যে বলে, 'পরেশ পুরকায়স্থ একটা জিনিয়স।'

জিনিয়স জিনিসটা অনেকটা চুম্বকের মত। আশপাশের জিনিসকে সে কাছে টানে।

পরেশ যখন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জিনিয়স বলে প্রতিপন্ন হয়ে গেল তখন বন্ধুবান্ধবরাই ঘিরে ধরতে লাগল তাকে। এতে মজাটা হল এই যে, পরেশ নিজেকে সত্যিসত্যিই মস্ত বড় বলে মনে করতে লাগল।

কিন্তু কি জন্যে সে বড়, এমন কি-কি কাজ সে করেছে ইত্যাদি প্রশ্ন নিজেকেই সে করে যখন নিজের কাছেই উত্তর দিতে পারে নি, যখন নিজের কাছেই হেরে গিয়েছে, তখনই

সে জোর করে আরও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজের সামনে।

এই ভাবে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে সে নিজের কাছেই দিব্য একটা প্রকাণ্ড পুরুষ হয়ে উঠল।

তখন তার চলন-বলন আদব-কায়দা সবই যেন কেমন হয়ে গেল, আশপাশের সমস্ত মানুষকে সে রীতিমত ছোট বলে মনে করতে লাগল।

যারা পরেশের কাছে ছোট হয়ে গেল তারাও বিশ্বাস করে ফেলল যে, সত্যিই তারা ছোট, অমন বৃহৎ মানুষটির তুলনায় তারা সত্যিই নিতান্ত তুচ্ছ।

যারা ছোট হয়ে গেল তারা স্তাবক হয়ে দাঁড়াল পরেশ পুরকায়স্থর। এক কালে যারা ছিল সমান, যারা ছিল বন্ধু—তারা-সব অসমান হয়ে গেল, তারা হয়ে গেল অর্বাচীন।

পরেশ মনে-মনে হাসে এই ব্যাপার দেখে। বুদ্ধিমান মানুষ সে। নিজেকে সে চেনে ভালোমতই। তাই সে হাসে এই ব্যাপার দেখে।

আজ পরেশ সত্যিই একজন মস্ত মানুষ। আজ তার মেলামেশা কেবল মস্ত মানুষদের সঙ্গেই। অনেক উঁচুতে আজ উঠে গিয়েছে পরেশ পুরকায়স্থ। কিন্তু তার পুরোপুরি ওঠা হয়তো এখনো বাকি আছে।

হেমেন অম্বর ত্রৈলোক্য মনোহর ইত্যাদি তার বন্ধুরা এখন অনেক নীচে পড়ে আছে। পরেশ চলে গিয়েছে তাদের নাগালের অনেক দূরে। এখন, এত দূর থেকে পরেশকে স্পষ্ট আর দেখাই যায় না।

ঝাপসা হয়ে গিয়েছে আজ পরেশ সকলের চোখে।

কিন্তু, আজ এত দিন পরেও, কুড়ি বছরেরও বেশিই বুঝি হবে, এই দীর্ঘ দিন পরেও একজনের চোখে ঝাপসা হয়ে যায় নি পরেশ পুরকায়স্থ।

সে হচ্ছে শোভারাণী রায়। শোভারাণী এখন আর রায় নেই অবশ্য, এখন সে মুখোপাধ্যায়।

তাদের বাল্যকালের জীবনের কথা এখনও মনে পড়ে শোভারাণীর। তাদের সেই শান্তিপুরের জীবনের কথা। একই পাড়াতে থাকত তারা, পাড়ার নাম বেজপল্লী। ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠেছে তখন শোভারাণী, পরেশ তখন পড়ছে কলকাতার কলেজে।

কলকাতা থেকে যখন পরেশ ফিরত তখন তার চটকই আলাদা। ভঙ্গিটা তখন থেকেই বেশ রপ্ত করেছে পরেশ। বাবুয়ানিও তার ছিল না, ছিমছামত্বও ছিল না। একটু এলো-মেলো আর উদাসীন ভাব নিয়ে বেজপল্লীতে ফিরে আসত কলকাতার পরেশ।

শোভারাণীর শরীরে শোভা ছিল। সে শোভায় পরেশও একটু কাবু হয়েছিল। কিন্তু তার উদাসীন ভঙ্গি দিয়ে সে শোভারাণীকে আরও বেশি কাবু করে তুলেছিল।

সেসব কথা এখন বাসী। কিন্তু বাসী হলে হবে কি, ভালোবাসাবাসি জিনিসটা কখনো ভেসে চলে যায় না সময়ের স্রোতেও। স্রোতেরও যেমন একটা টান আছে, এ জিনিসটারও টান থাকে তেমনিই। কিন্তু পুরনো ইস্পাতে যেমন জং ধরে, পুরনো ইচ্ছারও তেমনি রং বদলায়।

খুব নাম করেছে এখন পরেশ পুরকায়স্থ। কাগজে-কাগজে ছাপা হয় তার নাম। কোথায় ভাষা-আন্দোলন, সেখানে বক্তা পরেশ; কোথায় নগরসংকীর্তন, তার পুরোভাগে পরেশ পুরকায়স্থ; কোথায় গানের জলসা, তার শুভ-উদ্বোধনে—

শোভারাণীর মনে পড়ে তার অতীত জীবনের কথা। এখন কত উঁচুতে এই পরেশ, এখন কত দূরে সেই পরেশ, কিন্তু একদিন ছিল যখন—

খবরের কাগজ খুলে শোভারাণী তার স্বামীকে বলে, 'দেখ, দেখ, দেখ! কত বড় হয়ে গেছে মানুষটা। একদিন যে আমরা পাশাপাশি কাছাকাছি থাকতাম, তা বিশ্বাস করাই যায় না। কিন্তু বিশ্বাস করতে ভীষণ ভালো লাগে।'

অধ্যাপক অনঙ্গমোহন মুখোপাধ্যায় চন্দননগরের একজন বিশিষ্ট নাগরিক। খুব বিজ্ঞ মানুষ এবং বেশ পণ্ডিত লোক। তাঁর আর্থিক অবস্থাও তাঁর পাণ্ডিত্যের মতই সচ্ছল। পুত্ররাও বেশ বড় হয়ে উঠেছে, একজন এখনো স্কুলে পড়ছে, একজন ঢুকেছে কলেজে। তারা বাপের স্বাস্থ্য পেয়েছে, এবং পেয়েছে মায়ের রূপ। ছেলে-দুটিই বেশ সুপুরুষ।

শোভারাণীর সংসার বেশ সুখের সংসার। চন্দননগরের অনেকেই এই শোভন সংসারটির কথা নিয়ে গল্পগুজব করে আনন্দ পায়।

শোভারাণী আবার বলল, 'খুব উন্নতি করেছে বটে!'

অনঙ্গমোহন বললেন, 'নিশ্চয়। খুব নাম করেছেন। প্রায়ই কাগজে নাম দেখি।'

'হ্যাঁ। খুব নাম করেছে।' খুশিতে প্রাণ ভরে গেল শোভারাণীর, বলল, 'কিন্তু খুব লাজুক ছিল, খুব পাগলাটে ছিল ছেলেবেলায়।'

বইটা বন্ধ করে রাখতে-রাখতে অনঙ্গমোহন বললেন, 'ঠিকই তো। ওরাই তো জীবনে বড় হয়। বড় হবে বলেই তো ওরা পাগলাটে হয়, বড় হবে বলেই তো ওরা লাজুক হয়।'

সেই অতীতদিনের কথা ভাবতে গিয়ে শোভারাণীর মনে পড়ে গেল আর-একটা কথা। আর-একটা মানুষের কথা। উঃ, কী চাল ছিল তার, কী চটকই তার ছিল। আবার, বামন হয়ে তার ইচ্ছে হয়েছিল চাঁদে হাত দেবার। সে কথা ভেবে হাসি পায় শোভারাণীর।

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে বসে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন অনঙ্গমোহন, স্ত্রীর মুখের দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই বললেন, 'ও কি, পাগল হলে নাকি? একা-একাই হাসছ যে! আমাকে কি কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে?'

হেসে উঠল শোভারাণী, বলল, 'কথার কি রকম ছিরিই হচ্ছে! একটা কথা মনে পড়ায় হাসি পাচ্ছিল।'

কি কথা মনে পড়ায় তার অমন হাসি পেল, সে কথাটা বলার আর ইচ্ছে হল না শোভারাণীর। এই বয়সে এখন আর ওসব কথা নিয়ে আলোচনা করা শোভা পায় না।

কিন্তু লোকটার নাম আজও মনে আছে শোভারাণীর। তার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ। ভারি পাজি ছিল ছোকরাটা। বাংলা জানত না, তবু বাংলা বলত। উ, কি ছিরিরই সে উচ্চারণ, বলত—সুবারাণী। প্রাণে তার খুব শখ, প্রেম করতে চেয়েছিল সে শোভারাণীর সঙ্গে। খুব জ্বালিয়েছিল তাকে ঐ ছেলেটা।

তার বাবা করত তেজারতির কারবার। শান্তিপুরের বাজারে ছিল তার গদি। তারা বাসা নিয়েছিল পরেশদের বাড়ি থেকে একটু দূরে। ছেলেটা নাকি থাকত পাটনায়। বাংলা-দেশে এসেই সে এসে উপস্থিত হল শান্তিপুরে। উ, সে কী অশান্তি।

পরেশের সঙ্গে কৃষ্ণপ্রসাদের ছিল খুব ভাব। দুজনে প্রায় হরিহরাত্মা হয়ে উঠেছিল। তাদের এই অন্তরঙ্গতা দেখে অন্তরাত্মা আরও জ্বলে যেত শোভারাণীর।

কিন্তু সেসব গল্প আজ অনঙ্গমোহনের সঙ্গে করে লাভ কি। শোভারাণী তাই তার হাসি বন্ধ করে মুখ বন্ধ করে বসে রইল।

'কি, হল কি! অমন গম্ভীর হয়ে গেলে যে?'

অনঙ্গমোহনের এই কথা শুনে শোভারাণীর অঙ্গ যেন জ্বলে গেল, বলল, 'হাসলেও

অপরাধ নেবে, গম্ভীর হলেও কৈফিয়ত চাইবে। তোমার হল কি?'

নির্বিরোধ মানুষ অনঙ্গমোহন, বললেন, 'থাক্। ঠিক আছে।'

চন্দননগরের মুখোপাধ্যায়-পরিবারের জীবন কেটে চলেছে এইভাবে। এখানে বিরোধ নেই, বিদ্বেষ নেই, বিষাদ নেই, বিসম্বাদ নেই।

অদূরে গঙ্গায় জোয়ার-ভাটা খেলে, কিন্তু এখানে জোয়ার-ভাটাও বুঝি নেই। এখানকার জীবন নীরব ও নম্র, এখানকার জীবন স্বচ্ছ হ্রদের মত।

কিন্তু সেই স্বচ্ছ হ্রদে হঠাৎ টোল পড়ে গেল একদিন সন্ধ্যায়। হঠাৎ এসে উপস্থিত হল এখানে সেই মস্ত মানুষটি—বুদ্ধিই যার মূলধন, অনেস্টিই যার পলিসি।

বাগান পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠতে উঠতে পরেশ পুরকায়স্থ বলল, 'আমি পরেশ। কি, চিনতে পারেন?'

শোভারাণী বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দায় সুইচ টিপে দিয়েই বলল, 'বিলক্ষণ। বিলক্ষণ। চিনব না কেন? কিন্তু চমকে গেলাম যে, আপনার মত মানুষ, হঠাৎ এখানে ইয়ে—পদধূলি?'

বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়ে পরেশ বলল, 'ধূলি এককণাও নেই এ পায়ে। ঝুলি ঝাড়লেও ধূলি পড়বে না, এমনি রিক্ত—'

কথায় বাধা দিয়ে শোভারাণী বলল, 'আসুন। ভিতরে আসুন।'

শোভারাণীর দু পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল তার দুই ছেলে। তাদের দিকে চেয়ে পরেশ বলল, 'এদের দেখেই চিনলাম কিন্তু। পরিচয় দিতে হবে না। গ্র্যান্ড ছেলে দুটি আপনার, গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড।'

ঘরের ভিতরে এসে আলাপ হল অনঙ্গমোহনের সঙ্গে। অনঙ্গমোহনের বুদ্ধি পরেশের মত প্রখর নয়, তাই তিনি সহজেই পরেশের অমায়িকতায় ও বিনয়ে বিগলিত হয়ে গেলেন। বললেন, 'আপনি সত্যিই বড়, এতবড় মানুষ আপনি, কিন্তু কত সহজে আমাদের সঙ্গে—'

বাধা দিয়ে উঠল পরেশ পুরকায়স্থ, বলল, 'উহুঁ, উহুঁ, উঁহু! অত সহজ নয়, যত সহজ ভাবছেন তত সহজে নয়। রীতিমত শক্ত কাজ করেছি। খুঁজে বার করেছি আপনাদের। আজ কত বছর হয়ে গেল, যার খোঁজ রাখিনি এতদিন, হঠাৎ তাকে খুঁজে বের করা কি সহজ কথা। বলুন আপনি। আপনি জ্ঞানী লোক, গুণী লোক, আপনি পণ্ডিত লোক, আপনি বিজ্ঞ লোক, বলুন আপনি।'

কথা বুঝি জড়িয়ে গেল অনঙ্গমোহনের, তিনি কথা বলতে পারলেন না। এতবড় একজন মানুষের মুখে তাঁর এতটা সুখ্যাতি শুনে তিনি অভিভূত হয়ে গিয়েছেন। মানুষটা যে সত্যিই একজন মহৎ মানুষ, এ বিষয়ে তাঁর বিন্দুবিসর্গ আর সন্দেহ নেই।

স্ত্রীর মুখে তিনি শুনেছেন এই মানুষটার কথা। মানুষটা সম্বন্ধে তিনি যেন সবই জানেন। কিন্তু তাঁর জানার কৌতূহল হল, এত বড় যে ইনি হয়েছেন, কি কাজ করে এত বড় হলেন? কোনো কাগজে কখনো সে কথা খোলসা করে লেখা হয়েছে বলে তাঁর মনে হয় না। মানুষটাকে এত কাছে পেয়ে তাঁর জানতে বড় ইচ্ছে হল কথাটা। কিন্তু সে কথা তো জিজ্ঞাসা করা যায় না।

পরেশ একটা জিনিয়স। জিনিয়স জিনিসটা অনেকটা চুম্বকের মত। ঠিক। তাই। শোভারাণী তো আকৃষ্ট হয়ে আছেই, অনঙ্গমোহনও লোকটার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলেন।

যত কথা বলছেন, লোকটাকে ততই অপূর্ব লাগছে, ততই অদ্ভুত ঠেকছে, ততই ইন্টেলিজেন্ট ও ততই অনেস্ট বলে ধরতে পারছেন।

অনেকক্ষণ ধরে গল্পগুজব হল তাঁদের। অনেক অবান্তর কথা, অনেক অন্তরঙ্গ কথা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরেশ এ'দের একেবারে আপনার জন হয়ে গেল।

পরেশ বলল, 'বেশ। ভালোই। যোগাযোগ যখন হয়ে গেল ঈশ্বরের ইচ্ছায়, তখন, কাল আসুন একবার কলকাতায়—মিউজিয়মে একটা এগজিবিশন আছে, বিরাট স্কেলে করা হচ্ছে এই ইন্টারন্যাশনাল এগজিবিশন, কলকাতায় এই প্রথম। বিরাট বিরাট গণ্যমান্য লোক আসছেন দেশবিদেশ থেকে। আপনারাও আসুন। বলেন তো গাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারব, কলকাতা থেকে চন্দননগর আর কতটুকুই বা রাস্তা, এক ঘণ্টায় এসে যাবে। আরও বলেন তো' একটু হেসে পরেশ বলল, 'আমি এসেও নিয়ে যেতে পারি।'

এদের যেন চমকে দিতে লাগল, প্রায় পাগল করে তুলতে লাগল এই বিরাট মানুষটি। এত বড় একজন মানুষ কত ছোট হয়ে কত কাছের হয়ে এমন প্রস্তাব করে বসছে, শুনে অবাকই হয়ে যেতে হয়।

দর-কষাকষি ও বিনয়ের প্রতিযোগিতা হতে হতে ঠিক হল শোভারাণী যাবে। এবং এ কথাও ঠিক হয়ে গেল যে, পরেশ এসেই নিয়ে যাবে।

কথা পাকা করে পরেশ চলে গেল। এবং, আশ্চর্য, এত বড় মানুষটা কথা ঠিক রেখে পরের দিন গাড়ি নিয়ে ঠিক বেলা বারোটায় এসে হাজির।

অতি ভদ্র এই মানুষটি। নিজে ড্রাইভারের পাশে বসে, পিছনে শোভারাণীকে বসিয়ে সে চন্দননগর থেকে রওনা হল কলকাতার দিকে।

পুরনো ইস্পাতে জং ধরে, পুরনো ইচ্ছারও রং বদলায়। একদা শোভারাণী পরেশকে কি চোখে দেখত, সে কথা থাক্; আজ শোভারাণী পরেশকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, এবং হয়তো একটু ঈর্ষাও করে।

পিছনে বসে শোভারাণী বলল, 'আপনার ছেলেপিলে ক'টি তা কিন্তু জানাই হল না।'

'আমার?' পিছন দিকে তাকিয়ে পরেশ বলল, 'জিরো। অর্থাৎ শূন্য। বিয়েই হয়নি।'

'তাই বুঝি? তবে, কবে আর করবেন?'

'এ যাত্রা বুঝি হয়ে উঠল না।' বলে অমায়িক ভাবে হাসতে লাগল পরেশ পুরকায়স্থ।

কিছুক্ষণ বাদে পরেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কৃষ্ণপ্রসাদের কথা মনে আছে?'

'সে কে?' ইচ্ছে করেই শোভারাণী বলল।

'সেই-যে আমাদের শান্তিপুরের সেই কৃষ্ণপ্রসাদ। সে এখন বিরাট মানুষ, বিরাট ধনী, বিরাট প্রতাপ, ভীষণ ইনফ্লুয়েন্স। যাকে বলে বিগ ম্যান, এখন সে তাই।'

'তাই বুঝি?'

'তাই।' পরেশ বলল, 'ও হাতে থাকলে এখন ধুলোমুঠি সোনা হয়ে যাবে। ও এখন টাকার কুমির।'

শোভারাণী বলল, 'ও তো একটা বোকা। ওর আবার টাকা হল কি করে?'

'বোকা সেজে থাকত। ওটা ওর পলিসি। আসলে কিন্তু—'

গাড়িটা হঠাৎ ব্রেক কষায় ওরা সামনে ঝুঁকে গেল। পরেশের কথাটা তাই শেষ হল না।

মিউজিয়মের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। সত্যি, একটা বিরাট এগজিবিশনের ব্যবস্থা

হয়েছে এখানে।

পরেশের খুব খাতির এখানে। গাড়ি থেকে নেমে সে শোভারাণীকে বেশ যত্ন করে নিয়ে গেল ভিতরে। ভলান্টিয়াররা সম্ভ্রমের সঙ্গে তাদের আগে-আগে হেঁটে পথ দেখিয়ে চলল।

বেশ সুন্দর এগজিবিশন। চন্দননগরেও ছোটখাট প্রদর্শনী মাঝে-মাঝে হয়। কিন্তু এমন বিরাট ও এত বিশাল ব্যবস্থা নয়। শোভারাণীর খুবই ভালো লাগল। পড়ুয়ার আর পণ্ডিতের পরিবার সে, ওসব মানুষ একটু ঘরকুনোই হয়ে থাকে। বাইরে-বাইরে এমন দৌড়ঝাঁপ ওরা করে না। সেইজন্যে জগৎটাও ভালোভাবে দেখা হয় না ওদের। জগৎ যে কত বিচিত্র জায়গা, জগতে কত-যে বিচিত্র মানুষ বাস করে, আজ এই এগজিবিশনে এসে শোভারাণীর সে সম্বন্ধে একটু-একটু ধারণা যেন হচ্ছে।

খুব সজ্জন মানুষ পরেশ পুরস্কায়স্থ। এত তার খ্যাতি, এত তার খাতির, এত কাজের মানুষ সে, তবু শোভারাণীকে নিয়ে কত যত্ন করে সব ছবি দেখিয়ে-দেখিয়ে বুঝিয়ে-বুঝিয়ে সে অনায়াসে সময় খরচ করে চলেছে। এতটুকু তাড়া যেন তার নেই, এতটুকু তাগাদা নেই। শোভারাণী বুঝতে পারছিল, মানুষের মধ্যে গুণ না থাকলে মানুষ কখনো এমনি-এমনি বড় হয় না।

অনেকক্ষণ ধরে তারা দেখে বেড়াল ছবির এগজিবিশন। ছবিগুলির মধ্যেই-বা কত বৈচিত্র্য। কোনো-কোনোটা অবশ্য শোভারাণীর বীভৎস লেগেছে, কোনো-কোনোটা তার বিশ্রী লেগেছে, কিন্তু সে তা প্রকাশ করেনি। কি জানি, তাতে আবার সে বোকা হয়ে না যায়।

ওদিকে প্রকাণ্ড লনে সামিয়ানা খাটানো। সেখানে রং-বেরঙের মস্ত-মস্ত ছাতি বসানো কয়েকটা। অনেক পুরুষ ও অনেক মেয়ে বসে-বসে চা খাচ্ছে, কফি খাচ্ছে, খাবার খাচ্ছে।

পরেশ শোভারাণীকে নিয়ে সেদিকে গেল। বলল, 'একটু রেস্ট নেওয়া যাক। এত ঘুরে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছি।'

একটা ছাতার নীচে মোটা-মত একটা মানুষ একা বসে স্ট্র-পাইপ চুষছে। কার জন্যে বুঝি অপেক্ষা করছে সে। ওরা সেখানে গিয়ে বসল।

ওরা আসতেই মোটা লোকটা আহ্লাদে গদগদ হয়ে বলল, 'বহুৎ আদমি এল-গেল। ভাবছি, আপনেরা আসতেছেন না কেন।'

শোভারাণী প্রথমটা ধরতে পারে নি, কে এ। তার পরেই যেন বুঝল। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই পরেশ পরিচয় করে দিয়ে বলল, 'এই সেই কৃষ্ণপ্রসাদ, মনে পড়ে একে?'

শোভারাণী উত্তর দেবার আগেই কৃষ্ণপ্রসাদ বলল, 'মনে পড়বে না কেন। বিস বরষ তো খুব একটা লম্বা সময় না যে, মানুষ বিলকুল ভুলে যাবে মানুষকে। লেকিন, মাঝে-মাঝে ভুল ভি হয়।'

অনেক গল্প করতে লাগল তারা। বহুদিন বাদে কৃষ্ণপ্রসাদ এসেছে বাংলাদেশে। এদেশ সে ছেড়ে গেছে, লেকিন মন থেকে তো মুছে যায়নি এই দেশ। এদেশের মাটির একটা জাদু আছে।

কৃষ্ণপ্রসাদ বলল, 'দুনিয়ার কত বদল হয়ে গেল। কত লড়াই হল, কত দাঙ্গা। লেকিন বহৎ চিজ ঠিক থেকে গেল।'

কি কি ঠিক থেকে গেল সে কথা কৃষ্ণপ্রসাদ আর খুলে বলল না। কিন্তু সে যে খুবই খুশি হয়েছে, তার কথায় তা খুবই স্পষ্ট হতে লাগল।

পরেশ বেশি-কিছু বলছে না। মাঝে-মাঝে অবশ্য ছোটখাট মন্তব্য করছে।

কথায়-কথায় অনেক অন্তরঙ্গই বুঝি হয়ে গেল তারা। ওদিকে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যেও প্রায় নেমে এল।

কৃষ্ণপ্রসাদ বলল, 'পরেশবাবু তো বড় বিজি আদমি। চলুন, আপনাকে পেঁাছে দিয়ে আসি চন্দননগরে। মিস্টার মুকার্জির সঙ্গে আলাপও ভি হোবে।'

পরেশ কোনো কথা বলল না। শোভারাণী একবার তাকাল পরেশের মুখের দিকে। পরেশ নিশ্চিন্ত আরামে বসে আছে অন্য দিকে চেয়ে। সেইভাবে বসেই সে বলল, 'উত্তম প্রস্তাব। বেশ হয় তবে।'

শোভারাণী বলল, 'আপনি যাবেন না?'

পরেশ বলল, 'যেতে পারলে তো বেশ ভালোই হত। কিন্তু এদিকে বড্ড জড়িয়ে আছি যে।'

অগত্যা। অগত্যা শোভারাণী চন্দননগরে ফিরে চলল কৃষ্ণপ্রসাদের সঙ্গে।

মস্ত গাড়ির পিছনে দুজন পাশাপাশি বসে চলল।

কৃষ্ণপ্রসাদ বলল, 'কত চেঞ্জ হয়ে গেল দুনিয়ায়, কত লড়াই, কত দাঙ্গা। কিন্তু আপনি তেমনি তাজা রয়ে গেলেন, তেমনি খুপসুরত।'

আধুনিক সাহিত্য

কথাটা সম্ভবত বড় বেশি স্পষ্ট, এবং নিঃসন্দেহে সেই স্পষ্টভাষিতা অপরাধ, কিন্তু বলতে বাধা নেই : আমাদের সাহিত্যে এখন এক শূন্যতার যুগ। হিসেব করলে দেখা যাবে, গত এক দশকে তেমন উল্লেখ্য গল্প, কবিতা, নাটক অথবা উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। অথচ আমাদের লেখকদের যে শক্তির অভাব আছে, তা নয়। ইতস্তত ছড়ানো অনেক ভাল অংশ আছে; কোনো লেখার আঙ্গিক আমাদের বিস্মিত করেছে; কোনো কোনো উপন্যাসে বৃহদারণ্য সত্ত্বেও এক আধটি চরিত্র রচনা সার্থক। কোথাও হয়ত কোনো প্রতীক অথবা চিত্রকল্পের ব্যবহার পাঠকের দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে, কোনো সফল রচনা গত দশকে একান্ত বিরল।

কিন্তু এমন হবার কারণ কী? এর উৎস অন্বেষণে আমাদের কিছু প্রয়াসেই প্রতিভাত হবে আমাদের সাহিত্য-মন এবং আমাদের বাইরের পৃথিবীর মধ্যে এক অনুলোম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বাঙলা সাহিত্য হঠাৎ যেন দলছুট। তাই সম্ভবত অশ্রান্ত বর্ষণে সব কিছু ধুয়ে মুছে নতুন সম্ভাবনার শিহরণ সৃষ্টি করতে পারল না। অথচ আমাদের লেখকেরা একক অস্তিত্ব নিয়েও এগিয়ে যেতে পারেন নি। আন্দোলনের গতি ব্যাহত হল। অন্য কথায় বলা যায় : সাহিত্যকে ভিত্তি করে নতুন কোনো আন্দোলনই গড়ে উঠল না। এবং সম্ভবত একটি পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে সাম্প্রতীক সাহিত্য বুঝি এক বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব। তাই তার মূল্যায়নও অসম্পূর্ণ।

আমাদের সাহিত্যের একটি ধারাবাহিকতা ছিল। যদিও এই যাত্রা কখনই কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তবু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও একটি আন্দোলনের সম্পূর্ণ বৃত্তে আমরা স্থিত ছিলাম। তার কারণ, সাহিত্য অনেকখানি অশিক্ষিত পটুত্ব সত্ত্বেও অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতায় উজ্জ্বল ছিল। তাছাড়া ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, এই সাহিত্যিকরা বুদ্ধিবাদের নিশ্চেষ্ট অভিধায় অবসিত হতে দেননি। তাঁদের বক্তব্যের বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা কখনও অনাত্মীয় এবং অপরিচিত জগতে হারিয়ে যাইনি। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আনু-ভূমিক। তাই সহজেই তাঁরা বক্তব্য খুঁজে পেতেন। ঘটনার অন্বেষণে তাঁদের ঘুরে বেড়াতে হত না। এমনকি, কদাচিত দেখা গেছে অতীতচারণে অভিভূত, অথবা ইতিহাসের আশ্রয়ে।

কিন্তু এই দশকের লেখক, প্রবীন এবং নবীন নির্বিশেষে ইতিহাস আশ্রয়ী অথবা আঙ্গিক সর্বস্ব। এবং যেহেতু তাঁরা সামাজিক মানুষ হওয়া সত্ত্বেও অ-সামাজিক, তাই সম্ভবত উটপাখীর মতো বালুর স্তূপে মুখ লুকিয়ে আছেন। আর এরই মধ্যে যাঁরা কিছুটা সমাজ সচেতনতার দাবী করেন তাঁরা যেন একচক্ষু হরিণ। তাই তাঁরা জীবন বিকৃতিকে সম্পূর্ণ জীবন বলে ভুল করেন। এ পক্ষের বক্তব্য : আমাদের জীবনে বৈচিত্রের অভাব। শুধু তাই নয়, যুদ্ধ ইউরোপের জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, তা মাত্র সেখানকার রাজনীতিরই আদল বদলে দেয়নি, সামাজিক জীবনেরও নতুনভাবে বিন্যাস করেছে। এই রূপান্তর লেখক মানসকে বিচলিত করতে বাধ্য এবং করেছেও।

অথচ বাঙলাদেশে তাঁরা নিরুত্তাপ জৈব জীবনের অস্তিত্বেরই অভিজ্ঞতা পেয়েছেন।

ফলে বাইরের জীবন থেকে সরে এসেছেন এক কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গীর ছায়ায়।

এ দুপক্ষ বাদ দিয়ে আরো একটি নতুন পক্ষের অস্তিত্ব সহসা দৃশ্যমান। এ'দের সাহিত্য আপাত বিশ্বাস নির্ভর।

সম্ভবত এই মানসিকতায় বিব্রত লেখক কল্লোল-গোষ্ঠীর অনুসরণে কোনো একটি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, লক্ষ্যের দিগন্তে তাঁরা পোঁছুতে পেরেছেন কি না। তার অন্যতম কারণ, কল্লোলযুগের আপাত সমাজ বিরোধিতাই তাঁদের আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু পূর্বসূরিদের অভিজ্ঞতা তাঁরা বিস্মৃত। মনে হয়, এই নতুন লেখকদের কেন্দ্রবিন্দুর অভাব—বৃত্ত রচনা করবেন কেমন করে? সাহিত্য স্বতোৎসারিত নয়, অভিজ্ঞাত; এবং নৈতিমূলক মনোভঙ্গী কোনোমতেই তার সহায়ক হতে পারে না। তাছাড়া, বাইরের পৃথিবীর কোনো প্রমিত জ্ঞান না থাকায় সে সম্পর্কে সংবেদন অপরিহার্য। আর এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত আন্তরিকতা ও শিল্পচরিত্র।

দ্রিস বিন হামেদ শারহাদির উপন্যাস *A Life Full of Holes* পড়ার পর, বিশেষ করে এ কথাগুলি স্মর্তব্য। সীমিত অক্ষরজ্ঞান সত্ত্বেও তিনি শিল্পী এবং সে কারণেই তিনি সার্থক। অথচ উপন্যাসটির তিনি লেখক নন। তিনি তাঁর কাহিনী বিবৃত করেছেন আর তা একটি উপন্যাসের সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। নিঃসন্দেহে তিনি একজন নিপুণ কথক, এবং যেহেতু একজন শিল্পীও, আমাদের কখনই মনে হয়না প্রবক্তার বাক চাতুর্যে আমাদের মনে অধ্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর কাহিনী আগাগোড়া এক সহজ স্বচ্ছ তরঙ্গ, আর কোথাও আলো—কোথাও মেঘ। আবার কখনো মনে হয় ঝরে বিধ্বস্ত।

মগরেবী আফ্রিকার অধিবাসী শারহাদি, আফ্রিকার সাধারণ মানুষের জীবনের চিত্রকেই রচনা করেছেন। সতেরটি পরিচ্ছেদে সমৃদ্ধ উপন্যাসটিকে মনে হতে পারে সতেরটি ভিন্ন রঙের, ভিন্ন ফুলের মালা। নিপুণ রচনার গুণে, প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ এক একটি সুন্দর অথচ সার্থক গল্প।

অবশ্য এই রচনার কৃতিত্ব কার বেশি, তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে। কারণ উপন্যাসটি রচিত হয়েছে যৌথ প্রচেষ্টায়। শারহাদির ইংরেজীর জ্ঞান নেই। উত্তর আফ্রিকার পার্বত্য মুসলমানের মতো মগরেবী আরবী ভাষায় তিনি কথা বলেন। কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য এখানেই যে তিনি লেখকের মন নিয়ে গল্প বলেন এবং সফল শিল্পীর দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়ে ঘটনার বিন্যাস করেন।

নিজের ভাষায় গল্প বলেছেন শারহাদি। আর তাকে প্রতিবর্ণে লিপিবন্ধ করেছেন বিখ্যাত উপন্যাসিক পল বাওলেস। শারহাদির কথা যাতে কোনোক্রমে হারিয়ে না যায়, সেজন্য বাওলেস অন্তহীন আয়াস স্বীকার করেছেন। কথাগুলো প্রথমে তিনি টেপে রেকর্ড করেছেন, এবং তারপর তার আক্ষরিক অনুবাদ। নিঃসন্দেহে এ এক অভিনব আঙ্গিক!

উপন্যাসটি পড়লেই বোঝা যায়, গল্প রচনায় শারহাদির জন্মগত অধিকার। তাঁর রচনার প্রধান সম্পদ; অনুভব, অবেগ ও অলঙ্করণে অনীহা। আর এই বিশিষ্ট উপাদান-গুলি যাতে সম্পূর্ণভাবে অবিকৃত থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়েছেন বাওলেস। রচনার কৃতিত্ব আমাদের শারহাদিকেই দিতে হয়। বাওলেসের যদি কিছু প্রাপ্য থাকে, তা একান্ত সার্থক অনুবাদের।

উপন্যাসের পটভূমি উত্তর আফ্রিকার জনসাধারণ। যে সমাজে নানা স্তরের মানুষ—চোর, ডাকাত, বেশ্যা এবং সমকামী। এদের জীবন ধারণের জন্য ভয়াবহ অ্যাডভেঞ্চারে নামতে

হয়। তা ছাড়া অপরিণত দেশের মিথ্যে আইনের শাসন। অথচ অবাক হতে হয় শারহাদির সংযমে। কোথাও তিনি হিতোপদেশের অনুশাসন স্মরণ করিয়ে দেন নি।

তরুণ হামিদের বক্তব্য একটি বালকের নৈতিক অধঃপতনের কাহিনী নয়। বেশ বোঝা যায়, অদৃষ্টবাদকে আশ্রয় করে শারহাদি জীবনের অন্ধকার অধ্যায়কে বিশ্লেষণ করতে চান নি। এক বিষয়কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, অবিচার, দারিদ্র এবং অনাহারকে তিনি চিত্রিত করেছেন। কোথাও পাঠকের সহানুভূতি অর্জনের প্রয়াস দেখা যায় না। তাঁর রচনায় এমনই এক ঐশ্বর্য, যা সারল্য সত্ত্বেও এক উদ্দেশ্যবিহীন ব্যর্থ ভবঘুরে মানুষের আখ্যায়িকায় পরিণত হয় নি। তাঁর রচনার আগাগোড়া উত্তর আফ্রিকারই মতো দৃশ্যময় এবং স্বভাবতই বর্ণময়।

এ কারণেই উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য, আধুনিক সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজনা। সাফল্যে পৌঁছাবার জন্য তিনি কোনও হাতিয়ার গ্রহণ করেন নি। অথবা ঘটনাগুলির কোনো দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় মন দেন নি।

শারহাদির উপন্যাস প্রমাণ করল সাহিত্যের বড় উপকরণ সংবেদন। আর সেই সম্বলই লেখককে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই প্রসঙ্গেই আরো বেশি হতাশ বোধ করতে হয়। আমাদের এই উর্বর দেশে অজস্র ফসল। আমাদের কাজ তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ঘরে তোলা। আমরা সেখানে ব্যর্থ। অন্য দেশের তুলনায় যেন অনেকটা পিছিয়ে। অথচ এমন হবার কোনো কারণ ছিল না।

তার চেয়েও বড়ো কথা, এই অক্ষমতা আড়াল করতে আমাদের ভূমিকার সাহায্য গ্রহণ। সসঙ্কোচে বলি : আমরা এখন বাইরের জীবনের মিথ্যাচারের শিকার। মানসিকতা আমাদের বিধ্বস্ত হয়ত বিপর্যস্ত। তাকে লুকোতে গিয়ে আমাদের বিশীর্ণ সঞ্চারণ। তাই মনে হয়, চমক সৃষ্টি হতে পারে, এমন কিছু করার মোহ থেকে যদি আমরা স্বেচ্ছা নির্বাসন গ্রহণ করি তবে হয়তো আমাদের মঙ্গল হবে। পৃথিবীকে বুঝতে এবং জানতে শেখাবে। তখন আর শুধুমাত্র যৌন ইন্দ্রিয়ই মানুষের বিচারের একমাত্র মাধ্যম প্রতীত হবে না।*

নৃপেন্দ্র সান্যাল

---

* A Life Full of Holes. *By* Driss ben Hamed Charhadi. Tape-recorded by Paul Bowles. Weidenfeld & Nicolson. London. 18s.

সমালোচনা

স্বপ্নপ্রয়াণ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক : পুলিনবিহারী সেন। প্রাপ্তিস্থান : জিজ্ঞাসা। কলিকাতা, ২৯। মূল্য ছয় টাকা।

স্বপ্নপ্রয়াণ প্রথম প্রকাশ হয় ১৮৭৫ সালে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৯৬ সালে, তৃতীয় নবতম সংস্করণ ১৯১৪ সালে এবং বর্তমান পুনর্মুদ্রণ ১৯৬৪ সালে। এই কাব্যের জন্ম জোড়াসাঁকোর ঘরোয়া সাহিত্যসমাজকে আবেগচঞ্চল করে তুলেছিল সে খবর পাই রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে। কিন্তু দেশের বৃহত্তর সাহিত্যপাঠকসমাজে স্বীকৃত ও আদর পেয়েছে অতি সামান্যই। কয়েকজন বিদগ্ধ সমালোচক দীর্ঘকালের ফাঁকে ফাঁকে এই কাব্যকে অকুণ্ঠ প্রশস্তি জানিয়েছেন; এঁদের মধ্যে আছেন সতীশচন্দ্র রায়, প্রিয়নাথ সেন ও শ্রীকানাই সামন্ত প্রভৃতি। যদিও দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর এই মানসপুত্র কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করবে—অন্ততঃ সুধীসমাজে—জীবনের শেষ পর্যন্ত এই আশা পোষণ করেছিলেন, দুঃখের বিষয় তাঁর সে আশা সফল হয় নি। এই ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্ববর্তী সমালোচকেরা করেছেন। আজও সেই প্রসঙ্গ উত্থাপনের দরকার আছে। তবে সুখের কথা এই যে এই নূতন সংস্করণ অতি সহজগ্রাহ্য ও শোভন আকৃতিতে কাব্যগ্রন্থখানিকে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেছে এবং শুধু তাই নয়, এর এতদিনকার অনাদর-রহস্য সমাধানের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ও আলোচনা একত্র গ্রথিত করে এনে দিয়েছে। এর থেকে নতুন দৃষ্টিতে এই কাব্যকে বিচার করে দেখবার যথেষ্ট সহায়তা করা হয়েছে বলে মনে করি।

এই কাব্যের রসগ্রহণে সত্যকার কতকগুলি বাধা ছিল, কিন্তু সেগুলিকে দূর করে লেখক-পাঠকের মধ্যে একটা সহজ সংযোগ স্থাপন করে দেওয়া অসম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সহজ সংকোচবশেই জীবনস্মৃতির সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের বেশি নিজের বড়দার সম্বন্ধে আরো বিস্তৃততর আলোচনা করতে পারেন নি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা বলতে পারি যে প্রধান বাধা হল এই কয়টি : ১. এই কাব্যের নূতন বিষয়বস্তু ও তার বিন্যাস; ২. নূতন ছন্দ যার গতিভঙ্গী প্রথমপাঠে অনায়ত্ত থেকে যাওয়াই সম্ভব; ৩. সাধু ও লৌকিক শব্দের অবাধ সমন্বয়ে এমন ভাষাবন্ধের সৃষ্টি যা পাঠকচিত্তে হঠাৎ একটা অসামঞ্জস্যের ধারণা এনে দেওয়াই স্বাভাবিক; ৪. লেখকের যে কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য এই ছন্দ-ভাষা-ভাবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তার মূল আবেদন বা স্টাইল সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা : লেখকের মেজাজ প্রধানতঃ আখ্যানকার বা নাট্যকারের, তাঁর সুর আসলে কৌতুকের, ব্যঙ্গের, মননশীলতার, কল্পনার না লিরিক ভাবাবেশের—আপাতদৃষ্টির এই-সব প্রশ্নের নিশ্চিত সমাধানের অভাব; ৫. এবং সব শেষে দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিরূপ সম্বন্ধে বিশেষ এক ধরনের খ্যাতি যা তাঁর কবিত্বসম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করলে আশ্চর্যের কিছুই নেই। এ ছাড়া নতুন বানানরীতির প্রচলন করার চেষ্টাটাও, যথা 'দেখে' বানান 'দেখ্যা', পাঠককে বিভ্রান্ত করে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ একজন আত্মভোলা দার্শনিক, তিনি নানা বিচিত্র এবং অনেক সময়ে উদ্ভট

খেয়ালে মেতে থাকেন, নানা খুঁটিনাটি উদ্‌ভাবনের দিকে তাঁর নজর ও সরল শিশুসুলভ তাঁর উচ্চ হাসি তাঁর ভিতরকার মুক্ত জ্ঞানী স্বভাবটিকে সহজেই লেখকের কাছে প্রত্যক্ষ করে তোলে—এই ধরনের চারিত্র আরোপ কাব্যের সেই প্রথম প্রকাশের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল ও আছে যে, এও যে এই খেয়ালী মানুষটির শুধুই একটা খেয়াল নয়—(তা সে যত প্রশংসনীয় খেয়ালই হোক,) এর মধ্যে সত্যই যে একটি অবিসম্বাদ্য কবিপ্রাণ নিজের মর্মবাণী প্রকাশ করেছে একথা ভাবাই ছিল শক্ত; তাই রসজ্ঞ পাঠকরাও দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষা ছন্দ ইত্যাদির সাধুবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন, এই কাব্যের গভীরে নিহিত কাব্যস্পন্দ লক্ষ্যও করেন নি। তাই এই কাব্য থেকে গেছে সাহিত্যক্ষেত্রে একটা 'ঘটনা' মাত্র, প্রেরণা নয়। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথের উক্তিকেও অনেকের মনে হতে পারে, আমার তো তাই হয়েছিল, 'বড়দা'র প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন, কাব্যতত্ত্বদৃষ্টির কঠোর অপক্ষপাত বিচার নয়। কাব্য-সমালোচনায় ব্যক্তিগত সাক্ষ্যের বেশ একটা মূল্য আছে। আমি অন্ততঃ স্বীকার করি যে এর আগেই আমার যে অস্পষ্ট অনুমান গড়ে উঠেছিল বিশ্বভারতী লাইব্রেরিতে রক্ষিত স্বপ্নপ্রয়াণের ভঙ্গুরপত্রবিশিষ্ট একটি সংস্করণ অতি সন্তর্পণে ব্যবহার করে—যার ফলে অনায়াসে অগ্রসর হওয়া হয়েছিল একেবারেই অসম্ভব—তাই অতি সহজেই প্রতিপন্ন হল এই নতুন সংস্করণটি ব্যবহার করে। স্বপ্নপ্রয়াণ পুরোনো পুঁথির মত সাবধান-স্পর্শ ও অভিনিবেশ চায় না, চায় সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের—এমন কি বলিষ্ঠ প্রাণোদ্বেল সাহচর্যের সম্পর্ক। সেইরকম একটি সম্পর্কস্থাপন সম্ভব হয়েছে এই নতুন সংস্করণের সহায়তায়। এবং তার ফলে এই কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা তাঁর দার্শনিকতার চেয়ে কম সত্য নয়। স্বপ্নপ্রয়াণে তিনি নিজেই ঐ কবিনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ, এবং নিজের আত্মবিশ্লেষণে তাঁর সন্দেহমাত্র নেই যে তিনি কবি। প্রিয়নাথ সেনের কাছে লেখা তাঁর চিঠিতেও এ বিষয়ে তাঁর দৃঢ়প্রত্যয়ের ইঙ্গিত আছে।

এই মূল প্রত্যয়টি লাভ করলে অন্য সন্দেহ-সমস্যাগুলি দূর করা এমন-কিছু শক্ত নয়। নতুন বানানপদ্ধতি এই নতুন সংস্করণেও রাখা হয়েছে। বাংলা ভাষা যে এতদিনেও এই নতুন রীতি গ্রহণ করে নি তা আমরা জানি, কাজেই এই উদ্‌ভাবন বা সংস্কার-প্রস্তাবকে উপেক্ষা করলেই আর ঝঞ্ঝাট নেই।

এখন বাকি রইল যে-তিনটি প্রশ্ন তারা পরস্পরসম্বন্ধ। তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র কি ও তার সঙ্গে তুলনায় তাঁর বিষয়নির্বাচন কতটা সার্থক ও সমীচীন হয়েছে—এই হল একটা প্রশ্ন। সেই অভিজ্ঞতার যথাযথ কাব্যরূপায়ণের সামর্থ্য তাঁর ছিল কিনা—তাঁর কবি-প্রতিভার বিশেষ গুণ, ক্ষমতা, মেজাজ কতটা এই কাজের উপযোগী ছিল—এই হল দ্বিতীয় প্রশ্ন। আর তৃতীয় হল তাঁর সেই নির্বাচিত কাব্যপ্রয়াসের উপযোগী ছন্দ ও ভাষা তিনি খুঁজে বা তৈরি করে নিতে পেরেছেন কি না।

স্বীকার করতে হবে যে জীবন-অভিজ্ঞতায় দ্বিজেন্দ্রনাথের কিছুটা অপ্রাচুর্য ছিল। ইন্দ্রিয় ও হৃদয় সংবেদন ও রসবোধের ক্ষমতা যথেষ্ট থাকলেও জীবনের ও বাস্তব জগতের কিছু অভিজ্ঞতার পরই তাঁর অন্তরের মানুষটি বাইরে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেয়েছিল। সম্ভোগ ও সন্তাপ, প্রাপ্তি ও বঞ্চনায় মেশানো যে জীবন তার থেকে বিদায় নিয়ে অন্তরের জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহনের চেষ্টা এবং তার ফলে 'দ্বিজেন্দ্রের দ্বিজত্বলাভ'—এই হল তাঁর অন্তর্জীবনের ইতিহাস। স্বপ্নপ্রয়াণে এই দ্বিজত্বলাভের বর্ণনা করেছেন কবি এইভাবে—

হৃদিমাঝে পাইয়া চেতন-রবি
ফুটিল নয়ন-পদ্ম! 'দ্বিজ হনু' মনে ভাবে কবি।
ব্রহ্মতালু ভেদি'
ভবপাশ ছেদি',
উঠে জ্ঞানানলশিখা হিরন্ময় ছবি।

এ কোলরিজের মতো শুধু অমূর্ত চিন্তা ও তত্ত্বের রাজ্যে কবিচিত্তের আত্মবিসর্জন নয়। এ ব্রহ্মাস্বাদের সমুদ্রে কবিসুলভ রসবোধের সার্থক সমাপ্তি। কিন্তু যাতায়াতের সেতুটি তৈরি না থাকলে কবির জগৎ ও অধ্যাত্মদর্শনের জগৎ একসঙ্গে টিকতে পারে না যেমন টিকেছিল রবীন্দ্রনাথের বেলায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাই লৌকিক জীবন ও তার কাব্য-সম্ভাবনাকে দ্রুত পেরিয়ে উত্তীর্ণ হলেন আত্মজ্ঞানের জগতে। এই পেরিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতাটুকুই তাঁর এই কাব্যের বিষয়। বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে এই অভিজ্ঞতার পরিধিসংকোচ যদিই বা স্বীকার করি, তার জীবনসত্যতা ও যথার্থ্য স্বীকার করবার উপায় নেই, আর এ কথা নিশ্চয় মননশীলতা কল্পনা ও রসবোদিত্বের দ্বারা সেই অভিজ্ঞতার সুনিপুণ ব্যবহারে দ্বিজেন্দ্রনাথ অনন্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞের যে বর্ণনা আছে তারি আদর্শের অনুসরণে কূর্ম যেমন তার অঙ্গগুলিকে সংহরণ করে তেমনি আত্মসমাহিত হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ত্ততে।

কবি দ্বিজেন্দ্রের বিষয়গুলিও ক্রমে গেল বিদায় নিয়ে এবং তাঁর কাব্যরসও রসের অতীত পরতত্ত্বকে পেয়ে নিবৃত্ত হল। কিন্তু তার আগেই কবিপ্রতিভার যেটুকু স্ফুরণ ঘটে গেল তার থেকে দেখা যায় তিনি অনেকটা কাশীরাম দাস কৃত্তিবাসের মতোই মহাকবিসুলভ চিত্তসম্পদ্‌ ও কবিপ্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন। জীবনের বহুবিচিত্র রসকে গ্রহণ ও রূপ-দানের সহজসিদ্ধ ক্ষমতা তাঁর ছিল। মহাকাব্যে যেমন প্রয়োজনমতো গভীর লঘু সুরে বিচিত্র রসের অবতারণা করতে হয় এবং সব মিশিয়ে একটা ভাষার ও ছন্দের তৎপরতা ও কাহিনীর প্রবহমানতা রক্ষা করে যেতে হয় দ্বিজেন্দ্রনাথও স্বপ্নপ্রয়াণে নিপুণভাবে তাই করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যে গৃহিণীপনার অভাব'—এই মন্তব্য যে অর্থে সঞ্জীবচন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রনাথের বেলা খাটে না। বরং একটা বহুঅবয়বযুক্ত পরিকল্পনাকে রূপায়িত করে তোলার মতো সরল ও তীক্ষ্ণ সংগঠনী বুদ্ধিরই সাক্ষ্য পাওয়া যায় স্বপ্নপ্রয়াণে। কিন্তু গৃহিণীকে খাদ্যের আহরণ ও প্রস্তুতি ছাড়া আবার লোকের প্রয়োজন রুচি ও মেজাজ বুঝে পরিবেশনও করতে হয়। এইখানেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারে শিশুর মতো জ্ঞানবিবেচনাহীন। পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্তিকর অনেক কিছু করে তিনি মনে মনে কৌতুক অনুভব করেছেন, কিম্বা একটা নতুন কিছু করার আত্মপ্রসাদ। তাতে যে তাঁর কাব্যের প্রধান আকর্ষণ ঢাকা পড়ে যেতে পারে, পাঠকরাও বিমুখ হতে পারে এ খেয়াল তাঁর হয় নি। শুধু অদ্ভুত বানানপ্রথাই নয়, রূপক-আকারে গল্প রচনা করতে গেলে যে-যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তাও তিনি করেন নি। পাত্রপাত্রীর এমন নাম দিয়েছেন যা নীতিমূলক allegory-তেও বেমানান হত। যথা 'সখ্যরস', 'দাস্যরস'। আমাদের যাত্রাগানে নিয়তি, ধর্ম, বৈরাগ্য ইত্যাদি এক-একটি চরিত্র হিসাবে আসরে এলে তাও দর্শকরা

মেনে নেয়, কারণ, তাদের চরিত্ররূপ অনেক পরিমাণে প্রথাসিদ্ধ। 'সখ্যরস' শব্দটাকে একটা প্রচলিত কোনো নামের আকার দেওয়া শক্ত ছিল না। চরিত্রটির মধ্যে সত্যিকার জীবনের হৃৎস্পন্দনের কিছুটা ধ্বনি পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ ধরনের নাম দেওয়ার ফলে প্রথমেই পাঠকচিত্তে আসে একটা ঔৎসুক্যের অভাব। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর কাহিনীতে সত্যকার জীবনরস সঞ্চার করেছেন অনেক পরিমাণেই, কল্পনার প্রতি কবির আকর্ষণ, লালসার প্রতি কাম, সখ্যরসের সঙ্গে প্রণয় প্রভৃতি বর্ণনায়। বিশেষতঃ বিষাদপুরের হা হা হু হু রাজা ও তার মন্ত্রী, রসাতলের অদ্ভুত বাসিন্দাদের কার্যকলাপে যথেষ্ট প্রাণরস সঞ্চারিত হয়েছে। সমর প্রয়াণের যুদ্ধবিরোধ যথেষ্ট বাস্তব প্রত্যক্ষতা ও নাটকীয় অভিঘাতের সঙ্গে কল্পিত ও বর্ণিত হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথের লৌকিক ভাষার দৃঢ়ভিত্তিতে রচিত সুস্পষ্ট তীক্ষ্ম ও যথেচ্ছ সঞ্চরণক্ষম ভাষাব্যবহারের কৃতিত্ব কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস ভারতচন্দ্রের অনুরূপ কৃতির সঙ্গের তুলনীয়। শান্তিপ্রয়াণে মায়াবলে পশুতে পরিণত যে-সব মানুষ পশুত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে নিজ রূপ ফিরে পাচ্ছে তারা হোমারের ওডিসির সেই Circe-ও তার নষ্টামি মনে করিয়ে দেয়, কামরূপে মানুষকে ভেড়া করে রাখার স্মৃতিও উদ্রেক করে। কিন্তু রূপকভেদ করে নানারকমের চরিত্রবিকৃতির যে আলেখ্যগুলি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ তা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। স্পেন্সরের চেয়ে তা কম নয়। এই বিভিন্ন পর্যায়ের অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাঁর কাব্যের ভাষা সুর রসও প্রয়োজনমতো বদলেছে। এবং বিস্তৃততর আলোচনার সুযোগ পেলে দেখানো যেত রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-কবিতা, খামখেয়ালি কবিতা, উদ্ভটরসের কবিতা : যথা, হিং টিং ছট, খাপছাড়ার কবিতা ইত্যাদি তার দ্বারা প্রভাবান্বিত।

তা ছাড়া কণিকায় রবীন্দ্রনাথ যে ধরনের চকিতচিন্তাস্ফুরণ এক-একটি কবিতায় ধারণ করবার চেষ্টা করেছেন সেই ধরনের চিন্তায়ও দ্বিজেন্দ্রনাথের পারদর্শিতা উল্লেখযোগ্য—

কিন্তু সখে মাটিকে ছাড়িয়া দিলে
শোভাশূন্য ভোঁ ভোঁ ছাড়া আর কিছু থাকেনা নিখিলে।
জ্ঞানীজনে বলে—
মাটিতেই ফলে
চতুরবরগ ফল, ফলাতে জানিলে।

এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধে শ্রীকানাই সামন্ত সত্যকার লিরিক কবিতার সুর ও ছন্দেও দ্বিজেন্দ্রনাথের দক্ষতার ইঙ্গিত করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কোনো কোনো কবিতার উপর তার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। এবিষয়ে দীর্ঘতর আলোচনা হওয়া উচিত বলে শ্রীসামন্ত যে মন্তব্য করেছেন তার সম্পূর্ণ সমর্থন করি। সে অবকাশ এখানে নেই। তবে এইটুকু উল্লেখ করতেই হবে যে মাঝে মাঝে সুর বদলে ছন্দ বদলে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছেন ঠিক যেন সংস্কৃত শেলাকের ছাঁদে কবিতা—যা বিশেষ করে কালিদাসের স্মৃতিরণিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাসশিহরিত কবিতারও পূর্বাভাস আছে অনেক পঙ্ক্তিতে—

তোলো তোলো হে মলয় ইহার আঙুল দুটি ধরি—
আর উঠিবে না!
কেন আর ঘুরিছ গো মধুকর গুন গুন করি—
আর ফুটিবে না!
মরণেরে বরিয়াছে পরাণের প্রিয়—

ভুলানে কথায় আর কান দিবে কিও!

পৃথিবীতে 'চাবিবন্ধ হৃদয় সকলি' এই দুঃখে ম্রিয়মান কবিকে সুসঙ্গ (এই আবার দ্বিজেন্দ্রনাথের নামকরণের আর এক নমুনা) যা বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল সেই চমৎকার কাব্যকুহকরোমাঞ্চিত পদগুলি তুলে আমরাও আজ বন্দনা করি কবি দ্বিজেন্দ্রনাথকে। তাঁর কাব্য সাময়িক অবহেলায় ভাগ্যের ঝড়ঝাপটে লুপ্ত হবার নয়। এই কাব্যের 'সদানন্দ শাখায়' পাঠকপাখির কলরব শুরু হবে—স্বপ্নপ্রয়াণের এই নূতন সংস্করণ প্রকাশ আশা করি তারই সূচনা করছে।

অরণ্যের পাখী তুমি, বিলাপের ধ্বনি কেন মুখে!
চিরকাল তুমি অরণ্যের পাখী, থাকিবেও তথা
চিরকাল। বলিতেছি আমি সেই অরণ্যের কথা,
যে অরণ্য বাতাসের সনে মুখোমুখি কথা কয়—
ডরে না ঝড়-ঝাপটে, দিগন্ত-প্রাচীরে বন্ধ নয়,
আপনে আপনি রহে বিস্তারিয়া সদানন্দ শাখা।

ছন্দ ও মিল রচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথের অসাধারণ সাফল্যের বিষয় আলোচনা আশা করি যোগ্য ব্যক্তিরা করবেন।

সুনীল সরকার

Words. *By* Jean-Paul Sartre. Hamish Hamilton. London. 21*s*.

আত্মচরিতের ইতিহাসে খ্যাতনামা ফরাসী লেখকদের দান উজ্জ্বল হয়ে আছে। নির্ভীক আত্ম-উন্মোচনে তাঁদের তুলনা মেলা ভার। রুশোর "কনফেশানস্" ও আঁদে জিদের "ইফ ইট ডাই" বিশ্ব-সাহিত্যের দুটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। সিমন দ্য বোভোয়ার তাঁর আত্ম-জীবনীতে সার্ত্র-এর আত্ম-চরিতের আসন্ন প্রকাশ সম্বন্ধে উল্লেখ করবার পর থেকেই একটি চাঞ্চল্যকর বিবরণীর জন্য আশা জেগেছিল। তাই প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই "ওয়ার্ডস"-এর কাটতি হয়েছে অভূতপূর্ব। কোনো জীবনী-গ্রন্থের জন্য এমন চাহিদা এর পূর্বে কখনো হয়নি।

রুশো বা জিদের স্বীকৃতির মতো চাঞ্চল্যকর কিছু আশা করলে পাঠককে হতাশ হতে হবে। বর্তমান গ্রন্থে সার্ত্র মোটামুটি তাঁর বারো বছর পর্যন্ত জীবনের কথা বলেছেন। সুতরাং অনালোকিত অধ্যায়ের চমকপ্রদ উদ্ঘাটনের সুযোগ লেখক পাননি। তেমন ঘটনা কিছু আছে কিনা এবং থাকলে তা প্রকাশ করবার সুযোগ তিনি পরবর্তী খণ্ডে গ্রহণ করবেন কিনা, সেটা আবার জল্পনার বিষয় হয়েছে।

বারো বছরের বালকের জীবনেও যৌনচেতনা দেখা দেয়। সে চেতনা মনের অবচেতন স্তরে সঞ্চিত থেকে পরবর্তী জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। ফ্রয়েডপন্থী হয়েও সার্ত্র তাঁর যৌনচেতনার উন্মেষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। তরুণী বিধবা মাকে তাঁর কুমারী বলে মনে হত; বড় হয়ে পারিবারিক গঞ্জনার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য মা-কে বিয়ে করবেন, এই ছিল সার্ত্র-এর সংকল্প। এই নির্দোষ শিশুকল্পনা ছাড়া কোথাও বিবাহ কিংবা যৌন-

ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়নি। মা-র প্রভাবের জন্যই হয়ত এমন হয়েছে। মা ছেলেকে মেয়ের মতো রাখতে চাইতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, I was to have the sex of the angles, indeterminate but feminine round the edges.

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ডাঃ সার্তর গ্রামের জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করলেন উত্তরাধিকারসূত্রে অর্থপ্রাপ্তির আশায়। কিন্তু বিয়ের পরই জানতে পারলেন শ্বশুর আসলে নিঃস্ব। রাগ গিয়ে পড়ল স্ত্রীর উপর। শাস্তি হিসাবে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ডাঃ সার্তর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন নি। অবশ্য তাই বলে স্বামীর কর্তব্য তিনি অবহেলা করেন নি। পত্নী তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন দুই পুত্র ও এক কন্যা।

এক ছেলে জাঁ-ব্যাপ্তিস্ত নৌবাহিনীতে যোগ দিয়ে কোচিন-চীন থেকে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে দেশে ফিরলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পরিচয় হল পরিবারের উপেক্ষিতা তন্বী অ্যান-মেরি সোয়াইটজরের সঙ্গে। পরিচয় প্রেমে পরিণত হবার পূর্বেই তাঁদের বিয়ে হল। এঁদেরই সন্তান জাঁ-পল সার্তর।

১৯০৫ সালে পুত্রের জন্মের পরেই জাঁ-ব্যাপ্তিস্ত অন্তিম শয্যা গ্রহণ করলেন। অ্যান-মেরি রুগ্ন স্বামীর সেবা করতে বসে ভুলে গেলেন শিশু পুত্রকে। মাইনে করা দাইয়ের উপর ভার পড়ল জাঁ-পলকে দেখাশোনা করবার। স্বামীর মৃত্যুর পরে অ্যান-মেরি কর্তব্যের দায় থেকে মুক্তি পেলেন; ছেলে ফিরে এল মা-র কোলে।

জ্ঞান হবার পূর্বে পিতাকে হারানো সার্তর সৌভাগ্য বলে মনে করেন। পিতার নিরন্তর চেষ্টা থাকে পুত্রকে নিজের ছাঁচে গড়ে তোলবার। পিতার চিন্তা-ভাবনা এবং অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার বেদনা পুত্রের চেতনাকে আজীবন আচ্ছন্ন করে রাখে। পিতার মৃত্যু তাঁকে সুপার-ইগোর হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে।

কিন্তু মা-র বন্দীদশা হল নতুন করে। সহায় সম্বলহীন অ্যান-মেরির বাবার আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। চার্লস সোয়াইটজর (বিখ্যাত আলবর্ট সোয়াইটজর এই পরিবারের লোক) অবসর নেবার কথা ভাবছিলেন। বিধবা মেয়ের দায়িত্ব এসে পড়ায় তা আর হল না। সে জন্য অ্যান-মেরি সর্বদা কুণ্ঠিত হয়ে থাকতেন। অকস্মাৎ বিয়ে করা, এত তারাতাড়ি মা হওয়া এবং নিঃসম্বল বিধবা হয়ে ফিরে আসা, আত্মীয়স্বজন সুনজরে দেখেনি। পরিবারে কেউ তাঁকে মর্যাদা দেয়নি, তিনিও এই অবস্থা স্বীকার করে নীরবে সকলের সেবা করতেন। শিশু হলেও সার্তর মা-র অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিও মা-কে শ্রদ্ধা করতেন না, করতেন করুণা। কখনো ভাবতেন, অ্যান-মেরির দুঃখ দূর করবার জন্য বড় হয়ে তাঁকে বিয়ে করবেন।

মা যেমন পরিবারের সবাইকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন, সার্তরও তেমনি দাদামশাই ও দিদিমাকে খুশি করবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। মা এ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। আর এ-কাজটি সহজও ছিল। চার্লস সোয়াইটজর ছিলেন নিঃসঙ্গ; ছেলেরা বড় হয়ে গেছে, বাবাকে ভয় করে চলে, কাছে ঘেঁসে না; স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মেজাজের মিল নেই। সুতরাং অবসর সময়ে সার্তর হলেন দাদুর একমাত্র সঙ্গী। দাদুর সঙ্গে খেলা করা, তাঁর কাছে গল্প শোনা, নানা কলা-কৌশল দিয়ে তাঁকে চমক লাগানো—এই সব ছিল সার্তর-এর প্রধান কাজ। সর্বদা বড়দের সঙ্গে থাকতেন বলে বুড়ুটে কথা বলা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল তাঁর। বয়স্করা তা শুনে আমোদ পেতেন খুব। সার্তর বেশী খেতে পারলে প্রশংসা পেতেন, তাঁর কথা শুনে লোকে আনন্দ পেত; অন্যকে আমোদ দেওয়াই যেন তাঁর

একমাত্র কাজ। অন্য কর্তব্য ছিল না। কারণ মা, দাদু ও দিদিমার ভালোবাসা তাঁকে নিরন্তর ঘিরে থাকত। কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হবার সুযোগ পাননি।

দশ বছর পর্যন্ত এক বৃদ্ধ এবং দুই নারী নিয়ে ছিল সার্ত্র-এর বাইরের জগৎ। বর্ণপরিচয়ের পর ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে লাগলেন অন্তরলোকের নিজস্ব জগৎ,—বইয়ের জগৎ। দাদুর লাইব্রেরীর দ্বার তাঁর কাছে ছিল অবারিত। ছোটদের কিংবা বড়দের বইয়ের ভেদাভেদ ছিল না। যে বই খুশি পড়তেন। অনেক কিছুই বোঝা যেত না। কিছু বোঝা, কিছু না বোঝার রহস্য তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করত। বই ছেড়ে উঠতে পারতেন না। দিনের শেষে ঘর অন্ধকার হয়ে উঠত। মা এসে আলো জেবলে দিয়ে বলতেন, 'চোখ যে যাবে!' একবার "মাদাম বোভারি" পড়তে চাওয়ায় মা বলেছিলেন, 'এখনই যদি এসব বই পড় তাহলে বড় হয়ে কি পড়বে?' সার্ত্র জবাব দিয়েছিলেন, 'বড় হয়ে বই পড়ব না, কাহিনীর জীবন নিজেই যাপন করব।'

দাদু নাতির পড়ায় এত আগ্রহ দেখে গর্ববোধ করতেন। কিন্তু খুব আশা করে স্কুলে ভর্তি করবার জন্য নিয়ে গেলেন, শ্রুতিলিখনে ভুল বানানের বহর দেখে তাঁর মেজাজ বিগড়ে গেল। এই প্রথম চার্লস নাতির উপর রাগ করলেন। নিশ্চয়ই এটা তার মতলবী, ইচ্ছা করেই ভুল করেছে। হেডমাস্টারের সঙ্গে ঝগড়া করে সার্ত্রকে বাড়ি নিয়ে এলেন।

সাত-আট বছরের বালকের মনে ধারণা হয়েছিল তাঁর জীবন মা ও দাদুর হাতের মুঠোয়, নিজস্ব বলে কিছু অবশিষ্ট নেই। এই পৃথিবীতে তিনি যেন বিনা টিকিটের যাত্রী। তাই সসঙ্কোচে বাস্তব জগত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে চাইতেন। নিজেকে নিয়ে যেতেন বইয়ের জগতে, কল্পনার জগতে। সেই অন্তরঙ্গ জগতকে রূপ দেবার আকাঙ্ক্ষা জাগল। সার্ত্র লিখতে শুরু করলেন। একে একে খাতা ভর্তি হতে লাগল। বালকের পক্ষে মৌলিক সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর প্রথম রচনা ছিল শুধুই সুপরিচিত কাহিনীর প্রায় আক্ষরিক নকল। নিজের হাতে খাতায় নকল করে তৃপ্তি পেতেন। সৃষ্টির মিথ্যা মোহে বালকের মন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত। কিছুকাল পরে নিজের উদ্ভাবনের সঙ্গে অন্য লেখকের রচনা মিশিয়ে একের পর এক উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করলেন। সার্ত্র বলছেন, I adored plagiarism...লেখা চুরি করা যে অপরাধ তা মনেই হত না। কথা নিয়ে খেলা ছিল তাঁর কাছে নেশার মতো। কেননা, I saw words as the quintessence of things. Nothing disturbed me more than to see my scrawl little by little exchange its will-o'-the-wisp sheen for the dull consistency of matter; it was the imaginary made real. Trapped in their names, a lion, a Second Empire Captain, a Bedouin were introduced into the dining room; they remained there for ever imprisoned, given body by signs; it was as if I had anchored my dreams to the world by the scratching of a steel nib.

সার্ত্র নিজেই ছিলেন তাঁর সকল উপন্যাসের নায়ক। তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা ছিল নগণ্য; বালকদের খেলাধুলা এবং চিত্তবিনোদনের অন্যান্য যে-সব শখ থাকে সার্ত্র-এর তা ছিল না। নায়কের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করাই ছিল তাঁর একমাত্র খেলা। এই খেলার মোহ থেকে সার্ত্র মুক্তি পেলেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। তিনি নায়ক হিসাবে যে কাইজারকে সৃষ্টি করলেন তাঁর পরাজয়ের এবং যুদ্ধ-সমাপ্তির তারিখ নির্দিষ্ট ছিল।

কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হবার পরও যখন যুদ্ধ শেষ হল না, কাইজারের প্রতাপ অব্যাহত রইলো, তখন কিশোর লেখকের কলমের শক্তির উপর আস্থা ক্ষুণ্ণ হল। এতদিন কী এক মিথ্যার জগৎ নিয়ে সময় কেটেছে! লেখার খাতাগুলি সমুদ্র-তীরে বালির মধ্যে কবর দিয়ে এলেন। সাময়িকভাবে লেখা বন্ধ হয়ে গেল।

লেখা একেবারে বন্ধ হয়নি। হতে পারে না। কারণ লেখক হবার জন্যই তাঁর জন্ম হয়েছে। সার্তর বলেছেন, পিতার মৃত্যু তাঁকে অন্যের প্রভাব থেকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্তি তিনি পাননি। দাদামশাই তাঁকে নানা দিক থেকে প্রভাবান্বিত করেছেন। বিশেষ করে শব্দের প্রতি মোহ সৃষ্টিতে। দাদু ছিলেন ভাষা-শিক্ষক। প্রত্যেকটি শব্দের পৃথক রূপ উপলব্ধি করবার সাধনা ছিল তাঁর। শব্দের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধির ব্যগ্রতা সার্তর-এর মধ্যেও পরিস্ফুট। শব্দকে এত ভালো করে চিনেছেন বলেই তাঁর ধারণা, you talk in your own language, but you write in a foreign one. সব লেখকই নিজের অনুভূতির অনুবাদক। কথার সঙ্গে লেখার এই প্রভেদ। এর ফলে লেখায় খানিকটা কৃত্রিমতা এসে যায়। একটু বাড়িয়ে শাতোব্রিয়াঁ তাই বলেছেন, আমি গ্রন্থ উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র।

সার্তর তাঁর জীবনে সুবিন্যস্ত শব্দমালা বা সাহিত্যের প্রভাব স্বীকার করেছেন আত্মচরিতের নামকরণ। "ওয়ার্ডস" দুই অধ্যায়ে বিভক্ত—পাঠ ও লেখা। শৈশব থেকে লেখা ও পড়া তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে। কিন্তু এখন আর মোহ নেই। শুধু অভ্যাসের বশেই লিখে চলেছেন : It is my habit and it is also my profession. For a long while I treated my pen as a sword: now I realise how helpless we are. It does not matter: I am writing, I shall write books; they are needed; they have a use all the same. Culture saves nothing and nobody, nor does it justify.

সাহিত্যের মূল্য সম্বন্ধে এই নৈরাশ্য একটু আকস্মিক মনে হবে। প্রতিরোধের নেতা হিসাবে সার্তর বিশ্বাস করতেন সাহিত্যের তরবারি দিয়ে রাজনৈতিক বৈষম্য দূর করা যায়। আজ সেই তরবারিকে ভোঁতা কেন মনে হল কে জানে! সার্তর হয়ত এই ভেবেই বলেছেন যে, রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে এমন সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয় যা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সার্তর মনে করেন, ভালো লেখা ও খ্যাতি একই সঙ্গে আসে। কিন্তু খ্যাতি পেলেই শিল্পীর মৃত্যু ঘটে। সার্তর নিজেকে প্রতিভাবান লেখক হিসাবে দাবী করেন না। নিজেকে বিশ্লেষণ করে এই আত্মপরিচয় তিনি পেয়েছেন : I have never seen myself as the happy owner of a 'talent' : my one concern was to save myself—nothing in my hands, nothing in my pockets—through work and faith. Now at last my unadulterated choice did not set me up above anyone: . . . A whole man, made of all men, worth all of them, and any one of them worth him.

"ওয়ার্ডস" নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল একটি আত্মচরিত। সার্তর পরিণত বুদ্ধি দিয়ে আপন শৈশবকে বিশ্লেষণ ও বিচার করেছেন। শৈশব-স্মৃতির প্রতি যে স্বাভাবিক দুর্বলতা থাকে সার্তর তা থেকে মুক্ত। তিনি নির্মমভাবে বুর্জোয়া পরিবারে

তাঁর শৈশব-জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি, কৃত্রিমতা ইত্যাদি উদ্ঘাটন করেছেন। তুচ্ছ বিষয়কে ফেনিয়ে বইয়ের আকার বড় করা হয়নি। আজকের জীবনে শৈশবের অনেক কিছুই বেঁচে আছে; সেই জন্য স্মৃতিকথার মূল্য। নিজেকে প্রচার করবার জন্য নয়।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

An Area of Darkness. *By* V. S. Naipaul. Andre Deutsch. London 25*s.*

A House for Mr. Biswas-এর লেখক ভি. এস. নায়পল প্রায় দু বছর আগে এ দেশে আসেন। তাঁর পিতামহের জন্মভূমিতে প্রায় এক বৎসর বাসের অভিজ্ঞতার ফল *An Area of Darkness.* বইটি নিয়ে এদেশে ও বিদেশে যথেষ্ট আলোড়ন হয়েছে। এর কারণ বর্তমান ভারতের সামগ্রিক রূপ নিয়ে এই ধরনের সুলিখিত বই অনেকদিন বেরোয়নি। তা ছাড়া বইয়ের নাম থেকেই বোঝা শক্ত নয় যে লেখকের বক্তব্য নিয়ে পাঠকদের একমত হওয়া শক্ত।

বইটিকে লেখক 'An Experience of India' বলেছেন। 'Experience' কথাটার একটা তাৎপর্য আছে যা বাংলা 'অভিজ্ঞতা' দিয়ে ঠিক প্রকাশ করা যায় না। এ দেশে আসার আগে থেকেই নায়পল যেন বুঝেছিলেন যে ভারতের যে অস্পষ্ট, তমসাবৃত চেহারা ত্রিনিদাদে তাঁর বাল্যকালকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, চাক্ষুষ পরিচয়ে সেই দেশের চেহারাটা তাঁর কাছে খুব সুন্দর মনে হবে না। এই ধারণাটা ভেবে দেখলে খুব অমূলক নয়। লেখক নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন তাঁর কোনো দেশ নেই, জাত নেই, তিনি নিরীশ্বর ও পুরোপুরি ব্যক্তিত্ব-বাদী। এহেন লোকের সঙ্গে সনাতন ভারতের মোলাকৎ যে সংঘর্ষে পরিণত হবে তা আর আশ্চর্য কি।

জাহাজ ছেড়ে বোম্বাইয়ে পদার্পণ করেই নায়পল এক অভূতপূর্ব ক্লেশ বোধ করলেন। তাঁর মনে হল নগরীর জনস্রোতের মধ্যে তাঁর স্বত্তা লোপ পেয়ে গেছে, তিনি জনমণ্ডলীর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন। 'একাকার' কথাটা এখানে মূলগত অর্থে ব্যবহার করা হোল। কারণ ত্রিনিদাদ বা বিলেতের জনগণের সঙ্গে লেখকের অন্তত শারীরিক স্বাতন্ত্রতা ছিল। বোম্বাইয়ে তাও খোয়া গেল।

তারপর ভারত-পরিক্রমা সুরু হল এবং নায়পল প্রতিপদেই ক্লান্ত ও পীড়িত বোধ করতে লাগলেন। প্রথমত তিনি গরম ও ধুলোয় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দ্বিতীয়ত সারা দেশটাকে তাঁর একটা বিরাট আস্তাকুঁড় বলে মনে হোল। আস্তাকুঁড় কথাটা বেশ মোলায়েম। নায়পল বলেছেন 'India is like one vast latrine' পাতার পর পাতা ধরে তিনি জনবহুল সহরের রাজপথে আর মাঠে ঘাটে, রেল লাইনের ধারে আর নদীর পারে, সমুদ্রের কূলে আর পাহাড়ের গায়ে ভারতীয়দের মলমূত্রত্যাগের বর্ণনা করেছেন। যা দেখে নায়পল সবচেয়ে ক্লিষ্ট হয়েছেন তা হলো দেশের মানুষের ও সমাজের চেহারা। শাসক-গোষ্ঠির মূলধন হলো কথার বেসাতি কারণ কাজের দিক থেকে তাঁরা দেওয়ানা। আমরা মুখে বড় বড় কথা বলি, কথায় কথায় ভারতের আত্মা ও পারমার্থিক শক্তির দোহাই দিই অথচ কার্যত আমরা অর্থলোলুপ ও নিষ্ঠুর। শঠতা, ভণ্ডামী ও আদর্শহীনতা আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে রন্ধ্রগত হয়ে গেছে। নায়পল ভারতীয় চরিত্রের এই রূপ দেখে মর্মাহত

হয়েছেন। তিনি তাঁর বইয়ে রাজনীতি বা অর্থনীতির হেরফের নিয়ে আলোচনা করেন নি। পাঁচশালা পরিকল্পনায় কত ইস্পাত তৈরি হোল বা কত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হোল, কত লক্ষ একর জমিতে চাষের জল এলো বা কত কোটি হন্দর সার জমিতে ছড়ানো হোল, নেহরুর পরে কে দিল্লীশ্বর হবেন বা ভারতীয় গণতন্ত্র কোন পথে এ সব নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেন নি। তিনি মুখ্যতঃ মানুষ হিসেবে ভারতীয়রা কেমন এবং যে সব ঐতিহাসিক কারণ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের চিরকাল প্রভাবান্বিত করেছে ও এখনও করছে সেই জিনিষগুলিকে নিজের বুদ্ধিমত বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

বলাবাহুল্য শিক্ষিত ভারতীয়দের চেহারাটা নায়পলের চোখে বিসদৃশ লেগেছে। এর কারণ আমরা আমাদের জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রভাবগুলিকে খাপ খাইয়ে নিতে পারি নি। আমরা আচারে-ব্যবহারে, কথাবার্তায়, সাজসজ্জায় সাহেব হওয়ার চেষ্টা করি—নায়পল যাকে 'mimicry' বলেছেন আর হুতোম যাকে বলেছিলেন সাহেবের উঁচু কেতার গোবরের বস্ট (Bust)। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, কল-কারখানা, অর্থনীতিক ও রাজনীতিক পরিবর্তন সত্বেও আমাদের ভেতরের চেহারাটা সনাতনী রয়ে গেছে। তার একটা প্রমাণ যে আমাদের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও অনেকে ঠিকুজি কুষ্ঠিতে বিশ্বাস করেন। ফলে আমাদের ব্যক্তিস্বত্তা দ্বিধাবিভক্ত—নায়পলের ভাষায় schizophrenic। অনেকটা হাঁসজারুর মত—না সাহেব না ভারতীয়, না পুরাতন না আধুনিক।

নায়পলের মতে আমাদের জাতীয় চরিত্রের অবনতির একটি মূল কারণ আমাদের জাতি-ভেদ প্রথা। এই প্রসঙ্গে নায়পল বলেছেন: Cast imprisons a man in his function. It leads to callouness, inefficiency and a hopelessly divided country, division to weakness, weakness to foreign rule. জাতিভেদ প্রথা আবহমান কাল ধরে আমাদের ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করেছে। জাতিভেদের ফলে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে আমরা বিদেশী আক্রমণকারীদের দ্বারা পরাভূত হয়েছি। এই প্রথাই আমাদের দেশকে world's largest slum করে তুলেছে। আমাদের মন থেকে মানুষের সেবার কথা মুছে দিয়েছে, শ্রমবিমুখতাকে আমাদের মজ্জাগত করেছে। লোকের জন্যে দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়ার কথা আমরা ভাবতে পারি না। জলে লোককে ডুবতে দেখলে আমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখি। দেশে যখন জীবন মরণ সমস্যা দেখা দেয় আমরা তখন ওজস্বিনী ভাষায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা করি আর সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়।

এই জাতিভেদ প্রথার পটভূমিতে নায়পল মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও কর্মের আলোচনা করে তার আসল তাৎপর্য বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আমরা অনেকেই সামাজিক ব্যাপারে গান্ধীজিকে পুরাতনপন্থী বলে মনে করি। কিন্তু জাতিভেদের কুফল মনে রাখলে আমরা বুঝতে পারবো মহাত্মা গান্ধী কেন বার বার আমাদের নোংরামীর কথা উল্লেখ করেছেন, কেন বলেছেন স্বহস্তে শৌচাগার পরিষ্কার করা সুচীতার পরিচায়ক, কেন বলেছেন মানুষের সেবা সবচেয়ে বড় ধর্ম, কেন বলেছেন খেটে খাওয়ার মতন সম্মানজনক কাজ নেই। এইভাবে বিচার করলে আমরা বুঝবো যে এগুলি বাতিকগ্রস্ত লোকের কথা নয়, এ জাতি-প্রথার মূলে কুঠারাঘাতের চেষ্টা। কিন্তু স্বাধীন ভারতে আমরা তাঁকে অবতার বলে পুজো করি, তাঁর শিক্ষা নিইনি। নায়পলের ভাষায়: India undid him. He became a Mahatma. His message became irrelevant.

খুব কম কথায় এই হলো *An Area of Darkness*-এর মোটামুটি বক্তব্য। নায়পলের কড়া সমালোচনা আমরা অনেকে বরদাস্ত করতে পারি নি। অনেকেই বইটি পড়ে বা না পড়ে এটিকে *Mother India* বা *Verdict on India*-র সমগোত্রীয় করতে চেষ্টা করেছেন। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে এটা ঠিক নয়। নায়পলের বলবার কায়দাটা অবশ্যই নতুন। অতিশয়োক্তি ও সংযম বাদ দিলে নায়পল কিন্তু আমাদের যে সব মোটা মোটা দোষত্রুটি দেখিয়েছেন ইতিপূর্বে এদেশের ও বিদেশের অনেকেই সেগুলির বহুবার উল্লেখ করেছেন। সেই সব মহাজনদের পদাঙ্কনুসরণ করে নায়পল বন্ধুর কাজ করেছেন। মাঝে মাঝে এইরকম ঘা না খেলে আত্মম্ভরিতা ও আত্মতৃপ্তি আমাদের পেয়ে বসবে। আমাদের আর শুধরোবার পথ থাকবে না।

নায়পল আমাদের 'গাল' দিয়েছেন বলে তাঁকে দোষ দেওয়া সুবিচার হবে না। বইটির আসল গলদ অন্যত্র। সেটা হলো নায়পলের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী। অনেকটা অন্ধের হাতির পা দেখে হাতির চেহারাটাকে থামের মতন ভাবার মত। বইটা যাঁরা মন দিয়ে পড়বেন তাঁরা দেখবেন যে লেখক আমাদের জীবনের কয়েকটা দিক বেছে নিয়ে সেইগুলিই সব ও সেইগুলিই সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। খুব স্থূলভাবে বলতে গেলে বলা যায় এ যেন খানিকটা মার্কিন দেশকে মগের মুলুক বলে বাতিল করে দেবার মতন। তা ছাড়া একটা দেশকে বুঝতে হলে একবছর যথেষ্ট কিনা সেটা তর্কসাপেক্ষ। আর আজকের দিনে যখন আমরা সামাজিক ও অর্থনীতিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় পাপ দারিদ্র ও অজ্ঞানতা দূর করার চেষ্টা করছি তখন সেইগুলি বাদ দিয়ে সমাজ ও মানুষের চেহারার বোধহয় সঠিক বিচারও সম্ভব নয়। এই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই নায়পল তাঁর বর্ষব্যাপি ভারত-পরিক্রমায় এমন কিছু দেখলেন না যা তাঁর মনে আশার সঞ্চার করতে পেরেছে, এমন একজন লোক পেলেন না যে মনুষ্যপদবাচ্য। অন্তত তাঁর বইয়ে চিত্রিত নরনারীর বর্ণনা পড়ে তাই মনে হয়।

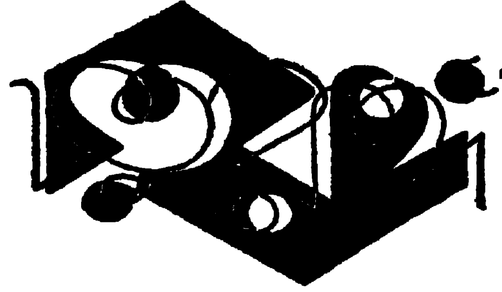
নায়পল বহুবার বলেছেন যে আমাদের বড় দোষ যে আমরা কোন জিনিষকে ইতিহাসের ধারা হিসেবে দেখতে পারি না। এই প্রসঙ্গে কেউ যদি লেখককে 'আপনার মুখ আপনি দেখ' বলেন তা হলে খুব অন্যায় হবে না। নায়পলের ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমাদের ইতিহাস অসুন্দর, আমাদের বর্তমান অসুন্দর, আমাদের ভবিষ্যত তমসাবৃত। তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টির একটি নমুনা হল যে তিনি খুব ঠাট্টার ভাব না নিয়ে বলেছেন যে পঞ্চায়তী রাজ্যের আওতায় হয়ত অদূরভবিষ্যতে ন্যায় বিচারের নামে গ্রামে গ্রামে লোকেদের নাক-কাটা সুরু হয়ে যাবে কারণ আমাদের গৌরবময় অতীতে এই জাতীয় শারীরিক দণ্ডের নজীর আছে। নায়পল অনেক মন্তব্য এই ধরনের ঐতিহাসিক পারম্পর্য ও যুক্তির ওপর খাড়া করেছেন। এই ধরনের যুক্তির দোহাই দিয়ে বলা যেতে পারে যে লেখকের বর্তমান বাসভূমি বিলেতে ভবিষ্যতে হয়ত লোককে রুটি চুরির অপরাধে ফাঁসীকাঠে চড়ানো হবে কারন সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও, লোককে সামান্য চুরীর অপরাধে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছে।

নায়পলের লেখা ঝকঝকে, তাঁর বর্ণনাশক্তি অসাধারণ, তাঁর দেখবার চোখ তীক্ষ্ন। একদল লোক সেইজন্যে নায়পলের বইটির নির্জলা প্রশংসা করেছেন। তাঁদের কথা হোল যে সাহিত্যিকের প্রথম কর্তব্য লেখা সুখপাঠ্য ও সরস করা, বক্তব্য তাঁর কাছে সবসময়ে বড় কথা নয়। কিন্তু এই যুক্তি *An Area of Darkness*-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে খুব

পাকা কাজ হবে না। কারণ এই বই শুধু সাহিত্য বা ভ্রমণ কাহিনী নয়, এতে একটা দেশের ও জাতির চরিত্রও বিচার করা হয়েছে। নায়পল যা বলেছেন তা ভেবে চিন্তে বলেছেন, এবং তাঁর আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা অন্যায়। তা ছাড়া সব ভাল লেখকদের মত নায়পলের লেখার মধ্যে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বও প্রকাশ পেয়েছে। প্রশ্ন হলো যে সেই ব্যক্তিত্বটা কি রকম। সত্যের খাতিরে বলতে হয় তা খুব চিত্তগ্রাহী নয়। আমরা আগেই দেখেছি নায়পল তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলেছেন তাঁর দেবদ্বিজে ভক্তি নেই। বই পড়ার পর মনে হয় যে এ ছাড়া তাঁর নিপীড়িত মানুষের প্রতি টান বা ভালবাসাও নেই। সেইজন্যেই বইটির লিপিচাতুর্য ও সাহিত্যিক প্রসাদগুণসত্ত্বেও মনে হয় এর কোথায় যেন একটা বড় ফাঁকি রয়ে গেছে।

রামপ্রসাদ সেন

ত্রৈমাসিক পত্রিকা



মাঘ-চৈত্র ১৩৭১

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ষড়বিংশতিতম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা



মাঘ-চৈত্র ১৩৭১

আমাদের ভাষা সমস্যা

অমিয়কুমার দাশগুপ্ত

ভাষা সমস্যার দুটো দিক রয়েছে আমাদের দেশে। একটি প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যম কি হবে এই নিয়ে, আর একটি প্রশ্ন রাষ্ট্র ভাষা কি হবে। একটি শিক্ষাব্রতীর প্রশ্ন, অপরটি রাজনৈতিক।

সাম্প্রতিক ভারতে দ্বিতীয় প্রশ্নটিই বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। আমি নিজে শিক্ষাব্রতী হিসাবে প্রথম প্রশ্নটির আলোচনাতেই যোগ দেবার যোগ্য মনে করি। সুতরাং সেই প্রশ্নের আলোচনা দিয়েই এই প্রবন্ধ সুরু করব।

বহুকাল ছাত্রদের পড়িয়ে আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় হ'য়েছে যে শিক্ষার ভিত্তি পাকা করতে হ'লে শিক্ষার মাধ্যম হ'তে হবে মাতৃভাষা,—যে ভাষায় শিক্ষার্থী শিশুকাল থেকে স্বভাবত কথা বলে আসছে, যে ভাষার ইঙ্গিতে সে জগৎটাকে দেখতে শিখেছে। আমাদের বহু ছেলে-মেয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পেয়েও দেখা যায় ভাবতে শেখে না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হয় যে তথাকথিত শিক্ষার ফলে পড়ুয়াদের স্বাভাবিক বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, তার প্রধান কারণ ভাষার বাধা। ভাষার বিপত্তিতে বিচার যায় তলিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ কোন একটি ভাষণে ব'লেছিলেন—গাড়ীর সবটা স্টীম যদি হুইস্‌ল্‌ দিতেই খরচ হ'য়ে যায় তবে এঞ্জিন চল্‌বে কি ক'রে? আমাদের শিক্ষার্থীর মগজ সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। আসলে মাতৃভাষায় যে জিনিষটা বোঝান হয়, তা শিক্ষার্থীর মনে সত্যিকার একটা রূপ নেয়, তাই সে শিক্ষা মনের স্বাভাবিক বিকাশের পথ খুলে দেয়। অন্য ভাষা এই স্বাভাবিক গতিকে সাহায্য করে না, বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ায়।

এটা নতুন কথা নয়। অনেকেই হয়ত—অন্তত মুখে—একথা মেনে নেবেন। অথচ এই প্রশ্ন নিয়েই কত বাক্‌বিতণ্ডা হ'য়ে গেছে দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে, ছোট বড় কত বৈঠক ব'সেছে এ নিয়ে। কিন্তু ব্যাপারটির সঠিক মীমাংসা হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। এখনও বহুলোক আছেন যাঁরা বলবেন ইংরেজীর মাধ্যমে ছাড়া উচ্চ শিক্ষা সম্ভব নয়। উচ্চ শিক্ষার উপযোগী বই আমাদের নিজেদের ভাষায় দুর্লভ; আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-প্রচার শুরু করলে উচ্চ শিক্ষার পরিধি সীমাবদ্ধ হ'য়ে পড়বে; বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার

মানও বিভিন্ন রকম হ'য়ে দাঁড়াবে,—এক অঞ্চলের শিক্ষক অন্য অঞ্চলে পড়ানো ত' দূরের কথা, পরীক্ষাতেও কোনরকম অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না; যেসব অঞ্চল অপেক্ষাকৃত উন্নত, আঞ্চলিক ভাষা চালু হ'লেও সেসব অঞ্চলে শিক্ষার মান খানিকটা বজায় থাকবে,—কিন্তু যে-সব অঞ্চল বর্তমানে অপেক্ষাকৃত পেছনে র'য়েছে, সে সব অঞ্চল ভবিষ্যতেও পেছনেই থেকে যাবে যদি আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের মধ্যেই অধ্যাপনার দায়িত্ব থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আঞ্চলিক ভাষা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে এইসব যুক্তি বহুদিন ধরে চলে আসছে।

এ যুক্তি একেবারে তুচ্ছ করা যায় না। আমাদের দেশের সব অঞ্চলের ভাষা সমান পরিণত নয়। এমন কি যেখানে-যেখানে ভাষা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ, সে সব অঞ্চলেও ঐ ভাষাতে সব রকম জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এমন উন্নত হয় নি যে ঐ ভাষা সত্যিকারের উচ্চশিক্ষার বাহন হতে পারে। বাংলা ভাষার কথাই ধরা যাক। একথা হয়ত অনেকেই স্বীকার করবেন যে বাংলা ভাষা ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে সব চাইতে উন্নত। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বহু বিষয়ে বহু বই প্রতি বছর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে, বাংলা ভাষায় লেখা বহু বই অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। বাংলা ভাষার আদর দেশের সর্বত্র। বাঙ্গালী এ নিয়ে স্বভাবতই গর্ব করতে পারেন, এবং করেও থাকেন। অথচ এই বাংলা ভাষাতেই কটি বই এ যাবত বেরিয়েছে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় সহায়তা করতে পারে? আমি নিজে যে বিজ্ঞানের চর্চা করে থাকি সেই অর্থবিজ্ঞানের বাজারে ত' একখানাও বাংলা বই আছে বলে জানি না যা কোন রকমে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঠিক কথা। কিন্তু এর উত্তরে প্রশ্ন ওঠে—যে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এতদিন ধ'রে আমরা লেখাপড়া শিখে এসেছি সেই ভাষাতেই বা কখানা বই ভারতীয় অধ্যাপকরা লিখেছেন যা'র ওপর ভরসা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন পাঠন চলতে পারে? আমাদের দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির পাঠ্য বইয়ের তালিকা থেকেই এর উত্তর মিলবে। কি সমাজবিজ্ঞান কি পদার্থ-বিজ্ঞান কোন ক্ষেত্রেই আমাদের দেশের অধ্যাপকরা এমন কিছু বই লেখেন নি যা কোন রকমের উচ্চশিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট; পাঠ্য তালিকায় বেশীর ভাগই দেখা যায় বিদেশী লেখকের বইয়ের উল্লেখ। এটা পশ্চিমাশ্রয়ী মনোভাবের পরিচয় নয়,—বরং আমাদের অধ্যাপকরা নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন! তা'ছাড়া বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অধ্যাপকদের আনাগোনার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কে বলবে যে বিভিন্ন অঞ্চলে লেখাপড়া বা পরীক্ষার মানে ভয়াবহরকম তফাৎ নেই?

আসলে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে যে শিক্ষা আমাদের দেশে চলে আসছে তা কৃত্রিম শিক্ষা। সন্দেহ নেই যে এর মধ্য দিয়েও বহু লোক সত্যিকার জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন; দেশের অনেক প্রতিভাবান লোকের নাম করা যেতে পারে যাঁরা এই ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন এবং করছেন। এ'দের পক্ষে ভাষার বাধা দুর্লঙ্ঘ্য নয়; যে কোন ভাষাই এ'রা সহজে নিজের ক'রে নিতে পারেন। এ'দের কথা আলাদা। বরং বলতে হবে যে এইসব প্রতিভাবান লোকের বেলায় একটি আন্তর্জাতিক ভাষা, যার মাধ্যমে বাইরের জগতের সঙ্গে এ'দের পরিচয় হতে পারে, অপরিহার্য। সাধারণ শিক্ষার জন্য যে ভাষাই ব্যবহার করা হোক না কেন, উচ্চশিক্ষার একটা স্তর আছে, যেখানে পৌঁছতে হ'লে একটি আন্তর্জাতিক ভাষার আশ্রয় নিতেই হবে। যেখানে মাতৃভাষার পরিধি সঙ্কীর্ণ, সেখানে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য ইংরেজী ভাষা ব্যবহারে কোন আপত্তি

থাকতে পারে না।

কিন্তু তার সীমা কোথায়, এবং ব্যবহারের পদ্ধতিই বা কি?

এইখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি—এ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েই স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা করতে আসে যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেটা হ'ল একটা ভাল চাকুরী জোটানো অথবা কোন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে রোজগারের সুবিধা করা। শুধু জানবার আগ্রহ নিয়ে খুব কম লোকই পড়াশুনা করে থাকেন। বেশীর ভাগ লোকেরই উদ্দেশ্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উন্নতি করা। এটা অস্বাভাবিক নয়, অবাঞ্ছনীয়ও নয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাফল্যের মধ্য দিয়েই সমাজের সমষ্টিগত উন্নতির সম্ভাবনার উদ্ভব হয়। আবার এই ব্যক্তিগত সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে শিক্ষার বিস্তারের ওপর। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমাজের উন্নতি সাধন একথা বললে খুব ভুল হবে না।

আদর্শ শিক্ষাব্রতী হয়ত এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন। ব্যবহারিক সার্থকতা দিয়ে শিক্ষার মান নির্দেশ করা তাঁর মনঃপূত হবে না। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

শিক্ষার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য দু'রকম হতে পারে। প্রথমত, সাধারণভাবে শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণ শক্তি বাড়িয়ে দেওয়া। সামাজিক বা ব্যক্তিগত জীবনে নানা সমস্যা আমাদের সামনে এসে পড়ে। যুক্তির সাহায্যে সেসব সমস্যার বিচার ও বিশ্লেষণ শিক্ষাসাপেক্ষ। একজন অশিক্ষিত লোক সংস্কার বা প্রয়োজনের তাগিদে কাজ করে, কখনও বা করে উত্তেজনার বশে। শিক্ষিত লোকও যে এর অতীত তা নয়। মানুষের প্রবৃত্তি কখন কি রূপ নেয় বলা কঠিন। কার্যকারণ বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকলেই যে মানুষ সব সময় পরিণতির দিকে তাকিয়ে কাজ করবে এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু একথা বলা যায় যে শিক্ষার মূলে একটা সম্ভাবনা থাকে যে মানুষ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সমস্যার বিচার করবে যুক্তির সাহায্যে।

এই শিক্ষা সর্বসাধারণের জন্য। যে কোন কাজের ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর বিশ্লেষণ বা বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন। এবং প্রত্যেক নাগরিকেরই এ ধরনের শিক্ষায় অধিকার রয়েছে। কোন বিশেষ শাস্ত্র এখানে অবান্তর। সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান—যে কোন শাস্ত্রের মাধ্যমেই এই সাধারণ শিক্ষার প্রচার চলতে পারে।

আমাদের স্কুল কলেজের ছাত্ররা এই যে নানা বিষয় অধ্যয়ন করছে, পরীক্ষা দিচ্ছে, ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা পাচ্ছে,—এদের ক'জন মনে রাখছে কোন সূত্রের উৎস কোথায় এবং তার পরিণতি কি? তথ্যই যদি শিক্ষার সার হ'ত তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষা নিরর্থক হ'য়ে যেতো। কারণ বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীই স্কুল কলেজের গণ্ডী পেরোবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য বইয়ের তথ্যগুলি ভুলে যায়। তাই ব'লে পড়াশুনা নিরর্থক হয় না। এইসব তথ্যের আলোচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মনে বিচার বুদ্ধির সঞ্চার হয়, পড়াশুনার সেখানেই সার্থকতা।

এই ত' গেল সাধারণ শিক্ষার দিক, যেখানে বিচার বুদ্ধির বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য,—তা' সে যে শাস্ত্রের মাধ্যমেই হোক্ না কেন। এ ছাড়া আর একটি দিক আছে যেখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশেষজ্ঞ তৈরী করা। এ শিক্ষা শাস্ত্রনিরপেক্ষ নয়, বরং এখানে তথ্যের প্রভাবই বেশী। এ শিক্ষার সীমা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য বিশেষ কোন শাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া এবং পরবর্তী জীবনেও সেই শাস্ত্রের অনুশীলন করা বা ব্যবহারিক জগতে তার প্রয়োগের সম্ভাবনা নির্দেশ করা। নানাভাবেই এইসব বিশেষজ্ঞরা তাঁদের জ্ঞান সমাজের কাজে লাগাতে পারেন—কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়র, কেউ আবার

সমাজবৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা সাহিত্যিক।

উচ্চশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বিশেষজ্ঞ তৈরী করা। কিন্তু এই বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও প্রতি দেশেই বেশ কিছু সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েন যেখানে তাঁদের বিশেষ বিদ্যার ব্যবহার সংকুচিত। আমি একসময় একজন আই. সি. এস্. কর্মচারীকে জানতাম যিনি ডাক্তারী ডিগ্রী নেবার পর আই. সি. এস্ পরীক্ষা পাশ করেন। আবার সেদিনও একটি যুবকের সঙ্গে পরিচয় হল যিনি ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রীধারী, বর্তমানে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করছেন। তেমনি সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো দেখা যায়, পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীধারী বিশেষজ্ঞ সরকারী দপ্তরে কাজ করছেন, যেখানে তাঁর নিজের বিশেষ জ্ঞানের ব্যবহারিকতা নেই বললেই চলে। এইসব তথাকথিত বিশেষজ্ঞরাও আস্তে-আস্তে এমন স্তরে এসে যান যেখানে তাঁদের বিশেষ বিজ্ঞান চর্চার যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেটুকু হচ্ছে বিশ্লেষণ শক্তি।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার বিস্তারের ফলে,—তা' সে শিক্ষা সাধারণ শ্রেণীরই হোক্ বা বিশেষ শ্রেণীরই হোক্—সমাজের উন্নতির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন শিক্ষার সার্থকতা সমাজের কল্যাণে।

এখন এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। যাঁরা ইংরেজীর মাধ্যমে লেখাপড়া শিখে এসেছেন সেই ইংরেজ আমল থেকে, তাঁদের ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে একটা দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। কায়েমি স্বার্থের প্রভাব আমাদের চিন্তা-ধারার ওপর থেকে যায় একথা অস্বীকার করা যায় না—আমি এই প্রবন্ধে যে কথা বলতে যাচ্ছি সে কথাই যে এর প্রভাবমুক্ত তাই বা জোর করে বলি কি করে? তাছাড়া চল্‌তি ব্যবস্থা মেনে নেওয়াই মানুষের স্বভাব। শিক্ষার ব্যাপারে এই জড়তা একটু বেশী রকম প্রকট; কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন্ বিশেষ ব্যবস্থার কি ফল তা' সঠিক নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অনেকে তাই যুক্তিপ্রয়োগ করেন, বেশ ত আমাদের ছেলেমেয়েরা এই ইংরেজীর মাধ্যমেই লেখাপড়া শিখে বাইরে গিয়েও সুনাম কিনে আনছে, আন্তর্জাতীয় বৈজ্ঞানিক আসরে আসন পাচ্ছে। আঞ্চলিক ভাষা প্রবর্তন করে শিক্ষার পরিধি সংকীর্ণ করলে কি এসব সম্ভব হত? এ রকম ভাবনা অনেক শিক্ষাব্রতীরই মনে আসা স্বাভাবিক।

এই প্রসঙ্গেই শিক্ষার শ্রেণী বিভাগের তাৎপর্য। বিশেষজ্ঞদের জন্য যে কোন একটি আন্তর্জাতিক ভাষার অবলম্বন অপরিহার্য। বেশী হ'লেও ভাল। বস্তুত বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষজ্ঞ হ'তে চান তাঁরা অনেকেই একের বেশী বিদেশী ভাষা শিখে থাকেন। যুদ্ধের আগে যখন জার্মানীতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের একটা প্রচণ্ড সাড়া পড়ে গিয়েছিল তখন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে জার্মান ভাষা ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। তখনকার দিনে আমাদের দেশের অনেক বৈজ্ঞানিক জার্মান ভাষা অবশ্যপাঠ্য ব'লে মনে করতেন। এখন আবার দেখছি রুশ ভাষার দিকে ঝোঁক। তবে ইংরেজী ভাষার নানাদিক থেকে এতটা প্রসার হয়ে গেছে যে এখন ঐ একটি ভাষার মাধ্যমেই যে কোন শাস্ত্রের সূক্ষ্মতম অনুশীলন সম্ভব ব'লে মনে হয়। তাছাড়া ইংরেজী ভাষার সঙ্গে ঐতিহাসিক কারণে আমরা এত জড়িত যে যদি শিক্ষার বিশেষ অবস্থানে আমাদের কোন আন্তর্জাতিক ভাষার আশ্রয় নিতে হয় ত' সে ইংরেজী ভাষা।

কিন্তু ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত ক'রে কোন শাস্ত্রের অনুশীলন করা এক কথা, আর ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া বা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা আর এক কথা।

যে কোন দেশের বিশেষজ্ঞরা নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়া একটি দু'টি আন্তর্জাতিক ভাষা আয়ত্ত করে থাকেন; তা' নইলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক দেশবাসীর সঙ্গে অন্য দেশবাসীর আদানপ্রদানের সম্ভাবনা থাকে না, শিক্ষার পরিধি বিস্তারের সম্ভাবনা কমে যায়। তাই বলে কোথাও লেখাপড়া শেখানো হয় না কোন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে।

এই ত গেল বিশেষজ্ঞদের কথা। এক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাবে না। বরং একথা বলতে হবে যে নানা শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞদের জন্য যে পরিমাণ ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন তার ব্যবস্থা রাখা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি দায়িত্ব।

কিন্তু শিক্ষার সাধারণ স্তরে—যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রী অবধি—ইংরেজীর এ দাবী একেবারেই খাটে না। সেখানেও শিক্ষক নিজে বিশেষজ্ঞ শ্রেণীভুক্ত। তিনি ছাত্রদের পড়াবার জন্য নিজে ইংরেজী বইয়ের সাহায্য নেবেন সন্দেহ নেই; কিন্তু বোঝাবেন মাতৃভাষার সাহায্যে।

এই দুয়ের মিলন ঘটানো আমি একেবারেই অসম্ভব বলে মনে করি না। যদি কেউ বলেন যে আমাদের আঞ্চলিক ভাষাগুলি এত দুর্বল যে তাদের মাধ্যমে বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তথ্য পরিষ্কার করে বোঝানো যায় না তবে আমি বলব তিনি নিজের ভাষাও জানেন না, নিজের শাস্ত্রও ভাল করে বোঝেন নি।

এক্ষেত্রে অবশ্য একটা কথা বলা দরকার। সব শাস্ত্রেই কতকগুলি শব্দ আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেয়ে এসেছে। সে সব শব্দ বিদেশী বলেই বাতিল করতে হবে এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কি দরকার quantum কথাটির আঞ্চলিক প্রতিশব্দ খুঁজে বেড়ানোর, যদি কথাটির মানে কি এবং পদার্থবিজ্ঞানে 'কোয়ান্টামবাদ'-এর ব্যবহার কি তা' শিক্ষক তাঁর নিজের ভাষায় পরিষ্কার ক'রে ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে পারেন? প্রতিশব্দ যদি সহজবোধ্য হয় তবে অবশ্য তার প্রচলন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সে রকম প্রতিশব্দের আবিষ্কার শিক্ষকের ওপরই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনের তাগিদে কথার সৃষ্টি হবে। তার মধ্যে যদি কিছু বিদেশী শব্দের আভাস থেকে যায় ত' ক্ষতি কি? আমি ত' বাংলাতে 'প্ল্যান' কথাটি বজায় রাখার পক্ষপাতী,—এমনকি planning-এর বদলে 'প্ল্যানীকরণ' কথাটি চালু করতেও দ্বিধা করব না। এর একটা সুবিধা এই যে শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রয়োজনবোধে আঞ্চলিক ভাষা থেকে ইংরেজী ভাষায় (অথবা অন্য কোন আন্তর্জাতিক ভাষায়) চ'লে যাবার পথ খানিকটা সহজ হবে।

সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই: শিশুকাল থেকে ছেলেমেয়েরা যে ভাষায় কথা ব'লে থাকে সেই মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম; সুতরাং বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষায় পড়ানো হবে। স্কুল-কলেজে ইংরেজী ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা থাকবে। যে সব শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতে বিশেষজ্ঞ হবার আকাঙ্ক্ষা থাকবে তাঁরা ইংরেজী ভাষা শিখবেন—সেজন্য শেক্স্পিয়র, মিলটন পড়ার প্রয়োজন হবে না, যদি না কেউ ইংরেজী ভাষাতেই বিশেষজ্ঞ হতে চান। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শেষ ধাপ অবধি অধ্যাপনা অথবা পরীক্ষার মাধ্যম হবে আঞ্চলিক ভাষা। কিন্তু পাঠ্যতালিকায় প্রয়োজনীয় ইংরেজী বইয়ের উল্লেখ থাকবে। বিশেষজ্ঞরা যে সবাই তাঁদের পরবর্তী জীবনে শুধু আপন আপন শাস্ত্রের অনুশীলন করবেন এমন নয়; কোন দেশেই সে ব্যবস্থা সম্ভবপর নয়। এ'দের মধ্যে অনেকেই হয়ত সরকারী নানারকম কাজে নিজেদের শিক্ষার ব্যবহার করতে চাইবেন। সরকারেরও এ ধরনের লোকের প্রয়োজন হবে, কারণ এ'দের দিয়েই বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে—অথবা বাইরের সঙ্গে দেশের—আদান-প্রদানের ব্যবস্থা

করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে এই দ্বিতীয় সুবিধাটি ফাল্‌তু পাওনা। শিক্ষার দিক থেকে দেখতে গেলে বিশেষজ্ঞদের জন্যই ইংরেজী ভাষা চালু রাখা; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার বাড়তি লাভ এই যে ইংরেজীর সাহায্যে সরকারী এমন সব কাজকর্ম সম্ভব হবে যা আঞ্চলিক ভাষায় সম্ভব হ'ত না,—হিন্দীতেও না।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন ওঠে: কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা-গুলিতে কি ভাষা ব্যবহার করা হবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যদি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয়, অথচ সরকারী চাকুরিতে ইংরেজীর প্রয়োজন থেকে যায়, তবে সরকারী চাকুরীর জন্য বাছাই হবে কি পদ্ধতিতে এবং কোন ভাষার মাধ্যমে?

সাম্প্রতিক আলোচনায় প্রশ্নটির ওপর যে রকম জোর দেওয়া হচ্ছে তাতে মনে হয় ভাষা ব্যাপারে এইটিই প্রধান সমস্যা। যত গোলমাল যেন এই মুষ্টিমেয় চাকুরীজীবীদের নিয়ে! সে যাই হো'ক্, আমি মনে করি যে যতটা জটিল করে দেখা হয় প্রশ্নটি ততটা জটিল নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলি যে পদ্ধতিতে এতকাল ধরে চলে আসছে সে পদ্ধতি অপরিবর্তনীয় নয়। বস্তুতঃ কেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ পরীক্ষার পরেও সেই একই বিষয়গুলি নিয়ে একই পদ্ধতিতে সরকারী চাকুরীর জন্য আবার একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা হয় তা বোঝা কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলের ওপর যদি সরকারের আস্থা না থাকে তবে সেখানে কি গলদ রয়েছে সেই দিকেই নজর দেওয়া সমীচীন নয় কি? সরকারী পরীক্ষাগুলিতেও যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এবং ফলাফল নির্ণয়ের ভার ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয় তবে এই বিশেষ পরীক্ষার মূল্য কি?

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বা পরীক্ষার পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়কেই শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করছে তখন সরকারী চাকুরীর বেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্রের আশ্রয় নিতে বাধা কি?

একথা ঠিক যে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে যোগ্যতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের উপর সব সময় নির্ভর করে না। তা'ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের, এমন কি একই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে, পরীক্ষার মান এক নয়। সুতরাং সরকারের তরফ থেকে বিশেষ একটি পরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সে পরীক্ষার উদ্দেশ্য হবে শুধু প্রতিযোগীর ব্যক্তিত্ব, সাধারণ জ্ঞান বা ঐ ধরনের গুণ যাচাই করা। ভাষার স্থান এখানে গৌণ; কারণ ভাষা এখানে শুধু কাজ চালাবার সহায়।

ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বিভিন্ন শাস্ত্রে যাঁদের পারদর্শিতার প্রমাণ র'য়েছে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষামূলক প্রশংসাপত্রে এমন বিশেষজ্ঞরাই এই সরকারী পরীক্ষা দেবেন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মনোনীত ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে একটা চরম বাছাইয়ের জন্য সরকারী যে পরীক্ষার প্রয়োজন সেটা শুধু মৌখিক পরীক্ষা হলেও চলতে পারে, যদিও সে পরীক্ষা ইংরেজীতেই চালাতে হবে। এতে যে ফলাফলের কোন তারতম্য হবে তা আমি মনে করি না। অপরপক্ষে সমাজ কতকগুলি অর্থহীন খরচের হাত থেকে রেহাই পাবে।

এই ত গেল শিক্ষার বাহন ভাষার কথা। এখন প্রশ্ন থেকে যায় রাষ্ট্রভাষা কি হবে? কি ভাষার উপর দাঁড়িয়ে আমরা জগতের কাছে বলব আমরা ভারতবাসী? শিক্ষাব্রতী তা শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে রায় দিলেন আঞ্চলিক ভাষার পক্ষে। কিন্তু জাতীয়তাবোধের ভিত্তি

হিসাবে যে একটি রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজন আছে সে সম্বন্ধে কি নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি? এটি রাজনৈতিক প্রশ্ন, এবং সাম্প্রতিক ভাষা আন্দোলনে এই প্রশ্নটিই বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে।

ব্যবহারিক রাজনীতির জঙ্গল আমি সাধারণত এড়িয়ে চলি। ওর মধ্যে ঢুকলে যুক্তির নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কঠিন হ'য়ে পড়ে; আবেগের প্রভাবই ওখানে প্রবলতর। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে এই যে হিন্দী নিয়ে মাতামাতি চলছে এর পেছনে যুক্তি কোথায়? দেশের চৌদ্দটি রাষ্ট্রসম্মত ভাষার মধ্যে হিন্দী একটি আঞ্চলিক ভাষা। অপেক্ষাকৃত বেশীসংখ্যক লোক হিন্দী ভাষাভাষী বলে এই একটি ভাষাকে সাধারণ রাষ্ট্রভাষা ব'লে স্বীকার করতে হবে এবং দেশাত্মবোধের দোহাই দিয়ে একে অন্য ভাষাভাষীদের উপরেও চাপিয়ে দেওয়া হবে এর কি মানে আছে বোঝা কঠিন।

আমি মনে করে ভাষার সার্থকতা প্রধানতঃ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে। সেক্ষেত্রে যদি আঞ্চলিক ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করা হয়, তবে তার মধ্যে একটি ভাষাকে সমগ্র দেশের সাধারণ শিক্ষার অংশ হিসাবে গ্রহণ করার কোন তাৎপর্য নেই। অহিন্দীভাষী যদি এই হিন্দী আন্দোলনের পেছনে কোন বিশেষ মতলব সন্দেহ করেন ত সেটা অস্বাভাবিক নয়।

এই প্রসঙ্গে তিন-ভাষার যে একটি সূত্র বাজারে চালু করার চেষ্টা চলছে—মাতৃভাষা-হিন্দী-ইংরেজী, অথবা (হিন্দী ভাষীদের জন্য) হিন্দী-ইংরেজী আর একটি আঞ্চলিক ভাষা —সেটি আরও অযৌক্তিক। না হয় মেনে নেওয়া গেল অহিন্দীভাষীরা হিন্দী শিখবে সমগ্র দেশে ভারতীয় একটি ভাষার প্রচলনের খাতিরে। কিন্তু তাই ব'লে হিন্দীভাষীরা কেন অন্য একটি আঞ্চলিক ভাষা শিখবে? এ যেন শিশুদের কলহ—বোঝার ভাগ সমান হওয়া চাই!

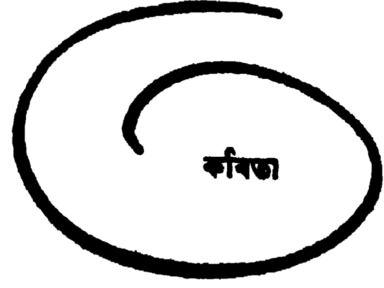
ভাষা গোষ্ঠিবোধকে সাহায্য করে সন্দেহ নেই। মানুষ আপন পরিবারের বাইরে কাউকে নিজের ব'লে গ্রহণ করে তখনই যখন তার সঙ্গে ভাব বিনিময় সম্ভব হয়, এবং ভাষার মারফতই এই ভাব বিনিময় হ'য়ে থাকে। কিন্তু যে ভাষার ভিত্তিতে এই গোষ্ঠিবোধের সঞ্চার হয় সে ভাষা মাতৃভাষা। ভারতবর্ষের নাগরিকদের মধ্যে এই সার্বজনীন ভাষার বন্ধন নেই একথা মেনে নেওয়াতেই মঙ্গল। রাষ্ট্রের বিধানে একটি আঞ্চলিক ভাষাকে সমস্ত দেশের ভাষা বলে চালাবার চেষ্টায় যে বিপরীত ফলের সৃষ্টি হতে পারে তার পরিচয় আমরা একাধিকবার পেয়েছি স্বদেশে ও বিদেশে। ও চেষ্টা না করাই ভাল।

আমি বলব আমাদের দেশের সব আঞ্চলিক ভাষাই রাষ্ট্রভাষা; বহু ভাষাভাষীর দেশে এ ব্যবস্থা বিচিত্র নয়। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ চালাবার জন্য অথবা এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের সরকারী সম্পর্কে চালু রাখার জন্য একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজন। সে প্রয়োজন মেটাবে ইংরেজী ভাষা,—যে ভাষা শিক্ষার উন্নত স্তরে বিশেষজ্ঞরা এমনিতেই শিখবেন।

ভারতবর্ষ নিছক একটি রাজনৈতিক সত্তা একথা ভুললে চলবে না। ভাষা, ধর্ম অথবা সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে এখানে একত্ববোধ আনার চেষ্টা বৃথা। আর সে চেষ্টার প্রয়োজনই বা কি? ঐতিহাসিক কারণে বর্তমান ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল একটি রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে অবস্থান করছে এবং আমরা সেই ভূখণ্ডের অধিবাসী—এই কি যথেষ্ট নয়? এই মনোভাব থেকেই জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হ'তে পারে। কিন্তু এই জাতীয়তাবোধ সক্রিয় হবে তখনই যখন জনগণ বুঝবে রাষ্ট্রের বিধান তাদের অগ্রগতির অনুকূল।

ভাষার বৈষম্য সত্ত্বেও জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ কায়েমী রাখা রাষ্ট্রের পক্ষে একটা অসম্ভব কাজ নয়। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের প্রচার যন্ত্রের কথা সহজেই মনে আসে। সঙ্কটকালে

প্রচার যন্ত্র কতটা কার্যকরী হ'তে পারে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি চীন-ভারত কলহের সময়। কিন্তু এই মনোভাবকে যদি কায়েমী করতে হয় তবে জনগণের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় করতে হবে যে রাষ্ট্রের যা কিছু বিধান তার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণের মঙ্গল। দেশাত্মবোধের ভিত্তি হ'তে হবে তাই অর্থনৈতিক প্রগতি ও সাম্য। আমি মনে করি ভাষার বৈষম্য স্বীকার ক'রে নিয়ে আমাদের রাষ্ট্রনেতারা যদি এই অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যের দিকে একাগ্রভাবে দৃষ্টি দেন তাহলে আপনা থেকেই দেশের অনেক সমস্যার সমাধানের পথ সহজ হবে।



ভেলা

অশোক মিত্রের জন্য

নরেশ গুহ

পৃথিবী জ্বলে যায়, এখনো জলে ভেলা
ভাসেনি, তোলা আছে। কোথায় আছো তুমি?
পাহাড় যুগলেরা আজ কি সমভূমি?
শূন্য মন্দির শুধেছে অবহেলা?

হয়তো অজগর গেলেনি হরিণীকে।
উপত্যকা থেকে কোথাও বারবার
এখনো প্রতিবাদী বাঘেরা হুঙ্কার
শোনায়, দাবানল যদিও দিকে দিকে।

কখন সে পাবক ঢুকেছে সব ঘরে,
চিনেছে নগরের জটিল পথঘাট,
হয়েছে শবাসীন, শ্মশানে সম্রাট।
কোথাও কিছু তার থাকেনি অগোচরে।

আমারও গেছে সব, নিয়েছে দাবানল।
যে-ভেলা ভাসলো না, এখন তাতে আর
কী হবে ফিরে পেয়ে অলীক অধিকার?
কেবলই দূরে যায় নদীর কোলাহল।

অসম্ভব

অরুণকুমার সরকার

ভালোবাসা এখনো সম্ভব হয়তো নিম্ন-তফসিলবর্ণিত বস্তুগুলি
নিজের টবের ফুল, খাঁচার শালিক ময়না, পালিত কুকুর,
সমুদ্রে সূর্যাস্ত, হ্রদে চন্দ্রোদয়, জানলায় বৃষ্টির টোকা
ইত্যাদি ও ইত্যাকার।
সবথেকে কঠিন আজ মানুষের প্রতি প্রেম রাখা,
মনুষ্যসৃষ্টিকে কিছু অনাবিল ভাবে ভালো লাগা।
ভয় নয়, ভক্তি নয়, দয়া কিম্বা অনুকম্পা নয়,
আপোস রফায় শুধু সহ্য করা নয়
পরস্পরের চোখে চোখ রেখে প্রাণ খুলে হাসা কিম্বা কাঁদা
সবথেকে কঠিন যদি কবিতাও নয় দৈববাণী।

কোলের শিশুও আজ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে রয়েছে।

ঘর বাড়ি ইমারত

নিখিলকুমার নন্দী

: এই দ্যাখো মাঠে মাঠে বিকেলের সূর্যরং ইঁট পড়ে আছে
চিত্রার্পিত চুন লোহা সিমেন্টের অনুষঙ্গরূপে
অনেক বাড়ির সাধ জেগেছে যে তার মধ্যে আমি বেছে বেছে
এই এক সবদিক-খোলা জায়গা রেখেছি বিরল স্তূপে স্তূপে
সাজাবো অনেক স্বপ্ন আবাল্য দেখেছি সব গিয়েছে সভয়ে
এই এক মধ্যজীবনের শেষ আশা দেখি যদি কথা রাখে
যদি পড়ে কোনক্রমে দুহাতের আঙুলের দুই ফোঁটা বেয়ে
মহাত্মা ঈশ্বর তিনি সকরুণ, অকৃপণ, কৃপা তাঁর ধরি এক ফাঁকে।
আমরা তো দুটি প্রাণী দুই পুত্রকন্যা আর আমরা দুজনে
এ-অব্দি যা জমিয়েছি মাসে মাসে শ-পাঁচেক মাত্র উপার্জনে
ফুল কিনে না কিনে ও বই পড়ে না পড়ে ও এমনকি খেয়ে ও না খেয়ে
এম্নি স্বপ্নের সুতো ভাড়াকরা ছাদে ছিল ঘরবাড়ি ইমারতে লাল ঘুড়ি ছেয়ে
ছাড়া ছিল এতকাল, এবার গুটাবো ধীরে সুস্থে বস্তু, জেনো যারা বাঁচে
এম্নি যেন বাঁচে এই কলকাতায় কলকাতার কাছে।

: সত্যিই সক্ষম তুমি সাফল্যনিরিখে কিন্তু আমি
কৈশোরের কলকাতায় সকালের ভিস্তিদের কলতানে নরম জলের
ঘুমচোখে শব্দ শুনে শব্দ শুনে রাত্রির তন্দ্রায়
রিক্সার ঠুনঠুন আর ট্রামের ঝিমন্ত ঝিকঝিক
বড়ো হয়ে বড়ো হয়ে দেখলাম ছোটো হয়ে গেছি
আকাশ ধোঁয়ায় নিচু বাতাস ধুলোয় ভারী ভীরু
রোদের করুণা নেই স্বয়ং সে করুণাভিক্ষুক
বিজুরিত গবাক্ষের রোগেশোকে মূর্ছা বুভুক্ষায়
শিয়ালদায় যেতে যেতে কলকাতাকে একদা-প্রোজ্জ্বল
তরুণ বাড়ির পটে জীর্ণ পীত তরুর মতন
উৎকীর্ণ দেখেছি জরা, জন্তু যেন, অগণ্য জনগণে
হিংস্র তাকে কিলে চড়ে হাতে পায়ে কনুইধাক্কায়
মৃত্যুর দুয়ারে আহা নিমতলায় পৌঁছে দিয়ে বিকেলবেলায়
শ্মশানযাত্রীর স্নান তারপর মুমুক্ষু আবেশে
চা খায় উদাস চোখে, চিন্তিত ও চিন্তাহীন, বেকার অথচ নির্বিকার।
তদবধি আর আমি কলকাতায় কলকাতার কাছে বা কোথাও
কোন জায়গা বাঁচবার বেঁচে থাকবার মতো পাই নি, খুঁজি নি
কলকাতা কলকাতা আজ পুরানো পাঁজির মতো সেরদরে বিকোচ্ছে বাজারে।

: এ তো হল দর্শনপ্রস্থান যেন আপনার আস্ত পরাভব
রেখে ঢেকে তুলে ধরো জয়ী যে সে তার অগৌরব।
কয়েকটি যে শুভ্র ফুল, স্নিগ্ধগন্ধী, এখনো ঝিমায়
তারা যাবে মারা যাবে চেপ্টে যাবে কংক্রীটে লোহাতে
কিন্তু কী উপায় বলো, দুঃখ পাই দুঃখজয় যাতে।

: সুন্দর বলেছ সত্যি, কিন্তু ফুল! সে তো অতি সামান্য সজীব
তারও চেয়ে ঢের বড়ো কত সুখ কত জ্যান্ত প্রাণবন্ত শিশুর ইচ্ছায়
কৈশোর কল্পনারাজ্যে যৌবনের অভিষেকে কত ক্রূর দূর বনবাস
দাহ দিয়ে, দিতে দিতে, এ সাম্রাজ্য-ইমারতে প্রৌঢ়ির সফলে
সুতরাং শিশু গেছে, যৌবনের রক্তরাগ, ফুল গেছে, ফুলগাছও যাবে,
ঘরবাড়িইমারত তবু হচ্ছে, হবে-হবে-তুমি হবে, আমি কিন্তু, হয়েও হবো না
পরাভূত? হতে পারি, তবু জেনো অভিভূত মুহ্যমান নই;
দেখে যাবো রেখে যাবো চুরুটের এ-চক্রে নয়, তর্কে নয়, দিগন্তেই, সূর্যাস্ত মথিত।

বৃত্তের বাইরে

রনি লিটেনবর্গ-কে

রণধীর মিত্র

দরজা খুললেই অসংখ্য মুখের এক গুচ্ছ
একই বৃত্তে ঘনিষ্ঠ কত ঠোঁট
অথচ অস্তিত্বহীন নাটকের দর্শকের মতো

বৃত্তের বাইরে প্রত্যেকেই চিন্তায় বাঁচে
পূর্বপুরুষ আর বংশধরের চিন্তা
অন্যের হ'য়ে নিজেকে দেখার চিন্তা
দুর্ভিক্ষ আর বিপ্লবের চিন্তা
আর একটা স্মৃতির কাছে
নিজেকে সমর্পণ করার চিন্তা

দরজা খুললেই আমাদের অপরূপ ছায়া
পরস্পরের কাছে তখন আমরা চমৎকার
বৃত্তের বাইরে শুধু সময়ের প্রতিশ্রুতি
সেখানে আমরা ভালোবাসি না।

আলেখ্য

মোহম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌

বিপন্ন বিস্ময়ে তাকে দেখলাম, রয়েছে দাঁড়িয়ে
বিদ্ধ হয়ে নাগরিক মানুষের দৃষ্টির সংগীণে
যে এসেছে শূন্য হাতে ভাসিয়ে নিজের কুঁড়েঘর
কোন্ অজ পাড়া গাঁ'র, স্মৃতি শুধু দূর-দূরান্তর
পাখির ডানার শব্দ—ম্রিয়মাণ, এমন দুর্দিনে
দেখি তাকে দিশাহারা জায়া, কন্যা, পুত্রকে হারিয়ে!
করমালি, কাসেমালি—কি নামে যে তাকে ডাকা যায়
জানেনা সে-কথা কেউ, জানে শুধু সে অনন্যোপায়।

বন্যায় ভেসেছে ঘর, ভেঙেছে প্রাণের রুদ্ধদ্বার
অশ্রু শুধু শেষ খড়কুটো—যেন শেষের সম্বল,
আত্মীয়-বান্ধবহীন নাগরিক নতুন সংসার
পেতেছে সে, চৌরাস্তায় আলো আর উল্লাস উজ্জ্বল।

প্রাণের দোসর খুঁজে এ-নগরে পাবে না পাবে না
তবুও শূন্যতা নিয়ে ফিরে সে-ত যাবে না যাবে না॥

সম্ভ্রান্ত

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র

লাবণ্য বোস	অজিত সেন
সেলিম খাঁ	প্রণব মৈত্র
সঞ্জয় মুখার্জি	মিস্টার তরফদার
বিপ্রদাস রায়	মলিনা তরফদার
শম্ভু হাজরা	শান্তনু তরফদার
লায়লা	অফিসের কয়েকজন কর্মচারী

জন্মদিনের পার্টিতে অভ্যাগত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কোনো একটি আধুনিক উঠ্‌তি ব্যবসায়ী দপ্তর। মঞ্চের দুটি ভাগের কিছুটা বড় দিকটিতে কোনো উচ্চপদস্থ অফিসারের ঘর। ছোট অংশটি রিসেপ্‌শান রুম। খট্‌খট্‌ টাইপ-রাইটারের শব্দের সঙ্গে পর্দা ওঠে। ঘড়িতে ঢং ঢং করে ন'টা বাজল। রিসেপ্‌শান্‌ রুমে মাঝবয়সী চাপরাশী সেলিম টুলে বসে কান খুঁটছে। চীফের ঘরের ভেতরের পর্দা সরিয়ে ফাইল ইত্যাদি হাতে ঢুকল লাবণ্য, সাজসজ্জা দুরস্ত। চেহারায় এখনও লাবণ্য থাকলেও মুখের ভাবে নেই। বয়েস তিরিশ থেকে প'য়ত্রিশের মধ্যে। টেবিলে কাগজপত্র রেখে মুখের শেষ হওয়া সিগারেট এ্যাশ্‌ট্রেতে টিপে নেভায়। ফোন বাজে। লাবণ্য তুলে নেয়। দু'একজন কর্মচারীর ব্যস্ত যাওয়াআসা লক্ষ্যে পড়ে।

লাবণ্য। হ্যালো! মিস্টার মুখার্জী এখনও আসেননি। May I help? Any message? উনি একটা বিশেষ কাজে গেছেন। [নোট নেয়] আচ্ছা ঠিক আছে। নমস্কার।

[রিসিভার নামিয়ে নতুন সিগারেট ঠোঁটে দিয়ে দেশলাই খোঁজে। না পেয়ে বেল টেপে। সেলিম উঠে আসে। পর্দা সরিয়ে মাঝের দরজা দিয়ে চীফের ঘরে ঢোকে।]

লাবণ্য। দেশলাই?

সেলিম। এই যে। [দেয়]

লাবণ্য। [ধরিয়ে] ক'জন?

সেলিম। চার জনা।

লাবণ্য। ওঃ, এখনও চারজন?

সেলিম। আজই তো শেষ। আরও দু'একজন আসতে পারেন। যদি ভরসা দেন তো একটা আর্জি পেশ করি।

লাবণ্য। মাইনে বাড়াবার কথা বলতে হবে তো? আচ্ছা বলব'খন মুখার্জী সায়েবকে। [কাজ করতে করতে]

সেলিম। [সলজ্জ] কাল রাত্তিরে আমার বিবির একটা ইয়ে মানে সন্তান হয়েছে।

লাবণ্য। বাঃ, কটি হল?

সেলিম। পাঁচটি।

লাবণ্য। বোঝাই যাচ্ছে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর লোকেদের হাতে পড়নি এখনও। পাঁচটিকে খাওয়াতে পরাতে পারছ?

সেলিম। না, তা আর পারছি কই?

লাবণ্য। তবে?

সেলিম। [অবাক] আল্লা দিচ্ছেন—

লাবণ্য। কিন্তু খাওয়াচ্ছেন না। এক ঘর বাচ্চাকাচ্চা খুব ভালবাস—না?

সেলিম। সে আর বলতে! ঘরদোর যেন সব আলো করে রাখে ওরা। যাদের ঘরে শিশু নেই তাদের ঘর তো শ্মশান। তারা তো—

লাবণ্য। [হঠাৎ রূঢ় গলায়] Stop it Salim!

সেলিম। [ঘাব্‌ড়ে] অপরাধ নেবেন না মা!

লাবণ্য। আঃ!

সেলিম। [ভীষণ ঘাব্‌ড়ে] অপরাধ নেবেন না মিস্‌ বোস!

লাবণ্য। আচ্ছা সেলিম, তুমি বাইরে গিয়ে বস। মুখার্জী সায়েব ছাড়া আর সবাই এসে গেছেন তো? সায়েব ক'দিন ধরে ভয়ানক ক্ষেপে আছেন। আজ একজন বড় ক্লায়েন্ট আসবেন জানো আশা করি।

সেলিম। আজ্ঞে হ্যাঁ!

[সেলিম রিসপ্‌শনে গেল। অজিত ফাইল হাতে ভেতর দিক থেকে এল। রিসেপ্‌শনে লোক আসছে যাচ্ছে। অজিত স্মার্ট। বয়েস অল্প—২৬।২৭ বৎসর]

অজিত। মিস বোস, এই অনুবাদের কাজগুলো—

লাবণ্য। [কাজ করতে করতে] আমার টেবিলে রেখে দিন। আমার এখন মরবার সময় নেই। তার ওপর এই ইন্টারভিউয়ের ঝামেলা। আঃ! বিয়েট্রিস্‌ বিলেতে যাবার আর সময় পেল না। ওর জায়গায় একজন ফ্রক-পরা ফিরিঙ্গি মেয়ে নিলেই ল্যাঠা চুকে যেত, তা না, শাড়ি-পরা মেয়ে চাই। স্বাধীনতা হয়ে আর যাই না হোক, এসব সাজসজ্জার ভড়ং খুব বেড়েছে।

অজিত। তাতে আর যাই না হোক কিছু দিশি মেয়ে চাকরী পাচ্ছে তো?

লাবণ্য। ছাই পাচ্ছে। এই তো তিনদিন ধরে ইন্টারভিউ চলল—ঐ পোস্টটাই একমাত্র open—একজনেরও হবে ভেবেছেন? কোনো আশা নেই। পছন্দই হয় না।

অজিত। [হেসে] আপনাদের বন্ধু বিয়েট্রিসের কথা হয়তো এ'রা ভুলতে পারছেন না। এ একেবারে আন্তর্জাতিক দোস্তি! আমরা আসলে international in form and content.

লাবণ্য। [হেসে] আপনি আসলে বলতে চাইছেন আমরা হলাম ইংলিশ মিডিয়ামে শিক্ষিতা শাড়ি-পরা cosmopolitans, এক কথায় টে'সো—না?

অজিত। Exactly!

লাবণ্য। Very Smart! [লাবণ্য কাগজপত্র গুছিয়ে নেয়]

অজিত। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

লাবণ্য। করুন।

অজিত। শুনেছি যে পাঁচটা পোস্টের জন্যে ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে এক ঐ রিসেপশনিস্টের পোস্টটা ছাড়া নাকি আগের থেকে সব ঠিক হয়ে গেছে? আমি ঠিক এই এলাহি ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারটা বুঝছি না।

লাবণ্য। বুঝবেন না—নতুন তো! আমাদের ভেতরের ক্যান্ডিডেট্দের priority দিতেই হবে। ইন্টারভিউ নেওয়াটা একটা দপ্তরী কায়দাও বটে, আবার বিজ্ঞাপনও বটে। তাছাড়া, রিসেপশনিস্ট পোস্টে শেষ পর্যন্ত আমাদের সেনগুপ্তর শালিকেই নেওয়া হবে।

অজিত। তবে কেন বললেন পছন্দসই মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না?

লাবণ্য। [হেসে] ওসব বলতে হয় নয়তো নিজেদেরই বড় খারাপ লাগে।

অজিত। কিন্তু এসব ভড়ংয়ের কোনো মানে হয়?

লাবণ্য। ভড়ং নয়, make-belief!

অজিত। একজনও নেবেন না?

লাবণ্য। হয়তো শেষ পর্যন্ত একজনকে নেওয়া হবে এদের মধ্যে থেকে। তবে সে একেবারেই অন্য একটা কাজের জন্যে। যাই, আমি ইন্টারভিউয়ের প্রথম ধাপটা সেরে রাখি।

[নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে কাগজপত্র নিয়ে লাবণ্য বেরিয়ে গেল পর্দা সরিয়ে ভেতর দিকের দরজা দিয়ে। অজিতকে একা দেখে সেলিম ঢুকল। অজিত কাজ করছে।]

সেলিম। এই যে স্যার! শুনছেন—সেন সায়েব! ব্যাপারগতিক ভাল দেখছিনে।

অজিত। কেন?

সেলিম। আপনি তো টেম্পোরারী মানুষ—দিব্বি আছেন। যত ঝামেলা এইসব পুরোনো লোকেদের।

অজিত। হলটা কি?

সেলিম। এদিকে চাকরী হবে শুনে দলে দলে লোক আসছে। ওদিকে ফক্কা! ইন্টারভিউয়ের চোদ্দগুষ্টির তুষ্টি করি!

[হাতে একখানা কাগজ নিয়ে পড়তে পড়তে আর হাসতে হাসতে ঢুকছে প্রণব—রিসেপশনের ভেতরের দিকের দরজা দিয়ে। প্রণবের গায়ে রঙীন খদ্দরের পাঞ্জাবী। বয়েস তিরিশের মধ্যে।]

অজিত। ওকি! আপনি না ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন?

প্রণব। হুঁ! [হাসিমুখে]

সেলিম। পরীক্ষা দিলেন না?

প্রণব। না। [পড়তে পড়তে হেসে ফেলে]

অজিত। হাসছেন কেন?

প্রণব। কী লিখেছে, দেখুন [হাসে]। এই যে এইখানটা দেখুন—ন'নম্বর প্রশ্ন। আপনি প্রসাধন-করা, না, না-প্রসাধন-করা মেয়ে পছন্দ করেন? দশ নম্বরেরটায় কী বলছে জানেন? আপনি ভালবেসে বিয়ে করবেন, না, বিয়ে করে ভালবাসবেন—হাসবো না?

অজিত। ওসব তো মামুলি ব্যাপার! Psychological test, American style।

প্রণব। মামুলি হবে কেন? আমার তো চমৎকার লাগছে—বেশ একটা আদিরসের সন্ধান মেলে।

সেলিম। তবে উঠে এলেন কেন স্যার?

প্রণব। শুনলাম আশা নেই। ইন্টারভিউ দিচ্ছে এমন একজনই বলল। তার হবে। কোনো

ওপরওয়ালার ক্যান্‌ডিডেট্‌।

অজিত। তবু শেষ না করে চলে আসাটা ঠিক উচিত হয়নি। হয়তো—

প্রণব। আশা আছে?

অজিত। না।

প্রণব। তবে?

অজিত। আশা করতে দোষ কী? যেমন ধরুন ডাক্তার জবাব দিয়ে দিলেও রোগীকে বাঁচাবার একটা আশা থেকেই যায়।

প্রণব। কথাটা বেড়ে বলেছেন। ঐ রোগেই আমি গেলাম। এটা আমার এগার নম্বর ইন্টারভিউ—তবু হাল ছাড়িনি।

অজিত। তবে ফিরে গিয়ে ওটা শেষ করুন!

[রিসেপশনে লোক সমাগম। বেল বাজছে। সেলিম তাড়াতাড়ি চলে গেল।]

প্রণব। আপনি এখানে কী করেন?

অজিত। আঁকি—পিস্‌ রেটে। তাছাড়া যাবতীয় অনুবাদের কাজ। টেম্পোরারী।

প্রণব। কি রকম হয়?

অজিত। এই শো দুই। [কথা বলার সঙ্গে কাজ করে দ্রুত হাতে] কোনো কোনো মাসে আড়াইশো তিনশো। তবে সে গাধার খাটুনি খাটলে কদাচ হয়। এমনিতে রেটটা কম বলেই পেরে ওঠা যায় না।

প্রণব। কেউ চেনাশুনো ছিল বুঝি?

অজিত। [হেসে] অবশ্যই। স্বয়ং একজন উঁচুদরের ইয়ের ইয়ে—তাঁরই করুণায়!—এর বেশি বলার নিয়ম নেই।

[দু'জনে হাসে। অজিত কাজ করছে। ঘরে ফাইল নিতে টাইপিস্ট ইত্যাদির যাওয়া আসা।]

প্রণব। তাহলে আর একবার ঐ পরীক্ষা-পরীক্ষা খেলাঘরে ফিরে যাই—কী বলেন?

অজিত। হ্যাঁ।

প্রণব। তাহলে আশা আছে বলছেন?

অজিত। না।

প্রণব। তবে কিসের আশায় যাই?

অজিত। [হেসে] আশা জিনিসটাকে তো আর অত সহজে মরতে দেওয়া চলে না।

[সঞ্জয় হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল। হাতে পোর্টফলিও। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। সুপুরুষ। একটা তড়বড়ে ভাব সারা দেহে মাখানো। সেলিম সঞ্জয়ের হাত থেকে জিনিসপত্র, কোট ইত্যাদি নেয়। অজিত আর প্রণব ভেতরে চলে গেল। ভেতরের পর্দা ঠেলে এল লাবণ্য।]

সঞ্জয়। ও গড! সকাল থেকে, একেবারে যা-তা চলেছে। ভোরবেলা উঠেই এয়ারপোর্ট। কুয়াশার জন্যে প্লেন লেট্‌। মিস্টার তরফদার খুব tired হয়ে পড়েছেন—এতটা পথ একটানা আসতে। Any way, ওঁকে fix করে দিয়ে তবে আসছি। বিমল ছিল সঙ্গে, তবু আমাকে personal interest দেখাতে হল। শোনো বনি, এবার থেকে তোমার এ কাজগুলো আরও interest নিয়ে করতে হবে। এসব ব্যাপারে আমি ভয়ানক tired হয়ে পড়ি।

লাবণ্য। তুমি তো নিজেই গেলে, সঞ্জয়। এমনিতে আমিই তো যাই।

সঞ্জয়। [টাই ঢল্ করতে করতে] তার ওপর একটা মজার খবর শুনেছ—আমার সম্পর্কে ডাক্তারদের latest discovery হচ্ছে—আমার নাকি মদে allergy, খেলেই সাংঘাতিক আমবাত বেরুচ্ছে। গলা চুলকোচ্ছে। শুনে গিন্নীর দাঁত ঢাকছে না। কিন্তু ব্যবসার দুনিয়ায় মদে allergy মানে তো জীবনেও allergy। সকালে খেলাম না। ভাল whisky। মিস্টার তরফদার হয়তো অসন্তুষ্ট হলেন।

সেলিম। ইন্টারভিউ দিচ্ছেন চার জন। [সেলিম বেরিয়ে গেল]

সঞ্জয়। ও! ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা যাক্। চিঠিগুলো? [সঞ্জয় পাইপ ধরাতে থাকে]

লাবণ্য। ঐ তো দেখো না।

সঞ্জয়। [চিঠি পড়ে] রিসেপশনিস্টদেরগুলো আগে দেখি। হুঁ, সেনগুপ্তর সেই ক্যান্‌ডিডেট্ আছে দেখছি। এইতো লাল দাগ। এ আর কী ইন্টারভিউ করব? কাগজগুলো নিয়ে এসো। Send her an appointment letter। আর অন্যগুলো কাল পাঠালেও হবে।

লাবণ্য। একবার ওঘরে গেলে হত না?

সঞ্জয়। একদম সময় নেই। ওদের বল written test-এর ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে। Confetence Room-এ অফিসের সবাইকে আসতে বল। মিস্টার তরফদার একটু পরেই আসবেন। এখন ক'দিন তুমি তরফদার ছাড়া আর কাউকে চিনবে না। [লাবণ্যর কাঁধে হাত রাখল]

লাবণ্য। তার মানে?

সঞ্জয়। তুমি হলে আমাদের পাব্‌লিসিটির মুখপাত্র। তরফদার must know us through you—গল্পগুজব করতে খুব ভালবাসেন। প্রথমে personal vein-এ কথা ব'লে ওর মুডটা একটু লক্ষ্য করবে। Intelligent লোক। কিন্তু he has his weaknesses. You have to strike at the weakest spot. স্কীমটা যদি work-out করে —উফ্! বনি dear, সমস্ত জীবন দিয়ে ব্যাপারটায় আমাদের নামতে হবে।

[ফোন বাজল। সঞ্জয় রিসিভার তোলে।]

সঞ্জয়। হ্যালো! কে, সেনগুপ্ত? বাঃ, বেশ লোক। ভুলবো কেন? বিশেষ করে শালী সংক্রান্ত ব্যাপার যখন। How come—তুমি ওর চাকরী সম্পর্কে এত interested? ওঃ হোঃ! আমি ভাবছিলাম বুঝি—[জোরে হেসে ওঠে] ও হয়ে যাবে। S' long! [রিসিভার নামিয়ে] বনি!

লাবণ্য। এই যে!

সঞ্জয়। [কাগজপত্র নিয়ে] আমি Conference Room-এ যাচ্ছি। নতুন স্কীমটা নিয়ে ওদের brief করব। তুমি হাতের কাজ সেরেই চলে এসো। আর মিস্টার তরফদারকে একটা ফোন করে জেনে নাও কখন আসবেন। [থেমে অন্তরঙ্গ গলায়] ওঃ হ্যাঁ, শোনো বনি, I know your private feelings, কিন্তু তরফদারকে একটু special attention তোমায় দিতেই হবে। উনি একটু যাকে বলে ইয়ে। অসুস্থ স্ত্রী বুঝছোই।

লাবণ্য। কিন্তু সঞ্জয়, তুমি জানো আমি একটা লিমিটের বাইরে যেতে পারব না।

সঞ্জয়। [হাসির ধরন বদলে] সে তো বটেই, সে তো বটেই! বাড়াবাড়ি কিছু আমিই বা চাইব কেন? তবে তুমি এই কোম্পানীর একটা অ্যাসেট্—গোড়া থেকে আছ। যা ভাল

বুঝবে করবে। কিন্তু this deal has to be clinched!

[শেষ কথাটায় বিশেষ জোর দিয়ে সঞ্জয় ফলাফলের জন্যে চেয়ে দেখে। তারপর ভেতরে চলে যায়।]

লাবণ্য। সেলিম! [সেলিম রিসেপশন থেকে উঠে এল]

সেলিম। যে আজ্ঞে!

লাবণ্য। মিস সরকারকে এই চিঠিগুলো টাইপ করতে দিয়ে এসো। আর আজই যেন এই চিঠিখানা ডাকে ফেলা হয়। রিসেপশন আর একদিনও খালি রাখা চলবে না।

সেলিম। আচ্ছা।

[লাবণ্য রিসিভার তোলে। সিগারেট নেয়। সেলিম দেশলাই ধরিয়ে দিয়ে কাগজপত্র নিয়ে ভেতরে চলে যায়। লাবণ্য ফোনে কথা বলছে। রিসেপশনের দিকের ভিতরের দরজা দিয়ে ঢোকে অজিত। তার পরে প্রণব।]

অজিত। আপনি এখনও যাননি?

প্রণব। না। আর সবাই চলে গেল।

অমিত। কিছু আশাটাশা দিল নাকি?

প্রণব। আপনার ঐ এক কথা—আশা! কথাটা মনে ফেউয়ের মত লেগে আছে।

অজিত। এ চাকরীটা তো আপনার হবে না। অন্য কোথাও—

প্রণব। কোথাও আশা দেখছি না। আসলে আমাদের কি হয়েছে জানেন, আমাদের ট্র্যাজেডি হল আমরা না শিখেছি আত্মীয়স্বজনের ধরাধরি করে চাকরী বাগাতে, না শিখেছি গরীব লোকেদের মত গতরে খেটে পেট চালাতে। এবার একেবারে ফৌত হয়ে যেতে হবে।

অজিত। নেশাটা কী?

প্রণব। বলতে এখন লজ্জা হচ্ছে—কবিতা লিখি।

অজিত। আপনার নাম?

প্রণব। প্রণব মৈত্র।

অজিত। আপনি প্রণব মৈত্র? আরে বাবা, আমি যে আপনার পরম ভক্ত।

প্রণব। ভক্ত! হ্যাঁ, আমার আরও অনেক ভক্ত আছে বলে শুনি।

অজিত। আচ্ছা শুনুন, আপনি তো চমৎকার অনুবাদ করেন। আপনাকে কিছু অনুবাদের কাজ দিলে করে দিতে পারেন না? পিস্ রেটে?

প্রণব। নিশ্চয়ই পারি। আছে কাজ?

অজিত। আমার কাজ থেকে যদি এখন কিছু করেন—

প্রণব। ছি, ছি, তা কখনও আমি নিতে পারি? আপনার দু'শো টাকার কাজ সম্বল। তাতে আমি কী ভাগ বসাব?

অজিত। না, না, আমার কাজ থেকে দেব কেন—ম্যানেজ করে দেব। আল্‌তু ফাল্‌তু, অর্ধ-শিক্ষিত, অশিক্ষিত, কত লোক ম্যানেজ করছে আর আমি না হয় একজন প্রকৃত শিক্ষিতের জন্যেই করলাম।—দাঁড়ান! [লাবণ্যকে দেখে নিয়ে] আপনি এক মিনিট অপেক্ষা করুন।

[লাবণ্য ফোন নামিয়ে রাখল। অজিত এল।]

অজিত। মিস বোস!

লাবণ্য। কী ব্যাপার? আমি কিন্তু ভীষণ busy।

অজিত। না, না—সামান্য একটা কথা। ও ঘরে একজন নাম-করা কবি এসেছেন। আমাদের সেদিন কথা হচ্ছিল না—যে নাম-করা দু'একজন নিলে পাব্‌লিসিটির সুবিধে হয়।

লাবণ্য। কবির নাম কী?

অজিত। প্রণব মৈত্র।

লাবণ্য। আধুনিক? নাম শুনিনি।

অজিত। কিন্তু খুব নাম হচ্ছে। এখনকার মধ্যে rising।

লাবণ্য। আচ্ছা, ডেকে আনুন। একটা কাজ আছে হাতে, করিয়ে নিয়ে চেখে দেখা যাক।

অজিত। প্রণব মৈত্র। লাবণ্য বোস।

প্রণব। নমস্কার।

লাবণ্য। নমস্কার। আপনি তো কবি? আমাদের মধ্যে এক অজিত ছাড়া কেউ আধুনিক কবিতা বোঝে না। আপনি আমাদের কাজে কিছু-কিছু সাহায্য করলে খুশি হব।

প্রণব। আমি—

লাবণ্য। শুনুন। আপনাকে একটা বক্তৃতা লিখে দিতে হবে। আমি বিষয়টা বলে দেব। আপনি ঘণ্টাখানেক পরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

প্রণব। বক্তৃতা? আমি তো—

লাবণ্য। ও খুব সোজা ব্যাপার। আমাদের চীফ বাঙলায় বক্তৃতা দিতে চান। আজকাল তো আবার ওসব রেওয়াজ হচ্ছে কিনা। খানিকটা decorative ব্যাপার বুঝলেন না?

প্রণব। আমি একদম বক্তৃতা দিতে পারি নে।

লাবণ্য। আপনি দেবেন কেন—আপনি লিখে দেবেন।

[সঞ্জয় ঢুকল]

সঞ্জয়। বনি। বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে। সবাই অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। [টেবিল হাতড়ে] আমার স্পীচের পয়েণ্টগুলো গেল কোথায়? [লাবণ্য ইশারা করায় অজিত প্রণবকে নিয়ে রিসেপশনে চলে যায়।]

লাবণ্য। এতদিনে একজন কবিকে পাওয়া গেছে। কতটা নাম-করা যাচাই করে নিতে হবে।

সঞ্জয়। ঐ লোকটা কবি নাকি?

লাবণ্য। হ্যাঁ। আমার একটা দারুন প্ল্যান মাথায় এসেছে। তোমার স্পীচ্‌টা ওকে দিয়ে লেখাবো। তারপর ওকেই boost করতে হবে। ফার্মে দু'একজন popular লোককে employ করা দরকার। পাব্‌লিসিটির ব্যাপারে এসব না হলে চলবে না।

সঞ্জয়। বনি, তুমি আর একমিনিট দেরী করলে সব উচ্ছন্নে যাবে। তরফদারকে গেঁথে ফেলা তো চাট্টিখানি কথা নয়। কলকাতার সমস্ত ফার্মগুলো ওৎ পেতে বসে আছে। এই কনট্র্যাক্‌টের অর্ধেক পেলেও আমরা কয়েক লাখ টাকা লাভ করতে পারব। তবে আমাদের চেষ্টা করা উচিত পুরোটা পেতে। তার জন্যে careful preparation চাই। একটা false step হলেই, ব্যস। সেই টিম্‌ টিম্‌ করে চলতে থাকব। তবে এভাবে কোম্পানী চালানোর কোনো মজা নেই। চলে এসো। Get excited my dear—come on! [লাবণ্যকে এক হাতে ধরে ঝাঁকায়]

লাবণ্য। চল। তোমার কথাবার্তা বড় infectious—জানো!

সঞ্জয়। Really? That's something to be proud of in business life.

[ওরা ভেতরের দরজা দিয়ে চলে গেল। রিসেপশনে সেলিম ও প্রণব। অজিত খানিক

আগে ভেতরে গেছে। খটাখট্ টাইপরাইটারের শব্দ। টেলিফোন বাজতে সেলিম গিয়ে ধরে। অজিত ফিরে আসে।]

সেলিম। হ্যালো, কে? আজ্ঞে? মিস্টার তরফদারের আপিস থেকে বলছেন? মুখার্জী সায়েবকে কী বলব? মিস্টার তরফদার এখানে আসার জন্যে রওনা হয়েছেন? জানিয়ে দিচ্ছি। সালাম। [রিসিভার রাখে] সেরেছে! এখন তো ভেল্কিখেলা শুরু হল। কিন্তু আমার কী হবে? ও সেন সায়েব—আজ দুপুর রাত পর্যন্ত আট্‌কে রাখলে বিবির—

অজিত। বিবি খুব ভাল আছে—তুমি ভাবছ কেন? আগে সায়েবকে খবরটা দিয়ে এসো।

সেলিম। তাহলে আপনি বলছেন বিবি আর ছ্যানাটা দু'জনেই ভাল আছে?

অজিত। খুব ভাল আছে। নয়তো খবর পেতে। যাও।

প্রণব। আপনাদের আপিসে আজ যেন কী একটা ঘটতে চলেছে বলে মনে হচ্ছে।

সেলিম। ভূমিকম্প! এই যে তরফদার সায়েব আসছেন—তারপর দেখবেন কী হয়! বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা! বাবা! ব্যবসা মাথায় থাক! ছিলাম চাষী, হয়েছি তক্‌মা-আঁটা চাপরাশী—আমাদের দুঃখুটা কী আর আপনারা ভদ্দরলোকেরা বুঝবেন?

[সেলিম অজিতের তাড়ায় গজ্ গজ্ করতে করতে ভেতর দিকে চলে গেল। কর্মচারীরা যাওয়াআসা করছে।]

অজিত। এ অপিসটায় ঢুকলেই মনে হয় সময়টা যেন একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড় হয়ে এদের সবাইকে তাড়া ক'রে ফিরছে।

প্রণব। ব্যবসায় time is money কথাটা খুব মূল্যবান। কিন্তু এখানকার ব্যাপারটা কি?

অজিত। আমি যতদূর বুঝেছি, এরা এক শাঁসালো মক্কেলকে গাঁথবার জন্যে আমাকে, আপনাকে—সম্ভব হলে সেলিমের ঐ ছানাটাকে পর্যন্ত কাজে লাগাতে চায়।

প্রণব। ঐ dealটা কিসের?

অজিত। একটা তিরিশ লাখ টাকার কাজ। কলকাতার business world একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে। যারা এই কাজটার সঙ্গে connected তাদের নিয়ে সবাই টানাহ্যাঁচ্‌ড়া করছে। আমাদের ভাগে মিস্টার তরফদার পড়েছেন। দেখা যাক, মিস্টার মুখার্জীর রাতারাতি কোম্পানীকে বড় করে তোলার স্বপ্ন সফল হয় কিনা।

প্রণব। ঐ ভদ্রমহিলা—বনি বোস, ভয়ানক artificial—না?

অজিত। গভীর জলের মাছ। ভীষণ ওস্তাদ মেয়ে। তবে শুনেছি ওর private lifeটা কেউ জানে না—ভীষণ guarded। আপিসের কাউকে কখনও বাড়িতে ডাকে না। ওর বন্ধুবান্ধব আছে বলেও কেউ জানে না।

প্রণব। তাহলে আমরা একদিন যাব ও'র বাড়িতে।

[মিঃ তরফদার ঢুকলেন। সম্ভ্রান্ত চেহারা। মাঝবয়সী। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে আস্থাবান। চলাফেরায় ও মুখে সেই ভাবটা আছে।]

মিঃ তরফদার। আমি তরফদার।

অজিত। [চম্‌কে] ওঃ! নমস্কার, আসুন। আমি মিস্টার মুখার্জীকে ডেকে দিচ্ছি।

[মিঃ তরফদারকে অজিত সঞ্জয়ের ঘরে বসিয়ে ভেতর থেকে সঞ্জয়কে ডেকে আনল। প্রণব রিসেপশনের চেয়ারে বসে লেখে। সঞ্জয় এল প্রায় ছুটে।]

সঞ্জয়। মিস্টার তরফদার! কী সৌভাগ্য, এর মধ্যে এসে পড়েছেন। আপনার কথাই

হাচ্ছল। এখন শরীরটা ভাল লাগছে তো?

মিঃ তরফদার। মন্দ নয়। কালকের dull ভাবটা কাটাতে একটা নীট খেয়ে নিলাম। ব্যস্, ঝর্ঝরে হয়ে গেল শরীরটা।

সঞ্জয়। বাঃ চমৎকার prescription তো! I like it। এই নিন, আমাদের এই documentটা। এতে আমাদের ফার্মের সমস্ত details পাবেন। আমাদের reliability সম্পর্কে আপনার যাতে কোনো সন্দেহ না থাকে, তাই ক'দিন ধরে ঘেঁটেঘুঁটে এগুলো তৈরী করা হয়েছে।

মিঃ তরফদার। তৈরী করা হয়েছে কথাটা বড়—[হাসলেন]

সঞ্জয়। [হেসে উঠে] No doubt, no doubt! সেলিম!

সেলিম। যে আজ্ঞে!

সঞ্জয়। চা বোলাও। চা খাবেন তো, না অন্য কিছু—কফি?

মিঃ তরফদার। কফি। চা-টা এ সময়ে ভাল লাগে না।

সঞ্জয়। সেলিম, কফি বোলাও! [সেলিম বেরিয়ে গেল] আমাদের পি. আর. ও. লাবণ্য বোসকে আপনি একবার দেখেছেন। সে-ই আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারটা নিয়ে বসবে। She's a golden-hearted darling—কোম্পানীর একটা asset।

লাবণ্য। নমস্কার! বাঃ, সঞ্জয় বলল আপনি tired হয়ে পড়েছেন। আমি তো দেখছি আপনি আমাদের চাইতেও ফিট্।

মিঃ তরফদার। ফিট্ থাকাটা অভ্যাস করতে হয়।

লাবণ্য। অবশ্যই। [সিগারেটের প্যাকেট বার করে] আপনার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে আমাদের আপিসের সবাই ব্যগ্র। তবে [হেসে] আমার সঙ্গেই বোধ হয় আলাপটা আপনাকে কিছুটা বেশি করতে হবে।

মিঃ তরফদার। [উঠে] With pleasure! এখুনি মিস্টার মুখার্জী আমাকে আপনার সম্বন্ধে এক মস্ত certificate দিচ্ছিলেন।

লাবণ্য। হ্যাঁ, ঢুকতে ঢুকতে শুনলাম বটে। আমাকে golden-hearted darling বলছিল, না? এই প্রথম বোধ হয় সঞ্জয় কোনো পরনারীর প্রশংসা করল।

মিঃ তরফদার। [বসে পড়ে] তাই নাকি? Very interesting।

লাবণ্য। ঐ দেখুন টেবিলে মিসেসের ছবি! আমাদের সঞ্জয় একেবারে ঐতিহাসিক।

মিঃ তরফদার। বাঃ [ছবি দেখলেন]!

লাবণ্য। আর জানেন, আমাদের সঞ্জয় এতই old-fashioned যে বউকে রীতিমত ভালবাসে।

সঞ্জয়। ফের পেছনে লাগা শুরু করলে?

লাবণ্য। আর কী আশ্চর্য জানেন, ও বউয়ের সঙ্গে এমন করে কথা বলে মনে হয় শালীর সঙ্গে কথা বলছে।

মিঃ তরফদার। [জোরে হেসে উঠে] ব্রাভো, ব্রাভো!

লাবণ্য। [হাসতে হাসতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে] আমার এই informality-তে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না ত'?

মিঃ তরফদার। Not at all—not in the least! বরং খুব ভালো লাগছে। মাথা ধরাটা একদম ছেড়ে গেল মনে হচ্ছে।

সঞ্জয়। এটা বনির একটা special ক্ষমতা। বিশেষ করে আমাকে নিয়ে একটু নির্দোষ আনন্দ

করতে পারলে তো কথাই নেই।

[তিন জনের মধ্যে হাসিতামাশা। সেলিম কফি এনে টিপয়তে ধরে দিলে লাবণ্য সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দেয় মিঃ তরফদারের দিকে।]

লাবণ্য। খান একটা। বড্ড সস্তা—প্রায় বিড়ির সমগোত্র।

মিঃ তরফদার। [একটা নিয়ে] আমিও এটাই খাই।

[সেলিম লাবণ্য ও তরফদারের সিগারেট ধরিয়ে দেয়। সঞ্জয় নেয় না।]

সঞ্জয়। আঃ বনি, ক'দিন ধরে লক্ষ্য করছি একেবারে chainsmoke শুরু করেছ। তার ওপর এই কড়া সিগারেটটা—lung cancer হয়ে মরবে শেষে।

লাবণ্য। [কফি করতে করতে হেসে] Don't be absurd! তুমি দেখছি quick changesগুলো ভাল বোঝই না। Common manকে জাতে ওঠাতে হলে তার কতগুলো হ্যাবিটকেও জাতে ওঠাতে হয়। কী বলেন, মিস্টার তরফদার?

মিঃ তরফদার। এক মত! Absolutely correct। আপনি দেখছি খুব alert!

[কফি খাওয়া চলছে। লাবণ্য উঠে অজিত ও প্রণবকে ডেকে নিয়ে এল। সঞ্জয় ফোনে নীচু গলায় কথা বলতে থাকে।]

লাবণ্য। ইনি প্রণব মৈত্র, নাম করা কবি—অল্পবয়সীদের মধ্যে leading। [সকলের নমস্কার প্রতিনমস্কার]

তরফদার। বাঃ বড় খুশি হলাম। এরকম সব talented লোকের imagination ধার না পেলে ব্যবসার মূলধন ভাল খেলে না। [অজিতকে] ইনি?

লাবণ্য। Budding সাহিত্যিক, commercial artist—Versatile!

তরফদার। চমৎকার! আর আপনার গুণগান তো এসেই শুনেছি। I think I'm going to like it all।

লাবণ্য। আসুন। আমাদের কনফারেন্স রুমে সবাই জড় হয়েছেন। আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনি। এখন তো আপনি চালালে আমরা চলব।

তরফদার। [হঠাৎ অর্থপূর্ণভাবে] আমি তো দেখছি আপনি চালালেই আমরা চলব।

সঞ্জয়। [রিসিভার নামিয়ে] বনি, তোমরা এগোও। আমরা আসছি। অজিতবাবু, একটু অপেক্ষা করবেন। বনি, তুমি কবিকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। মিস্টার তরফদারকে এরমধ্যে ও'র কবিতা শোনাতে পারবেন। উনি এখনও, মনে হচ্ছে, মনেপ্রাণে সবুজ।

মিঃ তরফদার। আঃ, সত্যিই যদি তাই হতে পারতাম! এখন তো প্রত্যেকটা জন্মদিন এক-একটা বিভীষিকা। আর পাঁচদিন পরে আমার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবে। ভেবে দেখুন—half-a-century!

লাবণ্য। আপনার জন্মদিন পাঁচদিন পরে? Wonderful। আমরা একটা gala birthday party দেব—press প্রেস্ সব বলব। আপনি একটা কবিতা লিখে দেবেন প্রণববাবু। এক তরুণ কবি আর এক প্রবীণ ব্যবসায়ী! চমৎকার হবে।

সঞ্জয়। হাসি নয়। National construction-এর যুগে রবীন্দ্রনাথের মত—'আমি যাবই —বাণিজ্যেতে যাব' ধরনের কবিতা না লিখতে পারলে চলবে কেন? Inspired হতে হবে।

মিঃ তরফদার। হুঁ, ঠিক কথা। বড় দরের কিছু হলে তবেই তো inspiration আসবে। আমার ঠাকুরদা সি. আর. দাশের contemporary ছিলেন। সে সব কী দিন ছিল।

কোথাও কোনো pettiness ছিল না। আমার ছোটবেলাটা স্বপ্নের মত মনে হয়। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু।

সঞ্জয়। তর্কে বহুদূর! [হেসে উঠে] চলুন একটু তর্ক করা যাক। এটা তো তর্ক করার যুগ। তবে আমার ধারণা আপনার সঙ্গে আমরা তর্কে হেরে যাব। আমাদের অভিজ্ঞতা কম।—ভাল কথা, আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?

মিঃ তরফদার। ভাল নয়। বহুদিন ধরে ভুগে ভুগে এখন কেমন mental case হয়ে দাঁড়িয়েছেন। Fixations।

সঞ্জয়। Very sad।

[লাবণ্য, তরফদার ও প্রণবকে ভেতরের দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে সঞ্জয় অজিতের কাছে ফিরে এল। সেলিম কফির সরঞ্জাম নিয়ে চলে গেলেন।]

সঞ্জয়। অজিতবাবু! শুনুন, কথা আছে। [চোখ বুজে ভাবে] ও গড্! এতগুলো কাজ মাথায় কিল্‌বিল্‌ করছে। ও হ্যাঁ! আচ্ছা অজিতবাবু, আপনি তো চ্যাটার্জির মারফৎ এসেছেন, না? ওর যে ভায়রা Milton & Sen-এ কাজ করে তার সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়? কিছু মনে করবেন না, এসব দরকার বলেই জিজ্ঞেস করছি।

অজিত। চ্যাটার্জীর ভায়রাকে আমি সামান্যই চিনি। ও'র স্ত্রী ছন্দা ব্যানার্জীই আমাকে আসলে এনেছেন।

সঞ্জয়। ঘনিষ্ঠতা আছে?

অজিত। মানে?

সঞ্জয়। একটা ব্যাপারে influence করতে পারবেন?

অজিত। ব্যাপারটা জানতে পারলে সুবিধে হত।

সঞ্জয়। ছন্দার স্বামী ব্যানার্জী Milton & Sen-এর লাখ লাখ টাকার লেনদেনের ব্যাপারে জড়িত। মিস্টার তরফদারের যাবতীয় কাজের one-fourth ওরা মারবে।

অজিত। কিন্তু এতবড় ব্যাপারে আমি যে কিভাবে—

সঞ্জয়। না, না, ব্যাপারটা কিছুই নয়—টাকার অঙ্কটাই বড়। আমি শুধু আপনাকে দিয়ে আর চ্যাটার্জীকে দিয়ে sound করিয়ে দেখতে চাই ছন্দার স্বামীকে আরও মোটা মাইনে দিলে সে আমাদের দিকে চলে আসবে কিনা। আমার পক্ষে ও'কে বলায় কতকগুলো অসুবিধে আছে।

অজিত। বড্ড risky ব্যাপার নয় কি?

সঞ্জয়। খানিকটা! কিন্তু এখন আমরা হয় risk নেব, নয়তো independent ছোট ছোট বাঙালী ফার্মগুলো একে একে উঠে যাবে।

অজিত। এ আমার দ্বারা হবে না।

সঞ্জয়। কিন্তু হতেই হবে যে অজিতবাবু। এর ওপর আপনার, আমার, সকলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আমরা একটা বাঙালী ফার্ম—আমাদের বিপদ-আপদগুলো ভেবে দেখুন। আমরা উঠছি—be a game!

অজিত। ভেবে দেখব। এখুনি কথা দিতে পারছি না।

সঞ্জয়। বেশ। কিন্তু আজই বলবেন।

[শান্তনু তরফদার ঢুকল। ২২।২৩ বছরের আদুরে চেহারার ছেলে। সাজসজ্জা আধুনিক হলেও একটু এলোমেলো।]

শান্তনু। বাবা এখানে এসেছেন? মিস্টার তরফদার?

সঞ্জয়। আরে এসো, এসো। বাবা এখুনি আসবেন। আমি ডেকে আনছি। বোসো। অজিতবাবু, কথা বলুন। [সঞ্জয় ভেতরের দিকে চলে গেল]

শান্তনু। আমার নাম শান্তনু। আপনার তো অজিত মনে হচ্ছে। অজিত কী?

অজিত। অজিত সেন।

শান্তনু। বদ্যি?

অজিত। [হেসে] কেন, জাত মানেন নাকি?

শান্তনু। না। আমার একজন বান্ধবী ছিল—গুপ্ত। মা তাকে দেখেই এমন ক্ষেপে গেলেন। বললেন, গুপ্ত টুপ্ত, বদ্যি টদ্যি বিয়ে করলে মা মরেই যাবেন। মেয়েটা গ্র্যান্ড্ ছিল।

অজিত। [হেসে উঠে] তাহলে আপনি বদ্যিদের admirer?

শান্তনু। তা একরকম বলতে পারেন।

অজিত। তাহলে বিয়ে করলেই পারতেন।

শান্তনু। যাঃ, বিয়ে করব কী করে? তখন আমি সবে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি।

অজিত। তাই নাকি? বাঃ! অপেক্ষা করতে বললেই পারতেন। বড় হয়ে—

শান্তনু। হাঃ—! আমি ওসব বিয়ে ফিয়ের মধ্যে নেই। প্রেমে পড়লেই বিয়ে করতে হবে কেন বুঝি না। তাছাড়া বিয়ে করলে সব charm লস্ট্—মা তো সেই old-fashioned values আঁকড়ে বসে আছেন—আমাকে বোঝেনই না। শুধু আমার মা বাবা কেন, অন্য অনেক বন্ধুবান্ধবের মা-বাবাও দেখি খুব emotional। সকলের সঙ্গেই একটা emotional involvement না করে পারবেন না। কই, আমার তো ওরকম কোনো involvement হয় না। এমন কি কলেজের বন্ধুদের সঙ্গেও সেরকম ভাবটাব হয়নি।

অজিত। আপনি এখন কী পড়েন?

শান্তনু। Fourth year Engineering। বাবা আবার আমায় engineer না বানিয়ে ছাড়বেন না। কী রকম যে সব illusions! আমি engineer হয়ে বাবার idealman হব—দেশ গড়ব। আর মাকে খুশী করতে আমাকে saintly life lead করতে হবে। Ideal saint হবার চাইতে আমার insane হয়ে যাওয়া ভাল। ঐ লাইনটা আমাকে suit করবে।

অজিত। এখনও ছাত্র!

শান্তনু। পুঃ—ছাত্র!—আচ্ছা, এখানে যেসব মেয়েরা কাজ করে—কী রকম?

অজিত। আপনার মা-মাসীর বয়সী। খুব ছোট হলে বড়দি বলে ডাকতে পারেন।

শান্তনু। ও, তাই বাবা—

[তরফদার, লাবণ্য, প্রণব, সঞ্জয় ঢুকল। পেছনে সেলিম।]

মিঃ তরফদার। কী রে শানু?

শান্তনু। মা পাঠিয়ে দিল।

মিঃ তরফদার। শরীর?

শান্তনু। শরীর তো কিছু খারাপ দেখলাম না। তবে কেন জানি না, বড্ড চেঁচামিচি করছে আর তোমাকে ডাকছে।

মিঃ তরফদার। মিস্ বোস, আপনার সঙ্গে আজই বিকেলে একবার বসতে চাই, ব্যাপারটা

নিয়ে। এখানে এসে আমি আপনাকে তুলে নিয়ে যাব। চারটে আপনাকে suit করবে?

লাবণ্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ—খুব।

মিঃ তরফদার। বেশ। এই আমার ছেলে শান্তনু।

লাবণ্য। বাঃ, ভারি সুন্দর ছেলে আপনার।

মিঃ তরফদার। Like father like son—না? [জোরে হেসে উঠলেন]

সঞ্জয়। That's a good one। [সমান তালে হাসি]

লাবণ্য। [হেসে] তুমি থেকে যাও, শান্তনু—আপিসটা দেখাব।

শান্তনু। খুব রাজি।

মিঃ তরফদার। ও নো! তোমার মা বিরক্ত হবেন। এখন চল, পরে আমার সঙ্গে এসো।

শান্তনু। চ—ল!

[সকলে কলরব করে বিদায় নিল। সঞ্জয় ভেতরে গেল। অজিত কাজ করছে। ফোন বাজে। প্রণব তুলে নেয়।]

প্রণব। হ্যাঁ আছেন। আপনি একটু ধরুন। [রিসিভার নামিয়ে] মিস্ বোস, আপনার বাড়ি থেকে শম্ভু হাজরা বলে একজন ডাকছেন।

লাবণ্য। শম্ভ? [অবাক হয়ে রিসিভার নেয়] কে? শম্ভু—হঠাৎ? কী ব্যাপার, বিপদ আপদ কিছু হয়নি? [মুখে ভাবাবেগ] সত্যি! কত বড়? দু'বছরের ছেলে? না, না আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। মতির মা কোথায় পেল? কালিঘাটের মেলায়—মা মরে গেছে গাড়ি চাপা পড়ে? সত্যি বলছিস্ তো, শম্ভু? নারে, বিশ্বাস হচ্ছে না। কোনো গোলমাল হবে নাতো? মতির মা কী চায়? যা চাইবে দেব। আসছি। এক্ষুনি আসছি। তুই খেতে দিয়েছিস তো? কাঁদেনি? আহা রে! আসছি। [থেমে] হ্যাঁরে, তোর অসীমদা এসেছিল নাকি রে? আসেনি? আজ দশদিন হতে চলল। আচ্ছা আসছি।

[লাবণ্য যতক্ষণ ফোনে কথা বলে প্রণব অবাক হয়ে তার পরিবর্তিত মুখ লক্ষ্য করে। রিসিভার নামাতেই চোখ নামিয়ে নেয়।]

অজিত। আপনার অনুবাদগুলো, প্রণববাবু!

প্রণব। [অন্যমনস্কভাবে নিয়ে] ওঃ!

লাবণ্য। মিস্টার সেন, একটা ভীষণ জরুরী দরকারে বাড়ি যেতে হচ্ছে।

অজিত। কারুর কিছু বিপদ হয়নি তো?

লাবণ্য। না, না, একটা ভীষণ মজার ব্যাপার হয়েছে—[হঠাৎ চুপ করে যায়] সঞ্জয়কে বলে দেবেন আমি লাঞ্চের পর আসব—ঘণ্টা দু'তিন। একটু বুঝিয়ে বলবেন।

অজিত। আপনি নিজে না বলাটা কী ভাল হবে?

লাবণ্য। বলতে গেলেই আটকাবে, অথচ না গেলেই নয়। [প্রণবকে কাগজ দিয়ে] এই পয়েন্টগুলোর ওপর আপনাকে লিখতে হবে।

প্রণব। আমি আজই এসে এত দেখছি যে বুঝে উঠতে পারছি না। আজকের মত আমায় ক্ষমা করুন। কাল থেকে পুরোপুরি কাজ করব।

অজিত। এগুলো নিয়ে যান। পারুন না পারুন সে পরের কথা। [তাড়াতাড়ি প্রণবের হাতে কাগজ ফেরৎ দেয়]

লাবণ্য। [উত্তেজনায়] মিস্টার সেন—please! একবারটি কনফারেন্স রুমে যান। আমার

এখুনি বাড়ি না গিয়ে উপায় নেই।

অজিত। [হঠাৎ] বাড়িতে কে কে আছেন?

লাবণ্য। [হঠাৎ হেসে উঠে] ছোট কোনো বোন নেই। [তিন জনেই হাসে, লাবণ্য চলে যায়]

প্রণব। আশ্চর্য, জানেন, ফোনে বাড়ির সঙ্গে কথা বলছিলেন, সম্পূর্ণ অন্য মানুষ।

অজিত। বললাম না, ভীষণ secretive। যাবেন নাকি ওর বাড়ি?

প্রণব। গেলে ক্ষেপবে! তবে যাব ঠিক। এ সমাজটা আমার অচেনা—শুধু বইয়ে পড়া। ভাবছি শম্ভু হাজরা লোকটি কে? খুব স্নেহের পাত্র বোঝা যায়। নাঃ, আমার এ চাকরিটা নিতেই হচ্ছে—যত বাজেই হোক।

অজিত। [হেসে] পথে আসুন।

প্রণব ও অজিতের গলা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় টাইপরাইটারের শব্দে। মঞ্চ অন্ধকার হচ্ছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্চ গভীর অন্ধকার। আলো সঞ্জয়ের টেবিলে পড়ল। সঞ্জয় ভীষণ উত্তেজিত। টাই অর্ধেক খোলা। চুল উস্‌কোখুস্‌কো। ফোন বাজল। সঞ্জয় রিসিভার তোলে।

সঞ্জয়। হ্যালো! মুখার্জী স্পিকিং! [লাফিয়ে ওঠে] উঃ, বনি! আমাকে পাগল করে ছাড়বে। এরকম critical সময়ে তুমি এভাবে ডুব দিলে চলবে কী করে? না, না, না। আমি কিছুতেই আর দেরি করতে পারব না। এমন কিছু যে ঘটেনি তা তোমার গলার স্বর শুনেই বোঝা যাচ্ছে। খুব আনন্দে আছ দেখছি। দেখা হলে বলবে? তাহলে এখুনি এসে বলে ফেল। আমি আছি। আমি আর কোথায় যাব—এরকম সময়ে? তুমি এরকম পাগলামি করবে আমি ভাবতে পারিনি। আজ third দিন, বনি। তিন দিন ধরে তুমি উধাও। আর দু'দিন পরে মিস্টার তরফদারের জন্মদিন। Nothing has been done। আমরা যা করার করব—উপায় কী? কিন্তু I shall have to carry you here if you don't come this minute. উঃ বনি, বনি, তুমি কবে থেকে এমন পাগল হলে? তোমাকে এমনটি কখনও দেখিনি—not in all these ten years। কাজ পুরোদমে চলেছে। এখনও favourable বলা চলে। তোমার ব্যাপারে bluff দিয়েছি—complete bluff। বলেছি sudden attack of flu। বাড়িতে যেতে চাইছিল। Imagine! He's terribly interested। একটু sensible হও বনি, চলে এসো। বল তো গাড়ি পাঠিয়ে দিই। তুমি নিজেই আসবে? বেশ। এক্ষুনি চলে এসো। হ্যাঁ, হ্যাঁ এক্ষুনি।—

কথা হচ্ছে। মঞ্চ অন্ধকার হতে থাকে। পুরো অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত সঞ্জয় বোঝাচ্ছে। খটাখট্ টাইপরাইটারের শব্দ।

তৃতীয় দৃশ্য

লাবণ্যের সাদাসিধে ঘর। বিপ্রদাস কী একটা আশঙ্কা করে বার বার দরজার দিকে তাকিয়ে পায়চারি করছে। সুপুরুষ এবং অত্যন্ত সজীব চেহারা। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস। লাবণ্য ঢুকল—একেবারে ঘরোয়া সাজে। এক হাতে প্যাকেট, অন্য হাতে লেফাফা। লাবণ্যর সমস্ত মুখে চাপা বেদনা।

বিপ্রদাস। কী ব্যাপার? অসীম এলো না?

লাবণ্য। [একটু দম নিয়ে] সে আর আসবে না। এই দেখ চিঠি।
বিপ্রদাস। [কুণ্ঠিত] এ চিঠি আমি পড়ব?
লাবণ্য। পড় না, কী এসে যায়?
বিপ্রদাস। [পড়া-শেষে] ও কিছুদিন ধরেই যাব যাব করছিল। বারটা বছর! কী করে মানুষ এত বদলে যায় বুঝে উঠতে পারিনে।
লাবণ্য। ও কথা থাক বিপ্রদাস।
বিপ্রদাস। তুমি ব্যাপারটাকে বড় সহজে মেনে নিচ্ছ, লাবণ্য।
লাবণ্য। না। এসব ব্যাপারে কিছু করতে গেলেই আত্মসম্মানে লাগে। আত্মসম্মানটুকু ছাড়া আমার নিজের সম্পত্তি বলে তো কিছুই নেই।

[প্যাকেট থেকে বাচ্চার কাপড় জামা বার করে রাখে।]

বিপ্রদাস। হুঁ! বারটা বছর—একটা যুগ। তুমি যদি ঐ বাচ্চা ছেলেটাকে না নিতে চাইতে তাহলে হয়তো আরও একটা যুগ অসীম তোমার এখানে যাওয়াআসা করত। অভ্যাস, বুঝলে লাবণ্য! এসব সম্পর্ক একবার অভ্যাসে দাঁড়ালে আর পরিত্রাণ নেই।
লাবণ্য। এখন তো ও ঘোর সংসারী।—বড় মেয়ের বিয়ে দেবে—early marriage! সেদিন কী বলল, জানো? বলল, আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলাম মেয়ের অল্প বয়েসে বিয়ে দিয়ে দেওয়াই ভাল।
বিপ্রদাস। তোমার উচিত ছিল ওকে জোর করে বিয়ে করা—একেবারে গোড়াতেই।
লাবণ্য। না বিপ্রদাস, তার চাইতে এ অনেক ভাল হয়েছে। ওর স্ত্রী বর্তমানে আমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারি না। একমাত্র উপায় ছিল স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করিয়ে নেওয়া—তাও হল না।
বিপ্রদাস। অসীমের আর যাই থাক্—সাহস নেই। ও সামাজিক নিয়মের ব্যতিক্রমটাও সমাজের নিয়মের মধ্যে করতে চায়। তাই ও কেবল তোমায় আশা দিতে পারে, বিয়ে করতে পারে না। এক পক্ষে হয়তো ভালই হয়েছে।
লাবণ্য। তবে এতো করে আমার শেষ চাওয়া চাইলাম ওর কাছে। বললাম, আমি কিছু চাই না—ভালবাসা নয়, আত্মীয়তা নয়—কিছু নয়, কেবল খোকাসোনার adoption-এর দরখাস্তে একবার বলুক যে অসীম আমার স্বামী। মিথ্যে হলেও বলুক—একটিবার!
বিপ্রদাস। বার বছর ধরে যাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিল না—তাকে একটা পালিত ছেলে পর্যন্ত নিতে দিতে ওর আতঙ্ক! আমি এসব বুঝে উঠতে পারি না।
লাবণ্য। [হঠাৎ কী অনুভব করে] কেন এমন হয় বিপ্রদাস! [ক্লান্ত চোখ বুঁজে]
বিপ্রদাস। হুঁ! বারটা বছর ধরে তোমাদের এই পরিণতি আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলাম। তুমি ভেব না লাবণ্য—
লাবণ্য। [সরে গিয়ে গলার স্বর বদলে] শম্ভু, মতির মা, খোকাসোনা, ওরা কোথায়?
বিপ্রদাস। [ঘাব্‌ড়ে] শম্ভু তো—
লাবণ্য। শম্ভু, শম্ভু!

[শম্ভু কুণ্ঠিত পায়ে ঢুকল। তেইশ-চব্বিশ বছরের একটি সরল গ্রাম্য ছেলে।]

শম্ভু। কী বলছ?
লাবণ্য। খোকাসোনা কোথায়?
শম্ভু। [বিপ্রদাসের দিকে ঘাব্‌ড়ে চায়] সে তো, সে তো—

লাবণ্য। কী হয়েছে, কী? ওরকম করছিস কেন?

শম্ভু। আমার তো—

লাবণ্য। মতির মা, খোকাসোনা কোথায়?

শম্ভু। পুলিশ নিয়ে গেছে।

লাবণ্য। [স্তম্ভিত] কী?

শম্ভু। পুলিশ ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছিল।

লাবণ্য। কেন?

শম্ভু। আমাদের পাড়ার ও-সি বললেন, কে যেন রিপোর্ট করে দিয়েছিল যে মতির মা কালিঘাটের মেলা থেকে খোকাসোনাকে চুরি করে এনে তোমায় বেচে দিয়েছে। Investigation করতেই নাকি আস্তে আস্তে সব খবর বেরিয়ে পড়েছে। মতির মা এখন হাজতে। বেচারাকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। খুব কান্নাকাটি করতে করতে গেল।

লাবণ্য। পুলিশ নিয়ে গেল আর তুই একটু আটকালিনে? একটা অসহায় মেয়েমানুষকে আর বাচ্চা ছেলেটাকে ঘর থেকে নিয়ে গেল আর তুই একটা জোয়ানমদ্দ পুরুষমানুষ হয়ে—

শম্ভু। আমি কী করব দিদি! পুলিশের সঙ্গে তো চালাকি নয়।

লাবণ্য। কিন্তু খোকাসোনা আমার। তার guardianship-এর জন্যে আমি দরখাস্ত দিয়েছি।

শম্ভু। ও-সি বললেন তোমার দরখাস্ত নামঞ্জুর হয়েছে।

লাবণ্য। [ছুঁড়ে হাতের জিনিস ফেলে দিয়ে] গোল্লায় যাক সব, গোল্লায় যাক। কী স্বপ্ন দেখলাম আর কী হয়ে গেল।

শম্ভু। পুলিশ বলে দিয়েছে তোমায় একবার থানায় হাজিরা দিতে। খোকাকে পাবার আশা নাকি তোমার নেই।

লাবণ্য। কেন?

শম্ভু। বলে নাকি—

লাবণ্য। কী?

শম্ভু। বলে নাকি খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছে তোমার বিয়ে হয়নি। তাই।

লাবণ্য। কী বললি?

শম্ভু। [সভয়ে পেছিয়ে] পুলিশ বলল যে!

লাবণ্য। [ঠাস্ করে চড় মেরে] পুলিশ বলল, পুলিশ বলল, পুলিশ বলল! খালি বড় বড় কথা! দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছি। যা চলে যা চোখের সামনে থেকে।

শম্ভু। দিদি!

লাবণ্য। [বাষ্পরুদ্ধ গলায়] শম্ভু!

শম্ভু। আমি তো—তুমি আমায়—

লাবণ্য। [কাছে টেনে] তোকে তো আমি কখনও মারিনি শম্ভু! কখনও মেরেছি?

শম্ভু। না।

লাবণ্য। রাগ করিস্‌নে।

শম্ভু। তুমি এবার একটা অন্যভাবে দরখাস্ত কর। ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের কাছে আমি নিজে নিয়ে যাব। অসীমদাকে দিয়ে একটা সই করিয়ে নিতে হবে। তাতে জোর আরও বাড়বে।

লাবণ্য। ওসব করে কিছু হবে না। তোর অসীমদা আর আসবে না! এই দেখ্ চিঠি।

শম্ভু। হতেই পারে না। অসীমদা যে মাটির মানুষ দিদি। [শম্ভুকে চিঠি দিলে সে পড়ে রেখে দেয়]

শম্ভু। অসীমদা আমাকে রাস্তা থেকে তুলে এনে এই বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল, সে কথা আমি ভুলি কী করে?

বিপ্রদাস। শোনো লাবণ্য, আমাকে কিছু অন্তত করতে দাও—একটা যা হোক্ কিছু।

লাবণ্য। তোমার আর এ ব্যাপারে কী করার থাকতে পারে, বিপ্রদাস?

বিপ্রদাস। ধর যদি, ধর যদি আমাকে তুমি—

লাবণ্য। না, না—সে হয় না। আমি এবার সত্যিই পাগল হয়ে যাব।

বিপ্রদাস। একটা offiicial সম্পর্ক বই তো নয়—তাতে হয়তো খোকাসোনাকে পেতে সুবিধে হবে।

লাবণ্য। জীবনে আর জটিলতা বাড়িয়ে লাভ কী?

বিপ্রদাস। তা বটে! জীবনের সবক্ষেত্রেই যারা সেকেন্ড হয়ে যায় তাদের এমনি হয়! [শ্লেষের হাসি] এই ধর না, আমার অভিনেতা জীবন। যেই নায়ক হব হব করছি আর একজন এসে কী জানি কিসের জোরে আমাকে হটিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল। প্রেমের ব্যাপারেও তাই। বার বার সেকেন্ড! এখন তুমি বলছ, এমন কি একটু পরোপকার করবার অধিকারও আমার নেই।

লাবণ্য। আঃ, কেন বার বার একই কথা বলছ? এতো সিভিল ওয়ার হয়ে নয় যে মিটিয়ে ফেলবে—নতুন জীবন তৈরি হবে। এ যে একটা নাটকের শেষ অঙ্ক।

বিপ্রদাস। [হঠাৎ] দূর্ ছাতা! এসব ঝামেলায় আর জড়াচ্ছিনে। আমারই ভুল, বুঝলে লাবণ্য! মনটাকে এমন সবাইর সঙ্গে জড়িয়ে ফেলি! আমার বাপু ঐ রেসের মাঠই ভাল।

লাবণ্য। সেই ভাল!

বিপ্রদাস। [দারুণ শ্লেষের সঙ্গে] কোথায় শনিবার ট্রিব্‌ল্ টোট্ জিতে চুর্‌চুর্ হয়ে রোব্‌বার কাটাব, তা না, এক সম্ভ্রান্ত মহিলার দুঃখে মনকে কাঁদতে দেওয়া! বেকারের জীবনে রেসের ময়দান আর ঘোড়া—সব চাইতে বড় বন্ধু।

শম্ভু। তার চাইতে আসুন না, মতির মাকে ছাড়িয়ে আনিগে।

বিপ্রদাস। তাই চল। এই শনিবার-টু-শনিবারের মাঝখানে একটু activity খুঁজে খুঁজে তো পাগল হলুম বাপু। একটু কাজ করবার অধিকারও থাকবে না আমার মত মানুষের! তুমি একবার বলে দেখ—ঠিক খোকাসোনাকে পাবার একটা উপায় আমি বার করবই।

লাবণ্য। এই তিনদিন ধরে কম চেষ্টা করিনি। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিজে গেছি। দরখাস্ত করতে বলেছেন, করেছি। আমি বিবাহিতা কিনা কথাটা জিজ্ঞেস করেননি। কিন্তু পরে যখন বুঝলাম উনি ধরেই নিয়েছেন আমি বিবাহিতা, তখন অসীমের হাতে পায়ে ধরেছি। ফল হয়নি। খোঁজ নিয়ে দরখাস্ত না-মঞ্জুর করা হয়েছে। আর কী করার থাকতে পারে?

বিপ্রদাস। কিন্তু উকীল ব্যারিস্টার লাগিয়ে শেষ চেষ্টা করতে দোষ কী?

লাবণ্য। না।

বিপ্রদাস। কেন?

লাবণ্য। আমার আত্মসম্মান!

বিপ্রদাস। [নিশ্বাস ফেলে হতাশভাবে] তোমাদের মেয়েদের মন বোঝা ভগবানেরও অসাধ্য। এ ক'দিন তো প্রায় পাগল হয়ে রইলে খোকাসোনার জন্য।

লাবণ্য। হ্যাঁ, পাগল হয়ে তো বারটা বছর কাটিয়েছি।

শম্ভু। দিদি, আমার আপিসের বেলা হল, কী করব?

লাবণ্য। তুই যা। শুধু শুধু কামাই করবি কেন? আমিও আজ আপিস যাব। নয়তো বিদায় করে দেবে।

বিপ্রদাস। আর আমি করবটা কি?

লাবণ্য। তোমার বন্ধু অসীমের মেয়ের বিয়ের বাজার করবে। তাছাড়া এক-আধটা পরোপকার। শনিবার এসে গেলে মাঠে যাবে—ব্যস্।

বিপ্রদাস। সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না!

লাবণ্য। তাহলে এক কাজ কর—একটা চাকরী নাও সংসার পাত।

বিপ্রদাস। [শ্লেষের হাসি] চাকরী?—আবার সংসার! ব্যস্, ব্যস্—আর কী চাই?—বিপ্রদাস রায় সেকেন্ড হয়ে যায় বলে ঠিক হেরে যায় না।—ওসব মামুলি উপদেশ দেবার চাইতে বল না—ঘোড়ার পেছনে নিজেকে বাজি ধরে কারুর গোলাম হয়ে যেতে! [হন্তদন্ত হয়ে সঞ্জয় ঢুকল]

সঞ্জয়। বনি!

[সকলে চম্‌কে উঠল]

লাবণ্য। সঞ্জয়, তুমি?

সঞ্জয়। না এসে উপায় কি? তোমার তো কাণ্ডজ্ঞান সব লোপ পেয়েছে দেখছি। এখন এমন সময়ও নেই যে তোমাকে কেউ replace করে। You must abide by certain rules। Too bad, too bad!

বিপ্রদাস। লাবণ্য, আমি চললাম। মতির মাকে বেলে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থাটা করে ফেলিগে।

শম্ভু। দিদি, আমিও বিপুদার সঙ্গে যাচ্ছি।

লাবণ্য। আচ্ছা। [বিপ্রদাস ও শম্ভু চলে গেল]

সঞ্জয়। এরা বুঝি তোমার আত্মীয়?

লাবণ্য। না। যে বয়স্ক সে আমার বন্ধু। অল্পবয়সী ছেলেটি কলকাতায় stranded হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বছর পাঁচেক হল আমার আশ্রয়ে আছে।

সঞ্জয়। [চারিদিক দেখে] Very simple living তোমার। কিন্তু আমার আর এক মুহূর্ত দেরী করার অবস্থা নেই। এখুনি আমার সঙ্গে তোমাকে আসতে হবে।

লাবণ্য। আমাকে আর একঘণ্টা সময় দাও।

সঞ্জয়। কিন্তু বণি, this can't go on for ever!

লাবণ্য। কথা দিচ্ছি। গাড়ি পাঠিয়ে দিও। আমি একঘণ্টা একটু বিশ্রাম নেব। ক'দিন বড় পরিশ্রম গেছে।

সঞ্জয়। হুঁ, একটু কাহিল দেখাচ্ছে। আমার জিজ্ঞেস করা উচিত নয়, কিন্তু I hope you're free from all your personal troubles।

লাবণ্য। Absolutely!

সঞ্জয়। বাঁচালে। আমি তো ভাবছিলাম তুমি বুঝি আর এলে না। খুব ভয় হয়েছিল। আমার বলা উচিত নয়—কিন্তু ব্যক্তিগত emotionগুলোকে অত stormy হতে দেওয়া উচিত নয়। কিছু মনে করলে?

লাবণ্য। না।

সঞ্জয়। [ব্যস্ত হয়ে উঠে] ঠিক একঘণ্টা পরে গাড়ি পাঠাব। কথার নড়চড় না হয়। মিস্টার তরফদার খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আচ্ছা চলি। তোমার বাড়িটা পেতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। Personal file-এ ভাগ্যিস্ ভুল ঠিকানা রাখনি। চলি!

[সঞ্জয় সস্নেহ একটা ভঙ্গি করে হেসে বেরিয়ে গেল।]

লাবণ্য। এক ঘণ্টা সময়!

[লাবণ্য সঞ্জয়ের চলে যাবার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে। ফিরে এসে কী ভাবে। বিষন্নতা। গ্রামোফোনে সাইগলের 'বাবুল মেরা' গানটি বাজায়। একটু অস্থির। মিসেস মলিনা তরফদার ঢুকে চেয়ে থাকেন। গান শেষ হবার আগেই কথা বলেন।]

মলিনা। আপনি লাবণ্য বোস?

লাবণ্য। [ভীষণ চম্‌কে] হ্যাঁ। আপনি কে?

মলিনা। আমি মলিনা তরফ্‌দার। যে মিস্টার তরফদার আপনাদের আপিসে যান তিনি আমার স্বামী। আমার ছেলে শান্তনু তো আপনার কথা বলতে অজ্ঞান। আমার স্বামী—

লাবণ্য। কিন্তু আপনি আমার ঠিকানা পেলেন কি করে?

মলিনা। আমার স্বামী যেসব মেয়েদের পেছনে ঘোরেন আমি তাদের সকলেরই ঠিকানা বার করে ফেলি।

লাবণ্য। কিন্তু আপনার স্বামী আমার ঠিকানা জানেন না।

মলিনা। সঞ্জয় মুখার্জী তো জানেন।

লাবণ্য। কিন্তু সঞ্জয়—

মলিনা। ও'কে follow করে এলাম। উনি আপিসের সামনে কাকে বললেন যে লাবণ্য বোসের বাড়ি যাচ্ছেন। দেখলাম এই সুযোগ। পিছু নিয়ে এসে অপেক্ষা করে রইলাম ঐ গলির মোড়ে। এ আর শক্ত কী? কত remote ঠিকানা বার করেছি!

লাবণ্য। আমার সঙ্গে আপনার কী দরকার? আমি এখুনি বেরিয়ে যাব।

মলিনা। আপনি আমার স্বামীকে ছেড়ে দিন। [লাবণ্যর হাত চেপে ধরে]

লাবণ্য। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। [হাত ছাড়ায়]

মলিনা। আপনি ঠিকই বুঝেছেন। দেখুন, আমি—আমি ভয়ানক অসুস্থ। আমার যখন কম বয়েস ছিল তখন লোকে আমায় সুন্দরী বলত। আজ আমার স্বামী আপনাদের মত দুরন্ত মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান কেন না আমি অসুস্থ—আমার রূপ ঝল্‌সে গেছে। আপনাকে আমি অনুরোধ করছি—আপনি—[হাঁপাতে থাকেন]

লাবণ্য। আপনার স্বামীর সঙ্গে আমার ব্যবসার সম্পর্ক। ব্যক্তিগত কোনো সম্পর্ক নেই।

মলিনা। কিন্তু উনি ঠিক একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলবেন।

লাবণ্য। আমি আপনার স্বামীকে প্রায় চিনিই না। দেখুন, ব্যবসাটা অনেকটা দাবা খেলার মত। আমি সেই দাবার একটি বোড়ে মাত্র।

মলিনা। মন্ত্রী।—ও'র মেয়ে বন্ধুরা সবাই মন্ত্রী!

লাবণ্য। আপনাকে কী করে বোঝাই?

মলিনা। আমি বুঝব না, বুঝব না, বুঝব না! [কাঁদতে আরম্ভ করেন]

[শান্তনু একটু কুণ্ঠার সঙ্গে ঢোকে]

শান্তনু। মা, এত দেরি করছ কেন? গাড়িতে কতক্ষণ বসে থাকা যায়? বাবা জানতে পারলে অশান্তির একশেষ হবে। মিস্ বোস্, আপনি খুব রাগ করেছেন তো? কিন্তু কী করব, মার এত ইচ্ছে একবার আপনাকে দেখার। অথচ আপনি আপিসে যাচ্ছেন না। বাবা তো—

মলিনা। চল্ শানু, হাতটা ধর্।

শান্তনু। [ধরে তুলে] মা, তুমি মিস বোসকে কিছু এলোমেলো বলে ফেলনি তো?

লাবণ্য। না, না, আমরা আলাপ করছিলাম।

মলিনা। তাহলে চলি। কথাটা মনে রাখবেন।

লাবণ্য। নমস্কার।

[শান্তনু ও মলিনা প্রতিনমস্কার করে বেরিয়ে যেতে না যেতে শান্তনু ফিরে আসে।]

শান্তনু। মা যদি অপমানকর কিছু বলে থাকেন আমি ক্ষমা চাইছি। উনি বেশিদিন বাঁচবেন না।

লাবণ্য। আমি সবই বুঝি শান্তনু!

শান্তনু। ধন্যবাদ! Thank you, Miss Bose!

[লাবণ্যর হাতটা চেপে ধরে শান্তনু বেরিয়ে চলে যায়। লাবণ্য চিঠিটা একবার তুলে নেয়। চোখ বোলায়। চুল খুলে বাঁধার চেষ্টা করছে। অন্যমনস্ক। খোলা দরজার সামনে কুণ্ঠিত অজিত ও প্রণবকে দেখা গেল।]

অজিত। আসব?

লাবণ্য। [অবাক] আসুন। আজ ব্যাপারটা কি? মনে হচ্ছে আমার মৃত্যুসংবাদে সব ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসছেন। এই তো সঞ্চয় গেল।

অজিত। না, না। একটা যোগাযোগ। মিস্টার মুখার্জী আপনার personal fileটা চাইলেন। বললেন, নিজে আসবেন একবার, তার জন্যে ঠিকানাটা চাই। ফাইলটা আনার সময় ঠিকানাটা দেখে নিলাম। অনেকদিন আপিস যাননি। তাই ভাবলাম—হয়তো অসুস্থ কিম্বা—

প্রণব। আমি কিন্তু নেহাৎই কৌতূহল মেটাবার জন্যে এসেছি।

লাবণ্য। সত্যি কথা বলবার জন্যে ধন্যবাদ। অজিতবাবু ব্যবসার জগতে দু'দিন মিশেই মিথ্যে কথাটা বেশ রপ্ত করেছেন।

অজিত। আপনি বড্ড রেগে আছেন দেখছি।

লাবণ্য। [নার্ভাস হাসি] আরে না, না। ঐ চিঠিটা পড়বেন? খুব পরিপূর্ণ একটি ট্র্যাজেডি। আপনাদের বাঙালী পান্সে চোখে জল আসবে। [অজিতকে চিঠি দিলে ওরা পড়ে]

অজিত। কিছু বুঝলাম না।

প্রণব। অসীম বলে কেউ কাউকে শেষ চিঠি দিয়েছেন বুঝছি। কিন্তু খোকাসোনাটা কে?

লাবণ্য। বলছি। সিগারেট আছে? বাড়িতে রাখি না। আপিসে এত খাই যে আর ইচ্ছে করে না।

[অজিত সিগারেট দিলে লাবণ্য কম্পিত হাতে ধরায়।]

অজিত। আপনার শরীর ভাল নেই।

লাবণ্য। ভাল থাকার কোনো কারণ দেখছি না। তিনদিন ধরে একটা ছোটখাট প্রলয় হয়ে গেল। আপনারা হয়তো কৌতূহলে ফেটে পড়ছেন। অসীম কে, জানেন? এক কথায় বলা শক্ত।

প্রণব। আজ না-ই বা বললেন ওসব কথা। আর একদিন শুনব।

লাবণ্য। না, না আজই বলব। এতদিন নিজের এই হৃদয়ের গণ্ডূষে সব কিছু ধরে রেখে-ছিলাম। জীবনটাকে দুটো compartment-এ ভাগ করে নিয়ে ভেবেছিলাম দারুণ একটা achievement হয়েছে আমার। প্রণববাবু, আপনি হয়তো ভাল বুঝবেন—নিজেকে কখনও দু'জন মানুষ হিসেবে দেখেছেন?

প্রণব। খানিকটা তো সবাইকেই দু'জন হতে হয়।

লাবণ্য। আমার বাবা ছিলেন ধনী—খুবই ধনী। তাঁর সমাজ আমার ভাল লাগেনি। চারি-দিকে তখন নতুনের সাড়া। সিকিউরিটির চাইতে প্রেম বড়। প্রেমের চাইতে দেশ বড়। সত্যিকথা বলতে কী আমার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে একটুও বেগ পেতে হয়নি। মনটা তখন উৎসাহে, আদর্শে—ডগমগ। [হঠাৎ] আপনাদের আপিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

অজিত। [ঘড়ি দেখে] এখনও আধঘণ্টা সময় আছে। বলুন।

লাবণ্য। হ্যাঁ, এই যে অসীমের চিঠি দেখছেন, সেই অসীম আজ থেকে এক যুগ আগে আমায় ভালবাসল। ও ছিল বিবাহিত। দুটি বাচ্চাও ছিল। স্ত্রীর সঙ্গে মনের মিল হয়নি তাই আমার মনের নাগাল পেতে এল। আমায় আশা দিল দেশে বিবাহবিচ্ছেদ আইন পাশ হলে বিয়ে করবে। অপেক্ষায় রইলাম।

প্রণব। দায়িত্ব একা অসীমের নয়। আপনিও তো দায়ী। আপনি মেনে নিলেন কেন?

লাবণ্য। সত্যি কথাই। মেয়েরা স্বাধীন হয়েছে। তাই ছেলেরা আজকাল আর রক্ষিতা রাখে না। একত্র বাস করে। আমাকে কাজ নিতে হল। বাসাও ভাড়া নিলাম। আপিসে এমন একটা পোস্ট আমায় দেওয়া হল যেখানে আমার বাবার সমাজের মূল্যবোধগুলো ফিরে এসে ডবল জোরে আমায় চেপে ধরল। সেই artificial হাসি, সেই রঙ্ মেখে সঙ্ সাজবার চেষ্টা—সেই সমস্ত! যেটা চাইনি বলে বাড়ি ছেড়েছিলাম—সেটাই আমার মস্ত qualification হয়ে দাঁড়াল। আমি দুটো compartment করে নিলাম। অসীমের compartment-এ আমি রয়ে গেলাম লাবণ্য। সঞ্জয়ের compartment-এ আমি হলাম বনি!

প্রণব। সবাইকেই তো জীবনে কিছু না কিছু compromise করতেই হয়। আপনি অত bitter হচ্ছেন কেন?

লাবণ্য। নাঃ, bitter হবার ক্ষমতা থাকলে তো কথাই ছিল না। [হঠাৎ] দেশলাইটা দেখি।

[অজিত দেশলাই দেয়। লাবণ্য সিগারেটটা আবার ভাল করে ধরায়।]

অজিত। আপনি একটু বিশ্রাম নিলে পারতেন। এখুনি তো বেরুতে হবে।

লাবণ্য। বিশ্রাম আমার দরকার নেই। এখন compartment দুটো ভেঙে এক করে দিতে হবে না? অসীম মানুষটা, জানেন, খুব নরম। অনেকটা বাঙ্‌লা দেশের মাটির মত। সইতে জানত, সবই জানত, কেবল লড়তে জানত না। এই দেখুন, এমন করে

কথা বলছি যেন অসীম মারা গেছে। ওর বৌ শুনলে কালিঘাটে ছুটবে।

প্রণব। বিবাহ বিচ্ছেদ আইন তো পাশ হয়েছিল। ডাইভোর্স নিলেই ল্যাঠা চুকে যেত।

লাবণ্য। আইন তো কতই হয়েছে, প্রণববাবু, ভাল ভাল আইন। কিন্তু সেগুলো কে কার্য-করী করবে? ভালবাসা বড়, না security বড়? আপনি বলবেন ভালবাসা। আমিও বলব ভালবাসা। কিন্তু ভালবাসা আমরা হারিয়ে ফেলব। কেন? আর তাছাড়া আমাদের মত সব সম্ভ্রান্ত পরিবারের পক্ষে কোর্টঘর করা কী বিশ্রী ব্যাপার, বলুন। তাইতে জানেন, অসীম আশা করে বসে রইল ওর বউ মরলে আমায় বিয়ে করবে। বউ মরল না। উল্টে ছেলেমেয়েগুলো বড় হতে লাগল। তাদের চাহিদা বাড়ল। মেয়েটির প্রতি ওর পিতৃস্নেহ উথ্‌লে উঠল। স্নেহ আর প্রেমের টানাপড়েনে আমি হেরে গেলাম। ওর অভ্যস্ত রুটিনে পড়ে যেতে লাগলাম।

অজিত। এখন কী এমন ঘটনা ঘটল যে উনি এই চিঠি দিলেন?

লাবণ্য। বলছি। তিনদিন আগে একটি বাচ্চাছেলেকে কুড়িয়ে এনে আমার ঠিকে ঝি আমাকে দিয়ে যায়। বাচ্চার মা ভীড়ের চাপে মরে যাওয়ায় তার গ্রামের লোক তাকে মা-কালির মন্দিরের দরজায় বসিয়ে রেখে চলে যায়। সেই বাচ্চাকে আইনত adopt করতে গিয়েই বিরোধটা ফেটে বেরিয়ে পড়ল।

প্রণব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই তো, আমিই ফোন ধরেছিলাম। সেদিনই আপনার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল হল। সেই ছেলেটাই তাহলে এই চিঠির খোকাসোনা?

লাবণ্য। হ্যাঁ। বাড়ি এসে কী দেখলাম জানেন? এত বড় বড় চোখওয়ালা এক নতুন পৃথিবী। মাত্র দু'বছরের প্রাণ কেড়ে নেওয়া একটা ছেলে—আমার দিকে পরম বিশ্বাসে চেয়ে আছে। ওর চোখের দিকে চেয়ে বুঝলাম—বিশ্বাস জিনিসটা কী ভয়ানক সুন্দর। অসীমের একটা সই পেলে ছেলেটা আমার হত। কিন্তু অসীম জীবনে এই একটি মহৎ মিথ্যে কথা বলতে পারল না।

অজিত। ভদ্রলোক ভয় পেয়ে গেলেন বুঝি?

লাবণ্য। হ্যাঁ, ভয় বলে ভয়—একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল। এই বার বছরে ওর মনটা গুটিয়ে এমন হয়ে উঠেছিল যে মুহূর্তের জন্যে সত্যিকারের একটা সত্য স্বীকার প্রায় ভূত দেখার মত ভয়াবহ মনে করেছিল।

অজিত। কিন্তু ভালই হয়েছে বলতে হবে। অন্ততপক্ষে আপনি মুক্তি পেয়েছেন।

লাবণ্য। মুক্তি, একেবারে মুক্তি!

প্রণব। কিন্তু খোকাসোনাকে পাবার কোনো উপায় কি নেই? যদি কোনোরকমে সাহায্য দরকার হয়—

লাবণ্য। না। কোনো সাহায্যই কাজে আসবে না। ও আলোচনা থাক্‌।

প্রণব। কিন্তু—

লাবণ্য। [একেবারে অন্য স্বরে] যার জন্যে এসেছিলেন জেনে গেলেন—এবার যান। personal হবার চেষ্টা করবেন না।

অজিত। আমরা অপেক্ষা করছি। আপনি তৈরী হয়ে আসুন।

লাবণ্য। আমার এখন একটাই compartment।

[লাবণ্য একটু এলোমেলোভাবে ভেতরে চলে গেল। অজিত অস্থির। পায়চারি করছে। প্রণব দেখছে]

প্রণব। আপনি খুব বিচলিত হয়েছেন দেখছি।

অজিত। ভদ্রমহিলা এবার একেবারে desperate হবেন মনে হচ্ছে। আমাদের যে এত সব গোপন কথা এভাবে বললেন—এটাই তো প্রমাণ করছে উনি কতটা উতলা হয়েছেন। কিছু করা যায় না?

প্রণব। করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে।

অজিত। ঐ বাচ্চাটাকে পাইয়ে দেবার ব্যাপারেও কিছু করা যায় না?

প্রণব। না। একমাত্র বিয়ে করা যায়। সে সাহস কি আপনার হবে?

অজিত। সে কি কথা! আমার বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না। তার ওপর উনি আমার চাইতে বয়েসে ঢের বড়।

প্রণব। এই নজর নিয়ে আপনি ঐ মেয়েকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন? ওর অভিজ্ঞতার পরিমাপটা ভেবে দেখুন।

অজিত। বাঃ, extreme একটা কিছু না করে ফেলতে পারলেই বুঝি আর সাহায্য করার কথা বলা যায় না? তাছাড়া সব জিনিসেরই একটা সীমারেখা আছে।

প্রণব। তাতো আছেই। আসলে আমাদের সবই সীমাবদ্ধ—এমন কি মেয়েরা কতবড় চুল রাখবে, কতখানি নীচু করে শাড়ি পরবে—সেটা পর্যন্ত। সীমাবদ্ধ প্রেম, সীমাবদ্ধ বিয়ে। মাপতে মাপতে এখন এমন হয়েছে যে নিজের স্বার্থের গণ্ডিটাকেই বৃহত্তর বলে চালিয়ে দিচ্ছি। এটা বোধ হয় গুছিয়ে নেবার যুগ।

অজিত। কোনো কিছুর সীমারেখা টানা সত্যিই বড় শক্ত।

প্রণব। শক্ত বলে শক্ত। এই ধরুন না, বিদ্যাসাগর মশাই কী তুমুল কাণ্ড করে একশ বছর আগে বিধবা-বিবাহ আইন চালু করলেন। এদেশের ছেলেরা বিধবাদের সঙ্গে কিছু অবৈধ প্রেম করল বটে কিন্তু বিয়ে প্রায় করলই না। ওতে অসুবিধে অনেক। আরে বাবা, পণ নিয়ে যদি আমাদের এখনকার প্রগতিশীলেরাও সুন্দরী কুমারী মেয়ে পেয়ে যায় তবে ছি ছি—বিধবা কেন?

অজিত। সত্যি কথা বলতে কী, মাঝে মাঝে মনে হয় কিছু একটা করে বসি। কিন্তু ভাবতে বসলেই সব গুলিয়ে যায়। কী করতে পারি আমি? এক অ্যাটম্ বোমার কথা ভাবলেই তো এখনও কেন বেঁচে আছি ভাবতে অবাক লাগে। আর দেশের কথা যদি বলেন—এই তো দেখছেন! কোনো কিছুর মধ্যে কোনো মানে খুঁজে পাই না।

প্রণব। এটাই আমাদের এ যুগের সবচাইতে বড় বেদনা। সব কিছু কোথায় যেন ঠেকে যাচ্ছে—বদলগুলো যেন নেহাতই মামুলি।

অজিত। আপনি এইসব নিয়ে একটা জমিয়ে কবিতা লিখুন না—অনেকদিন ভাল কবিতা পড়িনি।

প্রণব। নাঃ, কবিতা এখন আমার হবে না। এ রকম পা বেঁধে ঝোলানো অবস্থার মধ্যে অন্তত আমার হাত থেকে কবিতা বেরুবে না। বিশেষ করে আজ এমন একটা অক্ষমতার বেদনায় নিজেকে কাপুরুষ মনে হচ্ছে।

অজিত। এটাই তো চমৎকার একটা কবিতার বিষয় হতে পারে।

প্রণব। না। কবিতা আমি লিখব না। আমি সাংবাদিক নই যে খবরের গন্ধে লেখনী চঞ্চল হবে।

[বিপ্রদাস ও শম্ভু এল। থমকে দাঁড়াল।]

বিপ্রদাস। লাবণ্য কোথায় গেল দেখ তো, শম্ভু।

শম্ভু। এ'রা—?

অজিত। আমরা ওঁর অফিসে কাজ করি। উনি কাপড় বদলাতে গেছেন, তাই অপেক্ষা করছি।

বিপ্রদাস। অ! আজকের দিনটা আপিসে না গেলেই ভাল হত। ওঁর শরীর, মন, কিছুই ভাল নেই।

শম্ভু। বারণ কর না বিপুদা, তুমি বললে হয়তো শুনবে।

বিপ্রদাস। দেখি, অন্যভাবে আশাটাশা দিয়ে যদি—

প্রণব। আজ না গেলে ও'র চাকরী নিয়ে টানাটানি হতে পারে।

শম্ভু। অন্য চাকরী খ'ুজে নেবেন। ততদিন কী আর আমি চালাতে পারব না। কত অন্ন হজম করেছি, শোধ করা তো দরকার।

বিপ্রদাস। চাকরী, চাকরী, হ'ু!

[লাবণ্য একটু অতিরিক্ত সেজে ঢুকল। সকলে উঠে দাঁড়ায়।]

লাবণ্য। তরফদারের ব্যবসার deal-এর মন্ত্রী। কেমন মানিয়েছে?

শম্ভু। দিদি, বিপুদা কিছু বলতে এসেছে। আমরা মতির মাকে হাজত থেকে ছাড়িয়ে এনেছি।

লাবণ্য। ও! মতির মাকে এই টাকাটা দিস। আর তুই এই নে, বাজারখরচ বাবদ কিছু রাখ্। যদি না ফিরি—

শম্ভু। দিদি, কি যে বল! [লাবণ্য টাকা দিল]

বিপ্রদাস। লাবণ্য, আজ আপিসে না-ই বা গেলে। দরখাস্ত হবে। লড়লে আশা আছে। পুলিশবিভাগে চেনা বার করে ফেলব। তারপর—

লাবণ্য। ওসবের মধ্যে আমি আর যাব না।

বিপ্রদাস। কিন্তু লাবণ্য—খোকাসোনা?

লাবণ্য। পথ ছাড়, বিপ্রদাস। ও বড় পুরোনো পন্থা।

বিপ্রদাস। কিন্তু তোমাকে তো একটা কিছু নিয়ে বাঁচতে হবে।

লাবণ্য। দেখি!

[অজিত ও প্রণব বেরিয়ে গেল]

বিপ্রদাস। কখন ফিরবে লাবণ্য?

শম্ভু। আমি গিয়ে নিয়ে আসব?

লাবণ্য। না। আমি এখন পুরোপুরি সঞ্চয়ের প্রচারগৃহের মৌ-চাকরাণী। তোমাদের এ বাসা, এ compartment—আর না।

বিপ্রদাস। কিন্তু দশ বছরের ওপর তুমি এখানে আছ। শুধু আপিস নিয়ে তুমি বাঁচবে কী করে?

লাবণ্য। আমি ঠিক চালিয়ে যাব। বণি বোস—jazz music-এর মত হয়ে যাবে। Loud কিন্তু lonely। একেবারে উচ্চগ্রামে চড়া রঙে টং হয়ে থাকব।

শম্ভু। দিদি, আমরা কী অপরাধ করেছি?

লাবণ্য। এ কি রে, কাঁদবি নাকি? মরতে তো যাচ্ছিনে।

বিপ্রদাস। লাবণ্য, মাথাগরম করে কিছু করে বোসো না। রেসে যাই, মদ্ খাই, বেকার—

unsuccessful—কিন্তু মরিনি! যদি বল, লাবণ্য—এসব ছেড়ে দিয়ে একবার [লাবণ্যর হাত ধরে]

লাবণ্য। [হাত আস্তে ছাড়িয়ে] চললাম। শম্ভু, চললাম। [ঘরটা দেখে] চলি, চলি, চলি! [লাবণ্য বেরিয়ে গেল]

বিপ্রদাস। [হঠাৎ ছাইদানীটা আছ্‌ড়ে ফেলে] দুনিয়াটাকে এমনি আছ্‌ড়ে ফেলতে পারতাম!

শম্ভু। কিন্তু তার জন্যে ক্ষমতা চাই।

বিপ্রদাস। ক্ষমতা কী করে পাওয়া যায় বলতে পারিস, শম্ভু?

শম্ভু। অন্তত রেসের মাঠে পাওয়া যায় না।

বিপ্রদাস। রেসের মাঠ, রেসের মাঠ!

শম্ভু। আমায় আপিস যেতে হবে।

[শম্ভু বেরিয়ে যায়]

বিপ্রদাস। আমি কোথায় যাই? একটা জ্বলজ্যান্ত পুরুষমানুষ আমি?

মঞ্চ অন্ধকার হল

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তরফদারের জন্মদিনের পার্টি। অফিস-ঘরের পার্টিশান সরিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। পঞ্চাশটি বাতি জ্বালানো কেকের চারধারে অভ্যাগতের ভীড়। লাবণ্য, লায়লা ইত্যাদি Happy Birthday গানটি গাইছে। তরফদারের হাতে কেক-কাটা-ছুরি। সঞ্জয়েরা সকলে উপস্থিত। সেলিম ও অন্যান্য বেয়ারার দল মদ ইত্যাদি এগিয়ে দিচ্ছে। ঘর অন্ধকার।

লাবণ্য। [গান শেষ করে] Happy birthday!

সকলে। Happy birthday! . . blow, blow! ফুঁ দিন!

[ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠল। ক্যামেরাম্যান ছবি তুলছে। তরফদার ফুঁ দিয়ে বাতি নেভালেন। অন্যরা সাহায্য করছে। আলো নিভতেই হাসির রোল।]

লায়লা। Now all girls must kiss the lucky man।

[আলো জ্বলে উঠল। মেয়েরা তরফদারকে ঘিরে হাততালি দিয়ে ওঠে।]

মিঃ তরফদার। [চুল ঠিক করতে করতে] Thank you, thank you, my dears।

লাবণ্য। [একটি ছেলেকে] Music, something nice!

[ছেলেটি রেকর্ড-প্লেয়ারে টুইস্ট জাতীয় বাজনা দিতেই নাচ। লাবণ্যরা বাদে। একধারে প্রণব ও অজিত।]

অজিত। কেমন লাগছে?

প্রণব। ভৌতিক কিছু দেখছি মনে হচ্ছে। অন্য যেসব মদের আড্ডা দেখেছি তাদের আসল উদ্দেশ্য হল মদ খাওয়া। এদের উদ্দেশ্য একজন বিশেষ লোককে খুশি করা। সেই সূত্রে বেলেল্লাপনা। ভাল লাগছে না।

অজিত। মিঃ তরফদার দিব্বি আছেন! কতগুলো মেয়ে ওঁকে ঘিরে ধরেছিল ভেবে দেখুন!

প্রণব। আলো নেভানোর সময় কোথায় ছিলেন?

অজিত। সে আর বলবেন না। একবারে খপ্পরে। আপনি ক' পেগ খেলেন?

প্রণব। বেশী খেতে সাহস হচ্ছে না, অভ্যেস নেই তো। [সিগারেট ধরায় দু'জনে] আপনি?

অজিত। বেশ ক'টা।

[লাবণ্য যোগ দিল।]

লাবণ্য। কী sectarian, দল পাকানো হচ্ছে—এখানেও?

প্রণব। না। অজিতবাবু জিজ্ঞেস করছিলেন ক'টা খেয়েছি।

লাবণ্য। আপনি তো practically ছোঁননি দেখছি। মিস্টার সেন, ক'টা খেলেন?

অজিত। বেশ কয়েকটা। তবে আমার নেশা হয় না, জানেন?

লাবণ্য। ওঃ হোঃ—একেবারে [ভেঙিয়ে] 'চুণীবাবু, মদ খাই কিন্তু নেশা হয় না'—দেবদাস নাকি?

অজিত। এ পর্যন্ত কেউ নেশা ধরাতে পারেনি। আমার ego ভয়ানক সচেতন কিনা।

লাবণ্য। Really! [গলা তুলে] লায়লা! এদিকে এসো। Get this young man a few mixies, এ নাকি দেবদাস—নেশা হয় না।

[লায়লা এল। খুব দুরন্ত।]

লায়লা। আসুন, দেবদাস! Oh, come, come!

[অজিতকে ধরে নিয়ে লায়লা চলে গেল।]

প্রণব। শুনুন মিস বোস, একটা কথা ছিল।

লাবণ্য। Serious কিছু? এখন তার মেজাজ নেই। তাছাড়া—I must attend Mr. Tarafdar.

প্রণব। আমাকে যেভাবে publicise করা হচ্ছে আমি কিন্তু তার সিকির সিকি পাবার যোগ্য নই। আমি যে কবিতা লিখি এবং কবি এ কথাটা এ তিন চার দিনে যতবার শুনেছি সারা জীবনে ততবার শুনেছি কিনা সন্দেহ। আমার এসব ভাল লাগছে না।

লাবণ্য। বাঃ, আমার তো খুব ভাল লাগছে। Publicity অনেকটা রূপকথার মত—make-belief and repetition punched together, আসলে সবই তো ভুলতে চাওয়ার জন্যে করা। নাম হলে আপনার অসুবিধেটা কি?

প্রণব। অসুবিধে নিজের কাছে। নাম হবার মত কিছু লিখে নাম হলে আমার আপত্তি ছিল না।

[সঞ্জয় এসে যোগ দিল।]

সঞ্জয়। দু'জনে কী এত profound আলোচনা হচ্ছে?

লাবণ্য। প্রণবের publicity ভাল লাগছে না। ভেবে দেখো! Something to talk about।

সঞ্জয়। Romantic! আজকাল publicity ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। এই অখ্যাত কবি প্রণব—এই boom—বিখ্যাত হয়ে গেল। Publicity জিনিসটা অনেকটা ম্যাজিকের মত।

লাবণ্য। মিস্টার তরফদার একটু tipsy হয়েছেন না?

সঞ্জয়। বিলক্ষণ। বনি, আজ রাত্তিরেই ঐ orderটা মিস্টার তরফদারকে দিয়ে সই করিয়ে নেবে। কিছুতেই fail কোরো না। কাল Milton & Sen থেকে ব্যানার্জী চলে

আসছে—কাজেই ওটা added force হচ্ছে। মিস্টার মৈত্র, আপনাকে আর একটা speech লিখে দিতে হবে। তাতে একটা ছোট কবিতা থাকে যেন। মিস্টার তরফদারের অনেক দিনের সখ—ছাপার অক্ষরে লেখা বেরোয়। আমি ও'র সখটা মিটিয়ে দেব। ভালো রেট পাবেন।

লাবণ্য। ওকে আগে একটা ড্রিঙ্ক দাও। বেচারা যেন একটু out of gear হয়ে পড়েছে।

প্রণব। না, না, আমি বরং বাড়ি যাই। Speechটা লিখে দেব'খন, কবিতা পারব না।

লাবণ্য। [গলা তুলে] Boys and Girls, এখানে এসো, কবি প্রণব মৈত্র স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করবেন।

প্রণব। না, না, না।

সকলে। কবিতা পাঠ, কবিতা পাঠ হোক!

অজিত। [একটু নেশা] রবীন্দ্রসঙ্গীত হোক না?

সকলে। রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত হোক!

মিঃ তরফদার। 'হে নতুন, দেখা দিক'টা করুন।

সঞ্জয়। Start, somebody must start!

[একজন আরম্ভ করে। মিহি বিলিতি গলায়। দু'একজন যোগ দেয় কোরাসে।]

অজিত। [হঠাৎ] চুপ্ চুপ্! এরকম ইংলিশ মিডিয়ামে রবীন্দ্রসঙ্গীত হলে আমি কিন্তু চেঁচাবো।

[সকলে কলরব করে হেসে ওঠে। গান ছেড়ে খেতে আরম্ভ করে অনেকে। এক জায়গায় একটি ছেলে ও মেয়ে প্রেম করছে। দূরে থেকে অন্য একটি ছেলে তা স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। অজিতকে লায়লা ধরে নিয়ে যায়।]

লাবণ্য। ওকে আর দিও না লায়লা। শেষে কাঁধে করে বাড়ি পেঁৗছে দিতে হবে।

লায়লা। Oh no, he's perfectly alright।

অজিত। আমার নেশা হয়নি। আমায় কাঁধে করে নিয়ে যাবে এমন কাঁধ ক'টা আছে দেখি? আমি নাচ শিখতে যাচ্ছি।

লায়লা। Isn't he sweet!

[অজিতকে লায়লা নাচ শেখাতে নিয়ে যায়।]

মিঃ তরফদার। মিস্ বোস—you are neglecting me.

লাবণ্য। বাঃ, এতো সবই আপনার জন্যে।

সঞ্জয়। Drinks! সেলিম, drinks বোলাও।

[সেলিম মদ নিয়ে আসে।]

মিঃ তরফদার। গত দশ বছরের মধ্যে আমি এমন হাল্কা বোধ করিনি। যেন মহাকাশে উড়ছি—space-traveller হয়ে গেছি।

সঞ্জয়। [গেলাস তুলে] To our friendship, Mr. Tarafdar!

লাবণ্য। To our wonderful guest!

মিঃ তরফদার। To all of you!

সকলে। To you!

১টি ছেলে। Bottoms up!

[সকলে গ্লাস নিঃশেষ করে খায়। শান্তনু ঢোকে। প্রণব ছাড়া সকলে হাসছে, কথা বলছে।]

সেলিম। এই যে কবিবাবু, আপনি তো খাচ্ছেন না। আপনার নাম করে এটা খেয়ে নেব?

প্রণব। নাও না।

সেলিম। আচ্ছা।

[দুটো গেলাস ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নেয়।]

প্রণব। বিবি ঠ্যাঙানি লাগাবে।

সেলিম। তা মেয়েছেলে অত মদের গন্ধটন্ধ বুঝবে?

প্রণব। এই তো সব মেয়েছেলে দেখছ।

সেলিম। এনারা তো মেয়েছেলের বাবা।

[টেম্পো উঠছে।]

একটি ছেলে। [ভীষণ চিৎকার ক'রে গান ধরে] 'My Bonnie lies over the ocean—bonnie lies over the sea...'

সকলে। বনি, বনি—let's dance! [লাবণ্যর সামনে এসে গায়। সেই মুহূর্তে শান্তনু ঢোকে।]

শান্তনু। বাবা! [তরফদার জোরে চমকালেন]

মিঃ তরফদার। কি রে খোকা, কিছু খারাপ? মা?

শান্তনু। না, না, ওসব কিছু নয়। আমি মার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

মিঃ তরফদার। এখানে আসা তোমার উচিত হয়নি, খোকা। তোমার মা হয়তো—

শান্তনু। তা হতে পারে। কিন্তু আজকে মা তোমার জন্যে পায়েস রেঁধেছিল। তুমি বাড়িই গেলে না। মা সব জানতে পেরেছে।

মিঃ তরফদার। তুমি বাড়ি যাও, খোকা।

শান্তনু। একটু থাকি।

মিঃ তরফদার। এসব বড়দের ব্যাপারে—

শান্তনু। তোমার আজ জন্মদিন, বাবা!

মিঃ তরফদার। [অসহায়ভাবে] বেশ! তবে দশ মিনিট সময় দিলাম—enjoy yourself! Miss Bose!

লাবণ্য। হ্যাঁ? শান্তনু? এত দেরি কেন?

মিঃ তরফদার। ওকে একটা lemon squash দেবেন।

লাবণ্য। Why, certainly! সেলিম!

[দু'একজন হেসে উঠল। শান্তনু চটে। সেলিম ট্রে নিয়ে তার কাছে আসে।]

সেলিম। এই যে lemon squash বাবু! [গলা নামিয়ে] এক্কেবারে ডবোল্ হাফ—বিলিতি।

শান্তনু। [এক ঢোকে খেয়ে] আঃ! বাবা বেশ আছে। [আর একটা খেল] গন্ধ হচ্ছে কিনা দেখতো হে।

সেলিম। আমি একটা খেলে বুঝতে পারব।

শান্তনু। খাও না।

সেলিম। একটু আড়াল করে দাঁড়ান।

[সেলিমকে শান্তনু আড়াল করে দাঁড়ায়। সেলিম খায়।]

শান্তনু। কেমন লাগল? ওটা আমি খাইনি—ওটা কী?

সেলিম। রামচন্দ্রের লেমোনেড্!

শান্তনু। [হো হো করে হেসে] তুমি একটা জিনিয়াস্!

সেলিম। গন্ধটন্ধর জন্যে ভয় পাবেন না বাবু—আজ dry day। গন্ধে দোষ নেই। লোকে ভাববে শুঁকে গন্ধ হয়েছে।

শান্তনু। আজ dry day না? বেশ ফোয়ারা ছুটেছে তো।

সেলিম। আপনার বাপের তো বেধড়ক নামডাক কিনা—তাইতে শুখা দিনটাকে একেবারে ভিজিয়ে জবজবে করে দেওয়া হয়েছে।

[লায়লারা এসে শান্তনুকে ডেকে নিয়ে যায়। হঠাৎ, যে ছেলেটি একজোড়া ছেলেমেয়েকে লক্ষ্য করছিল তাদের কথা-কাটাকাটি হতে থাকে।]

লাবণ্য। [মদের গেলাস হাতে] প্রণব! কবি!—এমন নিঃসঙ্গ কেন? [বেশ একটু নেশাগ্রস্ত] সেলিম, বাবুকে দাও।

সেলিম। উনি তো খাবেন না, মিস্ বাস। খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। [লাবণ্যর দেওয়া গেলাস প্রণব নেয় না।]

লাবণ্য। কেন খাবেন না?

প্রণব। আপনাদের এইসব হৃদয়হীন ব্যবসার দুনিয়ার ফূর্তি আমার ভাল লাগে না। সত্যিকারের ফূর্তি করতেন তো গান গেয়ে মাতিয়ে রাখতাম। কিন্তু এ তো ব্যবসার মাপা ফূর্তি। একেবারে মরা।

লাবণ্য। [হেসে উঠে]...'April is the cruellest month, breeding lilacs out of deadland'...Dead land বুঝলেন? এইসব মৃত নক্ষত্র এখন আমাদের মূলধন—

প্রণব। এবার আমায় ছেড়ে দিন। আপনার সম্মানিত অতিথি ক্ষুব্ধ হবেন। একদিন বরং আপনার বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসব।

লাবণ্য। লায়লা, come here, a poet refuses a drink!

প্রণব। মদ না খেয়েই আমার অনেক সময় নেশা হয়। এইসব কাতুকুতু দিয়ে হেসে মরা আমার ভাল লাগে না। আসলে এই পরিবেশে কিছুই ভাল লাগবার নয়।

লাবণ্য। Then you must dance with this young lady.

প্রণব। আমি নাচতে পারি না। পারলে অবশ্যই খুশি হয়ে নাচতাম।

লায়লা। কিছুই পারেন না? প্রেম! প্রেমটেম আসে?

প্রণব। আসা তো উচিত—যা বয়েস।

লায়লা। উচিত! হাঃ হাঃ—mon ami, mon petit!

প্রণব। আপনারা অনর্থক আমার বসে থাকা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। আমি তো কিছুই করছি না। কেবল ভাবছি এসবের মানে কী?

লাবণ্য। মানে? Nothing—কিচ্ছু, কিচ্ছু, কিচ্ছু নয়—rien de tout Monsieur এভাবে মদ খাওয়ার মানে হল you invest in nothingness। তবে আমি এই nothingness থেকে একটা deal নিশ্চয় clinch করব। আমি হলাম দাবার মন্ত্রী। হ্যাঁ, মিসেস তরফদারকে জিজ্ঞেস করবেন—আমি মন্ত্রী। এই dealটা হলে—জানেন প্রণববাবু, সঞ্জলের promotion হবে, মাইনে বাড়বে। আমাদের নাম হবে। সঞ্জয় বলে আমাদের বাঙালী ফার্ম—আমাদের দাঁড়াতে হবে—মাথা তুলে! We have to win and make you famous!

প্রণব। ছাই! আগে আমরা বলতাম বৃটিশের বিরুদ্ধে, ব্যবসা করতে চরকা ধর, দিশি পর। এখন ভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে মদের ফোয়ারা ছোটাচ্ছি। এ সমস্ত একেবারে অর্থহীন—একেবারে।

লাবণ্য। Philosophise করবেন না। All work and no play make Jack a dull boy. Ladies and gentlemen—

প্রণব। আপনার নেশা হয়েছে।

লাবণ্য। না, না! লায়লা, he understands nothing—কিচ্ছু বোঝে না।—

লয়ালা। Do you understand English? [লাবণ্যকে] Doesn't understand English. Parley vous francais Monsieur? [লাবণ্যকে] No! He doesn't speak French. Speak Bengali? [লাবণ্যকে] He understands Bengali. How sweet of you, my dear, to declare your fidelity to lady Bengal!

[সেই ছেলেটি ও একজোড়া ছেলেমেয়ের মধ্যে মারামারি লেগেছে। সকলে ব্যস্ত হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। লাবণ্যরা গিয়ে মেটায়।]

সঞ্জয়। [রেকর্ড প্লেয়ারে দ্রুত ওয়াল্‌ট্‌জ্‌ দিয়ে] Dance Bonnie, let's dance!

মিঃ তরফদার। But I want to dance with Bonnie!

শান্তনু। Me too!

মিঃ তরফদার। শানু, আমি আগে নাচব।

শান্তনু। না আমি।

মিঃ তরফদার। আমি তোমার বাবা, আমার chance আগে।

শান্তনু। জন্মদিনে mean হতে নেই, বাবা।

মিঃ তরফদার। [দাঁড়াতে গিয়ে বসে পড়ে] নাঃ, আমার আর নাচ হবে না। শানু, বাড়ি যাও। তোমার মা ভাবছে। Go home this minute.

শান্তনু। আচ্ছা, আচ্ছা যাচ্ছি। [সরে গিয়ে গল্প করে]

[আবার সেই ছেলেটি মারামারি করবার জন্যে তৈরী হচ্ছে দেখে লাবণ্য উতলা হয়ে উঠল।]

লাবণ্য। Let's dance! [একটি সুপুরুষ ছেলের সঙ্গে নাচে] I am happy, happy, happy!

[ওয়াল্‌টজের সঙ্গে দ্রুত নাচ। লাবণ্য আর তার পার্টনার দুজনেই হাসছে। আলোটা এখন কেবল ওদের ওপর। কলরব। হাসি। আলোটা দপ্‌ করে নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাজনা থামল। মঞ্চ অন্ধকার।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

তিরিশ সেকেন্ড পরে আলো জ্বলে ওঠে। আলোটা পড়ে একটা সোফায়। লাবণ্য ও তরফদার বসে আছে। দূরে টুলে বসে সেলিম ঢুলছে। লাবণ্য একটু বিহ্বল—চোখে জল।

মিঃ তরফদার। [রুমাল এগিয়ে দিয়ে] তোমার চোখের জল আমার সহ্য হচ্ছে না। যদি জন্মান্তর থাকে যেন তোমাকে আমি পরের জন্মে বিয়ে করতে পারি।

লাবণ্য। জন্মান্তর? I have been born and once is enough...

মিঃ তরফদার। এই তো জীবন, বনি। গত আট বছর ধরে আমার স্ত্রীর পাগলামী আমি

সহ্য করছি। কিন্তু সে-ই বা কী করবে? দুরারোগ্য অসুখ। কিন্তু আমি-ই বা কী করি? যখন কোনো sympathetic মেয়েকে দেখি—সব গুলিয়ে যায়। [লাবণ্যর মুখ ধরে] বনি, তুমি যে কী সুন্দর! তোমার চোখে জল দেখে আমার ভেতরটা কী হচ্ছে তুমি জানো না।

লাবণ্য। মিস্টার তরফদার! আমার একটা জরুরী দরকার ছিল। [ব্যাগ ঘাঁটে। চোখ মুছে নেয়]

মিঃ তরফদার। কেন তুমি আমায় মিস্টার তরফদার বলে ডেকে কষ্ট দিচ্ছ, বনি। আমায় বাব্‌লু বলে ডেকো।

লাবণ্য। বাব্‌লু? ওটা আপনার নাম?

মিঃ তরফদার। হ্যাঁ, মা ডাকতেন।

লাবণ্য। মা! কী আশ্চর্য, এখানেও মা?

মিঃ তরফদার। বনি, আমি বড় sentimental, আমার মার কথা ভেবে আমার কান্না আসছে কেন বল তো?

লাবণ্য। স্ত্রীর কথা ভেবে?

মিঃ তরফদার। হ্যাঁ, তা-ও। আমার ছেলেটাও মানুষ হল না। পাশটাশ করে যাবে—চাকরীও পাবে কিন্তু মানুষ হবে না। আমরা মানুষ করতে পারছি না কেন? ছেলে-বেলার স্বদেশী আদর্শের একবর্ণও আর মেনে চলতে পারি না। ছেলেকে দোষ দিয়ে কী করব? ওকে কী দিয়েছি আমি? কিচ্ছু নয়—কেবল আমার দুর্বলতাগুলো ঢাকতে উপদেশ ছাড়া কিছুই দিতে পারিনি। এতো ক্ষমতা আমার হাতে—তবু আমি ক্ষমতাহীন! বণি, কিছু একটা হওয়া দরকার—তচ্‌নচ্‌ করে কিছু একটা না হলে আর বেঁচে লাভ নেই—any damned calamity!

লাবণ্য। বেশি বেঁচে কী হবে! যেমন চলছে চলুক! যা হবার হোক। [দলিল দিয়ে] এটাতে একটা সই লাগবে।

মিঃ তরফদার। [চম্‌কে] ওটা কী?

লাবণ্য। সেই যে contractএর priliminary documentটা! ওটাতে আপনার সই না পেলে কিছুই করা যাবে না।

মিঃ তরফদার। [ভাবতে চেষ্টা] ওঃ! ও হোঃ! কী বেরসিক মেয়ে তুমি, সত্যি! Document সই করার এই কি সময়? আমি সবে তোমায় আমার হৃদয় দান করতে যাচ্ছি আর তুমি কিনা document বের করছ?

লাবণ্য। কিন্তু modern প্রেমে তো documents অপরিহার্য।

মিঃ তরফদার। বনি, please, documentটা সরিয়ে রাখ।

লাবণ্য। কিন্তু কালই ওটা লাগবে। অনেকের জীবন এর ওপর নির্ভর করছে। Personally —I don't care!

মিঃ তরফদার। দেব, ঠিক সময়মত দেব। কাল সকালে। আজ তুমি আমার এক নীড় বাঁধা আছে, সেখানে চল।

লাবণ্য। নীড়? সেটা আবার কী?

মিঃ তরফদার। একটা ছোট্ট nest—nook—একফোঁটা একটা csoy ঘর। সেখানে তোমায় নিয়ে যাব। জানো বনি, গত কয়েক বছর ধরে, মাঝে মাঝে যখন নিঃসঙ্গতা আর সহ্য

হয় না, তখন কোনো না কোনো নিঃসঙ্গ মেয়েকে নিয়ে আমি ঐ ঘরটায় এক রাত্তিরের সংসার পেতেছি। একজনও এক রাতের বেশি থাকেনি। বনি, তুমি আমার ঐ ঘরে বরাবরের মত থাকবে? [হাত ধরে]

লাবণ্য। [ছিট্‌কে হাত সরিয়ে] আবার ঘর!

মিঃ তরফদার। Offence নিও না। তুমিই আমায় ক'দিন ধরে আশা দিয়েছ। আমি helpless—তোমার সঙ্গ দিয়ে আমার নিঃসঙ্গতা দূর কর, বনি।

লাবণ্য। উঠুন, কী করছেন—ছিঃ! দেখুন, কিছুতেই আমার কিছু এসে যায় না। তবে কোনো permanent arrangement-এর মধ্যে আমি নেই। I simply don't care about anything। আপনি যদি আপনার ঐ নীড় না কী বলছেন সেখানে আমায় নিয়ে যান—যেতে পারি—I'll simply go—যাব, চলুন।

মিঃ তরফদার। [লাবণ্যর দু'হাত ধরে] যাবে, বনি? Thank you, thank you—আমি ধন্য!

[ঠিক এই মুহূর্তে ঢুকলেন মিসেস তরফদার। নিঃশব্দে, দেয়ালের গা ঘেঁষে ঘরের কোণে চলে গেলেন।]

লাবণ্য। কোথায় যেতে হবে?

মিঃ তরফদার। হোটেল রাঁদেভ্যুতে আমার একখানা ছোট্ট ঘর আছে। খুব ছোট্ট সাজানো ঘর—তোমার ভাল লাগবে।

লাবণ্য। What do I care!

মিঃ তরফদার। ওরকম করে বোলো না। আমি পুরোনো আমলের লোক—যাকে ভাল লাগে তাকে খুব আবেগের সঙ্গে পেতে চাই। তার ওপর আমি একেবারে বাঙ্গালী—ভাবপ্রবণ। আরও কী জানো, বয়েসটাও তো পঞ্চাশ হল—যেটুকু পাই, কৃতার্থ হয়ে যাই।

লাবণ্য। আমারও বয়েস নেহাৎ কম নয়। বহু যুগ ধরে বেঁচে আছি। কেন জানি না।

মিঃ তরফদার। That's nothing, nothing! A woman is as old as she looks and a man is as old as he feels! চল আমরা যাই।

লাবণ্য। Documentটা তাহলে—

মিঃ তরফদার। হোটেলে পেঁছেই সই করে দেব—হল তো? এখানে একমুহূর্ত থাকতে পারছি না। চল, চল।

[ওরা বেরুবার জন্যে এগোয়]

লাবণ্য। সেলিম! সেলিম ওঠ—আমরা যাচ্ছি।

মিঃ তরফদার। ড্রাইভারকে ডেকে দিতে হবে।

সেলিম। [উঠে পড়ে] যে আজ্ঞে!

লাবণ্য। সেলিম শোনো, আমি মিস্টার তরফদারের সঙ্গে যাচ্ছি—ও'র হোটেলে। যদি কেউ আমাকে—

মিঃ তরফদার। Don't name the hotel, my dear. It's my private nook—নামটা কেবল তোমার আমার মধ্যেই থাক। এসো হাত ধর—my darling, Bonnie!

[তরফদার বনিকে ধরে বেরোয়। সেলিম ইশারা করে।]

সেলিম। মা, শুনুন!

লাবণ্য। [ঘুরে দাঁড়িয়ে] মা বলে ডাকতে বারণ করেছি।

সেলিম। মিস্ বোস, হোটেলে যাবেন না। আপনার পায়ে ধরছি।

লাবণ্য। কেন?

সেলিম। ভাল হবে না। ও খুব খারাপ পথ।

লাবণ্য। আমি তো খুব ভাল কিনা! কেউ জিজ্ঞেস করলে বোলো—আমি জাহান্নামে গেছি।

[লাবণ্য বেরিয়ে গেল। পেছনে গেল সেলিম। মলিনা তরফদার এগিয়ে এলেন।]

মলিনা। [একটু ঘুম-ঘুম জ্বল-জ্বলে চোখ] আর তো সহ্য করতে হবে না—এই শেষ! [ফোন তুলে ডায়েল করেন।] হ্যালো, লালবাজার? মিস্টার অনিল রয়কে দেবেন। হ্যালো কে, অনিমামা? আমি মলিনা কথা বলছি। একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়েছে। না অনিমামা, তোমার কাছে আমার এই শেষ চাওয়া। বুঝতেই পারছ কার সম্বন্ধে বলব—হ্যাঁ উনি। এইমাত্র চোখের সামনে দিয়ে একটি অতি আধুনিকাকে নিয়ে ও'র সেই হোটেল-ঘরে গেলেন। এতদিনে হোটেলের নামটা জানতে পেরেছি—হ্যাঁ, হোটেল রাঁদেভ্যু। তোমরা থাকতে এসব কতদিন চলবে? স্ত্রী অসুস্থ, এই সুযোগ নিয়ে যে কী কাণ্ড করছেন—ছেলের চোখের সামনে। আমার কথা বাদ দাও—আমি শেষ হয়ে গেছি। কী করতে পার তুমি? অনেক কিছু ও'কে arrest কর—মহিলা সমেত। হলই বা বড় অফিসার। এই তোমার ন্যায়দণ্ডের বিচার? আমি মরার আগে অন্তত এইটুকু জেনে যেতে চাই অনিমামা, হ্যাঁ এইটুকু যে ও শাস্তি পেয়েছে। আরও কত অন্যায়ের তো বিচার হল না—হবে না।

[বিপ্রদাস ও শম্ভু ঢুকে ইতস্তত কাকে খোঁজে। ফোনে কথা শুনে দাঁড়ায়।]

মলিনা। শুধু টাকা দিয়ে তো সব পাওয়া যায় না। অনিমামা, মনে আছে ছোটবেলায় আমাদের কী বন্ধুত্ব ছিল? আমি তোমার কাছে কোনোদিন কিছু চাইনি—আজ ভিক্ষে চাইছি। একমাত্র তুমিই ওর মাথা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পার। যাবে? একটু পরে যেও, হাতে-নাতে ধরতে পারবে। অনিমামা, তোমায় কী বলে ধন্যবাদ দেব। অনিমামা, এবার আমার ঘুম আসছে—কতদিন ঘুমোইনি, কতদিন ঘুমোইনি! চললাম! [সেলিম ঢুকল]—বেঁচে থাক। মামীর জীবন সুখী হোক!

[সেলিম ফিরে এসে শম্ভু আর বিপ্রদাসের সঙ্গে কথা বলছে। মলিনা রিসিভার নামাতেই সেলিম এগিয়ে আসে। মলিনা টেবিলে মাথা রেখে হাঁপাচ্ছে।]

সেলিম। আপনি কে? আপনি এ ঘরে ছিলেন নাকি?

মলিনা। আমি মিসেস তরফদার। [মাথা তুলে তাকাবার চেষ্টা]

সেলিম। অ্যাঁ! তা আপনি—সেকি!

মলিনা। [উঠে সোফায় বসার উদ্যোগ] আমার ঘুম আসছে।

সেলিম। সে তো হবার উপায় নেই। আপনাকে বাড়ি যেতে হবে, আমি সব বন্ধ করব।

মলিনা। আমি তো উঠতে পারবো না। [বসে পড়ে] আমি যে মৃত্যু-পথযাত্রী।

সেলিম। [চমকে, বিপ্রদাসের প্রতি] ও বাবুরা ইদিকে আসুন। ইনি কিরকম করছেন।

বিপ্রদাস। আপনার কী হয়েছে, মিসেস তরফদার?

মলিনা। আমি sleeping pill খেয়েছি।

শম্ভু। অ্যাঁ—কতগুলো?

মলিনা। এতগুলো জমিয়েছিলাম—স-ব! [ঢুলে] আমায় আর একটু জাগিয়ে রাখ তো!

বিপ্রদাস। সর্বনাশ করেছে! শম্ভু, ও'কে হাঁটাও, কিছুতেই ঘুমোতে দিও না। খাঁ সায়েব

—ও'কে ঐদিক থেকে ধরুন। [ওরা ধরে] আমি পুলিশে ততক্ষণ একটা ফোন করি। ওরা যা হয় করবে। [বিপ্রদাস ডিরেক্টরী দেখে ডায়েল করছে]

মলিনা। লালবাজারে অনিল রয়কে ডেকে বলবেন মলিনা তরফদার—[আবার ঘুম আসে]

শম্ভু। [সেলিমকে] একটু জল নিয়ে এসো—চোখে ঝাপ্‌টা দিই।

[সেলিম জল এনে ঝাপ্‌টা দেয়। মলিনাকে হাঁটাবার চেষ্টা করে।]

বিপ্রদাস। [রিসিভারে] হ্যালো, অনিল রায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই। বেরিয়ে গেছেন? এমন একজন কেউ নেই যিনি এখুনি আসতে পারেন—একেবারে ambulance নিয়ে। Suicide case—sleeping pill খেয়েছেন। হ্যাঁ Miracle Trading Company, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ building-এর দোতলার ডানদিকে। আমরা জাগিয়ে রাখছি। কিন্তু action শুরু হয়েছে। দেরী করলে সব শেষ হয়ে যাবে। [রিসিভার নামায়]

মলিনা। বড্ড ঘুম আসছে। [হাঁপ ওঠে]

বিপ্রদাস। কথা বলুন, এই যে—মিসেস তরফদার, আমার দিকে তাকান—এই যে আমি, দেখতে পাচ্ছেন?

মলিনা। হুঁ, কিরকম দুটো দুটো লাগছে।

শম্ভু। আপনি কাকে ফোন করছিলেন একটু আগে? তাঁকে কিছু বলেছেন এ ব্যাপারে?

মলিনা। না। যাকে ফোন করছিলাম, সে-ই তো অনিল রয়। বোধহয় এতক্ষণে ওদের arrest করেছে।

শম্ভু। কাদের?

মলিনা। ঐ তো, আমার স্বামীকে আর সেই লাবণ্য বোসকে।

শম্ভু। কাকে?

বিপ্রদাস। লাবণ্যকে?

মলিনা। হুঁ। আমার স্বামীর সঙ্গে হোটেলে বাস করতে গেছে। ব্যাভিচারের অভিযোগ! আমি স্ত্রী হিসেবে করেছি।

শম্ভু। কি হবে?

বিপ্রদাস। এই খাঁ সায়েব! আপনি এ'কে হাঁটান, আমাদের যেতে হবে। লাবণ্য যে এই রকম সাংঘাতিক কিছু করবে জানতাম। মাথায় ভূত চেপেছে। উঃ, কী মর্মান্তিক পরিণতি। কী করা যায়?

শম্ভু। দিদিকে বাঁচাতেই হবে। এখনও বোধ হয় সময় আছে। কোথায় আছে বললেন? মিসেস তরফদার—শুনতে পাচ্ছেন? ঘুমোবেন না—এই যে তাকান! [ঝাঁকায়]

মলিনা। উঁ! ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

বিপ্রদাস। হোটেলের নাম কী?

মলিনা। হোটেল! [হাঁই তুলে] তাদের এতক্ষণ ধরেছে। একটু জাগিয়ে রাখুন, আর একটু—

শম্ভু। কী মুশকিলেই পড়া গেল! আমাদের হাত-পা বেঁধে দিলেন ভদ্রমহিলা। মিসেস তরফদার, লাবণ্য বোস কোথায়?

মলিনা। [আধ বোঁজা চোখে] লাবণ্য বোস—সে কে?

শম্ভু। বনি, বনি—সকলে বনি বলে ডাকে। তাকে কোথায় arrest করবে? কোন্ হোটেলে?

মলিনা। জানি না তো! আমাকে জাগিয়ে রাখুন—আমার হাত-পা এলিয়ে আসছে। ছেলেকে একবার দেখব—শান্তনুকে—ওঁকে!

বিপ্রদাস। [জলের ঝাপটা দিয়ে] ক'টা পিল খেয়েছেন? কী বিপদ! উঃ, খাঁ সায়েব, এদিকে এসে ধরুন। মিসেস তরফদার, আপনি ক'টা পিল খেয়েছেন?

মলিনা। গোটা কতক! বললাম তো, অনেকও হতে পারে।

শম্ভু। সর্বনাশ!

মলিনা। [হঠাৎ] বাঁচব তো? [শম্ভুকে আঁকড়ে ধরে]

শম্ভু। খেলেন কেন, যদি বাঁচতে চান?

মলিনা। হ্যাঁ, কেন খেলাম বল তো? আমি আর পারছি না। ওখানে একটু শোবো।

সেলিম। মা ঠাকরুন, শোবার কথা ভাববেন না। ভাবুন আপনার ভীষণ বিপদ। ভাবুন আমরা সবাই চাই আপনি বাঁচুন। ভাবুন আপনি সুখী।

মলিনা। ভাবছি।

সেলিম। তাহলে আর একটু জোরে হাঁটুন, ঐ গাড়ি এল বলে। ডাক্তার এলেই সব সেরে যাবে।

মলিনা। বাঁচব?

শম্ভু। নিশ্চয় বাঁচবেন।

বিপ্রদাস। আমরা থাকতে মরতে দিই মানুষকে?

শম্ভু। দিদিকে কে বাঁচাবে?

বিপ্রদাস। সে নিজেই বাঁচবে। আমাদের সাহায্য সে নেবে না—বড় অভিমানী।

মলিনা। ঐ গাড়ি এল?

সেলিম। হাঁটুন—আর ক'পা। আবার আসুন এদিকে—হাঁটুন! দাঁড়াবেন না। হাঁটুন।

মলিনাকে ওরা হাঁটাচ্ছে। গাড়ির হর্ন বাজল। ওরা থমকে দাঁড়াতেই মঞ্চ অন্ধকার হল।

তৃতীয় দৃশ্য

সঞ্জয়ের অফিস। সঞ্জয় পায়চারী করছে। দূরের কোণে অজিত বসে। ফোন বাজছে।

সঞ্জয়। [রিসিভার তুলে] হ্যালো! হ্যাঁ, সঞ্জয় মুখার্জী। বলুন। মিসেস তরফদার? অ্যাঁ! তাই বলুন, বেঁচে উঠেছেন। উঃ, বাঁচালেন। খবরটার জন্যে সারারাত কী anxiety গেছে। Thank you, Mr. Roy! আমি আজই একবার আপনার কাছে যাব। মিস্টার তরফদারের ব্যাপারটা যেন একটু ভেবে দেখবেন। আপনারও আত্মীয়, আর—হ্যাঁ সম্ভ্রান্ত পরিবার! ও'র অফিসে কথাটা কোনো রকমে যাতে না পোঁছয় সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে। এসব জিনিস আরও একটু দরদ দিয়ে না দেখতে পারলে —হ্যাঁ, হ্যাঁ সে তো নিশ্চয়ই। মিসেস তরফদারের জীবনটা বড়ই tragic। না, না, প্রেসের জন্যে আপনি ভাববেন না। Arrest-এর খবরটা leak হওয়া মাত্র আমি প্রত্যেকটা প্রেস representative-এর কাছে নিজে হাতজোড় করে বলে এসেছি এ খবরটা যেন ছাপানো না হয়।—ফোনে সব কথা বলা শক্ত। আমি আসছি এদিকটা গুছিয়ে। ধন্যবাদ। নমস্কার। [রিসিভার নামিয়ে ক্লান্তভাবে বসে পড়ে] Mr. Sen, she's alive। মিসেস তরফদারকে পুলিশ-হাসপাতালে বাঁচিয়ে তুলেছে। আমরা বেঁচে

গেছি। বনিরাও বেঁচে যাবে। কপাল ভাল।

অজিত। আমি এখনও ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতেই পারছি না।

সঞ্জয়। কাল রাত্তিরে—after the party, তরফদার আর বনি হোটেলে গিয়েছিল। জানতে পেরে মিসেস তরফদার তাঁর এক পুলিশ অফিসার মামাকে ফোন করে complain করায় ওরা arrested হয়। তারপর উনি খেলেন sleeping pill—ব্যাস! কী বিশ্রী ব্যাপার ভেবে দেখুন!—একটু পরে staff-এর সবাইকে on the quiet ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে দেবেন। পুলিশ টুলিশ দেখে যেন না ঘাবড়ায়। আমি যা করার করব। Arrest-এর ব্যাপারটা চেপে দিতে পারলে তবে ধড়ে প্রাণ আসে। [সেলিম উঠে ভেতরে চলে যায়]

অজিত। মিস বোস, ছিঃ ছিঃ, কী করে এসব হল?

সঞ্জয়। হ্যাঁ, একেবারে যাচ্ছেতাই ব্যাপার। আর ঠিক এমন একটা সময়, যখন আমরা উঠছি। [চোখ বুঁজে ভাবে] হ্যাঁ, মিস্টার সেন, একটা কাজ আপনাকে করতে হবে।

অজিত। বলুন।

সঞ্জয়। [অস্বস্তিতে উঠে পায়চারী] বনি কোথায়?

অজিত। নিজের ঘরে, একা বসে আছেন।

সঞ্জয়। ওকে bail-এ release করে আনার পর থেকে একটি কথাও বলেনি। আমিই বা কী বলব! এসব যে ঘটবে তা কি আমি ভাবতে পেরেছি।

অজিত। কিন্তু উনিই বা গেলেন কেন? আপনি তো ওঁকে যেতে বলেননি।

সঞ্জয়। ওকে দোষ দেওয়া যায় না। আপনি ছেলেমানুষ, বুঝবেন না—ওসব হয়ই। আমি arrest-এর কথা বলছি।

অজিত। আমাকে কী বলতে হবে মিস বোসকে?

সঞ্জয়। আপনাকে জেনে নিতে হবে সেই documentটা তরফদার সই করেছেন কিনা। আমি জিজ্ঞেস করতে পারব না। ভয়ানক বিশ্রী লাগছে। গত দশবছর ধরে একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে আমাদের মধ্যে। অথচ documentটা বড় decisive. আজই জানা দরকার। এর ওপর আবার মিস্টার তরফদারকে handle করার ঝামেলা আছে—You must help me out of this, Mr. Sen! [সেলিম চিঠি এনে সঞ্জয়কে দিল]

সেলিম। মিস বোস, আপনাকে দিতে বললেন।

সঞ্জয়। [লাফিয়ে উঠে] ওঃ! ও নিজেই পাঠিয়েছে। মিস্টার সেন, দেখছেন তো কী considerate মেয়ে। সমস্ত কিছুই ও ফার্মের interestএ করে। আমি ওকে double increment দেব। [খাম ছিঁড়ে চিঠি পড়ে] একি? এ যে resignation letter—বনি resign করছে। সেই কাগজটাতো এতে দেখছি না। তবে? সর্বনাশ! হয়নি নাকি?

অজিত। ওঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়।

সঞ্জয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জিজ্ঞেস তো করতেই হবে। কী anxiety! ফার্মের সমস্ত interest ঐ সইটাতে বাঁধা। জিজ্ঞেস তো করতেই হবে। তার আগে একটা কাজ সারতে হবে। ও যদি আসে বসিয়ে রাখবেন। কথা আছে। বলবেন আমি, আমি বলে গেছি।

[সঞ্জয় বেরিয়ে যেতে উদ্যত। প্রণব ঢুকে দূরে একটা চেয়ারে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবে আর লেখে। ফোন বেজে ওঠে। সেলিম নেয়।]

সেলিম। [রিসিভারে] কে? মিসেস মুখার্জী? হ্যাঁ আছেন। [রিসিভার সঞ্জয়ের দিকে

এগিয়ে] আপনাকে মিসেস মুখার্জী ডাকছেন।

সঞ্জয়। [ফিরে এসে ফোন তুলে] কে, মিনু? [অজিতকে] মিস্টার সেন, আপনি একটু ওঘরে অপেক্ষা করুন। [সেলিম ও অজিত রিসেপশনে গেল] মিনু, শোনো! [ক্লান্ত স্নেহভরা গলা] আমরা বোধহয় এ যাত্রা বেঁচে যাব। সবদিক থেকে কিনা এখনও বলতে পারছি না। এক পলক ঘুমোইনি। তুমিও সারারাত বসে আছ? বাচ্চারা কোথায়? স্কুলে গেছে? কাবুল আমায় খোঁজেনি? মনটা ভীষণ খারাপ। তুমি খেয়ে নিও, লক্ষ্মীটি। খাবে না? কী আনন্দ পাও এতে? সাধে কি আমি স্ত্রৈণ! আচ্ছা, আচ্ছা, তাড়াতাড়ি আসব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আচ্ছা।

[ফোন রেখে ছুটে বেরিয়ে যায়। বিপ্রদাস ও শম্ভু এল। অজিত প্রণবের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।]

অজিত। সব শুনেছেন?

প্রণব। হুঁ।

অজিত। এ লাইন বড় কঠিন দেখছি। বন্ধুত্ব বলে কিছু নেই।

বিপ্রদাস। লাবণ্য কোথায়?

শম্ভু। ও'র সংগে আমরা দেখা করতে চাই।

অজিত। উনি এখন নিজের ঘরে। Resign করেছেন।

বিপ্রদাস। Resign করেছে? ভাল হয়েছে। খুব ভাল করেছে। চলুন, পথটা দেখান।

অজিত। এখন যাবেন না, হিতে বিপরীত হবে। একটু বসুন।

[লাবণ্য ঢুকল। প্রণব চেয়ার ছেড়ে এতক্ষণে উঠল। সঞ্জয়ের ঘরে লাবণ্য যেতে একে একে অন্যরাও গেল। সেলিম ভেতরে চলে গেল।]

শম্ভু। দিদি, আমরা তোমায় নিতে এসেছি। বাড়ি চল।

লাবণ্য। তোরা যা।

শম্ভু। তুমি আসবে না?

লাবণ্য। বাড়ি না গিয়ে যাব কোথায়?

বিপ্রদাস। শুনলাম resign করেছ। খুব ভাল করেছ। আমার মনে হয় এসব জায়গায় না থাকাই ভাল।

লাবণ্য। মনে হয়।

বিপ্রদাস। একটা কিছু উপায় হয়ে যাবেই। আমরা সবাই মিলেমিশে যদি—

লাবণ্য। তোমরা এখন বাড়ি যাও।

বিপ্রদাস। যাচ্ছি। একটা কথা বলে যাই। মানুষের সংগে মানুষের সম্পর্কটাই হল সব চাইতে বড়। তার জন্যেই মানুষ বাঁচতে চায়—কোনো একটা line-এর জন্যে নয়। [শেষের কথাটা অজিতের দিকে চেয়ে]

শম্ভু। এখন ওসব কথা থাক না, বিপুদা।

বিপ্রদাস। হ্যাঁ, থাক। তুমি ক্লান্ত। তাড়াতাড়ি চলে এসো।

লাবণ্য। দেখি।

শম্ভু। আমরা বসে থাকব দিদি।

লাবণ্য। আচ্ছা যা। পাগল কোথাকার।

বিপ্রদাস। [চাপা আবেগে] লাবণ্য, নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নিষ্ঠুরতা নয়।

[বিপ্রদাস ও শম্ভু বেরিয়ে গেল। সঞ্জয় ঢুকল।]

সঞ্জয়। [ইতস্তত] বনি! আমি কী-ই বা বলব। মানে, দেখো—তুমি তো যথেষ্ট বুদ্ধিমতী! আমরা, সকলেই—

লাবণ্য। [ব্যাগ থেকে খাম বার করে] আমি চলি।

সঞ্জয়। কিন্তু বনি—

লাবণ্য। কী চাও?

সঞ্জয়। [অপ্রস্তুত হাসে] মিস্টার সেন, মানে, বনি শোনো,—তোমার resignation—

অজিত। মিস বোস, আমি, আমরা লজ্জিত—আমি কিছুই বলতে পারব না। মিস্টার মুখার্জী আপনি বলুন।

সঞ্জয়। আমাকে তুমি ক্ষমা করবে না—জানি, বনি। তার প্রমাণ এই resignation letter। সত্যিকথা বলতে কি এসব ব্যাপারে ক্ষমা চাওয়ার মানে হয় না। কিন্তু বনি, মানুষের জীবনে অভিজ্ঞতার চাইতে বড় জিনিস কী আছে, বল? Voltaire বলছেন—'We are what we are by what we have experienced, granting that all experiences are good and the bitterest ones the best of all। তুমি হয়তো হাসবে বনি, কিন্তু আজও আমার Voltaire, মনে আছে। আজও।

লাবণ্য। তারপর? [দলিলটা নাড়ছে। সঞ্জয় দেখছে]

সঞ্জয়। বনি, তুমি ঠাট্টা করছ? তোমার অধিকার আছে। কিন্তু, my dearest friend, আমার miseryর পরিমাণ তোমাকে মেপে দেখালে তুমি স্তম্ভিত হয়ে যেতে।

লাবণ্য। তারপর? [দলিলটা নাড়াচাড়া করে]

সঞ্জয়। উঃ, আমি কী করি, কী বলি?

লাবণ্য। এতক্ষণ ধরে তুমি যে কথাটা জিজ্ঞেস করতে চাইছ সেটা হল—এই দলিলটা তরফদার সই করেছে কিনা। তাই না?

সঞ্জয়। [আত্মসম্বরণ করে] কথাটা মিথ্যে নয়।

লাবণ্য। এই নাও দলিল।

সঞ্জয়। [ঝট্ করে ঘুরে নিতে গিয়ে] মিস্টার সেন, ওটা খুলে দেখুন।

অজিত। [কাগজ নিয়ে] দেখি। [পড়ে] সই করেছেন। মিস্টার তরফদারের সই—এই যে।

সঞ্জয়। [ধপ্ করে বসে ক্লান্ত গলায়] Conference Room-এ নিয়ে যান। আমি আসছি [লাবণ্যকে] ঠিক যখন আমার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে, তুমি ছেড়ে চলে যাচ্ছ। আজকের দিনে একজন বাঙালীর পক্ষে ব্যবসা দাঁড় করানো যে কী—আসুন মিস্টার সেন, দেখা যাক ঐ arrest-এর খবরটা পুরোপুরি চেপে দেওয়া যায় কি না। শত্রুর অভাব হবে না। বিশেষ করে এই documentটার জন্যে। চলুন। চলি, বনি। [ক্লান্তভাবে বেরিয়ে গেল]

অজিত। [লাবণ্যকে] লোকে হয়তো বলবে আপনি জাহান্নামে গেছেন। কিন্তু আমি আর যাই না বুঝি এটুকু বুঝেছি যে আমার সামনে শুধুই এই জাহান্নামের পথ। আমি জানি এখন থেকে বণি বোসের জায়গায় P.R.O. হবে অজিত সেন! কোম্পানী বাড়বে, মাইনে বাড়বে—আমি একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যাব। Miracle Trading Company হবে আমার ধ্যানজ্ঞান। আমি একেবারে miraculous হয়ে যাব।

[সেলিম চুকল]

সেলিম। সেন সায়েব, সায়েব আপনাকে তাড়া দিতে বললেন।
অজিত। চল। চলি। [অজিত বেরিয়ে গেল]
সেলিম। [প্রণবকে] আপনারও তলব পড়েছে?
প্রণব। [চম্‌কে খাতা রেখে] হুঁ?
সেলিম। আপনাকে মুখার্জী সায়েব Conference Room-এ আসতে বললেন।
প্রণব। আমি যাব না। বলে দাও।
সেলিম। ওঃ! [ভেবে, লাবণ্যকে] আপনি একটু বিশ্রাম নেবেন, মিস বোস?
লাবণ্য। না।
সেলিম। বাড়ি পৌঁছে দেব?
লাবণ্য। না।
সেলিম। কী সর্বনেশে একটা রাত!
লাবণ্য। কী অদ্ভুত নতুন একটা দিন!
সেলিম। আপনি থাকতে আমাদের ভাবনা নেই, মা।
লাবণ্য। এবার মা বলে ডাকলে আর রাগ করব না।
সেলিম। বুঝেই ডেকেছি।—আপনি কাল যদি এই গরীবের মানা শুনতেন।
লাবণ্য। একবার চাকায় বাঁধা হয়ে গেলে কী আর থামা যায় সেলিম?
সেলিম। কী আপশোষ—কোনো কাজেই এলাম না।

[সেলিম বেরিয়ে গেল। লাবণ্যর দিকে চেয়ে ছিল প্রণব। এগিয়ে এল।]

প্রণব। আমার কিছু বলবার ছিল।
লাবণ্য। বলুন।
প্রণব। লাবণ্য!

[লাবণ্য হতবাক্ হয়ে তাকায়। মুখে নানা আবেগ। মুখ ফিরিয়ে নেয়।]

লাবণ্য। আপনি কিছু বলবেন?
প্রণব। আমি, আমি একটা কবিতা লিখেছি।
লাবণ্য। পড়ুন—
প্রণব। লাবণ্য, আমি অনেকদিন পরে কবিতা লিখলাম।
লাবণ্য। শুনি।
প্রণব। [কবিতা পড়ে]—

'লাবণ্য, একবার তুমি চোখ খুলে তাকালেই দেখতে পাবে মাথার ওপর
শূন্যতা কেবলমাত্র শূন্য নয়; চাঁদ সূর্য গ্রহ তারা শূন্যে বাঁধে ঘর,
আলো বাঁধে ঘর দেখো অন্ধকারে; দুই তীর দিয়ে বাঁধে নদীও নিজেকে
সমুদ্রে পড়ার আগে। জীবনের সেই এক বৃত্তে ঘুরি আমরা প্রত্যেকে।
জন্মেই মৃত্যুর চিন্তা, প্রেমে জাগে বিচ্ছেদের ভয়, পদে পদে ভুল ভ্রান্তি
অথচ জীবন তার চেয়ে বড়, ঢের ঢের বড়; শিশিরবিন্দুর শান্তি
ঘাসের ডগায় দোলে, পুলকিত পত্রগুচ্ছ বাতাসের নিশ্বাসে নিশ্বাসে
হাত নেড়ে বলে: বাঁধো, নীড় বাঁধো; লাবণ্য, একবার তুমি তাকাও আকাশে।'*

লাবণ্য। [স্তব্ধ শান্ত চোখে] খুব সুন্দর!

---

* সুভাষ মুখোপাধ্যায়

প্রণব। লাবণ্য, তাহলে আমি তোমাকে—

লাবণ্য। এবার যাও।

প্রণব। [একটু থেমে] চলে যাওয়া কি এতই সহজ?

লাবণ্য। থাকা আরও শক্ত হবে। অনেক দিন থেকেছি। এবার একটু নড়েচড়ে দেখি।

প্রণব। বেশ। লাবণ্যহীন হয়ে আমি লাবণ্যকে চাই না।

[একটি লাল গোলাপ ফুল পকেট থেকে বার করে কবিতার কাগজটি সমেত টেবিলের ওপর রাখে।]

লাবণ্য! লাবণ্য! আমাদের জীবনে তখনও লাবণ্য ছিল, তাই এইসব নাম রাখা হত।

প্রণব। [একটু চেয়ে থেকে] এখনও আছে। [থেমে] তাহলে আমি আসি?

লাবণ্য। এসো।

[প্রণব আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।]

লাবণ্য। ওকে আমি বাঁচিয়ে দিলাম।

[হঠাৎ হাসে। ফুলটি তুলে নিয়ে খোঁপায় গোঁজে। কবিতাটি তুলে নেয়।]

—'...পুলকিত পত্রগুচ্ছ বাতাসের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

হাত নেড়ে বলে বাঁধো, নীড় বাঁধো; লাবণ্য, একবার তুমি তাকাও আকাশে।'

[লাবণ্য আকাশের দিকে তাকায়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। হাসে।]

—একবার তাহলে খুঁজতে বেরুনো যাক। জীবনের লাবণ্য...লাবণ্যের জীবন...

কবিতাটি পড়তে পড়তে লাবণ্য স্বচ্ছন্দ পায়ে হেঁটে বেরিয়ে যায়।

॥ যবনিকা ॥

রোম্যাঁ রলাঁর ভারত ডায়েরী

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আগামী বছর, অর্থাৎ ১৯৬৬-তে, রোম্যাঁ রলাঁর শতবার্ষিকী পালিত হবে। তার তোড়জোড় ইতিমধ্যেই সুরু হ'য়ে গেছে দেশে দেশান্তরে—শোনা যাচ্ছে, উৎসবের সেই একতানে ভারতবর্ষও বাদ থাকবে না। এবং সেটাই উচিত, সেটাই স্বাভাবিক। মাক্স মুলার যেমন প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে একটি আধুনিক যুগোপযোগী ও দেশদেশান্তরব্যাপী আগ্রহের জন্ম দিলেন, অনেকটা ঠিক তেমনি ক'রেই নব্য ভারতকে পাশ্চাত্ত্যে প্রথম প্রচার করলেন রলাঁ। ভারতীয়দের কাছে রলাঁ বিংশ শতাব্দীর এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকই নন শুধু, এক বিরাট ভারতপ্রেমিকও। আমাদের সকলেরই চোখে তাঁর এই আসন্ন শতবার্ষিকীর তাই একটি বিশেষ অর্থ আছে।

রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও গান্ধীর উপর তাঁর রচনাগুলির কথা সকলেই জানেন—পৃথিবীর বহু ভাষায় যেগুলি অনূদিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বা গান্ধীর প্রতি তাঁর যে-আন্তরিক হৃদ্যতা, তাও সর্বজনবিদিত। তাঁর ভারতপ্রেমের প্রমাণ হিসেবে আরো একটি প্রচণ্ড রচনা আছে, যা আজো অত্যন্ত অল্প পরিচিত, কারণ তার কোনো ইংরেজী অনুবাদ হয় নি এখনো। রলাঁর আসন্ন শতবার্ষিকীকে উপলক্ষ্য ক'রে তাঁর সেই রচনাটির অতি সামান্য ও আংশিক একটি পরিচয় আমি এখানে দিচ্ছি।

রচনাটি হ'ল তাঁর ভারত ডায়েরী, রক্ষিত ১৯১৫ হ'তে ১৯৪৩ পর্যন্ত—ছয় শতাধিক পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র মহাভারত, ও যাতে আলোচনা আমাদের পরিচিত ও নমস্য প্রায় সকল ভারতীয়ের, আলোচনা বিশেষত রবীন্দ্রনাথের, গান্ধীর, জগদীশচন্দ্র বসুর, নেহরুর। এক কথায়, আধুনিক সমস্ত ভারতীয়ের একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। অবশ্যপাঠ্য এই কারণে যে গ্রন্থটিতে সর্বত্র প্রতিভাত এক আশ্চর্য বিদগ্ধ, সংস্কৃত, জাগ্রত, সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিদীপ্ত মনই শুধু নয়, তাতে পরিচয় ভারতের প্রতি রলাঁর এক অদ্ভুত প্রেম-প্রণোদিত জ্ঞানের। অথচ সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হ'ল যা, তা হচ্ছে তাঁর এত ভালোবাসা ও এত জ্ঞান যে-ভারতকে নিয়ে, সে-ভারতের মাটীতে তিনি কোনোদিন পদার্পণ করেন নি। এ-বিষয়েও মিল তাঁর মাক্স মুলারের সঙ্গে।

অবশ্য রলাঁর এই ডায়েরীটি সমগ্রভাবে অনূদিত হ'য়ে আজ যদি প্রকাশিত হয় তো অন্তত ভারতবর্ষে হৈ চৈ প'ড়ে যাবে। কারণ তাতে অনেক উক্তি আছে (যা রলাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, ও অংশত হয়তো যুক্তিযুক্তও) যা অপ্রিয়। বহু ভারতীয় ও কতিপয় বিখ্যাত ভারতপ্রেমিক বিদেশী—যাঁদের অনেকেই আজো জীবিত—তাঁদের সম্বন্ধেও বেশ কিছু অপ্রিয় ভাষণে মেতেছেন রলাঁ। সর্বত্রই তিনি নিজে যেটিকে সত্য ব'লে জেনেছেন বা বুঝেছেন, সেটিই বলতে চেয়েছেন। এখানে দুয়েকটি উদাহরণ দিই।

১৯২৬-এর ২৭শে জুন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এক জায়গায় লিখছেন: 'হায়, ভারতবর্ষ শুধু একটি নাম মাত্র, একটি মূর্তির নাম। তা বাস্তব নয়। তার অস্তিত্ব নেই। তার এক প্রদেশের জীবনের সঙ্গে পাশের প্রদেশের জীবনের সংযোগ নেই। পাঞ্জাবে কী হচ্ছে, তা জানতে বাংলায় আগ্রহ নেই। একতার অস্তিত্ব যদি

থাকে কোথাও তো তা আছে কেবল রাজনৈতিক বক্তৃতায়। শুধু কথা আর কথা। এক অমানুষিকতম অহমিকা, অথবা এক অতি গভীর উপেক্ষা, এক শেষ ঔদাস্য। রাজনীতিতে মত্ত যাঁরা, তাঁরা নিজের কাজটি গুছোচ্ছেন, যেমন পৃথিবীর সর্বত্রই। কিন্তু ভারতের জনগণ প'ড়ে আছে মূক, বিচারশক্তিরহিত, উদাসীন—এমন অবস্থা পৃথিবীর অন্য কোনো জনগণেরই নয়।'

আরেক জায়গায় লিখছেন, ১৯২৩-এর সেপ্টেম্বরে : 'হিন্দু জাতির কী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কী বিভিন্নতা! বাঙালীরা বুদ্ধিজীবী আর্টিষ্ট। রাজনীতির ধাত মারাঠীদের, সেখান থেকে বেরোলেন তিলক ও গোখলে। বোম্বাই পার্সীদের সহর, বড় বড় ব্যবসায়ীর জায়গা। গুজরাট গান্ধীকে নিয়ে দেখাল তার আন্তর্জাতিকতার ভাব, তার কর্মযোগী প্রতিভা।'

একটু অন্য ধরনের আরেকটি উক্তি। '৩১শে মে, ১৯২৬—লাজপৎ রায় দেখা করতে এলেন, মোটরে চ'ড়ে, সঙ্গে এক ভারতীয় বন্ধু ও বন্ধুপত্নী।...এ্যাদ্দিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠেছেন, গায়ে শক্তি ফিরে এসেছে, হাসছেন হো হো ক'রে। ভদ্রলোক চালাক ব্যক্তি, ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে তিনি সব থেকে চালাক, সন্দেহ নেই—তবে এ'কে আমার বিশেষ ভালো লাগে বলতে পারি না। কারণ ইউরোপে এ'র সগোত্র অনেককেই বিলক্ষণ চিনি। গান্ধীর অনেক কালের বন্ধু হ'য়েও সবচেয়ে কম গান্ধীবাদী এই ভদ্রলোক। লড়াই-এর প্রবৃত্তি এ'র একেবারে হাড়ে-হাড়ে মজ্জায় মজ্জায়। এবং ঘোর জাতীয়তাবাদী হিন্দু (অবশ্য বুদ্ধিও আছে, যদিও সব থেকে বেশি আছে যা, তা আবেগ ও এক ধরনের অগম্য অভেদ্য গোঁড়ামি)। বললেন, হিন্দু-মুসলমানের বর্তমান দাঙ্গার খবরে তিনি উৎফুল্ল। 'এই-ই ভালো। এটাই হওয়া উচিত ছিল। এবার আবহাওয়াটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।' পরে বললেন—এমন এক দাম্ভিক আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে, যার অংশ আমি কোনোমতেই গ্রহণ করতে স্বীকৃত নই—'আমাদের সঙ্গে একটা কোনো চুক্তি এবার মুসলমানদের পক্ষেও আরো সহজে সম্ভব হবে, কারণ এতদিনে ওরা বুঝেছে কাদের সঙ্গে ওদের চলতে হবে।'—এই মারপিটের রাজনীতি, এই যুদ্ধাভিলাষ শান্তির স্বার্থে, এসব কি আর জানি না আমরা এখানে! এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পড়ে আগামী বছরের মধ্যেই নাকি হিন্দু-মুসলমানের শান্তি স্থাপিত হবে, ঘোষণা করলেন লাজপৎ রায়। এমন কি এতদূরও তিনি বলতে চাইলেন যে স্বয়ং গান্ধী পর্যন্ত নাকি এইসব অশান্তি হ'তে নিজেকে সরিয়ে আনছেন। গান্ধী নাকি এতদিনে বুঝেছেন যে এ-দাঙ্গা কিছুতেই ঠেকানো সম্ভব নয়, এবং এ-অবস্থায় একমাত্র করণীয় যা, তা ঘটনার অনিবার্য প্রবাহকে চলতে দেওয়া, শেষ পর্যন্ত যা হবে, যে-শিক্ষা পাওয়া যাবে, তাকে মেনে নেওয়া। লাজপৎ রায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে জেনিভায় এসেছিলেন—পথে লণ্ডন হ'য়ে আসেন, যখন সেখানে বিরাট ধর্মঘট চলছে।'

আরেকটি ছোট, সুন্দর চিত্র, এবার গান্ধীকে নিয়ে। একবার গান্ধী এসেছেন, দেখা হয়েছে রলাঁর সঙ্গে, চ'লে যাচ্ছেন। রলাঁ লিখছেন, ১৯৩১-এর ১১ই ডিসেম্বর : 'গান্ধীর যাবার দিন সকালে তাঁকে একটি উপহার দিলাম। উনি আমায় ঠাট্টা ক'রে বলছিলেন, 'আপনি সব্বাইকেই উপহার দিয়ে বেড়ান, কেবল আমিই কিছু পেলাম না। তখন তাঁকে বলি, 'আপনাকে দেবার মত কী আছে আমার, বলুন! আপনি তো কিছুই রাখবেন না। দামী কোনো উপহার যদি দিই তো হয় সেটাকে আপনি ফেলে যাবেন, নয়তো বিক্রী করবেন আপনার কাজের জন্য।' (একবার এইভাবে তিনি আমার কাছে একটা সোনার মেডেল রেখে

চ'লে যান। সে-মেডেলের ওপর তাঁর নাম যত্ন ক'রে খোদিত ছিল। মেডেলটা তাঁকে দেন ব্রাসেলসের আন্তর্জাতিক ভবনের কর্তা অৎলে।)—অতএব শেষ পর্যন্ত তাঁকে একটা উপহার দিলামই: সোবিয়েৎ রাশিয়ার পালেখ সহর থেকে একটি ছোট্ট সুন্দর রং-করা গালার বাক্স—ঢাকনাটার ওপরে খাসা এক রাখালের ছবি, মাঠে বাঁশি বাজাচ্ছে। গান্ধী সেটি নিয়ে বেশ নাড়লেন-চাড়লেন, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন, বললেন: 'কিন্তু এটা নিয়ে করব কী?' কাছেই ছিলেন একজন, বললেন: 'কেন, আপনার ওষুধের বড়ি রাখবেন এর ভিতরে, এই ধরুন সর্দি-কাশির বড়ি! 'বাঃ,' ব'লে উঠলেন গান্ধী, 'অর্থাৎ কী ক'রে আমায় সারাজীবন সর্দি-কাশিতে ভুগতে হয়, এখন থেকে সেই চেষ্টা দেখতে হবে?'

২৮শে ডিসেম্বর গান্ধী বোম্বাই পেঁৗচোচ্ছেন।'

রলাঁর চোখে গান্ধী নিশ্চয়ই ছিলেন একমাত্র জীবিত ভারতীয়, যাঁর তুলনা নেই, যিনি সব চেয়ে শ্রদ্ধেয়—এই ডায়েরীটি পড়ার পর এমন ধারণা না হ'য়ে উপায় নেই। গ্রন্থের শেষার্ধ প্রায় সমগ্রভাবে গান্ধীকে কেন্দ্র ক'রেই লিখিত। তবে এ-কথাও সত্য, তাঁর এই বিপুল ও অটল শ্রদ্ধা সত্ত্বেও গান্ধী সম্বন্ধে কোনো আকস্মিক নতুন আলোকপাত রলাঁ করেন না। তাঁর সেই নতুন আলোকপাত দেখি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে, বহুবার। কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে এই বিশ্ববরেণ্য ফরাসী যে-ভাবে নিত্য-নূতন ক'রে আবিষ্কার করেছেন, তা যেমন অভিনব তেমনি মৌলিক। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানে আজো কতটা ঘাটতি আছে, তা রলাঁকে না পড়লে পরিষ্কার হবে না।

অন্য সকল ভারতীয়ের মধ্যে রলাঁর অন্তরের নিকটতম যিনি ছিলেন, তিনি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ। এই রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর যেমন শ্রদ্ধা, তেমনি এক নামহীন সংজ্ঞাতীত স্নেহ (বয়সে রবীন্দ্রনাথ থেকে তিনি পাঁচ বছরের ছোট ছিলেন), এক আশ্চর্য আকুল ভালোবাসা। কখনো আবার রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর রাগ, মান, অভিমান। রলাঁ সব সময় পছন্দ ক'রে উঠতে পারেন নি যে রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে, ভগ্ন স্বাস্থ্যে বার বার পাশ্চাত্ত্যে আসবেন ভিক্ষার ঝুলি (শান্তিনিকেতনের জন্য) কাঁধে ক'রে, নিজেকে এভাবে বিদেশীদের চোখে কৃপার পাত্র ক'রে তুলবেন। শেষের দিকে বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অসন্তোষের আরো একটি মস্ত বড় কারণ ঘটে রলাঁর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটু আগেই রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন ফ্যাসিস্ট ইতালী ও মুসোলিনীর অত্যধিক প্রিয়পাত্র হ'য়ে ওঠেন, এবং ফ্যাসিস্ট অভিসন্ধির কিছু না বুঝেই বা না জেনেই রবীন্দ্রনাথও হঠাৎ ইতালী ও মুসোলিনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন—এ-ঘটনায় রলাঁ ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত পীড়িত বোধ করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় বলে রবীন্দ্রনাথকে মেনে না নিতে পারার আরো একটি তৃতীয় কারণ ছিল রলাঁর। মনে হয়, দেশহিতৈষী ও সমাজসেবী রবীন্দ্রনাথকে ঠিক সম্পূর্ণভাবে জেনে উঠতে পারেননি রলাঁ—অথবা এমনও হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের সমাজসেবার পন্থাটাকে উচিত পন্থা বলে মনে মনে মেনে নিতে দ্বিধা ছিল তাঁর। রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে দেখেন মূলত কবি হিসেবে, আর্টের এক জাজ্বল্যমান (এমন কি চোখ-ঝলসে-যাওয়া) মূর্ত প্রতীক হিসেবে।

অবশ্য রলাঁর মতামত সম্বন্ধে আমাদের টীকাটিপ্পনীর কোনো প্রয়োজন নেই এখানে। এবং সব সত্ত্বেও এ-কথা কিছু কম সত্য নয় যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার ঘটনাটি রলাঁর অন্তরতর জীবনের পক্ষে একটা প্রচণ্ড মূল্যবান বস্তু। তাঁর এই ভারত ডায়েরী অর্ধেকের ওপর শুধু রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই। দু' তিনটি বিশেষ অংশ এখানে উদ্ধৃত করি।

আরম্ভ করা যাক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর স্মরণীয় প্রথম সাক্ষাৎটি দিয়ে। রলাঁ

লিখছেন ১৯২১-এর ১৯শে এপ্রিল: 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছেন, তাঁর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে। পারীতে এসেছেন দিন আষ্টেকের জন্যে, আছেন ওতুর দ্যু মঁদ-এ, ৯, কে দ্যু কাত্র সেপ্তাঁব্র—বুলইন স্যুর সেন-এ। পোশাক তাঁর ভারতীয়, মাথায় কালো ভেলভেটের উঁচু টুপি, গায়ে ঘি রঙের লম্বা জোব্বা। বেশ সুপুরুষ, একটু ভয়ংকর বেশি সুপুরুষই—দীর্ঘাকৃতি, সুশ্রী ক্লাসিকাল মুখ, পরিপূর্ণ আর্য চেহারা; গায়ের রঙের এমন একটি উত্তাপ যা সোনার সূর্যকে জীবন দেয়। চোখের পাতার স্নিগ্ধ ছায়ার তলায় দুটি ভাস্বর ঈষৎ কটা চোখ, মধ্য ভাগটি একটু বেশি কালো দুপাশের দুই ধবধবে সাদা ভাগের মধ্যে। সমস্ত মুখটি উচ্চ নাসিকা, শুভ্র গুম্ফের নীচেই সহাস্য মুখ, সযত্ন বর্ধিত শ্মশ্রুরাশি বিভক্ত তিনভাগে, ঝলমল করছে, এক শান্ত অথচ উচ্ছল আনন্দে, সে আনন্দ যেন ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে তাঁর কথায়। কথা বলেন শুধু ইংরেজীতে, আমার ভগিনী তা পরে ফরাসীতে আমাকে বোঝান। দেখতে একেবারে আমাদের পুরাণের যাজকের মত। তবে সুখের কথা, তাঁর ব্যবহার সহজ ও নম্র। যা কিছু বলেন, তা মধুর ও স্বতস্ফূর্ত। রইলেন ঘণ্টা দেড়েক, অনেক কথা বললেন। হাস্যমুখর, বুদ্ধিদীপ্ত কথা, যা সহজে আসে তাঁর মুখে। কথার মধ্য দিয়ে প্রায়ই ছবির সৃষ্টি করেন।

'ভারতে তিনি এক প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, সেখানে আনতে চান এশিয়ার সর্বত্র হ'তে বড় বড় অধ্যাপক, গ'ড়ে তুলতে চান ইউরোপীয় ও ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে একটি মেলামেশার আবহাওয়া। তাঁর স্বাভাবিক মধুর শালীনতা সত্ত্বেও এটুকু বুঝতে দেরী হয় না যে বুদ্ধির ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে ইউরোপ থেকে এশিয়ার—বিশেষত ভারতের—শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ নেই। ইউরোপ, তাঁর মতে, যেন এক সুদক্ষ কারিগর, সে তৈরী করেছে এক চমৎকার বাদ্যযন্ত্র। কিন্তু গান তো তার আসে না। তাতে গান বাজানোর দায়িত্ব নেবে ভারতবর্ষ। রবীন্দ্রনাথ আরো বললেন, ভারতীয়েরাই পারবে আদর্শ শান্তির ভিত্তিস্থাপন করতে (এ-সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস সুদৃঢ়)—যে-শান্তিকে বৃথাই খুঁজে মরছে পৃথিবীর আর সবাই। কারণ তাঁর জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যই নাকি এমন। হিংসার দ্বারা হিংসার প্রতিবাদে তিনি কখনো সম্মত নন। এবং তাঁর আদর্শ যে অপ্রতিরোধ, তা যে আজ গান্ধী তুলে ধরছেন এক জাগ্রত কর্মচেতনার দ্বারা সমৃদ্ধ ক'রে। ভারতের অন্তর্নিহিত এই অপ্রতিরোধ দর্শনের ঐহিক শক্তি এমনি যে তা যুগযুগান্তের অজস্র বিদেশী আক্রমণ আজ পর্যন্ত সমানে ব্যর্থ ক'রে এসেছে। আমি তখন বললাম, তাঁর সেই অপ্রতিরোধ কার্যকরী ও সহজসিদ্ধ হ'তে পারে তখনি যখন তা সম্পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে সমগ্র জাতির, যে-জাতি তার আদর্শ সম্বন্ধে নিশ্চিত, তার আশ্চর্য ক্ষমতায় শক্তিমান, তার সব প্রশ্নের শেষ উত্তরটি যে জানে। পাশ্চাত্ত্যের পক্ষে সমস্যাটা একটু অন্য-রকমের ও গণ্ডগোলে; কারণ পাশ্চাত্ত্যের জাতিদের সব সময়ই ভয় এই বুঝি তাদের লোপ ঘটে। দুরকমের শান্তি: এক শান্তি ত্যাগের দ্বারা, জীবনের দৈন্য স্বীকারের দ্বারা। অন্য শান্তি নিজের ক্ষমতায় অটল বিশ্বাসের দ্বারা, জীবনশক্তির অতি প্রাচুর্যের দ্বারা। এই দ্বিতীয় ধরনের যে-শান্তি, তাকে প্রয়োগ ক'রে কার্যকরী করার বিলাসিতা ভারতেরই পক্ষে সম্ভব। শেষ নিরীক্ষায় আসল প্রশ্ন যা, তা শক্তিরই। পাশ্চাত্ত্যে সর্বত্র প্রসারিত যে-চরম পাশবিকতা, তা রবীন্দ্রনাথের কাছে বিভীষিকার মত, এবং তা তিনি খোলাখুলিই জানালেন। এ সহ্য করা তাঁর সাধ্যাতীত, এখানে বাস করতে তিনি পারবেন না। আমাদের কথা অবশ্য আলাদা, এ-বিভীষিকা থেকে আমরা কখনো বেরোই নি, তাই তা আমাদের

এত গা-সওয়া হয়ে গেছে যে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমরা যেন আর সচেতন নই। কিন্তু একজন ভারতীয় এ-সবের মধ্য দিয়ে যাবে কেমন ক'রে, ঘৃণায় শিহরিত না হ'য়ে? তার দশা হবে নরকের সামনে দান্তের দশার মত। জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা, শিকারে হত্যার পাশবিক মত্ততা, এসবই বিশেষ ক'রে অসহ্য ঠেকে রবীন্দ্রনাথের। তাঁর কাছে এগুলো শুধু একটি অনুভূতিপ্রবণতার ব্যাপারই নয়, মনুষ্যত্বের সমগ্র মহিমা নিয়ে প্রশ্ন এখানে। তাঁর চোখে এসব কান্ড ঘৃণ্য, পাশবিক। তবে যা সবচেয়ে অসহ্য ঠেকে তাঁর, যা সব থেকে দুঃসহ ভার, তা উত্তর আমেরিকা। তাঁর কাছে তা দুঃস্বপ্নের মত। ভারতের যে-শান্তি ও স্থির সুষমার ছবি তিনি তুলে ধরলেন, তাতে তাঁকে বলতে প্রলুব্ধ হলাম যে আমার মত অনেক ইউরোপীয়ই বর্তমান যুগের পাশবিকতার বিরুদ্ধে বৃথাই একটি উত্তর খুঁজে মরছেন, জগতে খুঁজছেন একটি আশ্রয়—তবে আমরা বেছে নিই ভারতবর্ষকেই। স্নেহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ভারতে তাঁর আতিথ্য গ্রহণের নিমন্ত্রণ জানালেন আমায়।

'আমি জানতে চাইলাম, একথা কি সত্যি যে টলস্টয়ের লেখা ভারতে অত্যন্ত বিদিত? উনি বললেন, ও'র মনে হয় তাই, তবে টলস্টয়কে যে ভারতীয়েরা বুঝতে পারেনি, এ-বিষয়ে ও'র সন্দেহ নেই। গান্ধীর দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি টলস্টয় থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন—কিন্তু তা ভুল। গান্ধীর অপ্রতিরোধবাদের সঙ্গে টলস্টয়ের কোনো যোগসূত্র নেই। মনে হয়, হয়তো টলস্টয়কে রবীন্দ্রনাথ খুব পছন্দ করেন না। তাঁর পক্ষে অসহ্য (সমস্ত হিন্দুর পক্ষেই অসহ্য, তিনি বললেন) টলস্টয়ের নীতির কৃচ্ছ্রতা, তাঁর যাজক-যাজক ভাব। ভারতের আকাশ ও প্রকৃতির তা উপযুক্ত নয়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে আস্তিন গুটিয়ে যে-কৃচ্ছ্রতা ও ত্যাগ, তা ভালো পাশ্চাত্যের পক্ষে (এবং হয়তো জাপানেরও পক্ষে), কারণ জাপান ও পাশ্চাত্য প্রবলভাবে আঘাতপ্রবণ, আক্রমণের নেশা তাদের, তাদের আবেগকে দমন না ক'রে উপায় নেই তাদের। যে-শক্তির দরকার ভারতে, তা দমন করার নয়, জাগিয়ে তোলার। মোটামুটি বলতে গেলে, ইউরোপের আর্ট ও চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় আর কিছুই দেখেননি, দেখেছেন শুধু এক যুদ্ধের ভাব, এক শেষহীন সংগ্রাম। এবং তা তাঁকে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করেনি।

'সংগীত নিয়ে আমাদের অনেক আলোচনা হ'ল। ইচ্ছা ক'রে রবীন্দ্রনাথ শুনলেন অনেক ইউরোপীয় সুর, সবই বেহালায়—বাক, বীতোফেন, দ্যব্যুস্সি, ইত্যাদি। বললেন, এই সংগীত উনি বুঝতে পারেন, ও'র ভালো লাগে। বিশেষ ক'রে বাক তাঁর মনের অনেকটা কাছাকাছি নাকি, তাও বললেন (আমি তো শুনে বেশ একটু আশ্চর্যই হলাম)। ভাগনারের অপেরা শোনার নাকি প্রচলন আছে ভারতে। ভারতীয়েরা যদিও প্রায় পুরো-পুরি কণ্ঠসংগীতেরই প্রেমিক (অথবা হয়তো সেই কারণেই), ভাগনারের গানের চেয়ে তাঁর অর্কেস্ট্রা নাকি তাদের আরো অনেক ভালো লাগে। (ভাগনারের সংগীত সম্বন্ধে আমিও তাদের মতাবলম্বী)।—রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতায় নিজেই সুর বসান—বলেন, সংগীতের ক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহী। পুরোনো জিনিস ও ভাবকে তিনি নতুন ক'রে ঢেলেছেন, রাগ-রাগিণীর নিয়মকানুনও সব সময় মানেন না। তাঁর সুর, তাঁর সংগীত একেবারে তাঁর নিজস্ব। এ-বিষয়ে তাঁর দেশবাসীদের কাছ থেকে তিনি প্রভূত উৎসাহ পেয়েছেন। আজ তাঁর সংগীত লোকে নিয়েছে, তাঁর গান লোকের মুখে মুখে ফেরে—তা তিনি নিজে শুনেছেন।

'উনি অবশ্য কথাটা নিজেই পাড়তেন না, কিন্তু আমি বলাতে আমার সঙ্গে একমত

হলেন যে ভারত-ঘেঁষা ইউরোপীয়দের ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান প্রায়ই অগভীর—ভারত সম্বন্ধে তাঁদের যে-নম্র শালীনতা, তা যেন মনে খানিকটা বিদ্রোহের ভাব জাগায়, সেই শালীনতা দেখিয়ে তাঁরা যেন ভারতকে বাঁচিয়ে চলতে চান, তাঁদের ভাবখানা এমনি। ইংরেজরা (তাঁদের কেউ-কেউ) খুব চেষ্টা করেন, ভারতবর্ষকে বোঝেনও কখনো কখনো বেশ, কিন্তু তাকে কিছুতেই হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারেন না—অভাব সহানুভূতিশীল কল্পনা-শক্তির। রবীন্দ্রনাথের তাই ধারণা। আমরা দুজনেই এ-বিষয়ে একমত হলাম যে অন্য জাতির হৃদয়কে বোঝার ক্ষমতা বোধ হয় রুশদেরই সবচেয়ে বেশি, এবং হয়তো তারা একদিন এশিয়া ও ইউরোপের মিলনে মধ্যস্থতা করতে নামবে।

'(রবীন্দ্রনাথ বললেন, জাপানে তিনি নাকি প্রচণ্ড উৎসাহের সাড়া পেয়েছেন—যেখানেই গেছেন, লোকে নাকি জয়ধ্বনি ক'রে তাঁর সম্বর্ধনা করেছে। তাতে নাকি সেখানকার সরকার একটু ভড়কে যান ও বাধাবিপত্তির সৃষ্টি করেন। কেন্দ্রীয় সরকার তার জগদ্দল পাথরের চাপে জাপানী যুবশক্তির দম যেন বন্ধ করতে চায়, তাও বললেন রবীন্দ্রনাথ)।

'(রবীন্দ্রনাথের পুত্রের বয়স দেখে বিশ বছরের বেশি ব'লে মনে হয় না—যদিও তার চেয়ে বড় তিনি। তাঁর পরনে বিলিতি পোশাক, মাথায় এক ধরনের ফেজ টুপি। কথা বলেনই না—দেখে মনে হয় বুদ্ধিমান, ও জাগ্রত। গায়ের রং কিন্তু একেবারেই পিতার মত নয়। বহু রক্তের সংমিশ্রণে হিন্দু জাতি, তাতে কৃষ্ণবর্ণের অংশ বা অবদান সামান্য নয়—রবীন্দ্রনাথের পুত্রকে দেখে তাই মনে হয়। দেখে তাঁকে ভারতীয় মুসলমান ব'লে ভুল হয়)।'

প্রথম প্রথম রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শারীরিক উপস্থিতির এক বিহ্বল-করা আবেশ যেন কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেন না রলাঁ। দুদিন পরেই, অর্থাৎ ১৯২১-এর ২১শে এপ্রিল, তাঁকে আবার লিখতে দেখি: 'যখন উনি আমার বোনকে ইংরেজীতে তাঁর বক্তব্য বলতে থাকেন, আমি হাঁ ক'রে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। কী আশ্চর্য সৌন্দর্য এই মুখের, নাকের, চোখের—এক গর্বিত শ্রীর ছাপ সেই মুখে সর্বত্র। তাঁর যে সৌম্য প্রশান্তির ভাবটা গোড়াতেই নজরে পড়েছিল, তার মধ্যে কিন্তু এক গাঢ় বিষাদও প্রতিভাত—তাঁর দৃষ্টি যেন বিদ্ধ করে, সে মানুষকে চেনে ভ্রমহীন দৃষ্টিতে, তাঁর জাগ্রত বীর্যপূর্ণ বুদ্ধি-শক্তি সর্বদাই প্রস্তুত সমস্ত যুদ্ধের সম্মুখীন হ'তে—যদিও চিত্তের গভীরে তিনি অবিচলিত, এই রীতিই নিয়েছেন তিনি। (কিছুদিন আগে ট্স্ভাইগের একটা চিঠি পেয়েছি, লিখেছেন জার্মানীতে তাঁরা নাকি রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠিতম বার্ষিকীর আয়োজনে মাতছেন—ফ্রান্সে তো লোকে কিছু জানেও না, হয়তো ইংলন্ডেও না।) ওঁকে দেখে কিন্তু এত বয়স ব'লে মনে হয় না, এমন কি আমার থেকেও ও'র বয়স কম ব'লে মনে হয়। অবশ্য চুল-টুল সব খুবই পেকে গিয়েছে, কানের কাছটায় নেমে-আসা গুচ্ছগুলো তো একেবারে ধবধবে সাদা। গায়ের রং এক তপ্ত গৌর, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ম। যতক্ষণ কথা বলেন, একবারও কিন্তু আমার বোনের দিকে তাকান না—কথা আমার বোনকেই বলেন, কারণ সে-ই তো পরে আমায় ফরাসীতে বোঝাবে উনি কী বললেন—ওর দিকে তাকান কথা একেবারে শেষ ক'রে। তখন হাসেন, সরাসরি চান মুখের দিকে, কিন্তু মাত্র একটি মুহূর্তের জন্যেই, পরক্ষণেই আবার চোখ নামিয়ে নেন। বিদায় নেওয়ার সময় আমাদের হাতে হাত মেলান, পরে যুক্তকরে নমস্কার জানান প্রার্থনার ভঙ্গীতে।'

একেবারে প্রায় একই কথা রলাঁ বলছেন পাঁচ বছর পরেও, ১৯২৬-এর ২৫শে জুন।

'রবীন্দ্রনাথ যখন কথা বলতে থাকেন, আমি তাঁর শান্ত সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। সে-মুখের এক দীপ্ত গৌরবর্ণ আভা, তার সব কিছুই সংগতিপূর্ণ, এমন কি কুঞ্চিত রেখাগুলি পর্যন্ত, যা তাদের বিশৃংখলতার দ্বারা অধিকাংশ মুখকেই বিকৃত ক'রে তোলে। কিন্তু তাঁর মুখের রেখাগুলি শুধু সুন্দরই নয়, তা যেন এক সংহত, সঙ্ঘবদ্ধ ঢেউয়ের শ্রেণী। নাকের খুব কাছের রেখাগুলি যেন দেউড়ির ভাস্কর্য, যেন বাড়ীর সদর দরজার উপরে অঙ্কিত কারুকার্য। উপরের রেখাগুলিও এক কেন্দ্রীভূত সৌন্দর্যে বিধৃত। তা ক্ষণে ক্ষণে মিলিয়ে যায়, যেমন হাওয়ায় তরঙ্গ ভাঙে মুহূর্তে-মুহূর্তে—তা কখনো জমাট বাঁধে না, শিলীভূত হয় না।

'আর তাঁর নিজের কথা—যা তিনি নিজেই শুনতে একটু বেশি ভালোবাসেন, অথবা যার ধীর, তরল, মিষ্ট একটানা সুরটি নিয়ে খেলা করতে তিনি বড্ড পছন্দ করেন (একেবারে জাত বাগ্মী ইনি, প্রকাশ্যে অর্ধচড়া সুরে কথায় কথায় অভিনব চিন্তা ও ভাবের সৃজনে এঁ'র জুড়ি নেই—অবশ্য এসব কথা শোনানোর জন্যে লোক চাই তাঁর, যাদের 'সামনে' {ততটা 'সঙ্গে' নয়} তিনি কথা বলবেন)—তাঁর সেই কথার ব্যাপারেও আমি বারবার দেখেছি, হয়তো বহু অভ্যাসেরই দরুন কেমন চেষ্টা না ক'রেই তাঁর প্রকাশ্যে উচ্চারিত স্বগতোক্তিগুলি (যেগুলিকে তিনি অবশ্য অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে মনে করেন) শেষ পর্যন্ত ঠিক একই চিন্তা ও বক্তব্যের বিষয়ে ফিরে আসে। প্রারম্ভের ও শেষের কথা মনে হয় একই, যদিও মাঝখানের যুক্তি ও কথায় সে-সম্বন্ধ হয়তো একেবারেই প্রত্যক্ষ নয়, বরং তা কখনো কখনো কষ্টকল্পিত, অপ্রত্যাশিত।'

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে রলাঁর আরো দুয়েকটি মৌলিক মন্তব্য শোনাই। লিখছেন ১৯২৬-এর ৪ঠা জুলাই : 'রবীন্দ্রনাথের বয়স হয়েছে, স্বাস্থ্যও ভগ্ন, সন্দেহ নেই। এই তো মাত্র তিন বছর আগে যখন তাঁকে পারীতে দেখি, তাঁর কথাবর্তায় ও কর্মে যে-এক শক্তির দৃঢ়তা অনুভব করেছিলাম তখন, আজ তা নেই। কিন্তু এ-ব্যাপারটা আবার খানিকটা ওঁ'র মজ্জাগতও। শান্তিনিকেতন ছাড়া অন্য কোথাও তিনি সহজ স্বচ্ছন্দ অনুভব করেন না। চাই তাঁর সেই শান্তিনিকেতন, সেই প্রকৃতি, আকাশ, গাছপালা, তাঁর নিজের লোকজন, নিজের ছেলেমেয়ে। আমাদের এই ভ্রাম্যমাণ রবির দিনরাত্রির প্রতিটি গান যে খুঁজে মরছে সেই শান্তিনিকেতনকে, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। সেই শান্তিনিকেতন ছাড়া পৃথিবীর আর সব কিছুর প্রতিই তিনি তাকান যেন একটি অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে, যেন উপর হ'তে, অনন্তকালের এক পরম পিতার ভঙ্গীতে।'

এর কিছু আগেই, ১৯২৬-এর ২১-২২শে জুন, লিখেছিলেন রলাঁ : 'তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) মুখের মহিমামণ্ডিত শান্ত শ্রী সমানই আছে। কিন্তু তাঁর যে-অটুট স্বাস্থ্য তিন চার বছর আগেও পারীতে দেখি, ও দেখে মুগ্ধ হই, তা আর নেই। রোগা হ'য়ে গেছেন, ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। সম্প্রতি কয়েকদিন ধ'রে হঠাৎ যেন আবার দুর্বল হ'য়ে পড়েছেন, নিজেই বলছিলেন। ইতালী তাঁকে একেবারে প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছে, তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে কেউ সেখানে এতটুকু নজর দেয় নি। এখানে যদি একটু সেবাশুশ্রূষা পান, অন্তত একটু বিশ্রাম পান, তাতে তিনি আপত্তি জানাবেন না, এমন ভাব দেখালেন। এবার সুইজারল্যান্ডের প্রান্তসীমা পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন, তাও বললেন। আজ তাঁর স্বর মিষ্ট, কিন্তু দুর্বল, যেন সোপ্রানোর মত। আমার মনে হচ্ছে, এই আপাত প্রশান্তির আড়ালে কিছু বিক্ষোভ লুকিয়ে আছে। ভারতে ফেরার কথা এখন থেকেই বলছেন, ১৫ই

সেপ্টেম্বরের জাহাজে জায়গা পর্যন্ত নাকি নেওয়া হ'য়ে গেছে। তার আগে—তাঁর এই ক্লান্তি সত্ত্বেও, বিশ্রাম নেওয়ার বাসনা জানানো সত্ত্বেও—তিনি একবার ঘুরে আসতে চান প্রাগ, জার্মানী, হল্যান্ড, ইংলন্ড। যেন জ্বরাক্রান্ত রোগীর মত তিনি চঞ্চল হ'য়ে পড়েছেন, একবার শেষবারের মত দেখে নিতে চান ইউরোপের দেশগুলো, তাঁর শেষের বাণীটিকে সেখানে শুনিয়ে আসতে চান।'

অবশ্য, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ আবার আসেন। এ-প্রসঙ্গে ১৯৩০-এর আগস্টের একটি উদ্ধৃতির অনেকখানি অংশ এখানে তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। উদ্ধৃতিটির নানা দ্যোতনা, ও তাতে সুপরিস্ফুট প্রকাশ ভাবুক রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানসের দুয়েকটি অল্পবিদিত দিকের। এখানেও আমাদের টীকাটিপ্পনীর কোনো প্রয়োজন নেই, শুধু রলাঁর কথাটি শোনা যাক। তিনি লিখছেন : 'দিন পনেরর জন্যে রবীন্দ্রনাথ জেনিভায় এসেছেন, খবর পাঠিয়েছেন আমাদের দেখতে চান। তাই আমার বোনকে নিয়ে হাজির হলাম (২৮শে আগস্ট) জেনিভায়। প্রথম গ্রীষ্মের কয়েকটি অস্বস্থিকর সপ্তাহের পরে এখন চমৎকার সময়, ইউরোপের অর্ধাংশে সূর্যের প্রখর তাপ। মিস গ্রেভসের পায়রার খোপের মত ছোট্ট ঘরটিতে আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজন সারলাম—ঘরটি সাত তালায়, তার আলোকিত ঐ সু-উচ্চ স্থান হ'তে জেনিভা ও আশেপাশের অঞ্চলের উপর যেন তার একচ্ছত্র দৃষ্টি চলে। (মিস গ্রেভ্‌স্ নাকি পরের দিনই আফ্রিকার স্বর্ণকূল উপলক্ষ্যে ছুটছেন—নৃবিদ্যা নিয়ে তিনি পড়াশুনা করেই চলেছেন।) সেখান থেকে গেলাম রবীন্দ্রনাথের কাছে, ও তাঁর সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক রইলাম। জেনিভার একটু বাইরেই খাসা একখানি বাড়ী তাঁর জন্যে ঠিক করা হয়েছে—বাড়ীটি একটি অধিত্যকার উপর, চারিদিকে বিরাট বাগান, গরম দেশের মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁশের বন আশেপাশে, ঐ বাগানের মধ্যেই। রবীন্দ্রনাথ সেখানে যেন তাঁর ধাতের আবহাওয়াটি খুঁজে পেয়েছেন, আকাশটিও ভাস্বর। তাই যেন তাজা হ'য়ে উঠেছেন বেশ। প্রথম দেখায় মনে হয়, তিনি একটু ছোট হ'য়ে গেছেন, কুঁকড়ে গেছেন, যেমন বৃদ্ধদের সচরাচর হ'য়ে থাকে। তাঁর সেই অভিভূতি-জাগানো ভাবটি আর নেই—জোব্বার আড়ালে দেহটাকেও মনে হয় শীর্ণ। কিন্তু মুখের সেই রক্তিমপূর্ণ ভাবটি আছে—আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পেরেই উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠেন, বন্ধুর কাছে মন খোলার অবকাশ তাঁকে নিমেষের মধ্যে জাগিয়ে তোলে, সঞ্জীবিত করে। কণ্ঠস্বর তাঁর চিরকালই তীক্ষ্ন ছিল, তা এখন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তীক্ষ্নতর, আগের চেয়ে আরো অনেক মিহি—তা আর সোপ্রানো নয়, মনে হয় যেন তেনোরিনো। এবং তা খুব বিসদৃশ লাগে ঐ পরম পিতার মত মুখের সঙ্গে, ঐ ঋষির মত লম্বা দাড়ির পাশে। আমাদের পিছনে ব'সে তাঁর দুজন সেক্রেটারী খুব একাগ্রতার সঙ্গে নোট নিয়ে চলেছেন। একজন হলেন চক্রবর্তী (অমিয় চক্রবর্তী), রবীন্দ্রনাথের বেতনভোগী সেক্রেটারী তিনি (ও যাঁর সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান আমি কয়েক বছর আগে করেছি); অন্যজন হ'লেন রাও নামে এক ভারতীয়, যিনি সস্ত্রীক জেনিভায় বাস করেন। আমাদের কথাবার্তার শেষ এ্যান্ড্রুজও এসে হাজির হলেন, তিনি সঙ্গে এসেছেন এবার এবং রবীন্দ্রনাথের শরীরের উপর নজর রাখছেন। রবীন্দ্রনাথের পুত্র-পুত্রবধূ (ছেলেটি তো অসুস্থ) বার্মিংহামে র'য়ে গেছেন।

'আমি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের উপর যা লিখেছি, তার কয়েকটি পৃষ্ঠা প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ বেশ উত্তেজিত হয়েছেন দেখছি (অবশ্য সে-বিষয়ে খোলাখুলি কোনো উচ্চবাচ্য তিনি করলেন না, তবে বুঝতে আমি ঠিকই পারলাম), এবং আমাদের কথাবার্তার প্রারম্ভেই এ-বিষয়ে

মনটাকে তিনি খোলসা করতে চাইলেন। কথা তুললেন রামমোহন রায়ের ও তাঁর পিতার, ধর্মসম্বন্ধীয় একটি সংশ্লেষণের প্রতি লক্ষ্য রেখে কী উদ্যম এই দুটি ব্যক্তি করেছেন, তাও বললেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এটাও মেনে নিলেন যে তাঁদের প্রচারিত একেশ্বরবাদ এক ধরনের অসহিষ্ণুতা হ'তে মুক্ত ছিল না। এও বললেন (এবং এটা তাঁর তির্যক উত্তর আমার কৃত সমালোচনার) যে সত্যকে কোনো কোনো বিশিষ্ট ক্ষেত্রে অসহিষ্ণু হ'তেই হয়, কারণ কতকগুলি শোচনীয় ভুল ও পাগলামিকে ক্ষমা করা সম্ভব নয়। তার থেকে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ ভীষণ আক্রমণ ক'রে বসলেন হিন্দুদের বহুদেববাদকে, এবং বিশেষ ক'রে কালীকে, কালীর পূজকগোষ্ঠীকে। এমন একটা ভয়ংকর আবেগদীপ্ত ঘৃণার সঙ্গে কথা বলতে আমি তাঁকে আগে কখনো দেখিনি। রবীন্দ্রনাথের এমন প্রচণ্ড ভাবপ্রবণতার ধাত, এবং এত সহজে তিনি অতিরিক্ত উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন, যে তাঁর পক্ষে, শৈশব হ'তে যাকে ঘৃণা করতে শিখেছেন, সারাজীবন তাকে ঘৃণা ছাড়া অন্য কিছু করা সম্ভব নয়। শৈশবের একটি ঘটনা তিনি বললেন, যা মনে করলে আজো তাঁর শরীর সমানই শিউরে ওঠে। ছেলেবেলায় একদিন নাকি কালীঘাটের মন্দিরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখেন এক দরজার চৌকাটের কাছে রক্তগঙ্গা বইছে, এবং রাস্তার একটি স্ত্রীলোক সেই রক্তে আঙুল দিয়ে তার ছেলের কপালে টিপ পরিয়ে দিল। এক হতভাগ্য পুরুতের কথা বলতে গিয়েও তিনি রাগে ও ঘৃণায় কাঁপতে থাকেন। পুরুতটি নাকি একটি ছাগলছানাকে বলি দেবার আগে তার ঘাড় ধ'রে জোরে জোরে নাড়া দিচ্ছিল, আজো তা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। মানুষের এই রক্তলোলুপ চিত্তবৃত্তি হ'তেই জন্ম নিয়েছে পৃথিবীর যত যুদ্ধ, যত জিঘাংসু পাশবিকতা—এক দেশ খুন করছে আরেক দেশকে, একজনের রক্তপানের জন্যে আরেকজন লালায়িত হচ্ছে। যত বলেন রবীন্দ্রনাথ, ততই উত্তেজিত হন। এই কালীর ব্যাপারটির মধ্যে যে কোনো প্রতীক থাকতে পারে বা এখানে যে কোনো আধ্যাত্মিক উত্তরণ সম্ভব, তা রবীন্দ্রনাথ একেবারেই মানেন না। (এখানে লক্ষ্য যে তাঁর বিবেকানন্দই, তা স্পষ্ট।) সে-মানুষ কিছুতেই সৎ বা সুস্থ হ'তে পারে না, যে কালীর উপাসনা করে, এত বড় একটা কথা পর্যন্ত ব'লে বসলেন রবীন্দ্রনাথ। এই ঘৃণ্য দেবীটিকে ধ্বংস করতে তিনি উন্মুখ। (এখানে বিবেকানন্দ যা বলেছিলেন নিবেদিতাকে, পিশাচিনী মায়ের সম্বন্ধে তাঁর সেই অপূর্ব সুন্দর কথাগুলি, তা আরো একবার পড়া উচিত)। তাঁর দেশবাসী ও তাঁর দেশের স্তূপীকৃত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ খড়্গহস্ত। এর থেকে নিরীশ্বরবাদও অনেক ভালো—তিনি বলেন—অনেক ভালো পাশ্চাত্ত্যের নঙর্থক যুক্তিবাদ, অন্তত সাময়িকভাবে এক দরকার আছে। এত দেবদেবী (বা দৈত্যদানব) ও মিথ্যার জঞ্জালকে আগে ঘর থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় না করলেই নয়। ভালো-মন্দের ঊর্ধ্বেও যে কোনো আধ্যাত্মিক দর্শন থাকতে পারে, তা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন না। ঠিক পাশ্চাত্ত্যের একজনের মতই কথা বলেন তিনি—ব্যবহারিক ভিন্ন অন্য কোনো সত্য দর্শন বা ধর্মকে তিনি মানেন না। তাঁর মতে, আজ দারকার একমাত্র যার, তা এক সামাজিক দর্শন, যা আনবে সর্বমানবের কল্যাণ।'

শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রলাঁর আগ্রহে যেন একটু একটু ক'রে ভাঁটা পড়তে থাকে। রলাঁর এই পরিবর্তিত মনোভাব কতটা যুক্তিযুক্ত অথবা কতটা যুক্তিহীন, সে-বিচারের স্থান এটা নয়। শুধু রলাঁর আরেকটি উল্লেখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে এবার শেষ করি। ১৯৩০-এর ২০শে জুন লিখতে আরম্ভ ক'রে এক জায়গায় বলছেন : 'এই মহিমাময় জীবনের শেষটা (রবীন্দ্রনাথের) কী গভীর দুঃখ ও করুণাপূর্ণ! তাঁর নিজের দেশেই আজ তিনি একলা

প'ড়ে গেছেন। দেশের আজকের যুবশক্তি তাঁর দিক হ'তে মুখ সম্পূর্ণ ফিরিয়ে নিয়েছে। শুধু গান্ধীই তাঁর হাত হ'তে ভারতের সমস্ত শক্তি কেড়ে নেন নি, তাঁর বহু বড় বড় রচনা ও উপন্যাসও যেন আজ বুড়িয়ে গেছে। "ঘরে বাইরে"-র মত বইয়ের মধ্যে আজকের ভারত তার সত্তা আর খুঁজে পায় না। সে-সামাজিক চিত্র "ঘরে বাইরে"-তে, আজ তা অতীতের বস্তু। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মন্তব্যকে আরো নতুন ক'রে তুলতে পারলেন না। দুঃখের আরো একটি কারণ হ'ল এই যে ভারতের বাইরে পৃথিবীর অন্য কোথাও আজ এমন একটিমাত্র প্রাণীও নেই যিনি রবীন্দ্রনাথের পথের পথিক, যিনি চিন্তায় তাঁর সগোত্র, ভাই। তাঁর নিকট-তম যে ছিল, সে আমি।'

তা হ'লে কি রবীন্দ্রনাথকে আর তিনি নিকটতম ব'লে মনে করতেন না? সে-প্রসঙ্গে তবে ঐ অতীত 'ছিল' কথাটি ব্যবহার করলেন কেন?

আগেই বলেছি, এই ডায়েরী রলাঁ রাখেন ১৯১৫ হ'তে ১৯৪৩ পর্যন্ত। ছয় শতাধিক পৃষ্ঠার বই, যার অর্ধেকের উপর প্রায় একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই। অথচ আশ্চর্য, ১৯৪১-এ মাত্র একটি দিন লিখেছেন: ১৫ই জুন। এবং তা রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে। এর ঠিক পরের লেখাটি ১৯৪২-এর মে'তে, সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে। যেন এই দুটি তারিখের মধ্যে তাঁর উল্লেখ করার মত কিছুই ঘটেনি, আসেনি ১৯৪১-এর ৭ই আগস্ট, এক শোকাকুল, অবিস্মরণীয় বাইশে শ্রাবণ।

ক্ষুধা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সুরেশ তার তিন পুরুষের হিসেব রাখে। তার ঠাকুর্দার, বাবার আর নিজের। তাদের এই তিন পুরুষের একটি মাত্র বিশেষত্বের কথা সে লক্ষ্য করেছে। এই বিশেষত্বটি হলো ক্ষিদে পাওয়া। তার এই তিন পুরুষের মধ্যে কেউই কখনো পেট ভরে খেতে পায়নি। সুরেশের ঠাকুর্দা ছিলেন গ্রামের যজমান পন্ডিত। এর ছেলের অন্নপ্রাশন, ওর ছেলের উপনয়ন, তার বাড়ির শ্রাদ্ধ, তাঁকে করতে হতো। যখন সূর্য ওঠে না, ভোরের আলো ভালো করে ফোটে না, সেই আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠে তিনি পুকুরে ডুব দিয়ে আসতেন, তারপর সকালের আহ্নিক সেরে নামাবলী গায়ে জড়িয়ে নিজের শালগ্রাম শিলা আর কোষাকুষি ছেঁড়া গামছায় জড়িয়ে বেরুতেন। গ্রামের জমিদার তাঁর বিরাট বাড়ির এক অংশে সত্যনারায়ণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে সুরেশের ঠাকুর্দাকে সত্যনারায়ণের পূজারী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। প্রতি সকালে সময়টা যখন না-আলো-না-অন্ধকার সুরেশের ঠাকুর্দা যেতেন জমিদারের সত্যনারায়ণকে পুজো করতে। সেখান থেকে নিজের এবং কাছাকাছি গ্রামের নানা বাড়িতে যেতেন অন্নপ্রাশন, উপনয়ন বা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সারতে। গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদে ভাজা-ভাজা হয়ে, বর্ষার ঘন প্লাবনে জবজবে অবস্থায় নিত্যনৈমিত্তিক বাড়ি ফিরতে তাঁর বিকেল গড়িয়ে আসতো। প্রসাদ হিসেবে যে আলোচাল, কাঁচকলা ও ফলমূল পেতেন তাই ফুটিয়ে সন্ধেবেলায় তাঁর আহার প্রস্তুত হতো। ভোর থেকে সেই সন্ধ্যে পর্যন্ত তিনি জলস্পর্শও করতেন না। বিকেলে খাবার আগে প্রত্যহ একই কথা তিনি বলতেন, 'এতো লোক মরে কিন্তু ক্ষিদেটা মরে না।' তারপর চাটাই বিছিয়ে পুরনো তেলচিটে বালিশটা মাথায় দিয়ে গা এলিয়ে তালপাতার পাখা দিয়ে নিজেকে বাতাস করতেন আর খানিক পর চমকে উঠে বসে বলতেন, 'নারায়ণ নারায়ণ, এই সন্ধ্যে-আহ্নিকের সময় হয়ে গেলো।'

সুরেশের ঠাকুর্দার একবার ডাক পড়লো দু'মাইল দূরে এক গ্রামে বিয়ের পৌরহিত্য করার। পাত্রকে নিয়ে বরযাত্রীর সঙ্গে সুরেশের ঠাকুর্দা পায়ে হেঁটে গেলেন সেই দু'মাইল দূরের গ্রামে। পরের দিন ভোরে তিনি খাটে শুয়ে লোকের কাঁধে চেপে নিজের গ্রামে ফেরেন দাহ হবার জন্য। বিয়ে বাড়ির ভোজ খেয়ে সেই রাতেই তিনি প্রথম বলেছিলেন, 'আঃ, ক্ষিদেটা মিটলো।' বাস্তবিকই সেই রাতেই তাঁর জীবনের সমস্ত ক্ষিদে মেটে। ভোর রাতে ভেদ-বমিতে তিনি তাঁর নামাবলী, কোষাকুষি ও শালগ্রামের মায়া কাটিয়ে অন্য জগতে যাত্রা করেন। সুরেশের বাবা তখন নেহাৎ নাবালক। তাঁর মা আগেই গত হয়েছিলেন। সুরেশের বাবাকে মানুষ করেন তাঁর এক জ্যাঠামশাই। সেই জ্যাঠামশাইয়ের অবস্থাও দিন আনতে দিন কুলোয় না, তাই সুরেশের বাবাও যে দু'বেলা ক্ষিদে মিটিয়ে খেতে পেতেন না সে কথাও সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁদের আশে-পাশে তিন-চারটি গ্রাম মিলিয়ে একমাত্র যে হাই স্কুল ছিল সেটি মাইল চারেকের পথ। ভোরবেলায় সামান্য মুড়ি চিবিয়ে স্লেট পেনসিল আর ছেঁড়া বই খাতা নিয়ে তিনি রওনা হোতেন স্কুলে। স্কুলে কয়েকটা পেয়ারা গাছ ছিল। দুপুরের টিফিন হোত তাঁর কাঁচা-আধকাঁচা পেয়ারা চিবিয়ে। বাড়িতে তাঁর এক জ্যেঠতুতো

বিধবা বোন থাকতেন। সুরেশের বাবাকে পৃথিবীর মধ্যে তিনিই একমাত্র স্নেহ করতেন। বিধবা হবার পর বাপের বাড়ি ফিরে সুরেশের মতোই তাঁর অবস্থা। সবাইকার কাছ থেকেই একটা দূর-দূর ছাই-ছাই ভাব। সন্ধ্যেবেলায় স্কুল থেকে ফেরবার পর বাড়ির আঙিনায় তুলসীতলায় সুরেশের বাবার সঙ্গে তাঁর দিদির দেখা হতো।

দিদি বলতেন, 'ওমা, কি চেহারা হয়েছে রে!' সুরেশের বাবা বলতেন, 'দিদি, ভারি ক্ষিদে পেয়েছে।' দিদি বললেন, 'আ মরে যাই! মুখ-হাত ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে একটু বোস্, একটু পরেই ভাত নামিয়ে, ডাল সাঁতলে তোকে খেতে দেবো।'

কোনো কোনোদিন তিনি বলতেন, 'জানিস তোর জন্যে কি রেখেছি? লুকিয়ে একটা বেগুন পুড়িয়ে রেখেছি।'

যাই হোক, কাঁচা পেয়ারা চিবিয়ে ইন্তাভাত ও মাঝে-মাঝে বেগুন-পোড়া খেয়ে সুরেশের বাবা এনট্রেন্স পরীক্ষা পাস করে কলকাতায় আসেন এবং ছাত্র পড়িয়ে একবেলা খেয়ে বি.এ. পাস করে কপাল জোরে সরকারী এক দপ্তরে ত্রিশ টাকা বেতনের কেরানির চাকরি পান। তারপর তিনি বিয়ে করেন। একে একে সুরেশ আর তার দুই ভাই বোন পৃথিবীতে আসে।

ভাই-বোনদের মধ্যে সুরেশই বড়। ভাই-বোনদের কথা মনে হলেই নিজের মা'র কথা মনে পড়ে। কখনো একটা ফর্সা কাপড় পরেছেন কিনা সন্দেহ। হলুদের ছোপ-ধরা লাল বা কালপাড় শাড়ি পরনে। সেই কোন ভোর থেকে উঠে, তাদের গলির একতলার উঠোনে কয়লা ভেঙে, উনুন ধরিয়ে বাবার আপিসের ভাতে-ভাত আর ডাল বসিয়ে গত রাতের এঁটো বাসনপত্র মাজতে বসে যেতেন। সুরেশের বাবা যেতেন বাজারে। বাবা বাজার সেরে, স্নান সেরে যখন খেতে বসতেন প্রায় প্রত্যহই তখন তাদের ঘুম ভাঙতো। সুরেশের ছোট ভাই-বোন দু'টির ক্ষিদেই ছিল বেশী। ঘুম ভেঙে উঠেই চিঁচিঁ গলায় তারা কান্না জুড়ে দিত, 'মা গো, ক্ষিদে পেয়েছে।' মা রেগে উঠতেন। কিন্তু তাঁর গলায় রাগের চেয়ে অন্য কী একটা সুর সুরেশ তখন ধরি ধরি করেও ধরতে পারতো না। তিনজনের সামনে কাঁসার বাটি ভরা ফ্যান ঠকঠক করিয়ে বসিয়ে তাদের মা বলতেন, 'কেবল খাই-খাই! পিণ্ডি গেল্। এত যদি ক্ষিদে তাহলে এই পোড়া পেটে এসেছিলি কেন?' এমন সময় সুরেশের বাবার গলা শোনা যেতো। খেতে খেতে তাদের তিনি ডাকতেন, 'এই পিণ্টু, মিণ্টু, মিনু—এদিকে আয়।' তারা গিয়ে দেখতো বাবা তাঁর কাঁসার থালায় ভাতে-ভাত আর ডাল মেখে তিনভাগ করে রেখেছেন। নিজের হাতে তাদের তিনজনকে খাইয়ে ঢক্‌ঢক্ করে এক গেলাস জল খেয়ে উঠে পড়তেন। দরজার পাশে স্ত্রীকে আঁচলে চোখ মুছতে দেখে মস্ত একটা ঢেঁকুর তুলে বলতেন, 'আজ আর তেমন ক্ষিদে নেই। ক্ষিদে পেলে আপিসের ওখানেই কিছু খেয়ে নেব।'

ভাইবোনদের মধ্যে সুরেশই খেতো সবচেয়ে কম। নিজের ভাগ থেকে মা'র চোখ এড়িয়ে তার দু'ভাইবোনকে ভাগ করে দিতো। জন্তুরা নিজেদের মধ্যে যেরকম মারামারি করে খায় সেরকম করেই চটপট তারা থালা শূন্য করে ফেলতো। তবু কিন্তু আশ্চর্য, মিণ্টু আর মিনুর শরীর দিনে দিনে পাকিয়ে ওঠে। সুরেশের বাবা একদিন ধারধোর করে ডাক্তার ডাকেন। সুরেশের তখন এমন একটা বয়েস যেটা সঠিক বোঝার আর না-বোঝার ঠিক মাঝখানে। সে বুঝতে পারতো কিসের যেন একটা অভাব ঘটছে। কিন্তু বুঝতে পারতো না অভাবটা ঠিক কিসের। সুরেশদের সংসারে যেটা অভাবনীয় ঘটনা সেটা হলো ঘন ঘন ডাক্তার আসা, আর গলির মোড় পেরিয়ে চৌরাস্তার উপরে ডাক্তারখানা থেকে সুরেশকে গিয়েই বারবার রুপোর টাকা আধুলি এবং সিকির বিনিময়ে প্যাকেট মোড়া ওষুধ আনা। এক

সন্ধ্যেরাতের কথা সুরেশের মনে আছে। পাড়ার ডাক্তার সুরেশের বাবাকে বললেন, 'আপনি যথাসাধ্য ধারদেনা করেছেন। কিন্তু ওষুধে মানুষ বাঁচে না। এদের ছেলেবেলা থেকেই দরকার ছিল নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্যের।' তারপর তিনি কি যেন সব ভিটামিন-টিটামিনের কথা বলেছিলেন আর একটা কথাও বারবার উচ্চারণ করেছিলেন যার—তখনকার সুরেশের যে জ্ঞান ও বোধশক্তি তাতে—মানে সে বোঝেনি—'রিকেট্' না 'টিকেট' না ঐ জাতীয় কিছু একটা।

ঐ দুটো কথার মধ্যে 'টিকেট' কথাটাই সুরেশের খানিকটা যেন চেনা-চেনা। চিঠি পাঠাতে হলে টিকিট কিনতে হয়। এদেশ থেকে অন্যদেশে যেতে গেলেও টিকিট কিনতে হয়। তাই একদিন যখন সুরেশ স্কুল থেকে এসে শোনে যে একে-একে তার ভাই-বোনেরা চলে গেছে, তখন ভারি অবাক হয়ে ভেবেছিল, কই, পোস্টাপিসের কিম্বা কোনো ইস্টিশানের টিকিট তারা তো কেনেনি! মাকে সে প্রশ্ন করেছিল বিনা টিকিটে তার ভাইবোনেরা কোথায় চলে গেল। মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শুধু কেঁদেছিলেন, আর তার কালো রোগা বাবা শোবার ঘরে চৌকির তেলচিটে বিছানায় খালি গায়ে খাটো কাপড় পরে একটা ভাঙা তালপাতার পাখায় নিজেকে বাতাস করতে করতে তিনতলার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলেছিলেন, 'স্বগ্‌গে'। এই 'স্বগ্‌গ' সম্বন্ধে সুরেশের প্রথম ধারণা হয়েছিল এমন একটা জায়গা যেখানে যেতে কারুরই কোনো টিকিট লাগে না—না পোস্ট আপিসের, না ইস্টিশানের।

আশ্চর্য, কিন্তু এই আধখাওয়া আর সবসময় ক্ষিদে-পাওয়া-পেট নিয়েও সুরেশ সুস্থ শরীরে স্কুলের এক-এক ক্লাশের পরীক্ষা এবং পরে ম্যাট্রিক ও আই.এ. পাস করে। আই.এ. পাস করার আগে থেকেই সে লক্ষ্য করেছিল তার মায়ের শাড়িগুলো যেন আরো অনেক সেলাই-করা এবং তাতে হলুদের ছোপ ছাড়াও আরো নানা জাতের ছোপ। লক্ষ্য করেছিল এক-একদিন যেন তার বাবার গালে জঙ্গলের মত দাড়ি, এক-একদিন যেন ঝাঁট-দেওয়া রাস্তার মতো পরিষ্কার। কলেজ থেকে একদিন ফিরে এসে সে দেখে আবার তাদের বাড়িতে সেই ডাক্তার এসেছেন, যিনি মিণ্টু আর মিনু মারা যাবার সময় এসেছিলেন।

তার সামনেই বিছানায় তার আধ-ঘুমন্ত মা'র হাতের শেষ সোনার চুড়ি দু'গাছাও বাবা খুলে নিয়ে কোথায় যেন যান, আর তার আধঘণ্টার মধ্যেই এ্যাম্বুলেন্স-এর লোকেরা তার মাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে কোথায় যেন নিয়ে যায়। বাবাও যান সেই সঙ্গে। সেই রাতে তার প্রচণ্ড ক্ষিদে। অথচ বাড়ির তোলা-উনুনের ছাই পরিষ্কার করারও কেউ নেই। মোড়ের বড় বাড়ি বাঁধানো রকে তারই কয়েকজন বন্ধু বসে গুরুজনদের ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কুলপি বরফ খাচ্ছিল। সেটা তখন গ্রীষ্মকাল। কলকাতার অলিগলি দিয়েও একটা পাগলা দক্ষিণে বাতাস বইছে। মোড়ের ভাঙা গ্যাসের আলোর সঙ্গে প্রায় ভরাট একটা চাঁদের আলো এসে মিশেছে। সুরেশ সেই পাকা রকের এক কোণে গিয়ে বসে। বন্ধুরা জিগগেস করে, 'কীরে, কী খবর? কুলপি খাবি?'

সুরেশ বলে, 'না ভাই, ভারি ক্ষিদে।' 'তবে ঘুগনি খা, ঝালমুড়ি খা।'

সে রাতে সুরেশ ঘুগনিও খায়, ঝালমুড়িও খায়, কুলপিও খায়। কিন্তু ক্ষিদে তার যায় না। শুধু প্রকাণ্ড আশ্চর্য নেশাধরা একটা ঘুম তাকে যেন ধীরে-ধীরে গ্রাস করে ফেলে। কেমন করে সে যে বাড়ি ফেরে, কেমন করে দরজা খোলে, কেমন করে তার ময়লা বিছানায় শুয়ে পড়ে আজ কিছুই তার স্পষ্ট মনে নেই।

শুধু খানিকটা মনে পড়ে পরের দিন সকালে তার বাবা তাকে ঠেলে তোলেন, উঠোন থেকে মুখ-হাত ধুয়ে সে দেখে তার বাবা সেই চেনা কাঁসার থালায় শুধু আলো চাল আর কাঁচকলা সেদ্ধ করে দলা পাকিয়ে দুভাগ করে রেখেছেন। মাঝখানে লালচে খানিকটা নুন আর দুটো কাঁচা লঙ্কা।

সে সবও আজ অনেক বছরের কথা। তারপর শুধু অনেকগুলো টুকরো-টুকরো এলোমেলো ছবি। কলেজ থেকে ক্ষিদে নিয়ে ফেরা, আপিস থেকে ফিরে বাবার গলাবন্ধ কালো কোট আর ঘামে ভেজা হলদেটে চাদরটা ভাঙা আলনায় টাঙানো, কম আলোর বাল্বে রাত জেগে পড়া, বি.এ. পরীক্ষা পাস করা, বাবার সঙ্গে তাঁর আপিসে যাওয়া, সায়েবের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলা, আর সবচেয়ে নীচু বেতনের কাজে মাসে পয়ত্রিশ টাকা বেতনের চাকরিতে বহাল হওয়া।

পেনশেন নেবার পাঁচ বছর আগে থেকে তার বাবা আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না। জমানো ছুটি ভোগ করার আগেই সুরেশের সেই ছেলেবেলার ডাক্তার, তখন যিনি রীতিমতো বৃদ্ধ, শেষবার দেখে বলেছিলেন, 'এ অসুখের আর কোনো চিকিৎসা নেই। সারা জীবন আধপেটা আর প্রায়-না-খাওয়া অসুখের ওষুধ নেই। মরা ক্ষিদে পেটের মধ্যে থাকাই এই অসুখের কারণ।'

আজ মাসের বাইশ তারিখ। ভবানীপুর থেকে ডালহৌসি স্কোয়ারের আপিসে সুরেশ হেঁটে-হেঁটেই যাতায়াত করে। তার দৃঢ় ধারণা দু'বেলা এই যে হাঁটা সেটা ভারি উপকারী। বাসে-ট্রামে যা ভীড় তার চেয়ে হেঁটে যাওয়াই অনেক আরামের। শরীরের দিক দিয়েও ভালো। তবে অনেক সকাল-সকাল বেরুতে হয়, ফিরতেও অন্ধকার হয়ে যায়। আর এই পরিশ্রমের ফলে বেয়াড়া শরীরের প্রত্যেকটা রোমকূপ যেন সব সময় খাই-খাই করে।

সুরেশের ছেলে তিন সপ্তাহ ভুগে সবে টাইফয়েড থেকে উঠেছে। চিকিৎসায় অনেক খরচ হয়ে গেছে। এখন তার দরকার ভালো পথ্যের। দু'বেলা দু'টো মাগুরমাছ, হরলিক্স, আর অন্তত আঙুর-বেদানা-আপেল জাতীয় ফল চাই-ই।

খাকি প্যান্ট, হাওয়াই শার্ট আর কাবলি চটি পরে সুরেশ তখন আপিসে বেরুবে এমন সময় তার স্ত্রী দরজায় এসে দাঁড়ালো। রাত জেগে জেগে তার চোখ বসে গেছে। কপালে কয়েকটা চুল ঘামের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। পরনের লালপাড় শাড়িটা আধময়লা, হলুদের ছোপ-ধরা। দেখলে মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত ক্লান্তি যেন এই শ্যামলা মেয়ের রূপ নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে শীর্ণ হাত দুটি মুছছে। মাধবীকে দেখলে কেন জানে না, মা'র কথা মনে পড়ে যায় সুরেশের।

ভীরু ভীরু হেসে মাধবী বললো, 'দেখো না গো গোটা পঞ্চাশ টাকা কোনো রকমে জোগাড় করতে পারো কি না। আর তো কোনো দিক সামলাতে পারছি না। যেমন করে হোক খোকার পথ্যিটা তো রোজ জোগাড় করতেই হবে।'

'দেখি,' বলে সুরেশ বেরিয়ে পড়লো। গড়ের মাঠের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিন্তু কেবলই তার মনে হতে লাগলো কী দেখবে, কোথায় দেখবে? ধোঁয়া মলিন কলকাতার শীতকালের সন্ধ্যের মতো মাধবীর মুখটা বারবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো।

আপিসের কাজে কিছুতেই তার মন বসলো না। বারবার তার মনে হতে লাগলো

একটিমাত্র উপায় আছে। সে উপেন।

উপেন কলেজে তার সঙ্গে সেকেন্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়েছিল। তার বাবা অবস্থাপন্ন স্টিভেডোর ছিলেন। সেকেন্ড ইয়ারেই করোনারির স্ট্রোকে উপেনের বাবার মৃত্যু হয়। উপেনও পড়াশুনো ছেড়ে ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে কী যে করে আর না-করে তার নানা ভাসা-ভাসা গুজব সে শুনেছে।

কিছুকাল আগে সন্ধ্যেয় ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের পাশ দিয়ে সুরেশ যখন হেঁটে বাড়ি ফিরছিলো, হঠাৎ তার উপেনের সঙ্গে দেখা। বছরের সেরা চ্যারিটি ফুটবল ম্যাচ সবে শেষ হয়েছে। মানুষ আর গাড়িতে গিজগিজ করছে। বিরাট একটা হুড-খোলা গাড়িতে বসে সিগারেট টানতে-টানতে উপেন কাদের জন্য যেন অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ নিজের নাম শুনে চমকে তাকাতেই সুরেশ দেখতে পেল উপেনকে।

মোহনবাগান তিন গোলে জেতায় উপেনের মন-মেজাজ তখন দারুণ ভালো। চেঁচিয়ে বললো, 'এই সুরেশ, সুরেশ! দেখতেই যে পাস না! খুব বড় সায়েব হয়ে গেছিস বুঝি?' তারপর অন্য সুরে বললো, 'যাই বলিস, এমন খেলা বহুকাল দেখিনি। তোর কী মত?'

সুরেশ জানালো সে খেলা দেখতে যায়নি, ফিরছে আপিস থেকে।

'তোর যা কান্ড! চিরকালই সিরিয়াস। কেবল পড়া আর পড়া, কাজ আর কাজ! চল—আজ একটু রিল্যাক্স কর। আমরা দল বেঁধে যাচ্ছি শেরিজে। একটু বিয়ার-টিয়ার খাওয়া যাবে।'

সুরেশ নানা অজুহাত দেখিয়ে কোনোরকমে সেদিন উপেনকে এড়িয়েছিল। একটু হতাশ হয়েই উপেন তখন বলে, 'তুই এক্কেবারে হোপলেস। তা একদিন আমাদের টালিগঞ্জের নতুন বাড়িতে আসিস। পুরনো বন্ধুদের দেখলে ভালো লাগে।'

'দেখো না গো, কোনো রকমে গোটা পঞ্চাশ টাকা জোগাড় করতে পারো কি না' : সেই অসহায় করুণ সুর বারবার তার কানে ভেসে আসছে। সুরেশ মনস্থির করে ফেললো: হ্যাঁ উপেন, উপেনের কাছেই আজ সন্ধ্যেয় আপিসফেরৎ সে যাবে। ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে টালিগঞ্জ অনেকটা পথ। কিন্তু কাঁচা আধ-কাঁচা পেয়ারা চিবিয়ে তার বাবা রোজ আট মাইল হেঁটে স্কুল করতে পারলে একদিন এই পথ সে যাতায়াত করতে পারবে না?

সন্ধ্যেয় টালিগঞ্জের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভবতোষের কথাগুলো বারবার তার মনে পড়তে লাগল। ভবতোষ তুখোড় লোক। নিয়মিত রেসে যায়, ফ্লাশ খেলে জেতে। আপিসে সুরেশের পাশেই তার সিট। ভবতোষ বলে, 'ধার চাওয়া একটা ফাইন আর্ট। যার কাছে ধার চাইবে কখনো তাকে ভাববার সময় দিতে নেই। প্রথমেই ধার চেয়ে বসতে হয়। যদি ভাবো একথা সেকথার পর ধীরে সুস্থে ধারের কথাটা পাড়বে তাহলেই গেদো। যত সময় যাবে ধারের কথা বলতে ততই অস্বস্তি লাগবে।'

'দ্যাখ ভাই উপেন। ভারি ঠ্যাকায় পড়ে এসেছি। পঞ্চাশটা টাকা ধার দিতে পারবি?' দোর-গোড়ায় উপেনের সঙ্গে দেখা হলেই মরীয়ার মতো এই কথাগুলো সুরেশকে বলতে হবে। মন্ত্র জপ করার মতো মনে-মনে সারা পথ সুরেশ আওড়াতে লাগলো, 'দ্যাখ ভাই উপেন—'

টালিগঞ্জে উপেনের বাড়িতে যখন পৌঁছলো সুরেশের হাওয়াই শার্ট আর প্যান্ট নিঙরোলে বোধ হয় জল পড়ে। ঘামে সপসপে হয়ে ভিজে গেছে। উপেন আছে কিনা দরোয়ানকে প্রশ্ন করতে গিয়ে আর একটু হলেই সুরেশ বলে ফেলেছিল : 'দ্যাখ ভাই

উপেন—'

কিন্তু দরোয়ান কোনো উত্তর দেবার আগেই ড্রেনপাইপ ট্রাউজার আর বিচিত্র নক্সা-আঁকা হাওয়াই সার্ট পরা বছর বারো বয়েসের একটি ছেলে লন থেকে সাইকেল চালাতে-চালাতে সুরেশের কাছে এসে মাটিতে বাঁ পা ঠেকিয়ে ডান দিকে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফিল্ম-স্টার রাজ কাপুরের স্টাইলে প্রশ্ন করলো, 'কাকে চাই, বাবাকে? কেটে পড়ুন মশাই, এইমাত্তর মহাদেব চাকরটাকে দারুণ পিটিয়েছেন। এখন তিনি বন্দুক সাফ করতে বসেছেন। দারুণ টেম্পার। দেখা করতে গেলে হয়তো আপনাকে ছাতু বানিয়ে দেবেন।' তারপর সাইকেলে খাড়া হয়ে উঠে প্যাডেলে পা টিপে হেসে উঠলো, 'হি-হি-হি! মহাদেব ব্যাটাকে কী ক্লিন আন্ডার-কাটটাই ঝাড়লেন। এক্কেবারে নক-আউট ব্লো—'

এতোটা পথ হেঁটে আসায় তেষ্টায় যে সুরেশের গলা কাঠ হয়ে আসবে সেটা তো নিতান্তই স্বাভাবিক। তাছাড়া ক্ষিদে—। সুরেশ ফিরলো।

'দ্যাখো না গো কোনো রকমে যদি—'

তার মা'র হাত থেকে তার বাবা যে-রকম শেষ দু'গাছা চুরি খুলে নিয়েছিলেন মাধবীর হাত থেকেও সুরেশের বুঝি শেষ দু'গাছা চুরি খুলে নিতে হয়।

হাঁটতে-হাঁটতে সুরেশ ভাবলো লেকের জলে মুখ-হাত ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে জিরিয়ে দু'আজলা জল খেয়ে ফিরলে মন্দ হয় না।

লেকে সুরেশ যখন পেঁাছলো রাত প্রায় ন'টা। ঝড়ের মতো দক্ষিণে হাওয়া বুঝি উড়িয়ে নিয়ে যাবে। এখানেও মানুষ আর গাড়ির ভিড়ের অন্ত নেই। ঝাল-মুড়ি, চানাচুর, কুলপি বরফের সোরগোল। কোনো কোনো দল ঘাসে বসেছে। কোনো কোনো দল গাড়িতেই রয়েছে। এখানে ওখানে ট্রান্‌জিস্টার বাজছে।

একটা গাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে সুরেশ শুনলো,

পুরুষ কণ্ঠ : 'একটু বিয়ার চেখেই দ্যাখো না।'

নারী কণ্ঠ : 'বড্ড তেতো। জিন এ্যান্ড লাইম নেই?' (খিক্-খিক্ হাসি)

আর একটা গাড়ির পাশ দিয়ে যেতে-যেতে টেপ-রেকর্ডারের গানের একটা কলি কানে এলো : বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেই......

আরো খানিক দূরে একটা ভিড় অস্বাভাবিক বড় দেখে তার কেমন যেন কৌতূহল হোলো। কেউ আবার ডুবলো-টুবলো নাকি?

কাছে এগিয়ে দেখে উর্দি-পরা বেয়ারা আর ড্রাইভার, নাইলনের শাড়ি-পরা খোঁপায় বেলফুলের মালা-জড়ানো বুক-পিঠ-হাত-কাটা ব্লাউজ-পরা নানা বয়েসের রোগা, মাঝারি, মোটা, অসম্ভব মোটা বারে-বারে আঁচল-খসা মহিলা ও চোঙা-প্যান্ট আর হাওয়াই সার্ট পরা রোগা-মোটা পুরুষের দল একটি ডেক-চেয়ার ঘিরে ভিড় করে রয়েছে। চেয়ারে যে কী বস্তু প্রথম ঠাহরে ভালো করে বোঝা যায় না। বাস্তবিক এতো মোটা মানুষ সুরেশ জীবনে কখনো দেখেনি।

সেই মাংস-পিণ্ড একটু নড়ে উঠতে দু'জন ভৃত্য হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে তুললো। তাদের দু'কাঁধে ভর দিয়ে থপ্‌থপ্ করে পা দশেক হেঁটে আবার সেই ডেক-চেয়ারে বসে হাঁপাতে-হাঁপাতে পাশের তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বুড়ো লোকটিকে সে বললো : 'নাঃ কবিরাজমশাই, আজকেও ক্ষুধা হোলো না।'

চলচ্চিত্রের শিল্পপ্রকৃতি প্রসঙ্গে

সত্রাজিৎ দত্ত

সম্প্রতি এ-কথাটা প্রায়শই শোনা যায় যে, বিশশতকে বিভিন্ন শিল্পরূপের মধ্যে চলচ্চিত্রই গুরুত্বে প্রধানতম; কবিতা, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত—সবকিছুর উপরে তার আসন, কেননা চলচ্চিত্রশিল্পের ভাষাই নাকি এ-যুগের সবচেয়ে উপযোগী ও শক্তিমান শিল্পভাষা। বলা বাহুল্য, অনেকের কাছেই এই চরমপন্থী প্রস্তাব তর্কাতীত নয় (বর্তমান লেখকও সেই সন্দিগ্ধমনাদের অন্যতম); কিন্তু তুলনামূলক বিচারে শিল্প হিসেবে তার গুরুত্ব কতখানি সে-তর্কে না গিয়েও, চলচ্চিত্র যে বিশশতকের একটি অন্যতম প্রধান শিল্পরূপ, এটা মেনে নিতে কারুরই কোনো আপত্তি হবে বলে মনে হয় না। কারণ, চলচ্চিত্র যে আজ শুধু শিল্প নয়, এমনকি বিশিষ্ট শিল্প হিসেবে নিজের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বিশশতকের শিল্পধারণায় তার যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে—এ-ঘটনাটা মোটামুটি সর্বজনস্বীকৃত। ব্যাপকভাবে এই স্বীকৃতি চলচ্চিত্র খুব সাম্প্রতিককালে অর্জন করেছে। বয়সের দিক থেকে যদিও প্রায় শিশু, কিন্তু উদ্ভবের অনতিকাল পরেই শৈশব অতিক্রম করে চলচ্চিত্র তার শিল্পগত স্বরূপ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে; একটি পরিণত শিল্পমাধ্যম হিসেবে তার সম্ভাবনা বিষয়ে চলচ্চিত্র আজ সম্পূর্ণ সচেতন।

জনস্বীকৃতির মতো চলচ্চিত্রশিল্পের এই আত্মসচেতনতাও সাম্প্রতিক। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের আদিযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক চলচ্চিত্র-আন্দোলনের সূচনাকাল পর্যন্ত এমন অনেক চলচ্চিত্রই আজ খুঁজে বের করা সম্ভব যাদের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে সৃজনশীল কল্পনা ও আকর্ষণীয় শিল্পগুণের উদাহরণ বিরল নয়। কিন্তু, সম্ভবতঃ, অন্যান্য আর সব শিল্পের মতোই, প্রথমযুগে চলচ্চিত্রও মূলতঃ, এমনকি হয়তো সর্বতোভাবে, প্রমোদের মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহৃত ও গৃহীত হোতো। আইজেনস্টাইনের মতো ব্যতিক্রমের উদাহরণ বাদ দিলে, চলচ্চিত্র-স্রষ্টারা তখন কোনো অস্পষ্ট শিল্পধারণার বশবর্তী হয়েও কদাচিৎ ছবি তৈরী করতেন; শিল্পগত কোনো দায়িত্ববোধ কদাচিৎ তাঁদের ছবিকে সচেতনভাবে প্রভাবিত করতো। এমনকি, চার্লস চ্যাপলিনেরও পরবর্তী কালের ছবিতেই এই সচেতনতা ও দায়িত্ববোধের প্রমাণ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়েছে। চলচ্চিত্রের শিল্পাভিমুখী এই বিবর্তন অনেক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার কুয়াশা কাটিয়ে আজ একটা মোটামুটি স্পষ্ট চেহারা নিয়েছে। নিজস্ব ভাষা-আঙ্গিক-প্রকরণের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে চলচ্চিত্রও আজ একটি সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপের বিকাশে মনোযোগী। ফলতঃ, যে-কোনো শিল্পীর মতোই, চলচ্চিত্রস্রষ্টার দায়িত্ব আজ অপরিসীম, সেইসঙ্গে চলচ্চিত্র-দর্শকেরও।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে কোনো শিল্প সম্পর্কেই প্রতিক্রিয়ার স্তরভেদ আছে। নিছক ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দ-লাগার অনুভূতি থেকে শুরু করে সেই বিশেষ শিল্পরূপের নিজস্ব ভাষা ও প্রকরণের সূত্রে তার যুক্তিনির্ভর মূল্যায়ন পর্যন্ত সবগুলি প্রতিক্রিয়াই হয়ত শিল্প-অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু শিল্পবিচারে প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয় পদ্ধতিই যে অধিকতর প্রাসঙ্গিক—এ-প্রস্তাবে তর্কের অবকাশ সামান্যই। কবিতা, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদি যে-কোনো শিল্পের বিচারই তাই, শেষ পর্যন্ত, একটি ন্যূনতম

শিক্ষা, চর্চা ও অভিনিবেশের পটভূমি দাবী করে। শিল্পের উপভোগে অবশ্যই কোনো অধিকারভেদ নেই। বেঠোফেনের সঙ্গীত, বোদলেয়ারের কবিতা অথবা পিকাসোর বিমূর্ত শিল্পের অভিঘাত যে-কোনো ব্যক্তির চেতনায়ই একটি অনন্য শিল্প-অভিজ্ঞতাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে। এমনকি, সেই ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া ও উপলব্ধির জবানবন্দীও অপর শিল্প-রসপিপাসুদের কাছে প্রাসঙ্গিক ও মূল্যবান হতে পারে। কিন্তু, যাকে শিল্পের বিচার বা মূল্যায়ন বলি, সে-ক্ষেত্রে নিছক ব্যক্তিগত উপলব্ধি বা অনুভূতিই সব নয়; সেই শিল্পের বিশিষ্ট প্রকৃতি, ভাষা, আঙ্গিক ও প্রকরণের ইতিহাস মনে রেখে এবং সমসাময়িক শিল্প-ধারণার প্রাসঙ্গিক সূত্রগুলি অবলম্বন করে শিল্প-অভিজ্ঞতার স্বরূপটিকে সেখানে বিশ্লেষণ করতে হয়। অর্থাৎ এই মূল্যায়নে ব্যক্তিগত আবেগ বা উপলব্ধির ভূমিকা যতটা প্রাসঙ্গিক, যুক্তি বা তথ্যের প্রয়োজন হয়ত তার চেয়ে কিছু অধিকই।

শিল্পবিচারের এই সাধারণ শর্তাবলী চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। অথচ, চলচ্চিত্র আলোচনা ও সমালোচনায় আজও আমাদের দেশে এই অনুচ্চারিত অনুমানকে প্রশ্রয় পেতে দেখা যায় যে, চলচ্চিত্র, শিল্প হলেও, এমন একটি ব্যতিক্রম যার মূল্যবিচারে ব্যক্তিগত অনুভূতি বা উপলব্ধির বিবরণই যথেষ্ট। সেইজন্যেই, 'অবিস্মরণীয়', 'মহৎ', 'অনবদ্য' ইত্যাদি বিশেষণের নির্বিচার প্রয়োগ এবং সেইসঙ্গে কিছু সুশ্রাব্য প্রশংসাসূচক উপমার যথেচ্ছ ব্যবহার ছাড়া কোনো এক সুবিখ্যাত বাংলা চিত্রপরিচালকের সৃষ্টিকে আজও কদাচিৎ সমালোচিত হতে দেখা যায়। বস্তুতঃ, চলচ্চিত্র নামক শিল্পরূপটি যে বিশেষ শিল্পাদর্শ ও প্রকরণনির্ভর, কোন্ কোন্ গুণ ও লক্ষণ অনুসারে সেই বিশেষ শিল্পরীতির সৃজনশীল অভিব্যক্তি কোনো ছবিতে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে, তা যতক্ষণ না স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হচ্ছে, ততক্ষণ ঐ বিশেষণ ও উপমাগুলি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে অর্থহীন বুলি ছাড়া আর কিছু নয়।

অথচ, পুনরুক্তি হলেও বলা প্রয়োজন, চলচ্চিত্রশিল্পের একটি নিজস্ব ভাষা আছে। ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করে প্রমথ চৌধুরী যা বলেছিলেন, তার অনুকরণ করে বলা যায়, চলচ্চিত্রকে একাধারে চলৎ এবং চিত্র হতে হয়। প্রথমোক্ত প্রকৃতি প্রধানতঃ দৃশ্য-পরম্পরার উপর নির্ভরশীল; দ্বিতীয়োক্ত গুণ আলোছায়া ও দৃশ্যগঠনের উপর। অর্থাৎ দৃশ্যপরম্পরা, আলোছায়ার টোন এবং দৃশ্যগঠন বা কম্পোজিশন, এই তিনটি মৌলিক গুণ দ্বারা চলচ্চিত্রের ভাষাকে চিহ্নিত করা সম্ভব। আলোছায়া বলতে এক্ষেত্রে মুখ্যতঃ শাদা-কালোর বিভিন্ন টোন অথবা শেডকেই বোঝানো হচ্ছে। চিত্রশিল্পের সঙ্গে চলচ্চিত্রের চিত্ররূপের, বলাই বাহুল্য, বহুবিধ মৌলিক পার্থক্য আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে যা স্পষ্ট তা হোলো : চিত্রশিল্পের উপকরণ যেখানে রং এবং তুলি, চলচ্চিত্রের অবলম্বন সেখানে ক্যামেরা এবং আলো। বিবিধ বর্ণের ব্যবহার চলচ্চিত্রে সম্ভব হলেও তার প্রয়োগ বিষয়ে বর্তমানকালের অধিকাংশ চলচ্চিত্র-স্রষ্টারা দ্বিধাগ্রস্ত। এবং, যদিও চলচ্চিত্রে বহুবর্ণের শিল্পগত যাথার্থ্য নিয়ে তর্ক অমীমাংসিত, আলোছায়ার শাদা-কালো টোনের উপরই যে চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা প্রধানতঃ নির্ভরশীল এই অভিমতই মোটামুটি প্রামাণ্য বলে ধরে নেওয়া যায়। দৃশ্যগঠন বিষয়েও সেই একই কথা প্রযোজ্য। চিত্রশিল্পের দৃশ্যগঠন যেখানে স্থির এবং নিশ্চল, চলচ্চিত্রের দৃশ্যগঠন সেখানে সচল এবং গতিময়। এমন কি, ফোটোগ্রাফির স্থাণু দৃশ্যরূপের সঙ্গেও চলচ্চিত্রের দৃশ্যগঠন তুলনীয় নয়। চলচ্চিত্রের যে-কোনো দৃশ্য যেহেতু শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন ফোটো-গ্রাফ নয়, যেহেতু প্রত্যেক দৃশ্যই প্রবহমান দৃশ্য-পরম্পরার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেহেতু

সুচারু দৃশ্যময়তাই চলচ্চিত্রের দৃশ্যগঠনের প্রধানতম লক্ষণ বলে গণ্য নয়। প্রতিটি দৃশ্যই পূর্বাপর দৃশ্যের অন্তর্বর্তী একটি টেন্‌শনকে সূচিত করে। চলচ্চিত্রের দৃশ্যগঠনে এই গতিময়তা একদিকে যেমন সেই দৃশ্যের অন্তর্লীন ব্যঞ্জনাকে মূর্ত করে তোলে, অন্যদিকে তেমনি পরবর্তী দৃশ্য বা ঘটনার নিশ্চিত পূর্বাভাস অথবা অনিশ্চিত ইঙ্গিত দিয়ে দর্শকের প্রত্যাশাকে উদ্দীপ্ত করে। অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত, শুধু চমকপ্রদ দৃষ্টিকোণ অথবা বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির অভিনব কিম্বা সুষম সংস্থাপন নয়, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রতিটি দৃশ্যগঠনের একটি গতিময় অর্থ থাকা দরকার। বিক্ষিপ্তভাবে অনেক উদাহরণ মনে পড়ছে; অতিপরিচিত দু-একটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

'পথের পাঁচালি'-তে দুর্গার মৃত্যুর অনতিকাল পরে হরিহরের গ্রামে প্রত্যাবর্তন দৃশ্য স্মরণ করুন। হরিহরের বাড়ির ভাঙা পাঁচিলের সামনে একটি গরুর ক্লোজ-আপ। স্থির দাঁড়িয়ে থেকে সে জাবর কাটছে। নিশ্চল ক্যামেরা। দৃশ্যপটের বাঁ দিক দিয়ে হরিহরের প্রবেশ। ক্যামেরা তখনও নিশ্চল। হঠাৎ-আগমনে সবাইকে বিস্মিত করে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে হরিহর অতি সন্তর্পণে দৃশ্যপটের দক্ষিণ দিক দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন। হরিহরের এই নিষ্ক্রমণ এবং পাঁচিলের ওপাশ দিয়ে ঘুরে দূরপাল্লায় আবার ক্যামেরার সম্মুখবর্তী হওয়ার মধ্যবর্তী সেই আশ্চর্য দশ-পনেরো সেকেন্ড কল্পনা করুন। এমন কি তখনও ক্যামেরা নিশ্চল। এই সুদীর্ঘ সময় ক্যামেরাকে সম্পূর্ণ স্থাণু রেখে যে সচল ও গতিময় দৃশ্যগঠন এখানে রূপায়িত করা হয়েছে, চলচ্চিত্রে তার দৃষ্টান্ত বিরল। সম্পূর্ণ দৃশ্যটি প্রায় একটি ফোটোগ্রাফের মতোই নিশ্চল। গরুটির চোয়ালের ক্লান্তিকর নড়াচড়া ছাড়া সমস্ত পটভূমিতে চলচ্চিত্রের ক্ষীণতম আভাস নেই। অথচ কী রুদ্ধশ্বাস গতিময়তা সম্পূর্ণ দৃশ্য-গঠনটিকে স্পন্দিত করে রাখে! এক মর্মস্পর্শী মৃত্যু পাথরের মতো দর্শকের বুকের উপর এখনও চেপে আছে। আকস্মিক বজ্রপাতের মতোই যে-আঘাত অনতিকালের মধ্যে হরিহরকে দুমড়ে-মুচড়ে দেবে এবং সেইসঙ্গে সর্বজয়ার নিরুদ্ধ শোক এক আর্ত আবেগের বিস্ফোরণে হাহাকার করে উঠবে, সেই অনিবার্য পরিণতির জন্যে প্রতীক্ষমাণ দর্শকের অসহায় উৎকণ্ঠাকে এক আশ্চর্য বৈপরীত্য দিয়ে এখানে আরো তীক্ষ্ণ, তীব্র করে তোলা হয়েছে। স্থির নিশ্চল পটভূমিতে গরুর জাবর কাটার সেই নির্লিপ্ত, নির্বিকার, নিরুত্তেজ, মন্থর একঘেয়েমির পরিপ্রেক্ষিতে যন্ত্রণার এক সুতীব্র প্রহারের প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস সেই কয়েকটি মুহূর্ত দর্শকের চেতনাকে প্রায় এক সহনাতীত স্পর্শকাতরতার শীর্ষে নিয়ে যায়। আবার বলছি, দৃশ্যগঠনে চলচ্চিত্রের শিল্পভাষার এই সচেতন ও নিপুণ ব্যবহার নিঃসন্দেহে এক বিরল স্বাতন্ত্র্যের উদাহরণ।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিও সমমাত্রায় উল্লেখযোগ্য। সংহতি ও ইঙ্গিতময়তায় তা হয়ত প্রথম দৃষ্টান্তটিকেও ছাড়িয়ে গেছে। 'অপরাজিত'-তে হরিহরের মৃত্যুর পূর্বে ঘাটের সোপানে তার পতনদৃশ্যটির কথা বলছি। দূরপাল্লার ক্যামেরায় দৃশ্যটির চিত্ররূপ রচিত। মধ্যাহ্নের তীব্র রৌদ্ররশ্মি ঘাটের সিঁড়িগুলিতে চড়া শাদা-কালো টোনের কতগুলি ঋজু সমান্তরাল রেখা সৃষ্টি করেছে। শাদা-কালোর তীব্র বৈপরীত্য সমস্ত পটভূমিটিতে এক গাঢ়, ঘন, প্রায় নির্মম, কাঠিন্য সঞ্চারিত করেছে। এই স্থির, কঠিন, ঋজুরেখ পটভূমিতে হরিহরের ক্ষুদ্র, ন্যুব্জ, বক্র শরীরের অসহায় কারুণ্য দর্শকের চেতনাকে সোজাসুজি আক্রান্ত করে। শুধুমাত্র চড়া শাদা-কালোর এবং ঋজু ও বক্র রেখার বৈপরীত্য দিয়ে এমন একটি অবশ্যম্ভাবী ট্র্যাজেডিকে সূচিত করা হয়েছে যা দর্শকের বোধে অনিবার্যভাবে সংক্রামিত হয়। যা ঘটতে যাচ্ছে প্রায়

অচেতনভাবে দর্শকের মন যেন তার জন্যে প্রস্তুত হয়। এক অনির্দেশ্য দুঃখজনক সংঘটনের প্রতীক্ষা তার উপলব্ধিকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। আর, তারপরেই, দুর্বল, অশক্ত শরীরে সোপান অতিক্রম করতে গিয়ে হরিহর পড়ে যান। বস্তুতঃ, এই দৃশ্যেই, হরিহরের প্রকৃত মৃত্যুদৃশ্যে পৌঁছনোর আগেই, দর্শকের বোধে হরিহরের মৃত্যু প্রতিষ্ঠিত হয়। কারুণ্যে, নির্মমতায়, অনিবার্যতার ইঙ্গিতে এই দৃশ্যগঠনের প্রয়োগনৈপুণ্য বিস্ময়কর।

উদাহরণ দীর্ঘ হোলো; কিন্তু চলচ্চিত্রের শিল্পভাষায় দৃশ্যগঠনের যে একটি অর্থপূর্ণ ও গতিময় ভূমিকা আছে, এ-দৃষ্টান্ত দুটি তার নির্দেশক, এবং সেই অর্থে, হয়ত, প্রাসঙ্গিক।

ক্যামেরার যে বিশেষ ও সুপরিচিত কৌশলগুলি চলচ্চিত্রের প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ মনতাজ্, সুপার-ইম্পোজিশন ইত্যাদি, সে-সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা সম্ভবতঃ বাহুল্য হবে। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে সাধারণভাবে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। চলচ্চিত্রশিল্পের প্রথম যুগে যদিও ক্যামেরার এই নিজস্ব উপায়গুলি বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হোতো এবং চলচ্চিত্রের ভাষায় তাদের ভূমিকা মুখ্য উপায়গুলির অন্যতম ছিলো, কিন্তু আধুনিক শিল্পধারণা অনুসারে সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রে তাদের ব্যবহার ক্রমশঃই সংযত ও বিধি-নির্দিষ্ট হয়ে আসছে। অর্থাৎ ক্যামেরার এই সুবিধেজনক কৌশলপ্রয়োগের যথেচ্ছ সুযোগ-গ্রহণে আধুনিক চলচ্চিত্রস্রষ্টারা প্রায়শই অনিচ্ছুক। এক অলিখিত অনুশাসন দ্বারা এ-বিষয়ে তাঁরা নিজেদের স্বাধীনতা সীমানির্দিষ্ট করেছেন। উপায়গুলির নির্বিচার প্রয়োগ তো দূরের কথা, এদের ব্যবহারের কোনো বিশেষ গুরুত্ব ও অর্থপূর্ণতা সম্পর্কে যতক্ষণ না তাঁরা নিঃসংশয় হচ্ছেন, যতক্ষণ না এদের প্রয়োজন তাঁদের কাছে অনিবার্য ও অপরিহার্য বলে মনে হচ্ছে, ততক্ষণ এগুলির প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁরা বিশেষভাবে সন্দিগ্ধ। এমন কি, একটি বস্তু, ঘটনা বা অভিব্যক্তির প্রতি দর্শকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করার, কোনো বিষয়ের প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেওয়ার যে সহজ উপায় ক্যামেরার একটি নিজস্ব সুবিধে, সেই ক্লোজ-আপের নির্বিচার ব্যবহারের দৃষ্টান্তও আধুনিক চলচ্চিত্রে ক্রমশঃই বিরল হয়ে আসছে। ক্লোজ-আপের সচেতন, সংযত ও বিধিনির্দিষ্ট ব্যবহারই আধুনিক চলচ্চিত্রস্রষ্টার লক্ষ্য।

প্রসঙ্গতঃ, ফ্লাশব্যাকের সনাতন পদ্ধতি এবং ভাবনার ধ্বনিরূপের প্রয়োগ সম্পর্কে আধুনিক চলচ্চিত্রস্রষ্টার মনোভাব ভিন্ন নয়। বর্তমানের একটি বিন্দু থেকে কখনো কোনো বস্তুগত সূত্র, কখনো ঘটনার অনুষঙ্গ, আর কখনো বা কোনো চরিত্রের ভাবনা বা বিবৃতি অবলম্বন করে অকস্মাৎ সোজাসুজি অতীতের কোনো একটি মুহূর্তে চলে যাওয়ার সরল এবং সহজ উপায় আধুনিক চিত্রপরিচালককে কদাচিৎ আকৃষ্ট করে। বরং যে স্মৃতিচারণার মধ্যে দিয়ে বর্তমান এবং অতীত মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়, সেই কুহেলীময় অভিজ্ঞতার জগৎই তাঁর উদ্দিষ্ট। 'ওআইল্ড স্ট্রবেরিজ' অথবা 'হিরোশিমা মনামুর'-এ অতীত এবং বর্তমানের বিভেদ ঘুচিয়ে স্মৃতিচারণের যে-অভিব্যক্তি প্রকাশিত, যে অনায়াস সাবলীলতায় বর্তমান থেকে অতীত এবং অতীত থেকে বর্তমানে পরস্পরসংলগ্ন দৃশ্যগুলি সঞ্চরমান, ভাবনার দৃশ্যরূপ উন্মোচনে তার বাস্তবিকতা রীতিমতো বিস্ময়কর। উল্লিখিত ছবিদুটিতে স্পষ্টতঃই স্মৃতিচারণের এক বিশেষ অভিব্যক্তিই পরিচালকদ্বয়ের লক্ষ্য। অন্যান্য ক্ষেত্রে, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন অনুসারে ফ্লাশব্যাকের প্রয়োগ পদ্ধতি স্বভাবতই ভিন্ন হতে পারে। প্রসঙ্গত 'চাইল্ড্হুড্ অফ ইভান' স্মরণীয়। নিষ্ঠুর, ক্রূর যুদ্ধের পটভূমিতে অসহায় এবং একাকী বালক ইভানের স্বপ্ন ও স্মৃতিচারণ এ-ছবিটিতে যে পদ্ধতিতে বিবৃত হয়েছে তা চলচ্চিত্রের ভাষার ব্যঞ্জনা ও সঙ্কেতময়তার আর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। ইভানের শৈশব-

স্মৃতিকে যে প্রতীকী চিত্রকল্পের সাহায্যে একাধিকবার তার বর্তমান চেতনায় প্রতিফলিত করা হয়েছে তার অমোঘ অভিঘাত নিঃসন্দেহে একটি অনন্য শিল্প-অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। ফ্লাশব্যাকের প্রথাসম্মত ব্যবহারের অকিঞ্চিৎকরতা এর দ্বারা আরো একবার প্রমাণিত হোলো।

ভাবনাকে ধ্বনিরূপ দানও চলচ্চিত্রের একটি নিজস্ব সুবিধে হিশেবে যথেচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে। একটি চরিত্রের ভাবনা এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া পরিচালক এতকাল স্বচ্ছন্দে দর্শকদের শুনিয়ে দিতে পারতেন। এখনও পারেন না তা নয়; কিন্তু পূর্বোল্লিখিত অন্যান্য সুবিধের মতো এই সুবিধেটিরও নির্বিচার সুযোগ গ্রহণে আধুনিক চিত্রপরিচালক নিরুৎসুক। বরং দৃশ্য-পরম্পরা, ঘটনা সংস্থাপন ও দৃশ্যগঠনের সতর্ক ও সচেতন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে দর্শকের চেতনাকে তাঁরা এমনভাবে একাগ্র করে তুলতে চান, যার ফলে কোনো চরিত্রের মানসিক প্রক্রিয়ার জগৎ দর্শকের কাছে অনিবার্যভাবে উন্মোচিত হয়ে যায়। ফলতঃ, ভাবনাকে বাণীরূপ না দিলেও দর্শকের পক্ষে তা অনুসরণ করা সম্ভব হয়।

আবার 'অপরাজিত' মনে করুন। শহর থেকে অপুকে নিয়ে সর্বজয়ার গ্রামে প্রত্যাবর্তনের অনতিকাল পরের দৃশ্য। বহুকাল পরে আবার গ্রামে ফিরে আসার পর বাইরে ট্রেনের আওয়াজ পেয়ে উৎসুক, উদ্ভাসিত মুখে দৌড়ে বের হয়ে যায় অপু। দূরগামী ট্রেনের উপর চোখ পড়তেই হঠাৎ থমকে যায় সে। হাসি মিলিয়ে গিয়ে ম্লান, ব্যথিত হয়ে ওঠে তার মুখ। শিথিল, মন্থর পায়ে সে ফিরে আসে। দুর্গার মুখের 'অপু, রেলগাড়ি দেখতে যাবি ?' এই উক্তিটি পুনর্বার দর্শকদের শুনিয়ে দিয়ে পরিচালক এখানে অপুর মানসিক প্রক্রিয়াকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন না। তার দরকারই হয় না। অপুর ভাবনাকে অনুসরণ করে দর্শকের স্মৃতি অনিবার্যভাবে উদ্দীপ্ত হয়; তাঁরা যেন স্পষ্টই শুনতে পান দুর্গার সেই কথা।

'অপরাজিত' থেকেই আরেকটি উদাহরণ নেওয়া যাক। কলকাতায় পাঠরত অপুর ছুটিতে গ্রামে ফেরার প্রতীক্ষায় সর্বজয়া দাওয়ায় বসে আছেন। রাত গভীর হয়, সে আসে না। নিঝুম, নিস্তব্ধ, অন্ধকার জলে কালপুরুষের ছায়া পড়ে। সর্বজয়ার উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায় দর্শকও ক্রমশঃ একাত্মীভূত হয়ে যায়। অপুর গলায় 'মা' ডাক একবারও শোনান না পরিচালক, কিন্তু সর্বজয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকও যেন ভুল করে মাঝে মাঝে তার ডাক শুনতে পান। ভাবনাকে বিবৃত না করে ইঙ্গিতময়তার পদ্ধতি এই দৃশ্যকল্পনাটিতে অনুসৃত; আধুনিক চলচ্চিত্রের শিল্পপ্রকৃতি যে পরিচালকের সংযম ও সূক্ষ্মতাবোধের উপর কতটা নির্ভরশীল এ দৃশ্য তার সাক্ষ্য দেয়।

অথচ, দুর্ভাগ্যবশতঃ, একই পরিচালকের পরবর্তীকালের অন্যান্য ছবিতে মর্মান্তিক-ভাবে স্থূল কৌশলপ্রয়োগের উদাহরণ দুর্লভ নয়। এমন কি রাজপুত আভিজাত্যবোধ দ্বারা ভারাক্রান্ত ট্যাক্সি-ড্রাইভারের মানসিকতাকে শুধুমাত্র ঘোড়ার খুরের শব্দ দিয়েই নয়, ছুটন্ত ঘোড়ার উপরে সুসজ্জিত আরোহীর মতো নিম্নশ্রেণীর চিত্রকল্পের সাহায্যে প্রতি-ফলিত করার হাস্যকর অপচেষ্টা থেকেও তিনি বিরত হন না।

এতক্ষণ চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা-আঙ্গিক-প্রকরণ এবং আধুনিক চলচ্চিত্রের শিল্প-ধারণায় তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু বলা হোলো। এছাড়া, শিল্পের কতগুলি মৌলিক ও সাধারণ গুণও চলচ্চিত্রের অন্যতম চরিত্রলক্ষণ। এই লক্ষণগুলির মধ্যে উপমা, প্রতীক ও চিত্রকল্প গুরুত্বে প্রধানতম। কবিতার মতো চলচ্চিত্রেও উপমা, প্রতীক ও চিত্রকল্পকে সর্বদা আলাদা করা যায় না। এই তিনটি শিল্পপ্রকরণ প্রায়শই পরস্পর-নির্ভর এবং অনেক ক্ষেত্রেই তিনটি গুণ এমনভাবে মিলে-মিশে আত্মপ্রকাশিত হয় যে, কোনো একটি নাম দ্বারা

তাদের চিহ্নিত করা চলে না। আইজেনস্টাইন থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রতীকের বাঙ্ময় ব্যবহার চলচ্চিত্রস্রষ্টাকে আকৃষ্ট করেছে। চলচ্চিত্রে প্রতীক (এবং উপমা) নানাভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কখনো তা ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত, কখনো বা কোনো সমান্তরাল ঘটনা বা ভাবনার মাধ্যমে বাইরে থেকে আরোপিত। কখনো একটি বস্তু, কখনো একটি ঘটনা, কখনো একটি ধ্বনি, কখনো একটি দৃশ্যগঠন, আর কখনো বা সব কিছু নিয়ে একটি সম্পূর্ণ দৃশ্যকল্পনারই প্রতীকী ব্যবহার চলচ্চিত্রে লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

'লা দোল্‌চে ভিতা'-র সমাপ্তিকালীন দৃশ্যটি মনে করুন। নায়ক খাঁড়ির ওপারে দাঁড়িয়ে-থাকা মেয়েটির সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করছে, দূরত্ব ও হাওয়ার শব্দে কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছে না, অথচ পরস্পরের কাছে যাওয়ারও উপায় নেই। সমস্ত দৃশ্যটি এখানে প্রতীকী উদ্দেশ্যমূলক। দুটি ব্যক্তির মানসলোকের মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান ও কোনোরকম মানসিক যোগাযোগের অসম্ভাব্যতাই দৃশ্যটিতে প্রতিফলিত। লক্ষণীয় যে, দৃশ্যটি প্রতীকার্থ-ব্যতিরেকেই এখানে স্বাভাবিক এবং প্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপিত। প্রতীকার্থটি অগ্রাহ্য করলেও ঘটনাপ্রবাহের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে দৃশ্যটি তার নিজের কারণেই গ্রাহ্য হতে পারে। অবশ্য প্রতীক ব্যবহারে এই পরিচালকের মাত্রাজ্ঞান সর্বত্র প্রশংসনীয় নয়। স্থূল ও সচেষ্ট প্রতীকের প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি দর্শকের শিল্পবোধকে পীড়িত করে থাকেন। বিশেষ করে, অ্যাবসার্ড নাটকের শিল্পপ্রেরণা দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত এই পরিচালকের কোনো কোনো প্রতীক ব্যবহারে ভারসাম্যহীন অতিনাটকীয়তার লক্ষণ স্পষ্ট।

প্রতীকের অসামান্য ব্যবহারের অন্য একটি উদাহরণ মনে পড়ছে। 'ইভান দ্য টেরিব্‌ল'-এর একটি দৃশ্য। ঘরের মধ্যে একটি টেবিলের পেছনে ইভান উপবিষ্ট। সামনে ভীত, সন্ত্রস্ত কয়েকটি লোক। প্রায়ান্ধকার ঘরে একটি দীপাধারের আলো ক্ষীণকায় ইভানের একটি দৈত্যাকার ছায়া ফেলেছে দেয়ালে; সমস্ত পশ্চাৎপট জুড়ে সেই ভীষণ, দানবাকৃতি ছায়াটি ইভানের নির্মম মানসিকতা পরিস্ফুট করছে। প্রতীকী দৃশ্যকল্পনার এটি এমন একটি সার্থক উদাহরণ, যা মূলতঃ প্রতীকার্থে গঠিত হলেও স্বাবলম্বী; অর্থাৎ প্রতীকার্থকে অগ্রাহ্য করেও এই দৃশ্যটির একটি নিজস্ব ও স্বাভাবিক অবলম্বন আছে।

অপর পক্ষে, 'ওয়েজেস অফ ফিয়ার'-এর সূচনাতেই পরস্পরের পায়ের সঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা কয়েকটি কীট-পতঙ্গের ক্লোজ-আপটি এমন একটি দৃশ্য প্রতীকার্থ ভিন্ন যার অন্য কোনো সুস্পষ্ট প্রাসঙ্গিকতা নেই। সেই শহরে আট্‌কে-পড়া কয়েকটি লোকের সেখান থেকে বেরিয়ে আসার যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ও তজ্জনিত অসহায় নৈরাশ্য ছবিটিতে ক্রমশঃ মূর্ত হয়ে ওঠে, সূচনার এই প্রতীক দৃশ্যটি তারই ভূমিকা। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে ঘটনাপ্রবাহের অবিচ্ছেদ্য অংশ না হয়েও একটি আপাত-প্রক্ষিপ্ত প্রতীকদৃশ্য এখানে অর্থপূর্ণ গুরুত্ব পেয়েছে।

ধ্বনি এবং নেপথ্যসঙ্গীতকে প্রতীক অথবা উপমা হিসেবে ব্যবহার করার রীতি চলচ্চিত্রে সুপরিচিত ও ব্যাপক, সুতরাং এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা বাহুল্য হবে; কিন্তু দু-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে প্রলুব্ধ বোধ করছি।

দুর্গার মৃত্যুর পর সর্বজয়া ও হরিহরের প্রথম সাক্ষাৎকার স্মরণীয়। সর্বজয়ার আর্ত, অবরুদ্ধ ক্রন্দনধ্বনির উপমা হিসেবে তারসানাইয়ের মর্মস্পর্শী মূর্চ্ছনা যে স্পন্দমান আবেগকে মূর্ত করে তোলে তার তুলনা বিরল। তারসানাইয়ের ধ্বনির উপমা এখানে শোকার্ত সর্বজয়ার যন্ত্রণাবোধকে যে তীব্র তীক্ষ্ন গাঢ়তা দিয়েছে দর্শকের চেতনাকে তা সম্পূর্ণভাবে

অধিকার করে।

'অপরাজিত'-তে হরিহরের শেষ নিঃশ্বাস পতনের মুহূর্তে পটপরিবর্তন করে গম্বুজের উপর থেকে এক ঝাঁক পায়রা উড়ে-যাওয়ার দৃশ্যকল্পনাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অকস্মাৎ এক ঝাঁক পায়রার ডানা ঝাপ্‌টে উড়ে-যাওয়ার শব্দ যে নিঃশ্বসিত হাহাকারের উপমা হিসেবে এখানে ব্যবহৃত, চলচ্চিত্রের ভাষাগত ইঙ্গিতময়তার তা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অবশ্য প্রতীক, উপমা ও চিত্রকল্পের সার্থক বাঙ্ময় ব্যবহার চলচ্চিত্রশিল্পের ভাষাকে যে-ঘনত্ব দান করে, এদের স্থূল ও নির্বিচার প্রয়োগে ঠিক তার বিপরীত ফল হয়। সেইজন্যই আধুনিক চলচ্চিত্রস্রষ্টরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রকরণগুলির ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষভাবে সংযত ও সাবধানী। এদের সূক্ষ্ম, প্রচ্ছন্ন ও ইঙ্গিতময় প্রয়োগই তাঁদের লক্ষ্য। অন্যথায়, যে-ক্ষেত্রে পরিচালকের অভিপ্রায় অতি স্পষ্টবোধ্য হয়ে ওঠে, এবং প্রতীক বা উপমাটি চিৎকার করে নিজেদের অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করতে থাকে, সে-ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ সম্পূর্ণ অসার্থক ও পীড়াদায়ক হয়ে পড়ে। অর্থাৎ একাধারে প্রচ্ছন্ন ও অর্থপূর্ণ হবার দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করতে গেলে এমন একটি ভারসাম্যকে সযত্নে রক্ষা করতে হয় যা খুবই বিপজ্জনক। বিপজ্জনক, কারণ, একদিকে যেমন পরিচালকের নিজেকে সম্পূর্ণ নেপথ্যে রাখা প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি পরিচালকের উদ্দিষ্ট অর্থটি স্বতঃই দর্শকদের মানসে প্রতিফলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই ভারসাম্য বজায় রাখতে না পারলে হয় দর্শকের কাছে প্রতীক বা উপমাটি স্থূল ও চেষ্টাকৃত-রূপে প্রতিভাত হয়, অথবা দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট, এমন কি, সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে গৃহীত হয়। এই ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন না হলে টেবিলের ওপর খেলনা নৌকা উল্‌টে দিয়ে নৌকাডুবি বোঝানোর ছেলেমানুষি প্রবণতাও পরিচালককে প্রভাবিত করে। এমন কি, কখনো একটি লিপস্টিক আর কখনো বা একটি সিগারেট লাইটারের পৌনঃপুনিক উপস্থাপনের দ্বারা তাদের প্রতীকী অর্থ ব্যগ্র পরিচালক দর্শকদের 'মাথায় গজাল মেরে' বোঝাতে চান। প্রয়োগে প্রচ্ছন্নতা ও সূক্ষ্মতার একান্ত অভাবই শুধু নয়, প্রতীকার্থ দু'টির তুচ্ছতা ও গুরুত্বহীনতা এত সুস্পষ্ট যে, চলচ্চিত্র প্রতীকব্যবহারের শোচনীয় ব্যর্থতার উদাহরণ হিসেবে এরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-য় মানসিকতায় পৃথক দুটি তরুণ-তরুণীর পারস্পরিক ব্যবধান ও তজ্জনিত দ্বিধা ও সংশয়ে পীড়িত তরুণীটির মানসিক দ্বন্দ্বকে আকস্মিকভাবে একপাল গাধার গলার ঘণ্টার শব্দে মূর্ত করে তোলার অপচেষ্টা স্মরণ করুন। দৃশ্যটি সুস্পষ্টভাবে বানিয়ে-তোলা ও স্থূল। এতই প্রত্যক্ষভাবে পরিচালক এখানে অর্থপূর্ণ হতে প্রয়াসী যে দর্শকের কাছে দৃশ্যটি একটি অতি শস্তা কৌশলপ্রয়োগ বলে মনে হয়।

শিল্পের যে বিশুদ্ধ ও চরম অভিব্যক্তি আমরা চিত্রশিল্প, কবিতা এবং, বিশেষ করে, সঙ্গীতের মধ্যে দেখতে পাই, সেই স্তরে পৌঁছে কোনো সৃষ্টি প্রায়শই এক বিমূর্ত শিল্প-অভিজ্ঞতার ধারক হয়ে ওঠে। কোনো তাত্ত্বিক অথবা বিষয়গত অর্থময়তার ভূমিকা সেখানে অপরিহার্য নয়। কিন্তু চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে, তার শিল্পরূপের বর্তমান সাবালকত্ব সত্ত্বেও, বিষয়বস্তুর একটি অনিবার্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। চলচ্চিত্রে, শেষ পর্যন্ত, একটি বক্তব্য বা ধারণাকে, স্পষ্টবোধ্য না হলেও, অন্ততঃ স্পর্শসহ রূপ দিতে হয়; এমন কিছু বলতে হয় যা দর্শকের অভিনিবেশ ও অনুধাবনের যোগ্য। বলাই বাহুল্য, শুধুমাত্র তত্ত্বের বিবৃতি যেমন চলচ্চিত্রের শিল্পপ্রকৃতির পরিপন্থী, তেমনি গুরুত্বহীন বক্তব্যকে আশ্রয় করে চিত্রময়তার সুশোভন নক্সাও শিল্প হিসেবে কোনো চলচ্চিত্রের ব্যর্থতাই প্রমাণিত করে। প্রথমোক্ত

ব্যর্থতার উদাহরণ যদি হয় 'উইন্টার লাইট', তবে দ্বিতীয়োক্ত ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। প্রথম ছবিটিতে পরিচালকের তাত্ত্বিক বদ্ধসংস্কার এমন এক নিছক বিষয়াশ্রয়ী বিবৃতির রূপ নিয়েছে, চলচ্চিত্রের ইতিমধ্যে উল্লিখিত প্রাথমিক শর্তাবলী পূরণ করতে যা প্রায় সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়েছে। একই পরিচালকের 'ভার্জিন স্প্রিং' ছবিটির শেষাংশও পরিচালকের সুপরিচিত এই বদ্ধসংস্কার দ্বারা দুষ্ট। বদ্ধসংস্কার সম্পর্কে শিল্পগত কোনো আপত্তির প্রশ্ন নিঃসন্দেহে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু কোনো বদ্ধসংস্কারের সরল ও সোজাসুজি বিবৃতি নয়, যতক্ষণ না সঙ্কেতময় কল্পনা ও প্রকরণের সাহায্যে তাকে একটি শিল্প-অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করা হচ্ছে, ততক্ষণ শিল্পবিচারের পরিপ্রেক্ষিতে তা অসার্থক। অথচ, 'ভার্জিন স্প্রিং' ছবিটির শেষ দৃশ্যে পৌঁছে পরিচালক প্রায় সশরীরে নিজেকে উপস্থিত করেছেন এবং তত্ত্বকে প্রায় চিৎকার করে ঘোষণা করেছেন। এই দৃশ্যে তাঁর তত্ত্বের বিবৃতি সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত ও চেষ্টাকৃত।

আর 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'? চলৎ-চিত্র না বলে, ব্যাকরণগত ভুল হলেও, হয়ত এই ছবিটিকে অচলৎ-চিত্র বলাই উচিত। বিষয়বস্তুতে সৃজনশীল কল্পনার দৈন্য কী প্রকট হতে পারে এ ছবি শুধু তারই উদাহরণ নয়, বিন্যাসের দিক থেকেও শিথিলতা, অপ্রাসঙ্গিকতা ও অসংহতির দ্বারা ভারাক্রান্ত এই ছবি আবার একবার প্রমাণিত করলো যে, প্রত্যেক চলচ্চিত্রস্রষ্টাই অর্থময় কাহিনী বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সৃজনের ক্ষমতা অর্জন করেন না; প্রমাণ করলো যে, রচিত কাহিনী, বিষয়বস্তু বা ভাবকল্পনার ব্যাখ্যা অথবা রূপায়ণে নিজেদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ না রাখলে অনেক মহৎ চলচ্চিত্রস্রষ্টাই নিজেদের সৃষ্টিকে শিল্পগত পতন ও ব্যর্থতা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন না। বিশেষ করে উল্লিখিত ছবিটিতে পরিচালকের যে বিভ্রান্ত ও অনিশ্চিত মানসের প্রমাণ পাওয়া যায়, যে তুচ্ছতা ও গুরুত্বহীনতা ছবিটির সমস্ত অবয়বে পরিস্ফুট, চলচ্চিত্রের গতিময় শিল্পরূপের তা সর্বতোভাবে বিরোধী, এবং সেইজন্যেই, অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক।

অর্থময়তার গুরুত্বহীন আরো একটি উদাহরণ, 'মহানগর', আমাদের এই নৈরাশ্যকে সমর্থন করে। যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী নাম দ্বারা প্রথমেই ছবিটি দর্শকের প্রত্যাশাকে উদ্দীপ্ত করে, সূচনায় ট্র্যামের তার-সংলগ্ন চলন্ত পুলির প্রতীকদৃশ্য যে-নামটির অর্থপূর্ণতাকে আরো সম্ভাবনাময় করে তোলে, বিষয়বস্তুর কী করুণ অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সে সেই নামকরণের অর্থহীনতা প্রমাণিত। দুর্বল বিষয়চেতনা, সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যর্থ কল্পনাশক্তি প্রতি পদে এ-ছবিটির স্বরূপ নির্ধারণ করে।

অন্যদিকে, বিষয়বস্তুর ও অর্থময়তার গুরুত্ব সম্পর্কে পরিচালকের আত্মসচেতনতা এবং সেইসঙ্গে সুচারু দৃশ্যময়তার বোধ থাকা সত্ত্বেও কোনো চলচ্চিত্র কিভাবে শেষপর্যন্ত একটি বিবৃতিই থেকে যায়, শিল্প-অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে না, সে-প্রসঙ্গে 'লাভেন্তুরা' ছবিটি স্মরণীয়। সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তা ও স্থূল প্ল্যাটিচুড, সংহত দৃশ্যগঠন ও শিথিল চিত্রনাট্য ছবিটির মধ্যে একই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়। পুনরুক্তি ও অপ্রাসঙ্গিকতা দ্বারা এ-ছবিটি ভারাক্রান্ত। সব মিলিয়ে ছবিটি তাই এক কেন্দ্রচ্যুত এবং অবলম্বনহীন শিল্পধারণার আধার হয়েই রইলো, তার বেশি আর কিছু হতে পারলো না।

উপসংহারে একটি অভিমত স্থাপন করি। যে সমবায় সৃজনপ্রক্রিয়ার ফল চলচ্চিত্র নামক একটি শিল্প, অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে তার হয়ত একটি গুণগত তফাৎ আছে, অন্ততঃ এখনও আছে। চলচ্চিত্র, আজও, মুখ্যত বিষয়নির্ভর এবং প্রতিফলনধর্মী। যে সৃজনশীল

কল্পনার সাহায্যে অন্যান্য বিশুদ্ধ শিল্প আমাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতার পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায়শঃই ইন্দ্রিয়াতীত ও অনন্য অভিজ্ঞতার বিমূর্ত লোকে উত্তীর্ণ হয়, উন্মোচিত করে শিল্পচেতনার এক বিশুদ্ধ সারাৎসার, শিল্পচেতনার সেই বিশুদ্ধ, বিমূর্ত স্বরূপ আজও চলচ্চিত্রশিল্পের অনায়ত্ত। হতে পারে, শেষপর্যন্ত, শিল্পগত সেই সিদ্ধি চলচ্চিত্রশিল্পেরও চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই পরমতা অর্জন করতে হলে আধুনিক চলচ্চিত্রকে এখনো দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে; এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে, 'পথের পাঁচালি' ও 'অপরাজিত'-র মতো বিরল ব্যতিক্রমের উদাহরণ বাদ দিলে, সেই পথ হয়ত দীর্ঘতর।

আধুনিক সাহিত্য

মৃত্তিকার কাছাকাছি, হৃদয়বেত্তার কাছাকাছি, জীবনের প্রথমতম সূত্রের কাছাকাছি। ঘোরালো-প্যাঁচানো নয়, চতুরালি নেই, নিরাভরণ পরিস্বচ্ছ ভাষার নির্ঝর। এই ভাষায় এমন এক ছন্দ, যা মানুষের আদি মুহূর্তের প্রার্থনাউচ্চারণের মধ্যে ছিল। ভাষার সঙ্গে সংগীতের কোনো পার্থক্য নেই : সংগীত সমবেত হয়ে যা গীত হয়ে থাকে, ভাষাও তাই— প্রতিবেশীর সঙ্গে, প্রেমিকের সঙ্গে, যে-একদা আমার ভাই ছিল, আপাতত নিজেকে শত্রুর ভূমিকায় কল্পনা ক'রে আবেগকে বিমুক্ত করতে চাইছে, তার সঙ্গে, আলাপ জমাবার সংকেত-ধ্বনিসংহতি। যারা যত সরল, যারা যত নির্ভীক, যারা ন্যূনতম মানবিকপাপবোধ-ভারাতুর, তাদের ভাষা তত গানের কাছাকাছি : ভাষার ছন্দিত রূপ, ছন্দ সংগীতের সঙ্গে একাকার।

ঠিক এই মুহূর্তে আফ্রিকায় উথাল-পাথাল বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে। আমি রাষ্ট্র-বিপ্লবের কথা বলছি না, তার ছিটেফোঁটা সংবাদ আমরা খবরকাগজে পাই, সমস্তরকম বিদেশী প্রভাব ছুঁড়ে ফেলে রাষ্ট্রের-পর-রাষ্ট্রে যে-আমূল নতুন সমাজকল্পের প্রতিজ্ঞা উজ্জয়িনী হয়ে উঠেছে বিগত দশ-পনেরো বছর ধ'রে, তার কিছু-কিছু আভাস আমাদের অহমিকাঠাসা জীবনযাপনে মাঝে-মাঝে মৃদু স্পর্শ ক'রে যায় : আমরা হয়তো আতঙ্কে সাময়িকভাবে কাৎরাই, নয়তো অবজ্ঞায় পাশ ফিরি। কিন্তু যে-খবর আদৌ পৌঁছয় না তা আফ্রিকার নানা দেশের সারাৎসার প্রাণস্পন্দন যাতে জড়ানো সেই গান-ছন্দ-সাহিত্য-নৃত্যের খবর। ঈশ্বর, এদের কৃপা করো, এরা নিরক্ষর; আমাদের মতো সুপ্রাচীন ঐতিহ্য নেই; অথচ আমাদের মতো ইওরোপের স্পর্শের প্রজ্বলনে নতুন-কোনো প্রজ্ঞাপারমিতার সন্ধান পর্যন্ত পায়নি। এদের নৃত্যকলা, মার্কিনি ছবিতেই তো দেখেছি, বেধড়ক ঢাক বাজানোর সঙ্গে অসভ্য দাপাদাপি; এদের গানে, গলায় ঐশ্বর্য যতই থাক না কেন, আসলে কেমন-এক গুমোট-ছাওয়া সানুনাসিকতা; আর এদের সাহিত্য কিংবা কাব্য আমাদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে। আফ্রিকার লোকেরা আবার লেখাপড়া শিখলো কবে থেকে যে কবিতা লিখবে, কি মহৎ কোনো দর্শনচিন্তায় নিজেদের ব্যাপৃত করবে? অজ্ঞতার মতো নিরাপদ দুর্গ আর নেই : আমরা মিশর আর আলজেরিয়ার মধ্যে তফাৎ করতে শিখিনি, ঘানা-নাইজেরিয়া এক হয়ে আছে আমাদের মানসে, চাদ কিংবা উগাণ্ডা অথবা কিনিয়ায় কোথায় কী ধরনের সাংস্কৃতিক আলোড়ন দেখা দিচ্ছে, তা জানার আগ্রহ আমাদের প্রায় শূন্য। জানি না আরবী-ভাষায় কী লেখা হচ্ছে, জানি না সোয়াহিলিতে নতুন কী জাদুর সংযোগ, আমাদের জানা নেই বাণ্টুভাষায় চিন্তার দিগন্ত কতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে। আমরা কূপমণ্ডূক, আমরা পরিতৃপ্ত।

কিন্তু এই পরিতৃপ্তি ধাক্কা খায় মার্কিন দেশে, ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে। ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী হিশেবে যাঁরা দুই-দেড় শতাব্দী আগে শৃংখলিত বিপর্যয়ের মধ্যে নতুন ভূখণ্ডে চালান হয়েছিলেন, তাঁদের আর-কিছু সম্বল ছিল না, শুধু গান ছিল, প্রার্থনার ভাষা ছিল, যে-প্রার্থনা প্রেমেরই অন্য এক নাম। দশকের পর দশক ধ'রে, সন্তানসন্ততির দুঃখের নিহিত

নীলিমা আরো-আরো সন্তানসন্ততির দুঃখের নীলিমায় মিশে যাওয়ার আপাতঅনন্ত প্রহরে ব্যাপ্ত হ'য়ে, মার্কিন ও ক্যারিবিয়ানের নিগ্রোরা কোনোক্রমে নিজেদের ভরসা দিয়ে রেখেছে। ভরসা দিয়ে রাখতে পেরেছে কারণ, অত্যাচারের তীব্র-দীর্ণ মুহূর্তে পর্যন্ত, তাদের আস্তিকতা অটুট ছিল, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা নিটোল ছিল। সমস্ত নৈরাশ্যের উপকণ্ঠে পেঁছেও তাই তাদের গান ছিল, ভাষার অপাপবিদ্ধতা ছিল। যে-সংকেতশব্দাবলী আফ্রিকাতে একদা ভাষাকে বাক্যগত করতো, তার স্মৃতি নতুন পরিবেষ্টনীতে খুব বেশিদিন টিঁকে রইলো না, অচিরে প্রভুদের ব্যবহৃত ভাষামণ্ডলী থেকেই পুনরায় নবসংকেতসম্ভার সৃষ্টি করতে হলো। কিন্তু তেমন ক্ষতি হলো না তাতে। যেখানে হৃদয়ক্ষরিত আনন্দ বা ব্যথা প্রকাশের উৎস, যে-কোনো ভাষার মধ্যবর্তিতাই সে-অবস্থায় সমান ব্যবহারযোগ্য। আধো-ইংরেজি, আধো-ব্যাকরণঅসম্মত বাক্যবিন্যাস, কোনো-কিছুই নিগ্রো সম্প্রদায়ের সত্তার আকৃতিকে প্রতিহত হতে পারলো না। উপচে-পড়া জলের কলস মানলো না শাসন, উপচোলোই। তা উছলে উঠলো ক্যারিবিয়ানে ক্যালীপসোর উদ্দীপ্তির মধ্য দিয়ে, তা তীব্র হলো স্পিরিচুয়াল গানের ভক্তির সংহত মূর্ছনার মধ্য দিয়ে। নিগ্রোদের আর সব কেড়ে নেওয়া হলো; ঐশ্বর্য, নারী, ঐতিহ্যের গর্ব, পরিকল্পিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে সব-কিছুর অধিকার লুপ্ত করা হলো। দস্যুর দল, মহাজনের দল যা কেড়ে নিতে পারলো না তা ভক্তি, বিশ্বাস; আর সেই আস্তিকতাকে দুর্বার উৎসাহে প্রকাশ করার মতো দেবদত্ত কণ্ঠ, ভাষা, গান। সব-কিছুর শেষে গান, সব-কিছু নিঃশেষ হয়ে গেলেও অথচ যা যায়নি, সেই তদ্গত প্রেমের অভয়-মাখানো গান।

এই গান যে-কোনো সাধারণ লোক বাঁধতে পারে, যে-কোনো দুঃখী, সাক্ষরতা নিষ্প্রয়োজন। কথা-ব'লে-যাওয়ার মতো গান, অনুরাগে-মমতায় সাধারণ লোক সদাসর্বদা যে-ভাষা ব্যবহার করে, সেই ভাষায় পাশাপাশি-বসিয়ে-যাওয়া গান, ঋজুতার বাইরে যার অন্য-কোনো প্রাকরণিক পরিচয় নেই। কিন্তু তবুও তা আশ্চর্য ঐশ্বর্যউজ্জ্বল স্থপতি হয়ে ওঠে, কারণ এই আস্তিক নিরক্ষররা স্মৃতিভ্রষ্ট হয়নি, তাদের জাতিস্মর চৈতন্যে এই অনুভূতির ছোঁওয়া যে ভাষার প্রয়োজন প্রেমের জন্য। শাদামাঠা শব্দগুলি তাই, প্রেমের আশ্লেষ যেহেতু তাদের তিলোত্তমা ক'রে দিয়ে গেছে, প্রতি মুহূর্তে, প্রতি উচ্চারণে ঝলকানি ছড়ায় :

> You've got to move when the spirit say move,
> Move when the spirit say move!
> When the spirit say move, Oh Lord,
> You've got to move,
> You got to move when the spirit say move.

নিরাড়ম্বর সামান্য কয়েকটি কথার প্রতিধ্বনি, অথচ মনে হয় আশ্চর্য কাব্য। ব্যথা আছে, অথচ দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা নেই। যেন সমস্ত দ্বন্দ্ব অতিক্রম ক'রে, সমস্ত দর্শন উপলব্ধি ক'রে কোনো হ্রদের উপকূলে পেঁছনো গেছে। এখন যেন সব শান্ত, সমস্ত গ্লানি বিদূরিত, সমস্ত সন্দেহ অপগত। কচিৎ-কখনো অশীতিপরা কোনো নিগ্রো মহিলার মুখাবয়বের দিকে তাকালে যেন এই অভিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিদ্যুৎবার্তা অনুভব করা যায়, যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা-অবমাননা উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বাসের সমাহিতি, ভবিতব্যনির্দিষ্ট খিন্নতাম্লান প্রব্রজ্যার শেষে নিরাসক্ত আনন্দ। সেই মুখাবয়বে কোনো ঘৃণা নেই, ক্রোধ নেই, প্রতি-হিংসাপ্রবণতা নেই, যা আছে তা শুদ্ধ আস্তিকতার স্থৈর্য। নিগ্রো গানেও তাই। দুঃখ

নয় দৈন্য নয় অভিযোগ নয়, উত্তরদেশের গাথা : ভক্তি, প্রেম, ভবিষ্যৎবিশ্বাস, ক্ষমার প্রসন্নতা, আদি মানবিক গুণগুলির পুনরাবৃত্তি। সম্প্রতি কিছু-কিছু নিগ্রো গানে উত্তাপের প্রসঙ্গ, সামান্য অসহিষ্ণুতা, চিত্তস্থৈর্যের ঈষৎ উচ্চাবচতা। কিন্তু মনে হয় না নিগ্রো কবিতা-গানের মূল হৃৎসত্তা আদৌ বিচলিত হয়েছে, মনে হয় এখনো অবৈকল্য অস্খলিত।

বিচলিত হয়নি কারণ হয়তো উত্তেজনার সত্যিই আর প্রয়োজন নেই। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে নিগ্রো সম্প্রদায় রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও থরোথরো; দু'কোটি নিগ্রোর পদক্ষেপে অনাচারের প্রাচীন দেয়ালগুলি ধ্বংসে-ধ্বংসে পড়ছে। এবং আফ্রিকায় দেশের পর দেশে শুভ্র সভ্যতার সাম্রাজ্যবাদ বিলীন হ'তে-হ'তে যাচ্ছে। এমন অবস্থায়, নিগ্রোরা হয়তো যথার্থ যুক্তির সঙ্গেই গান উচ্চারণ করতে পারেন, আশঙ্কার কারণ গত :We shall overcome, one day we shall be free; we shall overcome, we shall soon be free।

মনে হয় এই অখণ্ড বিশ্বাসের জ্যোতির্মণ্ডল নিগ্রো সংগীত ছাপিয়ে নিগ্রো লেখকদের গদ্যরচনাকে পর্যন্ত ক্রমশ উদ্ভাসিত করছে। আশ্চর্য বই জেমস বল্ডুইনের *The Fire Next Time*[১]। যে-কোনো রচনাই যে শৈলীর ব্যাপার, অধ্যবসায়ের ইতিহাস ব'য়ে নিয়ে তবে যে সাহিত্যের জন্ম, *The Fire Next Time*-এ তার কোনোরকম স্বীকৃতি নেই। হৃদয়ের গভীরতম অভ্যন্তর থেকে এই রচনার উদ্ভব, অবিকল স্পিরিচুয়াল গানগুলির মতো। যেমনভাবে কথাগুলি উঠে আসছে, ঠিক তেমনি বসিয়ে যাওয়া হচ্ছে; কোনো সরঞ্জাম নেই, কারণ হৃদয় কথা বলছে। একটি মন, যে-মনের বহির্ধৃতি একটি রক্তমাংসসম্পন্ন মানুষ, যে-মানুষের গায়ের রঙ নিকষ কালো, নাক থ্যাবড়ানো, ঠোঁট পুরু, চুল উগ্র কোঁচকানো; সেই মানুষের সেই মন আবাল্য ঘা খেয়েছে, চিন্তা করেছে, চিন্তা ক'রে ফের নতুন ক'রে ঘা খেয়েছে। যারা আপাত শক্তিশালী, যন্ত্রপাতি যাদের অধিকারে, ধনসম্পদ যাদের মুঠোর মধ্যে, যারা সংখ্যায় নয়গুণ, তাদের ভয়-পাওয়া পর্যবেক্ষণ করেছে, তাদের সেই ভয়-পাওয়ার অসহায়তা থেকে যে-ক্লৈব্য সমাজে সঞ্চারিত হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করেছে। এই ক্লীবতা থেকে শ্রেণীসংঘর্ষ, বর্ণবিদ্বেষ; এই অসহায়তা থেকে নিগ্রোদের ঘরবাড়িমন্দির পুড়োনো, ভালো শিক্ষালয়ে পড়তে না-দেওয়া, ভালো পল্লীতে থাকতে না-দেওয়া; এই ভীরুতা থেকে নিগ্রো নারীধর্ষণ, আচমকা গুলি চালিয়ে নির্জন লোকালয়ে নরহত্যা; এই সমুৎপন্ন সর্বনাশের দুঃস্বপ্নবোধে শ্বেতকায় মার্কিনমহলে শঠতা-চাতুরী-কালহেলনের ক্লান্তিকর অভিনয়। একটি মন, কালো শরীরের আবরণের নিচে যে-আবাল্য দেখেছে, চিন্তা করেছে, অবশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে; সেই সিদ্ধান্তগুলি এ-বইতে নিরুত্তাপ স্বরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। স্বরে উত্তাপ নেই, কিন্তু তাই বলে লেখক নির্মোহ নন। মোহ আছে, প্রেম আছে, নিজের সম্প্রদায়কে ভালোবাসা আছে, কিন্তু শত্রুপক্ষ সম্পর্কে কোনো হিংসা নেই, বিদ্বেষ-বহ্নি নেই; কিছুটা কৌতুক আছে, সামান্য কিছু করুণাও হয়তো বা। একদিকে বিশ্বাস : 'Know whence you come, there is really no limit to where you can go'। (১৬ পৃষ্ঠা)। অন্যদিকে, শ্বেতকায়দের সম্বন্ধে আশ্চর্যশ্রীমণ্ডিত অন্তর্বেদনাবোধ : 'Try to imagine how you would feel if you woke up one morning to find the sun shining and all the stars aflame. You would be frightened because it is out of the order of nature. Any upheaval in the universe

[১] The Fire Next Time. *By* James Baldwin. Dial Press, New York. $ 2.25.

is terrifying because it so profoundly attacks one's sense of one's own reality. Well, the black man has functioned in the white man's world as a fixed star, as an immovable pillar; and as he moves out of his place, heaven and earth are shaken to their foundations' (১৭ পৃষ্ঠা)।

নিগ্রোসমস্যা নিয়ে লেখা তত্ত্বকথা কী জাদুতে মহত্তম সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বল্‌ডুইনের বই সেই হেঁয়ালি। গদ্য, অথচ মনে হয় কবিতার চরণ থেকে চরণান্তরে উপনীত হচ্ছি। গদ্য কবিতা হয়ে উঠেছে, গান হয়ে উঠেছে, কারণ এই গদ্য লিখেছেন একজন নিগ্রো, লিখেছেন নিজের সম্প্রদায়ের প্রতিভূ হয়ে, দুই শতাব্দীর জীবনী কুড়ি হাজার শব্দের স্থপতিশাসনে বন্দী ক'রে। ভাষার এখানে অকারণ ব্যবহার নেই, প্রত্যেকটি ক্রিয়াপদ একটি বিশেষ আবেগকে পরিস্ফুট করার জন্য নিয়োজিত, সব-ক'টি বিশেষণ যথাযথতম দ্যোতনার ভাববাহক, প্রতিটি বিশেষ্য ইতিহাসের পাহাড় খুঁড়ে জড়ো করা। আধিক্য নেই, বাহুল্য নেই; নির্ঘোষ নেই, কিন্তু কাকুতিও নেই। দুশো বছরের অপমানের ইতিহাস কথা বলছে, লাঞ্ছনার কাহিনী ব্যক্ত করা হচ্ছে, কিন্তু, আবেগের জায়গা থাকলেও, আবেগাধিক্যের নেই, নেই এই কারণে যে ইতিহাস তো অতীত হয়ে গেছে, এবং নিরাসক্ত বিচারে ইতিহাস ইতিমধ্যেই বিধান নিরূপণ ক'রে গেছে কাদের জয়, কাদের পরাজয়; সুতরাং তিক্ততার, হীনতার আর অবকাশ নেই, সে-প্রসঙ্গ প্রক্ষিপ্ত।

The Fire Next Time শাপমুক্তির কাহিনী, মার্কিন নিগ্রো সম্প্রদায় সহসা কী ক'রে উপলব্ধি করলো ইতিহাস তাদের দিকে, তার তদ্গত রূপকথা। রূপকথার বর্ণনায় এক এবং বহু প্রায়ই পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছে, সত্তা এবং সমাজ একীভূত। এটাও মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির সংজ্ঞা; পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্যতাতেই ব্যক্তিসত্তা এবং সমাজচেতনা পরস্পরের নির্ভরে সাহিত্যকে জন্ম দিয়েছে। কখনো মনে হয় বল্‌ডুইনের আত্মজীবনী পড়ছি, খানিকবাদে তা নিগ্রো সমাজের চেতনার ইতিহাসস্রোতস্বতীর সঙ্গে এক ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। নিচের উদ্ধৃতি প'ড়ে সন্দেহ হতে পারে কোনো অকপট স্নাতস্নিগ্ধ আর্ষ-উক্তি শুনছি, 'That man who is forced each day to snatch his manhood, his identity, out of the fire of human cruelty that rages to destroy it knows, if he survives his effort, and even if he does not survive it, something about himself and human life that no school on earth—and, indeed, no church—can teach. He achieves his own authority, and that is unshakable. This is because, in order to save his life, he is forced to look beneath appearances, to take nothing for granted, to bear the meaning behind the words. If one is continually surviving the worst that life can bring, one eventually ceases to be controlled by a fear of what life can bring; whatever it brings must be borne. And at this level of experience one's bitterness begins to be palatable, and hatred becomes too heavy a sack to carry' (৮৪ পৃষ্ঠা)।

হয়তো এই আস্তিকতায় সমস্ত সমস্যার নিরসনের সূত্র বিধৃত হয়ে আছে; অথবা হয়তো নেই। হয়তো, এখনো কিছুদিন, ঘৃণাকে বাদ দিয়ে আবেগ অসম্ভব, প্রগতি অসম্ভব। ব্যক্তি থেকে অন্যতর ব্যক্তিতে হয়তো অভিজ্ঞতার রূপ ভিন্ন হ'তে থাকবে। হয়তো

রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ এড়িয়ে ইতিহাসের নিস্তার নেই, মার্কিনদেশের নিগ্রো সম্প্রদায়েরও নেই। কিন্তু বিপ্লবের ভিত্তি বোধের উপর, চেতনার উৎসমূল থেকেই কর্মের আবেগ। চেতনা, বোধ, সাহিত্য; বিপ্লবের জন্যই প্রয়োজন সাহিত্যের। *The Fire Next Time,* তার প্রত্যয়বোধ সত্ত্বেও, এই প্রত্যয়ে যাদের বিশ্বাস নেই, তাদেরও হয়তো প্রেরণা এগিয়ে দেবে; তার কারণ বল্‌ডুইন নিজেই গানের কলির সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন,

The very time I thought I was lost,
My dungeon shook and my chains fell off.

এই বই সেই শৃঙ্খলমুক্তির ঝঙ্কনা।

অশোক মিত্র

স মা লো চ না

On Aristotle and Greek Tragedy. *By* John Jones. Chatto & Windus. London. 25*s.*

Egotistical Sublime-এর প্রণেতা শ্রীজন জোন্‌সের এটি দ্বিতীয় বই। মাঝখানে বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে, সুতরাং, অনুমান করা যেতে পারে, আলোচ্য গ্রন্থটির মুখ্যসূত্র নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করবার যথেষ্ট অবকাশ তিনি পেয়েছিলেন। এ কথা মনে করবার আরও একটি কারণ হলো যে মুখবন্ধে তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন যে বইটি একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার প্রথম পর্ব মাত্র। ইউরোপীয় সাহিত্যে মানুষের স্বরূপ উদ্ঘাটনের যে চেষ্টা হয়েছে তারই বিবর্তনের এক ধারাবিবরণী প্রকাশের উদ্দেশ্যে পরপর তিনটি বই লেখার ইচ্ছা রাখেন শ্রীজোনস্‌। এই আত্মপ্রতিশ্রুতিপূরণের প্রথম পর্যায় বর্তমান বই, যার উদ্দেশ্য গ্রীক নাট্যসাহিত্য বিচার। বইটির প্রথম অংশে এ্যারিস্টট্‌লের কাব্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ; দ্বিতীয় অংশে তারই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রীক নাট্যকারত্রয় ইস্কিলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিদিস্‌-এর ট্র্যাজেডীগুলির আলোচনা।

শ্রীজোন্‌সের পূর্বতন গ্রন্থ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যবিচার, পঠনান্তে মনে হয়েছিল যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপক হয়েও তিনি দর্শন-ভীত নন। সাহিত্য-তত্ত্ব, এবং বিশেষ-এক যুগের যে-সব দার্শনিক মতবাদ সেই যুগের কবিতার রূপ ও সংজ্ঞা-নির্ণয় করতে সাহায্য করে, সেই চিন্তাসূত্রগুলিকে বিষবৎ পরিহার না করে তিনি সযত্নে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর কাব্যমূলায়নের কাজে। তাঁর ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য-সমালোচনার মধ্যে আমরা পেয়েছিলাম সূক্ষ্ম সহানুভূতির সঙ্গে এক ঋজু নিষ্ঠাবোধ। বর্তমান বইয়ের প্রথম অংশটিতে অন্তত সেই সূক্ষ্মতাবোধের পুনর্পরিচারণ। এ্যারিস্টট্‌লের কাব্যতত্ত্বের বিশ্লেষণে শ্রীজোন্‌স্‌ সন্ধানী মনের পরিচয় দিয়েছেন; গবেষকের দৃষ্টির তীক্ষ্ম আলোতে তিনি এ্যারিস্টট্‌লের *Poetics*-এর প্রায় প্রতিটি অংশ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। নানা মুনির নানা মত সংগ্রহ করে তাঁর বিশ্লেষণকে অযথা ভারাক্রান্ত করে তোলেন নি—এ্যারিস্টট্‌লের চিন্তার মৌলিকত্বের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তিনি যথাসম্ভব এ্যারিস্টট্‌লের লেখা থেকেই তাঁর যুক্তির প্রমাণ দেখিয়েছেন। এমন কি *Poetics*-এর বাইরেও তাঁকে প্রায় যেতেই হয় নি—*Nicomachean Ethics* এবং *Rhetoric*-এর প্রতি শুধু মাঝে মাঝে ইঙ্গিত করেছেন। সুসংবদ্ধ চিন্তা এবং প্রামাণ্য যুক্তির ওপর নির্ভর করে তিনি কাব্য-সমালোচনার আদিগুরু এ্যারিস্টট্‌লের কাব্যতত্ত্ব পুনর্বিচারের কাজে নেমেছেন।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও শ্রীজোন্‌সের লেখার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তার একটি প্রধান কারণ বোধহয় এই অংশে তাঁর উদ্যম প্রধানতঃ বিনাশপ্রয়াসী। ইউরোপে রোমান্টিক চিন্তাধারা নাট্যচিন্তাকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করেছিল; শ্রীজোন্‌স্‌ দেখাচ্ছেন যে এমন কি ক্ল্যাসিকাল যুগের আদি চিন্তানায়ক এ্যারিস্টট্‌লের কাব্যচিন্তাকে পর্যন্ত নানাভাবে রোমান্টিক চিন্তাধারার পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করবার

চেষ্টা হয়েছিল। শ্রীজোন্‌সের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য এ্যারিস্টট্‌লের কাব্যতত্ত্বকে এই রোম্যান্টিক সংস্কারগুলির হাত থেকে উদ্ধার করে তার হৃতশ্রী ফিরিয়ে আনা। এইজন্য তিনি বহু পরিশ্রমে নানা দিক থেকে *Poetics*-এর অনুবাদক এবং টীকাকারদের ভ্রান্ত ধারণাগুলি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন।

শ্রী জোন্‌স্‌ এ্যারিস্টট্‌লের এক সুপরিচিত অনুবাদের এবং টীকার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য অনুবাদক এবং টীকাকার বর্ণিত 'tragic hero'। বাইওয়াটার প্রমুখ অনুবাদক এবং বুচার প্রমুখ টীকাকারেরা *Poetics*-এ বর্ণিত ট্র্যাজেডীকে এক মহৎচরিত্র নায়কের জীবনের বিবর্তনের কাহিনীরূপে দেখতে চেষ্টা করেছেন। সেই অনুসারে *Poetics*-এ বর্ণিত নাটকের বিভিন্ন অঙ্গকে তাঁরা অনেক সময় বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করেছেন তাঁদের অনুবাদ ও টীকার সূক্ষ্ম তারতম্যে। শ্রীজোন্‌স্‌ বলছেন যে নাটকের নায়ককে এইভাবে বড়ো করে দেখার পেছনে রয়েছে শেক্‌স্‌পীরীয় নাটক সম্বন্ধে রোম্যান্টিক মনোভাব। কোল্‌রীজ এবং গ্যেটের শেক্সপীয়ার অনুচিন্তন আমাদের ভাবরাজ্যে আমদানী করেছে এক অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত নায়কচরিত্র, এবং তারই সাক্ষাৎ প্রভাবে এ্যারিস্টট্‌লের টীকাকারেরা *Poetics*-এর মধ্যে নায়ককে বড়ো করে তুলে ধরবার কথা ভেবেছেন। শ্রীজোন্‌সের ভাষায়, 'We have imported a tragic hero into the *Poetics,* where the concept has no place.' (পৃঃ ১৩)

কাব্যবিচারের দাঁড়িপাল্লায় নায়কের ভূমিকা লঘুতর হ'লে আর একদিকের গুরুভার সহজেই চোখে পড়তে শুরু করে—সেটি হলো নাটকের ক্রিয়াংশ, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় *action,* এ্যারিস্টট্‌ল গ্রীক ভাষায় যাকে বলেন *praxis*। শ্রীজোন্‌সের এ্যারিস্টট্‌ল আলোচনার প্রধান লক্ষ্য এই *action*-এর হৃতগৌরবের পুনরুদ্ধার। শ্রী জোন্‌স্‌ আমাদের মনে করিয়ে দেন যে নাটকের ঘটনাপ্রবাহ—যাকে আমরা সোজা কথায় প্লট বলি—তা থেকে নাটকের *action* স্বতন্ত্র। তিনি এই স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করেন স্বয়ং এ্যারিস্টট্‌লের *'muthos'* (প্লট) এবং *'praxis'* এই দুই আলাদা শব্দের ব্যবহারে। এ্যারিস্টট্‌ল বর্ণিত ট্র্যাজেডীর কেন্দ্রমূল নাটকে 'চরিত্র' এবং 'প্লট' উভয়কে ছাড়িয়ে নাটকের *action*-এ—সুতরাং উত্তর-রোম্যান্টিক পাঠক এ্যারিস্টট্‌লের *Poetics* পড়তে গিয়ে যে চরিত্র এবং প্লটের দ্বন্দ্ববোধে জর্জরিত বোধ করেন, তা শ্রীজোন্‌সের মতে নেহাৎই নিরর্থক। নাটকের অন্তর্নিহিত যে রূপটি নাট্যকারের ধ্যানে প্রথম থেকেই জাগ্রত থাকে, তাকেই *action* বলা যেতে পারে। নাটকের ঘটনাপ্রবাহ বা প্লটের কাজ হচ্ছে এই রূপটিকে ফুটিয়ে তোলা—সুতরাং প্লট হলো *action*-এর অনুকৃত প্রতিরূপ—এ্যারিস্ট্‌লের ভাষায় 'muthos is an imitation of praxis'।

এ্যারিস্টট্‌লের অনুকরণতত্ত্ব নাটকে জীবনবোধের পরিপন্থী নয়। শেক্‌স্‌পীরীয় নাটকের অভ্যস্ত অনেক পাঠক চরিত্রগুলির বুকে কান রেখে নাটকের প্রাণস্পন্দন শুনতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীজোন্‌স্‌ এই অপচেষ্টার মূলে আঘাত করেছেন *action*কে প্রাধান্য দিয়ে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন এ্যারিস্টট্‌লের সতর্কবাণী, 'Tragedy is an imitation not of human beings, but of action'; *action*-এর সমগ্রতার মধ্যেই পাওয়া যায় জীবনের আশ্বাসবাণী, মানবচরিত্রের খণ্ডিত জীবনের গণ্ডী অতিক্রম না করলে এই প্রাপ্তি দুষ্কর। *Action* থেকেই হয় নাটকের প্রাণসঞ্চার এবং সেইজন্যই *action*-এর পরিবাহক হিসাবে প্লটকে এ্যারিস্টট্‌ল বলেছেন 'the cardinal principal and, as it were, the

soul of tragedy'।

শ্রীজোন্‌স্‌ আরো বলছেন, আত্মার উপমার সাহায্যে এ্যারিস্টট্‌ল প্রমাণ উপস্থাপন করে গেছেন যে ট্র্যাজেডীর *action* এক রক্তশূন্য বিমূর্ত ধারণামাত্র নয়, জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলে তা *action—praxis*। নাট্যকার তাঁর নাটকের রূপটিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য চরিত্রগুলিকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করবেন মাত্র। নাটকের চরিত্রগুলি আনবে নীতিবোধ, ন্যায়-অন্যায়ের মূল্যায়ন। নাটকের কুশীলবের কার্যকলাপ দিয়ে তৈরী হবে তার অন্তর্নিহিত রূপের ঠাসবুনুনী। তার বাইরে এই চরিত্রগুলির অস্তিত্বের কোনো প্রয়োজনই নেই। আমাদের চেনা পৃথিবীর লোকেদের সঙ্গে নাটকের চরিত্রগুলির সাদৃশ্য থাকবে বটে, কিন্তু *action*-এর প্রয়োজনেই তাদের অস্তিত্ব সীমায়িত হবে। এই চিন্তাসূত্রটি অনুধাবন করে শ্রীজোন্‌স্‌ এ্যারিস্টট্‌লের তিনটি মূল শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। *Hamartia* কথাটিকে আমরা নায়কের বিশেষ দোষ (tragic flaw) বলে জানি, কিন্তু শ্রীজোন্‌সের মতে তা বিচারের ভুল। এই বিচারের ভুলে আসে পরিবর্তন (perpeteia)—পরিবর্তন শুধু নায়কের একার জীবনে নয়, সমগ্র ঘটনাসমন্বয়ে; এবং তার সঙ্গে মুখোমুখি হতে পারার ক্ষমতা হচ্ছে *anagnorisis* (*recognition*)। সুতরাং, ট্র্যাজেডী কোনও ব্যক্তিবিশেষের জীবনের বিবর্তন নয়, সমগ্র মানবসত্তার ইতিহাসের অংশবিশেষ। তার নিজস্ব রূপ আছে, সে স্বয়ংসম্পূর্ণ; তার স্বল্প পরিসরের মধ্যে সে এমন এক পরিণতির সম্মুখীন হয় যার মাধ্যমে জীবনকে গভীরতর, নিবিড়তর করে বোঝা যায়। ট্র্যাজেডী কোনও শুষ্ক নীরস তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়মাত্র নয়, তা জীবনবোধের পরিবাহক, অভিজ্ঞতার পরিপূরক—'Thus tragic action presents the translucent and vital quality of a life-event; it makes sense of experience. Aristotle's treatise, begins and ends, as any sane aesthetic might, with art confronting life in an effort of interpretation।'

এই বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীজোন্‌স্‌ তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় এবং বৃহত্তর অংশে এথেন্সের ত্রয়ী নাট্যকার ইস্কিলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিদিস্‌-এর ট্র্যাজেডীতে মানুষের রূপের ক্রমবিবর্তন দেখিয়েছেন। গ্রীক নীতিবোধের পটভূমিকায় চরিত্রগুলির ঘাতপ্রতিঘাত বিশ্লেষণ করে শ্রীজোন্‌স্‌ দেখিয়েছেন মানুষের প্রতিকৃতি কেমন করে ধীরে ধীরে স্পষ্টতর হয়ে চলেছে। নিয়তির অমোঘ ও নিষ্ঠুর বিধানের মধ্য থেকে মানুষ জীবনকে বুঝে নেবার চেষ্টা করছে ইস্কিলাসের অরেষ্টিস নাট্যত্রয়ের মধ্যে। সফোক্লিসের নাটকে মানুষের জয়যাত্রা আরও একধাপ এগিয়ে এসেছে। বহির্জগতের বিধান এবং অন্তরের নীতিবোধের মধ্যবর্তী রেখাগুলি আর অত রূঢ়ভাবে স্পষ্ট নয়। নাটকে মানুষের ঐকান্তিক রূপ আরও অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে ইউরিপিদিসের চরিত্রগুলির অন্তর্মুখিতার মধ্যে।

সফোক্লিসের নাট্যবিচার করতে গিয়ে লেখক বলছেন যে যদিও মানবচরিত্রের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে এ্যারিস্টট্‌ল জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, তবুও দেখা যায় তাঁর অতি প্রিয় সফোক্লিসের নাটকের মধ্যেও মানবচরিত্র তার প্রাধান্য বিস্তার করছে। শ্রীজোন্‌স্‌-এর মতে এ্যারিস্টট্‌ল বোধহয় খানিকটা বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর সমসাময়িক এথেন্সের রঙ্গালয়েই শত্রুপক্ষের প্রতিপত্তি বাড়তে চলেছে, তাই তিনি আরও জোরের সঙ্গে ট্র্যাজেডীতে প্লট-অনুভূত *action*-এর মহিমা প্রচার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

কিন্তু নাটকের আঙ্গিক আলোচনায় চরিত্র আর ঘটনাপ্রবাহের বিবাদ শেষ পর্যন্ত

দাঁড়ায় গিয়ে সাজানো, নকল এক দ্বন্দ্বে। এককে নিয়েই অন্যের প্রকাশ। বইটিকে সফোক্লিসের নাটকের আলোচনা করতে গিয়েই এই বিবাদের অস্থায়িত্ব বেরিয়ে পড়েছে। অতি সাবধানে যুক্তিসমূহের অবতারণা করে যিনি এ্যারিস্টট্‌লকে চরিত্র প্রাধান্যের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করেছিলেন সেই লেখককেও চেষ্টা করতে হয়েছে দুই বিবাদী পক্ষের মধ্যে হাত মিলিয়ে দিতে : 'humanity serves action rather as colour serves the finished portrait in Aristotle's own simile; humanity does not vie with action।' ডাইওনশইয়াসের পূজা-সম্ভূত নৃত্য-গীত ইত্যাদি বহিরঙ্গসর্বস্ব নাটক কিভাবে মানুষের অন্তর্জগতে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করলো বইটিতে তারই আদি-পর্বের কথা লিপিবদ্ধ; এবং এই আলোচনা পড়ে মনে হয় যে এ্যারিস্টট্‌লের চেষ্টা প্রথম থেকেই ব্যর্থতার সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছিল। তাঁর শিষ্য থিওফ্র্যাস্‌টাস খোলাখুলি-ভাবেই নাটকে চরিত্রের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন।

বইটি পড়তে শুরু করার সময় যে ক'টি প্রত্যাশা মনে জাগে শেষ পর্যন্ত সেগুলোর অধিকাংশই অপূর্ণ থেকে যায়। যেমন, এ্যারিস্টট্‌লকে রোম্যান্টিক সংস্কারমুক্ত করবার যে আশ্বাস দিয়ে লেখক প্রথম আরম্ভ করেন তার পরিণতি কোথায়? এ্যারিস্টট্‌লের কাব্যতত্ত্বে নাটকের বহিরঙ্গের সঙ্গে অন্তরঙ্গের যে সম্পর্ক তিনি স্থাপন করেছেন তার মূল কথাটি আমরা আগেই পেয়েছি টি. এস. এলিয়টের 'objective correlative' তত্ত্বে। গোড়াতে শ্রীযুক্ত জোন্‌স্‌ যেমন আঁটঘাট বেঁধে এ্যারিস্টট্‌লের পুনরুদ্ধারের কাজে নেমেছিলেন তাতে মনে হয়েছিল হয়তো বা ইউরোপীয় সাহিত্যের কোনও লুপ্ত অধ্যায়ের পুনরুদ্ঘাটন হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো যে তিনি বিশ শতকের নব্য মানববাদীদেরই একজন। অথচ লেখকের এই স্বরূপ ধরা পড়তে কিছু সময় লাগে তাঁর সংস্কারকের মুখোশটির দরুন।

নাট্যচিন্তার দিক থেকেও শ্রীজোনস্‌-এর মৌলিক অবদান কিছু চোখে পড়লো না। নাটকে মানবচরিত্রের প্রাধান্যকে তিনি সদর দরজা দিয়ে ঘটা করে বিদায় দিয়ে আবার খিড়কির দরজা খুলে পরম আদরে ডেকে এনেছেন মাত্র। 'Tragic hero'র বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণেও নতুন কিছু কাজ হবে বলে মনে হয় না। ইউরোপীয় স্যাহিত্যে নায়কপ্রধান নাটকের বিলুপ্তি ঘটেছে এই শতকের গোড়াতেই।

তবে শ্রীজোনস্‌-এর এ্যারিস্টট্‌ল আলোচনার একটি প্রয়োজনীয় দিক আছে। বিশ শতকের সাধারণগ্রাহ্য নাট্যচিন্তার আলোতে এ্যারিস্টট্‌লের কাব্যতত্ত্বের এত পুংখানুপুংখ আলোচনা বোধহয় এর আগে আর হয় নি।

যশোধরা বাগচী

অনল-আয়তি—সুশীল রায়। এস্‌. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা ১২। মূল্য ১৫·০০ টাকা।

'অনল-আয়তি' ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসের কাহিনী ঊনবিংশশতাব্দীর বাংলাদেশের করুণতম একটি অধ্যায়, সময়ের বুক তোলপাড় করে যেন একটি গোপন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে। অনেক জীবন-যৌবন-ধন-মান ভাগীরথীর কালস্রোতে কিভাবে সেদিন ভেসে

গেছে, সেকথা আজ আমাদের ভালো করে জানা নেই। বণিকী সভ্যতার পত্তনের তলায় অনেক নটেগাছ মুড়োনোর গল্প আছে এই দেশে। সেই অজ-গ্রামে বহু চর্বিত চর্বণের নেপথ্য নথিতথ্য কাহিনী আকারে এই উপন্যাসের মূল কাঠামোর গায়ে দানা বেঁধে উঠেছে! ভাগীরথীর উভয় কূল এই কাহিনীর কানাকানিতে মালমশলা জুগিয়েছে। মাহেশ, রিষড়া, কোন্নগর, গৌরহাটি, চন্দননগর, চুঁচুড়া, বলাগড় এবং খড়দহ, জগদ্দল, কাঁকিনাড়া, সুখসাগর, শান্তিপুর, কলকাতা এই পটভূমিকায় একটি নারীর হৃদয়বিদারণের রহস্যময় কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীসুশীল রায়। দ্বিখণ্ডিতা রাধারাণীই এই উপন্যাসের নায়িকা। সতীদাহের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের চোখের সামনে এক জটিল প্রশ্নকেই যেন জীবন্ত করে রেখে গেল সে।

হরিশঙ্কর এবং তার মেয়ে রাধা এই উপন্যাসের মৌলবিন্দুতে রয়েছে। আকস্মিক-ভাবে নির্বাপিত গৌরহাটির চিতা থেকে শুরু হয়েছে এই কাহিনী, শেষ হয়েছে চুঁচুড়ার প্রজ্বলিত চিতায়। একটি মেয়ের জীবনেই দুটি চিতার তাপ এবং উত্তাপ এসে লেগেছে। বাবার হাত ধরে একদিন চলতে শুরু করেছিল দশ বছরের সেই মেয়েটি। অনেক লোকশ্রুতি নিরুক্তির মধ্য দিয়ে, অনেক মানুষের চড়াই উৎরাই ভেঙে জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জিত হল। পৃথিবীর মাটি কত উঁচুনীচু, পৃথিবীর মানুষ কত অন্ধকার, পৃথিবীর বিচার কত অবাস্তব, আক্ষরিক এবং অসার, জীবনের চরিতার্থতা সুখসম্ভোগ কত ক্ষণস্থায়ী, কত দ্রুত পরিবর্তনশীল ও বিলীয়মান এবং স্বপ্ন যে শুধু পৃথিবীতে আত্মপ্রবঞ্চনার আর এক নাম, এসব জানতে রাধাকে যে মূল্য দিতে হল তা চরম। কিশোরী বয়সে শান্তিপুরের রাস-উৎসবে রাইরাজা নির্বাচিত হয়ে চুঁচুড়ার বেনিয়ান রূপচরণ রায়ের নজরবন্দী হল রাধারাণী। পরিণামে তাঁর পুত্রবধূ হয়ে নিঃসঙ্গ প্রদীপের মত ঘর আলো ক'রে জ্বলতে এল সে। স্বামী তার দিকে ফিরেও তাকালো না। জোয়ার এল তারপর, পূর্ণ যৌবনের ভরা জোয়ার। তাসের ঘরের বিবিবাঁদী ভাসল একসঙ্গে উপবাসী ঐশ্বর্যের প্রাত্যহিক আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। এ যেন ঋতুসংহার এবং স্বপ্নসংহার একসঙ্গে। ফুলের মত নিষ্পাপ একটি মেয়ে কি ক'রে নিষ্পেষিত হল, বাসি হল এবং বিলীন হয়ে গেল তারই কাহিনী দক্ষতা এবং সংযমের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক।

সমাজের মুখের উপর প্রচণ্ড মুষ্ঠাঘাতের মতই মনে হয় রাধারাণীর রাণীবাঈ হওয়ার গোপন কাহিনী। একটি মেয়ের জীবনের নিঃসঙ্গতা কিছুতেই ঘুচলো না, জীবনের এই নিয়তি বড় মর্মস্পর্শী। জীবনে পথভুল করে অনেক মেয়েই, কিন্তু ভুলপথ বেছে নেয় দুচারজন মাত্র। রাধারাণী তাই করেছিল। ইতিহাসের আধুনিক পৃষ্ঠাজীবী নীলিমাবৌদি এবং রাধারাণী যে একই আগুনের শিখায় আত্মাহুতি দিয়েছে, তা' সমালোচকের নজর এড়ায়নি। সময়টা অনেকখানি আগুপিছু, আর কাহিনীটা সামান্য উল্টোপাল্টা, এই যা। লোকচক্ষে একজন সতী অন্যজন অসতী। একজনের মৃত্যু আত্মহত্যা ব'লে সনাক্ত হল, অন্যজনের আত্মাহুতি। কিন্তু এই দুটি দুর্ঘটনাই কি প্ররোচিত নয়? মৃত্যু-দুটিকে স্বয়ম্বরা মনে হলেও কেউ কি নির্মম হাতে ঠেলে দেয়নি তাদের?

এই দুটি মৃত্যুর চারপাশে ক্ষণস্থায়ী যে নারীমূর্তিগুলি বিচিত্র ব্যথিত মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছে, তারাও এই দ্রুতলয় কাহিনীর মধ্যে চক্ষের পলকে যেন অবিস্মরণীয় হয়ে গেছে। যেমন কামনার কারুণ্যে কদম্ব, ভমিনী, বাসন্তী; স্মৃতির দহনে শ্রীমতী কুর্টিশ, নিরুপমা এবং জীবনের নির্মম উপহাসে বিধুমুখী-বিরজার দল।

উল্টোপাল্টা অনেক প্রশ্ন ভিড় ক'রে আসে। দাহ্য পদার্থে কি কেবলই জ্বলা, না জ্বালাও আছে? কামনার উৎস কোথায়, দেহে, না মনে? ভুল কি কেবল এই দেহই করে? মানুষের ভুলের মাশুল তবে কেন একা এই দেহ-ই হাত পেতে নিতে বাধ্য থাকবে?

মুখ্যকাহিনীর মাঝখানে অনেক উপকাহিনী, শাখাকাহিনীর শেকড় গজিয়েছে। অনেক উপচর-সহচর মানুষ, অনেক উপচার-সমাচার ছড়িয়ে আছে। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের অনেক খুঁটিনাটি থেকে শুরু ক'রে, জনশিক্ষার বিবিধ আয়োজন, শহর কলকাতা গ'ড়ে ওঠার বিচিত্র ইতিহাস, দেশীবিদেশী জনসমাজের কৃষ্টিকালচার, বনেদীবেনিয়ান, বাই-বাতিক, বুলবুলির লড়াই, কালীঘাটের পটপটুয়া, নবজাগৃতি-নতুনধর্মমত, নীলকুঠির নানা তথ্য, উৎসব-ঘরোয়ানা, সব মিলিয়ে একটি যুগের যেন বহুমুখী এক চিত্র তৈরি হয়েছে। সেই চিত্রে আসন্নকালীন মনীষী মহাপুরুষদের বাল্যমূর্তিগুলি পর্যন্ত সযত্নে ধরা রয়েছে। যেমন বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, থ্যাকারে প্রভৃতি।

এক সহজ নিরীক্ষণে, অত্যন্ত প্রত্যক্ষভঙ্গিতে লেখক ইতিহাসের নিকটদূর জীবন্ত ক'রে তুলতে চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসের সমস্ত পর্যবেক্ষণের অন্তরালে তাঁর কবিমানস সজাগ। কবিয়ালদের জীবনচিত্রগুলি জীবন্ত চিত্র হয়েছে। গানগুলির মধ্যে লিপিকুশলতার পরিচয় বিদ্যমান। সব মিলিয়ে নাট্যরস ঘনীভূত হয়েছে। উপন্যাসের অধ্যায়চিত্রগুলি হারিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের স্মৃতির রেখা। চিত্রশিল্পীর পাশাপাশি কথাশিল্পীর চলচ্চিত্রাবলী আবার আমরা স্মরণ করছি।

আনন্দ বাগচী

এই বিশ্বের কথা সাহিত্য—অজিত গুপ্ত। কথাকলি। কলিকাতা-১২। মূল্য ১৪·০০

আলোচ্য বইয়ের ভূমিকায় ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, 'পাশ্চাত্ত্য কথাসাহিত্যের প্রতি এই অনুরাগ লক্ষ্য করেই বোধহয় শ্রীযুক্ত অসিত গুপ্ত এই গ্রন্থখানি রচনা করেছেন এবং......স্বল্প পরিসরে তিনি ইংরেজী আমেরিকান ফরাসী ও রুশ কথাসাহিত্যের বিবরণ এই গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন, প্রায় কালানুক্রম অনুসরণ করে।'...গ্রন্থকার নিজে লিখছেন, 'এই রচনাকর্মটি পণ্ডিত ও বিদগ্ধজনদের জন্য নয়, সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং উৎসাহী অথচ অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য, যাঁদের এই বিশ্বের কথাসাহিত্যের বিস্তীর্ণ পরিসর সম্পর্কে আগ্রহ আছে, জিজ্ঞাসা আছে, কিন্তু একটি সহানুভূতিসম্পন্ন পথ প্রদর্শকের অভাবে যাঁরা উপন্যাস গল্পের স্ফীত আয়তন সম্পর্কে ভীত হন, অসহায় বোধ করেন।'

গ্রন্থ সমালোচনার শুরুতেই এই উদ্ধৃতির কারণ হল যে এই ধরনের সমালোচনা-মূলক গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য না জানলে, গ্রন্থের প্রতি অবিচারের যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। জগতের যাবতীয় দেশের সাহিত্যের ধর্ম, মর্ম ও মূল, বিচ্ছিন্ন ও এককভাবে জানানো এ বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। তাই বলে সাহিত্যের এই সত্তা সম্পর্কে লেখক মোটেই উদাসীন নন, কারণ অনুবন্ধে তিনি লিখছেন, 'যে-ভাবনা ভাষায় অনূদিত হয়ে বাক্য হয়েছে, তার পেছনে আছে অনুভব। আর এই অনুভবই সাহিত্যের প্রধান কথা।' দুঃখের বিষয় ক্ষেত্রের সীমিত পরিসরের জন্য এই 'প্রধান কথা'টি সম্বন্ধে অনেকখানি বাদ পড়ে গেছে। আসলে

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সাহিত্য নয়, ভিন্ন ভিন্ন দেশের উপন্যাস ও গল্পলেখক এবং তাঁদের লেখা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও গল্পগুলি। তাও কম কথা নয়।

গ্রন্থকার প্রকাশ্যভাবে বলেছেন যে যাঁদের নিয়ে এই বইয়ে আলোচনা হয়েছে ('স্বল্পখ্যাত ফরাসী কথাশিল্পী'), তাঁদের অনেকের রচনাকর্মের সঙ্গেই তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। সুখের বিষয় সাহিত্যিকদের নিজেদের দেশের সমালোচকরা তাঁদের বিষয়ে বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করে থাকেন, এবং সেসব সমালোচনার অন্যান্য ভাষায়, বিশেষভাবে ইংরেজিতে অনুবাদও হয়ে থাকে। কাজেই অনুসন্ধিৎসু গ্রন্থকারের পক্ষে বিদেশী লেখকদের সব রচনা না পড়েও তাঁদের ও তাঁদের বই সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা শ্রমসাপেক্ষ হলেও অসম্ভব নয়।

এক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। আপাতদৃষ্টিতে এই বইখানিকে একটি সম্পূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ না বলে বরং সাহিত্যের রেফারেন্স একখণ্ড বলে মনে হতে পারে; কিন্তু বইটি আগাগোড়া পড়লে এই ধরনের রচনার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়। বইটিকে সাতটি অধ্যায় ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমটি হল অনুবন্ধ; এখানে মানুষের সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় কয়েকটি দেশের কথাসাহিত্যের জন্ম ও বিকাশ সম্বন্ধে কিছু তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করা হয়েছে। তারপর চারটি অধ্যায় ইংরেজি, ফরাসী, রুশ ও আমেরিকান উপন্যাস ও গল্পের লেখক ও তাঁদের বিশিষ্ট রচনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লিখিত চারটি ভাষার শ্রেষ্ঠ ঊনত্রিশটি গল্প ও তাদের রচয়িতাদের কীর্তির সংক্ষিপ্ত সারাংশ দেওয়া আছে। তা ছাড়া শেষ অধ্যায়ের নির্ঘণ্টে যত ইংরেজ ফরাসী রুশ ও আমেরিকান লেখকের ও রচনার এ বইতে নাম করা হয়েছে, বর্ণানুক্রমে তাঁদের তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে।

একটি কথা না বললে চলে না। সাধারণ বাঙালী লেখক বা পাঠকের পক্ষে সব ভাষার সব রচনা ও রচয়িতার নামের সঠিক উচ্চারণ জানা সম্ভব নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। এ ক্ষেত্রে দুটি উপায় অবলম্বন করলে অবস্থার হয় তো কিঞ্চিৎ উন্নতি করা যায়। প্রথমত, বাংলা হরপে লেখা নামগুলির পাশে ইংরিজি হরপে নামগুলির বানান দিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, ঐ ভাষাভাষীদের কাউকে ধরে সঠিক উচ্চারণগুলি জেনে নেওয়া। তথ্যের দিকে দু'একটি ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি যে বইটিতে নেই তা নয়।

লীলা মজুমদার

যাও, উত্তরের হাওয়া—অরুণকুমার সরকার। ত্রিবেণী। কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা

দশের হিসেবটা এখন প্রায় একটা মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে। যেন প্রত্যেকটা দশকে বাংলা কবিতা একটা ক'রে নতুন মোড় নিয়েছে। কবিতায় বদল অমন ঘড়ি ধ'রে গুণে গুণে শতাব্দীতে দশ বার ক'রে আসে না।

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতাকে দুটো বড় খাতে বইয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে। একটিতে বুদ্ধির টান প্রবল, অন্যটিতে হৃদয়ের টান। একদিকে টেনেছেন সুধীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে জীবনানন্দ।

অরুণকুমার সরকার এই দোটানার মধ্যে প'ড়ে কখনও বলেন :

> যদিও রঙীন মুহূর্তটুকু আচিরে
> অদৃশ্য ফের দুর্ভাবনার তিমিরে
> যেখানে অর্ধসত্য ছলনা চাতুরি,
> বুঝেছে অনেক গভীর রাতের মন
> সেটুকুই ছিল আমাদের যৌবন
> বাকিটুকু শুধু সময়-প্রভুর চাকুরি।

কখনও :

> জলের নিকটে এলে মানুষ কি বোবা হয়ে যায়!
> ভাবে, সেও গাছ মাটি মেঘের ছায়ার মতো কিছু॥
> শীতের দুপুর হাওয়া ধুলো রোদ সব কিছু জড়িয়ে
> ছড়িয়ে রয়েছে তার অস্তিত্বের নিবিড় শিকড়।

অরুণকুমার সরকারের বাহাদুরি এইখানে যে, এই দোটানায় তাঁকে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলে থাকতে হয়নি বরং টানাপোড়েনের অস্থির সূত্রে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন স্বকীয় শিল্পকাজ।

"যাও, উত্তরের হাওয়া"য় বিদায়ী যৌবনের দীর্ঘশ্বাস স্পষ্ট। কিন্তু 'যৌবনের ধনুর্বাণ লুকানো ইচ্ছার শমীগাছে।' শীতের নিষ্পত্র বিশুষ্ক ডালে দিন গোণে দুর্মর বসন্ত। অথচ বয়স যত বাড়ে, দেখবার চোখও বদলায়। খুব উঁচু থেকে সবই সমতল দেখায়। 'আবাদে ও মরুদেশে শুধুমাত্র রঙের তফাত।'

তবে কি তিনি নিরুত্তাপ দার্শনিকতায় নিজেকে সব কিছু থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছেন, সরিয়ে নিচ্ছেন? তাও নয়। দায়, দায়িত্ব, রাগ, তাপ, ভালবাসা, ঘৃণা থেকে থেকে উচ্চকিত হয়ে উঠে তাঁর পাদপীঠ নড়িয়ে দেয়। যদিও তিনি বলেন 'প্রেমেই...কবিতার আদি বাসস্থান', তাহলেও কোনো স্থিরবিশ্বাসের শক্ত মাটিতে তিনি দাঁড়ান না। যাকে তিনি দূরে ঠেলেন হয়ত এই বন্ধনহীন নির্বন্ধ দিয়েই ফিরে তাকে কাছে টেনে নেন।

অরুণকুমার সরকার ছন্দচাতুর্যে আর বাক্‌বন্ধনে সিদ্ধহস্ত। 'ধাঁ ক'রে মাথায় রাগ চড়ে বসলে, ছুঁড়লুম বইটাকে', 'যেমনি ভো কাট্টা হয়ে উপড়ে গেল পেটকাটি ঘুড়িটা', 'কে আছ? কেউ আছ? কেউ নি নেই হে'—এ রকম চতুর ঠোঁট-কাটা বাক্যের পাশে হঠাৎ 'ও হাওয়া, ও ব্যাকুল হাওয়া, কেন তোর বকুনি অযথা', 'ঘুরে ঘুরে দূরে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া/ টাঙার জীর্ণ চাকা', 'কেবল হৃদয় তার চুরি ক'রে নিয়ে গেল পাখি', হঠাৎ মনটাকে হু হু ক'রে তোলে। অল্প কথায় অনেকখানি বলা, বার বার আবৃত্তি করবার মত স্মরণীয় পঙ্‌ক্তি রচনা করা, কয়েকটি আঁচড়ে ছবি ফুটিয়ে তোলা—অরুণকুমার সরকারের এ ক্ষমতা তাঁর সমসাময়িক অনেকের চেয়ে বেশী।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, একটি কথা থেকেই যায়—এক জায়গায় এসে নিজেকে খণ্ডন করা দোষের হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বাসে জোর না বাঁধলে ছন্দ বা বাক্যের দৃঢ়বন্ধনকেও যে আলগা ক'রে দেয় "যাও, উত্তরের হাওয়া"য় তার যথেষ্ট চিহ্ন আছে। এও জানি, হাজার খুঁতখুঁতে হয়েও এ বই বার বার পড়তে হবে—কেননা এতে ধরা পড়েছে আমাদের কাল, কথা বলেছে আমাদের মুখচোরা বহুদর্শী হৃদয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

